বর্ণানুক্রমিক সূচী

(১৩২২ বৈশাখ—আশ্বিন)

বর্ণানুক্রমিক সূচী

(১৩২২ কার্ত্তিক—চৈত্র)

সবুজ পত্র

ঘরে-বাইরে

মাগো, আজ মনে পড়চে তোমার সেই সিঁথের সিঁদুর, চওড়া সেই লাল-পেড়ে সাড়ি, সেই তোমার দুটি চোখ—শান্ত, স্নিগ্ধ, গভীর। সে যে দেখেচি আমার চিত্তাকাশে ভোর-বেলাকার অরুণরাগ-রেখার মত। আমার জীবনের দিন যে সেই সোনার পাথেয় নিয়ে যাত্রা করে বেরিয়েছিল। তার পরে? পথে কালো মেঘ কি ডাকাতের মত ছুটে এল? সেই আমার আলোর সম্বল কি এক কণাও রাখ্‌ল না? কিন্তু জীবনের ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে সেই যে উষা-সতীর দান, দুর্য্যোগে সে ঢাকা পড়ে, তবু সে কি নষ্ট হবার?

আমাদের দেশে তাকেই বলে সুন্দর যার বর্ণ গৌর। কিন্তু যে আকাশ আলো দেয় সে যে নীল। আমার মায়ের বর্ণ ছিল শামলা, তাঁর দীপ্তি ছিল পুণ্যের। তাঁর রূপ রূপের গর্ব্বকে লজ্জা দিত।

আমি মায়ের মত দেখ্‌তে এই কথা সকলে বলে। তা নিয়ে ছেলেবেলায় একদিন আয়নার উপর রাগ করেচি। মনে হত আমার সর্ব্বাঙ্গে এ যেন একটা অন্যায়,—আমার গায়ের রং এ যেন আমার আসল রং নয়, এ যেন আর কারো জিনিষ, একেবারে আগাগোড়া ভুল।

সুন্দরী ত নই কিন্তু মায়ের মত যেন সতীর যশ পাই দেবতার কাছে একমনে এই বর চাইতুম। বিবাহ সম্বন্ধ হবার সময় আমার শ্বশুর-বাড়ি থেকে দৈবজ্ঞ এসে আমার হাত দেখে বলেছিল,—এ মেয়েটি সুলক্ষণা, এ সতী-লক্ষ্মী হবে।—মেয়েরা সবাই বল্লে, তা হবেই ত, বিমলা যে ওর মায়ের মত দেখতে।

রাজার ঘরে আমার বিয়ে হল। তাঁদের কোন্ কালের বাদসাহের আমলের সম্মান। ছেলেবেলায় রূপকথায় রাজপুত্রের কথা শুনেছি,—তখন থেকে মনে একটা ছবি আঁকা ছিল।—রাজার ঘরের ছেলে, দেহখানি যেন চামেলি ফুলের পাপড়ি দিয়ে গড়া, যুগযুগান্তর যে সব কুমারী শিবপূজা করে এসেছে তাদেরই একাগ্রমনের কামনা দিয়ে সেই মুখ যেন তিলে তিলে তৈরি। সে কি চোখ, কি নাক! তরুণ গোঁফের রেখা ভ্রমরের দুটি ডানার মত—যেমন কালো, তেমনি কোমল।

স্বামীকে দেখ্‌লুম, তার সঙ্গে ঠিক মেলে না। এমন কি, তাঁর রং দেখ্‌লুম আমারি মত। নিজের রূপের অভাব নিয়ে মনে যে সঙ্কোচ ছিল সেটা কিছু ঘুচল বটে কিন্তু সেই সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাসও পড়ল। নিজের জন্যে লজ্জায় না হয় মরেই যেতুম, তবু মনে মনে যে রাজপুত্রটি ছিল তাকে একবার চোখে চোখে দেখ্‌তে পেলুম না কেন?

কিন্তু রূপ যখন চোখের পাহারা এড়িয়ে লুকিয়ে অন্তরে দেখা দেয় সেই বুঝি ভালো। তখন সে যে ভক্তির অমরাবতীতে এসে দাঁড়ায়—সেখানে তাকে কোনো সাজ করে আস্‌তে হয় না। ভক্তির আপন সৌন্দর্য্যে সমস্তই কেমন সুন্দর হয়ে ওঠে সে আমি ছেলেবেলায় দেখেচি। মা যখন বাবার জন্যে বিশেষ করে ফলের খোসা ছাড়িয়ে সাদা পাথরের রেকাবিতে জলখাবার গুছিয়ে দিতেন, বাবার জন্যে পানগুলি বিশেষ করে ক্যাওরা জলের ছিটে দেওয়া কাপড়ের টুকরোয় আলাদা জড়িয়ে রাখ্‌তেন, তিনি খেতে বস্‌লে তালপাতার পাখা নিয়ে আস্তে আস্তে মাছি তাড়িয়ে দিতেন, তাঁর সেই লক্ষ্মীর হাতের আদর, তাঁর সেই হৃদয়ের সুধারসের ধারা কোন্ অপরূপ রূপের সমুদ্রে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়ত সে যে আমার সেই ছেলেবেলাতেও মনের মধ্যে বুঝতুম।

সেই ভক্তির সুরটি কি আমার মনের মধ্যে ছিল না? ছিল। তর্ক না, ভালোমন্দের তত্ত্বনির্ণয় না, সে কেবলমাত্র একটি সুর। সমস্ত জীবনকে যদি জীবনবিধাতার মন্দির-প্রাঙ্গণে একটি স্তব-গান করে বাজিয়ে যাবার কোনো সার্থকতা থাকে তবে সেই প্রভাতের সুরটি আপনার কাজ আরম্ভ করেছিল।

মনে আছে, ভোরের বেলায় উঠে অতি সাবধানে যখন স্বামীর পায়ের ধূলো নিতুম তখন মনে হত আমার সিঁথের সিঁদূরটি যেন শুকতারার মত জ্বলে উঠ্‌ল। একদিন তিনি হঠাৎ জেগে হেসে উঠে বল্লেন, ওকি বিমল, করচ কি? আমার সে লজ্জা ভুল্‌তে পারব না। তিনি হয় ত ভাবলেন, আমি লুকিয়ে পুণ্য অর্জ্জন করচি। কিন্তু নয়, নয়, সে আমার পুণ্য

নয়,—সে আমার নারীর হৃদয়, তার ভালোবাসা আপনিই পূজা করতে চায়।

আমার শ্বশুর-পরিবার সাবেক নিয়মে বাঁধা। তার কতক কায়দা কানুন মোগল পাঠানের, কতক বিধিবিধান মনু পরাশরের। কিন্তু আমার স্বামী একেবারে একেলে। এ বংশে তিনিই প্রথম রীতিমত লেখাপড়া শেখেন, আর এম, এ, পাশ করেন। তাঁর বড় দুই ভাই মদ খেয়ে অল্পবয়সে মারা গেছেন—তাঁদের ছেলেপুলে নেই। আমার স্বামী মদ খান না; তাঁর চরিত্রে কোনো চঞ্চলতা নেই—এ বংশে এটা এত খাপছাড়া যে, সকলে এতটা পছন্দ করে না, মনে করে যাদের ঘরে লক্ষ্মী নেই অত্যন্ত নির্ম্মল হওয়া তাদেরই সাজে; কলঙ্কের প্রশস্ত জায়গা তারার মধ্যে নেই, চাঁদের মধ্যেই আছে।

বহুকাল হল আমার শ্বশুর শাশুড়ীর মৃত্যু হয়েছে। আমার দিদিশাশুড়ীই ঘরের কর্ত্রী। আমার স্বামী তাঁর বক্ষের হার, তাঁর চক্ষের মণি। এই জন্যেই আমার স্বামী কায়দার গণ্ডি ডিঙিয়ে চল্‌তে সাহস করতেন। এই জন্যেই তিনি যখন মিস্ গিল্‌বিকে আমার সঙ্গিনী আর শিক্ষক নিযুক্ত করলেন তখন ঘরে বাইরে যত রসনা ছিল তার সমস্ত রস বিষ হয়ে উঠ্‌ল, তবু আমার স্বামীর জেদ বজায় রইল।

সেই সময়েই তিনি বি, এ, পাশ করে এম্ এ পড়ছিলেন। কলেজে পড়বার জন্যে তাঁকে কলকাতায় থাক্‌তে হত। তিনি প্রায় রোজই আমাকে একটি করে চিঠি লিখ্‌তেন, তার কথা অল্প, তার ভাষা সাদা, তাঁর হাতের সেই গোটা গোটা গোল

গোল অক্ষরগুলি যেন স্নিগ্ধ হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকৃত।

একটি চন্দনকাঠের বাক্সের মধ্যে আমি তাঁর চিঠিগুলি রাখতুম, আর রোজ বাগান থেকে ফুল তুলে সেগুলি ঢেকে দিতুম। তখন আমার সেই রূপকথার রাজপুত্র অরুণালোকে চাঁদের মত মিলিয়ে গেছে। সেদিন আমার সত্যকার রাজপুত্র বসেছে আমার হৃদয়সিংহাসনে। আমি তাঁর রাণী, তাঁর পাশে আমি বসতে পেরেচি; কিন্তু তার চেয়ে আনন্দ—তাঁর পায়ের কাছে আমার যথার্থ স্থান।

আমি লেখাপড়া করেছি সুতরাং এখনকার কালের সঙ্গে আমার এখনকার ভাষাতেই পরিচয় হয়ে গেছে। আমার আজকের এই কথাগুলো আমার নিজের কাছেই কবিত্বের মত শোনাচ্চে। এ কালের সঙ্গে যদি কোনো একদিন আমার মোকাবিলা না হত তাহলে আমার সেদিনকার সেই ভাবটাকে সোজা গদ্য বলেই জানতুম—মনে জানতুম মেয়ে হয়ে জন্মেছি এ যেমন আমার ঘরগড়া কথা নয় তেমনি মেয়েমানুষ প্রেমকে ভক্তিতে গলিয়ে দেবে এও তেমনি-সহজ কথা—এর মধ্যে বিশেষ কোনো একটা অপরূপ কাব্যসৌন্দর্য্য আছে কিনা সেটা এক মুহূর্ত্তের জন্যে ভাববার দরকার নেই।

কিন্তু সেই কিশোর বয়স থেকে আজ এই যৌবনের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত পৌঁছতে না পৌঁছতে আরএক যুগে এসে পড়েছি। যেটা নিশ্বাসের মত সহজ ছিল এখন সেটাকে কাব্যকলার মত করে গড়ে তোলবার উপদেশ আসচে। এখনকার ভাবুক

পুরুষেরা, সধবার পাতিব্রত্য এবং বিধবার ব্রহ্মচর্য্যে যে কি অপূর্ব্ব কবিত্ব আছে, সে কথা প্রতিদিন সুর চড়িয়ে চড়িয়ে বল্‌চেন। তার থেকে বোঝা যাচ্চে জীবনের এই জায়গায় কেমন করে সত্যে আর সুন্দরে বিচ্ছেদ হয়ে গেছে। এখন কি কেবলমাত্র সুন্দরের দোহাই দিলে আর সত্যকে ফিরে পাওয়া যাবে?

মেয়ে মানুষের মন সবই যে এক ছাঁচে ঢালা তা আমি মনে করিনে। কিন্তু এটুকু জানি, আমার মনের মধ্যে আমার মায়ের সেই জিনিষটি ছিল—সেই ভক্তি করবার ব্যগ্রতা। সে যে আমার সহজভাব তা আজকের স্পষ্ট বুঝতে পারচি যখন সেটা বাইরের দিক থেকে আর সহজ নেই।

এমনি আমার কপাল, আমার স্বামী আমাকে সেই পূজার অবকাশ দিতে চাইতেন না। সেই ছিল তাঁর মহত্ত্ব। তীর্থের অর্থপিশাচ পাণ্ডা পূজার জন্যে কাড়াকাড়ি করে কেননা সে পূজনীয় নয়; পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজা দাবী করে থাকে। তাতে পূজারি ও পূজিত দুইয়েরই অপমানের একশেষ।

কিন্তু এত সেবা আমার জন্যে কেন? সাজসজ্জা দাসদাসী জিনিষপত্রের মধ্যে দিয়ে যেন আমারি দুই কূল ছাপিয়ে তাঁর আদরের বান ডেকে রইল। এই সমস্তকে ঠেলে আমি নিজেকে দান করব কোন্ ফাঁকে? আমার পাওয়ার সুযোগের চেয়ে দেওয়ার সুযোগের দরকার অনেক বেশি ছিল। প্রেম যে স্বভাব-বৈরাগী, সে যে পথের ধারে ধূলার পরে আপনার ফুল অজস্র ফুটিয়ে দেয়, সে ত বৈঠকখানার চিনের টবে আপনার ঐশ্বর্য্য মেল্‌তে পারে না।

আমাদের অন্তঃপুরে যে সমস্ত সাবেক দস্তুর চলিত ছিল আমার স্বামী তাকে সম্পূর্ণ ঠেল্‌তে পারতেন না। দিনে-দুপরে যখন-তখন অবাধে তাঁর সঙ্গে আমার দেখাসাক্ষাৎ হতে পারত না। আমি জান্‌তুম ঠিক কখন তিনি আস্‌বেন—তাই যেমন তেমন এলোমেলো হয়ে আমাদের মিলন ঘটতে পারত না। আমাদের মিলন যেন কবিতার মিল—সে আস্‌ত ছন্দের ভিতর দিয়ে যতির ভিতর দিয়ে। দিনের কাজ সেরে, গা ধুয়ে, যত্ন করে চুল বেঁধে, কপালে সিঁদুরের টিপ দিয়ে, কোঁচানো সাড়িটি পরে, ছড়িয়ে-পড়া দেহমনকে সমস্ত সংসার থেকে সম্পূর্ণ ফিরিয়ে এনে একজনের কাছে একটি বিশেষ সময়ের সোনার থালায় নিবেদন করে দিতুম। সেই সময়টুকু অল্প; কিন্তু অল্পের মধ্যে সে অসীম।

আমার স্বামী বরাবর বলে এসেছেন; স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার, সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ। এ নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে কোনোদিন তর্ক করিনি। কিন্তু আমার মন বলে, ভক্তিতে মানুষকে সমান হবার বাধা দেয় না। ভক্তিতে মানুষকে উপরের দিকে তুলে সমান করতে চায়। তাই, সমান হতে থাকবার আনন্দ তাতে বরাবর পাওয়া যায়—কোনোদিন তা চুকে গিয়ে হেলার জিনিষ হয়ে ওঠে না। প্রেমের থালায় ভক্তির পূজা আরতির আলোর মত,—পূজা যে করে এবং যাকে পূজা করা হয় দুইয়ের উপরেই সে আলো সমান হয়ে পড়ে। আমি আজ নিশ্চয় জেনেছি, স্ত্রীলোকের ভালোবাসা পূজা করেই পূজিত হয়—নইলে সে ধিক্‌, ধিক্‌! আমাদের ভালোবাসার প্রদীপ যখন

জ্বলে তখন তার শিখা উপরের দিকে ওঠে—প্রদীপের পোড়া তেলই নীচের দিকে পড়তে পারে।

প্রিয়তম, তুমি আমার পূজা চাওনি. সে তোমারই যোগ্য, কিন্তু পূজা নিলে ভালো করতে। তুমি আমাকে সাজিয়ে ভালোবেসেছ, শিখিয়ে ভালোবেসেছ, যা চেয়েছি তা দিয়ে ভালোবেসেছ, যা চাইনি তা দিয়ে ভালোবেসেছ,—আমার ভালোবাসায় তোমার চোখে পাতা পড়েনি তা দেখেছি, আমার ভালোবাসায় তোমার লুকিয়ে নিশ্বাস পড়েছে তা দেখেছি;—আমার দেহকে তুমি এমন করে ভালোবেসেছ যেন সে স্বর্গের পারিজাত, আমার স্বভাবকে তুমি এমনি করে ভালোবেসেছ যেন সে তোমার সৌভাগ্য। এতে আমার মনে গর্ব্ব আসে, আমার মনে হয় এ আমারি ঐশ্বর্য্য যার লোভে তুমি এমন করে আমার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছ। তখন রাণীর সিংহাসনে বসে মানের দাবী করি, সে দাবী কেবল বাড়তেই থাকে, কোথাও তার তৃপ্তি হয় না। পুরুষকে বশ করবার শক্তি আমার হাতে আছে এই কথা মনে করেই কি নারীর সুখ, না তাতেই নারীর কল্যাণ? ভক্তির মধ্যে সেই গর্ব্বকে ভাসিয়ে দিয়ে তবেই তার রক্ষা। শঙ্কর ত ভিক্ষুক হয়েই অন্নপূর্ণার দ্বারে এসে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু এই ভিক্ষার রুদ্রতেজ কি অন্নপূর্ণা সইতে পারতেন যদি তিনি শিবের জন্যে তপস্যা না করতেন?

আজ মনে পড়চে সেদিন আমার সৌভাগ্যে সংসারে কত লোকের মনে কত ঈর্ষ্যার আগুন ধিকিধিকি জ্বলেছিল। ঈর্ষ্যা হবারই ত কথা—আমি যে অমনি পেয়েছি, ফাঁকি দিয়ে পেয়েছি।

কিন্তু ফাঁকি ত বরাবর চলে না,—দাম দিতেই হবে নইলে বিধাতা সহ্য করেন না—দীর্ঘকাল ধরে প্রতিদিন সৌভাগ্যের ঋণ শোধ করতে হয় তবেই স্বত্ব ধ্রুব হয়ে ওঠে। ভগবান আমাদের দিতেই পারেন কিন্তু নিতে যে হয় নিজের গুণে। পাওয়া জিনিষও আমরা পাইনে এমনি আমাদের পোড়া কপাল!

আমার সৌভাগ্যে কত কন্যার পিতার দীর্ঘনিশ্বাস পড়েছিল। আমার কি তেমনি রূপ, তেমনি গুণ, আমি কি এই ঘরের যোগ্য, এমন কথা পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে উঠেচে। আমার দিদিশাশুড়ি, শাশুড়ি সকলেরই অসামান্য রূপের খ্যাতি ছিল। আমার দুই বিধবা জায়ের মত এমন সুন্দরী দেখা যায় না। পরে পরে যখন তাঁদের দুজনেরই কপাল ভাঙল তখন আমার দিদিশাশুড়ি পণ করে বসলেন যে তাঁর একমাত্র অবশিষ্ট নাতির জন্যে তিনি আর রূপসীর খোঁজ করবেন না। আমি কেবলমাত্র সুলক্ষণের জোরে এই ঘরে প্রবেশ করতে পারলুম—নইলে আমার আর কোনো অধিকার ছিল না।

আমাদের ঘরে এই ভোগের সংসারে খুব অল্প স্ত্রীই যথার্থ স্ত্রীর সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু সেটাই না কি এখানকার নিয়ম, তাই, মদের ফেনা আর নটীর নূপুর-নিক্কণের তলায় তাঁদের জীবনের সমস্ত কান্না তলিয়ে গেলেও তাঁরা কেবলমাত্র বড় ঘরের ঘরণীর অভিমান বুকে আঁকড়ে ধরে মাথাটাকে উপরে ভাসিয়ে রেখেছিলেন। অথচ আমার স্বামী মদও ছুঁলেন না, আর নারীমাংসের লোভে পাপের পণ্যশালার দ্বারে দ্বারে মনুষ্যত্বের থলি উজাড় করে ফিরলেন না এ কি আমার গুণে? পুরুষের

উদ্‌ভ্রান্ত উন্মত্ত মনকে বশ করবার মত কোন্ মন্ত্র বিধাতা আমাকে দিয়েছিলেন? কেবলমাত্রই কপাল—আর কিছুই না! আর তাঁদের বেলাতেই কি পোড়া বিধাতার হুঁস ছিল না—সকল অক্ষরই বাঁকা হয়ে উঠ্‌ল! সন্ধ্যা হতে না হতেই তাঁদের ভোগের উৎসব মিটে গেল—কেবল রূপ-যৌবনের বাতিগুলো শূন্য সভায় সমস্ত রাত ধরে মিছে জ্বল্‌তে লাগ্‌ল! কোথাও সঙ্গীত নেই, কেবলমাত্রই জ্বলা।

আমার স্বামীর পৌরুষকে তাঁর দুই ভাজ অবজ্ঞা করবার ভান করতেন। এমন মানী সংসারের তরীটাকে একটিমাত্র স্ত্রীর আঁচলের পাল তুলে দিয়ে চালানো? কথায় কথায় তাঁদের কত খোঁটাই খেয়েছি! আমি যেন আমার স্বামীর সোহাগ কেবল চুরি করে করে নিচ্চি। কেবল ছলনা, তার সমস্তই কৃত্রিম; এখনকার কালের বিবিয়ানার নির্লজ্জতা! আমার স্বামী আমাকে হালফেশানের সাজে-সজ্জায় সাজিয়েছেন—সেই সমস্ত রং বেরংঙের জেকেট সাড়ী শেমিজ পেটিকোটের আয়োজন দেখে তাঁরা জ্বল্‌তে থাক্‌তেন। রূপ নেই, রূপের ঠাট! দেহটাকে যে একেবারে দোকান করে সাজিয়ে তুল্লে গো—লজ্জা করে না!

আমার স্বামী সমস্তই জান্‌তেন। কিন্তু মেয়েদের উপর যে তাঁর হৃদয় করুণায় ভরা। তিনি আমাকে বারবার বল্‌তেন রাগ কোরো না!—মনে আছে আমি একবার তাঁকে বলেছিলুম, মেয়েদের মন বড়ই ছোট, বড় বাঁকা। তিনি জবাব দিয়েছিলেন, চীন দেশের মেয়েদের পা যেমন ছোট, যেমন বাঁকা! সমস্ত সমাজ যে চারিদিক থেকে আমাদের মেয়েদের মনকে চেপে ছোট করে

বাঁকিয়ে রেখে দিয়েছে। ভাগ্য যে ওদের জীবনটাকে নিয়ে জুয়ো খেল্‌চে—দান পড়ার উপরই সমস্ত নির্ভর, নিজের কোন্ অধিকার ওদের আছে!

আমার জা'রা তাঁদের দেওরের কাছে যা দাবী করতেন তাই পেতেন। তাঁদের দাবী ন্যায্য কি অন্যায্য তিনি তার বিচারমাত্র করতেন না। আমার মনের ভিতরটা জ্বল্‌তে থাকৃত যখন দেখ্‌তুম তাঁরা এর জন্যে একটুও কৃতজ্ঞ ছিলেন না। এমন কি, আমার বড় জা, যিনি জপে তপে ব্রতে উপবাসে ভয়ঙ্কর সাত্ত্বিক, বৈরাগ্য যাঁর মুখে এত বেশি খরচ হত যে মনের জন্যে শিকি পয়সার বাকি থাকত না,—তিনি বারবার আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্‌তেন, যে, তাঁকে তাঁর উকিল দাদা বলেছেন যদি আদালতে তিনি নালিশ করেন তাহলে তিনি—সে কত কি সে আর ছাই কি লিখ্‌ব। আমার স্বামীকে কথা দিয়েছি যে, কোনোদিন কোনো কারণেই আমি এঁদের কথার জবাব করব না, তাই জ্বালা আরো আমার অসহ্য হত। আমার মনে হত, ভালো হবার একটা সীমা আছে—সেটা পেরিয়ে গেলে কেমন যেন তাতে পৌরুষের ব্যাঘাত হয়। আমার স্বামী বল্‌তেন আইন কিম্বা সমাজ তাঁর ভাজেদের স্বপক্ষ নয় কিন্তু একদিন স্বামীর অধিকারে যেটাকে নিজের বলেই তাঁরা নিশ্চিত জেনেছিলেন আজ সেটাকেই ভিক্ষুকের মত পরের মন জুগিয়ে চেয়ে চিন্তে নিতে হচ্চে এ অপমান যে বড় কঠিন। এর উপরেও আবার কৃতজ্ঞতা দাবি করা? মার খেয়ে আবার বখশিশ দিতে হবে?—সত্য কথা বল্‌ব? অনেকবার আমি মনে মনে ভেবেছি, আর একটু মন্দ হবার মত তেজ আমার স্বামীর থাকা উচিত ছিল।

আমার মেজ জা অন্য ধরণের ছিলেন। তাঁর বয়স অল্প—তিনি সাত্ত্বিকতার ভড়ং করতেন না। বরঞ্চ তাঁর কথাবার্ত্তা হাসি-ঠাট্টায় কিছু রসের বিকার ছিল। যে সব যুবতী দাসী তাঁর কাছে রেখেছিলেন তাদের রকম সকম একেবারেই ভালো নয়। তা নিয়ে কেউ আপত্তি করবার লোক ছিল না—কেননা এবাড়ির ঐ রকমই দস্তুর। আমি বুঝতুম, আমার স্বামী যে অকলঙ্ক আমার এই বিশেষ সৌভাগ্য তাঁর কাছে অসহ্য। তাই তাঁর দেওরের যাতায়াতের পথে ঘাটে নানারকম ফাঁদ পেতে রাখতেন। এই কথাটা কবুল করতে আমার সব চেয়ে লজ্জা হয় যে, আমার অমন স্বামীর জন্যেও মাঝে মাঝে আমার মনে ভয়-ভাবনা ঢুকত। এখানকার হাওয়াটাই যে ঘোলা—তার ভিতর দিয়ে স্বচ্ছ জিনিষকেও স্বচ্ছ বোধ হয় না। আমার মেজ জা মাঝে মাঝে এক-একদিন নিজে রেঁধে বেড়ে দেওরকে আদর করে খেতে ডাক্‌তেন। আমার ভারি ইচ্ছে হত, তিনি কোনো ছুতো করে বলেন, না, আমি যেতে পারব না।—যা মন্দ তার ত একটা শাস্তি পাওনা আছে। কিন্তু ফি বারেই যখন তিনি হাসিমুখে নিমন্ত্রণ রাখতে যেতেন আমার মনের মধ্যে একটু কেমন—সে আমার অপরাধ—কিন্তু কি করব, আমার মন মান্‌ত না—মনে হত এর মধ্যে পুরুষ মানুষের একটু চঞ্চলতা আছে। সে সময়টাতে আমার অন্য সহস্র কাজ থাক্‌লেও কোনো একটা ছুতো করে আমার মেজ জায়ের ঘরে গিয়ে বস্‌তুম। মেজ জা হেসে হেসে বল্‌তেন, বাস্‌রে, ছোটরাণীর একদণ্ড চোখের আড়াল হবার জো নেই—একেবারে কড়া পাহারা! বলি,

আমাদেরও ত একদিন ছিল, কিন্তু এত করে আগলে রাখ্তে শিখিনি।

আমার স্বামী এঁদের দুঃখটাই দেখ্তেন, দোষ দেখতে পেতেন না। আমি বল্তুম, আচ্ছা, না হয়, যত দোষ সবই সমাজের, কিন্তু অত বেশি দয়া করবার দরকার কি। মানুষ না হয় কিছু কষ্টই পেলে, তাই বলেই কি—কিন্তু তাঁর সঙ্গে পারবার জো নেই। তিনি তর্ক না করে একটুখানি হাস্তেন। বোধ হয় আমার মনের মধ্যে যে একটুখানি কাঁটা ছিল সেটুকু তাঁর অজানা ছিল না। আমার রাগের সত্যিকার ঝাঁজটুকু সমাজের উপরেও না, আর কারো উপরেও না, সে কেবল—সে আর বল্‌ব না।

স্বামী একদিন আমাকে বোঝালেন—তোমার এই যে-সমস্তকে ওরা মন্দ বল্‌চে যদি সত্যিই এগুলিকে মন্দ জান্‌ত তাহলে এতে ওদের এত রাগ হত না।

তাহলে এমন অন্যায় রাগ কিসের জন্যে?

অন্যায় বলব কেমন করে? ঈর্ষ্যা জিনিষটার মধ্যে একটি সত্য আছে সে হচ্চে এই যে, যা কিছু সুখের সেটি সকলেরই পাওয়া উচিত ছিল।

তা, বিধাতার সঙ্গে ঝগড়া করলেই হয় আমার সঙ্গে কেন?

বিধাতাকে যে হাতের কাছে পাওয়া যায় না।

তা ওঁরা যা পেতে চান তা নিলেই হয়। তুমি ত বঞ্চিত করতে চাওনা। পরুন না সাড়ি জ্যাকেট গয়না জুতো মোজা, মেমের কাছে পড়তে চান ত সে ত ঘরেই আছে, আর বিয়েই যদি করতে চান তুমি ত বিদ্যেসাগরের মত অমন সাতটা সাগর পেরতে পার তোমার এমন সম্বল আছে!

ঐ ত মুস্কিল—মন যা চায় তা হাতে তুলে দিলেও নেবার জো নেই।

তাই বুঝি কেবল ন্যাকামি করতে হয় যেন যেটা পাইনি সেটা মন্দ, অথচ অন্য কেউ পেলে সর্ব্বশরীর জ্বলতে থাকে!

যে মানুষ বঞ্চিত এমনি করেই সে আপনার বঞ্চনার চেয়ে বড় হয়ে উঠ্‌তে চায়—ঐ তার সান্ত্বনা।

যাই বল তুমি, মেয়েরা বড় ন্যাকা! ওরা সত্যি কথাকে কবুল করতে চায় না, ছল করে।

তার মানে ওরা সব চেয়ে বঞ্চিত।

এমনি করে উনি যখন বাড়ির মেয়েদের সব রকম ক্ষুদ্রতাই উড়িয়ে দিতেন আমার রাগ হত। সমাজ কি হলে কি হতে পারত সে সব কথা কয়ে ত কোনো লাভ নেই কিন্তু পথেঘাটে চারদিকে এই যে কাঁটা গজিয়ে রইল, এই যে বাঁকা কথার টিট্‌কারি, এই যে পেটে এক মুখে এক, এ'কে দয়া করতে পারা যায় না।

সে কথা শুনে তিনি বল্লেন, যেখানে তোমার নিজের একটু কোথাও বাজে সেইখানেই বুঝি তোমার যত দয়া—আর যেখানে ওদের জীবনের এপিঠ ওপিঠ ফুঁড়ে সমাজের শেল বিঁধেছে সেখানে দয়া করবার কিছু নেই? যারা পেটেও খাবেনা তারাই পিঠেও সইবে?

হবে, হবে, আমারি মন ছোট! আর সকলেই ভালো কেবল আমি ছাড়া! রাগ করে বল্লুম, তোমাকে ত ভিতরে থাক্‌তে হয়

না, সব কথা জান না।—এই বলে আমি তাঁকে ও মহলের একটা বিশেষ খবর দেবার চেষ্টা করতেই তিনি উঠে পড়লেন, বল্লেন, চন্দ্রনাথ বাবু অনেকক্ষণ বাইরে বসে আছেন।

আমি বসে ঘসে কাঁদতে লাগ্‌লুম। স্বামীর কাছে এমন ছোট প্রমাণ হয়ে গেলে বাঁচি কি করে? আমার ভাগ্য যদি বঞ্চিত হত তাহলেও আমি যে কখনো ওদের মত এমনতর হতুম না সেত প্রমাণ করবার জো নেই।

দেখ, আমার এক একবার মনে হয় রূপের অভিমানের সুযোগ বিধাতা যদি মেয়েদের দেন তবে অন্য অনেক অভিমানের দুর্গতি থেকে তারা রক্ষা পায়। হীরে জহরতের অভিমান করাও চল্‌ত কিন্তু রাজার ঘরে তার কোনো অর্থই নেই। তাই আমার অভিমান ছিল সতীত্বের। সেখানে আমার স্বামীকেও হার মানতে হবে এটা আমার মনে ছিল। কিন্তু যখনি সংসারের কোনো খিটিমিটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে গেছি তখনি বারবার এমন ছোট হয়ে গেছি যে সে আমাকে মেরেচে। তাই তখন আমি তাঁকেই উল্টে ছোট করতে চেয়েচি। মনে মনে বলেচি, তোমার এসব কথাকে ভালো বলে মান্‌ব না, এ কেবলমাত্র ভালোমানুষী। এ ত নিজেকে দেওয়া নয়, এ অন্যের কাছে ঠকা।

২

আমার স্বামীর বড় ইচ্ছা ছিল আমাকে বাইরে বের করবেন। একদিন আমি তাঁকে বল্লুম, বাইরেতে আমার দরকার কি?

তিনি বল্লেন, তোমাকে বাইরের দরকার থাক্‌তে পারে।

আমি বল্লুম, এতদিন যদি তার চলে গিয়ে থাকে আজো চল্‌বে, সে গলায় দড়ি দিয়ে মরবে না।

মরে ত মরুক না, সে জন্যে আমি ভাবচিনে—আমি আমার জন্যে ভাবচি।

সত্যি নাকি, তোমার আবার ভাবনা কিসের ?

আমার স্বামী হাসিমুখে চুপ করে রইলেন। আমি তাঁর ধরণ জানি, তাই বল্লুম, না, অমন চুপ করে ফাঁকি দিয়ে গেলে চল্‌বে না, এ কথাটা তোমার শেষ করে যেতে হবে।

তিনি বল্লেন, কথা কি মুখের কথাতেই শেষ হয় ? সমস্ত জীবনে কত কথা শেষ হয় না।

না, তুমি হেঁয়ালি রাখ, বল।

আমি চাই, বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও আমি তোমাকে পাই। ঐখানে আমাদের দেনা পাওনা বাকি আছে।

কেন, ঘরের মধ্যে পাওয়ার কম্‌তি হল কোথায় ?

এখানে আমাকে দিয়ে তোমার চোখ কান মুখ সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েছে,—তুমি যে কাকে চাও তাও জান না, কাকে পেয়েচ তাও জাননা।

খুব জানি গো খুব জানি !

মনে করচ জানি, কিন্তু জান কি না তাও জান না।

দেখ তোমার এই কথাগুলো সইতে পারিনে।

সেই জন্যেই ত বল্‌তে চাইনি।

তোমার চুপ করে থাকা আরো সইতে পারিনে।

তাই ত আমার ইচ্ছে, আমি কথাও কইব না চুপও করব

না, তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকরনাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমিও হওনি আমিও হইনি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।

পরিচয় তোমার হয় ত বাকি থাক্‌তে পারে কিন্তু আমার কিছুই বাকি নেই।

বেশ ত, আমারি যদি বাকি থাকে সেটুকু পূরণ করেই দাওনা কেন?

একথা নানা রকম আকারে বারবার উঠেছে। তিনি বল্‌তেন, যে পেটুক মাছের ঝোল ভালোবাসে সে মাছকে কেটেকুটে সাঁৎলে সিদ্ধ করে মসলা দিয়ে নিজের মনের মতটি করে নেয়, কিন্তু যে লোক মাছকেই সত্য ভালোবাসে সে তাকে পিতলের হাঁড়িতে রেঁধে পাথরের বাটিতে ভর্‌তি করতে চায় না—সে তাকে ছাড়া জলের মধ্যেই বশ করতে পারে ত ভালো, না পারে ত ডাঙায় বসে অপেক্ষা করে,—তারপরে যখন ঘরে ফেরে তখন এইটুকু তার সান্ত্বনা থাকে যে, যাকে চাই তাকে পাই নি কিন্তু নিজের সখের বা সুবিধার জন্যে তাকে ছেঁটে ফেলে নষ্ট করি নি। আস্ত পাওয়াটাই সব চেয়ে ভালো, নিতান্তই যদি তা সম্ভব না হয় তবে আস্ত হারানোটাও ভালো।

এ সব কথা আমার একেবারেই ভালো লাগ্‌ত না কিন্তু সেই জন্যেই যে তখন বের হই নি তা নয়। আমার দিদি-শাশুড়ি তখন বেঁচে ছিলেন। তাঁর অমতে আমার স্বামী বিংশ শতাব্দীর প্রায় বিশ আনা দিয়েই ঘর ভরতি করে তুলেছিলেন, তিনিও

সয়েছিলেন; রাজবাড়ির বউ যদি পর্দ্দা ঘুচিয়ে বাইরে বেরত, তা হলেও তিনি সইতেন;—তিনি নিশ্চয় জান্‌তেন এটাও একদিন ঘটবে—কিন্তু আমি ভাবতুম এটা এতই কি জরুরি যে তাঁকে কষ্ট দিতে যাব। বইয়ে পড়েচি আমরা খাঁচার পাখী কিন্তু, অন্যের কথা জানি নে, এই খাঁচার মধ্যে আমার এত ধরেচে যে বিশ্বেও তা ধরে না। অন্তত তখন ত সেই রকমই ভাবতুম।

আমার দিদিশাশুড়ি যে আমাকে এত ভালবাস্‌তেন তার গোড়ার কারণটা এই, যে, তাঁর বিশ্বাস আমি আমার স্বামীর ভালোবাসা টান্‌তে পেরেছিলুম সেটা যেন কেবল আমারি গুণ, কিংবা আমার গ্রহ নক্ষত্রের চক্রান্ত। কেন না, পুরুষমানুষের ধর্ম্মই হচ্চে রসাতলে তলিয়ে যাওয়া। তাঁর অন্য কোনো নাতীকে তাঁর নাতবৌরা সমস্ত রূপযৌবন নিয়েও ঘরের দিকে টান্‌তে পারে নি—তাঁরা পাপের আগুনে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে গেলেন কেউ তাঁদের বাঁচাতে পারলে না। তাঁদের ঘরে পুরুষ মানুষের এই মরণের আগুন আমিই নেবালুম এই ছিল তাঁর ধারণা। সেই জন্যেই তিনি আমাকে যেন বুকে করে রেখেছিলেন—আমার একটু অসুখ বিসুখ হলে তিনি ভয়ে কাঁপতেন। আমার স্বামী সাহেবের দোকান থেকে যে সমস্ত সাজসজ্জা এনে সাজাতেন সে তাঁর পছন্দসই ছিল না কিন্তু তিনি ভাবতেন, "পুরুষ মানুষের এমন কতকগুলো সখ্ থাক্‌বেই যা নিতান্ত বাজে, যাতে কেবলি লোকসান। তাকে ঠেকাতে গেলেও চলবে না অথচ সে যদি সর্ব্বনাশ পর্য্যন্ত না পৌঁছয় তবেই রক্ষে। আমার নিখিলেশ বউকে যদি না সাজাত আর কাউকে সাজাতে যেত।" এইজন্যে ফি বারে যখন আমার

জন্যে কোনো নতুন কাপড় আসত তিনি তাই নিয়ে আমার স্বামীকে ডেকে কত ঠাট্টা কত আমোদ করতেন। হতে হতে শেষকালে তাঁরও পছন্দর রং ফিরেছিল। কলিযুগের কল্যাণে অবশেষে তাঁর এমন দশা হয়েছিল যে নাতবৌ তাঁকে ইংরিজি বই থেকে গল্প না বল্লে তাঁর সন্ধ্যা কাটত না।

দিদিশাশুড়ির মৃত্যুর পর আমার স্বামীর ইচ্ছা হল আমরা কলকাতায় গিয়ে থাকি। কিন্তু কিছুতেই আমার মন উঠ্‌ল না। এ যে আমার শ্বশুরের ঘর, দিদিশাশুড়ি কত দুঃখ কত বিচ্ছেদের ভিতর দিয়ে কত যত্নে এ'কে এতকাল আগ্‌লে এসেচেন, আমি সমস্ত দায় একেবারে ঘুচিয়ে দিয়ে যদি কলকাতায় চলে যাই তবে যে আমাকে অভিশাপ লাগ্‌বে এই কথাই বারবার আমার মনে হতে লাগ্‌ল। দিদিশাশুড়ির শূন্য আসন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।—সেই সাধ্বী আট বছর বয়সে এই ঘরে এসেচেন, আর উনআশি বছরে মারা গেছেন। তাঁর সুখের জীবন ছিল না। ভাগ্য তাঁর বুকে একটার পর একটা কত বানই হেনেচে কিন্তু প্রত্যেক আঘাতেই তাঁর জীবন থেকে অমৃত উছ্‌লে উঠেছে। এই বৃহৎ সংসার সেই চোখের জলে গলানো পুণ্যের ধারায় পবিত্র। এ ছেড়ে আমি কলকাতার জঞ্জালের মধ্যে গিয়ে কি করব?

আমার স্বামী মনে করেছিলেন এই সুযোগে আমার দুই জায়ের উপর এখানকার সংসারের কর্তৃত্ব দিয়ে গেলে তাতে তাঁদের মনেরও সান্ত্বনা হত আর আমাদেরও জীবনটা কলকাতায় একটু ডালপালা মেলবার জায়গা পেত।

আমার ঐখানেই গোল বেধেছিল। ওঁরা যে এতদিন আমাকে

হাড়ে হাড়ে জ্বালিয়েছেন,—আমার স্বামীর ভালো ওঁরা কখনো দেখতে পারেন নি। আজ কি তারি পুরস্কার পাবেন?

আর রাজসংসার ত এইখানেই। আমাদের সমস্ত প্রজা, আমলা, আশ্রিত, অভ্যাগত, আত্মীয় সমস্তই এখানকার এই বাড়িকে চারিদিকে আঁকড়ে। কলকাতায় আমরা কে তা জানি নে, অন্য ক'জন লোকই বা জানে? আমাদের মান সম্মান ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ মূর্ত্তিই এখানে। এ সমস্তই ওঁদের হাতে দিয়ে সীতা যেমন নির্ব্বাসনে গিয়েছিলেন তেমনি করে চলে যাব? আর ওঁরা পিছন থেকে হাসবেন? ওঁরা কি আমার স্বামীর এ দাক্ষিণ্যের মর্য্যাদা বোঝেন, না, তার যোগ্য ওঁরা?

তারপরে যখন কোনো দিন এখানে ফিরে আসতে হবে তখন আমার আসনটি কি আর ফিরে পাব? আমার স্বামী বলতেন, দরকার কি তোমার ঐ আসনের? ও ছাড়াও ত জীবনের আরও অনেক জিনিষ আছে—তার দাম অনেক বেশী।—

আমি মনে মনে বল্লুম, পুরুষ মানুষ এ সব কথা ঠিক বোঝে না। সংসারটা যে কতখানি তা ওদের সম্পূর্ণ জানা নেই—সংসারের বাহির মহলে যে ওদের বাসা। এ জায়গায় মেয়েদের বুদ্ধিমতেই ওদের চলা উচিত।

সব চেয়ে বড় কথা হচ্চে একটা তেজ থাকা চাইত! যাঁরা চিরদিন এমন শত্রুতা করে এসেচেন তাঁদের হাতে সমস্ত দিয়ে-থুয়ে চলে যাওয়া যে পরাভব। আমার স্বামী যদি বা তা মানতে চান আমি ত মানতে দিতে পারব না। আমি মনে মনে জানলুম এ আমার সতীত্বের তেজ।

আমার স্বামী আমাকে জোর করে কেন নিয়ে গেলেন না? আমি জানি কেন। তাঁর জোর আছে বলেই জোর করেন নি। তিনি আমাকে বরাবর বলে এসেচেন, স্ত্রী বলেই যে তুমি আমাকে কেবলি মেনে চল্‌বে তোমার উপর আমার এ দৌরাত্ম্য আমার নিজেরই সইবে না। আমি অপেক্ষা করে থাক্‌ব আমার সঙ্গে যদি তোমার মেলে ত ভালো, যদি না মেলে ত উপায় কি।

কিন্তু তেজ বলে একটা জিনিষ আছে—সেদিন আমার মনে হয়েছিল ঐ জায়গায় আমি যেন আমার—না, এ কথা আর মুখে আনাও চলবে না।

ক্রমশঃ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার গান

মোর গান এরা সব শৈবালের দল,
যেথায় জন্মেছে সেথা আপনারে করেনি অচল।
মূল নাই, ফুল আছে, শুধু পাতা আছে,
আলোর আনন্দ নিয়ে জলের তরঙ্গে এরা নাচে
বাসা নাই নাইক সঞ্চয়;
অজানা অতিথি এরা কবে আসে নাইক নিশ্চয়

যেদিন শ্রাবণ নামে দুর্নিবার মেঘে,
দুই কূল ডোবে স্রোতোবেগে,
আমার শৈবালদল
উদ্দাম চঞ্চল,
বন্যার ধারায়
পথ যে হারায়,
দেশে দেশে
দিকে দিকে যায় ভেসে ভেসে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তুমি-আমি

যেদিন তুমি আপ্‌নি ছিলে একা
আপ্‌নাকে ত হয়নি তোমার দেখা।
সেদিন কোথাও কারো লাগি ছিলনা পথ-চাওয়া,
এপার হ'তে ওপার চেয়ে
বয়নি ধেয়ে
কাঁদন-ভরা বাঁধন-ছেঁড়া হাওয়া।

আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ কুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।
আমায় তুমি মরণমাঝে লুকিয়ে ফেলে
ফিরে ফিরে নূতন করে পেলে।

আমি এলেম, কাঁপ্‌ল তোমার বুক,
আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
আমি এলেম, এল তোমার আগুনভরা আনন্দ,
জীবন মরণ তুফান-তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম, তাই ত তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

আমার চোখে লজ্জা আছে, আমার বুকে ভয়,
আমার মুখে ঘোম্‌টা পড়ে রয়,—
দেখতে তোমায় বাধে বলে' পড়ে চোখের জল।
ওগো আমার প্রভু,
জানি আমি তবু
আমায় দেখবে বলে' তোমার অসীম কৌতূহল,
নইলে ত এই সূর্য্যতারা সকলি নিষ্ফল॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ডায়ারি

[পঁচিশ বছর পূর্ব্বেকার একখানি ডায়ারির কয়েকটি পাতা আমার হাতে পড়িয়াছে। তখনকার দিনের একজন কলেজের ছাত্রের লেখা। সবুজ পত্রের সম্পাদকের দরবারে এই পাতা কয়খানি দাখিল করিলাম। আমার মতে ছাপার অক্ষরে ইহা প্রকাশ করা যাইতে পারে। একটা প্রধান কারণ এই, ছাপিবার জন্য ইহা লেখা হয় নাই।

নবীন জীবনের একটা ব্যাকুলতা ইহার মধ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। সেইটে একটু ঠাহর করিয়া দেখিবার বিষয়। আনন্দের চাঞ্চল্যই যে যৌবনের একমাত্র লক্ষণ তাহা নহে, তাহার সঙ্গে বিষাদের গাঢ়তাও আছে। ভিতরকার শক্তিগুলি যখন একরকম অস্পষ্টভাবে বাহিরের আলোর একটা ডাক শুনিয়াছে অথচ তার অর্থ বোঝে নাই; যখন তারা আপনার ভিতরে প্রাণের তাগিদ পাইয়াছে অথচ আপনার পরিচয় পায় নাই; যখন তারা বীজকে দুইখানা করিয়াছে অথচ মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে পারে নাই, তখন সেই আলো আঁধারের দ্বন্দ্বের অবস্থায় একটা বিষাদের ঘোর ঘনাইয়া ওঠে। এটা কেবলমাত্র অনির্দ্দিষ্টতার বিষাদ।

নবযৌবনের প্রথম আবেগে কিছু একটা করিবার জন্য যখন আমাদের মধ্যে বেদনা জাগে; অথচ যখন কিছু একটা করিবার অভিজ্ঞতাও নাই উপকরণও নাই, কেবলমাত্র করিবার উদ্যম আছে,—সেই সময়ে নূতন সাঁতার শেখার হাত পা ছোঁড়ার মত আমাদের কথা এবং কাজে আতিশয্য প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেই সময়ে আমরা পরের নকল করিতে যাই, আপনাকে অন্য কেহ বলিয়া কল্পনা করি, এবং এতদিনের মুখস্থ করা পুঁথির তালে পা ফেলিতে গিয়া পদে পদে বেতালা হইয়া উঠি।

অন্য দেশের যুবকদের সামনে হাজার রাস্তা খোলা আছে। জীবনের ক্ষেত্র কোথায় তাহা তাহাদিগকে খুঁজিতে হয় না। আর এক মস্ত সুবিধা

এই যে, যাহারা ভাবিয়াছে, বুঝিয়াছে, পাইয়াছে, সৃষ্টি করিয়াছে, তাহারা চারিদিকেই। তাই ভাব, কথা ও কাজের ওজন বুঝিতে দেরি হয় না। অযথা বাড়াবাড়ি করিতে গেলে চারিদিকেই ঠেকিতে হয়। আমাদের দেশে যৌবনের উদ্যম বিধাতা দিয়াছেন, কিন্তু কাজের পন্থা মানুষে তৈরি করে নাই। কি সমাজতন্ত্রে, কি রাজ্যতন্ত্রে, আমাদের চেষ্টার পথ অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। তাহাতে বুদ্ধি এবং শক্তি খাটাইবার জায়গা পাই না। সমাজে হাজার বছরের পুনরাবৃত্তি করা ছাড়া কিছুই করিবার নাই, সমাজের বাহিরে কেবল গোটাকতক চাকরির পথ আমাদের অভ্যস্ত পথ। তাই আমাদের দেশ প্রৌঢ়দেরই পক্ষে সুখের ;—বাঁধা অভ্যাসের আরামের মধ্যে গট্ হইয়া বসিয়া সমস্ত নবীনতার চাঞ্চল্যকে ধিক্কার দিবার পক্ষে এ দেশের হাওয়া অনুকূল। জগতের নিয়মে যৌবনটা এ দেশেও আসে, কিন্তু কোথায় যে তার স্থান তাহা খুঁজিয়া পায় না। বুঝিতে পারে সে ভুল করিয়াছে। তাই যত শীঘ্র পারে বৃদ্ধ হইয়া উঠিয়া ভ্রম সংশোধনের চেষ্টায় থাকে।

এই ডায়ারি পড়িলে বুঝিতে পারিব যুবকের যে শক্তি স্বভাবতঃই বাহিরের দিকে সার্থকতা খোঁজে, তাহা প্রতিহত হইয়া নিজের মধ্যে কেবলই পাক খাইয়া বেড়াইতেছে। নিজেকে নানা দিকে নানা চেষ্টায় যাচাই করিয়া নিজের দর বুঝিবার উপায় নাই বলিয়া যৌবনের উদ্যম আত্মপরিচয়ের অস্পষ্টতার মধ্যে বিকার পাইতে থাকে। আমাদের দেশের যুবকদের এই দুঃখ এবং এই বিপদ। এই ডায়ারির মধ্যে আমাদের দেশের যৌবনের মনস্তত্ত্বের সেই আভাস অকৃত্রিম আকারে পাওয়া যাইবে বলিয়া সম্পাদকের হাতে সমর্পণ করিলাম।]

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১৩ই অগষ্ট, ১৮৯০।

আবার ডায়ারি লিখিব মনে করিয়াছি। দাসীসঙ্কুল অন্তঃপুর-ঘেঁসা ঘরে বসিয়া কিছু লেখা বড় কঠিন, তাই পূর্ব্বে বিশেষ ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কিছু লিখিয়া উঠিতে পারি নাই। এক বৎসর

পূর্ব্বে আমি যেরূপ ছিলাম, তাহা হইতে এখন আমার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মনের অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল। এখন আর আগের মত অকারণ মনের অশান্তি এবং অসুখ ততটা নাই। হৃদয় মন অনেকটা সুস্থ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আগে শান্তির জন্য লালায়িত হইতাম। এখন মনে হয় শান্তি অপেক্ষা সুখ ভাল। যখন জগতের সকলই অনিত্য মনে হয়, হৃদয়ের প্রিয় আকাঙ্ক্ষাসকল মিথ্যা বলিয়া মনে হয়, অতিজগৎকে মরীচিকাস্বরূপ মনে হয়; যখন, জগতে যাহা কিছু আমাদের নিকট সুন্দর, মহান এবং প্রিয় বলিয়া মনে হয়, সে সকলের প্রতিষ্ঠাভূমি খুঁজিয়া পাই না,—তখনই আমরা জগৎজোড়া নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়া পড়ি, এবং মনের অস্থিরতা ও হৃদয়ের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য কত না উপায় অনুসন্ধান করিয়া বেড়াই। দুঃখকে ফাঁকি দেওয়াই তখন আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়ায়, সুখের কথা ভাবিবার অবকাশমাত্রও হয় না। কোনও প্রকারে শান্তি লাভ করিতে পারিলেই বাঁচিয়া যাই। সুখের বিষয় এরূপ মনের ভাব চিরস্থায়ী নহে। অন্ধকারের পর আলোক দেখা দেয়। সংসার সময়ে সময়ে মায়াময় বলিয়া মনে হয়, আবার কখনও বা সত্যস্বরূপ মনে হয়।

১৫ই মে, ১৮৯১।

অনেকের পক্ষে ডায়ারি লেখা অভ্যাসটা অত্যন্ত ক্ষতিজনক। যাহারা নিজের সামান্য মনের ভাবকে বাহিরের জিনিষ অপেক্ষা অধিক আদর, অধিক প্রাধান্য দেয়, যাহাদের মনের

গঠন সঙ্কীর্ণ,—নিজেকে ছাড়িয়া অপরের দিকে যাইতে যাহাদের মন স্বভাবতঃই অনিচ্ছুক, সেরূপ লোকদের পক্ষে ডায়ারি লেখার অর্থ,—সকল প্রকার চিন্তা ও উদার মনের ভাব হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া আপনার ক্ষুদ্রতাকেই প্রধান করিয়া তোলা। এরূপ লোকেদের যাহাতে করিয়া নানা বিষয়ে interest জন্মায়, বহুলোকের প্রতি কিম্বা নূতন নূতন ভাবের প্রতি অনুরাগ হয়, হৃদয় মনের প্রসারতা লাভ হয়, সেইরূপ কার্য্যে নিযুক্ত থাকা আবশ্যক। কিন্তু মনের কথা লিপিবদ্ধ করিবার অভ্যাসটা ঠিক সেরূপ কার্য্য নহে। আমার নিজের বিশ্বাস আমি নিজসম্বন্ধে ছোটখাট বিষয়ের চিন্তাতে সন্তুষ্ট থাকিতে পারি না। যদি বড়-রকম কোন সুখ কিম্বা কোন দুঃখ আমার থাকে, তাহা হইলেও আমি আজ পর্য্যন্ত সে বিষয় কিছু আপনার নিকটও স্পষ্ট করিয়া বলিতে শিখি নাই। মনের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি প্রকাশ করিবার অক্ষমতাই আমার স্বভাবের বিশেষত্ব। চেষ্টা করিলে আমার চিন্তা আমি অপরকে বুঝাইয়া দিতে পারি, কিন্তু হৃদয়ের কথা খুলিয়া বলিবার ভাষা আজ পর্য্যন্তও আমি জানি না। প্রত্যহ খানিকক্ষণ করিয়া কাগজ কলম লইয়া বসিলে আমার প্রচ্ছন্ন হৃদয় যে অনাবৃত হইয়া পড়িবে, সে আশঙ্কা আমার নাই। কালিকলম দিয়া আমার হৃদয়ের একটি অস্পষ্ট, অসম্পূর্ণ অযথার্থ ছবি আঁকিবার আমার ইচ্ছাও নাই, অথচ ইহা অপেক্ষা ভাল কিছু করিবার শক্তিই বা কোথায়? নিজের নিজের মুখের প্রতিকৃতি আঁকা সাধারণের পক্ষে যেরূপ সহজ, হৃদয়ের ছবি আঁকা আমার পক্ষেও তদ্রূপ।

কিন্তু তাই বলিয়া আমি যে আমাকে লইয়া ব্যস্ত নহি, তাহা নহে। হৃদয় ছাড়িয়া দিয়া আমার প্রকৃতির আর সকল অংশের প্রতি আমার মন সর্ব্বদা পড়িয়া থাকে। আমার স্বভাব কিরূপ, আমার ক্ষমতা কিরূপ, কোন কার্য্যের জন্য আমি উপযোগী, আমার চিন্তার কতটুকু শিক্ষালব্ধ এবং কতটুকুই বা স্বাভাবিক, এই সকল খাঁটি সংবাদ জানিবার জন্য আমার নিয়তই বিশেষ চেষ্টা আছে। সুতরাং আমার পক্ষেও ডায়ারি লেখা নিতান্ত নিরাপদ নহে। অহং চর্চ্চা করিয়া ক্রমে হয়ত ঐ বিষয়ে আমি এত বেশি পারদর্শী হইব, যে অপর বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিবার ইচ্ছা দিনে দিনে খর্ব্ব হইয়া আসিবে, অনভ্যাসবশতঃ নূতন বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তি সহজে পরিচালিত হইতে চাহিবে না। যদি তাহাও না হয় ত অন্ততঃ এই কুফল দাঁড়াইবে যে, কি করিতে পারি তাহা নির্ণয় করিতে সময় চলিয়া যাইবে, কিছু করা হইবে না। আমার মত লোকে সর্ব্বদা এই সত্যটি ভুলিয়া যায়, যে কেবলমাত্র অন্তর্দৃষ্টিতে মানবস্বভাব জানা যায় না। কর্ম্মের ভিতর ফেলিয়া না দিলে স্বভাবের সকল দিক দেখা যায় না। অনেকগুলি মানবশক্তি কর্ম্মেতেই কেবল প্রকাশ পায়, আবার মনের অনেকগুলি ভাব ব্যবহারিক আবশ্যকবশতঃই জাগিয়া উঠে, হৃদয়ের অনেকগুলি ভাব এই উপায়েই সম্যক্ স্ফূর্ত্তি লাভ করে। কর্ম্মক্ষেত্রে যাচাই না করিয়া লইলে, কিরকম করিয়া মনুষ্যত্বের প্রকৃত মূল্য অবগত হওয়া যাইতে পারে। তাহা ছাড়া, জীবনের উদ্দেশ্য কি? নিজেকে ভাল করিয়া জানা, না নিজেকে শ্রেষ্ঠ করা? যতটুকুমাত্র অহং জ্ঞান নিজেকে শ্রেষ্ঠ করিবার পক্ষে

উপযোগী, ততটুকু মাত্রই লাভ করিবার চেষ্টা স্বার্থক, তাহার অতিরিক্ত জানা কেবলমাত্র বিড়ম্বনা। কিন্তু কোনও বিষয় আমি এতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইব, ইহার পর আর নয়,—এ কথা বলিলে চলে না, কারণ মনের গতি এবং শক্তি সর্ব্বদাই স্বায়ত্তাধীন নহে। এই সকল কারণে, আমি কেবল যে-সকল বিষয় সর্ব্ব-সাধারণ, যাহাতে মানবমাত্রেরই সমান interest এবং অধিকার আছে, যাহা অনেকেরই পক্ষে আবশ্যক এবং একহিসাবে সকলেরই অতি নিকট, অথচ যাহা কোনও একজনের নিজসম্পত্তি নহে,—সেই সকল বিষয়ে যদি কিছু বলিবার থাকে তাহাই এই ডায়ারিবদ্ধ করিব। কিন্তু এই সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে একটি কথা মনে হইতেছে। কাহারও কাহারও স্বভাব অপেক্ষা শিক্ষা ভাল, কাহারও বা ঠিক তাহার বিপরীত। শেষোক্ত ব্যক্তিরা যদি নিজের কথা বলে, তাহা হইলে তাহাতে অনেক নূতনত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব দেখা যায়। প্রথমোক্ত লোকেরা শিক্ষালব্ধ বিষয়ের আলোচনা করতেই বুদ্ধির পরিচয় দেয়। নিজের হৃদয়ের কথা না বলিলে, নিজের কিছু বিশেষত্ব আছে কি না জানা যায় না। অতএব এক সময়ে না এক সময়ে নিজের ভিতর কি আছে জানিতে চেষ্টা করা সকলেরই উচিৎ। নিজের মনকে নিজের কাছ হইতে লুকাইয়া রাখা সকল সময়ে সুবিবেচনার কার্য্য নহে।

১৮ই মে, ১৮৯১।
রাত্রি ১০ ঘটিকা

খানিকক্ষণ হ'ল বেশ বৃষ্টি হয়ে গেছে,—বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে, তবু বিছানায় শুয়ে ঘুম হল না, তাই সময় কাটাবার জন্য শয্যা

ছেড়ে টেবিলে এসে লিখ্‌তে বসেছি। সম্মুখের জানালা খোলা রয়েছে, বাহিরে আকাশ এখনও মেঘে আচ্ছন্ন রয়েছে। মধ্যে মধ্যে মেঘের অন্তরাল দিয়ে এক একবার চাঁদের বিমর্ষ মুখচ্ছবি দেখা যাচ্ছে, সবসুদ্ধ জড়িয়ে রাত্তিরটি মন্দ দেখ্‌তে হয়নি। আমি ভাবছি যে আমি দিন দিন অকর্ম্মণ্য হয়ে পড়ছি কেন? আমার সকল বিষয়ে নিশ্চেষ্ট ঔদাসীন্যের মূল কোথায়? আমার নিজের মনোমত কার্য্য করবার অক্ষমতা, স্বীয় শক্তির উপর অবিশ্বাস, কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্মের মহৎ ফলের উপর অবিশ্বাস হতে উৎপন্ন? আমি জানিনে যে আমি কোন্ কার্য্যের জন্য সম্যক্ উপযোগী, তাই একাগ্রচিত্তে সম্পূর্ণরূপে কোনও কার্য্যে আত্মসমর্পণ করতে পারিনে। এতদিন আমি নিজেকে এই পৃথিবীর রঙ্গভূমিতে কেবলমাত্র দর্শক হিসেবে দেখেছি। মনে করতুম কোন কার্য্যে নিজে লিপ্ত হওয়া অপেক্ষা নির্লিপ্তভাবে, কেবল সমালোচকের চক্ষে, মনুষ্যের নানাবিষয়ে শতসহস্র প্রকার চেষ্টা এবং অবিরত পরিশ্রম দর্শন করাই অধিক বুদ্ধিমানের কাজ। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অন্ধভাবে উদ্দেশ্যহীন খাটুনি, সামান্য ফললাভের জন্য অসামান্য পরিশ্রম, মহৎ ফললাভের নিষ্ফল প্রয়াস, এই সকল সত্য আমার স্বাভাবিক মনের গতিকে আরও অধিক বলবান করেছে। কিন্তু এখন আর এই আলস্যপ্রসূত শান্তি আমার কাছে যথেষ্ট মনে হয় না। আমার আভ্যন্তরিক শক্তির রুদ্ধ প্রবাহ মুক্তিলাভের জন্য উতলা হয়ে উঠছে। কেবলমাত্র প্রকৃতির ও মানবের অসংখ্য শক্তির বিবিধ বিচিত্র বিকাশ তফাৎ হতে দেখায় নহে, নিজ প্রকৃতির শক্তিসকলের উপযুক্ত বিকাশেই সুখের অনেকাংশ নির্ভর করে।

এই পৃথিবী যদি সম্পূর্ণরূপে সুন্দর ও সুখময় হত, যদি এখানে কিছু পরিবর্ত্তন করবার আবশ্যক না থাক্‌ত, যদি এখানে কোনরূপ উন্নতি কিম্বা অবনতির অবসর না থাকত, অর্থাৎ যদি এ পৃথিবী মানবকল্পনার আদর্শ জগৎ হত, কিম্বা যদি এই অসম্পূর্ণ, সুখদুঃখ সৌন্দর্য্যকদর্য্যতাময় সংসারের উপর মানবের ইচ্ছানুরূপ কতকটা অবস্থা-পরিবর্ত্তনের ক্ষমতা না থাকত,—তাহলে আমাদের চিরদর্শক হওয়া শোভা পেত। কিন্তু আমরা দেখ্‌তে পাই যে, সকলেই পৃথিবীর অবস্থা কতকপরিমাণে ভাল করবার চেষ্টা করছেন, দু চারজন বিশেষরূপে কৃতকার্য্য হয়েছেন, তাঁহারা সকলের নিকটই পরিচিত,—বাদবাকি সকলেই নিজ নিজ ক্ষমতা এবং পরিশ্রমের অনুরূপ ফল সাধারণের অলক্ষিতে পৃথিবীতে রেখে গেছেন। কর্ম্মেতেই জীবনের উদ্দেশ্য লাভ হয়, এবং কর্ম্মে ও কর্ম্মহীন চিন্তায় জীবনের সুখ লাভ হয়।

প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর আগে আমি মানব-জীবনটাকে সঙ্গীতের মত মনে করতুম। সঙ্গীতে যেমন শব্দসকলের মধ্যে শুধু সামঞ্জস্য ও মাধুর্য্য বিদ্যমান, কোন প্রকার বিরোধ কিম্বা বাধা যেমন তাহাতে অবর্ত্তমান, সেইরূপ আমাদের সকল কার্য্য সকল সম্বন্ধে কেবল মিল ও সৌন্দর্য্য, কেবল শান্তি ও সুখ আছে, এইরূপ মনে হত। কোন বাধা অতিক্রম করা, কোন কষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া আমাদের পক্ষে যে একান্ত আবশ্যক, এ কথা একবারও মনে হত না। একরকম নির্ব্বিবাদ শান্তির ব্যাঘাতজনক সকলপ্রকার পদার্থ থেকে, সকল প্রকার কর্ত্তব্য থেকে মনকে বিচ্ছিন্ন রাখতে ইচ্ছে করত। মনে হত মানুষ

নিজের অভাব নিজে রচনা করে, সেই অভাব দূর করবার জন্য শান্তি ও সৌন্দর্য্য বিসর্জ্জন দিয়ে, কর্ম্মক্ষেত্রের গোলমালের ভিতর, আরামময় বিশ্রামের বহির্দ্দেশে গিয়ে, অসীম চেষ্টা, নিয়ত উদ্যমের দ্বারা, অপরিচিত সুখের অতৃপ্ত পিপাসা নিবারণের বৃথা চেষ্টা করে! মনে হত বুঝিবার ভুল হতেই মানুষের এই স্বরচিত কষ্টের সৃষ্টি। তখন পার্থিব জীবনকে কেবলমাত্র beautiful বলেই মনে করতুম। যাঁহারা নিজের জীবনকে কতক পরিমাণে সুন্দর করে তুলতে পেরেছেন, তাঁদের জীবনই সার্থক বলে মনে হত। তখন Sublimity জিনিষটে ভালরকম বুঝতে পারতুম না, ইতিহাসের কিম্বা কাব্যের sublime চরিত্রের প্রতি তেমন ভালবাসাও ছিল না। কারণ পৃথিবীর কদর্য্যতা, পৃথিবীর দুঃখ, পৃথিবীর পাপ দূর করবার অভিপ্রায়ে বৃহৎ চেষ্টা এবং বিপুল শক্তির পরিচয় দানেই Sublimity প্রকাশ পায়। ক্ষুদ্রতার মধ্যে সৌন্দর্য্য থাকতে পারে, কিন্তু মহত্ত্বই Sublimityর লক্ষণ। পৃথিবী সুন্দর নয় বলিয়াই তাহাকে সুন্দর করবার জন্য Sublimityর আবশ্যক। Sublime ব্যক্তিদিগকে চিরকাল বড় বড় বাধা অতিক্রম করতে, জগৎজোড়া দুঃখ দূর করতে, মনুষ্য জীবনের উন্নতির পক্ষে ক্ষতিজনক বিষয় সকল দূর করতে জীবন অতিবাহিত করতে হয়, সুতরাং চিরন্তন বিরোধের মধ্যেই Sublimity ফুটে উঠে। শান্তির সুখ sublime ব্যক্তিরা জানে না। এখন বুঝতে পারি সৌন্দর্য্যলাভই জীবনের উদ্দেশ্য, কিন্তু সেই সৌন্দর্য্যলাভের জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ে সামঞ্জস্য, পৃথিবীর পরস্পর-বিপরীত শক্তিসকলের মিল না করাইলে সম্ভবে না। সেই

মনে হয় যেন এ সকলের সঙ্গে পূর্ব্বে সাক্ষাৎ-পরিচয় ছিল, কিন্তু সময়ে এখন স্মৃতিটুকুমাত্রই অবশিষ্ট আছে, শত চেষ্টাতেও ঠিক জিনিষটির ধারণা হয় না। পূর্ব্বোক্তকারণে আমাদের দেশীয় ইংরাজিশিক্ষিত বাঙ্গালীদের সৌন্দর্য্যজ্ঞান একটু নূতন ভাব ধারণ করেছে। সুন্দর বস্তুর আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের অধিকাংশ স্থলে নির্দ্দিষ্ট এবং বিশেষত্বযুক্ত জ্ঞান নেই। ইংরাজী জ্যোৎস্না, ইংরাজী আকাশ, দেশী জ্যোৎস্না, দেশী আকাশের মত নয়, সুতরাং বিলাতী সাহিত্যচর্চ্চা দ্বারা আমাদের জ্যোৎস্না ও আকাশ ইত্যাদির সৌন্দর্য্য উপভোগের ক্ষমতা কিছু অধিক সাহায্য লাভ করে না। সাহিত্যে বর্ণিত প্রকৃতি আমাদের নিকট অশরীরী ideal মাত্র, সুতরাং আমাদের চতুঃপার্শ্বের realityর মধ্যে আমরা সে সৌন্দর্য্য খুঁজে পাইনে। ফলে এই দাঁড়ায়, আমাদের বাহ্যদৃষ্টি দিন দিন হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, মস্তিষ্কে সঞ্চিত প্রকৃতির ছবির প্রতি আমাদের অনুরাগ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ভারতবর্ষ অপেক্ষা ইউরোপ আমাদের কাছে বাস্তবিক বেশি যথার্থ হয়ে ওঠে। কিন্তু কেবল ভাষার দ্বারা কোন বস্তুরই যথার্থ জ্ঞান অন্যকে দেওয়া যায় না। ভাষায় রর্ণিত বস্তু ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখ্‌লে তবে সে বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান জন্মে। আমাদের ইউরোপ সম্বন্ধে জ্ঞানে শেষোক্ত উপকরণের অভাববশতঃ, আমরা জেরেনিয়ম, ভায়লেট, হেলিওট্রোপের গন্ধকে গন্ধ বলিয়াই জানি, একের সহিত অন্যের পার্থক্য কি তা জানিনে। এইরূপে আমাদের কাছে ইউরোপীয় প্রকৃতি কেবলমাত্র কতকগুলি অনির্দ্দিষ্ট বর্ণ, গন্ধ, এবং শব্দের সমষ্টিমাত্র,— নানা বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন গন্ধের, বিভিন্ন শব্দের বস্তুসকলের

সমষ্টি নয়। সুতরাং আমাদের কৃত বাহ্যপ্রকৃতির বর্ণনায় অস্পষ্টতা ও অনির্দ্দিষ্টতার ভাব আসিবারই অধিক সম্ভাবনা। তবে আমাদের মধ্যে যাঁহারা বাল্যকালে, অর্থাৎ ইংরাজী সাহিত্যে অধিকার লাভ করিবার পূর্ব্বে যখন সকল ইন্দ্রিয়ই আপন আপন জ্ঞাতব্য বিষয়ের সম্পূর্ণরূপে উপভোগের পক্ষে উপযোগী ছিল সেই সময়ে, স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যজ্ঞানদ্বারা বাহ্য প্রকৃতির বৈচিত্র্য হৃদয়ে প্রবল ভাবে অনুভব করেছেন, তাঁরা যদি বাঙ্গলা ও সংস্কৃত সাহিত্য মনোযোগ সহকারে পাঠ করে থাকেন, তাহলে সেইরূপ লোকেরা দেশীয় প্রকৃতির যথার্থ বর্ণনায় পারগ হবেন। এইরূপ দেশীয় দৃশ্যের বর্ণনার পক্ষে উপযোগী ব্যক্তিরা যদি ইউরোপীয় সাহিত্যের সম্যক চর্চ্চা করে থাকেন, তাহলে ideal ইউরোপের ছায়া তাঁদের বর্ণনায় লিপ্ত হয়ে থাকবে, তাতে করে তাঁদের বর্ণনা সৌন্দর্য্য লাভ ছাড়া লোকসানগ্রস্ত হবে না।

সম্বন্ধ

আমার কোন একটি পূজনীয় আত্মীয় বলিতেন যে, মানুষ বিবাহ-পূর্ব্বে দ্বিপদ, বিবাহান্তে চতুষ্পদ, এবং সন্তানাদি হইলে ষট্‌পদ হইতে ক্রমশঃ অষ্টপদ হইয়া অবশেষে মাকড়শার জালে জড়াইয়া পড়ে।

এক এক সময় আমার মনে হয় এই মাকড়শার সঙ্গে মানুষের অনেক মিল আছে। আমরা সকলে তেমনি "আপন রচিত জালে আপনি জড়িত," তেমনি সংসারবৃক্ষে সুখদুঃখের ছায়ালোকে দোদুল্যমান, তেমনি অদ্ভুত অধ্যবসায় ও নিপুণতার সহিত এই ক্ষণভঙ্গুর জীবনজাল বুনিতে ব্যস্ত। সাদৃশ্য-তালিকা এইখানেই সমাপ্ত করিলাম, এবং আমরা অন্যান্য মানুষ-মাছিকে ঠিক তেমনি করিয়া নিজের জালের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া শুষিয়া খাইতে সর্ব্বদা উৎসুক কিনা, সে কথা উহ্য রাখিলাম! অন্ততঃ সকলের সে বদ্‌-অভ্যাসটি নাই, ইহাই মনুষ্যজাতির সৌভাগ্য এবং শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ।

মাকড়শা কি কারণে জাল বিস্তার করে, তাহা পোকাতত্ত্ব-বিৎরাই বলিতে পারেন। কিন্তু আমার কল্পিত মানুষ-মাকড় অদৃশ্য তন্তুদ্বারা এইরূপে অপরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে। সে যেন নিজে একটি কেন্দ্র, এবং নানা লোকের সঙ্গে নানা সূত্রে তাহার যে সম্বন্ধ, তাহাই তাহার জীবনজাল। জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে আমরা জন্মাবধি এই জাল বুনিতেছি। শিশু ভূমিষ্ঠ না হইতেই তাহার কত সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। মৌমাছির

চাক অথবা মাকড়শার জাল যেরূপ রেখাগণিতের অখণ্ডনীয় নিয়মানুসারে গঠিত, মানুষের সমগ্র জীবনজাল তত সুনির্দ্দিষ্ট না হউক, অন্ততঃ তাহার গোড়া পূর্ব্ব হইতেই বাঁধা থাকে। যিনি-অদৃষ্টবাদী তিনি বলেন আমরণ সম্পূর্ণ নক্সাই জন্মপূর্ব্বে প্রস্তুত থাকে, আমাদের অঙ্গুলি চালনার ক্ষমতা আছে মাত্র। আবার যিনি পুরুষকারে বিশ্বাস করেন, তিনি বলেন ভালমন্দ বুনানি আমাদের হাতে ;—উপকরণ পাইয়াছি বটে, কিন্তু আমরা যন্ত্রী, যন্ত্র নহি। দৈবশক্তি যদি প্রবল হয়, তাহলে মানুষের জীবন য়ুরোপীয় লিখিত-সঙ্গীতের ন্যায় আগাগোড়া বিধিবদ্ধ, এবং জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট পথে চলিতে বাধ্য,—মানুষ উপলক্ষ বই নয়। আর আত্মশক্তিই যদি প্রবল হয়, তাহলে প্রতি জীবনের রাগিণী ও ঠাট আদ্যাশক্তির হাতে বাঁধা হইলেও তাহা আমাদের দেশের সঙ্গীতের ন্যায় বহু বৈচিত্র্যের সম্ভাবনাপূর্ণ, গায়কের ক্ষমতা ও ইচ্ছানুসারে বিস্তারিত, এবং পুনঃপুনঃ পুনরাবদ্ধ।

সে যাহা হউক, আমার মাকড়শা অত তত্ত্বজ্ঞানের ধার ধারে না। তত্ত্বকথায় তাহার চতুর্দ্দিকের বাতাস অনুরণিত বটে, কিন্তু তাহার এক কান সে দিকে থাকিলেও, জালবোনা স্থগিত রাখিয়া সে-সব কথার মীমাংসা করিতে বসা তাহার পক্ষে অসম্ভব। আমরা আজ আছি কাল নাই সত্য, কিন্তু ইতিমধ্যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা চাই, এবং আশপাশের সঙ্গে দেনাপাওনার সম্বন্ধ স্থাপন করাই তাহার একমাত্র উপায়। পরের দ্রব্য না বলিয়া লওয়াকে সাধারণতঃ বলে চুরি। কিন্তু যাহা কিছু অপরকে দিতে পারিতাম, অথচ দিই নাই,—সে-প্রকার চুরির জন্য স্বতন্ত্র ধারা ও কারা আবশ্যক নহে কি ?

শৈশবকালে আমাদের দেনা অপেক্ষা পাওনার ভাগই বেশি। তখন আমরা গ্রহণ করিতেই ব্যস্ত, দান করিবার ক্ষমতা তখনো জন্মায় নাই। পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন, আলো বাতাস, খাদ্য পানীয় সবই আমাদের শরীর মন গড়িয়া তুলিবে, তবে ত আমরা কিঞ্চিদপি প্রতিদান দিতে সমর্থ হইব। আগে আহরণ, পরে বিতরণ; আগে সংকোচন, পরে প্রসারণ। জ্ঞানোদ্গমের সঙ্গে সঙ্গেই চারিদিক হইতে "দাও" "দাও" রব উত্থিত হয়, এবং চিরজীবন সেই প্রার্থনা অনবচ্ছিন্ন পূর্ণ করিতেই কাটিয়া যায়। পিতামাতা বলেন ভক্তি দাও, শিক্ষক বলেন মন দাও, প্রণয়ী বলে—প্রেম দাও, বন্ধু বলে প্রীতি দাও, সমাজ বলে সৌজন্য দাও, দেশ বলে কাজ দাও, সুখী বলে হাসি দাও, দীনদুঃখী বলে করুণা দাও, সন্তান বলে স্নেহ দাও,—পাওনাদার বলে টাকা দাও! অবশেষে মৃত্যু বলে প্রাণ দাও,—না দিলেও প্রাণ কাড়িয়া লইয়া যায়! আর বুঝি বা ভগবান বলেন সব দাও।

মাকড়শা বেচারি কি করে, গরু যেমন ঘানিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তেল যোগায়, সেও তেমনি অহরহ স্বীয় জীবনচক্রে ঘুরিতে ঘুরিতে মর্ম্মজাল ও কর্ম্মজাল বুনিতে থাকে। মর্ম্মইত কর্ম্মের প্ররোচক ও নিয়ন্তা, এবং কর্ম্মস্রোত ও চিন্তাস্রোত বরাবর পাশাপাশি বহিয়া পরস্পরকে শোধন করিতেছে বলিয়াই মনুষ্য-জীবনে ক্রমোন্নতির আশা করা যায়। কেহ কেহ আজকাল সত্যই বিশ্বাস করেন যে, কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রশ্মিদ্বারা মানুষ পরস্পরের উপর মানসিক প্রভাব বিস্তার করে, এবং কর্ম্মযোগ অপেক্ষা নিগূঢ় যোগে একের চিন্তা অপরকে স্পর্শ করে। সে

যোগ চর্ম্মচক্ষে না হউক, দিব্যচক্ষে দ্রষ্টব্য। অবশ্য এস্থলে আমরা বহির্মুখী রশ্মির কথাই বলিতেছি, কিন্তু বলা বাহুল্য যে বাহির হইতে অন্তর্মুখী রশ্মিজালও ক্রমাগত আসিতেছে। এই আদানপ্রদান টানাপোড়েনেইত জীবন-নক্সা এত বিচিত্র, এবং কপাল ও হাতযশ অনুসারে এত সুন্দর হয়। নিজের সহিত নিজের পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া, ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ হইতে দূর দূরতর দূরতম সম্বন্ধ পর্য্যন্ত গড়াইয়া ছড়াইয়া গাঢ়বর্ণ কেমন অলক্ষিতে ফিকা রংয়ে মিলাইয়া আসে, তাহা সহজেই পরিকল্পনা করা যায়। আত্মবৎ সম্বন্ধই প্রত্যেকের নিকট বেশি প্রকট,—তাহা নিশ্চয়ই হৃদয়ের রক্তরাগে লাল। তারপরে যে যতদূর পহুঁছিতে পারে। গোড়া যেমন অহংয়ে স্পষ্ট প্রোথিত, মাঝখান যেমন অসংখ্য চিত্রবিচিত্র নানামুখী সূত্রে গ্রথিত, শেষটা তেমনি কোন্ সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহা অপেক্ষাকৃত অনির্দ্দিষ্ট। প্রকৃতিভেদে এই সীমা কমবেশি স্পষ্ট। এমন সীমাবদ্ধ স্বার্থপর জীব বোধহয় কেহ নাই, যাহার মন কোন-না-কোন সময়ে নিজের জীবন-কোটর হইতে অজানা অসীমে দূত না পঠায়। আবার এমন ক্ষণজন্মা পুরুষও আছেন, যাঁহারা অহমিকার লাল হইতে সুরু করিয়া, আত্মীয়তা সামাজিকতার গোলাপী আভার মধ্য দিয়া, বিশ্বপ্রেমের শেষ শ্বেত আলোক পর্য্যন্ত অটুটভাবে জীবনজাল বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছেন,—যেখানে সাধারণ মানুষের মন দূরবীণ না কষিয়া কিছু দেখিতেই পায় না, হৃদয়ঙ্গম করা ত দূরের কথা।

কিন্তু তন্তুজাল ও রশ্মিজালে মিলিয়া মিশিয়া উপমা ক্রমে

ঘোরাল হইয়া পড়িতেছে, অথচ পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার মাকড়শা সরল প্রকৃতির সহজ লোক,—অসাধারণ বড়লোক বা ভাবুক নহে। শেষ পরিণাম ভাবিতে সে সময় নষ্ট করে না, কারণ তাহার অবসর কম ও কাজ অনেক। তাহার সাদা চোখের দৃষ্টি যতদূর যায়, সেই গণ্ডির মধ্যে আপনাহতে যাহারা আসিয়া পড়ে, তাহাদের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইতে ও রক্ষা করিতে পারিলেই সে যথালাভ মনে করে। সম্বন্ধের সংখ্যা বা দূরত্বের উপর মহত্ব নির্ভর করে হয়ত, কিন্তু সামঞ্জস্য রক্ষার উপর সৌন্দর্য্য নির্ভর করে, সে কথা অন্ততঃ স্ত্রীমাকড়শার মনে রাখা উচিত। আমার সময়ে সময়ে মনে হয় আমরা পরের দেখাদেখি এই সম্বন্ধসূত্র অনর্থক বেশি লম্বা ও জটিল করিতে আরম্ভ করিয়াছি। ইহাকে একপ্রকার দীর্ঘসূত্রতা বলা যাইতে পারে! শিরা উপশিরা যত দূরে ছড়াইবে, ততই হৃৎকেন্দ্র হইতে রক্ত পহুঁছাইয়া দেওয়া শক্ত হইবে,—এবং যেখানে মন দিতে পারিব না, সেখানে শুধু শুষ্ক কাজ দিয়া কি ফল? এই হৃৎপদার্থের অভাবেই পৃথিবীর বড় বড় ধর্ম্ম গোঁড়ামীতে, এবং বড় বড় কথা বাঁধিগতে ক্রমশঃ পরিণত হয়; এবং বারম্বার পুনরাবৃত্তিতে জীর্ণ সংস্কারকে এই হৃদামৃতে সরস ও সতেজ করিবার নিমিত্তই যুগে যুগে মহাত্মার সম্ভাবনা আবশ্যক হয়। মৌচাকে যতক্ষণ মধু থাকে ততক্ষণই তাহার সার্থকতা,—নহিলে সে রিক্ত পরিত্যক্ত নিরর্থক কোষমাত্র। সেকালে মেয়েদের কাছে অনাত্মীয় যাঁহারা আসিতেন, তাঁহারাও আত্মীয়ের পাতানো-সম্পর্ক ও স্নেহ লাভ করিতেন। এখন কি আমরা সেই ব্যক্তিগত সম্বন্ধের বদলে সভাসমিতির নীরস শাখা প্রশাখা

বিস্তার করা শ্রেয় মনে করিব? চিঠির সঙ্গে টেলিগ্রামের যে তফাৎ, ব্যক্তিগত ও সমিতিগত সম্বন্ধে সেই তফাৎ। একটি সরস, সজীব ও স্বপ্রকাশ,—আর একটি শুষ্ক, কঙ্কালসার ও কাজের নির্ব্বাহক কিন্তু ভাবের হন্তারক। আজকাল হয়ত আমরা পাড়াপ্রতিবেশীর বিপদে আপদে খোঁজ লই না, অথচ আফ্রিকার দুঃখমোচনে বদ্ধপরিকর হওয়া উন্নতির লক্ষণ মনে করি। মেয়েদের সঙ্কীর্ণ পারিবারিক গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ থাকিতে হইবে তাহা বলি না, কিন্তু মেয়ে পুরুষ উভয়েরই উচিত নিকট হইতে দূরের সব পথটুকু মাড়াইয়া চলা, ডিঙাইয়া যাওয়া নয়। পুত্রকে ত্যাজ্য করিয়া পৌত্রের জন্য প্রাণ দেওয়ার পক্ষপাতী আমি নই। কেবলমাত্র একটি ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া থাকিলে বাতাস দূষিত হয় বলিয়া স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য বেলুনে উড়িবার দরকার দেখি না, জানালা খোলা রাখিলে এবং মধ্যে মধ্যে বায়ু পরিবর্ত্তন করিলেই যথেষ্ট। তেমনি অতিসঙ্কীর্ণতা জীবনমনের স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতিকূল বলিয়া, অতিপ্রসারতাও কিছু অনুকূল নহে। এই ঘর ও পরের সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা আজকালকার দিনের একটি প্রধান সমস্যা। কেননা পূর্ব্বাপেক্ষা পরের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা অনেক সহজসাধ্য হইয়াছে, অথচ সেই কারণেই মন বিক্ষিপ্ত এবং জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা অনেক বাড়িয়াছে বলিয়া সাবধান থাকা আবশ্যক। প্রত্যেকের হৃদয়বৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্ম্মক্ষমতার একটি স্বাভাবিক সীমানা আছে, সেটি লঙ্ঘন করিবার চেষ্টা করিলে অনর্থক বলক্ষয় হয়। অবশ্য সেই সীমানা অগ্রসর করিতে সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকা উচিত, নহিলে জড়তার অন্ধকূপে

পড়িবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু হৃদয় যাহাতে পিছাইয়া না পড়ে, হাত বাড়াইবার সময় সেদিকে যেন লক্ষ্য থাকে। জীবনযাত্রাও একটি শোভাযাত্রা হইতে পারে, যদি আমরা তাহার শিল্পচাতুর্য্য আয়ত্ত করিতে পারি— এবং এই শিল্পকার্য্যের মত মহৎ ও সুন্দর শিল্প আর নাই। বাঙ্গালী পুরুষে যদি সেই মধুচক্র রচনা করিতে পারেন, "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি"; এবং বাঙ্গালী স্ত্রীলোকে যদি "পৌরজন"কে সেই আনন্দ বিতরণ করিতে পারেন, তাহা হইলে বোধহয় তাঁহাদের জীবন যথেষ্ট সার্থক হয়। পুরুষরা অবশ্য সংসারের অনেক নীরস কাজ করিতে বাধ্য,—কাহারো না কাহারো ত করিতেই হইবে। কিন্তু তাঁহাদেরও জীবনের সুযাত্রার পক্ষে অবসর আবশ্যক,—এবং মেয়েদের পক্ষে ত নিতান্তই আবশ্যক,—কারণ অবকাশেই সেই সকল ফুল ফোটে, যাহাতে সংসার মরুময় না হইয়া কখনো কখনো "নন্দনগন্ধমোদিত" হয়; অবকাশই সেই রন্ধ্র যাহার মধ্য দিয়া "সীমার মাঝে অসীম তুমি হে বাজাও আপন সুর।"

মানুষের সহিত মানুষের যেমন দেনাপাওনার সম্বন্ধ, মনুষ্যেতর প্রকৃতির সহিতও কি তাহাই? প্রকৃতির নিকট হইতে আমরা যেন শুধু পাই মনে হয়,—প্রতিদানে কিছু দিই না। শিশির-সিক্ত স্নিগ্ধ উষায়, রৌদ্ররঞ্জিত উদাস দিবসে, সূর্য্যাস্তমণ্ডিত স্বর্ণ সন্ধ্যায়, জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজত নিশীথে, যখন আমরা প্রকৃতির সৌন্দর্য্য পান করি, তখন কি কিছু দান করি? না মনের তন্ত্রীরাজির উপর সৌন্দর্য্যলক্ষ্মীর অবাধ হস্তসঞ্চালন নীরবে অনুভব করি মাত্র? যিনি নীরব থাকিতে না পারেন, তিনি

প্রকাশের প্রকার অনুসারে কবি বা শিল্পী হন, কিন্তু তাহাতে প্রকৃতিকে কিছু প্রতিদান করা হয় কি না সন্দেহ,—সময়ে সময়ে প্রতিশোধ লওয়া হয় বটে! "বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ" রীতিমত বিচার করিতে না বসিয়াও বলা যাইতে পারে যে, বাহিরের সৌন্দর্য্যের সহিত আমাদের হৃদয়ের যে সম্বন্ধ তাহাই শিল্পকলা, তাহার কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলার সহিত আমাদের বুদ্ধির যে সম্বন্ধ তাহাই জ্ঞানবিজ্ঞানদর্শন, এবং তাহার দ্বারা উদ্দেশ্যসাধনের সহিত আমাদের দ্বারা নির্দ্ধারিত উপায়ের যে সম্বন্ধ তাহাই আজকালকার বহুমান্য efficiency বা কার্য্যকুশলতা।

মনুষ্যনির্ম্মিত বস্তুতেও গঠনের সহিত উদ্দেশ্যের একটি সম্বন্ধ আছে, সেটি যথাযথ রক্ষা করিতে না পারিলেই সৌন্দর্য্যচ্যুতি ঘটে। অবশ্য প্রকৃতি নিজ উদ্দেশ্যসাধনের কৌশলে যত সিদ্ধহস্ত, আমরা তাহার তুলনায় আনাড়ি মাত্র, তবু যে শিল্পী যত গুণী তিনি তত লক্ষ্যভেদে পটু, এবং সত্যের সহিত সুন্দরের মিলন সাধনে সমর্থ। হিসাব করিয়া দেখিতে গেলে জগতের সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারে মানুষ কিছু কম দ্রব্যসম্ভার সরবরাহ করে নাই—যাহা যুগে যুগে প্রকৃতির শ্রীবৃদ্ধি এবং মানবের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছে ও করিতেছে। স্থাপত্যবিদ্যা ইহার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এক একটি পুরাতন সহরের ইতিহাসে কি মাহাত্ম্য কম? আবার এক একটি বিখ্যাত ইমারতের মর্য্যাদার ত সীমা পরিসীমা নাই। তাজমহল না থাকিলে আজ আগ্রাকে কে পুছিত? মানুষ যথার্থই প্রকৃতিকে বলিতে পারে "আমি আমার মনের মাধুরী মিশায়ে তোমারে করেছি রচনা—তুমি আমারই।" যমুনার গৌরবের কতখানি

প্রকৃতিরচিত এবং কতখানি কবিপ্রক্ষিপ্ত, তাহা অতিবড় রাসায়নিকও আজ নির্ণয় করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। তবু আমরা প্রকৃতির নিকট চিরঋণী, তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ স্থল-বিশেষে যেমন তাহাকে সাজাইয়াছি, তেমনি অসংখ্য স্থলে টিনের ছাদ ও কলের ধোঁয়া প্রভৃতিতে তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য নষ্ট করিয়াছি। পক্ষান্তরে, তাহার রূপরস যেমন আমাদের মুগ্ধ করে, পোষণ করে, তাহার বজ্র, তাহার সমুদ্র তেমনই আমাদের দগ্ধ করে, শোষণ করে। অতএব শোধবোধ!

স্ত্রীলোক ও পুরুষের দেবদত্ত অনৈক্যের মধ্যে এই একটি প্রধান যে, স্ত্রীলোক নিকটের সঙ্গে এবং পুরুষ দূরের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে স্বভাবতঃ পটু। কারণ পুরুষ সৃষ্টিকর্ত্তা, স্ত্রীলোক রক্ষাকর্ত্তা, (এবং বালক প্রলয়কর্ত্তা!) যিনি রক্ষক তিনি গচ্ছিত দ্রব্য হইতে বেশি দূরে গেলে চলে না। গৃহ এবং সমাজই নারীর নিকট গচ্ছিত সেই ধন, সুতরাং নারী তাহাই লইয়া পড়িয়া আছে ও পাহারা দিতেছে। তাহার শরীর ও মন, বুদ্ধি ও হৃদয় সবই ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণে সর্ব্বদা নিযুক্ত, সুতরাং বাহিরের প্রতি তাহার লক্ষ্য করিবার প্রবৃত্তি ও অবসর স্বভাবতঃই কম। সব কাজ একের দ্বারা হওয়া সম্ভবপর নহে, কার্য্যবিভক্তিতেই কার্য্যসিদ্ধি। লক্ষ্য উচ্চ হইলে তাহার সাধনে কোন খণ্ড কাজই তুচ্ছ নহে। গৃহরচনা ব্যূহরচনা অপেক্ষা কিছুমাত্র সহজসাধ্য নহে, এবং জীবনসংগ্রামের পক্ষে বোধহয় বেশি বই কম প্রয়োজনীয় নহে। খাদ্য যেমন পুরুষে অর্জ্জন এবং স্ত্রীলোকে বণ্টন করে, তেমনি মানসিক খোরাকও পুরুষকেই অধিকাংশ

যোগাইতে হয়। সত্যরাজ্যের সীমানা বাড়ানো তাঁহাদের কাজ, কিন্তু যে সত্যরত্ন মনের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা রক্ষা করা ও জীবনে প্রকাশ করা স্ত্রীলোকের কাজ। সেই জন্য সব দেশে ও কালে স্ত্রীলোক রক্ষণশীল, পুরুষ গতিশীল। একজনের সঙ্কীর্ণ সামাজিক জীবন,—অপরের বিস্তীর্ণ জাতীয় জীবন লইয়া কারবার। প্রাত্যহিক এবং প্রত্যক্ষ উপস্থিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ভার অধিকাংশ নারী অনুগ্রহ করিয়া (অথবা দায়ে পড়িয়া!) লইয়াছে বলিয়াই এতগুলি পুরুষ অপ্রত্যক্ষ এবং অনুপস্থিতের প্রতি এতটা মন দিতে পারে। তাই নারী মুক্তিদায়িনী। সে সর্ব্বদাই দশচক্রে ঘূর্ণ্যমানা ও দশভুজে কর্ম্মনিরতা। তাই নারী শক্তিরূপিনী। সে পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হইবার জন্য সততই উন্মুখ ও প্রস্তুত। তাই নারী সন্তাপহারিণী। আর পুরুষ "ভাঙ খেয়ে বিভোর ভোলানাথ"—অন্নের ভিখারী, প্রেমের ভিখারী, সৌন্দর্য্যের ভিখারী, জ্ঞানের ভিখারী। আবার যখন ভিখারী নন তখন শিকারী,—পশুপতি কি পশুমতি তাহা বলা কঠিন! সেই মৃগয়ামদে এখন য়ুরোপ মত্ত, ত্রস্ত, বিধ্বস্তপ্রায়। এই খাদ্যখাদক সম্বন্ধের তুলনা দিতে মাকড়শা হার মানে। হয় হিংস্রতর জন্তুর অবতারণা করিতে হয়, নাহয় স্বীকার করিতে হয় যে ভগবানের সৃষ্টিতে মানুষ হিংস্র জন্তু হিসাবে অদ্বিতীয়। সৃষ্টির কি উদ্দেশ্য তাহা ভগবানই জানেন,—আমরা সে হেঁয়ালির উত্তর দিতে ক্রমাগতই চেষ্টা করি, এবং ক্রমাগতই ভুল করি,—তাহা সংশোধনপূর্ব্বক পুনরায় চেষ্টা করি, ও পুনরায় ভুল করি। এই চেষ্টাপরম্পরার নামই ক্রমোন্নতি বা জীবের অভিব্যক্তি। এই নৃসিংহ অবতারকে

মানুষ করাই যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে কত যুগে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে তাহা এই বিংশ শতাব্দীর হত্যাকাণ্ড দেখিলে মনে হয় অনুমানেরও অগোচর। ইতিমধ্যে এটুকু নিশ্চিত যে এই খাদ্যখাদক সম্বন্ধকে বাধ্য-বাধক সম্বন্ধে পরিণত করিবার যৎকিঞ্চিৎ ক্ষমতা স্ত্রীলোকেরই আছে। সেই দূরাৎসুদূর লক্ষ্যের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া আপাততঃ প্রত্যেকে সযত্নে আপনাপন জীবন-জাল বুনিতে থাকি। কাল পূর্ণ হইলে হয়ত এই ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম জালিসমষ্টিই বেড়াজালে পরিণত হইয়া পৃথিবীকে আত্মীয়তার মঙ্গল রাখীবন্ধনে বাঁধিবে। তথাস্তু।

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

অন্নপূর্ণা

বিশ্বশিল্পী	মডেল
আমি	বৃদ্ধ
শ্রমজীবীগণ	দলনায়ক
রং-ওয়ালা	সহকারী নায়ক
তন্তুবায়	মহাজন
স্বর্ণকার	ব্যাপারী

স্থান।—বিশ্বের হাট। অনতিদূরে কারখানা ও খনি। সাম্‌নে পাহাড়, চূড়ায় মন্দির, পাহাড়ের গায়ে কুটীর।

(পাহাড়ের নিম্নদেশে শিলাখণ্ডে বসিয়া)

আমি।—কত আকাশ ঘুরে এই মাঝপথে এসে থেমে গেছি। সেই যে শূন্যময়ের দেশ পার হ'লাম, তারপর এক ঘূর্ণীপাকে পড়ি, সেথায় দুটা ছায়ামূর্ত্তি, অবিরাম্ গোলপথে পরস্পর পরস্পরকে অনুধাবন কর্‌ছে। উভয়ে দেখে কেবল উভয়ের পশ্চাতের একটা আবছায়া, আর উভয়েই. উভয়ের ছায়া ধর্‌বার জন্য ছোটে। বুঝ্‌লাম, এ যুগল জীবন ও মরণ। তখন সেই দ্বন্দ্বের ঘোর কেটে গেল, আবার চল্‌তে লাগ্‌লাম। এবার নূতন প্রয়াণে মধ্যপথে, সন্ধিস্থলে, এসে পড়্‌লাম। বুঝ্‌লাম তৃতীয় হ'য়ে মাঝে থাকাই সত্য,—দুই মিথ্যা, তিন সত্য। সেই অবধি এই মাঝপথে তৃতীয় হ'য়ে আছি।

এই দেশের মালেক একজন শিল্পী। তাঁরই তাঁবে ঐ কারখানা, ঐ খনি, ঐ হাট ; সকলই তাঁর অধীনে চলিতেছে। তাঁর বিশ্বশিল্পের উপকরণ

যোগাইবার জন্য। ক্ষতিবৃদ্ধির, লাভ লোকসানের, গণনা তাঁর নাই; তিনি শিল্পী।

সেই মালেক বিশ্বশিল্পী একদিকে, কারিগরেরা অপর দিকে, আর আমি কারিগরদের "মালেকা", শিল্পীর "বন্ধু", তাদের মাঝে। মাঝে বসে বসে দেখি, এই পাহাড়ের গায়ে ঊর্দ্ধে শিল্পীর সান্ধ্যমেঘরঞ্জিত কুটীর ও শিল্পাগার দুর্গম চূড়ায় তুষারশ্বেত মন্দির, ও তলদেশে খাদে ধূমায়মান খনি ও কারখানা।

শিল্পীকে বলি, বন্ধু, ঐ যে পায়ের তলে গহ্বর, কারিগরের আবাস, ভরিয়া উঠিবে কিসে? বন্ধু কেবল হাসে আর বলে, হৃদয়রাণী, ও যে সোণার খনি, ও খনি ভরিয়া উঠিলে তোমায় সোণা দিয়া সাজাইব কেমনে? পোড়াইয়া পিটাইয়া আমার খাস দরবারের আসবাব গড়াইব কিসে?

ভেবেছিলাম মাঝে থেকে মালেক ও মজুরদের বন্ধনী হ'য়ে থাকব। আমি "মালেকা", আমি মধ্যস্থা, বিবাদভঞ্জন ক'রে শান্তি এনে দেব। কিন্তু এ একতরফা শালিসী, একদিকে স্বস্তি অপর দিকে অসোয়াস্তি, তাই এদের জ্বালা, এদের হাহাকার, ঘুচ্‌ল না। চুলির আগুন দিনরাত ঐ কারখানায় জ্বল্‌ছে। আর খাদ থেকে উঠ্‌ছে ধোঁয়া, আর উঠে লোহা পেটার কড়্‌কড়া; কলের জাঁতার ঘর্‌ঘরা।

বঁধুয়া, তুমি মহীয়ান্ তুমি মালেক, আমার ধূলাকে সোণা দিয়া মুড়িয়াছ, কিন্তু আজ আমি ধূলায় ফিরিয়া যাইতে চাই। আজ আমি মাটির সঙ্গে মাটি হব, আগড়া ধসা মাটি,—তোমার শিল্পমূর্ত্তির মধ্যে রাণীমূর্ত্তি হ'তে চাই না। তোমার শিল্পের দোহাই, আমায় রেহাই দাও।

মন আমার, আর নয়, আর নয়, মাঝে থাকিলে চলিবে না। সূর্য্যের জ্যোতি সহস্রধা হ'য়ে ধূলাবালিতে পড়ে। মাটিতে পড়িতে সূর্য্যের কোন সহায় সম্বল নাই। মাঝে কেবল আকাশ, মাঝে কেবল ফাঁকা, কোন রূপের আড়াল নাই।

(কারখানার প্রাঙ্গণে প্রবেশ)

আমি আজ এই কারিগরদের, এদের প্রভুর নহি। ঐ যে কচি রাঙ্গা ফুটফুটে মুখখানি, যাকে একদিন অশ্রুজলে সিক্ত ক'রে, রিক্ত ক'রে, পটো অনাথার করুণমূর্ত্তি আঁকবে ব'লে মনে মনে ঠাওরাচ্ছে, আমি আজ ঐ কচি মুখখানির, পটোর নই। ঐ যে পরিশ্রান্ত বৃদ্ধের সৌম্য মূর্ত্তি গোধূলির আকাশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে সংসারতটে দণ্ডায়মান; যার শেষ নিশ্বাসটুকু নিয়ে ভাস্কর "বিদায়"-এর মর্ম্মরমূর্ত্তি প্রাণময় ক'রে গড়ে তুল্‌ছে,—মূর্ত্তির থামালে লেখা—"Au revoir, বিদায়! আবার যেন তোমায় দেখি!"—আমি আজ ঐ শ্রান্ত বৃদ্ধের, এ ভাস্করের নই। ঐ যে তন্তুবায় সৌখীন বিলাসীর জন্য হৃদয়েরই তন্তুগুলি ছিঁড়ে রেশমের গুটি প্রস্তুত ক'রে দিচ্ছে, ঐ যে রং-ওয়ালা নিজের রক্তাক্ত অস্থিকেই লোহার কলে পেষণ ক'রে চিত্রকরের জন্য রংএর গুঁড়া তৈয়ারী কর্‌ছে, আমি আজ ওদের, শিল্পীর নই। ঐ যে খনির মজুরেরা আঁধার থেকে কেবলই রত্নরাজি খনন ক'রে তুলে স্বর্ণকারকে নিবেদন কর্‌ছে—কারণ স্বর্ণকারই কেবল তা কেটে ছেঁটে ঘ'সে মেজে রাজার মাথার মুকুট, রাণীর কণ্ঠের মণিহার, প্রস্তুত কর্‌তে পারে,—আমি আজ ঐ মজুরদের, স্বর্ণকারের নই। যে হতভাগ্যদের অঙ্গহানিতে আজ ভাস্কর্য্যকলা ও চিত্রবিদ্যা পূর্ণাঙ্গ হ'চ্ছে, আমি তাদের ঘোর অমানিশার, শিল্পীর দিব্যালোকের কেহ নই। শিল্পী সকলকার সব পার্থিব সম্পদ লুঠ ক'রে এক অলৌকিক আদর্শ গ'ড়ে তুলছে, সব লাভ সব প্রশংসা সব নিপুণতা তার ভাগ্যেই পড়ে, আর যারা তাদের রক্তমাংসের পুঁজিসর্ব্বস্ব দিয়ে তার সেবা করছে, শিল্প না জেনে, না চিনে, অজ্ঞানের বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত এতদিন সেবা ক'রে এসেছে, তারা কেও নয়? না, না, আমি আজ তাদের। শিল্পী আমার কেও নয়। হায়! আমাকে কি তারা পুষ্যি নেবে।

বিশ্বের হাট

বিশ্বশিল্পী।—(স্বগত) আজ হাটের বাজার এমন খালি কেন? কই তন্তুবায় সুতা আনে নাই ত, রং-ওয়ালা রং গুঁড়া করেনি। আজকে না বণিকের হীরার টুকরা আন্‌বার কথা ছিল? কই পাথর কই? এবার প্রদর্শনীতে যে একটা নূতন ছন্দে নর্ত্তকীমূর্ত্তি গ'ড়ে দেওয়া চাই,—নটরাজে আর লোকের মন পাওয়া যায় না,—কই সে মেয়েটাও ত আসেনি। আর সেই বুড়োর আজ শেষ দিন ছিল, আজকে হ'লেই তাকে দিয়ে আমার আর কোন প্রয়োজন ছিল না। আজ সবাই মিলে কি যেন একটা ষড়যন্ত্র করেছে, তাই হাটের দরবার আজ এমন খালি। দিনটা তবে বৃথাই গেল। না, ঐ যে এদিকে কারা আস্‌ছে। (প্রকাশ্যে) আজ তোমাদের এত দেরী হল কেন?

রং-ওয়ালা।—দেরী? আজ দেরী হয়েছে, কাল থেকে আর আস্‌ব না। আমরা আর রং পিষ্‌তে পার্‌ব না। হাড় গুঁড়া হ'য়ে গেল।

তন্তুবায়।—আমরা আর সূতা কাট্‌বো না। আর পট্টবস্ত্র বুন্‌বো না। সেযে আমাদেরই গলার ফাঁসী।

স্বর্ণকার।—মজুর আর আঁধারে খনিতে কাজ কর্‌তে রাজী নয়। এবার আমার সোণার চাষ মাটি।

মডেল।—আমি তোমার মডেল হবো না। আমাকে দিয়া সুন্দর মূর্ত্তি আঁক্‌ছ তাতে তোমার লাভ, আমাকে কি দিলে? আমাকে একজন চাষী ভালবাসে। সে আমার পাষাণে প্রেম জাগাইয়াছে, আমি তার।

বৃদ্ধ।—সবটুকু ত দিয়েছি, একদিন আর বাকী। শেষ দিনটা না হয় আমারই থাক্‌। তুমি পূর্ণ হবে, আর আমি শূন্য হ'য়ে যাব? না, তা আর হবে না।

বিশ্বশিল্পী।—হাঁ, তাই ত দেখ্‌ছি। এতদিনে তোমাদের চোখ ফুটেছে।

কিন্তু তোমরা আমাকে সাহায্য না কর্‌লে সংসার চল্‌বে কেমনে? তোমরা খাবে কি? কম্মের বিনিময়ে মুদ্রা পাও, তাহাতেই তোমাদের লাভ। মুদ্রাতে কি তোমাদের প্রয়োজন নেই বল্‌তে পার? তোমরা শ্রমজীবী, আমি শিল্পী, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করি।

দলনায়ক।—হুঁ, প্রাণের বিনিময়ে মুদ্রা দিতেছ। একদিকে সবটুকু প্রাণ, অপরদিকে মুদ্রা, যাহা লোহার গুলির মতন আমাদের বুকে বাজ্‌ছে, ক্রমেই কঠিন হ'য়ে জমাট বাঁধছে, তাল পাকাইয়া এক জগদ্দল পাথরের স্থায় আমাদের চাপিয়া ধরিয়া শ্বাসরোধ কর্‌ছে। তরলতাটুকু সব হরণ করেছ, দিয়াছ কত যুগের পুরাতন জমাট হিমানী। আগুনটুকু সব তোমার ভাগেই। তোমার ওই আগুনের বখ্‌রা একটু ছেড়ে দাও ত, ঠাকুর! শীতল কঠিন ক'রে আর প্রাণে মেরে ফেল্‌তে দেবো না। এই যে পিপীলিকার শ্রেণীর স্থায় আমরা তোমার মঞ্চতলে দিন-গুজ্‌রান করি, তোমাকে ওই উচ্চাসনে দেখে আমাদেরও উঠ্‌বার উড়্‌বার সাধ হয়েছে। আমরাও তোমার মতন হাল্কা ও তরল হ'য়ে উড়ে যেতে চাই। কে জানে কোথা থেকে মাঝে মাঝে আসে কোন্ আগুনের হল্‌কা, কি যেন একটা প্রাণের ভিতর দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে, আর অমনি তোমার সকল বন্ধন জ্বলে পুড়ে খাক্ হ'য়ে যায়, তোমার কলকারখানা সব শূন্য হ'য়ে যায়, তুমিও নাই, আমরাও নাই, সব ভোঁ ভোঁ, সব ধূ ধূ, সব ফাঁকা!

বিশ্বশিল্পী।—(স্বগত) এ কি! আমাকেও হল্কার আঁচ লাগল বুঝি। আমার নিজেকেই যেন শূন্য বলে ঠেক্‌ছে।

সহকারী নায়ক।—টাকা চাই না এমন নহে, কিন্তু প্রাণও যে চাই, শুধু টাকায় চলে না, প্রাণের জন্যই টাকা।

বিশ্বশিল্পী।—(স্বগত) এ ছোঁড়াটা হুঁসিয়ার। এর কথায় আমারও আবার হুঁস ফিরে এল। (প্রকাশ্যে) প্রাণ? প্রাণ ত অন্নে, আর অন্ন

এই মুদ্রায়। মুদ্রার অভাবে অন্ন কি ক'রে মিল্‌তো? মুদ্রা জড়? কঠিন? এই জড়ই যে অন্নপূর্ণার পীঠস্থান। এই জড় মুদ্রার সৃষ্টিতেই যে অন্নের কারবার চল্‌ছে। এই জড়ের ছাঁদ না হ'লে সমাজের, সংসারের বিনিময় চল্‌ত কি প্রকারে? হাতে হাতে চালাচালি হ'য়েই এই ছাঁদি মুদ্রা অন্নবিতরণে সহায় হয়। আর এই মুদ্রার ছাঁদও অসংখ্য,—সোনা, রূপা, তামা, ভিন্ন ধাতু, ভিন্ন ওজন, ভিন্ন দর! কে অন্নপূর্ণার পীঠস্থান গণনা করিবে।

মহাজন।—(স্বগত) সে আমি। আমি গণিয়া গণিয়া দর দস্তুর করিয়া লোহার সিন্দুকে তুলিয়া রাখি। আমি জ্ঞানী!

ব্যাপারী।—ভিন্ন দর? বিশ্বে এমন কিছু নাই যাহা ঐ মুদ্রার মূল্যে বেচিতে না পারি, কিনিতে না পারি। (স্বগত) ঠাকুর, তোমাকেই কি ছাড়ি! সময় বুঝিয়া তোমাকেও বেচিয়াছি, তোমাকেও কিনিয়াছি।

সহকারী নায়ক।—কেবল আমাদেরই কি মুদ্রার অভাব আছে, তোমার তাতে প্রয়োজন নেই?

বিশ্বশিল্পী।—আছে, আমার অভাব আছে সত্য। যার অভাব আছে সেই অপরের অভাব দূর কর্‌তে পারে। যার অভাব নেই সে পারে না। আমার অভাব ও তোমাদের অভাব উভয়ে একত্র এই মুদ্রার ভিতর বাস কর্‌ছে। তোমরা যা চাও তা উহার ভিতরই পাবে। বেচে নাও।

দলনায়ক।—এ সব হেঁয়ালি বুঝি না। সোজা কথা শুন্‌তে চাই। প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ দিতে পার কি?

বিশ্বশিল্পী।—ওই মুদ্রার ভিতর প্রাণ আছে, অন্নপূর্ণার অন্নশক্তি।

বৃদ্ধ।—অন্নপূর্ণা? আমরা ত মালেকাকেই অন্নপূর্ণা বলে জানি। আমরা শ্রমজীবী, তিনি আমাদের সকলের ছোট মা। এরা আজ ছোট মায়ের আশীর্ব্বাদ নিয়ে কর্ত্তার সঙ্গে বোঝা পড়া কর্‌তে এসেছে। কর্ত্তা আবার কোন্ অন্নপূর্ণার কথা বল্‌ছ?

ব্যাপারী।—আরে বুড়ো, বুঝলিনে, এ সেই অন্নপূর্ণা যার অন্নছত্র কেও দেখেনি।

সহকারী নায়ক।—না, এ সেই অন্নপূর্ণা যে সকলকে নেমন্তন্ন ক'রে যজ্ঞবাড়ীতে ডেকে এনেছে—ত্রিভুবন আজ দুয়ারে উপস্থিত—সকলকার মুখে একই বুলি, অন্ন কই অন্ন কই!—দাও দাও!—কতকালের ফাঁকা মন্দিরে আজ একটা সোরগোল একটা হাঙ্গামা পড়ে গেছে—কিন্তু প্রথম পাতেই দেখা গেল অন্ন একেবারে অনাটন—আসল 'ফর্দ্দেই ভুল!—লোক সংখ্যা করেনি রে! লোক্ সংখ্যা করেনি! 'বিষম' গোলযোগ! তারপর? তারপর আর কি? অন্নের লুঠ্—শেষে অন্ন নিয়ে হাতাহাতি মারামারি কাটাকাটি —দেখ আজ ভুবনে কুরুক্ষেত্র!

বিশ্বশিল্পী।—আফসোস্, আফসোস্! কি বিষম ভ্রান্তি! নিয়ত, তোমারি জয়! হে অন্নার্থি! অন্নপূর্ণার অন্নের কম্‌তি নাই, ঘাটতি নাই। তাঁর ভাণ্ডার সদাপূর্ণ, অফুরন্ত বাড়ন্ত। তিনি যে অন্নময় কোষের অধিষ্ঠাত্রী। যাহা কিছু দৃশ্য শ্রব্য লেহ্য পেয়, ভোগ্য গ্রাহ্য, সকলই সেই অন্নময় কোষে অধিষ্ঠিত। জড়শক্তির অনন্তরূপ সেই অন্নপূর্ণারই রূপে। এই যে সৃষ্টির দাহ, সে ত অন্নেরই পাক! আবার শুধু ভোগ্য নয়, অসংখ্য ভোগকায়াও সেই অন্নপূর্ণার সৃষ্টি। তিনি শাশ্বতী প্রসূতি (Fecundity), তাঁহার বিরাট দেহ হইতে অসংখ্য প্রজা বহির্গত হইতেছে আবার তাঁহারই বিরাট দেহে প্রবেশ করিতেছে। তিনি গর্ভাশয়ে গর্ভবীজ, চষা ভূমিতে উর্ব্বরতা, আকরে রত্নপ্রসূতি। অসংখ্য ভোগকায়া ও অফুরন্ত ভোগ্য বস্তু খালাস করিয়াই তিনি খালাস। মুখ ও খাদ্য একত্র করার ভার বিধাতার।

ব্যাপারী।—(স্বগত) ভুল! ভুল! সে ভার এই ডান হাতখানির।

মহাজন।—(স্বগত) বুজরুকী, সব বুজরুকী! এই জড়শক্তি অন্নপূর্ণা একটা মুখোস মাত্র! অন্তঃসারশূন্য! ভিতরে কেবল খড়, তাতে শীষ নাই। সব শস্য ত আমার গোলাঘরে মজুত। আমিই অন্নপূর্ণার পুষ্যিপুত্তুর।

সহকারী নায়ক।—অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার অফুরন্ত, আর আমাদের অন্নের এই খাঁকতি! ভাণ্ডারী কে? চাবী কৈ? তুমিই তবে ভাণ্ডারী?

বিশ্বশিল্পী।—তোমাদের এই বিদ্রোহে আমাদের সবাইকারই লোকসান। কেবল অন্নপূর্ণার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তিনি শাশ্বতী রত্নগর্ভা হ'য়ে থাকবেন। কেবল সে রত্নের ভাগ আমরা পাবো না। তাই বলি অন্নকে ত্যাগ ক'রো না। দ্রোহ ক'রে অকল্যাণ করো না।

দলনায়ক।—অন্নপূর্ণার অন্নে আমাদের প্রয়োজন আছে বুঝি,—তোমারই কি নেই? কিন্তু বল দেখি, তোমার ওই নীলফ্রেমে আঁটা ছবি, ঐ চাঁদোয়া ঝাড় লণ্ঠন রোসনাই, ঐ সোনালি জরির ফিনফিনে উড়ানী, ঐ মাথায় হীরার জাজ্বল্যমান মুকুট, ওই সুন্দর নটবরের বেশ, শুধু অন্নের বিনিময়ে বেচ্‌বে কি? নানান্ রস নানান রং দিয়ে যে নানা ছাঁদে সুন্দরের আদর্শ গ'ড়ে তুল্‌ছ, তাতে কি শুধু অন্নই সহায়, আর কিছুর প্রয়োজন নাই?

বিশ্বশিল্পী।—তা ত নয়। অন্নে আমার পেট ভরে না। তোমাদের ঐ রং তুলি পট, ঐ রেশম ও পট্টবস্ত্র, ঐ মণিমুক্তা-মরকত, ঐ শ্বেত কৃষ্ণ লোহিত মর্ম্মর খণ্ড, সবই আমার চাই। সর্ব্বাপেক্ষা চাই তোমাদের মুখ চোখ, হাত পা, বুকের রক্ত ও মাথার ঘাম। অন্নকে চাই না; তোমাদের চাই। আর তোমরা যা দাও তার বিনিময়ে দিই এই মুদ্রা!

দলনায়ক।—ঠিক কথা, টাকা দাও বটে, কিন্তু তুমি যাহা দাও তাহা ত সুদসমেত ফিরিয়া লও। তোমার কিছুতেই লোকসান নেই। আর আমরা!—বুদ্ধিমান মহাজনেরা আমাদের টাকাগুলি সব নিয়ে তহবিলে জমা করছে, আর আমাদের মুষ্টি ক'রে অন্ন দিচ্ছে। আর তুমি ঐ জ্ঞানীদেরও একদিন তোমার মোহিনীশক্তিতে যাদু ক'রে মুদ্রাগুলি আবার সব আদায় ক'রে নাও। মুদ্রাতে প্রাণ আছে এ কথা আগেই বলেছ;—তবেই দেখ প্রাণটুকু সব নিজেই উপভোগ করছ।

বিশ্বশিল্পী।—আমার কাছে ফিরে আসে যত ভাঙ্গা কাটা অচল মুদ্রা। তখন তার সারটুকু তাতে থাকে না। সারটুকু দিয়ে অন্ন উৎপন্ন হয়, অন্নের আমদানি রপ্তানি হয়, সেই অন্নের মুঠা তোমরা পাও। আমি পাই শুধু ছাঁদটুকু। তাতে আবার প্রাণভরে মোহরের ছাপ লাগিয়ে তোমাদের দিই।

দলনায়ক।—বৃথা ছাপ! মুদ্রাতে প্রাণ থাক্‌লে প্রাণ পেতাম না? মুদ্রাতে আমাদের কোন প্রয়োজন নেই। আমাদের প্রাণের অভাব সে পূরণ কর্‌তে পারে না। বুঝেছি অন্নপূর্ণার সঙ্গে বোঝাপড়া ক'রে আমাদের এতগুলি প্রাণকে মুদ্রাতে পরিণত করা হয়েছে। সেই মুদ্রা কেবল তোমাদের উভয়েরই অভাব দূর কর্‌তে পারে। তোমাদের কারখানা, কারবার, এই জড়ের ছাঁদ না হ'লে চল্‌ত কি ক'রে? কিন্তু এ কারবারে আমাদের কোন স্বার্থ নেই। এ ত তোমরা ও আমরা মিলে যৌথ-কারবার চালাই নি। এ যে সব লাভ তোমাদের ভাগে, সব লোক্‌সান আমাদের,—স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের ফারাক!

বিশ্বশিল্পী।—লোক্‌সান! অন্নপূর্ণার অন্নে যে সার সে ত তোমাদেরই ভাগে। আমরা ত অন্ন গ্রহণ করি না। সারটুকু ত আমরা কেহই লই না, তবে আর লাভ নাই বল্‌ছ কেন?

সহকারী নায়ক।—কর্ত্তাদের চাতুরী সব বুঝি। অন্নপূর্ণার অন্নে সার নেই, সে শুধু তুষ! তুষ দিয়ে আর চল্‌বে না। সার তোমরা নাও না? (শ্রমজীবীদের প্রতি) কেও তবে এর মাঝে আছে রে! কেও আছে যে সবটুকু নেয় আমাদের কিছু দেয় না। ঐ জ্ঞানী মহাজনেরা বুঝি? না কোনও ঐন্দ্রজালিক, কোন যাদুকর? আর আমরা সবাই ছায়াবাজির ছায়া! কেও আছে নিশ্চয়, নতুবা আমরা এমন জীর্ণ শীর্ণ হ'য়ে পড়্‌ছি কেন? শক্তি কোথায় গেল?

দলনায়ক।—ঠাকুর, শক্তি কি ঐ শিল্পে? তাই সৃজন কর্‌ছ। আমরাও যে এক একটি নিজ নিজ জগৎ সৃজন কর্‌তে চাই। তুমি শিল্পী, তুমিই সৃজন-

কর্ত্তা হবে। আর আমরা কেবল সৃষ্ট বস্তু হ'য়ে থাকব। আচ্ছা, সোনা রূপার বদলে তোমার ওই সূক্ষ্ম প্রাণময়ী কলাশক্তি দিতে পার?

সহকারী নায়ক।—না, না সূক্ষ্মে হবে না, সূক্ষ্মে শক্তি নাই। তোমার হাতের ঐ রাজদণ্ড দিতে পার? ঐ মহাজনগুলাকে একবার সরাইয়া দিই। মহাজনদের দাদনের কিছুমাত্র দরকার নেই। আমরা তখন অনন্তপ্রসবা অন্নপূর্ণাকে কর্ষণ ক'রে অন্ন উৎপাদন করতে পারবো। এইবার একেবারে মুখোমুখী হ'য়ে অন্নপূর্ণার সঙ্গে কারবার চালাব। এই যে এক হাত থেকে অপর হাতে ঘোরা,—এই হাতে হাতে চালাচালি করতে করতে কে যে মাঝে থেকে সারটুকু ফুকে নেয় তার ফাঁকি ধরা পড়ে না। এবার আর মাঝে থেকে কাকেও সর্দ্দারী করতে দেওয়া হবে না। কারখানার মালেককেও নয়, মহাজনদিগকেও নয়।

শ্রমজীবীগণ।—(সহকারী নায়কের প্রতি) ঠিক্ ঠিক্, কেউ নায়ক থাকবে না, কেউ নায়ক নয়!

মহাজন।—(স্বগত) না, এ সয়তান বশ করা আমার কাজ নয়। কোন্ দিন আমার গোলাঘরে আগুন লাগায় বুঝি! অতীতের সব সঞ্চয়, সকল গচ্ছিত ধন, আমার কাছে মজুত। অ্যাঁ, এরা লুট করবে! সব মামুলী দখলী সম্পত্তি, সব পৈতৃক ভিটাবাড়ী, এরা লণ্ডভণ্ড করবে! অ্যাঁ অ্যাঁ......

ব্যাপারী।—(স্বগত) বলে কি? হাত চালাচালি বন্ধ হ'লে ত আমার ডান হাতও চলবে না!

বিশ্বশিল্পী।—জানি জানি, মুখোমুখী কারবার জানি! তোমরা যে আমার সঙ্গে মুখোমুখী হ'য়ে কারবার চালাতে পারো না তাই আমার দুঃখ। আমি যাহা গঠন ক'রে তুলছি তা ত তোমাদেরই জন্য। সে যে সকল প্রাণের প্রাণ মহাপ্রাণ, সকল রসের রস একরস। সেই একরস—আমার স্বরূপ—তোমাদের দান করিতে গিয়াও দিতে পারি না। তাই আমি পাতলা হ'য়ে ধীরে ধীরে সকলের ভিতর দিয়া নেমে আস্‌ছি। কিন্তু পাতলা হ'তে হ'তে সার

কমে আসে, শক্তি ক্ষীণ হয়, আর কোথা থেকে কত ভেজাল এসে মেশে। তাই এই বিশ্বের হাটে আমার নামে আমার মার্কায় দুগ্ধ ঘৃতের পরিবর্ত্তে বসা বিক্রয় হয়, তাই চাল ময়দায় খড়িমাটি! হায় রে! সে অন্নে তোমাদের পুষ্টি হয় না, তোমরা শীর্ণ হ'য়ে যাচ্ছ। তোমরা আমায় কিনে নেবে স্থির করেছ। কিন্তু ঐ ভেজাল না হলে যে তোমরা মূল্য দিতে পার না। খাঁটি জিনিষ কিনিবার সামর্থ্য তোমাদের নেই। তা আমারই কি দোষ?

দলনায়ক।—এই মুদ্রার কারবার, এই হাত চালাচালি, বন্ধ হ'লেই আমাদের কেহ ফাঁকি দিতে পারবে না।

বিশ্বশিল্পী।—শুধু তোমাদের ভাগ্যে এই হাত চালাচালি নয়;—আমাকেও তোমাদের অন্ন প্রাণরস সরবরাহ করতে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে এই ঘোরফেরে পড়তে হয়। এই ঘোরফেরের ভিতর দিয়া তোমরা আমাকে পাও, আমি তোমাদের পাই। তোমরা যেমন হাতে হাতে ফিরে ধাপে ধাপে উঠে আসছ, আমাকেও তেমনি তোমাদের মতন কত হাত ঘুরে ঘুরে ধাপে ধাপে নামতে হচ্ছে। আমি লাটাই ঘুরাতে ঘুরাতে কেবলই সূতা ছাড়ছি, আর তোমরা কেবলই তাকে তোমাদের লাটাইয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গুড়িয়ে নিচ্ছ। এই সূত্রবন্ধ ছিঁড়তে চাও? তা'হলে যে আমার টান ছাড়া হ'য়ে কোথায় যে যার ছটকে পড়বে, আমিও তোমাদের সন্ধান পাবো না। তাই বলি বিদ্রোহ করো না; মুখোমুখী হ'য়ে কারবার করবে ত একবার মানুষ হ'য়ে উঠ দেখি। পুরা মানুষ, গোটা মানুষ, আর সিকিও নয় আধখানাও নয়। বিকলাঙ্গ নয় পূর্ণাঙ্গ। এবার আমি তোমাদের জন্য পাঠশালার বন্দোবস্ত করেছি, তোমাদের বংশে এ যুগে কেহ আর অশিক্ষিত থাকবে না, কেহ অসহায় অপোগণ্ড থাকবে না। সকলের জ্ঞানচক্ষু ফুটবে সকলকে মানুষ হবার রাস্তা দেখান হবে। তাই বলি, একবার তোরা মানুষ হ।

শ্রমজীবীগণ।—মানুষ হ'তে হবে? কর্ত্তাই একবার মরদ হও দেখিনি।

মজুর না হ'লে কি দিন-মজুরীর কদর বোঝে? হামদর্‌দী জান্‌বে কি করে?

সরকারী নায়ক।—আমরা বিকলাঙ্গ? অনন্তাবয়বা প্রকৃতির ক্রোড়ে যাহারা পালিত, তাহাদের যে অঙ্গহানি, তাহা ত তোমার কল কারখানা খনির দওলতেই। কিন্তু আমরা পুরুভুজের বংশ, মাটি খাই, আর নব কলেবর পাই, বংশক্রমে আমাদের ভগ্ন ক্ষত সারিয়া যায়। তাই ঐ কুব্জের হাত ধরিয়া ঐ কচি ফুটফুটে মেয়েটি! মালেক গোষ্টিতে ক্রমিক অবনতি, আমাদের গোষ্ঠীতে সেরূপ নয়।

দলনায়ক।—শিক্ষার বন্দোবস্ত? শিক্ষা কার? মজুরের না মনিবের? আমাদের গোষ্ঠীতে না মালেক গোষ্ঠীতে? মানুষ? আর আধখানা নয়, পুরা মানুষ! কে আধখানা, কে গোটা? কে বেশী পূর্ণাঙ্গ, পূর্ণাবয়ব, শিল্পী না শিল্পীর মডেল? তুমি শিল্পী, সৃষ্টি কর্‌ছ সত্য, আর আমরা তোমার সৃষ্টির উপকরণ। যে উপকরণ হ'তে পারে তার স্বত্ব কি ওজনে বেশী নয়? সে কি বেশী দেয় না? সে কি শিক্ষার চরমে, শুদ্ধ স্বাভাবিকতায়, স্বতঃ উপস্থিত হয় নাই? তুমি শিল্পী, আমরা উপকরণ, শুনিবে তোমায় আমায় প্রভেদ?.........ঐ যে তোমার শিল্পাগারের নাচঘরে ঐ ভবঘুরে নর্ত্তকী রঙ্গমঞ্চে নৃত্য করে তার কৃত্রিম ভাব ভঙ্গীতে দর্শকদের মুহূর্ত্তের তরে রঙ্গীন নেশার ঘোরে মুগ্ধ করছে, আর নাচের তালে তালে পিটে ষ্টলে গ্যালারীতে করতালি পড়ছে, নাচের ঠমকে ঠমকে দর্শকদের ঘন ঘন মাথা নড়ছে পা দুল্‌ছে, আর "বাহবা", "কেয়াবাৎ", "বহুত আচ্ছা" আসর গরম ক'রে জমিয়ে তুল্‌ছে,...আমরা কেবল সেই নর্ত্তকীর মঞ্চটি শক্ত ক'রে বেঁধে দিই, দর্শকবৃন্দের জন্য তার মুখের সাম্‌নের পর্‌দা তুলে দিই, সময় বুঝে যে স্থানে বাতি জেলে দিলে তাকে সুন্দর দেখাবে ঠিক সেইখানে বাতি জ্বালি নেবাই; আবার দর্শকের কৌতূহল বৃদ্ধির জন্য তাকে পর্দ্দার আড়ালে রাখি—আমরা কেবল ছায়ার মতন আসি, ছায়ার মতন

যাই,—এই যে আমরা তোমাদের সবাইকে মহান ক'রে তুলছি, ইহার ভিতর শিক্ষা অশিক্ষার হিসাব নিকাশ ক'রে নাও। ঐ যে মাঝি গিরিনদীতে লগী মেরে মেরে সূর্য্যাস্তের দেশে ভেসে যাচ্ছে, তুমি তাকে দেখে একটা গান রচনা ক'রে পারাপারের আনন্দ পাও ও দাও,—ঐ অশিক্ষিত নগ্নদেহ মাঝি যেমন তাহার অবয়বের পেশীতে পেশীতে শিরায় শিরায়, হস্তের চালনায় ও গ্রীবার ভঙ্গিমায়, একটা সত্যিকার পরিস্ফুট প্রাণময় মূর্ত্তি হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে, তুমি তেমনি ক'রে ঐ নটবর বেশ ছেড়ে মাঝির সাজে একবার দাঁড়াও দেখি, প্রভু! ঐ যে পথের ধারে শিরীষ ফুলটি কুঁড়ির ভিতর থেকে ফুটে উঠে সত্য হ'য়ে উঠেছিল আবার এখনি ঝরে পড়ে সকল সত্য বিসর্জ্জন দিয়ে অরূপী হ'য়ে গেল, তুমি কখনও কুঁড়ি থেকে ফুটে উঠবার সুখ সৌভাগ্য পেয়েছ, প্রভু? ঝরে পড়তে শিখেছ কি প্রভু? শিরীষ ফুলের কাহিনী পটের উপর তুলি দিয়ে আঁকতে পার, ফুল হতে পার কি? পরের বুকের রক্ত, পরের মাথার ঘাম, তোমার সম্বল! একবার তোমার রক্ত দাও দেখি, তোমার রাগে আমাদের রঞ্জিত কর দেখি! আমরা যেমন সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, অজ্ঞানে তোমাকে গঠন করে তুল্‌ছি,—তুমি যা নিয়ে জ্ঞানের সৃষ্টিতে আদর্শ গড়ে তুল্‌ছ—তার বিনিময়ে আমরাও তোমার প্রাণটুকু ভিক্ষা কর্‌ছি। প্রাণ চাই, অঙ্গসম্পদে আমরা হীন নই, কিন্তু প্রকৃতি মাতা তাঁহার স্তন্যদানে আজ আর আমাদের ক্ষুধা মিটাইতে পারেন না। প্রাণ দিয়েই যে প্রাণের ক্ষুধা মেটে। তোমার প্রাণটি চাই!

শ্রমজীবীগণ।—(সমস্বরে)—চাই!

(বৈকুণ্ঠধামের পাহাড় হ'তে প্রতিধ্বনি—চাই!)

বিশ্বশিল্পী।—আমার প্রাণ? তাই দিয়েই ত তোমাদের প্রাণ দান করেছি।

সহকারী নায়ক।—সে ত কেবল শীকার—সুখের জন্য! শুধু মায়া হরিণে শীকারীর ক্ষুধা মেটে না। কাঠের হরিণেও নয়। তাই জ্যান্ত মৃগ সৃজন

করে ছেড়ে দিয়েছে! সেই মৃগয়ার কাহিনীই এ নীলপটে এঁকেছে এ রাশিচক্রের ছবিতে! তুমি ঐ ব্যাধ, আমরা মৃগশিরা!

দলনায়ক।—প্রাণ দান করেছ? তুমি সে প্রাণ ভোগ করিলে, আমরা প্রাণ পাই কেমনে! সৃষ্টি কর্‌বার সময় এ কথা ভাবা উচিত ছিল। আজ তোমার সৃষ্টির দাবী তোমাকে পূরণ কর্‌তে হবে, ঠাকুর! প্রাণ দিতে হবে!·· একবার মরিতে শিখিলে না! তোমার মৃত্যু বিনা আমরা বাঁচিব কিসে? তোমার স্বতন্ত্র সত্তায় যে আমরা শূন্য হয়ে যাই। যতই তুমি বড় হয়ে উঠছ, এ যুগে দিনে দিনে যতই তোমার আকাশ বেড়ে যাচ্ছে, ততই আমরা ছোট হ'য়ে যাই! যতই তুমি দীর্ঘায়ু হও, তোমার যুগ কল্প মন্বন্তরের গণনায় আদি অন্ত হারাইয়া যায়, ততই আমরা স্বল্পায়ু হ'য়ে যাই।' আমাদের বংশ নাকি পঙ্গপালের বংশ, দুদিনের তরে মাটি হ'তে উঠেছে আবার মাটিতেই মিশাবে। তাই হোক্, মাটিতে পড়ি,—কিন্তু, মালেক, আজ তোমাকে তোমার সৃষ্টি জড়াইয়া আঁকড়াইয়া তোমাকে মঞ্চ হ'তে পাড়িয়া পড়িবে। আমরাও মাটি, তুমিও মাটি!

(শ্রমজীবীগণ সমস্বরে চীৎকার করিতে করিতে):—

মাটি! মাটি! সব মাটি!

বিশ্বশিল্পী।—(সচকিত) এদের খুন চেগেছে! (উচ্চৈঃস্বরে) মাটি! মাটি! অন্নপূর্ণার দেহ, মাটি! ঐ! ঐ! (খাদের নিম্নভূমির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ)

শ্রমজীবীগণ।—ঐ অন্নপূর্ণা! ঐ! ঐ!··অন্নপূর্ণা! পাষাণী! চল্ রে সবে চল্, আজ একবার অন্নপূর্ণার দেহ উৎপাটন ক'রে আসি। দেখি এ শিল্পী আমাদের জন্য কি রেখেছে। আর যদি ফাঁকি হয়, তবে—তবে আবার ফিরে আস্‌ছি। আজ আর ছাড়্‌ছিনি। একটা রফা করতেই হবে, দফা রফা! দফা রফা! (সকলে চীৎকার করিতে করিতে দ্রুতবেগে খাদের দিকে প্রস্থান) দফা রফা···রফা···ফা···া···া···

* * * *

পর্ব্বতসানু (নিম্নে খাদ, এক পার্শ্বে কুটীর)

বিশ্বশিল্পী।—(কুটীরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) আমার সে কোথায় গেল! সেই আমার বন্ধু যাকে সহায় ক'রে এত বড় সংসার গড়ে তুল্‌ছি। বন্ধুও আজ আমায় পরিত্যাগ করিলে? কুটীর খাঁ খাঁ করছে। অনাদি কাল হ'তে আমি ছিলাম—শূন্য! আবার অনন্ত কাল ধরে শূন্য হ'য়ে যাব! যাব! বন্ধু! যাব! তোমার মনস্কামনা আজ সিদ্ধ করব। ওকি, আকাশে ও কিসের ছটা—খনিতে আগুন লাগ্‌ল নাকি?—না, ভুল হয়েছিল, ও দিক্‌প্রান্তে রাঙ্গা মেঘ—ঐ যে মিলিয়ে গেল—যাব! বন্ধু! যাব। তোমার বড় সাধ ছিল আমি এই "বৈকুণ্ঠধাম" ছেড়ে, এই রাজদণ্ড ছেড়ে, হাল হাতে ধরি, আর তুমি কৃষকপত্নীর মত দুপুরবেলা ক্ষেতের আল দিয়ে বাঁশঝাড়ে আমার জন্য একটা কাঁসায় ক'রে শাকান্ন লইয়া আস। বল্‌তে, সখা আমি শিল্পরাণী হ'তে চাই না, আমি সত্যিকার রাণী হব,—তা ঐ কৃষকপত্নী।...আবার দুদিন পরে করলে অন্য আবদার। সে বিষম আবদার! বল্‌লে, ছাড় প্রভু ছাড়, আমাকে পাইলে যে তুমি অন্য কাহাকেও চাহ না। আমি বলিলাম, হৃদয়রাণী! তুমি সর্ব্বস্ব দিয়ে আমার এই শিল্পের মধ্যে বসবাস করছ, তাই আমি শিল্পী। তুমি বিশ্বরূপবিলাসিনী বিশ্বদলবাসিনী। তোমার রসে বিভোর হ'য়েই আমি সৃষ্টিকে রস দান করি। তুমিই সৃষ্টিকে সুষমায় পূর্ণ করিতেছ। সুষমায়······ও আবার কি, এ যে জ্বালা! সৃষ্টি আজ জ্বালামুখী, সহস্র জিহ্বায় জ্বলে উঠেছে! এমন রক্তিম আভা ত কখনও দেখি নাই!—যাক্ যাক্, এখনই নিব্‌বে, আজ অমানিশা······ বন্ধু, তুমি বল্লে "সখা, অন্নপূর্ণার অন্নশক্তি মুদ্রায় পূরিয়া দিয়াছ······ সুষমায় সৃষ্টিকে পূর্ণ করিয়াছ......তাতে সংসারের কুলাইল না। আজ তোমার হৃদয়রাণীকে টুক্‌রা টুক্‌রা ক'রে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে বিলাইয়া দিতে পার, তবেই সৃষ্টি বাঁচে।" আমি হাসিলাম। রাণী রুদ্ধকণ্ঠে বল্‌লে, হাস! হাস! তোমার ঐ সর্ব্বনেশে হাসি ও খেলা! আর কতকাল এ

পাহাড়ের গায়ে "বৈকুণ্ঠধামের" বারন্দা থেকে গভীর নিশীথে আঁধারে ব'সে ব'সে দেখ্‌বে নীচে পাহাড়ের তলদেশে খাদে খাদে সহস্র সহস্র হাপর চুল্লী অগ্নি উদ্‌গীরণ কর্‌ছে ও যে আমার হৃদয়ে চুল্লী জ্বলে! ঐ যে কটাহে কটাহে রসের পাক!—উঃ! তোমার শিল্পের দোহাই আমায় রেহাই দাও! আমিও মানবী, মানবকুলের প্রতিনিধি—আমার স্বগোষ্ঠীতে ফিরে যেতে চাই।"……না না, রাণী আজ তোমার কথায় আমার ঘোর ভেঙ্গেছে! আজ বুঝেছি আমাকে পত্তন পরিবর্ত্তন কর্‌তে হবে। বুঝিবা বৈকুণ্ঠধাম না ছাড়িলে মর্ত্ত্যের পীঠস্থান শূন্য হ'য়ে যায়!……আজ এত দেরী কেন? বন্ধুও কি আমায় ছেড়ে গেল? সে আসে না কেন?

"আমি"র প্রবেশ

আমি।—হাঁ, তাই স্থির করে আমি আজ বাহির হয়েছিলাম কিন্তু বাহিরে যা দেখ্‌লাম তাতে বুঝ্‌লাম, আজ প্রভুর পার্শ্বেই আমার স্থান। আমাকে না হ'লে প্রভুর আজ চল্‌বে না।

বিশ্বশিল্পী।—হাঁ, পাশে এসে দাঁড়াও, আজ তোমাকে সাজাইব। মনের সাধে ঐ বরাঙ্গে যেখানে যে ভূষণটি সাজে, তাই দিয়ে আজ সাজাইব। জানি সৃষ্টি আমাকে ছাড়িলেও রাণী ছাড়িবে না।

আমি।—ছাড় ছাড় প্রভু, আজ আমি সেই সৃষ্টিরই প্রতিনিধি।

বিশ্বশিল্পী।—তুমিও, রাণী!

আমি।—আমিই। আমিই…. পাশে দাঁড়াইয়া আজ প্রভুর ঐ রাজমুকুট ও রাজবেশ ছাড়াইতে আসিয়াছি! আজ প্রভুর সন্ন্যাস!

বিশ্বশিল্পী।—সন্ন্যাস? কেন, আবার নূতন ক'রে ঘট স্থাপনা কর্‌বো। এবার নূতন রস, নূতন রং, নূতন ছাঁদ। সব সৃষ্টিছাড়া সৃষ্টি, সব অনাসৃষ্টি।

আমি।—(স্বগত) এখনও প্রভুর সৃষ্টি করবার মোহ ঘুচ্‌ল না।

(প্রকাশ্যে নীচে ও উপরে চাহিয়া দেখিয়া) দেখ দেখ, জলে স্থলে আকাশে কি একটা আগুন আজ দাউ দাউ ক'রে জ্বল্‌ছে। স্বর্গে মর্ত্ত্যে পাতালে সর্ব্বত্র প্রলয় যেন রণরঙ্গে মেতে উঠেছে। জনমানবের সংঘে সংঘে প্রলয়বার্ত্তা ঘোষিত হচ্ছে, পর্ব্বতশিখর হ'তে পর্ব্বতশিখরে, উপত্যকা হ'তে উপত্যকায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সকল রাষ্ট্রে সকল জাতিতে একটা তুমুল কোলাহল! শোন ঐ প্রলয় ভেরী! মুহুর্মুহু মেদিনী কম্পিত হচ্ছে; আর সংসার পথে যত অতীতের মূর্ত্তিশালা চিত্র কক্ষ......সাহিত্যাগার, যত ধর্ম্মশালা পান্থশালা, দেবালয়, যত বিচারকক্ষ নীতিমার্গ শিক্ষালয়, একে একে ধূলিসাৎ হচ্ছে। যত নরনারীর গৃহ আবাস সংসার প্রতিষ্ঠা সেই সর্ব্বংসহা মাটিতে আশ্রয় নিচ্ছে। আজ স্বামী স্ত্রী, পিতা পুত্র, ভাই ভগিনী, সকল মন্ত্রপূত সংস্কারই নিরর্থক বীজমন্ত্রের ন্যায় শূন্য পথে মিলাইয়া যাইতেছে। অচিরে এক দাবানল সমস্ত সংসার বেড়িয়া জ্বলিবে। আকাশে তার পূর্ব্বাভাস দেখছ না! কি ঘোর রক্তিম আভা!

বিশ্বশিল্পী।—রসের সাগরে এই দাবানল নিবাইব। রসের আয়োজন করিয়াছি, ভয় নাই।

আমি।—প্রভু, এ প্রলয়কে বাধা দেবার শক্তি কোন রসেই নাই। এ মহা দ্রাবক, সকল রসের জারক।

বিশ্বশিল্পী।—এরও তবে একটা রস আছে? ধ্বংসে রস?

আমি।—এ প্রলয়ে যে নূতন সৃষ্টির বীজ। মানুষ, সমাজ, বিশ্বসংসার, সকলই নব কলেবর ধারণ করবে।

বিশ্বশিল্পী।—তবে আমার সৃষ্টির শেষ নেই!

আমি।—এবার মানুষের সৃষ্টি, তুমি এবার সরে পড়, প্রভু!

বিশ্বশিল্পী।—আমি সরি কোথায়? সরি কি ক'রে?

আমি।—ব্রহ্মাণ্ডের লোপ ক'রে। একবার মানুষের সঙ্গে মানুষ হও, বহুর মধ্যে এক, একলা এক নয়। রাজদণ্ড ছাড়, হাল ধর।

বিশ্বশিল্পী।—রাণী, তোমার কি হবে? ব্রহ্ম ছাড়িলে তোমার আশ্রয় কোথায়! তুমি যে আমার বিশ্বরূপবিলাসিনী, রাণী।

আমি।—রসাতলে, পাতালে, যাই—সংসার বাঁচুক!

বিশ্বশিল্পী।—আত্মহত্যা! উঃ আত্মহত্যায় সংসার বাঁচবে!

আমি।—হাঁ, যুগে যুগে মানবকুলে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে "আমি"র সংহার দানলীলা সাধিত হয়েছে, তাই সংসার উদ্ধার পেয়েছে। আমার বেলা আজ ফুরিয়েছে।

বিশ্বশিল্পী।—ঘাতক! ঘাতক! রাণী, আমায় প্রাণে মেরো না।

আমি।—মারবো! মারবো! দুইএর সংহার না হ'লে বহুর উৎপত্তি কোথায়! এতদিন ছিল এক দুই তিন, আজ শুধু এক আর বহু। অন্নপূর্ণার দেহে এবার যুগল রসমূর্ত্তি মিশাইয়া যাবে। অন্নপূর্ণা ও এই অসংখ্য জীবের মাঝে কেহ থাকবে না। এবার তৃতীয় নাই। চল,—পাতালে চল।—

বিশ্বশিল্পী।—না, না, তা আর হবে না। এ কি ভয়ানক! আমার হাতের গড়া ঐ বৈকুণ্ঠের মন্দির আজ ধূলিসাৎ হবে! কত যুগের চেষ্টায়, পরিশ্রমে, যা গড়ে তুলেছি তা কেমন করে ভাঙ্গবো!…ভাঙ্গবো!… ভাঙ্গবো!…আহা কি সুন্দর!…দাঁড়াও, একবার একটু সরে দাঁড়াও…রাণী মন্দির, মন্দির রাণী…আর একটু সরে! আরও—আরও!—দেখি শেষবার …উঃ এতদিন দেখিনি ঐ মন্দিরের চূড়া কি উঁচু—বৈকুণ্ঠের আকাশও ভেদ ক'রে উঠেছে, এ চোখের দৃষ্টি সেখানে যায় না, ফিরে আসে! একটু যেন ঈশান কোণে হেলে পড়েছে না—না,…চোখের ভ্রম……আমার গড়া! আমার! আমার! আমার!! নিজের হাতের গড়া জিনিষ কেমন ক'রে ভাঙ্গবো!…রাণী! রাণী…আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল!…

আমি।—ভাঙ্গো! ভাঙ্গো! ভেঙ্গে ফেল। প্রাণের মায়া ছাড়তে হবে বন্ধু, প্রাণের মায়া ছাড়তে হবে। তোমায় কষ্ট দিলাম বন্ধু, কিন্তু আজ আমি শুধু তোমার হতে পারি না, আজ আমি সবাকার। আজ কলির শেষ দিন! এই কলির রঙ্গমঞ্চে এতদিন দুজনে অভিনয় করেছি; আজ

সখা বিদায়! বিদায়! আজ শুধু ঐ অন্নপূর্ণা অতীতের শবদেহ হ'য়ে সংসারে পড়ে থাক্‌বে। আর সেই শবদেহের উপর জয়োল্লাসে শ্রমজীবীরা তাদের বর্ত্তমান গড়ে তুলবে। অতীত ভবিষ্যৎ কিছুই নাই। শুধু বর্ত্তমান। মা অন্নপূর্ণা, জগৎলক্ষ্মী দ্বিধা হও! সীতা যেমন রঘুপতিকে প্রত্যাখ্যান ক'রে মা বসুন্ধরার দেহে প্রবেশ করেছিল, ..আমিও মাগো! তেমনি তোমার আঁধার গর্ভে প্রবেশ করি! আবার যদি কোথায় কখন কোন দেশে কোন কালে কোনও কৃষকের করুণার উদ্রেক হয়, তবে সেও আমাকে সীতার মতন লাঙ্গলের ফালে তুলবে। এস বন্ধু! শেষবার কোলাকুলি করি। বিদায়! বিদায়! চারিদিক অন্ধকার হ'য়ে গেল। মাটিতে কেবল রক্তস্রোত, আর আকাশে সেই রক্তের রক্তিম আভা। কোথা থেকে রক্তগঙ্গা ছুটে আস্‌ছে। কার রক্ত। আহা আহা বন্ধু আমার। বন্ধু! (অন্ধ খাদে পতন,—পড়িতে পড়িতে) বন্ধু...বন্ধু .. (বিশ্বশিল্পী মূর্চ্ছিত)

শ্রমজীবীগণ।—(কোলাহল করিতে করিতে) এই দিকে, এই দিকে! হা হা হা! কি মজা! কই কই! কই কুড়ুল, কই খোন্তা! আজ... খণ্ড খণ্ড করে এই অন্নপূর্ণার বুক চিরে দেখ্‌ব শিল্পী কি রেখেছে। এই যে...এদিকে...সেই শিল্পী ভয়ে মরে পড়ে আছে। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে, আঃ কাপুরুষ, ভণ্ড! খোঁড়্, খোঁড়্, খোঁড়্, কোটি বাহুর জোরে, কোটি পায়ের দাপে! খোঁড়্, খোঁড়্, খোঁড়্ মেদিনী কাঁপিয়ে খোঁড়্! দেখ্ দেখ্, কত মণি, কত হীরা, কত সোণা! দেখ্‌ছ, সব এখানে লুকিয়ে রেখেছে! কিছু দেয় নাই। আসল মাল লুকিয়ে রেখে কেবল ধানের তুষ আর মেকি টাকা দিয়ে আমাদের প্রাণ কিনে নিতে-ছিল! কম্ চালাক নয়! এতদিন সব ফাঁকি, সব ফাঁকি! আয়, আয়, আজ সবাই এক একটি ক'রে এই মণি মাথায় পরি। শুধু রাজাই কি মুকুট পর্‌বে! আজ আমরাও মুকুট পর্‌বো। আজ সবাই রাজা, সবাই মালেক! কি মজা! কি মজা! হা হা হা! হা হা হা!!

(পরস্পর পরস্পরের কটি বেষ্টন করিয়া চক্রাকারে নৃত্য ও গীত)

(গীত)

কোমর বেঁধে চল্
আজ খুঁড়্‌বো মাটি, তুল্‌বো সোনা,
শুন্‌বো না আর কারো মানা,
চষ্‌লে মাটি ফল্‌বে দানা ;
এ যে অন্নপূর্ণার কল !
(সকলে সমস্বরে,—
পদক্ষেপ করিতে করিতে)
তবে ভাবনা কিসের বল্,
চল্‌রে সবাই চল্,
কোটি কোমর বেঁধে চল্ !
এই রসাতলে ডরাইনিরে,
এতেই মোদের সুখ !
এই ধসার উপর তুল্‌বো গড়ে,
ঘুচবে মোদের দুখ !
ও সেই শিল্পীর রক্তে টীকা প'রে
চল্‌বো ফুলিয়ে বুক্ !
ঘুচ্‌বে মোদের দুখ !

(সমস্বরে) তবে ভাবনা কিসের বল্,
চল্‌রে সবাই চল্,
কোটি কোমর বেঁধে চল্ !
আজ কেইবা রাজা কেইবা রাণী ;
সবাই সমান সবাই ধনী ;
মাটিতে আছে সোনার খনি,
বাহুতে আছে বল্ ।
(সমস্বরে) তবে ভাবনা কিসের বল্,
চলরে সবাই চল্,
কোটি কোমর বেঁধে চল্ !
চল্ অন্নপূর্ণার নাইকো মানা,
মাটি সবার, সবার সোণা,
নাইকো নাইকো মহাজনা,
দুনিয়া কার্ দখল !
(সমস্বরে) তবে ভাবনা কিসের বল্,
চল্‌রে সবাই চল্,
কোটি কোমর বেঁধে চল্ !

দৃশ্য

বিজন প্রান্তর—সূর্য্য অস্তগত। সুদূর পূর্ব্বে পর্ব্বতভূমি, "বৈকুণ্ঠধামে"র পাহাড় আঁধারে আচ্ছন্ন। পশ্চিমে কান্তার, দো-আলোয় ধুধু করিতেছে। কান্তারের দিকে মুখ রাখিয়া লাঙ্গলে ভর দিয়া দণ্ডায়মান এক চাষী, অঙ্গে ও পরিচ্ছদে মাটির দাগ। একপাশে, পরিত্যক্ত মুকুট, রাজদণ্ড ও রাজবেশ।

যবনিকা পতন

শ্রীমতী সরযূবালা দাসগুপ্তা।

সবুজ পত্র

কবির কৈফিয়ৎ

আমরা যে ব্যাপারটাকে বলি জীবলীলা পশ্চিম সমুদ্রের ওপারে তাকেই বলে জীবনসংগ্রাম।

ইহাতে ক্ষতি ছিল না। একটা জিনিষকে আমি যদি বলি নৌকা-চালানো আর তুমি যদি বল দাঁড়-টানা, একটি কাব্যকে আমি যদি বলি রামায়ণ আর তুমি যদি বল রামরাবণের-লড়াই তাহা লইয়া আদালত করিবার দরকার ছিল না।

কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে এই যে, কথাটা ব্যবহার করিতে আমাদের আজকাল লজ্জা বোধ হইতেছে। জীবনটা কেবলই লীলা! এ কথা শুনিলে জগতের সমস্ত পালোয়ানের দলেরা কি বলিবে যাহারা তিনভুবনে কেবলি তাল ঠুকিয়া লড়াই করিয়া বেড়াইতেছে!

আমি কবুল করিতেছি আমার এখানে লজ্জা নাই। ইহাতে আমার ইংরেজি মাষ্টার তাঁর সব চেয়ে বড় শব্দভেদী বাণটা

আমাকে মারিতে পারেন—বলিতে পারেন ওহে, তুমি নেহাৎ ওরিয়েণ্টাল।—কিন্তু তাহাতে আমি মারা পড়িব না।

"লীলা" বলিলে সবটাই বলা হইল আর "লড়াই" বলিলে ল্যাজামুড়া বাদ পড়ে। এ লড়ায়ের আগাই বা কোথায় আর গোড়াই বা কোথায়? ভাঙ-খোর বিধাতার ভাঙের প্রসাদ টানিয়া এ কি হঠাৎ আমাদের একটা মত্ততা? কেনরে বাপু, কিসের জন্যে খামকা লড়াই?

বাঁচিবার জন্য।

আমার না-হক্ বাঁচিবার দরকার কি?

না বাঁচিলে যে মরিবে।

না হয় মরিলাম।

মরিতে যে চাওনা।

কেন চাইনা?

চাওনা বলিয়াই চাওনা।

এই জবাবটাকে এক কথায় বলিতে গেলে বলিতে হয় লীলা। জীবনের মধ্যে বাঁচিবার একটা অহেতুক ইচ্ছা আছে। সেই ইচ্ছাটাই চরম কথা। সেইটে আছে বলিয়াই আমরা লড়াই করি, দুঃখকে মানিয়া লই। সমস্ত জোরজবরদস্তির সবশেষে একটা খুসি আছে—তার ওদিকে আর যাইবার জো নাই, দরকারও নাই। সতরঞ্চ খেলার আগাগোড়াই খেলা,—মাঝখানে দাবাবড়ে চালাচালি এবং মহাভাবনা। সেই দুঃখ না থাকিলে খেলার কোনো অর্থই থাকে না। অপর পক্ষে, খেলার আনন্দ না থাকিলে দুঃখের মত এমন নিদারুণ নিরর্থকতা আর কিছু নাই। এমন স্থলে

সতরঞ্চকে আমি যদি বলি খেলা আর তুমি যদি বল দাবাবড়ের লড়াই তবে তুমি আমার চেয়ে কম বই যে বেশি বলিলে এমন কথা আমি মানিব না।

কিন্তু এ সব কথা বলা কেন? জীবনটা কিম্বা জগৎটা যে লীলা এ কথা শুনিতে পাইলেই যে মানুষ একদম কাজকর্ম্মে ঢিল দিয়া বসিবে।

এই কথাটা শোনা-না-শোনার উপরই যদি মানুষের কাজ করা-না-করা নির্ভর করিত তবে যিনি বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন গোড়ায় তাঁরি মুখ বন্ধ করিয়া দিতে হয়। সামান্য কবির উপরে রাগ করায় বাহাদুরি নাই।

কেন, সৃষ্টিকর্ত্তা বলেন কি?

তিনি আর যাই বলুন লড়াইয়ের কথাটা যত পারেন চাপা দেন। মানুষের বিজ্ঞান বলিতেছে জগৎ জুড়িয়া অণুতে পরমাণুতে লড়াই। কিন্তু আমরা যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে তাকাইয়া দেখি সেই যুদ্ধ-ব্যাপার ফুল হইয়া ফোটে, তারা হইয়া জ্বলে, নদী হইয়া চলে, মেঘ হইয়া ওড়ে। সমস্তটার দিকে সমগ্রভাবে যখন দেখি তখন দেখি ভূমার ক্ষেত্রে সুরের সঙ্গে সুরের মিল, রেখার সঙ্গে রেখার যোগ, রঙের সঙ্গে রঙের মালাবদল। বিজ্ঞান সেই সমগ্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দলাদলি ঠেলাঠেলি হানাহানি দেখিতে পায়। সেই অবচ্ছিন্ন সত্য বিজ্ঞানের সত্য হইতে পারে কিন্তু তাহা কবির সত্যও নহে কবিগুরুর সত্যও নয়।

অন্য কবির কথা রাখিয়া দাও, তুমি নিজের হইয়া বল।

আচ্ছা ভাল। তোমাদের নালিশ এই যে, খেলা, ছুটি, আনন্দ,

এই সব কথা আমার কাব্যে বারবার আসিয়া পড়িতেছে। কথাটা যদি ঠিক হয় তবে বুঝিতে হইবে একটা কোনো সত্যে আমাকে পাইয়াছে। তার হাত আমার আর এড়াইবার জো নাই। অতএব এখন হইতে আমি বিধাতার মতই বেহায়া হইয়া এক কথা হাজার বার বলিব। যদি আমাকে বানাইয়া বলিতে হইত তবে ফি বারে নূতন কথা না বলিলে লজ্জা হইত। কিন্তু সত্যের লজ্জা নাই, ভয় নাই, ভাবনা নাই। সে নিজেকেই প্রকাশ করে; নিজেকেই প্রকাশ করা ছাড়া তার আর গতি নাই, এই জন্যই সে বেপরোয়া।

এটা যেন তোমার অহঙ্কারের মত শোনাইতেছে।

সত্যের দোহাই দিয়া নিন্দা করিলে যদি দোষ না হয় তবে সত্যের দোহাই দিয়া অহঙ্কার করিলেও দোষ নাই। অতএব এখানে তোমাতে আমাতে শোধ বোধ হইল।

বাজে কথা আসিল। যে কথা লইয়া তর্ক হইতেছিল, সেটা—

সেটা এই যে, জগতে শক্তির লড়াইটাকেই প্রধান করিয়া দেখা অবচ্ছিন্ন দেখা,—অর্থাৎ গানকে বাদ দিয়া সুরের কসরৎকে দেখা। আনন্দকে দেখাই সম্পূর্ণকে দেখা। এ কথা আমাদেরই দেশের সব চেয়ে বড় কথা। উপনিষদের চরম কথাটি এই যে, আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি। আনন্দ হতেই সমস্ত উৎপন্ন হয়, সমস্ত বাঁচে, আনন্দের দিকেই সমস্ত চলে।

এই যদি উপনিষদের চরম কথা হয় তবে কি ঋষি বলিতে চান জগতে পাপ নাই, দুঃখ নাই, রেষারেষি নাই? আমরা ত

ঐ গুলোর উপরেই বেশি করিয়া জোর দিতে চাই নহিলে মানুষের চেতনা হইবে কেমন করিয়া?

উপনিষৎ ইহার উত্তর দিয়াছেন, কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। কেইবা শরীরের চেষ্টা প্রাণের চেষ্টা করিত (অর্থাৎ কেইবা দুঃখধন্দা লেশমাত্র স্বীকার করিত) আনন্দ যদি আকাশ ভরিয়া না থাকিত। অর্থাৎ আনন্দই শেষ কথা বলিয়াই জগৎ দুঃখদ্বন্দ্ব সহিতে পারে। শুধু তাই নয়, দুঃখের পরিমাপেই আনন্দের পরিমাপ। আমরা প্রেমকে ততখানিই সত্য জানি যতখানি সে দুঃখ বহন করে। অতএব দুঃখ ত আছেই কিন্তু তাহার উপরে আনন্দ আছে বলিয়াই সে আছে। নহিলে কিছুই থাকিত না, হানাহানি মারামারিও না। তোমরা যখন দুঃখকেই স্বীকার কর তখন আনন্দকে বাদ দাও কিন্তু আনন্দকে স্বীকার করিলে দুঃখকে বাদ দেওয়া হয় না। অতএব তোমরা যখন বল হানাহানি করিতে করিতে যাহা টিঁকিল তাহাই সৃষ্টি সেটা একটা অবচ্ছিন্ন কথা, ইংরেজিতে যাকে বলে অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্‌শন্‌, —আর আনন্দ হইতেই সমস্ত হইতেছে ও টিকিতেছে এইটেই হইল পূরা সত্য।

আচ্ছা, তোমার কথাই মানিয়া লইলাম, কিন্তু এটা ত একটা তত্ত্বজ্ঞানের কথা। সংসারের কাজে ইহার দাম কি?

সে জবাবদিহি কবির নয়, এমন কি, বৈজ্ঞানিকেরও নয়। কিন্তু যে রকম দিনকাল পড়িয়াছে কবিদের মত সংসারের নেহাৎ অনাবশ্যক লোকেরও হিসাবনিকাশের দায় এড়াইয়া চলিবার জো নাই। আমাদের দেশের অলঙ্কারশাস্ত্রে রসকে চিরদিন অহেতুক

অনির্ব্বচনীয় বলিয়া আসিয়াছে, সুতরাং যারা রসের কারবারী তাহাদিগকে এদেশে প্রয়োজনের হাটের মাশুল দিতে হয় নাই। কিন্তু শুনিতে পাই পশ্চিমের কোনো কোনো নামজাদা পাকা লোক রসকে কাব্যের চরম পদার্থ বলিয়া মানিতে রাজি নন, রসের তলায় কোনো তলানি পড়ে কি না সেইটে দেখিয়া নিক্তিতে মাপিয়া তাঁরা কাব্যের দাম ঠিক করিতে চান। সুতরাং কোনো কথাতেই অনির্ব্বচনীয়তার দোহাই দিতে গেলে আজকাল আমাদের দেশেও লোকে সেকেলে এবং ওরিয়েণ্টাল বলিয়া নিন্দা করিতে পারে। সে নিন্দা অসহ্য নয় তবু কাজের লোকদিগকে যতটুকু খুসি করিতে পারা যায় চেষ্টা করা ভাল। যদিচ আমি কবি মাত্র তবুও এ সম্বন্ধে আমার বুদ্ধিতে যা আসে তা একটু গোড়ার দিক হইতে বলিতে চাই।

জগতে সৎ চিৎ ও আনন্দের প্রকাশকে আমরা জ্ঞানের ল্যাবরেটরিতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিতে পারি কিন্তু তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া নাই। কাষ্ঠ বস্তু গাছ নয়, তার রস টানিবার ও প্রাণ ধরিবার শক্তিও গাছ নয়; বস্তু ও শক্তিকে একটি সমগ্রতার মধ্যে আবৃত করিয়া যে একটি অখণ্ড প্রকাশ তাহাই গাছ—তাহা একই কালে বস্তুময়, শক্তিময়, সৌন্দর্য্যময়। গাছ আমাদিগকে যে আনন্দ দেয় সে এই জন্যই। এই জন্যই গাছ বিশ্বপৃথিবীর ঐশ্বর্য্য। গাছের মধ্যে ছুটির সঙ্গে কাজের, কাজের সঙ্গে খেলার কোনো বিচ্ছেদ নাই। এই জন্যেই গাছপালার মধ্যে চিত্ত এমন বিরাম পায়—ছুটির সত্য রূপটি দেখিতে পায়। সে রূপ কাজের বিরুদ্ধ রূপ নয়। বস্তুত তাহা কাজেরই সম্পূর্ণ রূপ। এই কাজের

সম্পূর্ণ রূপটিই আনন্দ রূপ, সৌন্দর্য্য রূপ। তাহা কাজ বটে কিন্তু তাহা লীলা, কারণ তাহার কাজ ও বিশ্রাম এক সঙ্গেই আছে।

সৃষ্টির সমগ্রতার ধারাটা মানুষের মধ্যে আসিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া গেছে। তার প্রধান কারণ, মানুষের নিজের একটা ইচ্ছা আছে জগতের লীলার সঙ্গে সে সমান তালে চলে না। বিশ্বের তালটা সে আজও সম্পূর্ণ কায়দা করিতে পারিল না। কথায় কথায় তাল কাটিয়া যায়। এই জন্য নিজের সৃষ্টিকে সে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ছোট ছোট গণ্ডীর মধ্যে তাহাকে কোনো প্রকারে তালে বাঁধিয়া লইতে চায়। কিন্তু তাহাতে পূরা সঙ্গীতের রস ভাঙিয়া যায় এবং সেই টুক্‌রাগুলার মধ্যেও তাল রক্ষা হয় না। ইহাতে মানুষের প্রায় সকল কাজেই যোঝাযুঝিটাই সবচেয়ে প্রকাশ পাইতে থাকে।

একটা দৃষ্টান্ত ছেলেদের শিক্ষা। মানবসন্তানের পক্ষে এমন নিদারুণ দুঃখ আর কিছুই নাই। পাখী উড়িতে শেখে, মা বাপের গান শুনিয়া গান অভ্যাস করে, সেটা তার জীবলীলার অঙ্গ—বিদ্যার সঙ্গে প্রাণের ও মনের প্রাণান্তিক লড়াই নয়। সে শিক্ষা আগাগোড়াই ছুটির দিনের শিক্ষা, তাহা খেলার বেশে কাজ। গুরুমশায় এবং পাঠশালা কি জিনিষ ছিল একবার ভাবিয়া দেখ। মানুষের ঘরে শিশু হইয়া জন্মানো যেন এমন অপরাধ যে বিশ বছর ধরিয়া তার শাস্তি পাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে কোন তর্ক না করিয়া আমি কেবলমাত্র কবিত্বের জোরেই বলিব এটা বিষম গলদ। কেননা সৃষ্টিকর্ত্তার মহলে বিশ্বকর্ম্মার দলবল জগৎ জুড়িয়া গান গাহিতেছে—

মোদের, যেমন খেলা তেম্‌নি যে কাজ জানিস্‌নে কি ভাই ?

একদিন নীতিবিৎরা বলিয়াছিল, লালনে বহবো দোষাস্তাড়নে বহবো গুণাঃ। বেত বাঁচাইলে ছেলে মাটি করা হয় একথা সুপ্রসিদ্ধ ছিল। অথচ আজ দেখিতেছি শিক্ষার মধ্যে বিশ্বের আনন্দসুর ক্রমে লাগিতেছে—সেখানে বাঁশের জায়গা ক্রমেই বাঁশি দখল করিল।

আর একটা দৃষ্টান্ত দেখাই। বিলাত হইতে জাহাজে করিয়া যখন দেশে ফিরিতেছিলাম দুই জন মিশনারি আমার পাছু ধরিয়াছিল। তাহাদের মুখ হইতে আমার দেশের নিন্দায় সমুদ্রের হাওয়া পর্য্যন্ত দূষিয়া উঠিল। কিন্তু তাহারা নিজের স্বার্থ ভুলিয়া আমার দেশের লোকের যে কত অবিশ্রাম উপকার করিতেছে তাহার লম্বা ফর্দ্দ আমার কাছে দাখিল করিত। তাহাদের ফর্দ্দটি জাল ফর্দ্দ নয় অঙ্কেও ভুল নাই। তাহারা সত্যই আমাদের উপকার করে কিন্তু সেটার মত নিষ্ঠুর অন্যায় আমাদের প্রতি আর কিছুই হইতে পারে না। তার চেয়ে আমাদের পাড়ায় গুর্খাফৌজ লাগাইয়া দেওয়াই ভাল। আমি এই কথা বলি কর্ত্তব্যনীতি যেখানে কর্ত্তব্যের মধ্যেই বদ্ধ অর্থাৎ যেখানে তাহা অ্যাব্‌ষ্ট্র্যাক্‌শন্‌ সেখানে সজীব প্রাণীর প্রতি তাহার প্রয়োগ অপরাধ। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রে বলে শ্রদ্ধয়া দেয়ং। কেননা দানের সঙ্গে শ্রদ্ধা বা প্রেম মিলিলে তবেই তাহা সুন্দর ও সমগ্র হয়।

কিন্তু এমনি আমাদের অভ্যাস কদর্য্য হইয়াছে যে, আমরা নির্লজ্জের মত বলিতে পারি যে, কর্ত্তব্যের সরস না হইলেও চলে, এমন কি, না হইলে ভাল চলে। লড়াই, লড়াই, লড়াই!

আমাদিগকে বড়াই করিতে হইবে যে আনন্দকে অবজ্ঞা করি আমরা এম্‌নি বাহাদুর! চন্দন মাখিতে আমাদের লজ্জা, তাই রাই-শরিষার বেলেস্তারা মাখিয়া আমরা দাপাদাপি করি। আমার লজ্জা ঐ বেলেস্তারাটাকে।

আসলে, মানুষের গলদটা এইখানে যে, পনেরোআনা লোক ঠিক নিজেকে প্রকাশ করিতে পায় না। অথচ নিজের পূর্ণ প্রকাশেই আনন্দ। গুণী যেখানে গুণী সেখানে তার কাজ যতই কঠিন হোক্ সেখানেই তার আনন্দ, মা যেখানে মা, সেখানে তার ঝঞ্ঝাট যত বেশিই হোক্ না সেখানেই তার আনন্দ। কেননা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যথার্থ আনন্দই সমস্ত দুঃখকে শিবের বিষপানের মত অনায়াসে আত্মসাৎ করিতে পারে। তাই কার্লাইল প্রতিভাকে উল্টাদিক দিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন অসীম দুঃখ স্বীকার করিবার শক্তিকেই বলে প্রতিভা।

কিন্তু মানুষ যে কাজ করে তার অধিকাংশই নিজেকে প্রকাশের জন্য নয়। সে, হয় নিজের মনিবকে, নয় কোনো প্রবল পক্ষকে, নয় কোনো বাঁধা দস্তুরের কর্ম্মপ্রণালীকে পেটের দায়ে বা পিঠের দায়ে প্রকাশ করে। পনেরোআনা মানুষের কাজ অন্যের কাজ। জোর করিয়া মানুষ নিজেকে আর কেহ কিম্বা আর কিছুর মত করিতে বাধ্য। চীনের মেয়ের জুতা তার পায়ের মত নহে, তার পা তার জুতার মত। কাজেই পাকে দুঃখ পাইতে হয় এবং কুৎসিত হইতে হয়। কিন্তু এমনতর কুৎসিত হইবার মস্ত সুবিধা এই যে, সকলেরই সমান কুৎসিত হওয়া সহজ। বিধাতা সকলকে সমান করেন নাই, কিন্তু নীতিতত্ত্ববিৎ

যদি সকলকেই সমান করিতে চায় তবে ত লড়াই ছাড়া কৃচ্ছ্র-সাধন ছাড়া কুৎসিত হওয়া ছাড়া আর কথা নাই।

সকল মানুষকেই রাজার, সমাজের, পরিবারের, মনিবের দাসত্ব করিতে হইতেছে। কেমন গোলমালে দায়ে পড়িয়া এই রকমটা ঘটিয়াছে। এই জন্যই লীলা কথাটাকে আমরা চাপা দিতে চাই। আমরা বুক ফুলাইয়া বলি, জিন-লাগাম পরিয়া ছুটিতে ছুটিতে রাস্তায় মুখ থুবড়াইয়া মরাই মানুষের পরম গৌরব। এ সমস্ত দাসের জাতির দাসত্বের বড়াই। এমনি করিয়া দাসত্বের মন্ত্র আমাদের কানে আওড়ানো হয় পাছে এক মুহূর্ত্তের জন্য আমাদের আত্মা আত্মগৌরবে সচেতন হইয়া উঠে। না, আমরা ঠ্যাক্‌রা গাড়ির ঘোড়ার মত লাগাম-বাঁধা মরিবার জন্য জন্মাই নাই। আমরা রাজার মত বাঁচিব, রাজার মত মরিব।

আমাদের সব চেয়ে বড় প্রার্থনা এই যে, আবিরাবীর্ম্মএধি। হে আবি, তুমি আমার মধ্যে প্রকাশিত হও। তুমি পরিপূর্ণ, তুমি আনন্দ। তোমার রূপই আনন্দরূপ। সেই আনন্দরূপ গাছের চ্যালা কাঠ নহে তাহা গাছ, তার মধ্যে হওয়া এবং করা একই।

আমার কথার জবাবে এ কথা বলা চলে যে, আনন্দরূপ মানুষের মধ্যে একবার ভাঙচুরের মধ্যে দিয়া তবে আবার আপনার অখণ্ড পরিপূর্ণতা লাভ করিতে পারিবে। যতদিন তা না হয় ততদিন লড়াইয়ের মন্ত্র দিনরাত জপিতে হইবে। ততদিন লাগাম পরিয়া মুখ থুবড়িয়া মরিতে হইবে। ততদিন ইস্কুলে আফিসে আদালতে হাটে বাজারে কেবলি নরমেধ যজ্ঞ চলিতে থাকিবে। সেই বলির পশুদের কানে বলিদানের

ঢাক ঢোলই খুব উচ্চৈস্বরে বাজাইয়া তাহাদের বুদ্ধিকে ঘুলাইয়া দেওয়া ভাল—বলা ভাল এই হাড়কাঠই পরম দেবতা, এই খড়গাঘাতই আশীর্ব্বাদ—আর জল্লাদই আমাদের ত্রাণকর্ত্তা।

তা হোক্, বলিদানের ঢাক ঢোল বাজুক আফিসে, বাজুক আদালতে—বাজুক বন্দীদের শিকলের ঝঙ্কারের সঙ্গে তাল রাখিয়া। মরুক সকলে গলদ্ঘর্ম্ম হইয়া শুষ্কতালু লইয়া লাগাম কামড়াইয়া রাস্তার ধূলার উপরে। কিন্তু কবির বীণায় বরাবর বাজিবে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে—কবির ছন্দে এই মন্ত্রের উচ্চারণ শেষ হইবে না—Truth is beauty, beauty truth—ইহাতে আফিস আদালত কলেজ লাঠি হাতে তাড়া করিয়া আসিলেও সকল কোলাহলের উপরেও এই সুর বাজিবে—সমুদ্রের সঙ্গে, অরণ্যের সঙ্গে, আকাশের আলোক-বীণার সঙ্গে সুর মিলাইয়া বাজিবে—আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি—যাহা কিছু সমস্তই পরিপূর্ণ আনন্দের দিকেই চলিয়াছে, ধুঁকিতে ধুঁকিতে রাস্তার ধূলার উপরে মুখ থুবড়াইয়া মরিবার দিকে নহে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঘরে-বাইরে

৩

রাত্রের সঙ্গে দিনের যে তফাৎ সেটাকে যদি ঠিক হিসাবমত ক্রমে ক্রমে ঘোচাতে হত তাহলে সে কি কোনো যুগে ঘুচত? কিন্তু সূর্য্য উঠে পড়ে, অন্ধকার চুকে যায়, অসীম কালের হিসাব মুহূর্ত্তকালে মেটে।

বাংলা দেশে একদিন স্বদেশীর যুগ এসেছিল—কিন্তু সে যে কেমন করে তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। তার আগেকার সঙ্গে এ যুগের মাঝখানকার ক্রম যেন নেই। বোধ করি সেই জন্যেই নূতন যুগ একেবারে বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত আমাদের ভয় ভাবনা চোখের পলকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। কি হল কি হবে তা বোঝবার সময় পাইনি।

পাড়ায় বর আস্‌চে, তার বাঁশি বাজ্‌চে, তার আলো দেখা দিয়েছে, অমনি মেয়েরা যেমন ছাতে বারান্দায় জানলায় বেরিয়ে পড়ে, তাদের আবরণের দিকে আর মন থাকে না, তেমনি সেদিন সমস্ত দেশের বর আসবার বাঁশি যেমনি শোনা গেল মেয়েরা কি আর ঘরের কাজ নিয়ে চুপ করে বসে থাক্‌তে পারে? হুলু দিতে দিতে শাঁক বাজাতে বাজাতে, তারা যেখানে দরজা জানলা দেয়ালের ফাঁক পেলে সেইখানেই মুখ বাড়িয়ে দিলে।

সেদিন আমারও দৃষ্টি এবং চিত্ত, আশা এবং ইচ্ছা উন্মত্ত নবযুগের আবীরে লাল হয়ে উঠেছিল। এতদিন মন যে জগৎটাকে একান্ত বলে জেনেছিল এবং জীবনের ধর্ম্মকর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা

যে সীমাটুকুর মধ্যে বেশ গুছিয়ে সাজিয়ে সুন্দর করিয়ে তোলবার কাজে প্রতিদিন লেগেছিল সেদিনও তার বেড়া ভাঙেনি বটে কিন্তু সেই বেড়ার উপরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যে একটি দূর দিগন্তের ডাক শুনলুম স্পষ্ট তার মানে বুঝতে পারলুম না কিন্তু মন উতলা হয়ে গেল।

আমার স্বামী যখন কলেজে পড়তেন তখন থেকেই তিনি দেশের প্রয়োজনের জিনিষ দেশেই উৎপন্ন করবেন বলে নানা রকম চেষ্টা করছিলেন। আমাদের জেলায় খেজুর গাছ অজস্র—কি করে অনেক গাছ থেকে একটি নলের সাহায্যে একসঙ্গে একজায়গায় রস আদায় করে সেইখানেই জ্বাল দিয়ে সহজে চিনি করা যেতে পারে সেই চেষ্টায় তিনি অনেক দিন কাটালেন। শুনেছি উপায় খুব সুন্দর উদ্ভাবন হয়েছিল, কিন্তু তাতে রসের তুলনায় টাকা এত বেশি গলে' পড়তে লাগ্‌ল যে কারবার টিঁক্‌ল না। চাষের কাজে নানারকম পরীক্ষা করে তিনি যে সব ফসল ফলিয়েছিলেন সে অতি আশ্চর্য্য কিন্তু তাতে যে টাকা খরচ করেছিলেন সে আরো বেশি আশ্চর্য্য। তাঁর মনে হল আমাদের দেশে বড় বড় কারবার যে সম্ভবপর হয় না তার প্রধান কারণ আমাদের ব্যাঙ্ক নেই। সেই সময়ে তিনি আমাকে পোলিটিক্যাল ইকনমি পড়াতে লাগ্‌লেন। তাতে কোনো ক্ষতি ছিল না। কিন্তু তাঁর মনে হল, সব প্রথমে দরকার ব্যাঙ্কে টাকা সঞ্চয় করবার অভ্যাস ও ইচ্ছা আমাদের জনসাধারণের মনে সঞ্চার করে দেওয়া। একটা ছোট গোছের ব্যাঙ্ক খুল্লেন। ব্যাঙ্কে টাকা জমাবার উৎসাহ গ্রামের লোকের খুব জেগে উঠ্‌ল, কারণ সুদের হার খুব চড়া ছিল।

কিন্তু যে কারণে লোকের উৎসাহ বাড়তে লাগ্‌ল সেই কারণেই ঐ মোটা সুদের ছিদ্র দিয়ে ব্যাঙ্ক গেল তলিয়ে। এই সকল কাণ্ড দেখে তাঁর পুরাতন আমলারা অত্যন্ত বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্‌ত। শত্রুপক্ষ ঠাট্টা বিদ্রূপ করত। আমার বড় জা একদিন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্লেন, তাঁর বিখ্যাত উকীল খুড়তত ভাই তাঁকে বলেচেন যদি জজের কাছে দরবার করা যায় তবে এই পাগলের হাত থেকে এই বনেদিবংশের মানসম্ভ্রম বিষয়-সম্পত্তি এখনো রক্ষা হবার উপায় হতে পারে।

সমস্ত পরিবারের মধ্যে কেবল আমার দিদিশাশুড়ির মনে বিকার ছিল না। তিনি আমাকে ডেকে কতবার ভর্ৎসনা করেচেন, বলেচেন, কেন তোরা ওকে সবাই মিলে বিরক্ত করচিস্! বিষয় সম্পত্তির কথা ভাবচিস্? আমার বয়সে আমি তিনবার এ সম্পত্তি রিসীভরের হাতে যেতে দেখেচি। পুরুষেরা কি মেয়ে মানুষের মত? ওরা যে উড়নচণ্ডী, ওরা ওড়াতেই জানে। নাত বৌ, তোর কপাল ভাল, যে, সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেও উড়চে না। দুঃখ পাসনি বলেই সে কথা মনে থাকে না।

আমার স্বামীর দানের লিষ্ট্‌ ছিল খুব লম্বা। তাঁতের কল, কিম্বা ধানভানার যন্ত্র কিম্বা ঐ রকম একটা-কিছু যে কেউ তৈরি করবার চেষ্টা করেচে তাকে তার শেষ নিষ্ফলতা পর্য্যন্ত তিনি সাহায্য করেচেন। বিলিতি কম্পানির সঙ্গে টক্কর দিয়ে পুরী যাত্রার জাহাজ চালাবার স্বদেশী কম্পানি উঠ্‌ল; তার একখানা জাহাজও ভাসে নি কিন্তু আমার স্বামীর অনেকগুলি কোম্পানির কাগজ ডুবেচে।

সব চেয়ে আমার বিরক্ত লাগত সন্দীপবাবু যখন দেশের নানা উপকারের ছুতোয় তাঁর টাকা শুষে নিতেন। তিনি খবরের কাগজ চালাবেন, স্বাদেশিকতা প্রচার করতে যাবেন, ডাক্তারের পরামর্শমতে তাঁকে কিছুদিনের জন্যে উটকামন্দে যেতে হবে, নির্ব্বিচারে আমার স্বামী তার খরচ জুগিয়েচেন। এ ছাড়া সংসার খরচের জন্য নিয়মিত তাঁর মাসিক বরাদ্দ আছে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর যে মতের মিল আছে তাও নয়। আমার স্বামী বলতেন দেশের খনিতে যে পণ্যদ্রব্য আছে তাকে উদ্ধার করতে না পারলে যেমন দেশের দারিদ্র্য, তেমনি দেশের চিত্তে যেখানে শক্তির রত্নখনি আছে তাকে যদি আবিষ্কার এবং স্বীকার না করা যায় তবে সে দারিদ্র্য আরো গুরুতর। আমি তাঁকে একদিন রাগ করে বলেছিলুম এরা তোমাকে সবাই ফাঁকি দিচ্চে—তিনি হেসে বল্লেন, আমার গুণ নেই অথচ কেবলমাত্র টাকা দিয়ে গুণের অংশীদার হচ্চি—আমিই ত ফাঁকি দিয়ে লাভ করে নিলুম।

এই পূর্ব্বযুগের পরিচয় কিছু বলে রাখা গেল নইলে নব যুগের নাট্যটা স্পষ্ট বুঝা যাবে না।

এই যুগের তুফান যেই আমার রক্তে লাগ্‌ল আমি প্রথমেই স্বামীকে বল্লুম বিলিতি জিনিষে তৈরি আমার সমস্ত পোষাক পুড়িয়ে ফেলব। স্বামী বল্লেন, পোড়াবে কেন? যতদিন খুসী ব্যবহার না করলেই হবে।

কী তুমি বলচ যতদিন খুসী! ইহজীবনে আমি কখনো—

কিন্তু যে কারণে লোকের উৎসাহ বাড়তে লাগ্‌ল সেই কারণেই ঐ মোটা সুদের ছিদ্র দিয়ে ব্যাঙ্ক গেল তলিয়ে। এই সকল কাণ্ড দেখে তাঁর পুরাতন আমলারা অত্যন্ত বিরক্ত ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্‌ত। শত্রুপক্ষ ঠাট্টা বিদ্রূপ করত। আমার বড় জা একদিন আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বল্লেন, তাঁর বিখ্যাত উকীল খুড়তত ভাই তাঁকে বলেচেন যদি জজের কাছে দরবার করা যায় তবে এই পাগলের হাত থেকে এই বনেদিবংশের মানসম্ভ্রম বিষয়-সম্পত্তি এখনো রক্ষা হবার উপায় হতে পারে।

সমস্ত পরিবারের মধ্যে কেবল আমার দিদিশাশুড়ির মনে বিকার ছিল না। তিনি আমাকে ডেকে কতবার ভর্ৎসনা করেচেন, বলেচেন, কেন তোরা ওকে সবাই মিলে বিরক্ত করচিস্! বিষয় সম্পত্তির কথা ভাবচিস্? আমার বয়সে আমি তিনবার এ সম্পত্তি রিসীভরের হাতে যেতে দেখেচি। পুরুষেরা কি মেয়ে মানুষের মত? ওরা যে উড়নচণ্ডী, ওরা ওড়াতেই জানে। নাত বৌ, তোর কপাল ভাল, যে, সঙ্গে সঙ্গে ও নিজেও উড়চে না। দুঃখ পাসনি বলেই সে কথা মনে থাকে না।

আমার স্বামীর দানের লিষ্ট্ ছিল খুব লম্বা। তাঁতের কল, কিম্বা ধানভানার যন্ত্র কিম্বা ঐ রকম একটা-কিছু যে কেউ তৈরি করবার চেষ্টা করেচে তাকে তার শেষ নিষ্ফলতা পর্য্যন্ত তিনি সাহায্য করেচেন। বিলিতি কম্পানির সঙ্গে টক্কর দিয়ে পুরী যাত্রার জাহাজ চালাবার স্বদেশী কম্পানি উঠ্‌ল; তার একখানা জাহাজও ভাসে নি কিন্তু আমার স্বামীর অনেকগুলি কোম্পানির কাগজ ডুবেচে।

সব চেয়ে আমার বিরক্ত লাগত সন্দীপবাবু যখন দেশের নানা উপকারের ছুতোয় তাঁর টাকা শুষে নিতেন। তিনি খবরের কাগজ চালাবেন, স্বাদেশিকতা প্রচার করতে যাবেন, ডাক্তারের পরামর্শমতে তাঁকে কিছুদিনের জন্যে উটকামন্দে যেতে হবে, নির্ব্বিচারে আমার স্বামী তার খরচ জুগিয়েচেন। এ ছাড়া সংসার খরচের জন্য নিয়মিত তাঁর মাসিক বরাদ্দ আছে। অথচ আশ্চর্য্য এই যে, আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর যে মতের মিল আছে তাও নয়। আমার স্বামী বল্‌তেন দেশের খনিতে যে পণ্যদ্রব্য আছে তাকে উদ্ধার করতে না পারলে যেমন দেশের দারিদ্র্য, তেমনি দেশের চিত্তে যেখানে শক্তির রত্নখনি আছে তাকে যদি আবিষ্কার এবং স্বীকার না করা যায় তবে সে দারিদ্র্য আরো গুরুতর। আমি তাঁকে একদিন রাগ করে বলেছিলুম এরা তোমাকে সবাই ফাঁকি দিচ্চে—তিনি হেসে বল্লেন, আমার গুণ নেই অথচ কেবলমাত্র টাকা দিয়ে গুণের অংশীদার হচ্চি—আমিই ত ফাঁকি দিয়ে লাভ করে নিলুম।

এই পূর্ব্বযুগের পরিচয় কিছু বলে রাখা গেল নইলে নব যুগের নাট্যটা স্পষ্ট বুঝা যাবে না।

এই যুগের তুফান যেই আমার রক্তে লাগ্‌ল আমি প্রথমেই স্বামীকে বল্লুম বিলিতি জিনিষে তৈরি আমার সমস্ত পোষাক পুড়িয়ে ফেলব। স্বামী বল্লেন, পোড়াবে কেন? যতদিন খুসী ব্যবহার না করলেই হবে।

কী তুমি বল্‌চ যতদিন খুসী! ইহজীবনে আমি কখনো—

বেশ ত ইহজীবনে তুমি না হয় ব্যবহার করবে না। ঘটা করে নাই পোড়ালে!

কেন এতে তুমি বাধা দিচ্চ?

আমি বল্‌চি গ'ড়ে তোলবার কাজে তোমার সমস্ত শক্তি দাও, অনাবশ্যক ভেঙে ফেলবার উত্তেজনায় তার শিকি পয়সা বাজে খরচ করতে নেই।

এই উত্তেজনাতেই গড়ে তোলবার সাহায্য হয়।

তাই যদি বল তবে বল্‌তে হয় ঘরে আগুন না লাগালে ঘর আলো করা যায় না। আমি প্রদীপ জ্বালবার হাজার ঝঞ্ঝাট পোয়াতে রাজি আছি কিন্তু তাড়াতাড়ি সুবিধের জন্যে ঘরে আগুন লাগাতে রাজি নই। ওটা দেখ্‌তেই বাহাদুরী কিন্তু আসলে দুর্ব্বলতার গোঁজামিলন।

আমার স্বামী বল্লেন, দেখ, বুঝচি আমার কথা আজ তোমার মনে নিচ্চে না, তবু আমি এ কথাটি তোমাকে বলচি ভেবে দেখো। মা যেমন নিজের গয়না দিয়ে তার প্রত্যেক মেয়েকে সাজিয়ে দেয়, আজ তেমনি এমন একটা দিন এসেছে যখন সমস্ত পৃথিবী প্রত্যেক দেশকে আপন গয়না দিয়ে সাজিয়ে দিচ্চে। আজ আমাদের খাওয়াপরা চলাফেরা ভাবাচিন্তা সমস্তই সমস্ত-পৃথিবীর যোগে। আমি তাই মনে করি এটা প্রত্যেক জাতিরই সৌভাগ্যের যুগ—এই সৌভাগ্যকে অস্বীকার করা বীরত্ব নয়।

তার পরে আর এক ল্যাঠা। মিস্ গিল্‌বি যখন আমাদের অন্তঃপুরে এসেছিল তখন তাই নিয়ে কিছুদিন খুব গোলমাল চলেছিল। তার পরে অভ্যাসক্রমে সেটা চাপা পড়ে গেছে।

আবার সমস্ত ঘুলিয়ে উঠ্‌ল। মিস্ গিল্‌বি ইংরেজ কি বাঙালী অনেকদিন সে কথা আমারও মনে হয় নি—কিন্তু মনে হতে সুরু হল। আমি স্বামীকে বল্লুম, মিস্ গিল্‌বিকে ছাড়িয়ে দিতে হবে। স্বামী চুপ করে রইলেন। আমি সেদিন তাঁকে যা মুখে এল বলেছিলুম তিনি ম্লান মুখ করে চলে গেলেন। আমি খুব খানিকটা কাঁদলুম। কেঁদে যখন আমার মনটা একটু নরম হল তিনি রাত্রে এসে বল্লেন, দেখ, মিস্ গিল্‌বিকে কেবলমাত্র ইংরেজ বলে ঝাপ্‌সা করে দেখতে আমি পারি নে। এতদিনের পরিচয়েও কি ঐ নামের বেড়াটা ঘুচ্‌বে না? ও যে তোমাকে ভালবাসে।

আমি একটুখানি লজ্জিত হয়ে অথচ নিজের অভিমানের অল্প একটু ঝাঁজ বজায় রেখে বল্লুম, আচ্ছা থাক্ না, ওকে কে যেতে বল্‌চে?

মিস্ গিল্‌বি রয়ে গেল। একদিন সে গির্জ্জেয় যাবার সময় পথের মধ্যে আমাদেরই একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় ছেলে তাকে ঢিল ছুঁড়ে মেরে অপমান করলে। আমার স্বামীই এতদিন সেই ছেলেকে পালন করেছিলেন,—তিনি তাকে তাড়িয়ে দিলেন। এই নিয়ে ভারি একটা গোল উঠ্‌ল। সেই ছেলে যা বল্লে সবাই তাই বিশ্বাস করলে। লোকে বল্‌লে মিস্ গিল্‌বিই তাকে অপমান করেছে এবং তার সম্বন্ধে বানিয়ে বলেছে। আমারও কেমন মনে হল সেটা অসম্ভব নয়। ছেলেটার মা নেই, তার খুড়ো এসে আমাকে ধরলে। আমি তার হয়ে অনেক চেষ্টা করলুম কিন্তু কোনো ফল হল না।

সেদিনকার দিনে আমার স্বামীর এই ব্যবহার কেউ ক্ষমা

করতে পারলে না। আমিও না। আমি মনে মনে তাঁকে নিন্দাই করলুম। এইবার মিস্ গিল্‌বি আপনিই চলে গেল। যাবার সময় তার চোখ দিয়ে জল পড়ল—কিন্তু আমার মন গল্‌ল না। আহা মিথ্যা করে' ছেলেটার এমন সর্ব্বনাশ করে গেল গো! আর অমন ছেলে! স্বদেশীর উৎসাহে তার নাওয়া খাওয়া ছিল না।—আমার স্বামী নিজের গাড়িতে করে মিস্ গিল্‌বিকে ষ্টেশনে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন। সেটা আমার বড় বাড়াবাড়ি বোধ হল। এই কথাটা নিয়ে নানা ডাল পালা দিয়ে কাগজে যখন গাল দিলে আমার মনে হল এই শাস্তি ওঁর পাওনা ছিল।

ইতিপূর্ব্বে আমি আমার স্বামীর জন্যে অনেকবার উদ্বিগ্ন হয়েছি কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাঁর জন্যে একদিনও লজ্জা বোধ করিনি। এবার লজ্জা হল। মিস্ গিল্‌বির প্রতি নরেন কি অন্যায় করেছে না করেছে সে আমি জানিনে কিন্তু আজকের দিনে তা নিয়ে সদ্বিচার করতে পারাটাই লজ্জার কথা। যে ভাবের থেকে নরেন ইংরেজ মেয়ের প্রতি ঔদ্ধত্য করতে পেরেচে আমি তাকে কিছুতেই দমিয়ে দিতে চাইনে। এই কথাটা আমার স্বামী যে কিছুতেই বুঝতে চাইলেন না, আমার মনে হল সেটা তাঁর পৌরুষের অভাব। তাই আমার মনে লজ্জা হল।

শুধু তাই নয়, আমার সব চেয়ে বুকে বিঁধেছিল যে আমাকে হার মানতে হয়েছে। আমার তেজ কেবল আমাকেই দগ্ধ করলে কিন্তু আমার স্বামীকে উজ্জ্বল করলে না। এই ত আমার সতীত্বের অপমান।

অথচ স্বদেশী কাণ্ডর সঙ্গে যে আমার স্বামীর যোগ ছিলনা বা তিনি এর বিরুদ্ধ ছিলেন তা নয়। কিন্তু "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রটি তিনি চূড়ান্ত করে গ্রহণ করতে পারেন নি। তিনি বল্‌তেন, দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি কিন্তু বন্দনা করব যাঁকে তিনি ওর চেয়ে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্ব্বনাশ করা হবে।

৪

এমন সময়ে সন্দীপবাবু স্বদেশী প্রচার করবার জন্যে তাঁর দলবল নিয়ে আমাদের ওখানে এসে উপস্থিত হলেন। বিকেল বেলায় আমাদের নাটমন্দিরে সভা হবে। আমরা মেয়েরা দালানের একদিকে চিক্ ফেলে বসে আছি। বন্দেমাতরম্ শব্দের সিংহনাদ ক্রমে ক্রমে কাছে আস্‌চে, আমার বুকের ভিতরটা গুরগুর করে কেঁপে উঠ্‌চে। হঠাৎ পাগড়ি-বাঁধা গেরুয়াপরা যুবক ও বালকের দল খালি পায়ে আমাদের প্রকাণ্ড আঙিনার মধ্যে, মরা নদীতে প্রথম বর্ষার গেরুয়া বন্যার ধারার মত, হুড় হুড় করে ঢুকে পড়ল। লোকে লোকে ভরে গেল। সেই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে একটা বড় চৌকির উপর বসিয়ে দশবারোজন ছেলে সন্দীপবাবুকে কাঁধে করে নিয়ে এল। বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্! আকাশটা যেন ফেটে টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে ছিঁড়ে পড়বে মনে হল।

সন্দীপবাবুর ফোটোগ্রাফ পূর্ব্বেই দেখেছিলুম। তখন যে ঠিক ভালো লেগেছিল তা বল্‌তে পারিনে। কুশ্রী দেখতে নয়, এমন কি, রীতিমত সুশ্রীই, তবু জানিনে কেন, আমার মনে হয়েছিল, উজ্জ্বলতা আছে বটে কিন্তু চেহারাটা অনেকখানি খাদে মিশিয়ে

গড়া—চোখে আর ঠোঁটে কি একটা আছে যেটা খাঁটি নয়। সেই জন্যেই আমার স্বামী যখন বিনা দ্বিধায় তাঁর সকল দাবী পূরণ করতেন আমার ভাল লাগ্‌ত না। অপব্যয় আমি সইতে পারতুম কিন্তু আমার কেবলি মনে হত বন্ধু হয়ে এ লোকটা আমার স্বামীকে ঠকাচ্চে। কেননা ভাবখানা ত তপস্বীর মত নয়, গরীবের মতও নয়, দিব্যি বাবুর মত। ভিতরে আরামের লোভ আছে অথচ—এই রকম নানা কথা আমার মনে উদয় হয়েছিল। আজ সেই সব কথা মনে উঠ্‌চে—কিন্তু থাক্।

কিন্তু সেদিন সন্দীপবাবু যখন বক্তৃতা দিতে লাগ্‌লেন আর এই বৃহৎ সভার হৃদয় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠে কূল ছাপিয়ে ভেসে যাবার জো হল তখন তাঁর সে এক আশ্চর্য্য মূর্ত্তি দেখ্‌লুম। বিশেষত এক সময় সূর্য্য ক্রমে নেমে এসে ছাদের নীচে দিয়ে তাঁর মুখের উপর হঠাৎ রৌদ্র ছড়িয়ে দিলে তখন মনে হল তিনি যে অমরলোকের মানুষ এই কথাটা দেবতা সেদিন সমস্ত নরনারীর সাম্‌নে প্রকাশ করে দিলে। বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কথায় যেন ঝড়ের দম্‌কা হাওয়া। সাহসের অন্ত নেই। আমার চোখের সাম্‌নে যেটুকু চিকের আড়াল ছিল সে আমি সইতে পারছিলুম না। কখন নিজের অগোচরে চিক খানিকটা সরিয়ে ফেলে মুখ বের করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে ছিলুম আমার মনে পড়ে না। সমস্ত সভায় এমন একটি লোক ছিল না আমার মুখ দেখবার যার একটু অবকাশ ছিল। কেবল এক সময় দেখ্‌লুম কালপুরুষের নক্ষত্রের মত সন্দীপবাবুর উজ্জ্বল দুই চোখ আমার মুখের উপর এসে পড়ল। কিন্তু আমার হুঁস

ছিলনা। আমি কি তখন রাজবাড়ির বউ? আমি তখন বাংলা দেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি—আর তিনি বাংলা দেশের বীর। যেমন আকাশের সূর্য্যের আলো তাঁর ঐ ললাটের উপর পড়েচে, তেমনি দেশের নারীচিত্তের অভিষেক যে চাই। নইলে তাঁর রণযাত্রার মাঙ্গল্য পূর্ণ হবে কি করে?

আমি স্পষ্টই অনুভব করতে পারলুম আমার মুখের দিকে চাওয়ার পর থেকে তাঁর ভাষায় আগুন আরো জ্বলে উঠ্‌ল। ইন্দ্রের উচ্চৈশ্রবা তখন আর রাশ মানতে চাইল না—বজ্রের উপর বজ্রের গর্জ্জন, বিদ্যুতের উপর বিদ্যুতের চমকানি। আমার মন বল্লে আমারই চোখের শিখায় এই আগুন ধরিয়ে দিলে। আমরা কি কেবল লক্ষ্মী, আমরাই ত ভারতী।

সেদিন একটা অপূর্ব্ব আনন্দ এবং অহঙ্কারের দীপ্তি নিয়ে বাড়ি ফিরে এলুম। ভিতরে একটা আগুনের ঝড়ের বেগ আমাকে এক মুহূর্ত্তে এক কেন্দ্র থেকে আরেক কেন্দ্রে টেনে নিয়ে গেল। আমার ইচ্ছা করতে লাগ্‌ল গ্রীসের বীরাঙ্গনার মত আমার চুল কেটে দিই ঐ বীরের হাতের ধনুকের ছিলা করবার জন্য, আমার এই আজানুলম্বিত চুল! যদি ভিতরকার চিত্তের সঙ্গে বাইরেকার গয়নার যোগ থাকত তাহলে আমার কণ্ঠী আমার গলার হার আমার বাজুবন্ধ উল্কাবৃষ্টির মত সেই সভায় ছুটে ছুটে খসে খসে পড়ে যেত। নিজের অত্যন্ত একটা ক্ষতি করতে পারলে তবেই যেন সেই আনন্দের উৎসাহবেগ সহ্য করা সম্ভব হতে পারত।

সন্ধ্যাবেলায় আমার স্বামী যখন ঘরে এলেন আমার ভয় হতে লাগ্‌ল পাছে তিনি সেদিনকার বক্তৃতার দীপক রাগিণীর সঙ্গে

তান না মিলিয়ে কোনো কথা বলেন, পাছে তাঁর সত্যপ্রিয়তায় কোনো জায়গায় ঘা লাগাতে তিনি একটুও অসম্মতি প্রকাশ করেন—তাহলে সেদিন আমি তাঁকে স্পষ্ট অবজ্ঞা করতে পারতুম।

কিন্তু তিনি আমাকে কোনো কথাই বল্লেন না। সেটাও আমাকে ভালো লাগ্‌ল না। তাঁর উচিত ছিল বলা, "আজ সন্দীপের কথা শুনে আমার চৈতন্য হল, এসব বিষয়ে আমার অনেক দিনের ভুল ভেঙে গেল।" আমার কেমন মনে হল তিনি কেবল জেদ করে চুপ করে আছেন, জোর করেই উৎসাহ প্রকাশ করচেন না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম সন্দীপবাবু আর কতদিন এখানে আছেন?

স্বামী বল্লেন, তিনি কাল সকালেই রংপুরে রওনা হবেন।

কাল সকালেই?

হাঁ, সেখানে তাঁর বক্তৃতার সময় স্থির হয়ে গেছে।

আমি একটুক্ষণ চুপ করে রইলুম। তার পরে বল্লুম, কোনো-মতে কালকের দিনটা থেকে গেলে হয় না?

সে ত সম্ভব নয়, কিন্তু কেন বল দেখি?

আমার ইচ্ছা আমি নিজে উপস্থিত থেকে তাঁকে খাওয়াব।

শুনে আমার স্বামী আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। এর পূর্ব্বে অনেক দিন অনেকবার তিনি তাঁর বন্ধুদের কাছে আমাকে বের হবার জন্যে অনুরোধ করেচেন। আমি কিছুতেই রাজি হইনি।

আমার স্বামী আমার মুখের দিকে স্থিরভাবে একরকম করে চাইলেন—আমি তার মানেটা ঠিক বুঝলুম না। ভিতরে হঠাৎ একটু কেমন লজ্জা বোধ হল। বল্লুম, না, না, সে কাজ নেই।

তিনি বল্লেন, কেনই বা কাজ নেই? আমি সন্দীপকে বল্‌ব —যদি কোনো রকমে সম্ভব হয় তাহলে কাল সে থেকে যাবে।

দেখ্‌লুম সম্ভব হল্‌।

আমি সত্য কথা বল্‌ব। সেদিন আমার মনে হচ্ছিল ঈশ্বর কেন আমাকে আশ্চর্য্য সুন্দর করে গড়লেন না? কারো মন হরণ করবার জন্যে যে, তা নয়। কিন্তু রূপ যে একটা গৌরব। আজ এই মহাদিনে দেশের পুরুষেরা দেশের নারীর মধ্যে দেখুক একবার জগদ্ধাত্রীকে। কিন্তু বাইরের রূপ না হলে তাদের চোখ যে দেবীকে দেখ্‌তে পায় না। সন্দীপবাবু কি আমার মধ্যে দেশের সেই জাগ্রত শক্তিকে দেখ্‌তে পাবেন? না, মনে করবেন, এ একজন সামান্য মেয়েমানুষ, তাঁর এ বন্ধুর ঘরের গৃহিণীমাত্র?

সেদিন সকালে মাথা ঘঁসে আমার সুদীর্ঘ এলোচুল একটি লাল রেশমের ফিতে দিয়ে নিপুণ করে জড়িয়ে ছিলুম। দুপুর বেলায় খাবার নিমন্ত্রণ, তাই ভিজে চুল তখন খোঁপা করে বাঁধবার সময় ছিল না। গায়ে ছিল জরির পাড়ের একটি সাদা মাদ্রাজি সাড়ি, আর জরির একটুখানি পাড়-দেওয়া হাতকাটা জ্যাকেট্‌।

আমি ঠিক করেছিলুম এ খুব সংযত সাজ, এর চেয়ে সাদাসিধা আর কিছু হতে পারে না। এমন সময় আমার মেজ জা এসে আমার মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তার পরে ঠোঁট দুটো খুব টিপে একটু হাস্‌লেন। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, দিদি, তুমি হাস্‌লে যে?

তিনি বল্লেন, তোর সাজ দেখচি।

আমি মনে মনে বিরক্ত হয়ে বল্লুম, এম্‌নিই কি সাজ দেখ্‌লে?

তিনি আর একবার একটুখানি বাঁকা হাসি হেসে বল্লেন, মন্দ হয়নি ছোট রাণী, বেশ হয়েচে! কেবল ভাবচি সেই তোমার বিলিতি দোকানের বুককাটা জামাটা পরলেই সাজটা পুরোপূরি হত।

এই বলে তিনি কেবল তাঁর মুখ চোখ নয়, তাঁর মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত সমস্ত দেহের ভঙ্গী হাসিতে ভরে ঘর থেকে চলে গেলেন। খুব রাগ হল এবং মনে হল সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে আটপৌরে মোটাগোছের একটা সাড়ি পরি। কিন্তু সে ইচ্ছা শেষ পর্য্যন্ত কেন যে পালন করতে পারলুম না তা ঠিক জানিনে। মনে মনে বল্লুম আমি যদি বেশ ভদ্ররকম সাজ না করেই সন্দীপবাবুর সাম্‌নে বেরই তাহলে আমার স্বামী রাগ করবেন— মেয়েরা যে সমাজের শ্রী।

ভেবেছিলুম, সন্দীপবাবু একেবারে খেতে যখন বস্‌বেন তখন তাঁর সাম্‌নে বেরব। সেই খাওয়ানো কর্ম্মটার আড়ালে প্রথম দেখার সঙ্কোচ অনেকটা কেটে যাবে। কিন্তু খাবার তৈরি হতে আজ দেরি হচ্চে, প্রায় একটা বেজে গেছে। তাই আমার স্বামী আলাপ করবার জন্যে আমাকে ডেকে পাঠিয়েচেন। ঘরে ঢুকে প্রথমটা তাঁর মুখের দিকে চাইতে ভারি লজ্জা ঠেকছিল। কোনোমতে সেটা কাটিয়ে জোর করে বলে ফেল্লুম—আজ খেতে আপনার ভারি দেরি হয়ে গেল।

তিনি অসঙ্কোচে আমার পাশের চৌকিতে এসে বল্লেন, দেখুন, অন্ন ত রোজই একরকম জোটে কিন্তু অন্নপূর্ণা থাকেন আড়ালে। আজ অন্নপূর্ণা এলেন, অন্ন না হয় আড়ালেই রইল।

যেমন জোর তাঁর বক্তৃতায় তেমনি ব্যবহারে। একটুও দ্বিধা নেই। সব জায়গাতেই আপন আসনটি অবিলম্বে জিতে নেওয়াই যেন তাঁর অভ্যাস। কেউ কিছু মনে করতে পারে এ সব তর্ক তাঁর নয়। খুব কাছে এসে বসবার স্বাভাবিক দাবী যেন তাঁর আছে, অতএব এতে যে দোষ দিতে পারে দোষ তারই।

আমার লজ্জা হতে লাগ্‌ল পাছে সন্দীপবাবু মনে করেন আমি নেহাৎ একটা সেকেলে জড়পদার্থ। মুখের কথা বেশ জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠ্‌বে, কোথাও বাধবে না, এক একটা জবাব শুনে তিনি মনে মনে আশ্চর্য্য হয়ে যাবেন, এ আমার কিছুতেই ঘটে উঠ্‌ল না। ভিতরে ভিতরে ভারি কষ্ট হতে লাগ্‌ল—নিজেকে হাজারবার ভর্ৎসনা করে বল্লুম, কেন ওঁর সাম্‌নে এমন হঠাৎ বের হতে গেলুম।

কোনো রকম করে খাওয়ানোটা হয়ে গেলেই আমি তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছিলুম—তিনি আবার তেমনি নিঃসঙ্কোচে দরজার কাছে এসে আমার পথ আগ্‌লে বল্লেন,—আমাকে পেটুক ঠাওরাবেন না, আমি খাবার লোভে এখানে আসি নি। আমার লোভ কেবল আপনি ডেকেচেন বলে। যদি খাওয়ার পরে অমনি পালান তাহলে অতিথিকে ফাঁকি দেওয়া হবে।

এমন সব কথা অত্যন্ত সহজে অত্যন্ত জোরে না বল্লে ভারি বদ্‌সুর লাগ্‌ত। আমার স্বামী যে ওঁর পরমবন্ধু, আমি যে ওঁর ভাজের মত। আমি যখন নিজের সঙ্গে লড়াই করে সন্দীপবাবুর প্রবল আত্মীয়তার সমোচ্চ ক্ষেত্রে ওঠবার চেষ্টা করচি, আমার স্বামী আমার বিভ্রাট দেখে আমাকে বল্লেন, আচ্ছা, তুমি তাহলে তোমার খাওয়া সেরে চলে এস।

সন্দীপবাবু বল্লেন, কিন্তু কথা দিয়ে যান ফাঁকি দেবেন না।

আমি একটু হেসে বল্লুম, আমি এখনি আস্‌চি।

তিনি বল্লেন, আপনাকে কেন বিশ্বাস করিনে তা বলি। আজ ন বছর হল নিখিলেশের বিয়ে হয়েচে। এই ন'টি বছর আপনি আমাকে ফাঁকি দিয়ে এসেচেন। আবার ফের যদি ন বছর করেন তাহলে আর দেখা হবে না।

আমিও আত্মীয়তা সুরু করে দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বল্লুম, কেন, তাহলেই বা দেখা হবে না কেন?

তিনি বল্লেন, আমার কুষ্টিতে আছে আমি অল্প বয়সে মরব। আমার বাপ দাদা কেউ ত্রিশের কোঠা পেরতে পারেন নি। আমার ত এই সাতাশ হল।

তিনি বুঝেছিলেন কথাটা আমার মনে বাজ্‌বে। বাজ্‌লও বটে। এবার আমার মৃদুকণ্ঠে বোধ হয় করুণ রসের একটু ছিটে লাগ্‌ল। আমি বল্লুম, সমস্ত দেশের আশীর্ব্বাদে আপনার ফাঁড়া কেটে যাবে।

তিনি বল্লেন, দেশের আশীর্ব্বাদ দেশলক্ষ্মীদের কণ্ঠ থেকেই ত পাব। সেই জন্যেই ত এত ব্যাকুল হয়ে আপনাকে আস্‌তে বলচি, তা হলে আজ থেকেই আমার স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ হবে।

স্রোতের জল ঘোলা হলেও অনায়াসে তার ব্যবহার চলে। সন্দীপবাবুর সমস্তই এম্‌নি দ্রুতবেগে সচল যে, আর একজনের মুখে যা সইত না তাঁর মুখে তাতে আপত্তি করবার ফাঁক পাওয়া যায় না। হাস্‌তে হাস্‌তে বল্লেন, দেখুন আপনার এই স্বামীকে জামিন রেখে দিলুম, আপনি যদি না আসেন তাহলে ইনিও খালাস পাবেন না।

আমি যখন চলে আস্‌চি, তিনি আবার বলে উঠ্‌লেন, আমার আর একটু সামান্য দরকার আছে।

আমি থম্‌কে ফিরে দাঁড়ালুম। তিনি বল্লেন, ভয় পাবেন না, এক গ্লাস জল। আপনি দেখেছেন আমি খাবার সময়ে জল খাই নে—খাবার খানিক পরে খাই।

এর পরে আমাকে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করতে হল, কেন বলুন দেখি?

কবে তাঁর কঠিন অজীর্ণ রোগ হয়েছিল তার ইতিহাস এল। প্রায় সাত মাস ধরে তাঁর কি রকম অসহ্য ভোগ গিয়েছে তাও শুনলুম। এলোপ্যাথ্ হোমিওপ্যাথ্ সকল রকমের চিকিৎসকের উপদ্রব পার হয়ে অবশেষে কবিরাজের চিকিৎসায় কি রকম আশ্চর্য্য ফল পেয়েছেন তার বর্ণনা সেরে হেসে তিনি বল্লেন, ভগবান আমার ব্যামোগুলোও এমনি করে গড়েচেন যে, স্বদেশী বড়িটুকু হাতে হাতে না পেলে তারা বিদায় হতে চায় না।

আমার স্বামী এতক্ষণ পরে বল্লেন, আর বিদেশী ওষুধের শিশিগুলোও যে একদণ্ড তোমার আশ্রয় ছাড়তে চায় না—তোমার বসবার ঘরের তিন্‌টি শেল্‌ফ্ যে একেবারে—

ওগুলো কি জান? প্যুনিটিভ পুলীসের মত। প্রয়োজন আছে বলে যে এসেচে তা নয়—আধুনিক কালের শাসনে ওরা ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে—কেবল দণ্ডই দিতে হয়, গুঁতোও কম খাই নে।

আমার স্বামী অত্যুক্তি সইতে পারেন না। কিন্তু অলঙ্কার-

মাত্রই যে অত্যুক্তি, সে ত বিধাতার তৈরি নয়, মানুষের বানানো। আমি একবার আমার নিজের কোনো একটা মিথ্যার জবাবদিহির ছলে আমার স্বামীকে বলেছিলুম, গাছ পালা পশু পাখীরাই আগাগোড়া সত্য বলে, বেচারাদের মিথ্যা বলবার শক্তি নেই। পশুর চেয়ে মানুষের এইখানে শ্রেষ্ঠতা, আবার পুরুষের চেয়ে মেয়েদের শ্রেষ্ঠতাও এইখানে,—মেয়েদেরি বিস্তর অলঙ্কার সাজে এবং বিস্তর মিথ্যাও মানায়।

ঘর থেকে বাইরে এসে দেখি মেজ জা একটা জানলার খড়খড়ি একটুখানি ফাঁক করে ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এখানে যে?—তিনি ফিস্ ফিস্ করে উত্তর করলেন, আড়ি পাতছিলুম।

যখন ফিরে এলুম, সন্দীপবাবু করুণ স্বরে বল্লেন, আপনার আজ বোধ হয় কিছুই খাওয়া হল না।

শুনে আমার ভারি লজ্জা হল। আমি একটু বেশি শীঘ্র ফিরে এসেছি। ভদ্ররকম খাবার জন্যে যতটা সময় দেওয়া উচিত ছিল তা দেওয়া হয়নি। আজকের আমার খাওয়ার মধ্যে না-খাওয়ার অংশটাই যে বেশি, সময়ের অঙ্ক হিসাব করলে সেটা বুঝতে বাকি থাকে না। কিন্তু কেউ যে সেই হিসাব করছিল তা আমার মনেও হয়নি।

সন্দীপবাবু বোধ হয় আমার লজ্জাটুকু দেখ্‌তে পেলেন—সেইটেই আরো লজ্জা। তিনি বল্লেন, বনের হরিণীর মত আপনার ত পালাবার দিকেই ঝোঁক ছিল তবুও যে এত কষ্ট করে সত্য রক্ষা করলেন এ আমার কম পুরস্কার নয়।

আমি ভালো করে জবাব দিতে পারিনি; মুখ লাল করে ঘেমে একটা সোফার কোণে বসে পড়লুম। দেশের মূর্ত্তিমতী নারীশক্তির মত যে রকম নিঃসঙ্কোচে এবং সগৌরবে সন্দীপবাবুর কাছে বেরিয়ে কেবলমাত্র দর্শনদানের দ্বারা তাঁর ললাটে জয়মাল্য পরাব কল্পনা করেছিলুম এ পর্য্যন্ত তার কিছুই হল না।

সন্দীপবাবু ইচ্ছা করেই আমার স্বামীর সঙ্গে তর্ক বাধিয়ে দিলেন। তিনি জানেন, তর্কে তাঁর তীক্ষ্ণধার মনের সমস্ত উজ্জ্বলতা ঝক্ ঝক্ করে উঠ্‌তে থাকে। এর পরেও আমি বারবার দেখেচি আমি উপস্থিত থাক্‌লেই তিনি তর্ক করবার সামান্য উপলক্ষ্যটুকু ছাড়তেন না।

বন্দেমাতরম্ মন্ত্র সম্বন্ধে আমার স্বামীর মত কি তিনি জানতেন, সেইটের উল্লেখ করে বল্লেন, দেশের কাজে মানুষের কল্পনাবৃত্তির যে একটা জায়গা আছে সেটা কি তুমি মাননা নিখিল?

একটা জায়গা আছে মানি কিন্তু সব জায়গাই তার তা মানি নে। দেশ জিনিষকে আমি খুব সত্যরূপে নিজের মনে জান্‌তে চাই এবং সকল লোককে জানাতে চাই—এত বড় জিনিষের সম্বন্ধে কোনো মন-ভোলাবার যাদুমন্ত্র ব্যবহার করতে আমি ভয়ও পাই লজ্জাও বোধ করি।

তুমি যাকে মায়ামন্ত্র বল্‌চ আমি তাকেই বলি সত্য। আমি দেশকে সত্যই দেবতা বলে মানি। আমি নরনারায়ণের উপাসক —মানুষের মধ্যেই ভগবানের সত্যকার প্রকাশ, তেমনি দেশের মধ্যে।

একথা যদি সত্যই বিশ্বাস কর তবে তোমার পক্ষে এক

মানুষের সঙ্গে অন্য মানুষের সুতরাং এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশের ভেদ নেই।

সে কথা সত্য কিন্তু আমার শক্তি অল্প, অতএব নিজের দেশের পূজার দ্বারাই আমি দেশনারায়ণের পূজা করি।

পূজা করতে নিষেধ করি নে কিন্তু অন্য দেশে যে নারায়ণ আছেন তাঁর প্রতি বিদ্বেষ করে' সে পূজা কেমন করে' সমাধা হবে?

বিদ্বেষও পূজার অঙ্গ। কিরাতবেশী মহাদেবের সঙ্গে লড়াই করেই অর্জ্জুন বরলাভ করেছিলেন। আমরা একদিক দিয়ে ভগবানকে মারব একদিন তাতেই তিনি প্রসন্ন হবেন।

তাই যদি হয়, তবে যারা দেশের ক্ষতি করচে আর যারা দেশের সেবা করচে উভয়েই তাঁর উপাসনা করচে—তাহলে বিশেষ করে দেশভক্তি প্রচার করবার দরকার নেই।

নিজের দেশ সম্বন্ধে আলাদা কথা—ওখানে যে হৃদয়ের মধ্যে পূজার স্পষ্ট উপদেশ আছে।

তাহলে সুধু নিজের দেশ কেন, তার চেয়ে আরো ঢের স্পষ্ট উপদেশ আছে নিজেরই সম্বন্ধে। নিজের মধ্যে যে নরনারায়ণ আছেন তাঁর পূজার মন্ত্রটাই যে দেশ বিদেশ সব চেয়ে বড় করে কানে বাজচে।

নিখিল, তুমি যে এই সব তর্ক করচ এ কেবল বুদ্ধির শুক্‌নো তর্ক। হৃদয় বলে একটা পদার্থ আছে তাকে কি একেবারে মান্‌বে না?

আমি তোমাকে সত্য বলচি সন্দীপ, দেশকে দেবতা বলিয়ে যখন তোমরা অন্যায়কে কর্ত্তব্য, অধর্ম্মকে পুণ্য বলে চালাতে চাও

তখন আমার হৃদয়ে লাগে বলেই আমি স্থির থাকতে পারিনে। আমি যদি নিজের স্বার্থসাধনের জন্যে চুরি করি, তাহলে নিজের প্রতি আমার যে সত্য প্রেম তারই কি মূলে ঘা দিইনে? চুরি করতে পারিনে যে তাই, সে কি বুদ্ধি আছে বলে? না, নিজের প্রতি শ্রদ্ধা আছে বলে?

ভিতরে ভিতরে আমার রাগ হচ্ছিল আমি আর থাকতে পারলুম না। আমি বলে উঠলুম,—ইংরেজ ফরাসী জর্ম্মান রুশ এমন কোন্ সভ্যদেশ আছে যার ইতিহাস নিজের দেশের জন্যে চুরির ইতিহাস নয়?

সে চুরির জবাবদিহি তাদের করতে হবে, এখনো করতে হচ্চে। ইতিহাস এখনো শেষ হয়ে যায়নি।

সন্দীপবাবু বল্লেন, বেশ ত আমরাও তাই করব। চোরাই মালে আগে ঘরটা বোঝাই করে তার পরে ধীরে সুস্থে দীর্ঘকাল ধরে আমরাও জবাবদিহি করব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তুমি যে বল্লে এখনো তারা জবাবদিহি করচে সেটা কোথায়?

রোম যখন নিজের পাপের জবাবদিহি করছিল তখন তা কেউ দেখতে পায়নি। তখন তার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। বড় বড় ডাকাত সভ্যতারও জবাবদিহির দিন কখন্ আসে তা বাইরে থেকে দেখা যায় না। কিন্তু একটা জিনিষ কি দেখতে পাচ্চনা —ওদের পলিটিক্সের ঝুলিভরা মিথ্যাকথা, প্রবঞ্চনা, বিশ্বাসঘাতকতা, গুপ্তচরবৃত্তি, প্রেষ্টিজ্‌রক্ষার লোভে ন্যায় ও সত্যকে বলিদান, এই যে সব পাপের বোঝা নিয়ে চলেছে এর ভার কি কম? আর এ কি প্রতিদিন ওদের সভ্যতার বুকের রক্ত শুষে খাচ্চেনা?

দেশের উপরেও যারা ধর্ম্মকে মান্‌চে না, আমি বল্‌চি তারা দেশকেও মান্‌চে না।

আমার স্বামীকে আমি কোনোদিন বাইরের লোকের সঙ্গে তর্ক করতে শুনিনি—আমার সঙ্গে তিনি তর্ক করেচেন কিন্তু আমার প্রতি তাঁর এমন গভীর করুণা যে, আমাকে হার মানাতে তাঁর কষ্ট হত। আজ দেখ্‌লুম তাঁর অস্ত্রচালনা।

আমার স্বামীর কথাগুলোতে কোনোমতেই আমার মন সায় দিচ্ছিল না। কেবলি মনে হচ্ছিল, এর উপযুক্ত উত্তর আছে, উপস্থিতমত সে আমার মনে জোগাচ্ছিল না। মুস্কিল এই যে, ধর্ম্মের দোহাই দিলে চুপ করে যেতে হয়—একথা বলা শক্ত ধর্ম্মকে অতটা দূর পর্য্যন্ত মানতে রাজি নই। এই তর্ক সম্বন্ধে ভালো রকম জবাব দিয়ে আমি একটা লিখব এবং সেটা সন্দীপবাবুর হাতে দেব আমার মনে এই সঙ্কল্প ছিল। তাই আজকের কথাবার্ত্তাগুলো ঘরে ফিরে এসেই আমি নোট করে নিয়েছি।

এক সময়ে সন্দীপবাবু আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, আপনি কি বলেন?

আমি বল্লুম, আমি বেশি সূক্ষ্মে যেতে চাইনে, আমি মোটা কথাই বলব। আমি মানুষ, আমার লোভ আছে, আমি দেশের জন্যে লোভ করব—আমি কিছু চাই যা আমি কাড়ব, কুড়ব; আমার রাগ আছে, আমি দেশের জন্যে রাগ করব, আমি কাউকে চাই যাঁকে কাট্‌ব কুট্‌ব, যার উপরে আমি আমার এতদিনের অপমানের শোধ তুলব; আমার মোহ আছে আমি দেশকে নিয়ে মুগ্ধ হব, আমি দেশের এমন একটি প্রত্যক্ষ রূপ চাই যাকে

আমি মা বলব, দেবী বল্‌ব, দুর্গা বল্‌ব; যার কাছে আমি বলি-দানের পশুকে বলি দিয়ে রক্তে ভাসিয়ে দেব। আমি মানুষ, আমি দেবতা নই।

সন্দীপবাবু চৌকি থেকে উঠে আকাশে দক্ষিণ হাত আস্ফালন করে বলে উঠ্‌লেন, হুররা, হুররা!—পরক্ষণেই সংশোধন করে বল্লেন, বন্দেমাতরং বন্দেমাতরং!

আমার স্বামীর অন্তরের একটি গভীর বেদনা তাঁর মুখের উপর ছায়া ফেলে চলে গেল। তিনি খুব মৃদুস্বরে বল্লেন, আমিও দেবতা না, আমি মানুষ, আমি সেই জন্যেই বল্‌চি, আমার যা কিছু মন্দ কিছুতেই সে আমি আমার দেশকে দেব না, দেব না, দেব না।

সন্দীপবাবু বল্লেন, দেখ নিখিল, সত্য জিনিষটা মেয়েদের মধ্যে প্রাণের সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে এক হয়ে আছে। আমাদের সত্যে রং নেই, রস নেই, প্রাণ নেই, শুধু কেবল যুক্তি। মেয়েদের হৃদয় রক্তশতদল, তার উপরে সত্য রূপ ধরে বিরাজ করে, আমাদের তর্কের মত তা বস্তুহীন নয়। এই জন্যে মেয়েরাই যথার্থ নিষ্ঠুর হতে জানে, পুরুষ তেমন জানে না, কেননা ধর্ম্মবুদ্ধি পুরুষকে দুর্ব্বল করে দেয়; মেয়েরা সর্ব্বনাশ করতে পারে অনায়াসে, পুরুষেও পারে কিন্তু তাদের মনে চিন্তার দ্বিধা এসে পড়ে; মেয়েরা ঝড়ের মত অন্যায় করতে পারে, সে অন্যায় ভয়ঙ্কর সুন্দর, পুরুষের অন্যায় কুশ্রী, কেননা তার ভিতরে ভিতরে ন্যায়বুদ্ধির পীড়া আছে। তাই আমি তোমাকে বলে রাখচি আজকের দিনে আমাদের মেয়েরাই আমাদের দেশকে বাঁচাবে।

আজ আমাদের ধর্ম্মকর্ম্ম বিচার বিবেকের দিন নয়, আজ আমাদের নির্ব্বিচার নির্ব্বিকার হয়ে নিষ্ঠুর হতে হবে, অন্যায় করতে হবে, আজ পাপকে রক্তচন্দন পরিয়ে দিয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের হাতে তাকে বরণ করে নিতে হবে। আমাদের কবি কি বলেচে মনে নেই?—

এস পাপ, এস সুন্দরী!
তব চুম্বন-অগ্নি-মদিরা রক্তে ফিরুক্ সঞ্চরি!
অকল্যাণের বাজুক্ শঙ্খ,
ললাটে লেপিয়া দাও কলঙ্ক,
নির্লাজ কালো কলুষ পঙ্ক
বুকে দাও, প্রলয়ঙ্করী!

আজ ধিক্ থাক্ সেই ধর্ম্মকে যা হাস্তে হাস্তে সর্ব্বনাশ করতে জানে না!

এই বলে' তিনি মেজের উপর দু'বার জোরে লাথি মারলেন—কার্পেট থেকে অনেকখানি নিদ্রিত ধূলো চম্‌কে উপরে উঠে পড়ল। দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষ যা কিছুকে বড় বলে মেনেছে একমুহূর্ত্তে তিনি তাকে অপমান করে' এমন গৌরবে মাথা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে উঠ্‌লেন যে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার সমস্ত শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল।

আবার হঠাৎ গর্জ্জে উঠ্‌লেন, যে আগুন ঘরকে পোড়ায় যে আগুন বাহিরকে জ্বালায় আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি তুমি সেই আগুনের সুন্দরী দেবতা, তুমি আজ আমাদের সকলকে নষ্ট হবার দুর্জ্জয় তেজ দাও, আমাদের অন্যায়কে সুন্দর কর!

এই শেষ ক'টি কথা তিনি যে কা'কে বল্লেন তা ঠিক বোঝা গেল না। মনে করা যেতে পারত তিনি যাকে বন্দেমাতরং বলে বন্দনা করেন তাকে, কিম্বা দেশের যে নারী সেই দেশলক্ষ্মীর প্রতিনিধিরূপে তখন সেখানে বর্ত্তমান ছিল তাকে। মনে করা যেতে পারত কবি বাল্মীকি যেমন পাপবুদ্ধির বিরুদ্ধে করুণার আঘাতে এক নিমেষে হঠাৎ প্রথম অনুষ্টুপ উচ্চারণ করেছিলেন, তেমনি সন্দীপবাবুও ধর্ম্মবুদ্ধির বিরুদ্ধে নিষ্কারুণ্যের আঘাতে এই কথাগুলি হঠাৎ 'বলে' উঠ্‌লেন, কিম্বা জনসাধারণের মনোহরণ ব্যবসায়ের চিরাভ্যস্ত অভিনয়কুশলতার এই একটি আশ্চর্য্য পরিচয় দিলেন।

আরো কিছু বোধ হয় বল্‌তেন, এমন সময়ে আমার স্বামী উঠে তাঁর গায়ে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে বল্লেন, সন্দীপ, চন্দ্রনাথ বাবু এসেচেন।

হঠাৎ চমক্ ভেঙে ফিরে দেখি সৌম্যমূর্ত্তি বৃদ্ধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকবেন কি না ভাবচেন। অস্তোন্মুখ সন্ধ্যাসূর্য্যের মত তাঁর মুখের জ্যোতি নম্রতায় পরিপূর্ণ। আমাকে আমার স্বামী এসে বল্লেন, ইনি আমার মাষ্টার মশায়। এঁর কথা অনেকবার তোমাকে বলেছি, এঁকে প্রণাম কর।

আমি তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে তাঁকে প্রণাম করলুম। তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন, মা, ভগবান চিরদিন তোমাকে রক্ষা করুন। ঠিক সেই সময়ে আমার সেই আশীর্ব্বাদের প্রয়োজন ছিল।

ক্রমশঃ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চুট্‌কি

সমালোচকেরা আমার রচনার এই একটি দোষ ধরেন যে, আমি কথায়-কথায় বলি "হচ্ছে"। এটি যে একটি মহাদোষ সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই, কেননা ওকথা বলায় সত্যের অপলাপ করা হয়। সত্য কথা বল্‌তে গেলে বল্‌তে হয়, বাঙ্গলায় কিছু "হচ্ছে না"। এ দেশের কর্ম্মজগতে যে কিছু হচ্ছে না, সে ত প্রত্যক্ষ—কিন্তু মনোজগতেও যে কিছু হচ্ছে না, তার প্রমাণ বর্দ্ধমানের গত সাহিত্য-সম্মিলন।

উক্ত মহাসভার পঞ্চ সভাপতি সমস্বরে বলেছেন যে, বাঙ্গলায় কিছু হচ্ছে না,—না দর্শন, না বিজ্ঞান, না সাহিত্য, না ইতিহাস।

শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত মহাশয়ের প্রধান বক্তব্য এই যে, আমরা না পাই সত্যের সাক্ষাৎ, না করি সত্যাসত্যের বিচার। আমরা সত্যের স্রষ্টাও নই, দ্রষ্টাও নই; কাজেই আমাদের দর্শন-চর্চ্চা real ও নয়, critical ও নয়।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়ের মতে, কি "মূর্ত্ত-বিজ্ঞান", কি "অমূর্ত্ত-বিজ্ঞান",—এ দুয়ের কোনটিই বাঙ্গালী অদ্যাবধি আত্মসাৎ করতে পারে নি। অর্থাৎ বিজ্ঞানের যন্ত্রভাগও আমাদের হাতে পড়ে নি, তার তন্ত্রভাগও আমাদের মনে ধরে নি। আমরা শুধু বিজ্ঞানের স্থূলসূত্রগুলি কণ্ঠস্থ করেছি, এবং তার পরিভাষার নামতা মুখস্থ করেছি। যে বিদ্যা প্রয়োগ-প্রধান, কেবলমাত্র তার মন্ত্রের শ্রবণে এবং উচ্চারণে বাঙ্গালী জাতির মোক্ষলাভ হবে না। এক কথায় আমাদের বিজ্ঞান-চর্চ্চা real নয়।

শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের মতে ইতিহাস-চর্চ্চার উদ্দেশ্য সত্যের আবিষ্কার এবং উদ্ধার,—এ সত্য নিত্য এবং গুপ্ত সত্য

নয়, অনিত্য এবং লুপ্ত সত্য,—অতএব এ সত্যের দর্শন লাভের জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য আবশ্যক। অতীতের জ্ঞান লাভ করবার জন্য হীরেন্দ্রবাবুর বর্ণিত বোধীর (Intuition) প্রয়োজন নেই—প্রয়োজন আছে শুধু শিক্ষিত বুদ্ধির। অতীতের অন্ধকারের উপর বুদ্ধির আলো ফেলাই হচ্ছে ঐতিহাসিকের একমাত্র কর্ত্তব্য, —সে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া নয়। অথচ আমরা সে অন্ধকারে শুধু ঢিল নয়, পাথর ছুঁড়ছি,—ফলে পূর্ব্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের ঐতিহাসিকদের দেহ পরস্পারের শিলাঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে পড়ছে। এক-কথায় আমাদের ইতিহাস-চর্চ্চা critical নয়।

অতএব দেখা গেল যে, সম্মিলনের সকল শাখাপতি এ বিষয়ে একমত যে, কিছু হচ্ছে না। কিন্তু কি যে হচ্ছে, সে কথা বলেছেন স্বয়ং সভাপতি। তিনি বল্লেন বাঙ্গলা-সাহিত্যে যা হচ্ছে, তার নাম চুট্‌কি। এ কথা লাখ কথার এক কথা। সকলেই জানেন যে, যখন আমরা ঠিক কথাটি ধরতে না পারি, তখনই আমরা লাখ কথা বলি। এই "চুট্‌কি" নামক বিশেষণটি খুঁজে না পাওয়ায়, আমরা বঙ্গ-সরস্বতীর গায়ে "বিজাতীয়" "অভিজাতীয়" "অবাস্তব" "অবান্তর" প্রভৃতি নানা নামের ছাপ মেরেছি—অথচ তার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারি নি।

তার কারণ—এ সকল ছোট ছোট বিশেষণের অর্থ কি, তার ব্যাখ্যা করতে বড় বড় প্রবন্ধ লিখতে হয়, কিন্তু চুট্‌কি যে কি পদার্থ তা যে আমরা সকলেই জানি, তার প্রমাণ হাতে-হাতেই দেওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অভিভাষণ যে চুট্‌কি নয়, এ কথা স্বয়ং শাস্ত্রীমহাশয়ও স্বীকার করতে বাধ্য—কেননা

এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, ভাবে ও ভাষায় এর চাইতে ভারি অঙ্গের গন্থবন্ধ জর্ম্মানীর বাইরে পাওয়া দুষ্কর।

হীরেন্দ্রবাবুর অভিভাষণও চুট্‌কি নয়। তবে শাস্ত্রীমহাশয় এ মতে সায় দেবেন কি না জানিনে, কেননা হীরেন্দ্রবাবুর প্রবন্ধ একে সংক্ষিপ্ত, তার উপর আবার সহজবোধ্য, অর্থাৎ সকল দেশের সকল যুগের সকল দার্শনিক তত্ত্ব যে পরিমাণে বোঝা যায়, হীরেন্দ্রবাবুর দার্শনিক তত্ত্বও ঠিক সেই পরিমাণে বোঝা যায়—তার কমও নয়, বেশিও নয়। শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে, যে কাব্য মহাকায়, তাই হচ্ছে মহাকাব্য। গজমাপে যদি সাহিত্যের মর্য্যাদা নির্ণয় করতে হয়, তাহলে হীরেন্দ্রবাবুর রচনা অবশ্য চুট্‌কি—কেননা, তার ওজন যতই হোক্ না কেন, তার আকার ছোট।

অপরপক্ষে শাস্ত্রীমহাশয়ের অভিভাষণযুগল যে চুট্‌কি-অঙ্গের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

শাস্ত্রীমহাশয়ের নিজের কথা এই :—"একখানি বই পড়িলাম, অমনি আমার মনের ভাব আমূল পরিবর্ত্তন হইয়া গেল, যতদিন বাঁচিব ততদিন সেই বইয়ের কথাই মনে পড়িবে, এবং সেই আনন্দেই বিভোর হইয়া থাকিব"—এ রকম যাতে হয় না, তারি নাম চুট্‌কি। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে জিজ্ঞাসা করি বাঙ্গলায় এ রকম কজন পাঠক আছেন যাঁরা বুকে হাত দিয়ে বল্‌তে পারেন যে, শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রবন্ধ পড়ে তাঁদের ভিতরটা সব ওলটপালট হয়ে গেছে?

শাস্ত্রীমহাশয় বাঙ্গলা-সাহিত্যে চুট্‌কির চেয়ে কিছু বড় জিনিষ চান। বড় বইয়ের যদি ধর্ম্মই এই হয় যে, তা পড়বামাত্র

আমাদের মনের ভাবের আমূল পরিবর্ত্তন হয়ে যাবে,—তাহলে সেরকম বই যত কম লেখা হয় ততই ভাল, কারণ দিনে একবার করে যদি পাঠকের অন্তরাত্মার আমূল পরিবর্ত্তন ঘটে—তাহলে বড় বই লেখবার লোক যেমন বাড়্‌বে, পড়বার লোকও তেমনি কমে আস্‌বে। তিনি চুট্‌কির সম্বন্ধে যে দুটি ভাল কথা বলেন নি তা নয়—কিন্তু সে অতি মুরুব্বিয়ানা করে। ইংরাজেরা বলেন, স্বল্পস্তুতির অর্থ অতিনিন্দা। সুতরাং আত্মরক্ষার্থ চুটকি সম্বন্ধে তাঁর মতামত আমাদের পক্ষে একটু যাচিয়ে দেখা দরকার। তিনি বলেন—চুট্‌কির একটি দোষ আছে, "যখনকার তখনই, বেশি দিন থাকে না।" এ কথা যে ঠিক নয়—তা তাঁর উক্তি থেকেই প্রমাণ করা যায়। সংস্কৃত অভিধানে চুট্‌কি শব্দ নেই,—কিন্তু ও বস্তু যে সংস্কৃত-সাহিত্যে আছে, সে কথা শাস্ত্রীমহাশয়ই আমাদের বলে দিয়েছেন। তাঁর মতে "কালিদাস ও ভবভূতির পর চুট্‌কি আরম্ভ হইয়াছিল, কেননা শতক, দশক, অষ্টক, সপ্তশতী, এই সব ত চুট্‌কি সংগ্রহ ছাড়া আর কিছুই নয়।" তথাস্তু। শাস্ত্রীমহাশয়ের বর্ণিত সংস্কৃত চুট্‌কির দুটি একটি নমুনার সাহায্যেই দেখানো যেতে পারে যে, আর্য্যযুগেও চুট্‌কি কাব্যাচার্য্যদিগের নিকট অতি উপাদেয় ও মহার্হ বস্তু বলেই প্রতিপন্ন হত। ভর্ত্তৃহরির শতক তিনটি সকলের নিকটই সুপরিচিত, এবং "গাথা সপ্তশতী"ও বাঙ্গলাদেশে একেবারে অপরিচিত নয়। ভর্ত্তৃহরি ভবভূতির পূর্ব্ববর্ত্তী কবি, কেননা জনরব এই যে তিনি কালিদাসের ভ্রাতা, এবং ইতিহাসের অভাবে কিম্বদন্তীই প্রামাণ্য। সে যাই হোক, "গাথা সপ্তশতী" যে কালিদাসের জন্মের অন্ততঃ দু তিন শ' বছর পূর্ব্বে সংগৃহীত

হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। তাহলে দাঁড়ালো এই যে, আগে আসে চুট্‌কি, তারপর আসে মহাকাব্য এবং মহানাটক। অভিব্যক্তির নৈসর্গিক নিয়মই এই যে, এ জগতে সব জিনিসই ছোট থেকে ক্রমে বড় হয়। সাহিত্যও ঐ একই নিয়মের অধীন। তার পর পূর্ব্বোক্ত শতকত্রয় এবং পূর্ব্বোক্ত সপ্তশতী যখনকার তখনকারই নয়,—চিরদিনকারই। এ মত আমার নয়—বাণভট্টের। গাথা সপ্তশতী শুধু চুট্‌কি নয়—একেবারে প্রাকৃত-চুট্‌কি,—তথাপি শ্রীহর্ষকারের মতে—

"অবিনাশিনমগ্রাম্যমকরোৎসাতবাহনঃ।
বিশুদ্ধ জাতিভিঃ কোশং রত্নৈরিব সুভাষিতৈঃ॥"

তারপর ভর্তৃহরি যে এক-ন'র পান্না, এক-ন'র চুণী এবং এক-ন'র নীলা—এই তিন-ন'র রত্নমালা সরস্বতীর কণ্ঠে পরিয়ে গেছেন,—তার প্রতি রত্নটি যে বিশুদ্ধ জাতীয় এবং অবিনাশী, তার আর সন্দেহ নেই। যাবচ্চন্দ্র দিবাকর এই তিন শত বর্ণোজ্জ্বল শ্লোক সরস্বতীর মন্দির অহর্নিশি আলোকিত করে রাখবে।

আসল কথা, চুট্‌কি যদি হেয় হয়, তাহলে কাব্যের চুট্‌কিত্ব তার আকারের উপর নয়, তার প্রকারের অথবা বিকারের উপর নির্ভর করে—নচেৎ সমগ্র সংস্কৃত কাব্যকে চুটকি বল্‌তে হয়। কেননা সংস্কৃত ভাষায় চার ছত্রের বেশি কবিতা নেই—কাব্যেও নয়, নাটকেও নয়। শুধু কাব্য কেন, হাতে-বহরে বেদও চুট্‌কির অন্তর্ভূত হয়ে পড়ে। শাস্ত্রীমহাশয় বলেন যে, বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ বুদ্ধিমান ব'লে বেদাভ্যাস করেন না। কর্ণবেধের জন্য যতটুকু বেদ দরকার, ততটুকুই এদেশে ব্রাহ্মণ সন্তানের করায়ত্ত। অথচ

বাঙ্গালী বেদপাঠ না করেও এ কথা জানে যে, ঋক্ হচ্চে ছোট কবিতা, এবং সাম গান। সুতরাং আমরা যখন ছোট কবিতা ও গান রচনা করি, তখন আমরা ভারতবর্ষের কাব্যরচনার সনাতন রীতিই অনুসরণ করি।

শাস্ত্রীমহাশয় মুখে যাই বলুন—কাজে তিনি চুট্‌কিরই পক্ষপাতী। তিনি আজীবন চুট্‌কিতেই গলা সেধেছেন, চুট্‌কিতেই হাত তৈরি করেছেন,—সুতরাং কি লেখায়, কি বক্তৃতায়, আমরা তাঁর এই অভ্যস্ত বিদ্যারই পরিচয় পাই। তিনি বাঙ্গালীর যে বিংশপর্ব্ব মহাগৌরব রচনা করেছেন, তা ঐতিহাসিক চুট্‌কি বই আর কিছুই নয়,—অন্ততঃ সে রচনাকে শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় অন্য কোনও নামে অভিহিত করবেন না।

একথা নিশ্চিত যে, তিনি সরকারমহাশয়ের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করেন নি, সম্ভবতঃ এই বিশ্বাসে যে বৈজ্ঞানিক-পদ্ধতি অনুসারে আবিষ্কৃত সত্য বাঙ্গালীর পক্ষে পুষ্টিকর হতে পারে, কিন্তু রুচিকর হবে না। সরকারমহাশয় বলেন যে এদেশের ইতিহাসের সত্য যতই অপ্রিয় হোক্—বাঙ্গালীকে তা বল্‌তেও হবে, শুন্‌তেও হবে। অপর পক্ষে শাস্ত্রীমহাশয়ের উদ্দেশ্য তাঁর রচনা লোকের মুখরোচক করা, এবং সেই উদ্দেশ্য সাধন করবার জন্য তিনি নানারকম সত্য ও কল্পনা এক-সঙ্গে মিলিয়ে ঐতিহাসিক সাড়ে-বত্রিশ-ভাজার সৃষ্টি করেছেন। ফলে এ রচনায় যে মাল আছে তাও মশলা থেকে পৃথক করে নেওয়া যায় না। শাস্ত্রীমহাশয়ের কথিত বাঙ্গলার পুরাবৃত্তের কোনও ভিত্তি আছে কি না বলা কঠিন। তবে এ ইতিহাসের যে গোড়াপত্তন করা হয় নি—সে বিষয়ে আর

দ্বিমত নেই। ইতিহাসের ছবি আঁকতে হলে প্রথমে ভূগোলের জমি করতে হয়। কোনও একটি দেশের সীমার মধ্যে কালকে আবদ্ধ না করতে পারলে, সে কালের পরিচয় দেওয়া যায় না। অসীম আকাশের জিওগ্রাফি নেই—অনন্ত কালেরও হিষ্টরি নেই। কিন্তু শাস্ত্রীমহাশয় সেকালের বাঙ্গালীর পরিচয় দিতে গিয়ে সেকালের বাঙ্গলার পরিচয় দেন নি,—ফলে গৌরবটা উত্তরাধিকারী-স্বত্বে আমাদের কি অপরের প্রাপ্য—এ বিষয়েও সন্দেহ থেকে যায়। শাস্ত্রীমহাশয়ের শক্ত হাতে পড়ে দেখতে পাচ্ছি অঙ্গ ভয়ে বঙ্গের ভিতর সেঁধিয়েছে—কেননা যে "হস্ত্যায়ুর্ব্বেদ" আমাদের সর্ব্বপ্রথম গৌরব, সে শাস্ত্র অঙ্গরাজ্যে রচিত হয়েছিল। বাঙ্গলার লম্বাচৌড়া অতীতের গুণবর্ণনা করতে হলে, বাঙ্গলা দেশটাকেও একটু লম্বাচৌড়া করে নিতে হয়, সম্ভবতঃ সেই জন্য শাস্ত্রীমহাশয় আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের হয়ে অঙ্গকেও বে-দখল করে বসেছেন। তাই যদি হয়, তাহলে বরেন্দ্র-ভূমিকে ছেঁটে দেওয়া হ'ল কেন? শুনতে পাই বাঙ্গলার অসংখ্য প্রত্নরাশি বরেন্দ্রভূমি নিজের বুকের ভিতর লুকিয়ে রেখেছে। বাঙ্গলার পূর্ব্বগৌরবের পরিচয় দিতে গিয়ে বাঙ্গলার যে ভূমি সব চেয়ে প্রত্নগর্ভা, সে প্রদেশের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ না করবার কারণ কি? যদি এই হয় যে, পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গের আদৌ কোন অস্তিত্ব ছিল না, এবং থাকলেও সে দেশ বঙ্গের বহির্ভূত ছিল—তাহলে সে কথাটাও বলে দেওয়া উচিত। নচেৎ বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি আমাদের মনে একটা ভুল ধারণা এমনি বদ্ধমূল করে দেবে যে, তার "আমূল পরিবর্ত্তন" কোনও চুটকি ইতিহাসের দ্বারা সাধিত হবে না।

শাস্ত্রীমহাশয় যে তাম্রশাসনে শাসিত নন্ তার প্রমাণ, তিনি পাতায় পাতায় বলেন "আমি বলি" "আমার মতে" এই সত্য। এর থেকেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, শাস্ত্রীমহাশয়ের ইতিহাস বস্তুতন্ত্রতার ধার ধারে না, অর্থাৎ এক কথায় তা কাব্য—এবং যখন তা কাব্য, তখন তা যে চুট্‌কি হবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

শাস্ত্রীমহাশয়ের দেখতে পাই আর একটি এই অভ্যাস আছে যে, তিনি নামের সাদৃশ্য থেকে পৃথক পৃথক বস্তু এবং ব্যক্তির ঐক্য প্রমাণ করেন। একীকরণের এ পদ্ধতি অবশ্য বৈজ্ঞানিক নয়। কৃষ্ট এবং খৃষ্ট, এ দুটি নামের যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকলেও, ও দুটি অবতারের প্রভেদ শুধু বর্ণগত নয়, বর্গগতও বটে। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয়ের অবলম্বিত পদ্ধতির এই একটি মহাগুণ যে, ঐ উপায়ে অনেক পূর্ব্বগৌরব আমাদের হাতে আসে, যা বৈজ্ঞানিক হিসাবে ন্যায়তঃ অপরের প্রাপ্য। কিন্তু উক্ত উপায়ে অতীতকে হস্তান্তর করার ভিতর বিপদও আছে। একদিকে যেমন গৌরব আসে—অপরদিকে তেমনি অগৌরবও আস্‌তে পারে। অগৌরব শুধু যে আস্‌তে পারে তাই নয়, বস্তুতঃ এসেওছে।

স্বয়ং শাস্ত্রীমহাশয় ঐতরেয় আরণ্যক হতে এই সত্য উদ্ধার করেছেন যে, প্রাচীন আর্য্যেরা বাঙ্গালী-জাতিকে পাখী বলে গালি দিতেন। সে বচনটি এইঃ—

"বয়াংসি বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা"

প্রথম পরিচয়ে আর্য্যেরা যে বাঙ্গালী জাতির সম্বন্ধে অনেক অকথা কুকথা বলেন, তার পরিচয় আমরা এ যুগেও পেয়েছি। Vide Macaulay. সুতরাং প্রাচীন আর্য্যেরাও যে প্রথম পরিচয়ে

বাঙ্গালীদের প্রতি নানারূপ কটূকাটব্য প্রয়োগ করেছিলেন, এ কথা সহজেই বিশ্বাস হয়। তবে এ ক্ষেত্রে এই সন্দেহ উপস্থিত হয় যে, যদি গালি দেওয়াই তাঁদের অভিপ্রায় ছিল তাহলে আর্য্যেরা আমাদের পাখী বল্‌লেন কেন? পাখী বলে গাল দেবার প্রথা ত কোনও সভ্যসমাজে প্রচলিত দেখা যায় না। বরং "বুলবুল" "ময়না" প্রভৃতি এদেশে আদরের ডাক বলেই গণ্য। এবং ব্যক্তি-বিশেষের বুদ্ধির প্রশংসা করতে হলে আমরা তাকে "ঘুঘু" উপাধিদানে সম্মানিত করি। অপমান করবার উদ্দেশ্যে মানুষকে যে সব প্রাণীর সঙ্গে তুলনা করা হয়ে থাকে, তারা প্রায়শঃই ভূচর এবং চতুষ্পাদ;—দ্বিপদ এবং খেচর নয়। পাখী বলে নিন্দা করবার একটি মাত্র শাস্ত্রীয় উদাহরণ আমার জানা আছে। বাণভট্ট তাঁর সমসাময়িক কুকবিদের কোকিল বলে ভর্ৎসনা করেছেন—কেননা তারা বাচাল, কামকারী, এবং তাদের "দৃষ্টি রাগাধিষ্ঠিত"—অর্থাৎ তাদের চক্ষু রক্তবর্ণ। গাল হিসেবে এ যে যথেষ্ট হ'ল না—সে কথা বাণভট্টও বুঝেছিলেন, কেননা পরবর্ত্তী শ্লোকেই তিনি বলেছেন যে, কুকুরের মত কবি ঘরে ঘরে অসংখ্য মেলে, কিন্তু শরভের মত কবি মেলাই দুর্ঘট। এস্থলে কবিকে প্রশংসাচ্ছলে কেন শরভ বলা হল—একথা যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন,– তার উত্তর, শরভ জানোয়ার হলেও চতুষ্পদ নয়, অষ্টপদ,—এবং তার অতিরিক্ত চারিখানি পা ভূচর নয়, খেচর।

এই সব কারণে কেবলমাত্র শব্দের সাদৃশ্য থেকে এ অনুমান করা সঙ্গত হবে না যে, আর্য্য ঋষিরা অপর এত কড়াকড়া গাল থাক্‌তে আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কেবলমাত্র পাখী বলে গাল

দিয়েছেন। শাস্ত্রীমহাশয়ের মতে আমাদের সঙ্গে মাগধ এবং চের জাতিও এ গালির ভাগ পেয়েছে। কেননা তাঁর মতে বঙ্গা হচ্ছে বাঙ্গালী, বগধা হচ্ছে মগধা, এবং চেরপাদা হচ্ছে চের নামক অসভ্য জাতি। "চেরপাদা" যে কি করে "চের"তে দাঁড়াল, তা বোঝা কঠিন। বাক্যের পদচ্ছেদের অর্থ পা কেটে ফেলা নয়। অথচ শাস্ত্রী মহাশয় "চেরপাদা"র পাদুখানি কেটে ফেলেই "চের" খাড়া করেছেন।

"বঙ্গাবগধাশ্চেরপাদা"—এই যুক্তপদের শুনতে পাই সেকেলে পণ্ডিতেরা এইরূপ পদচ্ছেদ করেন—

বঙ্গা + অবগধাঃ + চ + ইরপাদা।

ইরপাদা অর্থে সাপ। তাহলে দাঁড়াল এই যে, বাঙ্গালী ও বেহারীকে প্রথমে পাখী এবং পরে সাপ বলা হয়েছে। উক্ত বৈদিক নিন্দার ভাগ আমি বেহারীদের দিতে পারিনে। অবগধা মানে যে মাগধা, এর কোনও প্রমাণ নেই। অতএব শাস্ত্রীমহাশয় যেমন "চেরপাদা"র শেষ দুই বর্ণ ছেঁটে দিয়ে "চের" লাভ করেছেন, আমিও তেমনি "অবগধা" শব্দের প্রথম দুটি বর্ণ বাদ দিয়ে পাই "গধা"। এইরূপ বর্ণ-বিচ্ছেদের ফলে উক্ত বচনের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আর্য্য ঋষিদের মতে বাঙ্গালী আদিতে পক্ষী, অন্তে সর্প, এবং ইতিমধ্যে গর্দ্দভ।

"অবগধা"কে "গধা"য় রূপান্তরিত করা সম্বন্ধে কেউ কেউ এই আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন যে, সেকালে যে গাধা ছিল, তার কোনও প্রমাণ নেই। শাস্ত্রীমহাশয় বাঙ্গালীর প্রথম গৌরবের কারণ দেখিয়েছেন যে, পুরাকালে বাঙ্গলায় হাতি ছিল—কিন্তু বাঙ্গালীর দ্বিতীয় গৌরবের এ কারণ দেখান নি যে, সেকালে এদেশে গাধাও ছিল। কিন্তু গাধা যে ছিল, এ অনুমান করা

অসঙ্গত হবে না। কেননা যদি সেকালে গাধা না থাকৃত ত একালে এদেশে এত গাধা এল কোথা থেকে? ঘোড়া যে বিদেশ থেকে এসেছে, তার পরিচয় ঘোড়ার নামেই পাওয়া যায়, যথা—পগেয়া, ভুটিয়া, তাজি, আরবী ইত্যাদি। কিন্তু গর্দ্দভদের এরূপ কোনও নামরূপের প্রভেদ দেখা যায় না। এবং ও জাতি যে, যে-কোনও অর্ব্বাচীন যুগে বঙ্গদেশে এসে উপনিবেশ স্থাপন করেছে, তারও কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই।—অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে—রাসভকুল অপর সকল দেশের ন্যায় এদেশে এখনও আছে, পূর্ব্বেও ছিল। তবে একমাত্র নামের সাদৃশ্য থেকে এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত হবে যে, আর্য্য ঋষিরা পুরাকালের বাঙ্গালীদের এরূপ তিরস্কারে পুরস্কৃত করেছেন। সংস্কৃত ভাষায় "বঙ্গ" শব্দের অর্থ বৃক্ষ। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, আরণ্যক শাস্ত্রে বৃক্ষ পক্ষী সর্প প্রভৃতি আরণ্য জীবজন্তুরই উল্লেখ করা হয়েছে—বাঙ্গালীর নামও করা হয় নি।—অতএব আমাদের অতীত অতি গৌরবেরও বস্তু নয়—অতি অগৌরবেরও বস্তু নয়।

আর একটি কথা। হীরেন্দ্রবাবু দর্শন-শব্দের, এবং যোগেশ বাবু বিজ্ঞান-শব্দের নিরুক্তের আলোচনা করেছেন, কিন্তু যদুবাবু ইতিহাসের নিরুক্ত সম্বন্ধে নীরব। ইতিহাস-শব্দ সম্ভবতঃ হস ধাতু হতে উৎপন্ন—অন্ততঃ শাস্ত্রীমহাশয়ের ইতিহাস যে হাস্যরসের উদ্রেক করে, সে বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। এমন কি, আমার সময়ে সময়ে মনে হয় যে, শাস্ত্রীমহাশয় পুরাতত্ত্বের ছলে আত্মশ্লাঘাপরায়ণ বাঙ্গালী জাতির সঙ্গে একটি মস্ত রসিকতা করেছেন।

বীরবল।

হিতসাধন

সেদিন কলিকাতায় এক হিতসাধন মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এবং দেশের প্রধান-প্রধান ব্যক্তি ইহাতে যোগ দিয়াছেন। ইহা সুলক্ষণ, ইহাই ত চাই, ইহাই যে আমাদের সাধন। এই হিতসাধন-সম্বন্ধে বেদপথিক হিন্দুগণ কিরূপ চিন্তা করিয়াছেন, এ সময়ে তাহা একবার আলোচনা করা মন্দ নহে; আমি এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অতিসংক্ষিপ্ত ভাবে তাহাই করিবার চেষ্টা করিব।

দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, বেদপন্থীদের সমাজের নানাস্থানে বর্ত্তমান দুরবস্থা দর্শন করিয়া অনেকে তাঁহাদের ধর্ম্মকে পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ধর্ম্মের আদর্শকেও তাঁহারা নিতান্ত সঙ্কীর্ণ ভাবে ধরিয়া লইয়া থাকেন। ধর্ম্ম, ধর্ম্মের আদর্শ মহান্-অতিমহান্ হইলেও যদি তাহা অনুষ্ঠান করা না হয়, অনুভব করিবার চেষ্টা করা না হয়, তবে তাহা ক্ষুদ্র-অতিক্ষুদ্র ভাবে যে প্রতীয়মান হইবে, তাহা বিস্ময়াবহ নহে। কিন্তু ইহা ধর্ম্ম বা ধর্ম্মের আদর্শের দোষ নহে, লোকের অজ্ঞান-অশিক্ষা, আলস্য অনভ্যাস প্রভৃতিই এখানে দোষ। নিরুক্তকার এক স্থানে বলিয়াছেন —"নৈষ স্থাণোরপরাধো যদেনমন্ধো ন পশ্যতীতি।" অন্ধ যে স্থাণুকে দেখিতে পায় না, তাহা স্থাণুর দোষ নহে। বেদপন্থীর হিতসাধনের আদর্শ আমাদের এই কথাটিকে সমর্থন করিবে।

বেদপন্থী ত্রিকোটিকুলোদ্ধার ফল দেখাইয়া সাধারণ লোককে পুণ্যানুষ্ঠানে প্রলোভিত করিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহাও সত্য যে,

সঙ্গে-সঙ্গেই সেই অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল "ব্রহ্মার্পণমস্তু" বলিয়া পরিত্যাগ করিবার জন্য বলা হইয়াছে, কারণ "ফলে সক্তো নিবধ্যতে।" এ সম্বন্ধে এখানে বাহুল্যের প্রয়োজন নাই।

যে ধর্ম্মের সর্ব্বসার কথা এবং সমস্ত জ্ঞান-সাধনের চরম লক্ষ্য হইয়াছে সমস্ত ভূতের মধ্যে আত্মাকে, এবং সমস্ত ভূতকে আত্মার মধ্যে দেখিতে হইবে; সমস্ত ভূতের মধ্যে ভগবান্‌কে, এবং সমস্ত ভূতকে ভগবানের মধ্যে দেখিতে হইবে; আমার মনে হয়, সেই ধর্ম্মে বিশ্বহিতসাধন যেরূপ সুন্দর আকার ধারণ করিতে পারে, এবং বস্তুতও করিয়াছে, অপর ধর্ম্মে সেরূপ করিতে পারে না।

বেদপন্থীর ধর্ম্মে এই কথা বলে যে, এই যে, স্থাবর-জঙ্গমময় বিশ্ব, ইহা ভগবানের শরীর, ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ, বায়ু ইত্যাদি অষ্ট মূর্ত্তি দ্বারা তিনি এই বিশ্বকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। এই বিশ্ব-স্থিত কোনো দেহীর কোনরূপ পীড়ন করিলে অষ্টমূর্ত্তিধর ভগবানের তাহা অভিমত হয় না, তাহা তাঁহার অপ্রীতিকর। কারণ, সকলের উপকার করা, সকলকে অনুগ্রহ করা এবং সকলকে অভয়প্রদান করাই শিবের পূজা। বেদান্তদর্শনের শৈবভাষ্যকার শ্রীকণ্ঠ (১, ২, ১) পুরাণের এই বচন তুলিয়াছেন :—

> "বিগ্রহং দেবদেবস্য জগদেতচ্চরাচরম্।
> এতমর্থং ন জানন্তি পশবঃ পাশ গৌরবাৎ॥
> বিদ্যেতি চেতনাং প্রাহুস্তথাবিদ্যামচেতনাম্।
> বিদ্যাবিদ্যাত্মকং সর্ব্বং বিশ্বং বিশ্বগুরোর্বিভোঃ॥
> রূপমস্য ন সন্দেহো বিশ্বং তস্য বশে যতঃ॥

* * *

দেহিনো যস্য কস্যাপি নিগ্রহঃ ক্রিয়তে যদি ।
অনিষ্টগস্টমূর্ত্তেস্তন্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥"

"সর্ব্বোপকারকরণং সর্ব্বানুগ্রহণং তথা ।
সর্ব্বাভয় প্রদানঞ্চ শিবস্যারাধনং বিদুঃ ॥"

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে (২-৩৩) উক্ত হইয়াছে—

কৃতে বিশ্বহিতে দেবি বিশ্বেশঃ পরমেশ্বরি ।
প্রীতো ভবতি বিশ্বাত্মা যতো বিশ্বং তদাশ্রিতম্ ॥ *

শ্রীমদ্ভাগবতে এই কথাটা নানাস্থানে নানারকম বলা হইয়াছে। কপিলমূর্ত্তি ভগবান্ জননীকে বলিতেছেন ঃ—

আমি সমস্ত ভূতের আত্মা ; আমি সমস্ত ভূতে রহিয়াছি ; এই আমাকে অবজ্ঞা করিয়া মানব প্রতিমা দ্বারা অনুকরণ করিয়া থাকে। আমি ঈশ্বর, আমি সকলের আত্মা, আমি সমস্ত ভূতে রহিয়াছি ; এই আমাকে উপেক্ষা করিয়া যে ব্যক্তি প্রতিমার ভজন করে, তাহার ভস্মে আহুতি প্রদান করা হয়। অন্যেরও শরীরে আমিই রহিয়াছি, যে ব্যক্তি এইরূপে অলক্ষিত আমাকে দ্বেষ করে, যে ব্যক্তির ভূতসমূহের প্রতি বৈরবুদ্ধি থাকে, সেই ভেদদর্শীর মন কখনো শান্তি লাভ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি ভূতগ্রামের অবমাননা করিয়া থাকে, সে নানাবিধ উপকরণ-সম্ভারে প্রতিমাতে আমার পূজা করিলেও আমি তাহাতে সন্তুষ্ট

* দ্রষ্টব্য (ঐ, ২-২৭)—"সর্ব্বলোকোপকারায় সর্ব্বপ্রাণিহিতায় চ।

হই না। আমি সর্ব্বভূতে অবস্থিত ঈশ্বর—এইরূপে যতক্ষণ আমাকে নিজহৃদয়ে জানিতে না পারিবে, ততক্ষণই প্রতিমায় পূজা করিতে হয়। যে ব্যক্তি নিজের ও পরের মধ্যে স্বল্পমাত্রও ভেদ করিয়া থাকে, মৃত্যু সেই ভেদদর্শীর জন্য ভীষণ ভয়ের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন।

অতএব, এই যে আমি সমস্ত ভূতের আত্মা,—সমস্ত ভূতের মধ্যে বাস করিতেছি, সেই আমাকে দান, মান, মৈত্রী ও অভেদ দৃষ্টি দ্বারা পূজা করিবে।

মূল শ্লোক কয়টি পাঠকবর্গের হৃদয়াকর্ষক হইল বলিয়া উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি ঃ—

"অহং সর্ব্বেষু ভূতেষু ভূতাত্মাবস্থিতঃ সদা।
তমবজ্ঞায় মাং মর্ত্ত্যঃ কুরুতেঽর্চ্চা বিড়ম্বনম্॥
যো মাং সর্ব্বেষু ভূতেষু সন্তমাত্মানমীশ্বরম্।
হিত্বার্চ্চাং ভজতে মৌঢ্যাদ্ ভস্মন্যেব জুহোতি সঃ॥
দ্বিষতঃ পরকায়ে মাং মানিনো ভিন্নদর্শিনঃ।
ভূতেষু বদ্ধবৈরস্য ন মনঃ শান্তিমৃচ্ছতি॥
অহমুচ্চাবচৈর্দ্রব্যৈঃ ক্রিয়য়োৎপন্নয়ানঘে।
নৈব তুষ্যেঽর্চ্চিতোঽর্চ্চায়াং ভূতগ্রামাবমানিনঃ॥
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েৎ তাবদীশ্বরং মাং স্বকর্ম্মকৃৎ।
যাবন্ন বেদ স্বহৃদি সর্ব্বভূতেষ্ববস্থিতম্॥
আত্মনশ্চ পরস্যাপি যঃ করোত্যন্তরোদরম্।
তস্য ভিন্নদৃশো মৃত্যুর্বিদধে ভয়মুল্বণম্॥

অথ মাং সর্ব্বভূতেষু ভূতাত্মানং কৃতালয়ম্ ।
অর্হয়েদ্ দানমানাভ্যাং মৈত্র্যাভিন্নেন চক্ষুষা ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ৩-২৯-২১—২৭।

মানব যখন এইরূপে দর্শন করিতে শিক্ষা করে, তখন কেবল মানুষ নহে, সমস্ত জীবের নিকট সে প্রণত হয়, সমস্ত জীবকেই বহু মান প্রদান করে; সে ভাবে জীবরূপে ভগবানই তাহাদের মধ্যে রহিয়াছেন :—

"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহু মানয়ন্ ।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥"

৩-২৯-৩৩।

"প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভূমা-বাশ্ব-চণ্ডাল-গো-খরম্ ।"

১১-২৯-১৬।

মানব তখন পণ্ডিত হয়, তাহার নিকট ব্রাহ্মণ-চণ্ডালের ভেদ থাকে না :—

ব্রাহ্মণে পুল্কশে স্তেনে ব্রহ্মণ্যেঽর্কে স্ফুলিঙ্গকে ।
অক্রূরে ক্রূরকে চৈব সমদৃক্ পণ্ডিতো মতঃ ॥

১১-২৯-১৪।

বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৫-১৮।

এইরূপ ভাব, হইলেই মানব তখন নিজের সুখসম্পদের কথা

ভুলিয়া বিশ্বের দুঃখের ভার নিজের মস্তকে লইবার জন্য দাঁড়াইয়া উঠে :—

"ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরাম্
অষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিল দেহ ভাজাম্
অন্তঃস্থিতো, যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত, ৯-২১-১২।

ভগবানের নিকট আমি ইহা প্রার্থনা করি না যে, আমার অনিমাদি অষ্ট সিদ্ধি-যুক্ত পরম গতি হউক, বা অপুনর্জন্ম হউক। আমি ইহাই প্রার্থনা করি, যেন আমি সমস্ত দেহীর অন্তঃকরণ-স্থিত হইয়া তাহাদের দুঃখ-পীড়াকে গ্রহণ করিতে পারি,—যাহাতে তাহাদিগকে আর দুঃখভোগ করিতে না হয়।

হৃদয়ে যেমন-যেমন এই ভাব পরিস্ফুট হইয়া দৃঢ় হইতে থাকিবে, মানব তেমন-তেমন সুন্দরভাবে বিশ্বের হিতসাধনে নিযুক্ত হইতে পারিবে। সভা সমিতির দ্বারা বাহিরে যেমন চেষ্টা করা হইতেছে, ভাবনা দ্বারা ভিতরেও সেইরূপ চেষ্টা করিলে মণিকাঞ্চন-যোগ হইবে। বাহিরের ভাব দেহ, ভিতরের ভাব প্রাণ। প্রাণবিরহিত দেহ বেশীক্ষণ টিকিয়া থাকে না। আমাদিগকে প্রাণের উপাসনা করিতে হইবে।

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য।

৺দ্বিজেন্দ্রলালের স্মৃতিসভায় কথিত

আমি এ সভায় কোনরূপ বক্তৃতা করবার অভিপ্রায়ে উপস্থিত হইনি, যদিচ সেক্রেটারি মহাশয়ের নিমন্ত্রণ পত্রে আমার নাম বক্তা-শ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত করা হয়েছে। সভা সমিতিতে বক্তৃতা করার অভ্যাস আমার নেই—এবং অনভ্যাস বশতঃ সবার সুমুখে মুখ খুলতে আমার সঙ্কোচও হয়, ভয়ও হয়। এ ক্ষেত্রে ৺দ্বিজেন্দ্রলালের কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে, অপ্রতিভভাবে, উপস্থিতমত যা মনে আসে, দুচার কথা বলে' দেওয়া আমার মতে উচিত ব্যবহার হবে না—না তাঁর প্রতি—না আমার প্রতি।

তবে যে আমি বিনা আপত্তিতে, সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধ রক্ষা করতে উদ্যত হয়েছি, তার কারণ, তিনি যখন ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আমার আজীবন বন্ধুত্বের দোহাই দিয়ে আমাকে কিছু বলবার জন্য অনুরোধ করেছেন, তখন সে অনুরোধ আমি আদেশ হিসেবে প্রতিপালন করতে বাধ্য। সভাপতি মহাশয় যা যা বলেছেন সে সবই সত্য। ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গে আমার যখন প্রথম পরিচয় হয়, তখন আমার বয়েস পাঁচ এবং তাঁর দশ কি এগারো। এবং আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ঐকান্তিক সদ্ভাব কখনও নষ্ট হয় নি। সাহিত্যে আমাদের মতান্তর ঘটেছে, কিন্তু জীবনে কখনও মনান্তর ঘটে নি। উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর ভিতর বোধ হয় অনেকেই জানেন যে, বঙ্গসাহিত্যের আখড়ায় আমি তাঁর সঙ্গে লকড়ি খেলেছি, কিন্তু সে আপোষে। এ খেলায়

আমরা পরস্পর পরস্পরকে ফাঁক দেখিয়ে দিয়েছি। তবে দু' এক বাড়ি যে গায়ে পড়েনি এ কথা বল্‌তে পারিনে। কিন্তু তার জন্য আমাদের ক্ষণিক গাত্রজ্বালা উপস্থিত হ'লেও, স্থায়ী মনোমালিন্য ঘটেনি। এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে, যে এই আশৈশব সোহার্দ্দ্যের ফলে, আমি ৺দ্বিজেন্দ্রলালের মনের এবং চরিত্রের সম্যক্ পরিচয় লাভ কর্‌বার অনেকটা অবসর পেয়েছি। কিন্তু আজকের সভায়, মানুষ হিসেবে এবং কবি হিসেবে, ৺দ্বিজেন্দ্রলালের গুণাগুণ সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা কর্‌তে আমি প্রস্তুত নই। এ সকল বিষয়ে আমার মতামত আমি ভবিষ্যতে, অবসর মত, লিখে প্রকাশ কর্‌ব। প্রবীন সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় ৺দ্বিজেন্দ্রলালের উপর প্রকাশ্যে যে সকল কটুকথা বর্ষণ করেছেন, আমি এই সুযোগে সেই অযথা নিন্দাবাদের প্রতিবাদ কর্‌তে চাই—কেননা সে নিন্দা রুচিসঙ্গতও নয়, যুক্তি সঙ্গতও নয়।

সরকার মহাশয় গত বৎসর এই কলিকাতা সহরের টাউনহলে, সাহিত্যসম্মিলনের সভাপতির উচ্চমঞ্চে আরোহণ করে' উচ্চৈঃস্বরে এই অপবাদ ঘোষণা করেন যে ৺দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দু সঙ্গীতের সর্ব্বনাশ সাধন করেছেন।

৺দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি সরকার মহাশয়েব আক্রোশ এত অপরিমিত যে তিনি নিজমুখে এই কথা বলেছেন যে, মৃত দ্বিজেন্দ্রলালের উপর ভব্যতার সীমা অতিক্রম করে' আক্রমণ করে'ও তাঁর মনের ক্ষোভ মেটেনি। সরকার মহাশয়ের সমালোচনা যে, ভব্যতার সীমা অতিক্রম করে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

সভ্যসমাজে পরলোকগত ব্যক্তিকে স্বর্গীয় বলেই উল্লেখ করা হয়, কিন্তু সরকার মহাশয় তার পরিবর্ত্তে ৺দ্বিজেন্দ্রলালকে "মৃত" বলে উল্লেখ করেছেন—সম্ভবতঃ এই কারণে যে হিন্দুসঙ্গীতের এই কালা পাহাড়কে তিনি স্বর্গেতর লোকে প্রেরণ করতে চান।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসঙ্গীতের জাতিপাত করেছেন এ অপবাদ যদি সত্য হয় তাহলে ভব্যতার সীমা অতিক্রম করে' নয়, রক্ষা করে', সে কথাটি দেশের লোককে বলা এবং বুঝিয়ে দেওয়া দরকার। বিশেষতঃ ৺দ্বিজেন্দ্রলাল সম্বন্ধে এরূপ সমালোচনার যথেষ্ট সার্থকতা আছে, কেননা এ কবির শ্রেষ্ঠত্ব প্রধানতঃ গান রচনায়। যাঁর সুরজ্ঞান নেই তাঁর পক্ষে গান রচনা করা বিড়ম্বনা মাত্র। সুর বাদ দিয়ে গানের কথায় যা অবশিষ্ট থাকে তা অনেক স্থলে না থাকারই সামিল। অতএব, ৺দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে সরকার মহাশয়ের অভিযোগ যদি সত্য হয়, তাহলে এ কবির রচনার কোনই মূল্য নেই, কোনই মর্য্যাদা নেই; এবং কবি হিসেবে তিনি শুধু উপেক্ষার কেন, অবজ্ঞারও পাত্র।

আজ কাল দেখতে পাই সমালোচকেরা কবিতার ভাব ও ভাষার বিচ্ছেদ ঘটিয়ে এ উভয়ের পৃথক্ সমালোচনা করেন। সমালোচকের মতে এ কবির ভাব মূল্যবান কিন্তু ভাব তদনুরূপ নয়, এবং ও কবির ভাষা চমৎকার কিন্তু ভাব অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু আসল কথা এই যে, ভাব ও ভাষায় দু'য়ে মিলে একবস্তু না হ'লে কবিতা হয় না। প্রদেশের প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা শব্দালঙ্কার এবং অর্থালঙ্কারের পৃথক বর্ণনা এবং তার দোষগুণের পৃথক বিচার করেছেন, কিন্তু এ জ্ঞান তাঁদের ছিল যে, ভাষা

হচ্ছে ভাবের দেহ এবং ভাব ভাষার আত্মা। এবং যে রচনায় প্রাণ আছে—সেখানে এ দু'য়ের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। আমরা ভাব থেকে ভাষা ছাড়িয়ে নিয়ে গড়ি Philology ও Grammar, এবং ভাষা থেকে ভাব ছাড়িয়ে নিয়ে গড়ি Psychology ও Logic। এ সকল শাস্ত্র বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির বিষয়। যা অনুভূতির দিক থেকে, আর্টের দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে সমগ্র, তাই আবার বিচার বুদ্ধির দিক থেকে, বিজ্ঞানের দিক থেকে দেখ্‌তে গেলে সমষ্টি মাত্র। সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে রস—যে রচনায় সে বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়, সে রচনায় ভাব ভাষা পৃথক করা যায় না। কাব্যরস যে কতটা ধ্বনির অধীন, তার পরিচয় আমরা সংস্কৃত কাব্যের বাঙ্গলা অনুবাদে নিত্যই পাই। অপরের কথা দূরে থাক, স্বয়ং কালিদাসের ভারতী বঙ্গভাষাস্থ হয়ে যে কতদূর কাহিল এবং অস্থিচর্ম্মসার হয়ে পড়ে তার প্রমাণ বঙ্গসাহিত্যে দুর্লভ নয়। কবিতার প্রাণ যদি ধ্বনির উপর নির্ভর করে তাহলে গানের প্রাণ যে সম্পূর্ণ সুরের উপর নির্ভর কর্‌বে সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত হতে পারে না। ৺দ্বিজেন্দ্র-লালের সুর যদি গুণীসমাজে অসহ্য এবং অগ্রাহ্য হয় তাহলে তাঁর গানও বাঙ্গালীর নিকট অসহ্য এবং অগ্রাহ্য হত। কিন্তু যখন দেখা যায় যে, সে গান বঙ্গদেশে অতি আদরের সামগ্রী তখন যিনি গানের 'গা'ও জানেন না তিনিও ধরে' নিতে পারেন যে ৺দ্বিজেন্দ্রলাল সঙ্গীত সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ এবং মূর্খ ছিলেন না।

সরকার মহাশয়ের সমালোচনা পড়ে' মনে হয় যে, হয় তাঁর হিন্দু

সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচয় নেই, নয় তাঁর ৺দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সঙ্গে পরিচয় নেই। তাঁর অভিভাষণ পাঠে তাঁর সঙ্গীতশাস্ত্রে পারদর্শিতা সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। কাউকে সা রি গ ম সাধ্‌তে শুন্‌লে, সরকার মহাশয়ের ধৈর্য্যচ্যুতি হয়, অথচ ধৈর্য্য ধরে সা রি গ ম অভ্যেস না কর্‌লে কি করে ও-বিদ্যা যে আয়ত্ত করা যায় সে কথা তিনি বলে দেননি। সঙ্গীত শিক্ষার অপর কোনও উপায় যদি থাকে তাহলে সে উপায় এ দেশের সঙ্গীতাচার্য্যদের জানা নেই। সঙ্গীতের ভাষাজ্ঞান যে তাঁর নেই তার প্রমাণ উক্ত অভিভাষণের একটি গোটা পাতায় পাওয়া যায়। অপর পক্ষে ৺দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের যে হিন্দু সঙ্গীতের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় ছিল এবং তাঁর যে এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান ও যথেষ্ট অধিকার ছিল তা সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই নিকট সুপরিচিত।

সঙ্গীত তাঁর কুলবিদ্যা এবং সে বিদ্যা তাঁকে কায়ক্লেশে আয়ত্ত করতে হয়নি, কেন না ভগবান তাঁকে গানের গলা এবং সুরের কাণ দিয়েছিলেন। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল যে বারো তেরো বৎসর বয়েসে গুণী-সমাজে গায়ক হিসেবে আদৃত হতেন, সে বিষয়ে আমি সাক্ষ্য দিতে পারি। সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর সংস্কারের অনুরূপ শিক্ষা ছিল। ৺দ্বিজেন্দ্রলালের গান যে বাঙ্গালী জাতির নিকট একটা আদর লাভ করেছে—আমার বিশ্বাস তার প্রধান কারণ এই যে, এ কবির আর্ট সঙ্গীতপ্রাণ এবং সঙ্গীতকায়। আমার দৃঢ় ধারণা এই যে, ৺দ্বিজেন্দ্রলাল আগে কবিতা রচনা করে' পরে তাতে সুর বসাতেন না, কিন্তু আগে তাঁর মনে একটি সুর আস্‌ত তার পরে কথা সেই সুরকে অনুসরণ করত। এ রকম মনে করবার

কারণ এই যে, যে কথা সুরে বসে না সে কথায় তাঁর প্রতিভা পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠেনি। ৺দ্বিজেন্দ্রলালের মনের প্রকৃতির একটি উদ্দাম ভাব ছিল, সুতরাং তাঁর মনোভাব যদি সঙ্গীতের কঠিন বন্ধনের মধ্যে ধরা না পড়্‌ত তাহলে তাঁর রচনা আর্ট হ'ত কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

৺দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানের হাস্যরস কতটা তার কথার আর কতটা তার সুরের উপর নির্ভর করে বলা কঠিন। সুতরাং সুর থেকে বিশ্লিষ্ট করে' তাঁর কথার এবং কথা থেকে বিশ্লিষ্ট করে' তাঁর সুরের মূল্য নির্ণয় কর্‌বার চেষ্টা ব্যর্থ হবারই সম্ভাবনা। তবে যখন একজন খ্যাতনামা সমালোচক তাঁর সুরের উপর আক্রমণ করেছেন তখন সে সুরের বিশেষত্ব এবং নূতনত্ব সম্বন্ধে দুচার কথা বলা আবশ্যক মনে করি।

আপনারা সকলেই জানেন যে, সঙ্গীতে কোন বিশেষ রস ফুটিয়ে তুলতে হ'লে, সেই রসের অনুরূপ সুরের আবশ্যক। করুণ রসের প্রকাশের জন্য সুরও করুণ হওয়া চাই—এবং বীর রসের প্রকাশের জন্য সুরও রুদ্র হওয়া চাই। কিন্তু এ বিষয়ে হাস্যরসের একটু বিশেষত্ব আছে। অনুরূপ কি বিরূপ, সকল রূপ সুরেই গুণী ব্যক্তির হাতে হাস্যরস সমান ফুটে ওঠে। ৺দ্বিজেন্দ্র-লাল তাঁর হাসির গানে সুর সম্বন্ধে যে এই উভয় পদ্ধতিই অবলম্বন করেছেন তা দুচারটি উদাহরণের সাহায্যে সহজেই প্রমাণ করা যেতে পারে। সুরের এবং কথার স্পষ্ট এবং ঘোর অসামঞ্জস্য যে সহজেই হাসির উদ্রেক করে, তার প্রমাণ ৺দ্বিজেন্দ্রলালের—

"এক যে ছিল শেয়াল, তার বাপ দিচ্ছিল দেয়াল"
"বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্‌টাপ্‌"
"পুরাকালে ছিল শুনি, দুর্ব্বাসা নামেতে মুনি"
"নন্দলাল একদা একটা করিল ভীষণ পণ"

প্রভৃতি গান। এ সকল গানের কথা যেমন হালকা—সুরও তেমনি ভারি। হিন্দু সঙ্গীতের রাগ রাগিণীর উপর ৺ দ্বিজেন্দ্রলালের কতটা অধিকার ছিল, এই সকল গানের সুরই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ সকল সুর যে খাঁটি দরবারি শুধু তাই নয়, ঢংও খাঁটি কালোয়াতি।

"এক যে ছিল শেয়াল"—হচ্ছে পূরবীর মামুলি খেয়াল।

"বৃষ্টি পড়িতেছে টুপ্‌টাপ"—কানাড়া ও মহ্লারের মিশ্রণে যে সুর হয় তাই—অর্থাৎ মেঘমহ্লার।

"পুরাকালে ছিল শুনি, দুর্ব্বাসা নামেতে মুনি"—দরবারি কানাড়া।

এবং "নন্দলাল একদা একটা করিল ভীষণ পণ"—বিশুদ্ধ পরজ।

এ সকল সুর অবলীলাক্রমে গাওয়ার ভিতর যে কত শিক্ষা এবং কত সাধনা আছে তা যিনি সঙ্গীতের স্বল্প চর্চ্চা করেছেন তিনিই জানেন। এবং ৺ দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতজ্ঞ বন্ধু মাত্রেই জানেন যে তিনি তাঁর স্বরচিত এই গানগুলি কতদূর নির্ভুল তালে মানে লয়ে সুরে গাইতেন। সুতরাং ৺ দ্বিজেন্দ্রলালের সুরজ্ঞান ছিল না একথা শুধু তিনিই বল্‌তে পারেন যাঁর সঙ্গীতের সঙ্গে কোনরূপ সাক্ষাৎ পরিচয় নেই। যিনি জীবনে কখন দুছত্র কবিতা রচনা কর্‌তে পারেন নি কিম্বা করেন নি, তিনি কাব্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক হলেও হতে পারেন—কিন্তু যিনি সপ্তসুরকে

কখনও হাতে কিম্বা গলায় আয়ত্ব করতে চেষ্টা করেন নি, তিনি সঙ্গীতের সমালোচক হতে পারেন না। কেননা সঙ্গীত শিক্ষা প্রয়োগ সাপেক্ষ।

৺ দ্বিজেন্দ্রলাল যে তাঁর সকল গানেই ওস্তাদি সুর দেন নি, তার কারণ তাঁর এ জ্ঞান ছিল যে হাস্যরসের অনুরূপ সুরের সৃষ্টি করতে হলে আমাদের তৈরি রাগ রাগিণীকে একটু বাঁকিয়ে চুরিয়ে নূতন করে' গড়ে' নেওয়া আবশ্যক। তিনি তাই প্রচলিত সুরের পরিচিত আকার পরিবর্ত্তন করে' তার নূতন আকার দিয়েছেন, তার বিকার সাধন করেন নি।

"বিক্রমাদিত্য রাজা ছিলেন—নবরত্ন নভাই"—এই গানটিতে কথার অনুরূপ সুরেরও আগাগোড়া একটা বেপরোয়া ভাব আছে। কিন্তু আমার বিশ্বাস এ গানটি শুনলে স্বয়ং তানসেনও মুখভার করা দূরে থাক্ হাস্য সম্বরণ করতে পারতেন না। ৺ দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত এ ধরণের সুরের আর কোন উদাহরণ দেওয়া নিষ্প্রয়োজন—কেননা তাঁর অধিকাংশ গান এই ধরণের।

সম্ভবতঃ ৺ দ্বিজেন্দ্রলালের উদ্ভাবিত এই নূতন ঢঙের প্রতিই সরকার মহাশয় তাঁর সকল আক্রোশ প্রকাশ করেছেন। এ ঢং যদি কারও ভাল না লাগে—তাহলে তাঁর কথার কোন উত্তর দেওয়া চলে না। তবে যদি কেউ বলেন যে, এ ঢং বিশ্রী বা বিকৃত—তাহলেই তর্ক উপস্থিত হয়।

৺দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্য একটি নতুন ঢঙের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তাতে করে' হিন্দুসঙ্গীতের ধর্ম্ম নষ্ট হয় নি—কেননা ওস্তাদি ঢং ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের একমাত্র ঢং নয়। দেশভেদে যুগভেদে এদেশে নানা ঢঙের উৎপত্তি হয়েছে। যাঁদের সঙ্গীতের দাক্ষিণাত্যে

প্রচলিত রীতির সঙ্গে পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে দক্ষিণী ঢং এবং হিন্দুস্থানী ঢং এত বিভিন্ন যে দুই একজাতীয় সঙ্গীত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। অথচ এ দুই যে মূলতঃ এক জাতীয়; বিশেষজ্ঞ মাত্রেই তা জানেন। তারপর এই হিন্দুস্থানী গানেরও প্রদেশভেদে সুরের চেহারা বদ্‌লে যায়। আমাদের এই বাঙ্গলাদেশে বিষ্ণুপুরে একটি নূতন ঢঙের সৃষ্টি হয়েছে—যা দেশে বিদেশে বিষ্ণুপুরি ঢং বলে' পরিচিত। এ সকল ঢঙে অবশ্য সনাতন সুরতাল রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু বাঙ্গালীর যা সম্পূর্ণ নিজস্ব বস্তু কীর্ত্তন—তাতে রাগরাগিণীকে এতটা রূপান্তরিত করা হয়েছে যে, সে গান শুনে অনেক ওস্তাদে কানে হাত দেন। কিন্তু ওস্তাদেরা স্বীকার না করলেও আমরা স্বীকার কর্‌তে বাধ্য যে বাঙ্গলার কীর্ত্তন হিন্দুসঙ্গীত। সুতরাং ৺দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের রাগরাগিণীর উপর হস্তক্ষেপ করায় তাঁর অহিন্দুত্বের পরিচয় দেন নি—পরিচয় দিয়েছেন শুধু তাঁর বাঙ্গালীত্বের।

৺দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের বিশেষত্ব এবং নূতনত্ব এই যে, সে সুরের ভিতর অতিসহজে একটি বিলেতি চাল এসে পড়েছে। আমার মতে সঙ্গীত সম্বন্ধে ৺দ্বিজেন্দ্রলালের বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তাঁর প্রতিভার বলে আমাদের রাগরাগিণী বিলেতি চাল এত সহজে অঙ্গীকার করেছে যে তাঁর সুরের এই বিলেতি ভঙ্গি আমাদের কানে মোটেই বেখাপ্পা লাগে না। আমাদের দেশে ইতিপূর্ব্বে দেশী গান বাজনাকে বিলেতি ছাঁচে ঢালবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বিলেতি Concertএর অনুকরণে আমাদের দেশে যে সব "ঐক্যতান-গীতবাদ্যের" রচনা করা হয়েছে তা শুনে যুগপৎ হাসি

ও কান্না পায়। কারণ, এ সকল তানে ও গানে আর যাই করা হয়ে থাক্, দেশী ও বিলাতি সঙ্গীতের ঐক্যসাধন করা হয়নি। তার কারণ কেবলমাত্র Mechanical উপায়ে এইরূপ ঐক্যসাধনের চেষ্টা বৃথা। Mechanical পদ্ধতি হচ্ছে যোড়াতাড়া দিয়ে গড়্বার পদ্ধতি। যোড়াতাড়ার সাহায্যে পৃথিবীতে আর যাই হো'ক আর্ট হয় না। আর্টের সৃষ্টির পদ্ধতি হচ্ছে Organic. ৺দ্বিজেন্দ্র-লালের হিন্দুসঙ্গীতের ন্যায় ইউরোপীয় সঙ্গীতেরও পরিচয় ছিল। তাঁর অন্তরে এই দুয়ের অলক্ষিত মিলনের ফলে তাঁর সুরের সৃষ্টি। আমরা আমাদের জাগ্রত চৈতন্যের সাহায্যে যা গড়ে' তুলতে পারিনি, যখন দেখি অপর কারও মন থেকে তা আপনিই গড়ে' উঠছে তখন আমরা বলি যে যে গঠনক্রীয়ার মূল আর্টের সৃষ্টিকর্ত্তার মগ্ন-চৈতন্যে নিহিত। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল যে নূতন ঢঙের নবসুরের সৃষ্টি করেছেন, সে সুর তাঁর মগ্ন-চৈতন্যে, দেশী ও বিলাতি সুরের নিগূঢ় মিলনে, সৃষ্ট হয়েছে।

আমার পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তা শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে "ঐ দেখা যায় আমার বাড়ি চারদিকে মালঞ্চের বেড়া" এই গানের সঙ্গে কথায় এবং সুরে, "আমার দেশ"এর যে প্রভেদ বাঙ্গলার সেকেলে গান রচয়িতাদের সঙ্গে ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সেই প্রভেদ। তিনি বলেন যে, হয়ত কারও কারও মতে "আমার বাড়ি" "আমার দেশ" অপেক্ষা অধিক মধুর। কিন্তু কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না যে "আমার দেশ"-এ যে ওজস্বিতা আছে "আমার বাড়ী"-তে তার বিন্দুমাত্রও নেই। তাঁর মতে এই ওজঃগুণের সমাবেশেই ৺দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতার বিশেষত্ব এবং

শ্রেষ্ঠত্ব। ইংরাজি কাব্য এবং ইংরাজি সঙ্গীতের শিক্ষার প্রসাদেই ৺দ্বিজেন্দ্রলাল এই ওজঃগুণ লাভ করেছিলেন। "আমার দেশ"-এর সুর ঝিঁঝিট। কিন্তু এ ঝিঁঝিট এবং বাঙ্গলা ঝিঁঝিটে তফাৎ এত বেশি যে প্রচলিত ঢঙে এ গান গাইতে গেলে এর সুর একেবারে এলিয়ে পড়্‌বে। অথচ "আমার দেশ"-এর ঝিঁঝিটের সকল সুর বজায় আছে এবং তার তালও পূরামাত্রায় একতালা। অতএব এ কথা সাহস করে বলা যেতে পারে যে আমাদের রাগরাগিণী ৺দ্বিজেন্দ্রলালের হাতে বেঁকেচুরে গেলেও ভেঙ্গেচুরে যায়নি। রাগরাগিণীর উপর অসাধারণ অধিকার না থাক্‌লে সুরকে নিয়ে যা খুসি তাই করা যায় না। অধিকাংশ গায়ক এবং বাদক অভ্যস্ত বিদ্যারই পুনরাবৃত্তি করেন—কেননা সঙ্গীতে নূতন সুরের কিম্বা নূতন ঢঙের সৃষ্টি করবার জন্য প্রতিভা চাই। ৺দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসঙ্গীতকে যে একটি নূতন পথে চালাতে সক্ষম হয়েছেন তাতে করে' তিনি সঙ্গীত-বিষয়ে অনভিজ্ঞতার নয়, প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

আমার শেষ কথা এই যে ৺দ্বিজেন্দ্রলালের সুরগুলির স্বাতন্ত্র্য রক্ষা কর্‌তে পারলেই তাঁর যথার্থ স্মৃতি রক্ষা করা হবে। এ সকল সুরের বিশেষত্বের লোপ পাবার সম্ভাবনা খুব বেশি, কেননা সুর মুখে মুখে কথার চাইতেও বেশি বদ্‌লে যায়। ৺দ্বিজেন্দ্রলালের গানগুলি যদি আমরা অতি সত্বর স্বরলীপিতে আবদ্ধ না করি, তাহলে অদূর ভবিষ্যতে সে সব সুর আমাদের চল্‌তি সুরেতে পরিণত হবে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

সোনার কাঠি

রূপকথায় আছে, রাক্ষসের যাদুতে রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছেন। যে পুরীতে আছেন সে সোনারপুরী, যে পালঙ্কে শুয়েচেন সে সোনার পালঙ্ক; সোনা মাণিকের অলঙ্কারে তাঁর গা ভরা। কিন্তু কড়াক্কড় পাহারা, পাছে কোনো সুযোগে বাহিরের থেকে কেউ এসে তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তাতে দোষ কি? দোষ এই যে, চেতনার অধিকার যে বড়। সচেতনকে যদি বলা যায় তুমি কেবল এইটুকুর মধ্যেই চিরকাল থাক্‌বে, তার এক পা বাইরে যাবে না, তাহলে তার চৈতন্যকে অপমান করা হয়। ঘুম পাড়িয়ে রাখার সুবিধা এই যে তাতে দেহের প্রাণটা টিঁকে থাকে কিন্তু মনের বেগটা হয় একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, নয় সে অদ্ভুত স্বপ্নের পথহীন ও লক্ষ্যহীন অন্ধলোকে বিচরণ করে।

আমাদের দেশের গীতিকলার দশাটা এই রকম। সে মোহ-রাক্ষসের হাতে পড়ে' বহুকাল থেকে ঘুমিয়ে আছে। যে ঘরটুকু যে পালঙ্কটুকুর মধ্যে এই সুন্দরীর স্থিতি তার ঐশ্বর্য্যের সীমা নেই; চারিদিকে কারুকার্য্য, সে কত সূক্ষ্ম কত বিচিত্র! সেই চেড়ির দল, যাদের নাম ওস্তাদি, তাদের চোখে ঘুম নেই; তারা শত শত বছর ধরে সমস্ত আসা যাওয়ার পথ আগ্‌লে বসে আছে, পাছে বাহির থেকে কোনো আগন্তুক এসে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়।

তাতে ফল হয়েছে এই যে, যে কাল্‌টা চল্‌চে রাজকন্যা তার গলায় মালা দিতে পারেনি, প্রতিদিনের নূতন নূতন ব্যবহারে

তার কোনো যোগ নেই। সে আপনার সৌন্দর্য্যের মধ্যে বন্দী, ঐশ্বর্য্যের মধ্যে অচল।

কিন্তু তার যত ঐশ্বর্য্য যত সৌন্দর্য্যই থাক্ তাব গতিশক্তি যদি না থাকে তাহলে চল্‌তি কাল তার ভার বহন করতে রাজি হয় না। একদিন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পালঙ্কের উপর অচলাকে শুইয়ে রেখে সে আপন পথে চলে যায়—তখন কালের সঙ্গে কলার বিচ্ছেদ ঘটে। তাতে কালেরও দারিদ্র্য, কলারও বৈকল্য।

আমরা স্পষ্টই দেখ্‌তে পাচ্চি আমাদের দেশে গান জিনিষটা চলচে না। ওস্তাদরা বল্‌চেন, গান জিনিষটা ত চল্‌বার জন্যে হয় নি, সে বৈঠকে বসে থাক্‌বে তোমরা এসে সমের কাছে খুব জোরে মাথা নেড়ে যাবে।' কিন্তু মুস্কিল এই যে, আমাদের বৈঠকখানার যুগ চলে গেছে, এখন আমরা যেখানে একটু বিশ্রাম করতে পাই সে মুসাফিরখানায়। যা কিছু স্থির হয়ে আছে তার খাতিরে আমরা স্থির হয়ে থাক্‌তে পারব না। আমরা যে নদী বেয়ে চলচি সে নদী চল্‌চে, যদি নৌকোটা না চলে তবে খুব দামী নৌকো হলেও তাকে ত্যাগ করে যেতে হবে।

সংসারের স্থাবর অস্থাবর দুই জাতের মানুষ আছে অতএব বর্ত্তমান অবস্থাটা ভালো কি মন্দ তা নিয়ে মতভেদ থাক্‌বেই। কিন্তু মত নিয়ে করব কি? যেখানে একদিন ডাঙা ছিল সেখানে আজ যদি জল হয়েই থাকে তবে সেখানকার পক্ষে দামী চৌঘুড়ির চেয়ে কলার ভেলাটাও যে ভালো।

পঞ্চাশ বছর আগে একদিন ছিল যখন বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ে দূরদেশ থেকে কলকাতা সহরে আস্‌ত। ধনীদের ঘরে মজ্‌লিস

বস্তু, ঠিক সমে মাথা নড়তে পারে এমন মাথা গুন্‌তিতে নেহাত কম ছিল না। এখন আমাদের সহরে বক্তৃতা সভার অভাব নেই, কিন্তু গানের মজলিস বন্ধ হয়ে গেছে। সমস্ত তানমানলয় সমেত বৈঠকী গান পুরোপুরী বরদাস্ত করতে পারে এত বড় মজ্‌বুত লোক এখনকার যুবকদের মধ্যে প্রায় দেখাই যায় না।

চর্চ্চা নেই বলে জবাব দিলে আমি শুন্‌ব না। মন নেই বলেই চর্চ্চা নেই। আকবরের রাজত্ব গেছে এ কথা আমাদের মানতেই হবে। খুব ভাল রাজত্ব, কিন্তু কি করা যাবে—সে নেই। অথচ গানেতেই যে সে রাজত্ব বহাল থাক্‌বে এ কথা বল্‌লে অন্যায় হবে। আমি বল্‌ছিনে আকবরের আমলের গান লুপ্ত হয়ে যাবে—কিন্তু এখনকার কালের সঙ্গে যোগ রেখে তাকে টিক্‌তে হবে—সে যে বর্ত্তমান কালের মুখ বন্ধ করে দিয়ে নিজেরই পুনরাবৃত্তিকে অন্তহীন করে তুল্‌বে তা হতেই পারবে না।

সাহিত্যের দিক থেকে উদাহরণ দিলে আমার কথাটা স্পষ্ট হবে। আজ পর্য্যন্ত আমাদের সাহিত্যে যদি কবিকঙ্কণ চণ্ডী, ধর্ম্মমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, মনসার ভাসানের পুনরাবৃত্তি নিয়ত চল্‌তে থাক্‌ত তাহলে কি হত? পনেরো আনা লোক সাহিত্য পড়া ছেড়েই দিত। বাংলার সকল গল্পই যদি বাসবদত্তা কাদম্বরীর ছাঁচে ঢালা হত তাহলে জাতে ঠেলার ভয় দেখিয়ে সে গল্প পড়াতে হত।

কবিকঙ্কণ চণ্ডী কাদম্বরীর আমি নিন্দা করচিনে। সাহিত্যের শোভাযাত্রার মধ্যে চিরকালই তাদের একটা স্থান আছে কিন্তু যাত্রাপথের সমস্তটা জুড়ে তারাই যদি আড্ডা করে' বসে, তাহলে

সে পথটাই মাটি, আর তাদের আসরে কেবল তাকিয়া পড়ে থাক্‌বে, মানুষ থাক্‌বে না।

বঙ্কিম আন্‌লেন, সাতসমুদ্রপারের রাজপুত্রকে আমাদের সাহিত্য রাজকন্যার পালঙ্কের শিয়রে। তিনি যেমনি ঠেকালেন্ সোনার কাঠি, অমনি সেই বিজয়-বসন্ত লয়লামজ্‌নুর হাতির দাঁতে বাঁধানো পালঙ্কের উপর রাজকন্যা নড়ে' উঠ্‌লেন। চল্‌তিকালের সঙ্গে তাঁর মালা বদল হয়ে গেল, তার পর থেকে তাঁকে আজ আর ঠেকিয়ে রাখে কে ? .

যারা মনুষ্যত্বের চেয়ে কৌলীন্যকে বড় করে' মানে তারা বল্‌বে ঐ রাজপুত্রটা যে বিদেশী। তারা এখনো বলে, এ সমস্তই ভুয়ো ; বস্তুতন্ত্র যদি কিছু থাকে ত সে ঐ কবিকঙ্কণ চণ্ডী, কেননা এ আমাদের খাঁটি মাল। তাদের কথাই যদি সত্য হয় তাহলে এ কথা বল্‌তেই হবে নিছক খাঁটি বস্তুতন্ত্রকে মানুষ পছন্দ করে না। মানুষ তাকেই চায় যা বস্তু হয়ে বাস্তু গেড়ে বসে না, যা তার প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে চলে, যা তাকে মুক্তির স্বাদ দেয়।

বিদেশের সোনার কাঠি যে জিনিষকে মুক্তি দিয়েছে সে ত বিদেশী নয়—সে যে আমাদের আপন প্রাণ। তার ফল হয়েচে এই, যে, যে বাংলাভাষাকে ও সাহিত্যকে একদিন আধুনিকের দল ছুঁতে চাইত না এখন তাকে নিয়ে সকলেই ব্যবহার করচে ও গৌরব করচে। অথচ যদি ঠাহর করে' দেখি তবে দেখ্‌তে পাব, গদ্যে পদ্যে সকল জায়গাতেই সাহিত্যের চালচলন সাবেক কালের সঙ্গে সম্পূর্ণ বদ্‌লে গেছে। যাঁরা তাকে জাতিচ্যুত বলে' নিন্দা করেন ব্যবহার করবার বেলা তাকে তাঁরা বর্জ্জন করতে পারেন না।

সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে মানুষের মনকে সোনার কাঠি ছুঁইয়ে জাগিয়ে দেয় এটা তার ইতিহাসে চিরদিন ঘটে আসচে। আপনার পূর্ণ শক্তি পাবার জন্যে বৈষম্যের আঘাতের অপেক্ষা তাকে করতেই হয়। কোনো সভ্যতাই একা আপনাকে আপনি সৃষ্টি করে নাই। গ্রীসের সভ্যতার গোড়ায় অন্য সভ্যতা ছিল এবং গ্রীস বরাবর ইজিপ্ট্ ও এসিয়া থেকে ধাক্কা পেয়ে এসেছে। ভারতবর্ষে দ্রাবিড় মনের সঙ্গে আর্য্য মনের সংঘাত ও সম্মিলন ভারতসভ্যতা সৃষ্টির মূল উপকরণ, তার উপরে গ্রীস্ রোম পারস্য তাকে কেবলি নাড়া দিয়েচে। য়ুরোপীয় সভ্যতায় যে সব যুগকে পুনর্জন্মের যুগ বলে সে সমস্তই অন্য দেশ ও অন্য কালের সংঘাতের যুগ। মানুষের মন বাহির হতে নাড়া পেলে তবে আপনার অন্তরকে সত্যভাবে লাভ করে এবং তার পরিচয় পাওয়া যায় যখন দেখি সে আপনার বাহিরের জীর্ণ বেড়াগুলোকে ভেঙে আপনার অধিকার বিস্তার করচে। এই অধিকার বিস্তারকে একদল লোক দোষ দেয়, বলে ওতে আমরা নিজেকে হারালুম— তারা জানে না নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া নিজেকে হারিয়ে যাওয়া নয়—কারণ বৃদ্ধি মাত্রই নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়া।

সম্প্রতি আমাদের দেশে চিত্রকলার যে নবজীবন লাভের লক্ষণ দেখচি তার মূলেও সেই সাগরপারের রাজপুত্রের সোনার কাঠি আছে। কাঠি ছোঁয়ার প্রথম অবস্থায় ঘুমের ঘোরটা যখন সম্পূর্ণ কাটে না, তখন আমরা নিজের শক্তি পূরোপূরি অনুভব করিনে, তখন অনুকরণটাই বড় হয়ে ওঠে, কিন্তু ঘোর কেটে গেলেই আমরা নিজের জোরে চল্‌তে পারি। সেই নিজের জোরে চলার একটা

লক্ষণ এই যে তখন আমরা পরের পথেও নিজের শক্তিতেই চলতে পারি। পথ নানা, অভিপ্রায়টি আমার, শক্তিটি আমার। যদি পথের বৈচিত্র্য রুদ্ধ করি, যদি একই বাঁধা পথ থাকে, তাহলে অভিপ্রায়ের স্বাধীনতা থাকে না—তাহলে কলের চাকার মত চল্‌তে হয়। সেই কলের চাকার পথটাকে চাকার স্বকীয় পথ বলে গৌরব করার মত অদ্ভুত প্রহসন আর জগতে নেই।

আমাদের সাহিত্যে চিত্রে সমুদ্রপারের রাজপুত্র এসে পৌঁচছে। কিন্তু সঙ্গীতে পৌঁছয়নি। সেই জন্যেই আজও সঙ্গীত জাগ্‌তে দেরি করচে। অথচ আমাদের জীবন জেগে উঠেছে। সেই জন্যে সঙ্গীতের বেড়া টলমল করচে। এ কথা বল্‌তে পারব না, আধুনিকের দল গান একেবারে বর্জ্জন করেচে। কিন্তু তারা যে গান ব্যবহার করচে, যে গানে আনন্দ পাচ্চে সে গান জাত-খোয়ানো গান। তার শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার নেই। কীর্ত্তনে বাউলে বৈঠকে মিলিয়ে যে জিনিষ আজ তৈরি হয়ে উঠ্‌চে সে আচারভ্রষ্ট। তাকে ওস্তাদের দল নিন্দা করচে। তার মধ্যে নিন্দনীয়তা নিশ্চয়ই অনেক আছে। কিন্তু অনিন্দনীয়তাই যে সব চেয়ে বড় গুণ তা নয়। প্রাণশক্তি শিবের মত অনেক বিষ হজম করে' ফেলে। লোকের ভাল লাগ্‌চে, সবাই শুন্‌তে চাচ্চে, শুন্‌তে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়চে না,—এটা কম কথা নয়। অর্থাৎ গানের পঙ্গুতা ঘুচ্‌ল, চল্‌তে সুরু করল। প্রথম চালটা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নয়, তার অনেক ভঙ্গী হাস্যকর এবং কুশ্রী—কিন্তু সব চেয়ে আশার কথা যে, চল্‌তে সুরু করেচে—সে বাঁধন মান্‌চে না। প্রাণের সঙ্গে সম্বন্ধই যে তার সব চেয়ে বড় সম্বন্ধ, প্রথার সঙ্গে সম্বন্ধটা নয়, এই কথাটা

এখনকার এই গানের গোলমেলে হাওয়ার মধ্যে বেজে উঠেচে। ওস্তাদের কারদানিতে আর তাকে বেঁধে রাখ্‌তে পারবে না।

দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সুরের মধ্যে ইংরেজি সুরের স্পর্শ লেগেচে বলে কেউ কেউ তাকে হিন্দুসঙ্গীত থেকে বহিষ্কৃত করতে চান। যদি দ্বিজেন্দ্রলাল হিন্দুসঙ্গীতে বিদেশী সোনার কাঠি ছুঁইয়ে থাকেন তবে সরস্বতী নিশ্চয়ই তাঁকে আশীর্ব্বাদ করবেন। হিঁদু-সঙ্গীত বলে যদি কোনো পদার্থ থাকে তবে সে আপনার জাত বাঁচিয়ে চলুক; কারণ তার প্রাণ নেই, তার জাতই আছে। হিন্দুসঙ্গীতের কোনো ভয় নেই—বিদেশের সংস্রবে সে আপনাকে বড় করেই পাবে। চিত্তের সঙ্গে চিত্তের সংঘাত আজ লেগেছে —সেই সংঘাতে সত্য উজ্জ্বল হবে না, নষ্টই হবে, এমন আশঙ্কা যে ভীরু করে, যে মনে করে সত্যকে সে নিজের মাতামহীর জীর্ণ কাঁথা আড়াল করে ঘিরে রাখ্‌লে তবেই সত্য টিঁকে থাক্‌বে, আজকের দিনে সে যত আস্ফালনই করুক তাকে পথ ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে হবে। কারণ, সত্য হিঁদুর সত্য নয়, পল্‌তেয় করে ফোঁটা ফোঁটা পুঁথির বিধান খাইয়ে তাকে বাঁচিয়ে রাখ্‌তে হয় না; চারদিক থেকে মানুষের নাড়া খেলেই সে আপনার শক্তিকে প্রকাশ করতে পারে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সবুজ পত্র

ঘরে বাইরে

৫

নিখিলেশের আত্মকথা

একদিন আমার মনে বিশ্বাস ছিল ঈশ্বর আমাকে যা দেবেন আমি তা নিতে পারব। এ পর্য্যন্ত তার পরীক্ষা হয়নি। এবার বুঝি সময় এল।

মনকে যখন মনে মনে যাচাই করতুম অনেক দুঃখ কল্পনা করেচি। কখনো ভেবেচি দারিদ্র্য, কখনো জেলখানা, কখনো অসম্মান, কখনো মৃত্যু। এমন কি, কখনো বিমলের মৃত্যুর কথাও ভাবতে চেষ্টা করেচি। এ সমস্তই নমস্কার করে মাথায় করে নেব এ কথা যখন বলেচি বোধ হয় মিথ্যা বলিনি।

কেবল একটা কথা কোনো দিন মনে কল্পনাও করতে পারিনি। আজ সেই কথাটা নিয়ে সমস্ত দিন বসে বসে ভাবচি, এও কি সইবে?

মনের ভিতরে কোন্ জায়গায় একটা কাঁটা বিঁধে রয়েচে। কাজকর্ম্ম করচি কিন্তু বেদনার অবসান নেই। বোধ হয় যখন ঘুমিয়ে থাকি তখন সেই একটা ব্যথা পাঁজর কাটতে থাকে। সকালে জেগে উঠেই দেখি দিনের আলোর লাবণ্য শুকিয়ে গেছে। কি? এ কি? কি হয়েছে? এ কালো কিসের কালো? কোথা দিয়ে আমার সমস্ত পূর্ণ চাঁদের উপর ছায়া ফেল্‌তে এল?

আমার মনের বোধশক্তি হঠাৎ এমন ভয়ানক বেড়ে উঠেছে যে, যে দুঃখ আমার অতীতের বুকের ভিতর সুখের ছদ্মবেশ পরে লুকিয়ে বসেছিল তার সমস্ত মিথ্যা আজ আমার নাড়ি টেনে টেনে ছিঁড়চে, আর সে লজ্জা যে দুঃখ ঘনিয়ে এল বলে, সে যতই প্রাণপণে ঘোমটা টান্‌চে আমার হৃদয়ের সাম্‌নে ততই তার আব্রু ঘুচে গেল। আমার সমস্ত হৃদয় দৃষ্টিতে ভরে গিয়েচে—যা দেখ্‌বার নয়, যা দেখ্‌তে চাইনে তাও বসে বসে দেখ্‌চি।

আমি চিরদিন ঐশ্বর্য্যের ফাঁকির মধ্যে এত বড় কাঙাল হয়ে বসেছিলুম সে কথা এতকাল ভুলিয়ে রেখে আজ হঠাৎ দিনের পর দিনে, মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে, কথার পর কথায়, দৃষ্টির পর দৃষ্টিতে, সেই আমার প্রতারিত জীবনের দুর্ভাগ্য এমন তিল তিল করে প্রকাশ করবার দিন এল কেন? যৌবনের এই ন'টা বছর মাত্র মায়াকে যা খাজনা দিয়েচি, জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সত্য সেটাকে সুদে আসলে কড়ায় কড়ায় আদায় করতে থাক্‌বে। ঋণশোধের সম্বল যার একেবারে ফুরোলো সব চেয়ে বড়

ঋণ শোধের ভার তারই ঘাড়ে। তবু যেন প্রাণপণে বল্‌তে পারি, হে সত্য তোমারি জয় হোক্‌।

আমার পিস্‌তুত বোন মুনুর স্বামী গোপাল কাল এসেছিল তার মেয়ের বিয়ের সাহায্য চাইতে। সে আমার ঘরের আসবাব গুলোর দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভাব্‌ছিল আমার মত সুখী জগতে আর কেউ নেই। আমি বল্লুম, "গোপাল, মুনুকে বোলো কাল আমি তার ওখানে খেতে যাব।" মুনু আপনার হৃদয়ের অমৃতে গরীবের ঘরটিকে স্বর্গ করে রেখেচে। সেই লক্ষ্মীর হাতের অন্ন একবার খেয়ে আসবার জন্যে আমার সমস্ত প্রাণ আজ কাঁদচে। তার ঘরের অভাবগুলিই তার ভূষণ হয়ে উঠেছে। আজ তাকে একবার দেখে আসিগে।—ওগো পবিত্র, জগতে তোমার পবিত্র পায়ের ধূলো আজো একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি।

জোর করে অহঙ্কার করে কি করব? না হয় মাথা হেঁট করেই বল্লুম আমার গুণের অভাব আছে। পুরুষের মধ্যে মেয়েরা যেটা সব চেয়ে খোঁজে আমার স্বভাবে হয়ত সেই জোর নেই। কিন্তু জোর কি শুধু আস্ফালন, শুধু খামখেয়াল, জোর কি এই রকম অসঙ্কোচে পায়ের তলায়—কিন্তু এ সমস্ত তর্ক করা কেন? ঝগড়া করে ত যোগ্যতা লাভ করা যায় না! অযোগ্য, অযোগ্য, অযোগ্য! না হয় তাই হল—কিন্তু ভালোবাসার ত মূল্য তাই—সে যে অযোগ্যতাকেও সফল করে তোলে। যোগ্যের জন্যে

পৃথিবীতে অনেক পুরস্কার আছে—অযোগ্যের জন্যেই বিধাতা কেবল এই ভালোবাসাটুকু রেখেছিলেন।

একদিন বিমলকে বলেছিলুম তোমাকে বাইরে আস্‌তে হবে। বিমল ছিল আমার ঘরের মধ্যে—সে ছিল ঘরগড়া বিমল, ছোট জায়গা এবং ছোট কর্ত্তব্যের কতকগুলো বাঁধা নিয়মে তৈরি। তার কাছ থেকে যে ভালোবাসাটুকু নিয়মিত পাচ্ছিলুম সে কি তার হৃদয়ের গভীর উৎসের সামগ্রী, না সে সামাজিক ম্যুনিসিপালিটির বাষ্পের চাপে চালিত দৈনিক কলের জলের বাঁধা বরাদ্দের মত?

আমি লোভী? যা পেয়েছিলুম তার চেয়ে আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার অনেক বেশি? না, আমি লোভী নই, আমি প্রেমিক। সেই জন্যেই আমি তালা-দেওয়া লোহার সিন্দুকের জিনিষ চাইনি —আমি তাকেই চেয়েছিলুম আপনি ধরা না দিলে যাকে কোনো মতেই ধরা যায় না। স্মৃতি সংহিতার পুঁথির কাগজের কাটা ফুলে আমি ঘর সাজাতে চাইনি; বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণবিকশিত বিমলকে দেখবার বড় ইচ্ছা ছিল।

একটা কথা তখন ভাবিনি মানুষকে যদি তার পূর্ণ মুক্তরূপে সত্যরূপেই দেখতে চাই তাহলে তার উপরে একেবারে নিশ্চিত দাবি রাখবার আশা ছেড়ে দিতে হয়। একথা কেন ভাবিনি? স্ত্রীর উপর স্বামীর নিত্য-দখলের অহঙ্কারে?—না, তা নয়। ভালোবাসার উপর একান্ত ভরসা ছিল বলেই।

সত্যের সম্পূর্ণ অনাবৃত রূপ সহ্য করবার শক্তি আমার আছে

এই অহঙ্কার আমার মনে ছিল। আজ তার পরীক্ষা হচ্চে। মরি আর বাঁচি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব এই অহঙ্কার এখনো মনে রেখে দিলুম।

আজ পর্য্যন্ত বিমল এক জায়গায় আমাকে কোনোমতেই বুঝতে পারেনি। জবরদস্তিকে আমি বরাবর দুর্ব্বলতা বলেই জানি। যে দুর্ব্বল সে সুবিচার করতে সাহস করে না;—ন্যায়পরতার দায়িত্ব এড়িয়ে অন্যায়ের দ্বারা সে তাড়াতাড়ি ফল পেতে চায়। ধৈর্য্যের পরে বিমলের ধৈর্য্য নেই। পুরুষের মধ্যে সে দুর্দ্দান্ত, ক্রুদ্ধ, এমন কি, অন্যায়কারীকে দেখ্‌তে ভালোবাসে। শ্রদ্ধার সঙ্গে একটা ভয়ের আকাঙ্ক্ষা যেন তার মনে আছে।

ভেবেছিলুম বড় জায়গায় এসে জীবনকে যখন সে বড় করে দেখ্‌বে তখন দৌরাত্ম্যের প্রতি এই মোহ থেকে সে উদ্ধার পাবে। কিন্তু আজ দেখ্‌তে পাচ্চি ওটা বিমলের প্রকৃতির একটা অঙ্গ। উৎকটের উপরে ওর অন্তরের ভালোবাসা। জীবনের সমস্ত সহজ সরল রসকে সে লঙ্কামরিচ দিয়ে ঝাল আগুন করে জিবের ডগা থেকে পাকযন্ত্রের তলা পর্য্যন্ত জ্বালিয়ে তুল্‌তে চায়—অন্য সমস্ত স্বাদকে সে একরকম অবজ্ঞা করে।

তেমনি আমার পণ এই যে কোনো একটা উত্তেজনার কড়া মদ খেয়ে উন্মত্তের মত দেশের কাজে লাগ্‌ব না। আমি বরঞ্চ কাজের ত্রুটি সহ্য করি তবু চাকরবাকরকে মারধোর করতে পারিনে, কারো উপর রেগেমেগে হঠাৎ কিছু একটা বল্‌তে বা করতে আমার সমস্ত দেহ মনের ভিতর একটা সঙ্কোচ বোধ হয়। আমি জানি আমার এই সঙ্কোচকে মৃদুতা বলে বিমল মনে

মনে অশ্রদ্ধা করে—আজ সেই একই কারণ থেকে সে ভিতরে ভিতরে আমার উপরে রাগ করে উঠ্‌চে যখন দেখ্‌চে আমি বন্দেমাতরম্‌ হেঁকে চারিদিকে যা-ইচ্ছে-তাই করে বেড়াইনে।

আজ সমস্ত দেশের ভৈরবীচক্রে মদের পাত্র নিয়ে আমি যে বসে যাইনি এতে সকলেরই অপ্রিয় হয়েচি। দেশের লোক ভাবচে আমি খেতাব চাই কিম্বা পুলিসকে ভয় করি; পুলিস ভাবচে ভিতরে আমার কুমৎলব আছে বলেই বাইরে আমি এমন ভালোমানুষ। তবু আমি এই অবিশ্বাস ও অপমানের পথেই চলেচি।

কেননা, আমি এই বলি, দেশকে সাদাভাবে সত্যভাবে দেশ বলেই জেনে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে', যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না, চীৎকার করে' মা বলে' দেবী বলে' মন্ত্র পড়ে যাদের কেবলি সম্মোহনের দরকার হয় তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয় যেমন নেশার প্রতি। সত্যেরও উপরে কোনো একটা মোহকে প্রবল করে রাখবার চেষ্টা এ আমাদের মজ্জাগত দাসত্বের লক্ষণ। চিত্তকে মুক্ত করে দিলেই আমরা আর বল পাইনে। হয় কোনো কল্পনাকে, নয় কোনো মানুষকে, নয় ভাটপাড়ার ব্যবস্থাকে আমাদের অসাড় চৈতন্যের পিঠের উপর সওয়ার করে না বসালে সে নড়তে চায় না। যতক্ষণ সহজ সত্যে আমরা স্বাদ পাইনে, যতক্ষণ এই রকম মোহে আমাদের প্রয়োজন আছে ততক্ষণ বুঝতে হবে স্বাধীন ভাবে নিজের দেশকে পাবার শক্তি আমাদের হয়নি। ততক্ষণ, আমাদের অবস্থা যেমনি হোক্, হয় কোনো কাল্পনিক ভূত নয় কোনো

সত্যকার ওঝা, নয় একসঙ্গে দুইয়ে মিলে, আমাদের উপর উৎপাত করবেই।

সেদিন সন্দীপ আমাকে বল্লে তোমার অন্য নানা গুণ থাকতে পারে কিন্তু তোমার কল্পনাবৃত্তি নেই ;—সেই জন্যেই স্বদেশের এই দিব্যমূর্ত্তিকে তুমি সত্য করে দেখ্‌তে পার না। দেখ্‌লুম বিমলও তাতে সায় দিলে। আমি আর উত্তর করলুম না। তর্কে জিতে সুখ নেই। কেন না এ ত বুদ্ধির অনৈক্য নয়, এ যে স্বভাবের ভেদ। ছোট ঘরকন্নার সীমাটুকুর মধ্যে এই ভেদ ছোট আকারেই দেখা দেয় সেই জন্যে সেটুকুতে মিলনগানের তাল কেটে যায় না। বড় সংসারে এই ভেদের তরঙ্গ বড়—সেখানে এই তরঙ্গ কেবলমাত্র কলধ্বনি করে না, আঘাত করে।

কল্পনাবৃত্তি নেই? অর্থাৎ আমার মনের প্রদীপে তেলবাতি থাকতে পারে কেবল শিখার অভাব! আমি ত বলি সে অভাব তোমাদেরই। তোমরা চকমকি পাথরের মত আলোকহীন, তাই এত ঠুক্‌তে হয় এত শব্দ করতে হয় তবে একটু একটু স্ফুলিঙ্গ বেরয়—সেই বিচ্ছিন্ন স্ফুলিঙ্গে কেবল অহঙ্কার বাড়ে, দৃষ্টি বাড়ে না।

আমি অনেক দিন থেকেই লক্ষ্য করেচি, সন্দীপের প্রকৃতির মধ্যে একটা লালসার স্থূলতা আছে। তার সেই মাংসবহুল আসক্তিই তাকে ধর্ম্ম সম্বন্ধে মোহ রচনা করায় এবং দেশের কাজে দৌরাত্ম্যের দিকে তাড়না করে। তার প্রকৃতি স্থূল অথচ বুদ্ধি তীক্ষ্ণ বলেই সে আপনার প্রবৃত্তিকে বড় নাম দিয়ে সাজিয়ে

তোলে। ভোগের তৃপ্তির মতই বিদ্বেষের আশু চরিতার্থতা তার পক্ষে উগ্ররূপে দরকারী। টাকা সম্বন্ধে সন্দীপের একটা লোলুপতা আছে সে কথা বিমল এর পূর্ব্বে আমাকে অনেকবার বলেচে। আমি যে তা বুঝিনি তা নয় কিন্তু সন্দীপের সঙ্গে টাকা সম্বন্ধে কৃপণতা করতে আমি পারতুম না। ও যে আমাকে ফাঁকি দিচ্চে একথা মনে করতেও আমার লজ্জা হত। আমি যে ওকে টাকার সাহায্য করচি সেটা পাছে কুশ্রী হয়ে দেখা দেয় এই জন্যে ও সম্বন্ধে আমি কোনো রকম তক্‌রার করতে চাইতুম না। আজ কিন্তু বিমলকে একথা বোঝানো শক্ত হবে যে, দেশের সম্বন্ধে সন্দীপের মনের ভাবের অনেক খানিই সেই স্থূল লোলুপতার রূপান্তর। সন্দীপকে বিমল মনে মনে পূজা করচে, তাই আজ সন্দীপের সম্বন্ধে বিমলের কাছে কিছু বল্‌তে আমার মন ছোট হয়ে যায়, কি জানি হয় ত তার মধ্যে আমার মনের ঈর্ষা এসে বেঁধে, হয় ত অত্যুক্তি এসে পড়ে। সন্দীপের যে ছবি আমার মনে জাগ্‌চে তার রেখা হয় ত আমার বেদনার তীব্র তাপে বেঁকেচুরে গিয়েচে। তবু মনে রাখার চেয়ে লিখে ফেলা ভালো।

আমার মাষ্টার মশায় চন্দ্রনাথবাবুকে আজ আমার এই জীবনের প্রায় ত্রিশবৎসর পর্য্যন্ত দেখ্‌লুম তিনি না ভয় করেন নিন্দাকে, না ক্ষতিকে, না মৃত্যুকে। আমি যে বাড়িতে জন্মেচি এখানে কোনো উপদেশ আমাকে রক্ষা করতে পারত না—কিন্তু ঐ মানুষটি তাঁর শান্তি, তাঁর সত্য, তাঁর পবিত্র মূর্ত্তিখানি নিয়ে

আমার জীবনের মাঝখানটিতে তাঁর জীবনের প্রতিষ্ঠা করেচেন—তাই আমি কল্যাণকে এমন সত্য করে এমন প্রত্যক্ষ করে পেয়েচি।

সেই চন্দ্রনাথবাবু সেদিন আমার কাছে এসে বল্লেন, সন্দীপকে কি এখানে আর দরকার আছে?

কোথাও অমঙ্গলের একটু হাওয়া দিলেই তাঁর চিত্তে গিয়ে ঘা দেয়, তিনি কেমন করে বুঝতে পারেন। সহজে তিনি চঞ্চল হন না কিন্তু সেদিন সাম্‌নে তিনি মস্ত বিপদের একটা ছায়া দেখ্‌তে পেয়েছিলেন। তিনি আমাকে কত ভালোবাসেন সে ত আমি জানি।

চায়ের টেবিলে সন্দীপকে বল্লুম, তুমি রংপুরে যাবে না? সেখান থেকে চিঠি পেয়েচি, তারা ভেবেচে আমিই তোমাকে জোর করে ধরে রেখেচি।

বিমল চা-দানি থেকে চা ঢালছিল। একমুহূর্ত্তে তার মুখ শুকিয়ে গেল। সে সন্দীপের মুখের দিকে একবার কটাক্ষমাত্রে চাইলে।

সন্দীপ বল্লে, আমরা এই যে চারদিকে ঘুরে ঘুরে স্বদেশী প্রচার করে বেড়াচ্চি, ভেবে দেখ্‌লুম এতে কেবল শক্তির বাজে খরচ হচ্চে। আমার মনে হয় এক-একটা জায়গাকে কেন্দ্র করে যদি আমরা কাজ করি তা হলে ঢের বেশি স্থায়ী কাজ হতে পারে।

এই বলে বিমলের মুখের দিকে চেয়ে বল্লে, আপনার কি তাই মনে হয় না?

বিমল কি উত্তর দেবে প্রথমটা ভেবে পেলে না। একটু পরে বল্লে, দুরকমেই দেশের কাজ হতে পারে। চারদিকে ঘুরে কাজ করা কিম্বা এক জায়গায় বসে কাজ করা, সেটা নিজের ইচ্ছা কিম্বা স্বভাব অনুসারে বেছে নিতে হবে। ওর মধ্যে যে ভাবে কাজ করা আপনার মন চায় সেইটেই আপনার পথ।

সন্দীপ বল্লে, তবে সত্য কথা বলি। এতদিন বিশ্বাস ছিল ঘুরে ঘুরে সমস্ত দেশকে মাতিয়ে বেড়ানই আমার কাজ। কিন্তু নিজেকে ভুল বুঝেছিলুম। ভুল বোঝবার একটা কারণ ছিল এই যে আমার অন্তরকে সব সময়ে পূর্ণ রাখতে পারে এমন শক্তির উৎস আমি কোনো এক-জায়গায় পাইনি। তাই কেবল দেশে দেশে নতুন নতুন লোকের মনকে উত্তেজিত করে সেই উত্তেজনা থেকেই আমাকে জীবনের তেজ সংগ্রহ করতে হত। আজ আপনিই আমার কাছে দেশের বাণী। এ আগুন ত আজ পর্য্যন্ত আমি কোনো পুরুষের মধ্যে দেখিনি। ধিক্ এত দিন আপন শক্তির অভিমান করেছিলুম। দেশের নায়ক হবার গর্ব্ব আর রাখিনে। আমি উপলক্ষ্য মাত্র হয়ে আপনার এই তেজে এইখানে থেকেই সমস্ত দেশকে জ্বালিয়ে তুলতে পারব এ আমি স্পর্দ্ধা করে বল্‌তে পারি। না, না, আপনি লজ্জা করবেন না—মিথ্যা লজ্জা সঙ্কোচ বিনয়ের অনেক উপরে আপনার স্থান। আপনি আমাদের মৌচাকের মক্ষিরাণী—আমরা আপনাকে চারিদিকে ঘিরে কাজ করব—কিন্তু সেই কাজের শক্তি আপনারই—তাই আপনার থেকে দূরে গেলেই আমাদের কাজ কেন্দ্রভ্রষ্ট, আনন্দহীন হবে। আপনি নিঃসঙ্কোচে আমাদের পূজা গ্রহণ করুন।

লজ্জায় এবং গৌরবে বিমলের মুখ লাল হয়ে উঠল এবং চায়ের পেয়ালায় চা ঢাল্‌তে তার হাত কাঁপতে লাগল।

চন্দ্রনাথবাবু আর একদিন এসে বল্লেন, তোমরা দুজনে কিছুদিনের জন্যে একবার দার্জ্জিলিং বেড়াতে যাও—তোমার মুখ দেখে আমার বোধ হয় তোমার শরীর ভালো নেই। ভালো ঘুম হয় না বুঝি?

বিমলকে সন্ধ্যার সময় বল্লুম, বিমল দার্জ্জিলিঙে বেড়াতে যাবে?

আমি জানি দার্জ্জিলিঙে গিয়ে হিমালয় পর্ব্বত দেখবার জন্যে বিমলের খুব সখ ছিল। সেদিন সে বল্লে, না, এখন থাক্!

দেশের ক্ষতি হবার আশঙ্কা ছিল।

আমি বিশ্বাস হারাব না, আমি অপেক্ষা করব। ছোট জায়গা থেকে বড় জায়গায় যাবার মাঝখানকার রাস্তা ঝোড়ো রাস্তা;—ঘরের চতুঃসীমানায় যে ব্যবস্থাটুকুর মধ্যে বিমলের জীবন বাসা বেঁধে বসে ছিল, ঘরের বাইরে এসে হঠাৎ সে ব্যবস্থায় কুলচ্চে না। অচেনা বাইরের সঙ্গে চেনাশুনো সম্পূর্ণ হয়ে যখন একটা বোঝাপড়া পাকা হয়ে যাবে তখন দেখব আমার স্থান কোথায়। যদি দেখি এই বৃহৎ জীবনের ব্যবস্থার মধ্যে কোথাও আমি আর খাপ খাইনে তাহলে বুঝব এতদিন যা নিয়ে ছিলুম সে কেবল ফাঁকি। সে ফাঁকিতে কোনো দরকার নেই। সে দিন যদি আসে ত ঝগড়া করব না, আস্তে আস্তে বিদায় হয়ে যাব। জোর জবরদস্তি? কিসের জন্যে? সত্যের সঙ্গে কি জোর খাটে?

৬

সন্দীপের আত্মকথা

যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েচে সেইটুকুই আমার, একথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্ব্বলেরা শোনে। যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটেই যথার্থ আমার, এই হল সমস্ত জগতের শিক্ষা।

দেশে আপনা-আপনি জন্মেছি বলেই দেশ আমার নয়—দেশকে যেদিন লুঠ করে নিয়ে জোর করে আমার করতে পারব সেই দিনই দেশ আমার হবে।

লাভ করবার স্বাভাবিক অধিকার আছে বলেই লোভ করা স্বাভাবিক। কোনো কারণেই কিছু থেকে বঞ্চিত হব প্রকৃতির মধ্যে এমন বাণী নেই। মনের দিক থেকে যেটা চাচ্চে বাইরের দিক থেকে সেটা পেতেই হবে, প্রকৃতিতে ভিতরে বাইরে এই রফাটাই সত্য। এই সত্যকে যে শিক্ষা মান্‌তে দেয় না তাকেই আমরা বলি নীতি, এই জন্যেই নীতিকে আজ পর্য্যন্ত কিছুতেই মানুষ মেনে উঠ্‌তে পারচে না।

যারা কাড়তে জানে না, ধরতে পারে না, একটুতেই যাদের মুঠো আলগা হয়ে যায় পৃথিবীতে সেই আধ-মরা একদল লোক আছে নীতি সেই বেচারাদের সান্ত্বনা দিক্! কিন্তু যারা সমস্ত মন দিয়ে চাইতে পারে, সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভোগ করতে জানে, যাদের দ্বিধা নেই সঙ্কোচ নেই, তারাই প্রকৃতির বরপুত্র। তাদের জন্যেই প্রকৃতি যা-কিছু সুন্দর যা-কিছু দামী সাজিয়ে রেখেচে। তারাই নদী সাঁৎরে আস্‌বে, পাঁচিল ডিঙিয়ে পড়বে, দরজা

লাথিয়ে ভাঙবে, পাবার যোগ্য জিনিষ ছিনিয়ে কেড়ে নিয়ে চলে যাবে। এতেই যথার্থ আনন্দ, এতেই দামী জিনেষের দাম। প্রকৃতি আত্মসমর্পণ কর্ব্বে,—কিন্তু সে দস্যুর কাছে। কেননা, চাওয়ার জোর, নেওয়ার জোর, পাওয়ার জোর সে ভোগ করতে ভালোবাসে—তাই আধ-মরা তপস্বীর হাড়-বের-করা গলায় সে আপনার বসন্ত ফুলের স্বয়ম্বরের মালা পরাতে চায় না। নহবৎ-খানায় রসনচৌকি বাজ্‌চে—লগ্ন বয়ে যায় যে, মন উদাস হয়ে গেল। বর কে? আমিই বর—যে মশাল জ্বালিয়ে এসে পড়তে পারে, বরের আসন তারই। প্রকৃতির বর আসে অনাহূত।

লজ্জা? না, আমি লজ্জা করিনে। যা দরকার আমি তা চেয়ে নিই, না চেয়েও নিই। লজ্জা করে যারা নেবার যোগ্য জিনিষ নিলে না তারা সেই না-নেবার দুঃখটাকে চাপা দেবারি জন্যেই লজ্জাটাকে বড় নাম দেয়। এই যে পৃথিবীতে আমরা এসেছি এ হচ্চে রিয়ালিটির পৃথিবী—কতকগুলো বড় কথায় নিজেকে ফাঁকি দিয়ে খালি পেটে খালি হাতে যে মানুষ এই বস্তুর হাট থেকে চলে গেল সে কেন এই শক্ত মাটির পৃথিবীতে জন্মেছিল? আস্‌মানে আকাশকুসুমের কুঞ্জবনে কতকগুলো মিষ্ট বুলির বাঁধা-তানে বাঁশি বাজাবার জন্যে ধর্ম্মবিলাসী বাবুর দলের কাছ থেকে তারা বায়না নিয়েছিল না কি? আমার সে বাঁশির বুলিতেও দরকার নেই, আমার সে আকাশকুসুমেও পেট ভরবে না। আমি যা চাই তা আমি খুবই চাই। তা আমি দুই হাতে করে চটকাব, দুই পায়ে করে দলব, সমস্ত গায়ে তা মাখব, সমস্ত পেট ভরে তা খাব। চাইতে আমার লজ্জা নেই,

পেতে আমার সঙ্কোচ নেই। যারা নীতির উপবাসে শুকিয়ে শুকিয়ে অনেক কালের পরিত্যক্ত খাটিয়ার ছারপোকার মত একেবারে পাৎলা সাদা হয়ে গেছে তাদের চাঁচাঁ গলার ভর্ৎসনা আমার কানে পোঁছবে না।

লুকোচুরি করতে আমি চাইনে কেননা তাতে কাপুরুষতা আছে কিন্তু দরকার হলে যদি করতে না পারি তবে সেও কাপুরুষতা। তুমি যা চাও তা তুমি দেয়াল গেঁথে রাখ্‌তে চাও সুতরাং আমি যা চাই তা আমি সিঁদ কেটে নিতে চাই। তোমার লোভ আছে তাই তুমি দেয়াল গাঁথ, আমার লোভ আছে তাই আমি সিঁধ কাটি। তুমি যদি কল কর আমি কৌশল করব। এইগুলোই হচ্চে প্রকৃতির বাস্তব কথা। এই কথাগুলোর উপরেই পৃথিবীর রাজ্য-সাম্রাজ্য, পৃথিবীর বড় বড় কাণ্ড কারখানা চল্‌চে। আর যে সব অবতার স্বর্গ থেকে নেমে এসে সেইখানকার ভাষায় কথা কইতে থাকেন তাঁদের কথা বাস্তব নয়। সেই জন্যে এত চীৎকারে সে সব কথা কেবলমাত্র দুর্ব্বলদের ঘরের কোণে স্থান পায়; যারা সবল হয়ে পৃথিবী শাসন করে তারা সে সব কথা মান্‌তে পারে না। কেননা মান্‌তে গেলেই বলক্ষয় হয়; তার কারণ কথাগুলো সত্যই নয়। যারা এ কথা বুঝতে দ্বিধা করে না, মান্‌তে লজ্জা করে না তারাই কৃতকার্য্য হল, আর যে হতভাগা একদিকে প্রকৃতি আরেক দিকে অবতারের উৎপাতে বাস্তব অবাস্তব দুনৌকায় পা দিয়ে দুলে মরচে তারা না পারে এগোতে, না পারে বাঁচতে!

একদল মানুষ বাঁচবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে এই পৃথিবীতে

জন্মগ্রহণ করে। সূর্য্যাস্তকালের আকাশের মত মুমূর্ষুতার একটা সৌন্দর্য্য আছে, তারা তাই দেখে মুগ্ধ। আমাদের নিখিলেশ সেই জাতের জীব,—ওকে নির্জ্জীব বল্লেই হয়। আজ চার বৎসর আগে ওর সঙ্গে আমার এই নিয়ে একদিন ঘোর তর্ক হয়ে গেছে। ও আমাকে বলে, "জোর না হলে কিছু পাওয়া যায় না সে কথা মানি, কিন্তু কাকে জোর বল, আর কোন্ জিনিষকে পেতে হবে তাই নিয়ে তর্ক। আমার জোর ত্যাগের দিকে জোর।"

আমি বল্লুম, অর্থাৎ লোকসানের নেশায় তুমি একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেচ।

নিখিলেশ বল্লে, হাঁ, ডিমের ভিতরকার পাখী যেমন তার ডিমের খোলাটাকে লোকসান করবার জন্যে মরিয়া হয়ে ওঠে। খোলাটা খুব বাস্তব জিনিষ বটে, তার বদলে সে পায় হাওয়া, পায় আলো—তোমাদের মতে সে বোধ হয় ঠকে।

নিখিলেশ এই রকম রূপক দিয়ে কথা কয় তার পরে আর তাকে বোঝানো শক্ত যে তৎসত্ত্বেও সেগুলো কেবল মাত্র কথা, সে সত্য নয়। তা বেশ, ও এই রকম রূপক নিয়েই সুখে থাকে ত থাক্—আমরা পৃথিবীর মাংসাশী জীব, আমাদের দাঁত আছে নখ আছে, আমরা দৌড়তে পারি, ধরতে পারি, ছিঁড়তে পারি,—আমরা সকাল বেলায় ঘাস খেয়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তারই রোমন্থনে দিন কাটাতে পারিনে অতএব এ পৃথিবীতে আমাদের খাদ্যের যে ব্যবস্থা আছে তোমরা রূপকওয়ালার দল তার দরজা আগ্‌লে থাকলে আমরা মান্‌তে পারব না। হয় চুরি করব, নয় ডাকাতি করব। নইলে যে আমাদের প্রাণ বাঁচবে না,—

আমরা ত মৃত্যুর প্রেমে মুগ্ধ হয়ে পদ্মপাতার উপর শুয়ে শুয়ে দশম দশায় প্রাণত্যাগ করতে রাজী নই—তা এতে আমাকে বৈষ্ণব বাবাজিরা যতই দুঃখিত হোন্ না কেন!

আমাব এই কথাগুলোকে সবাই বল্‌বে, ও তোমার একটা মত। তার কারণ, পৃথিবীতে যারা চল্‌চে তারা এই নিয়মেই চল্‌চে, অথচ বল্‌চে অন্য রকম কথা। এই জন্যে তারা জানেনা এই নিয়মটাই নীতি। আমি জানি। আমার এই কথাগুলো যে মতমাত্র নয় জীবনে তার একটা পরীক্ষা হয়ে গেছে। আমি যে চালে চলি তাতে মেয়েদের হৃদয় জয় করতে আমার দেরি হয় না। ওরা যে বাস্তব পৃথিবীর জীব, পুরুষদের মত ওরা ফাঁকা আইডিয়ার বেলুনে চড়ে মেঘের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় না। ওরা আমার চোখে মুখে দেহে মনে কথায় ভাবে একটা প্রবল ইচ্ছা দেখতে পায়—সেই ইচ্ছা কোনো তপস্যার দ্বারা শুকিয়ে ফেলা নয়, কোনো তর্কের দ্বারা পিছন দিকে মুখ ফেরানো নয়, সে একেবারে ভরপূর ইচ্ছা—চাই চাই খাই খাই করতে করতে কোটালের বানের মত গর্জ্জে চলেছে। মেয়েরা আপনার ভিতর থেকে জানে এই দুর্দ্দম ইচ্ছাই হচ্চে জগতের প্রাণ। সেই প্রাণ আপনাকে ছাড়া আর কাউকে মানতে চায় না বলেই চারদিকে জয়ী হচ্চে। বারবার দেখলুম আমার সেই ইচ্ছার কাছে মেয়েরা আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েচে, তারা মরবে কি বাঁচবে তার আর হুঁস থাকেনি। যে শক্তিতে এই মেয়েদের পাওয়া যায় সেইটেই হচ্চে বীরের শক্তি—অর্থাৎ বাস্তব জগৎকে পাবার শক্তি। যারা আর কোনো জগৎ পাবার আছে বলে কল্পনা করে তারা তাদের

ইচ্ছার ধারাকে মাটির দিক থেকে সরিয়ে আসমানের দিকেই নিয়ে যাক্—দেখি তাদের সেই ফোয়ারা কত দূর ওঠে, আর কত দিন চলে। এই আইডিয়াবিহারী সূক্ষ্ম প্রাণীদের জন্যে মেয়েদের সৃষ্টি হয়নি।

"এফিনিটি!" জোড়া মিলিয়ে মিলিয়ে বিধাতা বিশেষ ভাবে এক-একটি মেয়ে এক-একটি পুরুষ পৃথিবীতে পাঠিয়েচেন, তাদের মিলই মন্ত্রের মিলের চেয়ে খাঁটি এমন কথা সময়মত দরকারমত অনেক জায়গায় বলেচি। তার কারণ, মানুষ মানতে চায় প্রকৃতিকে, কিন্তু একটা কথার আড়াল না দিলে তার সুখ হয় না। এই জন্যে মিথ্যে কথায় জগৎ ভরে গেল! এফিনিটি একটা কেন? এফিনিটি হাজারটা। একটা এফিনিটির খাতিরে আর সমস্ত এফিনিটিকে বরখাস্ত করে বসে থাকতে হবে প্রকৃতির সঙ্গে এমন লেখাপড়া নেই। আমার জীবনে অনেক এফিনিটি পেয়েছি—তাতে করে আরো একটি পাবার পথ বন্ধ হয়নি। সেটিকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি—সেও আমার এফিনিটি দেখতে পেয়েচে। তার পরে? তার পরে আমি যদি জয় করতে না পারি তাহলে আমি কাপুরুষ!

৭

বিমলার আত্মকথা

আমার লজ্জা যে কোথায় গিয়েছিল তাই ভাবি। নিজেকে দেখবার আমি একটুও সময় পাইনি—আমার দিনগুলো রাতগুলো আমাকে নিয়ে একেবারে ঘুর্ণার মত ঘুরছিল। তাই সেদিন লজ্জা আমার মনের মধ্যে প্রবেশ করবার একটুও ফাঁক পায়নি।

একদিন আমার সামনেই আমার মেজ জা হাস্‌তে হাস্‌তে আমার স্বামীকে বল্লেন, ভাই ঠাকুরপো, তোমাদের এ বাড়ীতে এতদিন বরাবর মেয়েরাই কেঁদে এসেচে এইবার পুরুষদের পালা এল, এখন থেকে আমরাই কাঁদাব। কি বল ভাই ছোটরাণী? রণবেশ ত পরেচ, রণরঙ্গিনী, এবার পুরুষের বুকে কসে হানো শেল।

এই বলে আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত তিনি একবার তাঁর চোখ বুলিয়ে নিলেন। আমার সাজে সজ্জায় ভাবে গতিকে ভিতরের দিক থেকে একটা কেমন রঙের ছটা ফুটে উঠছিল তার লেশ-মাত্র মেজ জায়ের চোখ এড়াতে পারেনি। আজ আমার একথা লিখতে লজ্জা হচ্চে কিন্তু সেদিন আমার কিছুই লজ্জা ছিল না। কেননা সেদিন আমার সমস্ত প্রকৃতি আপনার ভিতর থেকে কাজ করছিল, কিছুই বুঝে সুঝে করিনি।

আমি জানি সেদিন আমি একটু বিশেষ সাজগোজ করতুম। কিন্তু সে যেন অন্যমনে। আমার কোন্ সাজ সন্দীপবাবুর বিশেষ ভাল লাগত তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারতুম। তা ছাড়া আন্দাজে বোঝবার দরকার ছিল না। সন্দীপবাবু সকলের সামনেই তার আলোচনা করতেন। তিনি আমার সাম্‌নে আমার স্বামীকে একদিন বল্লেন, নিখিল, যেদিন আমাদের মক্ষিরাণীকে আমি প্রথম দেখলুম সেই জরীর পাড়-দেওয়া কাপড় পরে চুপ করে বসে, চোখ দুটো যেন পথ-হারানো তারার মত অসীমের দিকে তাকিয়ে—যেন কিসের সন্ধানে কার অপেক্ষায় অতলস্পর্শ অন্ধকারের তীরে হাজার হাজার বৎসর ধরে এই রকম করে তাকিয়ে,—তখন আমার বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল—মনে হল ওঁর অন্তরের অগ্নিশিখা যেন

বাইরে কাপড়ের পাড়ে পাড়ে ওঁকে জড়িয়ে জড়িয়ে রয়েছে। এই আগুনই ত চাই—এই প্রত্যক্ষ আগুন। মক্ষিরাণী, আমার এই একটি অনুরোধ রাখবেন, আরেকদিন তেমনি অগ্নিশিখা সেজে আমাদের দেখা দেবেন।

এতদিন আমি ছিলুম গ্রামের একটি ছোট নদী—তখন ছিল আমার এক ছন্দ, এক ভাষা—কিন্তু কখন একদিন কোনো খবর না দিয়ে সমুদ্রের বান ডেকে এল—আমার বুক ফুলে উঠল, আমার কূল ছাপিয়ে গেল, সমুদ্রের ডমরুর তালে তালে আমার স্রোতের কলতান আপনি বেজে বেজে উঠতে লাগ্‌ল; আমি আপনার রক্তের ভিতরকার সেই ধ্বনির ঠিক অর্থটা ত কিছুই বুঝতে পারলুম না। সে আমি কোথায় গেল? হঠাৎ আমার মধ্যে রূপের ঢেউ কোথা থেকে এমন করে ফেনিয়ে এল? সন্দীপ বাবুর দুই অতৃপ্ত চোখ আমার সৌন্দর্য্যের দিকে যেন পূজার প্রদীপের মত জ্বলে উঠল। রূপেতে শক্তিতে আমি যে আশ্চর্য্য সে কথা সন্দীপবাবুর সমস্ত চাওয়ায় কওয়ায় মন্দিরের কাঁসর ঘণ্টার মত আকাশ ফাটিয়ে বাজতে লাগল। সেদিন তাতেই পৃথিবীর অন্য সমস্ত আওয়াজ ঢেকে দিলে।

আমাকে কি বিধাতা আজ একেবারে নতুন করে স্থষ্টি করলেন? তাঁর এতদিনকার অনাদরের শোধ দিয়ে দিলেন? যে সুন্দরী ছিল না সে সুন্দরী হয়ে উঠল। যে ছিল সামান্য সে নিজের মধ্যে সমস্ত বাংলা দেশের গৌরবকে প্রত্যক্ষ অনুভব করলে। সন্দীপবাবু ত কেবল একটি মাত্র মানুষ নন—তিনি যে একলাই দেশের লক্ষ লক্ষ চিত্তধারার মোহানার মত। তাই,

তিনি যখন আমাকে বল্লেন, মৌচাকের মক্ষিরাণী, তখন সেদিনকার সমস্ত দেশ-সেবকদের স্তবগুঞ্জনধ্বনিতে আমার অভিষেক হয়ে গেল। এর পরে আমাদের ঘরের কোণে আমার বড় জায়ের নিঃশব্দ অবজ্ঞা আর আমার মেজ জায়ের সশব্দ পরিহাস আমাকে স্পর্শ করতেই পারলে না। সমস্ত জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে।

সন্দীপবাবু আমাকে বুঝিয়ে দিলেন আমাকে যেন সমস্ত দেশের ভারি দরকার। সেদিন সে কথা আমার বিশ্বাস করতে বাধেনি। আমি পারি, সমস্তই পারি, আমার মধ্যে একটা দিব্য-শক্তি এসেচে—সে এমন একটা কিছু, যাকে ইতিপূর্ব্বে আমি অনুভব করিনি, যা আমার অতীত। আমার অন্তরের মধ্যে এই যে একটা বিপুল আবেগ হঠাৎ এল, এ জিনিষটা কি সে নিয়ে আমার মনে কোন দ্বিধা ওঠবার সময় ছিল না;—এ যেন আমারই, অথচ এ যেন আমার নয়, এ যেন আমার বাইরেকার, এ যেন সমস্ত দেশের। এ যেন বানের জল, এর জন্যে কোনো খিড়কির পুকুরের জবাবদিহি নেই।

সন্দীপবাবু দেশের সম্বন্ধে প্রত্যেক ছোট বিষয়ে আমার পরামর্শ নিতেন। প্রথমটা আমার ভারি সঙ্কোচ বোধ হত কিন্তু সেটা অল্প দিনেই কেটে গেল। আমি যা বল্‌তুম তাতেই সন্দীপবাবু আশ্চর্য্য হয়ে যেতেন। তিনি কেবলি বল্‌তেন, আমরা পুরুষরা কেবলমাত্র ভাবতেই পারি, কিন্তু আপনারা বুঝতে পারেন, আপনাদের আর ভাবতে হয় না। মেয়েদেরই বিধাতা মানস থেকে সৃষ্টি করেচেন আর পুরুষদের তিনি হাতে করে হাতুড়ি পিটিয়ে

গড়েচেন। শুন্‌তে শুন্‌তে আমার বিশ্বাস হয়েছিল আমার মধ্যে সহজ বুদ্ধি সহজ শক্তি এতই সহজ যে আমি নিজেই এতদিন তাকে দেখতে পাইনি।

দেশের চারিদিক থেকে নানা কথা নিয়ে সন্দীপবাবুর কাছে চিঠি আস্‌ত, সে সমস্তই আমি পড়্‌তুম, এবং আমার মত না নিয়ে তার কোনোটার জবাব যেত না। মাঝে মাঝে এক একদিন সন্দীপ বাবু আমার সঙ্গে মতে মিল্‌তেন্‌ না। আমি তাঁর সঙ্গে তর্ক করতুম না। কিন্তু তার দুদিন পরেই সকালে যেন ঘুম থেকে উঠেই তিনি একটা আলো দেখতে পেতেন এবং তখনি আমাকে ডাকিয়ে এনে বল্‌তেন, দেখুন সেদিন আপনি যা বলেছিলেন সেটাই সত্য, আমার সমস্ত তর্ক ভুল।—এক একদিন বল্‌তেন, আপনার যে পরামর্শটি নিইনি সেইটেতেই আমি ঠকেচি। আচ্ছা এর রহস্যটা কি আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন?

ক্রমেই আমার বিশ্বাস পাকা হতে লাগল যে, সেদিন সমস্ত দেশে যা কিছু কাজ চল্‌ছিল তার মূলে ছিলেন সন্দীপবাবু, আর তারও মূলে ছিল একজন সামান্য স্ত্রীলোকের সহজ বুদ্ধি। প্রকাণ্ড একটা দায়িত্বের গৌরবে আমার মন ভরে রইল।

আমাদের এই সমস্ত পরামর্শের মধ্যে আমার স্বামীর কোনো স্থান ছিল না। দাদা যেমন আপনার নাবালক ভাইটিকে খুবই ভালোবাসে অথচ কাজে কর্ম্মে তার বুদ্ধির উপর কোনো ভরসা রাখে না সন্দীপবাবু আমার স্বামীর সম্বন্ধে সেই রকম ভাবটা প্রকাশ করতেন। আমার স্বামী যে এ সব বিষয়ে একেবারে ছেলেমানুষের মত, তাঁর বুদ্ধিবিবেচনা একেবারে উল্টো রকম,

এ কথা সন্দীপবাবু যেন খুব গভীর স্নেহের সঙ্গে হাস্‌তে হাস্‌তে বল্‌তেন। আমার স্বামীর এই সমস্ত অদ্ভুত মত ও বুদ্ধি বিপর্য্যয়ের মধ্যে এমন একটি মজার রস আছে যেন সেই জন্যেই সন্দীপবাবু তাঁকে আরো বেশি করে ভালবাস্‌তেন। তাই তিনি নিরতিশয় স্নেহের সঙ্গেই আমার স্বামীকে দেশের সমস্ত দায় থেকে একেবারে রেহাই দিয়েছিলেন।

প্রকৃতির ডাক্তারিতে ব্যথা অসাড় করবার অনেক ওষুধ আছে। যখন কোনো একটা গভীর সম্বন্ধের নাড়ী কাটা পড়তে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে কখন যে সেই ওষুধের জোগান ঘটে তা কেউ জান্‌তে পারে না—অবশেষে একদিন জেগে উঠে দেখা যায় মস্ত একটা ব্যবচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে। আমার জীবনের সব চেয়ে বড় সম্বন্ধের মধ্যে যখন ছুরি চল্‌ছিল, তখন আমার মন এমন একটা তীব্র আবেগের গ্যাসে আগাগোড়া আচ্ছন্ন হয়ে রইল যে আমি টেরই পেলুম না কত বড় নিষ্ঠুর একটা কাণ্ড ঘট্‌চে। এই বুঝি মেয়েদেরি স্বভাব—তাদের হৃদয়াবেগ যখন একদিকে প্রবল হয়ে জেগে উঠে তখন অন্যদিকে তাদের আর কিছুই সাড় থাকে না। এই জন্যেই আমরা প্রলয়ঙ্করী; আমরা আমাদের অন্ধ প্রকৃতি দিয়ে প্রলয় করি, কেবলমাত্র বুদ্ধি দিয়ে নয়। আমরা নদীর মত, কূলের মধ্যে দিয়ে যখন বয়ে যাই তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা পালন করি, যখন কূল ছাপিয়ে বইতে থাকি তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা বিনাশ করি।

ক্রমশঃ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বেদনা

বেদনায় ভরে গিয়েছে পেয়ালা,
নিয়ো হে নিয়ো !
হৃদয় বিদারি' হয়ে গেছে ঢালা,
পিয়ো হে পিয়ো !
তোমারি লাগিয়া এরে বুকে করে'
বহিয়া বেড়ানু সারারাতি ধরে',
লও তুলে লও আজি নিশি ভোরে
প্রিয় হে প্রিয় !

রোদনের রঙে লহরে লহরে
রঙীন্ হোলো।
করুণ তোমার অরুণ অধরে
তোলো গো তোলো !
মিশাক্ এ রসে তব নিশ্বাস
নবপ্রভাতের কুসুমের বাস,
এরি পরে তব আঁখির আভাস
দিয়ো হে দিয়ো।

১৩ই পৌষ ১৩২১
শান্তিনিকেতন।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যৌবনের পত্র

পউষের পাতা-ঝরা তপোবনে
আজি কি কারণে
টলিয়া পড়িল আসি বসন্তের মাতাল বাতাস ;
নাই লজ্জা, নাই ত্রাস,
আকাশে ছড়ায় উচ্চহাস
চঞ্চলিয়া শীতের প্রহর
শিশির-মন্থর।

বহুদিনকার
ভুলে-যাওয়া যৌবন আমার
সহসা কি মনে করে'
পত্র তার পাঠায়েছে মোরে
উচ্ছৃঙ্খল বসন্তের হাতে
অকস্মাৎ সঙ্গীতের ইঙ্গিতের সাথে।

লিখেছে সে—
আছি আমি অনন্তের দেশে
যৌবন তোমার
চিরদিনকার।
গলে মোর মন্দারের মালা,
পীত মোর উত্তরীয় দূর বনান্তের গন্ধ-ঢালা।

বিরহী তোমার লাগি
আছি জাগি
দক্ষিণ বাতাসে
ফাল্গুনের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
আছি জাগি চক্ষে চক্ষে হাসিতে হাসিতে
কত মধু মধ্যাহ্নের বাঁশিতে বাঁশিতে।"—

লিখেছে সে—
এস এস চলে এস বয়সের জীর্ণ পথশেষে,
মরণের সিংহদ্বার
হয়ে এস পার।
ফেলে এস ক্লান্ত পুষ্পহার।
ঝরে পড়ে ফোটা ফুল, খসে পড়ে জীর্ণ পত্রভার,
স্বপ্ন যায় টুটে,
ছিন্ন আশা ধূলিতলে পড়ে লুটে।
শুধু আমি যৌবন তোমার
চিরদিনকার;
ফিরে ফিরে মোর সাথে দেখা তব হবে বারম্বার
জীবনের এপার ওপার।

২৩ পৌষ ১৩২১ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সুরুল।

সুরো

১

"হ্যাঁরে, বোদে, এখনো যে বড় পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছিস্—আপিস যেতে হবে না?"

"হবে না মনে করেই একটু গড়াচ্ছি।"

"গড়াচ্ছি! বল্‌তে লজ্জা করে না! আমি বু—আমি এই বয়—আমি—আমি তোর দাদা হয়ে কখনো এত বেলা অবধি গড়াই দেখেছিস?"

"তোমার যে দাদা দিন দিন বয়স্ কম্‌ছে আর আমার বাড়ছে কাজেই তুমি এখন যত ভোরে উঠতে পার আমি কি তা পারি? তাছাড়া আজ শরীর তেমন ভাল নেই, কেমন গা মাটি মাটি করছে।"

"গা মাটি মাটি কর্‌ছে! আমার যেদিন গা মাটি মাটি করে আমি কি বেরোই না?"

"তোমার বেরলেই বা কষ্ট কি? উকীলগুলো বকে মরে তুমি বসে ঝিমোও; তার পরে যা খুসী একটা রায় দিয়ে বিচারের শ্রাদ্ধ কর।"

"যাঃ, আর বাঁদরামী কর্‌তে হবে না; কাজটা যদি হাতছাড়া হয়, আমি ঘরে বসিয়ে তোমার পেট ভরাতে পারব না। যা দিন কাল পড়েছে সংসার চালানো ভার, এত যে উপায় করছি কোথায় ধূলোর মত উড়ে যাচ্ছে চোখেও দেখতে পাই না।"

"বাস্তবিক! তার উপর আবার এই লড়ায়ের হাঙ্গামে এসেন্স,

সাবান, পাউডার, কলপ প্রভৃতি বিলাতী সৌখীন জিনিষগুলোর এমন অসম্ভব দাম চড়ে গেছে, আমি ত ভেবেই পাই না দাদা কি করে নিত্যি নতুন জোগাড় করছ!"

"কি বল্লি রে ছোঁড়া! কলপ? কলপ? কবে তুই আমাকে কলপ লাগাতে দেখেছিস্? যত বড় না মুখ তত বড় কথা! ওরে জগুয়া, গাঁঠ গুলোয় ভাল করে তেল ডলে দেত।"

জগু। "হাঁ বাবু, তাই ত দিচ্ছে। এই পুরুবিয়া হাওয়া লাগলে বুড্‌ঢা লোগ্‌কো বদন্ হাঁত সব দুখ্‌তা। সে হামি জানে।"

"নাঃ, এরা আমাকে বাড়ীছাড়া করলে দেখছি! আমার গায়ে ব্যথা হয়েছে এ কথা তোকে কে বল্লে রে ব্যাটা? আমার চিরকাল ভাল করে তেল মাখা অভ্যেস। যা, স্নানের ঘরে গরম জল রেখে আয়।"

"এই গরমে গরম জল? ওহো, বুঝেছি, সেদিন নবীন বাবু বলে গেল যে গরম জলে নাইলে গায়ের চামড়া কুঁচ্‌কে যায় না, তাই বুঝি দাদা আজকাল গরম জলে চান কর?"

"তাই বুঝি দাদা গরম জলে চান কর! বেশ করি! খুব করি! তোর তাতে কি? ভাল চাস্ ত খাটিয়া ছেড়ে উঠে যা! সারারাত এই ছাতে পড়ে থাকিস্ বলেই ত সকাল বেলায় গা মাটি মাটি করে।"

"এত তাড়া কিসের? তুমি যতক্ষণে চান করে বেরোবে আমার তার মধ্যে দশবার চান করা ভাত খাওয়া অবধি সারা হয়ে যাবে।"

ন মরে বাল্‌কাকা মায় ন মরে বুঢ়উকা জোয়

গিরিজাসুন্দরীর মৃত্যুতে এই প্রবাদ বচনটি খাটিয়া গেল; শিশু কন্যা কালীতারা ও প্রৌঢ় স্বামী হরপ্রসাদ দুজনেই সমভাবে তার অভাব অনুভব করিল। কালীর তিন দিদিই বিবাহিতা, তারা কেহই ছেলেপুলেভরা সংসারে তাকে স্থান দিয়া আর ঝঞ্ঝাট বাড়াইতে রাজি হইল না। তখন হরপ্রসাদ ভাবিল বোদেটার বিবাহ দিলে সব গোল চোকে, আমি টাকা চাই না, দেখতে শুনতে ভাল একটি গরীব গৃহস্থের মেয়ে আন্‌ব, সে আমাদের সবাইকে টেনে করবে। টাকা চাই না, সুন্দর মেয়ের আর অভাব কি! উপযুক্ত পাত্রীর সন্ধান পাইয়া হরপ্রসাদ কাহাকেও কিছু না বলিয়া দেখিতে গেল; বোদের আর বিবাহ হইল না— দশম বর্ষীয়া বালিকা সুরসুন্দরী কালীতারার জননীর পদ গ্রহণ করিল।

সুরো মেয়েটি বড় লক্ষ্মী; সে অকপট চিত্তে ভক্তির সহিত বাপের বয়সী স্বামীর সেবা করিত। বামুন ঠাকুর ডাক দিতে না দিতে সে পানটি ছেঁচিয়া গম্ভীর ভাবে সাম্‌নে বসিয়া পাকা গিন্নিটির মত এটা খাও, ওটা খেলে না কেন, আজ বুঝি রান্না ভাল হয় নাই, ঝালের মাছটায় কাঁচা হলুদের গন্ধ বেরোচ্ছে ইত্যাদি নানা-প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ব্যন্ননের বাটিগুলি হাতের কাছে সরাইয়া দিত। অপরাহ্নে ফল ছাড়াইয়া, বেদানার রস ছাঁকিয়া, মিষ্টান্ন সাজাইয়া ভৃত্যের হাতে স্বামীর জলযোগের জন্য পাঠাইয়া দিত। আদালত-ফেরৎ হরপ্রসাদের ঘর্ম্মাক্ত কাপড়গুলি বাতাসে দিয়া কাচা কাপড়, মুখ ধুইবার জল হাতে হাতে জোগাইয়া

দিত আর সন্ধ্যাবেলায় কালীর সহিত বাজি রাখিয়া পাকা চুল তুলিত। বোতাম বসাইতে অল্পস্বল্প মেরামতের কাজে সুরো কদাচ আলস্য করিত না। তার ছোট বুদ্ধিটিতে যা ভাল বুঝিত খুসি মনে পালন করিত। পশ্চিমী বাঙালীর মেয়ে লজ্জা সরমের বড় ধার ধারিত না; স্বামীকে দেখিলে বারো আনা পিঠ খুলিয়া ষোল আনা মুখ ঢাকিবার জন্য ঘোমটা টানা কর্ত্তব্য, সুরো সে শিক্ষা পায় নাই। শিশু বয়সেই তার বাপ মা মরিয়াছে; বড় ভাইয়ের ঘরে সর্ব্বদা পরিজনহিতরতা, অক্লান্তকর্ম্মিণী, মিষ্টভাষিনী ভাইবউকেই সে আদর্শ বলিয়া জানিত এবং যতদূর সম্ভব তাহার উপদেশ মত চলিতে চেষ্টা করিত।

সুরোর যৌবন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হরপ্রসাদেরও এক অদ্ভুত যৌবনশ্রী ফুটিয়া উঠিল; তার কাঁচাপাকা চুলগুলি প্রথমে কটা ক্রমে একেবারে কালো হইয়া গেল; সে দাড়ি গোঁফ ফেলিয়া দিল এবং রাত থাকিতে উঠিয়া রোজ ক্ষৌর করিতে লাগিল; তার টোল-খাওয়া গাল দুটি দাঁতের চাড়া পাইয়া সামলাইয়া উঠিল আর তার বেশভূষার পারিপাট্য দেখিয়া বোদে হাসিয়া অস্থির হইল। সুরোকে আর পান ছেঁচিতে হয় না, দাঁতের ব্যথা সেরে গেছে আমার লক্ষ্মীকে আর কষ্ট করে পান ছেঁচতে হবে না বলিয়া হরপ্রসাদ সুরোর চিবুক ধরিয়া আদর করিত। কালী বা সুরোকে মাথায় হাত দিতে দেয় না, বলে, যেদিন মাথা ধরবে টিপে দিও, শুধু শুধু হাতে তেল লাগিয়ে লাভ নেই। ছাতের এক কোণে টিনে ঘেরা নূতন তৈরি স্নানের ঘরে হরপ্রসাদ কয়খানা সাবান নিঃশেষ করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইত সে রহস্য ভেদ করিতে কাহারো

সাহসে কুলায় নাই—বোদেরও না। পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হইলে সে কেমন একটা সঙ্কোচ বোধ করে, তাহারাও হঠাৎ হরপ্রসাদকে চিনিতে পারে না, এবং বুড়ো বয়সে নাৎনীর যোগ্য মেয়েকে বিবাহ করিলে ভীমরতি কি ভীম আকার ধারণ করে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া হরপ্রসাদের দিকে দেখাইয়া দেয়। একমাত্র নব্য উকীল মহলে ডেপুটি হরপ্রসাদের খাতির ধরে না—নলিন চৌধুরীর কাঁধে হাত দিয়া সেই ছোক্‌রার দলে পরিবেষ্টিত হইয়া সে বুঝিতেই পারে না লোকে তাকে দেখিয়া হাসে কেন?

২

ছুটির দিনটা পূর্ণ মাত্রায় রসালাপে যাপন করিবার পাছে কোন ব্যাঘাত ঘটে সেই জন্য হরপ্রসাদ নিজের গ্রামসম্পর্কীয়া এক মাসীর খোঁজ লইতে বোদের সহিত কালীকে প্রত্যেক রবিবারে পাঠাইয়া দিত। দুই এক রবিবার পার হইলে ব্যাপার বুঝিতে বোদের বাকি রহিল না; দাদার উপর তুষ্ট থাকিলে একেবারে সন্ধ্যা কাবার করিয়া ফিরিত আবার কখনো তফাতে গাড়ী রাখিয়া আচম্‌কা আসিয়া একতরফা প্রেমালাপে বাধা দিয়া দাদার অভিশাপ অর্জ্জন করিত।

সুরো ভাঁড়ার ঘরে তোলা উনানে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত, এমন সময় মস্ত একগাছা বেলফুলের গোড়ে মালা লইয়া হরপ্রসাদ ডাকিল, "সুরো, ও সুরো, দেখ তোমার জন্যে কি এনেছি।"

সুরো। "কি গা?"

হর। " 'কি গা' ! আহা, প্রাণ ঠাণ্ডা করে দিলে! সেদিন না বল্লুম যে নলিনের বউ 'ভাই' বলে সাড়া দেয়?"

সুরো। "সে দেয় দিগ্‌গে। কি এনেছ দেখি! ওঃ, ফুলের মালা! একটু জল আছড়া দিয়ে রেখে দাও না কাল অবধি গন্ধ থাকবে।"

হর। "আচ্ছা, সুরো, তোমায় না মানা করেছি গরমে উনুন-তাতে বসে কিছু কোরো না, তোমার কষ্ট হয় মনে করলে ওসব আমার মুখে রোচে না, তার চেয়ে আমি বেশী খুসী হই যদি তুমি এখন ওসব ফেলে সেদিনকার সেই ঢাকাই কাপড়খানি পরে দেখাও; কিনে দিলুম তা একবার পরলেও না। এত অছেদ্দা কর কেন?"

সুরো। "কি মুস্কিল! ছিঁড়ে যাবে বলে ঘরে পরি না, তার জন্যে এত রাগ? তুমি যাও না আমি এইগুলো সেরে নিয়ে এই এলুম বলে।"

হর। "এলুম, এলুম, কর্ত্তে কর্ত্তে বোদেরাও এসে পড়বে।"

সুরো। "তা আসুক না, বেশ ত।"

হর। "অত তর্ক না করে ওঠই না। এই জগু! জগুয়া রে! এদিকে আয়! শীগ্‌গির বামনাকে ডেকে দে, তাকে কি করতে রাখা হয়েছে যে মা-জীকে গরমে খাবার তৈরি করতে হবে! যা, চট্ করে আসতে বল।"

চাকরদের সম্মুখে স্বামীর অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ হইবার ভয়ে সুরো তাড়াতাড়ি পাচককে নিজের স্থান ছাড়িয়া দিল। অনেকদিন পর্য্যন্ত সে মনে মনে অনুভব করিতেছে যে হরপ্রসাদ

বেতনভোগী ভৃত্য হইতে আরম্ভ করিয়া বন্ধুবান্ধব সকলকার কাছেই নিজেকে হাস্যাস্পদ করিয়া তুলিতেছে, আর সে কাহার জন্য? তারই জন্যই ত এই বৃদ্ধটি যুবকের বেশে সময় নাই অসময় নাই লোক-আনাগোনার রাস্তায়, যেখানে সেখানে তার হাত চাপিয়া ধরে, মাথার কাপড় টানিয়া খুলিয়া দেয়, গায়ে এসেন্স ঢালিয়া দেয়—এই সেদিন ঠাকুরপো দেখিতে পাইয়া তবে না সকালে অত ঠাট্টা করিল! কি করিয়া বুঝাইবে যে সে পুরাতন স্বামীর সেবা করিয়া যত তৃপ্ত হইত এই নূতন স্বামীর সেবা তার মনে তেমন প্রীতি সঞ্চার করে না! হরপ্রসাদের কথাবার্ত্তা, আদর, ভালবাসা সবই তার মনে হয় যেন কার কাছে ধার করা, এ সব ছিব্‌লামী তার স্বামীর যোগ্য নয় এ কথা কে তাঁকে বলিবে? তার রূপের, তার নবপ্রস্ফুট যৌবনের অর্ঘ্য লইয়া সে তাঁকে দেবতা জানিয়া পূজা দেয় তবে কেন তিনি নিজেকে পরের কথা শুনিয়া তাহার চোখে খাটো করিতে চেষ্টা করিতেছেন? সে পরটি যে কে তাহাও সুরো বেশ জানিত ও বড় রাগ হইলে তার মুণ্ডপাত করিত—অবশ্য মনে মনে।

কত কথাই আজ বলিতে হইবে স্থির করিয়া সুরো আস্তে আস্তে হরপ্রসাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু সে এক গাল হাসিয়া, মালা ছড়াটি তার গলায় পরাইয়া হাত ধরিয়া যখন কাছে টানিয়া লইল, সুরো মাথা হেঁট করিয়া অঞ্চলের প্রান্ত খুঁটিতে লাগিল, যা বলিতে আসিল কিছুই বলিতে পারিল না।

হর। "সুরো, প্রাণ আমার, তুমি ফুল ভালবাস বলে আমি

কত দূর থেকে নিজে গিয়ে ফুলের মালাটি আনলুম আর তুমি আমাকে তার বদলে কিছু দিলে না ভাই ?”

সুরো। “কি চাও ? পাখার বাতাস দেব ? গরম হচ্ছে ?”

হর। “আঃ! ঐ এক কথাতে সব মাটি করে দিলে! এত করে মনে মনে সব জপ্‌তে জপ্‌তে এলুম সব ভণ্ডুল হয়ে গেল! পাখার বাতাস কি আমি চেয়ে ছিলুম ? নলিনের বউ বলে, ‘প্রাণনাথ’—”

সুরো। “সে যা খুসী বলুক, ও সব আমার ভাল লাগে না।”

হর। “কেন তোমার ভাল লাগে না ভাই ? আমার ত বেশ লাগে। কি বলছিলুম, ঐ নলিনের বউ বলে, ‘প্রাণনাথ! হৃদয়েশ্বর!’—”

সুরো। “দেখ, কাল থেকে তুমি আর নলিনের বাড়ী যেও না, সত্যি সত্যি যদি ওর বউ ও সব ছাইভস্ম বল্‌ত তাহলে কি ও তোমার সামনে সে কথা বল্‌তে পার্‌ত ? তোমাকে নিয়ে তামাসা করে বোঝ না ? নাও, ছাড় কে এসে পড়্‌বে!”

হর। “আসে আসুক! ভাল কথা। কি ছিলুম, হ্যাঁ, তুমি নলিনের উপর এত চট কেন ? সে তোমার কত খবর নেয়, সেইত বলে দিলে ফুলের মালা নিয়ে এসে তোমায় পরিতে দিতে; সেদিনকার কাপড় খানা সেই ত পসন্দ করে কেনালে; তাকে দিয়েই ত তোমার তেল, এসেন্স আতর সব আনাই; আমাকে দেখ না, যেদিন থেকে ওর সঙ্গে মিশ্‌ছি আমার যেন ২০ বছর—এই বলছিলুম যে আমার—আমার—বুঝলে কি না—বড় ভাল ছেলে ও। সুরো, আমার আঁধার ঘরের আলো—”

সুরো। "ও কথাটাও কি নলিন তার বৌকে বলে ?"

হর। "অ্যাঁ! অ্যাঁ! তার বৌকে ? কে বল্লে তোমাকে ?"

সুরো। "যেই বলুক না কেন, অন্যের কাছে শেখা বুলি আমার উপর ঝেড়ে আর আমাকে লজ্জা দিও না।"

হর। "ছি সুরো! ভাব করতে গেলুম কেঁদে ফেল্লি! আচ্ছা, ওটা আর বল্‌ব না—হল ? লক্ষ্মী সোনা আমার—মাইরি বলছি ভাই এ কথাটা কেউ শিখিয়ে দেয় নি—অত দূরে সরে যেয়ো না, আমি কি বাঘ না শোর যে তোমাকে খেয়ে ফেল্‌ব!"

সুরো। "হ্যাঁ গা, সেদিন যে বল্লে যে এবার ছুটিতে গয়া কাশী দেখিয়ে আন্‌বে তার কি হল ?"

হর। "বাপ্‌রে! ঐ চাঁদমুখ কি আমি দেশ বিদেশে নিয়ে ঘুরতে পারি তাহলে দ্বিতীয় সীতা হরণ হয়ে যাবে।"

সুরো। "কেন, তুমিও দশানন বধ করে সীতাকে ফিরিয়ে আনবে!"

হর। "আর কি ভাই, সেদিন—ওর নাম কি—আর কি সে জোর—কি বলছিলুম ভাল—আর কি সে যুগ আছে, এখন ঘোর কলি! বধ করতে গেলেই নিজেও সঙ্গে সঙ্গে বধ হতে হয়। অত ব্যস্ত কেন ? নাতী পুতী হোক্ তারা তীর্থ ধর্ম্ম করাবে।"

সুরো। "বেশ। ঐ বুঝি ঠাকুরপোরা এল! যাই কালীকে খেতে দিগে, অনেক দেরী হল।"

হর। "আঃ! বসই না, যাবে এখন, আমার কাছ থেকে পালাতে পারলেই বাঁচ। আঃ জ্বালালে দেখ্‌ছি! বোদেটা উপরে আস্‌ছে বুঝি!"

গলার মালা খুলিয়া স্থুরো সরিয়া বসিতেই বোদে দরজার কাছে হাঁকিল, "দাদা!"

হর। "দাদা! কি বল্ না ছাই!"

বোদে। "মেজাজ এত গরম কেন? আচ্ছা দাদা, এতকাল ত আমরা কেউ জানতুমও না যে এই বিদেশে আবার এক মাসী আছে, তুমি হঠাৎ কোত্থেকে খবর পেলে? এক কাজ কর না, আমরাই বা গাড়ী ভাড়া করে অতদূর যাই কেন তার চেয়ে মাসীকে কাছে রাখলেই ত তুমি সব সময় তাঁর তত্ত্বাবধান করতে পার। সেই হলেই বেশ হয়, বৌদি কি বল?"

হর। "বৌদি কি বল! কিসে বেশ হয় আমাকে আর শেখাতে হবে না। যা, কালীকে বল খাবারের জায়গা করতে, ক্ষিদে পেয়েছে।"

বোদে। "মালাটা আমি নিয়ে চল্লুম।"

হর। "প্রাণ ঠাণ্ডা করে দিলে!"

৩

কালীতারার বিবাহ হইয়া সে শ্বশুরবাড়ী গিয়াছে। কলিকাতার বাইরে একখানি বাড়ী কিনিয়া পেন্সনপ্রাপ্ত হরপ্রসাদ সপরিবারে থাকে। এইবার স্ত্রীর নেশা ছুটিয়া তাকে বাড়ীর নেশায় ধরিয়াছে; ঘরে ঘরে পাথর বসাইতে হইবে, দক্ষিণের বারাণ্ডাটা বাড়াইতে হইবে, জানালাগুলো বড় করা দরকার, কোথায় সস্তাদরে মার্বেল, কাট কাঠরা বিক্রয় হইতেছে স্নান নাই আহার নাই রৌদ্রের তাপে সে সারা সহর হাঁটকাইয়া বেড়ায়। এখন সে বেশ দস্তুর-মত বৃদ্ধ—নলিন তার ঘাড় হইতে নামিতেই সেও অল্পে অল্পে

নিজেকে বৃদ্ধ বলিয়া জাহির করিতে আপত্তি করিল না এমন কি আবশ্যক সময় ভিন্ন দাঁত জোড়াটির পর্য্যন্ত খবর লয় না।

এই পূর্ণমাত্রায় বৃদ্ধ স্বামীটিকে পাইয়া এতদিনে সুরো প্রাণ খুলিয়া স্নেহ প্রস্রবণ ঢালিয়া দিতে পারিল। সন্তানহীনার সমস্ত পুঞ্জীভূত সন্তানস্নেহ অপরিমিত ধারায় হরপ্রসাদের উপর পতিত হইল। সে এক দণ্ড স্বামীকে চোখের আড়াল করিতে চায় না। কোনো কাজে কোন দিন বাড়ী ফিরিতে দেরি হইলে সে বোদেকে মোড়ের কাছে দাঁড় করাইয়া একবার ঘর একবার বারাণ্ডায় ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়ায়, যতই বোদে সান্ত্বনা দেয় যে দাদাকে ছেলেধরায় ধরে নাই নিশ্চয়ই, সে আশ্বাসবাক্য সুরো কানেও তোলে না। হরপ্রসাদের আর বেশভূষায় দৃষ্টি নাই কিন্তু সুরো ছাড়ে না, তাঁতিনী ডাকাইয়া নিজে সুন্দর সুন্দর পাড়ের কাপড় বাছিয়া রাখে; শীতকালের উপযুক্ত নানারঙের পশমের টুপি, মোজা, গেঞ্জি, গলাবন্ধ বুনিয়া রাখে ও সেগুলি পরাইয়া স্বামীকে কেমন মানাইয়াছে, বারম্বার কোন না কোন ছুতা করিয়া বাইরে গিয়া দেখিয়া আসিত। ছোট বৌ ঠাট্টা করে যে দিদি বড়-ঠাকুরের টাকের বাকি দুগাছি চুল আঁচড়ানোর চোটে আর টিঁকিতে দিবে না। নিদ্রিত স্বামীর গায়ে হাত দিয়া মস্তক আঘ্রাণ করিয়া তার সমস্ত দেহ পুলকিত হইত। অযাচিতভাবে দিনের মধ্যে যখন-তখন হরপ্রসাদের পাশে দাঁড়াইয়া গায়ে হাত বুলাইতে থাকে, নয় তো মাথার কোন চুলটি স্থানচ্যুত হইয়াছে সেটি ঠিক করিয়া দেয়, কোঁচা পায়ে জড়াইয়া পড়িয়া যাইবে বলিয়া তুলিয়া ধরিতে বলে। বোদে স্ত্রীকে বলে যে, দাদা আগে বৌদির পায়ের

ধূলো নিত কিনা তাই বৌদি এখন মাথায় হাত দিয়ে দাদাকে আশীর্ব্বাদ করে। যে যাই বলে সুরো গ্রাহ্য করে না, সে তার বৃদ্ধ স্বামীটিকে শিশুর মত চোখে চোখে রাখে। খাওয়ায়, পরায়, কখনো আবার অবাধ্যতা করিলে মৃদু ভৎর্সনাও করে। একদিন হরপ্রসাদ যুবক সাজিয়া লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইয়া স্ত্রীকে আঘাত করিয়াছিল। আজ সেই স্ত্রী দুগ্ধপোষ্য শিশুর মত ব্যবহার করিয়া তাকে আরো কত হাস্যভাজন করিয়া তুলিতেছে এ কথা সুরোর সম্মুখে কেহ আঁচেও বলিলে সে মহা খাপ্পা হইয়া উঠিত।

হরপ্রসাদও যে মধ্যে মধ্যে বিদ্রোহ না করিত তা নয়। স্ত্রী যে কাজ করিতে বারণ করিত বিশেষ করিয়া সেইটেই করিয়া সে আপনার পৌরুষাভিমান প্রচার করিত। সুরো কি তাকে কচি খোকা পাইয়াছে! সব কথায় কি তাকে স্ত্রীর অনুমতি লইতে হইবে! সময় সময় সুরোরও চেতনা হইত, ভাবিত, একি করিতেছি, আমি স্বামীর অধীনে থাকিব তা না তাঁকে নিজের অধীনে আনিতে চাই, আবার ভাবে, কই না, অধীনে ত আনিতে চাই না, আমি কি চাই তা ত নিজেই বুঝিতে পারি না। বোধ হয় কিছুই চাই না, শুধু নিজের সর্ব্বস্ব দান করিয়া, দুই হাতে তাঁর আশীর্ব্বাদ ভরিয়া লইয়া, জন্ম জন্ম তাঁকে পতিরূপে পাইবার জন্য ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করিতে চাই।

দেখিতে দেখিতে কয়েক বছর কাটিল। এ বছরে বসন্তের মহামারী পাড়ায় পাড়ায় দেখা দিয়াছে। হরপ্রসাদের মনে বসন্তের এমনি ভয় ঢুকিল যে গায়ে একজায়গায় মশাকামড়ের দাগ লাগিলে সাতবার করিয়া সে ডাক্তার ডাকিয়া পরীক্ষা করাইত। একদিন

রাত্রে সুরোর কপালে কি একটা দাগ দেখিয়া সমস্ত রাত আলাদা বিছানায় সে কাটাইল।

এমন সময় একদিন সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা করিয়া সুরোর জ্বর আসিল। বোদে হরপ্রসাদকে লুকাইয়া তেতালায় চিলের ছাদের ঘরে সুরোর জন্যে জায়গা করিয়া দিল। সেখানে তার সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া বসন্ত দেখা দিল। বোদে হরপ্রসাদকে বলিল, পটলডাঙ্গায় তার বিধবা বোনটির বড় অসুখ, বৌদিদি তাঁকে দেখতে গিয়েচেন, কিছুদিন দেরি হবে।

হরপ্রসাদের এমনি অবস্থা স্ত্রী নহিলে সে এক পা নড়িতে পারে না। যতই সুরো সুরো করিয়া সে ব্যস্ত হয়, খাবার সাম্‌নে লইয়া সুরোর অনুপস্থিতিতে যতই খুঁৎখুঁৎ করে, কই ছুটিয়া কেহ ত আসে না। হৃদয়ের ভিতরটা অসুখ ও বিরক্তিতে ভরিয়া ভরিয়া উঠে। হরপ্রসাদ একবার পটলডাঙ্গায় গিয়া তার স্ত্রীর খোঁজ লইবে মনে করিল কিন্তু সে পাড়ায় বসন্তের প্রকোপ বেশি শুনিয়া সাহস হইল না।

এদিকে বোদে পুরাতন ভৃত্য জগুয়ার উপর দাদার ভার দিয়া বৌদিদির সেবায় নিযুক্ত হইল। না ছিল তার ভয়, না ছিল ঘৃণা। আহার নিদ্রা ছাড়িয়া সুরোর বিছানার পাশে বসিয়া কি করিয়া তার একটু যন্ত্রণার উপশম হইবে তারই উপায় বাহির করিত। সুরো বোদেকে নিবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু বোদে শুনিল না বলিয়াই সুরো প্রাণে বাঁচিল। অমন প্রাণের সঙ্গে শুশ্রূষা করিবার লোক তার আর কেহ ছিল না।

সুরো ত বাঁচিল কিন্তু তার দিকে চাহিয়া বোদের চোখে

জল আসিল। আহা অমন লক্ষ্মীর প্রতিমা, তার এ কি পরিবর্ত্তন! দেখিলে যেন চেনা যায় না। সুরোও প্রথম দিন আপন চেহারা দেখিয়া মৃত্যুই শ্রেয় ভাবিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিল মরণ হইলে তার স্বামীর দশা কি হইবে! আহা না জানি এতদিন তিনি কত কষ্টই পাইয়াছেন! আজ একবার ঠাকুরপোকে বলিব তাঁকে সঙ্গে করিয়া আনিতে। একবার দেখিয়া প্রাণ ঠাণ্ডা করি!

বোদে হরপ্রসাদকে ডাকিল, দাদা, চল, তোমাকে বৌদিদির কাছে নিয়ে যাই।

হর। কোথায়?

বোদে। উপরের ঘরে আছেন।

হর। না, যাব না।

বোদে। সে কি কথা, যাবেনা কেন?

হর। আমি যাব কেন? সে কি আস্‌তে পারে না?

বোদে। তাঁর বড় অসুখ করেছিল, এখনো কাহিল আছেন।

হর। মিছে কথা। একদিনের জন্যে তার ত অসুখ করতে শুনিনি।

বোদে। তোমার গা ছুঁয়ে বলচি, তাঁর অসুখ করেছিল, তুমি ভাব্‌বে বলে বলিনি।

হর। যা, যা, আর মিছে বল্‌তে হবে না। আমি কি আর বুঝিনে! ইদানীং তার কি আর কাজে মন ছিল? খাওয়াতেও আস্‌ত না, তেল মাখিয়েও দিত না,—জগুর হাতে পড়ে আমার প্রাণ বেরিয়ে যাচ্চে তবু তার মনে একটু ব্যথা লাগে না। আমি ওর সঙ্গে আর কথা বল্‌ব না।

এই ক'দিন যে কাজের অনিয়ম হইয়াছিল হরপ্রসাদের পীড়িত কল্পনায় তাহা সুদীর্ঘ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার মনে হইতেছিল যেন নমাস ছমাস ধরিয়াই এই রকম ব্যাপারটা ঘটিতেছে।

বোদে যত অনুনয় করে হরপ্রসাদের গোঁ ততই বাড়িতে থাকে। বোদে বৌদিদিকে আসিয়া বলিল, দাদা রাগ করিয়া আছেন।

বারান্দায় বসিয়া হরপ্রসাদ অপ্রসন্ন মনে তামাক খাইতেছিল। এমন সময় সাম্নের রাস্তা দিয়া হরিবোল শব্দে মড়া লইয়া গেল। কাল রাত্রি হইতে পাড়ায় ঘোষেদের বাড়ি হইতে কান্নার রব উঠিয়াছে। সকাল হইতে কিছুক্ষণের জন্য থামিয়াছিল আবার জাগিয়া উঠিল। হরপ্রসাদের সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিয়া উঠিল।

এমন সময় শীর্ণ মলিন সুরো ধীরে ধীরে পাশে আসিয়া তার কাঁধের উপর হাত রাখিল।

হরপ্রসাদ চমকিয়া তার মুখের দিকে চাহিল। এ কে? এ যে ব্যাধি মূর্ত্তিমতী। এ যে মৃত্যুর দূতী! বোদে, বোদে! আমার ঘরে এ কে ঢুক্‌ল রে? সরে যা! সরে যা! সুরো! সুরো! আমার সুরো কোথায় গেল?

শ্রীমাধুরীলতা দেবী

ছবির অঙ্গ

এক বলিলেন বহু হইব, এমনি করিয়া সৃষ্টি হইল—আমাদের সৃষ্টিতত্ত্বে এই কথা বলে।

একের মধ্যে ভেদ ঘটিয়া তবে রূপ আসিয়া পড়িল। তাহা হইলে রূপের মধ্যে দুইটি পরিচয় থাকা চাই, বহুর পরিচয়, যেখানে ভেদ ; এবং একের পরিচয়, যেখানে মিল।

জগতে রূপের মধ্যে আমরা কেবল সীমা নয়, সংযম দেখি। সীমাটা অন্য সকলের সঙ্গে নিজেকে তফাৎ করিয়া, আর সংযমটা অন্য সমস্তের সঙ্গে রফা করিয়া। রূপ একদিকে আপনাকে মানিতেছে, আর একদিকে অন্য সমস্তকে মানিতেছে তবেই সে টিঁকিতেছে।

তাই উপনিষৎ বলিয়াছেন, সূর্য্য ও চন্দ্র, দ্যুলোক ও ভূলোক, একের শাসনে বিধৃত। সূর্য্য চন্দ্র দ্যুলোক ভূলোক আপন-আপন সীমায় খণ্ডিত ও বহু—কিন্তু তবু তার মধ্যে কোথায় এককে দেখিতেছি ? যেখানে প্রত্যেকে আপন-আপন ওজন রাখিয়া চলিতেছে ; যেখানে প্রত্যেকে সংযমের শাসনে নিয়ন্ত্রিত।

ভেদের দ্বারা বহুর জন্ম কিন্তু মিলের দ্বারা বহুর রক্ষা। যেখানে অনেককে টিঁকিতে হইবে সেখানে প্রত্যেককে আপন পরিমাণটি রাখিয়া আপন ওজন বাঁচাইয়া চলিতে হয়। জগৎ-সৃষ্টিতে সমস্ত রূপের মধ্যে অর্থাৎ সীমার মধ্যে পরিমাণের যে সংযম সেই সংযমই মঙ্গল, সেই সংযমই সুন্দর। শিব যে যতী।

আমরা যখন সৈন্যদলকে চলিতে দেখি তখন একদিকে দেখি

প্রত্যেকে আপন সীমার দ্বারা স্বতন্ত্র, আর-একদিকে দেখি প্রত্যেকে একটি নির্দ্দিষ্ট মাপ রাখিয়া ওজন রাখিয়া চলিতেছে। সেইখানেই সেই পরিমাণের সুষমার ভিতর দিয়া জানি ইহাদের ভেদের মধ্যেও একটি এক প্রকাশ পাইতেছে। সেই এক যতই পরিস্ফুট এই সৈন্যদল ততই সত্য। বহু যখন এলোমেলো হইয়া ভিড় করিয়া পরস্পরকে ঠেলাঠেলি ও অবশেষে পরস্পরকে পায়ের তলায় দলাদলি করিয়া চলে তখন বহুকেই দেখি, এককে দেখিতে পাই না, অর্থাৎ তখন সীমাকেই দেখি ভূমাকে দেখি না—অথচ এই ভূমার রূপই কল্যাণরূপ, আনন্দরূপ।

নিছক বহু কি জ্ঞানে কি প্রেমে কি কর্ম্মে মানুষকে ক্লেশ দেয়, ক্লান্ত করে,—এই জন্য মানুষ আপনার সমস্ত জানায় চাওয়ায় পাওয়ায় করায় বহুর ভিতরকার এককে খুঁজিতেছে—নহিলে তার মন মানে না, তার সুখ থাকে না, তার প্রাণ বাঁচে না। মানুষ তার বিজ্ঞানে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন নিয়মকে পায়, দর্শনে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন তত্ত্বকে পায়, সাহিত্যে শিল্পে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন সৌন্দর্য্যকে পায়, সমাজে বহুর মধ্যে যখন এককে পায় তখন কল্যাণকে পায়। এমনি করিয়া মানুষ বহুকে লইয়া তপস্যা করিতেছে এককে পাইবার জন্য।

এই গেল আমার ভূমিকা। তার পরে, আমাদের শিল্পশাস্ত্র চিত্রকলা-সম্বন্ধে কি বলিতেছে বুঝিয়া দেখা যাক্।

সেই শাস্ত্রে বলে, ছবির ছয় অঙ্গ। রূপভেদ, প্রমাণ, ভাব, লাবণ্য, সাদৃশ্য ও বর্ণিকাভঙ্গ।

"রূপভেদাঃ"—ভেদ লইয়া সুরু। গোড়ায় বলিয়াছি ভেদেই

রূপের সৃষ্টি। প্রথমেই রূপ আপনার বহু বৈচিত্র্য লইয়াই আমাদের চোখে পড়ে। তাই ছবির আরম্ভ হইল রূপের ভেদে—একের সীমা হইতে আরের সীমার পার্থক্যে।

কিন্তু শুধু ভেদে কেবল বৈষম্যই দেখা যায়। তার সঙ্গে যদি সুষমাকে না দেখানো যায় তবে চিত্রকলা ত ভূতের কীর্ত্তন হইয়া উঠে। জগতের সৃষ্টিকার্য্যে বৈষম্য এবং সৌষম্য রূপে রূপে একেবারে গায়ে গায়ে লাগিয়া আছে; আমাদের সৃষ্টিকার্য্যে যদি তার অন্যথা ঘটে তবে সেটা সৃষ্টিই হয় না, অনাসৃষ্টি হয়।

বাতাস যখন স্তব্ধ তখন তাহা আগাগোড়া এক হইয়া আছে। সেই এককে বীণার তার দিয়া আঘাত কর তাহা ভাঙিয়া বহু হইয়া যাইবে। এই বহুর মধ্যে ধ্বনিগুলি যখন পরস্পর পরস্পরের ওজন মানিয়া চলে তখন তাহা সঙ্গীত, তখনই একের সহিত অন্যের সুনিয়ত যোগ—তখনই সমস্ত বহু তাহার বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া একই সঙ্গীতকে প্রকাশ করে। ধ্বনি এখানে রূপ, এবং ধ্বনির সুষমা যাহা সুর তাহাই প্রমাণ। ধ্বনির মধ্যে ভেদ, সুরের মধ্যে এক।

এইজন্য শাস্ত্রে ছবির ছয় অঙ্গের গোড়াতে যেখানে "রূপভেদ" আছে সেইখানেই তার সঙ্গে সঙ্গে "প্রমাণানি" অর্থাৎ পরিমাণ জিনিষটাকে একেবারে যমক করিয়া সাজাইয়াছে। ইহাতে বুঝিতেছি ভেদ নহিলে মিল হয় না এই জন্যই ভেদ, ভেদের জন্য ভেদ নহে; সীমা নহিলে সুন্দর হয় না এই জন্যই সীমা, নহিলে আপনাতেই সীমার সার্থকতা নাই, ছবিতে এই কথাটাই জানাইতে হইবে। রূপটাকে তার পরিমাণে দাঁড় করানো চাই। কেননা আপনার সত্য-মাপে যে চলিল অর্থাৎ চারিদিকের মাপের সঙ্গে যার খাপ খাইল

সেই হইল সুন্দর। প্রমাণ মানেনা যে রূপ সেই কুরূপ, তাহা সমগ্রের বিরোধী।

রূপের রাজ্যে যেমন জ্ঞানের রাজ্যেও তেমনি। প্রমাণ মানে না যে যুক্তি সেই ত কুযুক্তি। অর্থাৎ সমস্তের মাপকাঠিতে যার মাপে কমিবেশি হইল, সমস্তের তুলাদণ্ডে যার ওজনের গরমিল হইল সেই ত মিথ্যা বলিয়া ধরা পড়িল। শুধু আপনার মধ্যেই আপনি ত কেহ সত্য হইতে পারে না, তাই যুক্তিশাস্ত্রে প্রমাণ করার মানে অন্যকে দিয়া একে মাপা। তাই দেখি, সত্য এবং সুন্দরের একই ধর্ম্ম। একদিকে তাহা রূপের বিশিষ্টতায় চারিদিক হইতে পৃথক্ ও আপনার মধ্যে বিচিত্র, আর-একদিকে তাহা প্রমাণের সুষমায় চারিদিকের সঙ্গে ও আপনার মধ্যে সামঞ্জস্যে মিলিত। তাই যারা গভীর করিয়া বুঝিয়াছে তারা বলিয়াছে সত্যই সুন্দর, সুন্দরই সত্য।

ছবির ছয় অঙ্গের গোড়ার কথা হইল রূপভেদাঃ প্রমাণানি। কিন্তু এটা ত হইল বহিরঙ্গ—একটা অন্তরঙ্গও ত আছে।

কেন না, মানুষ ত শুধু চোখ দিয়া দেখে না, চোখের পিছনে তার মনটা আছে। চোখ ঠিক যেটি দেখিতেছে মন যে তারই প্রতিবিম্বটুকু দেখিতেছে তাহা নহে। চোখের উচ্ছিষ্টেই মন মানুষ এ কথা মানা চলিবে না—চোখের ছবিতে মন আপনার ছবি জুড়িয়া দেয় তবেই সে ছবি মানুষের কাছে সম্পূর্ণ হইয়া ওঠে।

তাই শাস্ত্র "রূপভেদাঃ প্রমাণানি"তে ষড়ঙ্গের বহিরঙ্গ সারিয়া অন্তরঙ্গের কথায় বলিতেছেন—"ভাবলাবণ্য যোজনং"—চেহারার সঙ্গে ভাব ও লাবণ্য যোগ করিতে হইবে—চোখের কাজের উপরে

মনের কাজ ফলাইতে হইবে; কেন না শুধু কারু কাজটা সামান্য, চিত্র করা চাই—চিত্রের প্রধান কাজই চিৎকে দিয়া।

ভাব বলিতে কি বুঝায় তাহা আমাদের এক রকম সহজে জানা আছে। এই জন্যই তাহাকে বুঝাইবার চেষ্টায় যাহা বলা হইবে তাহাই বুঝা শক্ত হইবে। স্ফটিক যেমন অনেকগুলা কোণ লইয়া দানা বাঁধিয়া দাঁড়ায় তেমনি "ভাব" কথাটা অনেকগুলা অর্থকে মিলাইয়া দানা বাঁধিয়াছে। এ সকল কথার মুস্কিল এই যে, ইহাদের সব অর্থ আমরা সকল সময়ে পূরাভাবে ব্যবহার করি না, দরকার-মত ইহাদের অর্থচ্ছটাকে ভিন্ন পর্য্যায়ে সাজাইয়া এবং কিছু কিছু বাদসাদ দিয়া নানা কাজে লাগাই। ভাব বলিতে feelings, ভাব বলিতে idea, ভাব বলিতে characteristics, ভাব বলিতে sugg-estion, এমন আরো কত কি আছে।

এখানে ভাব বলিতে বুঝাইতেছে অন্তরের রূপ। আমার একটা ভাব, তোমার একটা ভাব; সেইভাবে আমি আমার মত, তুমি তোমার মত। রূপের ভেদ যেমন বাহিরের ভেদ, ভাবের ভেদ তেমনি অন্তরের ভেদ।

রূপের ভেদ সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে ভাবের ভেদ সম্বন্ধেও সেই কথাই খাটে। অর্থাৎ কেবল যদি তাহা এক-রোখা হইয়া ভেদকেই প্রকাশ করিতে থাকে তবে তাহা বীভৎস হইয়া উঠে। তাহা লইয়া সৃষ্টি হয় না, প্রলয়ই হয়। ভাব যখন আপন সত্য ওজন মানে, অর্থাৎ আপনার চারিদিককে মানে, বিশ্বকে মানে, তখনই তাহা মধুর। রূপের ওজন যেমন তাহার প্রমাণ, ভাবের ওজন তেমনি তাহার লাবণ্য।

কেহ যেন না মনে করেন ভাব কথাটা কেবল মানুষের সম্বন্ধেই খাটে। মানুষের মন অচেতন পদার্থের মধ্যেও একটা অন্তরের পদার্থ দেখে। সেই পদার্থটা সেই অচেতনের মধ্যে বস্তুতই আছে কিম্বা আমাদের মন সেটাকে সেইখানে আরোপ করে সে হইল তত্ত্বশাস্ত্রের তর্ক, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। এইটুকু মানিলেই হইল স্বভাবতই মানুষের মন সকল জিনিষকেই মনের জিনিষ করিয়া লইতে চায়।

তাই আমরা যখন একটা ছবি দেখি তখন এই প্রশ্ন করি এই ছবির ভাবটা কি? অর্থাৎ ইহাতে ত হাতের কাজের নৈপুণ্য দেখিলাম, চোখে দেখার বৈচিত্র্য দেখিলাম, কিন্তু ইহার মধ্যে চিত্তের কোন্ রূপ দেখা যাইতেছে—ইহার ভিতর হইতে মন মনের কাছে কোন্ লিপি পাঠাইতেছে? দেখিলাম একটা গাছ—কিন্তু গাছ ত ঢের দেখিয়াছি, এ গাছের অন্তরের কথাটা কি, অথবা যে আঁকিল গাছের মধ্যদিয়া তার অন্তরের কথাটা কি সেটা যদি না পাইলাম তব গাছ আঁকিয়া লাভ কিসের? অবশ্য উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের বইয়ে যদি গাছের নমুনা দিতে হয় তবে সে আলাদা কথা। কেননা সেখানে সেটা চিত্র নয় সেটা দৃষ্টান্ত।

শুধু-রূপ শুধু-ভাব কেবল আমাদের গোচর হয় মাত্র। "আমাকে দেখ" "আমাকে জান" তাহাদের দাবি এই পর্য্যন্ত। কিন্তু "আমাকে রাখ" এ দাবি করিতে হইলে আরো কিছু চাই। মনের আম্-দরবারে আপন-আপন রূপ লইয়া ভাব লইয়া নানা জিনিষ হাজির হয়, মন তাহাদের কাহাকেও বলে, "বোসো", কাহাকেও বলে, "আচ্ছা, যাও।"

যাহারা আর্টিষ্ট তাহাদের লক্ষ্য এই যে তাহাদের সৃষ্ট পদার্থ

মনের দরবারে নিত্য আসন পাইবে। যে সব গুণীর সৃষ্টিতে রূপ আপনার প্রমাণে, ভাব আপনার লাবণ্যে, প্রতিষ্ঠিত হইয়া আসিয়াছে তাহারাই ক্লাসিক হইয়াছে, তাহারাই নিত্য হইয়াছে।

অতএব চিত্রকলায় ওস্তাদের ওস্তাদী, রূপে ও ভাবে তেমন নয়, যেমন প্রমাণে ও লাবণ্যে। এই সত্য-ওজনের আন্দাজটি পুঁথিগত বিদ্যায় পাইবার জো নাই। ইহাতে স্বাভাবিক প্রতিভার দরকার। দৈহিক ওজনবোধটি স্বাভাবিক হইয়া উঠিলে তবেই চলা সহজ হয়। তবেই নূতন নূতন বাধায়, পথের নূতন নূতন আঁকেবাঁকে আমরা দেহের গতিটাকে অনায়াসে বাহিরের অবস্থার সঙ্গে তানে লয়ে মিলাইয়া চলিতে পারি। এই ওজনবোধ একেবারে ভিতরের জিনিষ যদি না হয় তবে রেলগাড়ির মত একই বাঁধা রাস্তায় কলের টানে চলিতে হয়, এক ইঞ্চি ডাইনে বাঁয়ে হেলিলেই সর্ব্বনাশ। তেমনি রূপ ও ভাবের সম্বন্ধে যার ওজনবোধ অন্তরের জিনিষ সে "নবনবোন্মেষশালিনী বুদ্ধির" পথে কলাসৃষ্টিকে চালাইতে পারে। যার সে বোধ নাই সে ভয়ে ভয়ে একই বাঁধা রাস্তায় ঠিক এক লাইনে চলিয়া পোটো হইয়া কারিগর হইয়া ওঠে, সে সীমার সঙ্গে সীমার নূতন সম্বন্ধ জমাইতে পারে না। এই জন্য নূতন সম্বন্ধমাত্রকে সে বাঘের মত দেখে।

যাহা হউক এতক্ষণ ছবির ষড়ঙ্গের আমরা দুটি অঙ্গ দেখিলাম, বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। এইবার পঞ্চম অঙ্গে বাহির ও ভিতর যে-কোঠায় এক হইয়া মিলিয়াছে তাহার কথা আলোচনা করা যাক্। সেটার নাম "সাদৃশ্যং"। নকল করিয়া যে সাদৃশ্য মেলে এতক্ষণে সেই কথাটা আসিয়া পড়িল এমন যদি কেহ মনে করেন তবে

শাস্ত্রবাক্য তাঁহার পক্ষে বৃথা হইল। ঘোড়াগরুকে ঘোড়াগরু করিয়া আঁকিবার জন্য রেখা প্রমাণ ভাব লাবণ্যের এত বড় উদ্যোগপর্ব্ব কেন? তাহা হইলে এমন কথাও কেহ মনে করিতে পারেন উত্তর-গোগৃহে গোরু-চুরি কাণ্ডের জন্যই উদ্যোগপর্ব্ব, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের জন্য নহে।

সাদৃশ্যের দুইটা দিক আছে। একটা, রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য; আর-একটা, ভাবের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য। একটা বাহিরের, একটা ভিতরের। দুটাই দরকার। কিন্তু সাদৃশ্যকে মুখ্যভাবে বাহিরের বলিয়া ধরিয়া লইলে চলিবে না।

যখনি রেখা ও প্রমাণের কথা ছাড়াইয়া ভাব লাবণ্যের কথা পাড়া হইয়াছে তখনি বোঝা গিয়াছে গুণীর মনে যে ছবিটি আছে সে প্রধানত রেখার ছবি নহে তাহা রসের ছবি। তাহার মধ্যে এমন একটি অনির্ব্বচনীয়তা আছে যাহা প্রকৃতিতে নাই। অন্তরের সেই অমৃতরসের ভাবচ্ছবিকে বাহিরে দৃশ্যমান করিতে পারিলে তবেই রসের সহিত রূপের সাদৃশ্য পাওয়া যায়, তবেই অন্তরের সহিত বাহিরের মিল হয়। অদৃশ্য তবেই দৃশ্যে আপনার প্রতিরূপ দেখে। নানারকম চিত্রবিচিত্র করা গেল, নৈপুণ্যের অন্ত রহিল না, কিন্তু ভিতরের রসের ছবির সঙ্গে বাহিরের রূপের ছবির সাদৃশ্য রহিল না; রেখাভেদ ও প্রমাণের সঙ্গে ভাব ও লাবণ্যের জোড় মিলিল না;—হয়ত রেখার দিকে ত্রুটি রহিল নয়ত ভাবের দিকে—পরস্পর পরস্পরের সদৃশ হইল না। বরও আসিল, কনেও আসিল, কিন্তু অশুভ লগ্নে মিলনের মন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গেল। মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ, বাহিরের লোক হয়ত পেট

ভরিয়া সন্দেশ খাইয়া খুব জয়ধ্বনি করিল কিন্তু অন্তরের খবর যে জানে সে বুঝিল সব মাটি হইয়াছে। চোখ-ভোলানো চাতুরী-তেই বেশি লোক মজে, কিন্তু, রূপের সঙ্গে রসের সাদৃশ্যবোধ যার আছে, চোখের আড়ে তাকাইলেই যে-লোক বুঝিতে পারে রসটি রূপের মধ্যে ঠিক আপনার চেহারা পাইয়াছে কিনা, সেইত রসিক। বাতাস যেমন সূর্য্যের কিরণকে চারিদিকে ছড়াইয়া দিবার কাজ করে তেমনি গুণীর সৃষ্ট কলাসৌন্দর্য্যকে লোকালয়ের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া দিবার ভার এই রসিকের উপর। কেননা যে ভরপূর করিয়া পাইয়াছে সে স্বভাবতই না দিয়া থাকিতে পারেনা,—সে জানে তন্নষ্টং যন্ন দীয়তে। সর্ব্বত্র এবং সকল কালেই মানুষ এই মধ্যস্থকে মানে। ইহারা ভাবলোকের ব্যাঙ্কের কর্ত্তা—এরা নানাদিক হইতে নানা ডিপজিটের টাকা পায়—সে টাকা বদ্ধ করিয়া রাখিবার জন্য নহে;—সংসারে নানা কারবারে নানা লোক টাকা খাটাইতে চায়, তাহাদের নিজের মূলধন যথেষ্ট নাই—এই ব্যাঙ্কার নহিলে তাহাদের কাজ বন্ধ।

এমনি করিয়া রূপের ভেদ প্রমাণে বাঁধা পড়িল, ভাবের বেগ লাবণ্যে সংযত হইল, ভাবের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য পটের উপর সুসম্পূর্ণ হইয়া ভিতরে বাহিরে পূরাপূরি মিল হইয়া গেল—এই ত সব চুকিল। ইহার পর আর বাকি রহিল কি?

কিন্তু আমাদের শিল্পশাস্ত্রের বচন এখনো যে ফুরাইল না। স্বয়ং দ্রৌপদীকে সে ছাড়াইয়া গেল। পাঁচ পার হইয়া যে ছয়ে আসিয়া ঠেকিল সেটা "বর্ণিকাভঙ্গং"। রঙের ভঙ্গিমা।

এইখানে বিষম খট্‌কা লাগিল। আমার পাশে এক গুণী

বসিয়া আছেন তাঁরই কাছ হইতে এই শ্লোকটি পাইয়াছি। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, রূপ, অর্থাৎ রেখার কারবার যেটা ষড়ঙ্গের গোড়াতেই আছে আর এই রঙেরভঙ্গী যেটা তার সকলের শেষে স্থান পাইল চিত্রকলায় এ দুটোর প্রাধান্য তুলনায় কার কত ?

তিনি বলিলেন, বলা শক্ত।

তাঁর পক্ষে শক্ত বই কি ? দুটির পরেই যে তাঁর অন্তরের টান, এমন স্থলে নিরাসক্ত মনে বিচার করিতে বসা তাঁর দ্বারা চলিবে না। আমি অব্যবসায়ী, অতএব বাহির হইতে ঠাহর করিয়া দেখা আমার পক্ষে সহজ।

রং আর রেখা এই দুই লইয়াই পৃথিবীর সকল রূপ আমাদের চোখে পড়ে। ইহার মধ্যে রেখাটাতেই রূপের সীমা টানিয়া দেয়। এই সীমার নির্দ্দেশই ছবির প্রধান জিনিষ। অনির্দ্দিষ্টতা গানে আছে, গন্ধে আছে কিন্তু ছবিতে থাকিতে পারে না।

এই জন্যই কেবল রেখাপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে কিন্তু কেবল বর্ণপাতের দ্বারা ছবি হইতে পারে না। বর্ণটা রেখার আনুষঙ্গিক।

সাদার উপরে কালোর দাগ এই হইল ছবির গোড়া। আমরা সৃষ্টিতে যাহা চোখে দেখিতেছি তাহা অসীম আলোকের সাদার উপরকার সসীম দাগ। এই দাগটা আলোর বিরুদ্ধ তাই আলোর উপরে ফুটিয়া উঠে। আলোর উল্টা কালো, আলোর বুকের উপরে ইহার বিহার।

কালো আপনাকে আপনি দেখাইতে পারে না। স্বয়ং সে শুধু অন্ধকার, দোয়াতের কালীর মত। সাদার উপর যেই সে

দাগ কাটে অমনি সেই মিলনে সে দেখা দেয়। সাদা আলোকের পটটি বৈচিত্র্যহীন ও স্থির, তার উপরে কালো রেখাটি বিচিত্রনৃত্যে ছন্দে ছন্দে ছবি হইয়া উঠিতেছে। শুভ্র ও নিস্তব্ধ অসীম রজতগিরিনিভ, তারই বুকের উপর কালীর পদক্ষেপ চঞ্চল হইয়া সীমায় সীমায় রেখায় রেখায় ছবির পরে ছবির ছাপ মারিতেছে। কালীরেখার সেই নৃত্যের ছন্দটি লইয়া চিত্রকলার রূপভেদাঃ প্রমাণানি। নৃত্যের বিচিত্র বিক্ষেপগুলি রূপের ভেদ, আর তার ছন্দের তালটিই প্রমাণ।

আলো আর কালো, অর্থাৎ আলো আর না-আলোর দ্বন্দ্ব খুবই একান্ত। রংগুলি তারই মাঝখানে মধ্যস্থতা করে। ইহারা যেন বীণার আলাপের মীড়—এই মীড়ের দ্বারা সুর যেন সুরের অতীতকে পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে ইসারায় দেখাইয়া দেয়—ভঙ্গীতে ভঙ্গীতে সুর আপনাকে অতিক্রম করিয়া চলে। তেমনি রঙের ভঙ্গী দিয়া রেখা আপনাকে অতিক্রম করে; রেখা যেন অরেখার দিকে আপন ইসারা চালাইতে থাকে। রেখা জিনিষটা সুনির্দ্দিষ্ট,—আর রং জিনিষটা নির্দ্দিষ্ট অনির্দ্দিষ্টের সেতু, তাহা সাদা কালোর মাঝখানকার নানা টানের মীড়। সীমার বাঁধনে বাঁধা কালো-রেখার তারটাকে সাদা যেন খুব তীব্র করিয়া আপনার দিকে টানিতেছে, কালো তাই কড়ি হইতে অতিকোমলের ভিতর দিয়া রঙে রঙে অসীমকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে। তাই বলিতেছি রং জিনিষটা রেখা এবং অরেখার মাঝখানের সমস্ত ভঙ্গী। রেখা ও অরেখার মিলনে যে ছবির সৃষ্টি সেই ছবিতে এই মধ্যস্থের প্রয়োজন। অরেখ সাদার বুকের উপর যেখানে রেখা-কালীর নৃত্য সেখানে

এই রংগুলি যোগিনী। শাস্ত্রে ইহাদের নাম সকলের শেষে থাকিলেও ইহাদের কাজ নেহাৎ কম নয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি সাদার উপর শুধু-রেখার ছবি হয়, কিন্তু সাদার উপর শুধু-রঙে ছবি হয় না। তার কারণ, রং জিনিষটা মধ্যস্থ—দুই পক্ষের মাঝখানে ছাড়া কোনো স্বতন্ত্র জায়গায় তার অর্থই থাকে না।

এই গেল বর্ণিকাভঙ্গ।

এই ছবির ছয় অঙ্গের সঙ্গে কবিতার কিরূপ মিল আছে তাহা দেখাইলেই কথাটা বোঝা হয় ত সহজ হইবে।

ছবির স্থূল উপাদান যেমন রেখা তেমনি কবিতার স্থূল উপাদান হইল বাণী। সৈন্যদলের চালের মত সেই বাণীর চালে একটা ওজন একটা প্রমাণ আছে—তাহাই ছন্দ। এই বাণী ও বাণীর প্রমাণ বাহিরের অঙ্গ, ভিতরের অঙ্গ ভাব ও মাধুর্য্য।

এই বাহিরের সঙ্গে ভিতরকে মিলাইতে হইবে। বাহিরের কথাগুলি ভিতরের ভাবের সদৃশ হওয়া চাই; তাহা হইলেই সমস্তটায় মিলিয়া কবির কাব্য কবির কল্পনার সাদৃশ্য লাভ করিবে।

বহিঃসাদৃশ্য, অর্থাৎ রূপের সঙ্গে রূপের সাদৃশ্য, অর্থাৎ যেটাকে দেখা যায় সেইটাকে ঠিকঠাক করিয়া বর্ণনা করা কবিতার প্রধান জিনিষ নহে। তাহা কবিতার লক্ষ্য নহে উপলক্ষ্য মাত্র। এইজন্য বর্ণনামাত্রই যে-কবিতার পরিণাম, রসিকেরা তাহাকে উঁচুদরের কবিতা বলিয়া গণ্য করেন না। বাহিরকে ভিতরের করিয়া দেখা ও ভিতরকে বাহিরের রূপে ব্যক্ত করা ইহাই কবিতা এবং সমস্ত আর্টেরই লক্ষ্য।

সৃষ্টিকর্ত্তা একেবারেই আপন পরিপূর্ণতা হইতে সৃষ্টি করিতেছেন তাঁর আর-কোনো উপসর্গ নাই। কিন্তু বাহিরের সৃষ্টি মানুষের ভিতরের তারে ঘা দিয়া যখন একটা মানস পদার্থকে জন্ম দেয়, যখন একটা রসের সুর বাজায় তখনই সে আর থাকিতে পারে না, বাহিরে সৃষ্ট হইবার কামনা করে। ইহাই মানুষের সকল সৃষ্টির গোড়ার কথা। এই জন্যই মানুষের সৃষ্টিতে ভিতর বাহিরের ঘাত প্রতিঘাত। এই জন্য মানুষের সৃষ্টিতে বাহিরের জগতের আধিপত্য আছে। কিন্তু একাধিপত্য যদি থাকে, যদি প্রকৃতির ধামা-ধরা হওয়াই কোনো আর্টিষ্টের কাজ হয় তবে তার দ্বারা সৃষ্টিই হয় না। শরীর বাহিরের খাবার খায় বটে কিন্তু তাহাকে অবিকৃত বমন করিবে বলিয়া নয়। নিজের মধ্যে তাহার বিকার জন্মাইয়া তাহাকে নিজের করিয়া লইবে বলিয়া। তখন সেই খাদ্য একদিকে রসরক্তরূপে বাহ্য আকার, আরেক দিকে শক্তি স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যরূপে আন্তর আকার ধারণ করে। ইহাই শরীরের সৃষ্টি-কার্য্য। মনের সৃষ্টিকার্য্যও এমনিতর। তাহা বাহিরের বিশ্বকে বিকারের দ্বারা যখন আপনার করিয়া লয় তখন সেই মানস পদার্থটা একদিকে বাক্য রেখা সুর প্রভৃতি বাহ্য আকার, অন্যদিকে সৌন্দর্য্য শক্তি প্রভৃতি আন্তর আকার ধারণ করে। ইহাই মনের সৃষ্টি—যাহা দেখিলাম অবিকল তাহাই দেখানো সৃষ্টি নহে।

তারপরে, ছবিতে যেমন বর্ণিকাভঙ্গং, কবিতায় তেমনি ব্যঞ্জনা (Suggestiveness)। এই ব্যঞ্জনার দ্বারা কথা আপনার অর্থকে পার হইয়া যায়। যাহা বলে তার চেয়ে বেশি বলে। এই ব্যঞ্জনা ব্যক্ত ও অব্যক্তর মাঝখানকার মীড়। কবির কাব্যে এই ব্যঞ্জনা

বাণীর নির্দ্দিষ্ট অর্থের দ্বারা নহে, বাণীর অনির্দ্দিষ্ট ভঙ্গীর দ্বারা, অর্থাৎ বাণীর রেখার দ্বারা নহে, তাহার রঙের দ্বারা সৃষ্ট হয়।

আসল কথা, সকল প্রকৃত আর্টেই একটা বাহিরের উপকরণ, আর, একটা চিত্তের উপকরণ থাকা চাই—অর্থাৎ একটা রূপ, আর-একটা ভাব। সেই উপকরণকে সংযমের দ্বারা বাঁধিয়া গড়িতে হয়; বাহিরের বাঁধন প্রমাণ, ভিতরের বাঁধন লাবণ্য। তার পরে সেই ভিতর বাহিরের উপকরণকে মিলাইতে হইবে কিসের জন্য? সাদৃশ্যের জন্য। কিসের সঙ্গে সাদৃশ্য? না ধ্যানরূপের সঙ্গে কল্পরূপের সঙ্গে সাদৃশ্য। বাহিরের রূপের সঙ্গে সাদৃশ্যই যদি মুখ্য লক্ষ্য হয় তবে ভাব ও লাবণ্য কেবল যে অনাবশ্যক হয় তাহা নহে, তাহা বিরুদ্ধ হইয়া দাঁড়ায়। এই সাদৃশ্যটিকে ব্যঞ্জনার রঙে রঙাইতে পারিলে সোনায় সোহাগা—কারণ তখন তাহা সাদৃশ্যের চেয়ে বড় হইয়া ওঠে,—তখন তাহা কতটা যে বলিতেছে তাহা স্বয়ং রচয়িতাও জানে না—তখন সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টি তাহার সংকল্পকেও ছাড়াইয়া যায়।

অতএব, দেখা যাইতেছে ছবির যে ছয় অঙ্গ, সমস্ত আর্টের অর্থাৎ আনন্দরূপেরই তাই।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভাষার কথা

উত্তরবঙ্গ-সাহিত্যসম্মিলনে পঠিত আমার অভিভাষণ অবলম্বন করে,' শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয়, আষাঢ় মাসের 'নারায়ণ' পত্রে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এই সমালোচনার জন্য আমি তাঁর নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। সমাজে এবং সাহিত্যে যে-সকল বিষয়ে আমাদের পরস্পরের মধ্যে মতভেদ আছে, তার সম্যক আলোচনা ও বিচার হওয়া আমি নিতান্ত বাঞ্ছনীয় মনে করি। যাঁরা কোন নূতন মতের প্রচার করতে চান, তাঁদের কথা সমাজের এবং সাহিত্যের গোলে-হরিবোলে প্রায়ই চাপা পড়ে যায়। কেন না, প্রচলিত পদ্ধতির দলীয় লোক গণনায় অসংখ্য, এবং তাদের তুলনায় নূতন মতের পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা নগণ্য বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং এ সকল ক্ষেত্রে মতভেদ যে আছে, সমাজের নিকট তাই প্রতিপন্ন করাই কঠিন, —সমাজকে নূতন মত গ্রাহ্য করানো ত দূরের কথা। এরূপ অবস্থায়, যিনি নব্যপন্থীদের নূতন মত সমর্থন করবার সুযোগ দেন, তিনি তাদের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র।

যে ভাষা আজকাল সাহিত্যে সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তার নাম সাধুভাষা। তার জোর এই যে, এখন মুলুক তার। বঙ্গসাহিত্য আজ তার দখলে। যারা তার উচ্ছেদ সাধনে ব্রতী হয়েছে, সাহিত্যের আদালতে সকল প্রকার প্রমাণ প্রয়োগের ভার, সকল প্রকার কৈফিয়তের দায় তাদেরই উপর অর্শায়। সুতরাং যিনি আমাদের প্রমাণ দর্শাতে বলেন, তাঁর নিকট আমরা কৃতজ্ঞ, আর

যিনি আমাদের কৈফিয়ৎ তলব করেন, তাঁর নিকটও আমরা সমান কৃতজ্ঞ। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সিংহ মহাশয় এই ভাষার কথা নিয়ে কোনরূপ তর্কবিতর্ক করবার সুযোগ আমাদের দেন নি। তাঁর প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত পাঠ করে' অনুমান করা যায় যে, তিনি সাধুভাষার পক্ষে, এবং বাঙ্গলা ভাষার বিপক্ষে। কিন্তু তিনি কোথায়ও তাঁর এই মত স্পষ্ট করে উল্লেখ করেন নি। সাবধানের মার নেই, সম্ভবতঃ এই বচনটি মনে রেখে, তিনি তাঁর প্রবন্ধটি রচনা করেছেন। তাই তিনি আমার অভিভাষণের উতোর গান নি,—শুধু আমার উপর দু'টি একটি চাপান দিয়েছেন। আমি যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

ভাষা সম্বন্ধে আমার মতামতের জবাবদিহি করবার পূর্ব্বে আমি বীরবলের হয়ে দুয়েকটি কথা বল্‌তে চাই। সিংহ মহাশয় লিখেছেন যে—

"চৌধুরী মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ বীরবলী ভাষায় রচনা করেন নাই। তিনি নিজেই তাহার কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। 'বিদূষকের আসন' হইতে 'বীরবলী ঢঙ' চলে, কিন্তু তাহা 'সভাপতির আসনের বহুনিম্নে' অবস্থিত। পরক্ষণেই তিনি বলেন এই সভাপতির আসন হইতে নামিয়াই আমি আবার আমার বীরবলী ভাষা আরম্ভ করিব।"

আমার যতদূর স্মরণ হয়, আমি এরূপ কোন কথা বলিনি। বীরবলী ঢঙ নামক একটা বিশেষ ঢঙের অস্তিত্ব থাকলেও, বীরবলী ভাষা নামে কোন বিশেষ ভাষা নেই। একই ভাষা নানা ঢঙে লেখা যায়। ঢঙ অর্থে সংস্কৃতে যা'কে বলে রীতি, এবং ইংরাজীতে Style। একই ইংরাজী ভাষা যে পৃথক পৃথক লেখকের হাতে পৃথক পৃথক মূর্ত্তি ধারণ

করে, এ কথা সর্ব্বলোকবিদিত। এমন কি, সংস্কৃত ভাষাও বৈদর্ভী, গৌড়ীয়, পাঞ্চালী প্রভৃতি নানা রীতিতে লিখিত হত। আমি অবশ্য সকলকে লেখায় মৌখিক ভাষা অনুসরণ করতে বলি; কিন্তু কাউকেও বীরবলী ঢঙ অনুকরণ করতে অনুরোধ করিনে। তার কারণ, বীরবল রচনার যে পথ অবলম্বন করেছেন, সে পথ সঙ্কীর্ণ, কুটিল ও বন্ধুর। তা' ছাড়া, সে পথে কাঁটা আছে। এ পথ সাহিত্যের বামমার্গ। আমি সকলকে দক্ষিণমার্গ অবলম্বন করতে পরামর্শ দিই,—সাহিত্যের সেই সরল সমতল ও প্রশস্ত রাজপথ, যে পথে দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস প্রভৃতির বড় বড় মালগাড়ি অবাধে যাতায়াত করতে পারে। বীরবলের মতামতেরও ষোল-আনা দায়ীত্ব নিতে আমি রাজি নই। কমলাকান্তের মতের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্পূর্ণ দায়ী করা কি সঙ্গত হবে? সভাপতির আসন গ্রহণ করলেই বক্তাকে বীরবলী ঢং ত্যাগ করতে হয়, কেননা কোন সভার কোনও সভাপতি মজাঠাট্টার ওজুহাতে নিজ কথার দায়ীত্ব এড়াতে পারেন না।

তর্কস্থলে আমরা ফাঁক পেলেই প্রশ্নচ্ছলে অপরকে ঠোকা দেই। এই ভাবে এবং এই উদ্দেশ্যে সিংহ মহাশয় যে-সকল ছোটখাট প্রশ্ন করেছেন, তার উত্তর দেওয়া আমি অনাবশ্যক মনে করি। তা ছাড়া সিংহ মহাশয়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করবার ইচ্ছা আমার মোটেই নেই। কেননা তিনি আমার অভিভাষণের উপর আক্রমণ করেন নি—শুধু তার চতুর্দ্দিকে পরিক্রমণ করেছেন।

সিংহ মহাশয়ের মুখ্য প্রশ্ন এই যে, মৌখিক ভাষাকে কি করে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে? কেননা সমগ্র বঙ্গের

মৌখিক ভাষা এক নয়, দেশভেদ এবং জাতিভেদ অনুসারে মুখের কথা নানা আকার ধারণ করে।

মৌখিক ভাষার অনুসরণ করলে সাহিত্যে প্রাদেশিকতা এসে পড়বে—এ ভয় অনেকেই পান; এবং সাহিত্যকে এই দোষ হতে মুক্ত রাখবার অভিপ্রায়ে তাঁরা প্রস্তাব করেন যে, সমস্ত বঙ্গ দেশের জন্য এমন একটি ভাষা রচনা করতে হবে, যা বাঙ্গলার কোন প্রদেশেরই ভাষা নয়। সাধুভাষার স্বপক্ষে এই হচ্ছে সর্ব্বপ্রধান যুক্তি। এ যুক্তির বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য কথা আমি ইতি-পূর্ব্বে আমার "চলতিভাষা বনাম সাধুভাষা, ওরফে বাবু-বাংলা" নামক প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করেছি। সংক্ষেপে আমার কথা এই:—সাহিত্যের রাজ্য অধিকার করবার জন্য নানা প্রাদেশিক ভাষার ভিতর প্রথমে লড়াই চলে। সে লড়াইয়ে, যে প্রাদেশিক ভাষার রসনাবল সব চেয়ে বেশি, সেই ভাষা জয়লাভ করে,—বাদবাকি সব উপভাষা হয়ে পড়ে। পৃথিবীর সকল দেশেই সাহিত্যের ভাষা তার কোন একটি বিশেষ প্রদেশের মৌখিক ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত। এবং সেই মৌখিক ভাষার সঙ্গে যোগ রক্ষা করেই সাহিত্যের ভাষা পুষ্টি এবং শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে। যুগে যুগে মৌখিক ভাষার অল্পবিস্তর পরিবর্ত্তন ঘটে, এবং সঙ্গে সঙ্গে লিখিত ভাষারও রূপান্তর ঘটে। Shakespeareএর ভাষায় এ যুগে ইংরাজিতে গদ্য পদ্য কিছুই লিখিত হয় না। অথচ ইংরাজি ভাষায় আজও সাহিত্য রচিত হয়। যদি কোনও দেশে কোনও কারণে লিখিত ভাষা কথিত ভাষার অনুসরণ না করে, তাহলে অচিরে সে ভাষা কালগ্রাসে পতিত হয়। আমাদের দেশে পুঁথিগত

প্রাকৃতের দুর্দ্দশার ইতিহাস এ সত্যের সাক্ষ্য দেয়। বঙ্গদেশে সাহিত্যের ভাষা দক্ষিণবঙ্গের মৌখিক ভাষা ব্যতীত আর কিছুই নয়। ও ভাষা আকাশ থেকে পড়েনি—মানুষের মুখ থেকেই বেরিয়েছে। সুতরাং কালক্রমে দক্ষিণবঙ্গের মুখের কথার যে বদল হয়েছে, আমাদের নবসাহিত্যের ভাষাকেও সেই বদল অল্লাধিক পরিমাণে অঙ্গীকার করতে হবে—নইলে আমাদের সাহিত্য রস-রক্তহীন হয়ে পড়বে। শব্দ শ্রবণেন্দ্রিয়ের বিষয়, দর্শণেন্দ্রিয়ের নয়,—এই সত্যটি ভুলে গেলেই মানুষে লেখ্যপটের পূজা করতে আরম্ভ করে। পূর্ব্বে যা বলা গেল তার সত্যতা এতই প্রত্যক্ষ যে, স্বয়ং সিংহ মহাশয়ও বলেছেন—

"অবশ্য ভাষার বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে দক্ষিণবঙ্গের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। এবং আমাদের সাহিত্যে প্রচলিত ভাষাও এই অঞ্চলের ভাষারই অনুরূপ সন্দেহ নাই—কিন্তু এ অঞ্চলের ভাষাতেও যে প্রাদেশিকতা আছে তাহা বর্জ্জন করা আবশ্যক।"

এ কথার উত্তর আমি পরে দেব।

সিংহ মহাশয়ের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই—

"শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথোপকথনের ভাষাই যদি সাহিত্যরচনার উপযোগী ভাষা হয়, তবে সে শিক্ষিত সম্প্রদায় অর্থে কাহাদিগকে বুঝিব? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে এই শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে বাদ দিব কি? তাঁহারা "কলম" না বলিয়া "লেখনী" বলেন—"দোয়াত" না বলিয়া "মস্যাধার"—"আদালত" না বলিয়া "বিচারালয়" বলেন ইত্যাদি।"

ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রচলিত কথোপকথনের ভাষা বঙ্গের অপর সকল সমাজের মৌখিক ভাষার তুলনায় যে সংস্কৃত-শব্দভূয়িষ্ঠ,—এ

কথা আমি অস্বীকার করিনে। তবে পণ্ডিত মহাশয়েরা যে ভুলেও দোয়াত কলমের নাম মুখে আনেন না, এ কথা আমার জানা ছিল না। কলমের চর্চ্চা করবার বিপক্ষে ত কোন শাস্ত্রীয় বিধান নেই। মহম্মদগজ্‌নির বহুপূর্ব্বে ও পদার্থটি ভারতবর্ষে প্রবেশলাভ এবং সংস্কৃত কাব্যে স্থানলাভ করেছিল। মহাকবি ক্ষেমেন্দ্র তাঁর রচনায় ওশব্দ ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেন—

কলমাগ্রনির্গতমসীবিন্দুব্যাজেন সাঞ্জনাশ্রুকণৈঃ।
কায়স্থলুণ্ঠ্যমানা রোদতি খিন্নেব রাজ্যশ্রীঃ॥ (কলাবিলাসঃ)।

অস্যার্থ—

"কায়স্থ কর্ত্তৃক লুণ্ঠিতা এবং খিন্না রাজ্যশ্রী কলমাগ্রনির্গত মসীবিন্দুর ছলে সাঞ্জন অশ্রুকণা বিসর্জ্জন করেন।"

তারপর সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা "আদালত"কে কেন যে "বিচারালয়" বল্‌বেন তাও বোঝা কঠিন, কেননা সংস্কৃতভাষায় Law Courtএর নাম অধিকরণমণ্ডপ, ব্যবহারমণ্ডপ, ব্যবহারসভা প্রভৃতি। ইংরাজি Trial শব্দের সংস্কৃত প্রতিবাক্য "বিচার" নয়। ইংরাজিশিক্ষিত সম্প্রদায়ের হাতে পড়েই Law Court ভাষায় "বিচারালয়" আকার ধারণ করেছে। "মস্যাধার" শব্দ ব্যবহার কর্‌বার ভিতর বিপদ আছে। ভৃত্যকে "মস্যাধার" আনয়ন করতে বল্‌লে, "নস্যাধার" আনীত হবারই বেশী সম্ভাবনা—কেননা ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু মসী নয়,—নস্য।

সিংহ মহাশয় বলেন যে, একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা কথায় কথায় সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করেন; অপর দিকে ইংরাজি শিক্ষিত সম্প্রদায় তেমনি ইংরাজি শব্দ ব্যবহার করেন। অতএব

"যতদিন ইংরাজিশিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের কথোপকথনের মধ্যে ইংরেজি কথার বুক্‌নী দেওয়া না ছাড়িবেন, ততদিন কথোপকথনের ভাষায় গ্রন্থরচনা করিলে তাহা শাপভ্রষ্ট ইংরাজি ভাষাই হইবে।"

আমি ত চিরকাল এই কথাই বলে আস্‌ছি যে একদিকে সংস্কৃত, অপর দিকে ইংরেজি,—এই দোটানার মধ্যে পড়ে আমাদের মাতৃভাষা মারা যাচ্ছে। এবং এই দুটি ভাষার মিলনে যে কিম্ভূত কিমাকার নবভাষার সৃষ্টি হচ্ছে, তারি নাম সাধুভাষা। ইংরেজি বুক্‌নি ছাড়্‌তে হলে যে সংস্কৃত বুক্‌নি ধরতে হবে—এ কথা আমি স্বীকার করি নে। ইংরেজি বুক্‌নি এখন পর্য্যন্ত আমাদের মুখেই রয়েছে, কিন্তু সংস্কৃত বুক্‌নি সাহিত্যে স্থান পেয়েছে—তাও আবার খাঁটি সংস্কৃত নয়—ইংরেজি কথা ভেঙ্গে যোড়াতাড়া দিয়ে আমাদের হাতে-গড়া বাঙ্গলা সংস্কৃত। সাহিত্যের ভাষাকে মৌখিক ভাষার অনুসরণ কর্‌তে হবে, অনুকরণ করতে হবে না। সুতরাং আমাদের শিক্ষার প্রসাদে আমাদের মুখের ভাষার উপর যে-সকল ইংরাজি ও সংস্কৃত শব্দ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, লেখায় সেগুলি বর্জ্জন কর্‌তে হবে। মনে রাখবেন যে সেই শব্দগুলিই দূরে নিক্ষেপ কর্‌তে হবে, যেগুলি আজও প্রক্ষিপ্ত হিসাবে গণ্য ;—কিন্তু যে-সকল ইংরাজি এবং সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গলা ভাষার সম্পূর্ণ অঙ্গীভূত হয়ে গেছে, সেগুলি লেখায় বাদ দেওয়া চল্‌বে না।

এস্থলে একটি কথার পুনরুল্লেখ করার দরকার, যে কথা আমি পূর্ব্বে বহুবার বলেছি। ভাষার বিশেষত্ব তার বাক্যের—(Sentence) উপরে নির্ভর করে—পদের (Word) উপরে নয়। ভাষার স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় তার ব্যাকরণে পাওয়া যায়—অভিধানে নয়। প্রতি জীবন্ত

ভাষায় নিত্য নূতন শব্দের আমদানি হয়, এবং অনেক প্রাচীন শব্দ ঝরে পড়ে। কিন্তু ভাষার গঠন অতি স্বল্প মাত্রায় এবং অতি ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তিত হয়। আমার সঙ্গে সিংহ মহাশয়ের মতের প্রভেদ এই যে, গত দু'তিনশ' বৎসরের মধ্যে মুখের ভাষার গঠনের যে পরিবর্ত্তন হয়েছে, আমি লেখায় তা গ্রাহ্য করতে বলি। সিংহ মহাশয় বলেন যে, দক্ষিণবঙ্গের ভাষাতেও যে প্রাদেশিকতা আছে, তাহা বর্জ্জন করা আবশ্যক। তাঁর মতে "করছি" হচ্ছে এই প্রাদেশিকতার উদাহরণ। তিনি দেখিয়েছেন যে, ভাষা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের সঙ্গে আমার মতের পোনেরো-আনা-তিন-পাই মিল থাকলেও, ঐ এক পাই অমিলের জন্য তাঁদের রচনা সাহিত্যসমাজে আদৃত, এবং আমার ভাষা নিন্দিত। এর উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, প্রতি জীবন্ত ভাষা Evolutionএর নিয়মের অধীন। এবং সেই ইভলিউশনের দিক দিয়ে দেখতে গেলে "করছি"—"করিতেছি" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ form—কেননা "করিতেছি"তে কৃ এবং অস এই যোড়া ধাতুরই একত্র অস্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়,—অপর পক্ষে "করছি"তে অস ধাতু বিভক্তিতে পরিণত হয়েছে। এ বিষয়ে আমি আমার পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে বিস্তর আলোচনা করেছি।

কথিত ভাষার বদল যত সহজে হয়, লিখিত ভাষার অবশ্য তত সহজে হয় না,—অথচ একথাও সত্য যে, কোন জীবন্ত ভাষা হ্রাস-বৃদ্ধির নৈসর্গিক নিয়মের বহির্ভূত নয়। যা জড় কিম্বা মৃত, এ পৃথিবীতে একমাত্র তাই নিজের শক্তিতে নিজেকে বদলে নিতে পারে না। যাঁরা সাধুভাষার সাধুতা রক্ষা করবার জন্য বদ্ধপরিকর

হয়েছেন, তাঁরাও স্বীকার কর্‌তে বাধ্য যে, দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমাদের চোখের সুমুখেই সে ভাষার চেহারা বিলকুল ফিরে গেছে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষার সঙ্গে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের ভাষার তুলনা কর্‌লেই, নবসাহিত্য যে কতদূর মৌখিক ভাষার কাছে এগিয়ে এসেছে, তা নিতান্ত অন্যমনস্ক পাঠকও প্রত্যক্ষ কর্‌তে পার্‌বেন। জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হওয়াতে, বাঙ্গালীর ভাষার ঐক্য নষ্ট হবার কোনই সম্ভাবনা নেই। জাতিভেদ এবং প্রদেশভেদ অনুসারে বাঙ্গালীতে বাঙ্গালীতে, শুধু ভাষা কেন, অপর অনেক বিষয়েও যে প্রভেদ বিস্তর, এ ত প্রত্যক্ষ সত্য। কোনও কৃত্রিম উপায়ে সে পার্থক্য দূর করা যাবে না, বড় জোর চাপা দেওয়া যেতে পারে। সাধুভাষা যদি নিতান্ত কৃত্রিম ভাষা না হয়ে পড়ে, এবং যদি তা দক্ষিণবঙ্গের মৌখিক ভাষার সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ না করে, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ সাহিত্যের প্রসাদে বাঙ্গালীর শুধু ভাষার নয়—সমাজেরও ঐক্য গড়ে উঠবে।

যদিচ সিংহ মহাশয়ের প্রবন্ধের নাম "ভাষার কথা," তবুও তাতে ভাষার অপেক্ষা সাহিত্যের আলোচনাই ঢের বেশি-পরিমাণে করা হয়েছে। সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁর মতামতের কোনরূপ বিচার করা আমি অনাবশ্যক মনে করি—কেননা তাঁর মোদ্দা কথা এই যে, রবীন্দ্রনাথের লেখা বোঝা যায় না। তাঁর প্রবন্ধ পড়ে আমার শুধু এই মনে হয় যে, মানুষের বোঝবার ক্ষমতার সীমা আছে, কিন্তু তার না বোঝবার ক্ষমতা অসীম।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

অব্যক্ত বাসনা

(প্রাচীন ফরাসী কবি হইতে)

সাধ যায় বালা—আঃ রে দুরন্ত সরম !
এমন ক'দিন আর মরি জ্বলে জ্বলে ?
দূরে যারে লজ্জা ভয়—দূরে যা সম্ভ্রম !
প্রাণের গোপন ব্যথা দিই তবে বলে।
"সাধ যায় অয়ি বালা, তুমি যে দরদী
মোর দুঃখে"···কি বলিরে, রুষিবে দেবতা।
না—না পোড়া আশা নিয়ে যতই দগধি'
মনে মনে,—মনে থাকে মনের যা কথা।
কিন্তু কেন মর্ম্মে রাখি এ আগুন জ্বেলে,—
যা হয় তা হোক, তাহে দিই জল ঢেলে।
বলি আমি—তার পরে খেদ নাই কোনো।
"সাধ যায়"···বুক ফাটে, মুখ নাহি ফুটে,
বলিব—বলিরে তবু—প্রাণ কণ্ঠে উঠে !
সাধ যায়—ওগো তুমি শোনো তুমি শোনো।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

সবুজ পত্র

ঘরে বাইরে

সন্দীপের আত্মকথা

আমি বুঝতে পারচি একটা গোলমাল বেধেছে। সেদিন তার একটু পরিচয় পাওয়া গেল।

নিখিলেশের বৈঠকখানার ঘরটা আমি আসার পর থেকে সদর ও অন্দরে মিশিয়ে একটা উভচর জাতীয় পদার্থ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেখানে বাইরের থেকে আমার অধিকার ছিল, ভিতরের থেকে মক্ষির বাধা ছিল না।

আমাদের এই অধিকার যদি আমরা কিছু-কিছু হাতে রেখে রয়ে-বসে ভোগ করতুম তাহলে হয় ত লোকের একরকম সয়ে যেত। কিন্তু বাঁধ যখন প্রথম ভাঙে তখনি জলের তোড়টা হয় বেশি। বৈঠকখানা ঘরে আমাদের সভাটা এম্‌নি জোরে চল্‌তে লাগল যে, আর কোনো কথা মনেই রইল না।

বৈঠকখানা ঘরে যখন মক্ষি আসে আমার ঘর থেকে আমি একরকম করে টের পাই। খানিকটা বালা-চুড়ির খানিকটা এটা-ওটার শব্দ পাওয়া যায়। ঘরের দরজাটা বোধ করি সে একটু অনাবশ্যক জোরে ঘা দিয়েই খোলে। তার পরে বইয়ের আলমারির কাঁচের পাল্লাটা একটু আঁট আছে সেটা টেনে খুল্‌তে গেলে যথেষ্ট শব্দ হয়ে ওঠে। বৈঠকখানায় এসে দেখি দরজার দিকে পিছন করে মক্ষি শেল্‌ফ্‌ থেকে মনের মত বই বাছাই করতে অত্যন্ত বেশি মনোযোগী। তখন তাকে এই দুরূহ কাজে সাহায্য করবার প্রস্তাব করতেই সে চমুকে উঠে আপত্তি করে—তার পরে অন্য প্রসঙ্গ উঠে পড়ে।

সেদিন বৃহস্পতিবারের বারবেলায় পূর্ব্বোক্ত রকমের শব্দ লক্ষ্য করেই ঘর থেকে রওনা হয়েছিলুম। পথের মাঝখানে বারান্দায় দেখি এক দরোয়ান খাড়া। তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করেই আমি চলেছিলুম—এমন সময় সে পথ আগ্‌লে বল্লে, বাবু, ওদিকে যাবেন না।

যাব না ? কেন ?

বৈঠকখানা ঘরে রাণীমা আছেন।

আচ্ছা, তোমার রাণীমাকে খবর দাও যে সন্দীপবাবু দেখা করতে চান।

না, সে হবে না, হুকুম নেই।

ভারি রাগ হল, গলা একটু চড়িয়ে বল্লুম,—আমি হুকুম করচি তুমি জিজ্ঞাসা করে এস।

গতিক দেখে দরোয়ান একটু থম্‌কে গেল। তখন আমি

তাকে পাশে ঠেলে ঘরের দিকে এগলুম। যখন প্রায় দরজার কাছ-বরাবর পৌঁচেছি এমন সময় তাড়াতাড়ি সে কর্ত্তব্য পালন করবার জন্যে ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরে বল্লে, বাবু, যাবেন না।

কি! আমার গায়ে হাত! আমি হাত ছিনিয়ে নিয়ে তার গালে এক চড় কষিয়ে দিলুম। এমন সময়ে মক্ষি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেই দেখে দরোয়ান আমাকে অপমান করবার উপক্রম করচে।

তার সেই মূর্ত্তি আমি কখনো ভুল্‌ব না। মক্ষি যে সুন্দরী সেটা আমার আবিষ্কার। আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক ওর দিকে তাকাবে না। লম্বা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, যাকে আমাদের রূপ-রসজ্ঞ লোকেরা নিন্দা করে বলে "ঢ্যাঙা"। ওর ঐ লম্বা গড়নটিই আমাকে মুগ্ধ করে—যেন প্রাণের ফোয়ারার ধারা—সৃষ্টিকর্ত্তার হৃদয়গুহা থেকে বেগে উপরের দিকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেচে। ওর রং শাম্‌লা—কিন্তু সে যে ইস্পাতের তলোয়ারের মত শাম্‌লা—কি তেজ আর কি ধার! সেই তেজ সেদিন ওর সমস্ত মুখে চোখে ঝিক্‌মিক্ করে উঠ্‌ল। চৌকাঠের উপর দাঁড়িয়ে তর্জ্জনী তুলে রাণী বল্লে, নন্‌কু চলা যাও!—

আমি বল্লুম, আপনি রাগ করবেন না—নিষেধ যখন আছে তখন আমিই চলে যাচ্চি।

মক্ষি কম্পিত স্বরে বল্লে, না আপনি যাবেন না—ঘরে আসুন।

এ ত অনুরোধ নয়, এ হুকুম। আমি ঘরে এসে চৌকিতে বসে একটা হাতপাখা নিয়ে হাওয়া খেতে লাগ্‌লুম। মক্ষি একটা

কাগজের টুক্‌রোয় পেন্সিল দিয়ে কি লিখে বেহারাকে ডেকে বল্লে, বাবুকে দিয়ে এসো।

আমি বল্লুম, আমাকে মাপ করবেন, ধৈর্য্য রাখ্‌তে পারিনি—দরোয়ানটাকে মেরেচি।

মক্ষি বল্লে, বেশ করেচেন।

কিন্তু ও বেচারার ত কোনো দোষ নেই—ও ত কর্ত্তব্য পালন করেচে।

এমন সময় নিখিল ঘরে ঢুক্‌ল। আমি দ্রুত চৌকি থেকে উঠে তার দিকে পিঠ করে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

মক্ষি নিখিলকে বল্লে, আজ নন্‌কু দরোয়ান সন্দীপবাবুকে অপমান করেচে।

নিখিল এম্‌নি ভালোমানুষের মত আশ্চর্য্য হয়ে বল্লে, "কেন ?" যে আমি আর থাক্‌তে পারলুম না। মুখ ফিরিয়ে তার মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকালুম। ভাবলুম, সাধুলোকের সত্যের বড়াই স্ত্রীর কাছে টেঁকে না, যদি তেমন স্ত্রী হয়।

মক্ষি বল্লে, সন্দীপবাবু বৈঠকখানায় আস্‌ছিলেন সে ওঁর পথ আটক করে বল্লে, হুকুম নেই।

নিখিল জিজ্ঞাসা করলে, কার হুকুম নেই ?

মক্ষি বল্লে, তা কেমন করে বল্‌ব ?

রাগে ক্ষোভে মক্ষির চোখ দিয়ে জল পড়ে-পড়ে আর কি!

দরোয়ানকে নিখিল ডেকে পাঠালে। সে বল্লে, হুজুর, আমার ত কসুর নেই। হুকুম তামিল করেচি।

কার হুকুম ?

বড় রাণীমা মেজ রাণীমা আমাকে ডেকে বলে দিয়েচেন।

ক্ষণকালের জন্যে সবাই আমরা চুপ করে রইলুম।

দরোয়ান চলে গেলে মক্ষি বল্লে, নন্‌কুকে ছাড়িয়ে দিতে হবে।

নিখিল চুপ করে রইল। আমি বুঝলুম ওর ন্যায়বুদ্ধিতে খট্‌কা লাগ্‌ল। ওর খট্‌কার আর অন্ত নেই।

কিন্তু বড় শক্ত সমস্যা! সোজা মেয়ে ত নয়। নন্‌কুকে ছাড়ানোর উপলক্ষে জায়েদের উপর অপমানের শোধ তোলা চাই।

নিখিল চুপ করেই রইল। তখন মক্ষির চোখ দিয়ে আগুন ঠিকরে পড়তে লাগ্‌ল। নিখিলের ভালোমানুষির পরে তার ঘৃণার আর অন্ত রইল না।

নিখিল কোনো কথা না বলে উঠে ঘর থেকে চলে গেল।

পরদিন সেই দরোয়ানকে দেখা গেল না। খবর নিয়ে শুন্‌লুম, তাকে নিখিল মফস্বলের কোন্ কাজে নিযুক্ত করে পাঠিয়েচে—দরোয়ানজির তাতে লাভ বই ক্ষতি হয়নি।

এইটুকুর ভিতরে নেপথ্যে কত ঝড় বয়ে গেছে সে ত আভাসে বুঝতে পারচি। বারে বারে কেবল এই কথাই মনে হয়। নিখিল অদ্ভুত মানুষ, একেবারে সৃষ্টিছাড়া!

এর ফল হল এই যে এর পরে কিছুদিন মক্ষি রোজই বৈঠকখানায় এসে বেহারাকে দিয়ে আমাকে ডাকিয়ে এনে আলাপ করতে আরম্ভ করলে—কোনোরকম প্রয়োজনের কিম্বা আকস্মিকতার ছুতোটুকু পর্য্যন্ত রাখ্‌লে না।

এমনি করেই ভাবভঙ্গী ক্রমে আকার ইঙ্গিতে, অস্পষ্ট ক্রমে

স্পষ্টতায় জমে উঠ্‌তে থাকে। এ যে ঘরের বউ, বাইরের পুরুষের পক্ষে একেবারে নক্ষত্রলোকের মানুষ। এখানে কোনো বাঁধা পথ নেই।

এই পথহীন শূন্যের ভিতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে টানাটানি জানাজানি, অদৃশ্য হাওয়ার-হাওয়ায় সংস্কারের পর্দ্দা একটার পর আর-একটা উড়িয়ে দিয়ে কোন্ এক সময়ে একেবারে উলঙ্গ প্রকৃতির মাঝখানে এসে পৌঁছন,—সত্যের এ এক আশ্চর্য্য জয়যাত্রা।

সত্য নয় ত কি! স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের যে মিলের টান, সেটা হল একটা বাস্তব জিনিষ; ধূলোর কণা থেকে আরম্ভ করে আকাশের তারা পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত বস্তুপুঞ্জ তার পক্ষে; আর মানুষ তাকে কতকগুলো বচন দিয়ে আড়ালে রাখতে চায়, তাকে ঘরগড়া বিধি নিষেধ দিয়ে নিজের ঘরের জিনিষ করে' বানাতে বসেছে। যেন সৌরজগৎকে গলিয়ে জামাইয়ের জন্যে ঘড়ির চেন্ করবার ফরমাস। তারপরে বাস্তব যেদিন বস্তুর ডাক শুনে জেগে ওঠে, মানুষের সমস্ত কথার ফাঁকি একমুহূর্ত্তে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিয়ে আপনার জায়গায় এসে দাঁড়ায় তখন ধর্ম্ম বল বিশ্বাস বল কেউ কি তাকে ঠেকাতে পারে? তখন কত ধিক্কার, কত হাহাকার, কত শাসন—কিন্তু ঝড়ের সঙ্গে ঝগড়া করবে কি শুধু মুখের কোথায়? সে ত জবাব দেয় না, সে শুধু নাড়া দেয়, সে যে বাস্তব।

তাই চোখের সাম্‌নে সত্যের এই প্রত্যক্ষ প্রকাশ দেখ্‌তে আমার ভারি চমৎকার লাগ্‌চে। কত লজ্জা, কত ভয়, কত

দ্বিধা,—তাই যদি না থাক্‌বে তবে সত্যের রস রইল কি? এই যে পা কাঁপ্‌তে থাকা, এই যে থেকে-থেকে মুখ ফেরানো, এ বড় মিষ্টি; আর, এই ছলনা, শুধু অন্যকে নয়, নিজেকে। বাস্তবকে যখন অবাস্তবের সঙ্গে লড়াই করতে হয় তখন ছলনা তার প্রধান অস্ত্র। কেননা বস্তুকে তার শত্রুপক্ষ লজ্জা দিয়ে বলে, তুমি স্থূল। তাই, হয় তাকে লুকিয়ে-লুকিয়ে থাকতে, নয় মায়া আবরণ পরে বেড়াতে হয়। যে রকম অবস্থা তাতে সে জোর করে বল্‌তে পারে না যে, হাঁ আমি স্থূল, কেননা আমি সত্য, আমি মাংস, আমি প্রবৃত্তি, আমি ক্ষুধা, নির্লজ্জ, নির্দ্দয়,—যেমন নির্লজ্জ নির্দ্দয় সেই প্রচণ্ড পাথর যা বৃষ্টির ধারায় পাহাড়ের উপর থেকে লোকালয়ের মাথার উপরে গড়িয়ে এসে পড়ে, তার পরে যে বাঁচুক্ আর যে মরুক্!

আমি সমস্তই দেখ্‌তে পাচ্চি। ঐ যে পর্দ্দা উড়ে-উড়ে পড়্‌চে, ঐ যে দেখ্‌তে পাচ্চি প্রলয়ের রাস্তায় যাত্রার সাজসজ্জা চল্‌চে;—ঐ যে লাল ফিতেটুকু ছোট্টো এতটুকু, রাশি রাশি ঘষা চুলের ভিতর থেকে একটুখানি দেখা যাচ্চে, ওযে কালবৈশাখীর লোলুপ জিহ্বা, কামনার গোপন উদ্দীপনায় রাঙা; ঐ যে পাড়ের এতটুকু ভঙ্গী, ঐ যে জ্যাকেটের এতটুকু ইঙ্গিত আমি যে স্পষ্ট অনুভব করচি তার উত্তাপ। অথচ এসব আয়োজন অনেকটা অগোচরে হচ্চে এবং অগোচরে থাক্‌চে, যে করচে সেও সম্পূর্ণ জানে না।

কেন জানে না? তার কারণ, মানুষ বরাবর বাস্তবকে ঢাকা দিয়ে-দিয়ে বাস্তবকে স্পষ্ট করে জানবার এবং মানবার উপায় নিজের হাতে নষ্ট করেছে। বাস্তবকে মানুষ লজ্জা করে। তাই

মানুষের তৈরি রাশি-রাশি ঢাকাঢুকির ভিতর দিয়ে লুকিয়ে-লুকিয়ে তাকে নিজের কাজ করতে হয়—এই জন্যে তার গতিবিধি জান্‌তে পারিনে, অবশেষে হঠাৎ যখন সে একেবারে ঘাড়ের উপরে এসে পড়ে তখন তাকে আর অস্বীকার করবার জো থাকে না। মানুষ তাকে সয়তান বলে বদ্‌নাম দিয়ে তাড়াতে চেয়েচে, এই জন্যেই সাপের মূর্ত্তি ধরে' স্বর্গোদ্যানে সে লুকিয়ে প্রবেশ করে, আর কানে-কানে কথা কয়েই মানবপ্রেয়সীর চোখ ফুটিয়ে দিয়ে তাকে বিদ্রোহী করে তোলে; তার পর থেকে আর আরাম নেই, তার পরে মরণ আর কি!

আমি বস্তুতন্ত্র। উলঙ্গ বাস্তব আজ ভাবুকতার জেলখানা ভেঙে আলোকের মধ্যে বেরিয়ে আস্‌চে এর পদে পদেই আমার আনন্দ ঘনিয়ে উঠ্‌চে। যা চাই সে খুব কাছে আস্‌বে, তাকে মোটা করে পাব, তাকে শক্ত করে ধরব, তাকে কিছুতে ছাড়ব না—মাঝখানে যা-কিছু আছে তা ভেঙে চুরমার হয়ে ধূলোয় লুটবে, হাওয়ায় উড়বে, এই আনন্দ, এই ত আনন্দ, এই ত বাস্তবের তাণ্ডব নৃত্য—তার পরে মরণ বাঁচন, ভালো মন্দ, সুখ দুঃখ তুচ্ছ তুচ্ছ তুচ্ছ!

আমার মক্ষিরাণী স্বপ্নের ঘোরেই চল্‌চে—সে জানেনা কোন্ পথে চল্‌চে। সময় আসবার আগে তাকে হঠাৎ জানিয়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়া নিরাপদ নয়। আমি যে কিছুই লক্ষ্য করিনে এইটে জানানোই ভালো। সেদিন আমি যখন খাচ্ছিলুম মক্ষিরাণী আমার মুখের দিকে একরকম করে তাকিয়ে ছিল, একেবারে ভুলে গিয়েছিল এই চেয়ে থাকার অর্থটা কি। আমি হঠাৎ একসময়ে

তার চোখের দিকে চোখ তুল্‌তেই তার মুখ লাল হয়ে উঠ্‌ল, চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলে। আমি বল্লুম, আপনি আমার খাওয়া দেখে একেবারে অবাক হয়ে গেছেন। অনেক জিনিষ লুকিয়ে রাখ্‌তে পারি কিন্তু আমার ঐ লোভটা পদে পদে ধরা পড়ে। তা দেখুন, আমি যখন নিজের হয়ে লজ্জা করিনে তখন আপনি আমার হয়ে লজ্জা করবেন না।

সে ঘাড় বেঁকিয়ে আরো লাল হয়ে উঠে বল্‌তে লাগ্‌ল, না, না, আপনি—

আমি বল্লুম, আমি জানি লোভী মানুষকে মেয়েরা ভালবাসে—ঐ লোভের উপর দিয়েই ত মেয়েরা তাদের জয় করে। আমি লোভী তাই বরাবর মেয়েদের কাছ থেকে আদর পেয়ে-পেয়ে আজ আমার এমন দশা হয়েছে যে, আর লজ্জার লেশমাত্র নেই। অতএব আপনি একদৃষ্টে অবাক্ হয়ে আমার খাওয়া দেখুন না, আমি কিচ্ছু কেয়ার করিনে। এই ডাঁটাগুলির প্রত্যেকটিকে চিবিয়ে একেবারে নিঃসত্ত্ব করে ফেলে দেব তবে ছাড়ব—এই আমার স্বভাব।

আমি কিছুদিন আগে আজকাল্‌কার দিনের একখানি ইংরিজি বই পড়ছিলুম তাতে স্ত্রীপুরুষের মিলননীতি সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট-স্পষ্ট বাস্তব কথা আছে। সেইটে আমি ওদের বৈঠকখানায় ফেলে গিয়েছিলুম। একদিন দুপুর বেলায় আমি কি জন্যে সেই ঘরে ঢুকেই দেখি মক্ষিরাণী সেই বইটা হাতে করে নিয়ে পড়চে—পায়ের শব্দ পেয়েই তাড়াতাড়ি সেটার উপর আরেকটা বই চাপা দিয়ে উঠে পড়ল। যে বইটা চাপা দিল সেটা লংফেলোর কবিতা।

আমি বল্লুম, দেখুন আপনারা কবিতার বই পড়তে লজ্জা পান কেন আমি কিছুই বুঝতে পারিনে। লজ্জা পাবার কথা পুরুষের, কেননা, আমরা কেউবা এটর্ণি, কেউবা এঞ্জিনিয়ার; আমাদের যদি কবিতা পড়তেই হয় তাহলে অর্দ্ধেকরাত্রে দরজা বন্ধ করে পড়া উচিত; কবিতার সঙ্গেই ত আপনাদের আগাগোড়া মিল। যে বিধাতা আপনাদের সৃষ্টি করেচেন তিনি যে গীতিকবি, —জয়দেব তাঁরই পায়ের কাছে বসে "ললিতলবঙ্গলতা"য় হাত পাকিয়েচেন।

মক্ষিরাণী কোনো জবাব না দিয়ে হেসে লাল হয়ে চলে যাবার উদ্যোগ করতেই আমি বল্লুম, না, সে হবেনা—আপনি বসে বসে পড়ুন। আমি একখানা বই ফেলে গিয়েছিলুম সেটা নিয়েই দৌড় দিচ্চি।

আমার বইখানা টেবিল থেকে তুলে নিলুম। বল্লুম, ভাগ্যে এ বই আপনার হাতে পড়েনি তাহলে আপনি হয়ত আমাকে মারতে আস্তেন।

মক্ষি বল্লে, কেন ?

আমি বল্লুম, কেননা, এ কবিতার বই নয়। এতে যা আছে সে একেবারে মানুষের মোটা কথা, খুব মোটা করেই বলা, কোনোরকম চাতুরী নেই। আমার খুব ইচ্ছে ছিল এ বইটা নিখিল পড়ে।

একটুখানি ভ্রূকুঞ্চিত করে মক্ষি বল্লে, কেন বলুন দেখি ?

আমি বল্লুম, ও যে পুরুষ মানুষ, আমাদেরই দলের লোক। এই স্থূল জগৎটাকে ও কেবলি ঝাপ্‌সা করে দেখ্‌তে চায় সেই

জন্যেই ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া বাধে। আপনি ত দেখচেন সেই-জন্যেই আমাদের স্বদেশী ব্যাপারটাকে ও লংফেলোর কবিতার মত ঠাউরেছে—যেন ফি-কথায় মধুর ছন্দ বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে এইরকম ওর মৎলব। আমরা গদ্যের গদা নিয়ে বেড়াই, আমরা ছন্দ ভাঙার দল।

মক্ষি বল্লে, স্বদেশীর সঙ্গে এ বইটার যোগ কি?

আমি বল্লুম, আপনি পড়ে দেখ্‌লেই বুঝতে পারবেন। কি স্বদেশ কি অন্য সব বিষয়েই নিখিল বানানো কথা নিয়ে চল্‌তে চায়, তাই পদে পদে মানুষের যেটা স্বভাব তারই সঙ্গে ওর ঠোকাঠুকি বাধে, তখন ও স্বভাবকে গাল দিতে থাকে;—কিছু-তেই একথাটা ও মান্‌তে চায় না যে, কথা তৈরি হবার বহু আগেই আমাদের স্বভাব তৈরি হয়ে গেছে—কথা থেমে যাবার বহু পরেও আমাদের স্বভাব বেঁচে থাক্‌বে।

মক্ষি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল তার পরে গম্ভীরভাবে বল্লে, স্বভাবের চেয়ে বড় হতে চাওয়াটাই কি আমাদের স্বভাব নয়?

আমি মনে মনে হাস্‌লুম—ওগো ও রাণী, এ তোমার আপন বুলি নয়, এ নিখিলেশের কাছে শেখা। তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ, প্রকৃতিস্থ মানুষ, স্বভাবের রসে দিব্যি টস্‌টস্‌ করচ; যেমনি স্বভাবের ডাক শুনেছ অমনি তোমার সমস্ত রক্তমাংস সাড়া দিতে সুরু করেছে—এতদিন এরা তোমার কানে যে মন্ত্র দিয়েছে সেই মায়ামন্ত্রজালে তোমাকে ধরে রাখ্‌তে পারবে কেন? তুমি যে জীবনের আগুনের তেজে শিরায় শিরায় জ্বলচ আমি কি জানিনে? তোমাকে সাধুকথার ভিজে গামছা জড়িয়ে ঠাণ্ডা রাখ্‌বে আর কতদিন?

আমি বল্লুম, পৃথিবীতে দুর্ব্বল লোকের সংখ্যাই বেশি ; তারা নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ঐ রকমের মন্ত্র দিন রাত পৃথিবীর কানে আউড়ে-আউড়ে সবল লোকের কান খারাপ করে দিচ্চে। স্বভাব যাদের বঞ্চিত করে কাহিল করে রেখেচে তারাই অন্যের স্বভাবকে কাহিল করবার পরামর্শ দেয়।

মক্ষি বল্লে, আমরা মেয়েরাও ত দুর্ব্বল, দুর্ব্বলের ষড়যন্ত্রে আমাদেরও ত যোগ দিতে হবে।

আমি হেসে বল্লুম, কে বল্লে দুর্ব্বল ? পুরুষ মানুষ তোমাদের অবলা বলে স্তুতিবাদ করে-করে তোমাদের লজ্জা দিয়ে দুর্ব্বল করে রেখেছে। আমার বিশ্বাস তোমরাই সবল। তোমরা পুরুষের মন্ত্রে-গড়া দুর্গ ভেঙে ফেলে ভয়ঙ্করী হয়ে মুক্তি লাভ করবে এ আমি লিখে পড়ে দিচ্চি। বাইরেই পুরুষরা হাঁক-ডাক করে বেড়ায় কিন্তু তাদের ভিতরটা ত দেখচ তারা অত্যন্ত বদ্ধ জীব। আজ পর্য্যন্ত তারাই ত নিজের হাতে শাস্ত্র গড়ে নিজেকে বেঁধেছে, নিজের ফুঁয়ে এবং আগুনে মেয়ে জাতকে সোনার শিকল বানিয়ে অন্তরে-বাইরে আপনাকে জড়িয়েছে। এমনি করে নিজের ফাঁদে নিজেকে বাঁধবার অদ্ভুত ক্ষমতা যদি পুরুষের না থাক্‌ত তাহলে পুরুষকে আজ ধরে রাখত কে ? নিজের তৈরি ফাঁদই পুরুষের সব চেয়ে বড় উপাস্য দেবতা। তাকেই পুরুষ নানা রঙে রাঙিয়েচে, নানা সাজে সাজিয়েচে, নানা নামে পূজো দিয়েচে। কিন্তু মেয়েরা ? তোমরাই দেহ দিয়ে মন দিয়ে পৃথিবীতে রক্তমাংসের বাস্তবকে চেয়েচ, বাস্তবকে জন্ম দিয়েচ, বাস্তবকে পালন করেচ।

মক্ষি শিক্ষিত মেয়ে, সহজে তর্ক করতে ছাড়ে না,—সে বল্লে,

তাই যদি সত্যি হত তাহলে পুরুষ কি মেয়েকে পছন্দ করতে পারত ?

আমি বল্লুম, মেয়েরা সেই বিপদের কথা জানে—তারা জানে পুরুষ জাতটা স্বভাবত ফাঁকি ভালোবাসে সেই জন্যে তারা পুরুষের কাছ থেকেই কথা ধার করে ফাঁকি সেজে পুরুষকে ভোলাবার চেষ্টা করে। তারা জানে খাদ্যের চেয়ে মদের দিকেই স্বভাবমাতাল পুরুষ জাতটার ঝোঁক বেশি, এই জন্যেই নানা কৌশলে নানা ভাবে-ভঙ্গীতে তারা নিজেকে মদ বলেই চালাতে চায়, আসলে তারা যে খাদ্য সেটা যথাসাধ্য গোপন করে রাখে। মেয়েরা বস্তুতন্ত্র, তাদের কোনো মোহের উপকরণের দরকার করে না—পুরুষের জন্যেই ত যত রকম-বেরকম মোহের আয়োজন। মেয়েরা মোহিনী হয়েছে নেহাৎ দায়ে পড়ে।

মক্ষি বল্লে, তবে এ মোহ ভাঙতে চান কেন ?

আমি বল্লুম, স্বাধীনতা চাই বলে। দেশেও স্বাধীনতা চাই, মানুষের সঙ্গে সম্বন্ধেও স্বাধীনতা চাই। দেশ আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব সেই জন্যে আমি কোনো নীতিকথার ধোঁয়ায় তাকে এতটুকু আড়াল করে দেখতে পারব না—আমি আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, তুমি আমার কাছে অত্যন্ত বাস্তব, সেই জন্যে মাঝখানে কেবল কতকগুলো কথা ছড়িয়ে মানুষের কাছে মানুষকে দুর্গম দুর্ব্বোধ করে তোলার ব্যবসায় আমি একটুও পছন্দ করিনে।

আমার মনে ছিল যে-লোক ঘুমতে ঘুমতে চল্‌চে তাকে হঠাৎ চমকিয়ে দেওয়া কিছু নয়। কিন্তু আমার স্বভাবটা যে দুর্দ্দাম, ধীরে সুস্থে চলা আমার চাল নয়। জানি যে কথা সেদিন বললুম

তার ভঙ্গীটা তার সুরটা বড় সাহসিক—জানি এরকম কথার প্রথম আঘাত কিছু দুঃসহ—কিন্তু মেয়েদের কাছে সাহসিকেরই জয়। পুরুষরা ভালোবাসে ধোঁয়াকে, আর মেয়েরা ভালোবাসে বস্তুকে—সেই জন্যেই পুরুষ পূজো করতে ছোটে তার নিজের আইডিয়ার অবতারকে, আর মেয়েরা তাদের সমস্ত অর্ঘ্য এনে হাজির করে প্রবলের পায়ের তলায়।

আমাদের কথাটা ঠিক যখন গরম হয়ে উঠতে চলেচে এমন সময় আমাদের ঘরের মধ্যে নিখিলের ছেলেবেলাকার মাষ্টার চন্দ্রনাথবাবু এসে উপস্থিত। মোটের উপরে পৃথিবী জায়গাটা বেশ ভালোই ছিল কিন্তু এই সব মাষ্টারমশায়দের উৎপাতে এখান থেকে বাস ওঠাতে ইচ্ছে করে। নিখিলেশের মত মানুষ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই সংসারটাকে ইস্কুল বানিয়ে রেখে দিতে চায়। বয়স হল তবু ইস্কুল পিছন-পিছন চল্‌ল, সংসারে প্রবেশ করলে সেখানেও ইস্কুল এসে ঢুক্‌ল। উচিত, মরবার সময়ে ইস্কুলমাষ্টারটিকে সহমরণে টেনে নিয়ে যাওয়া। সেদিন আমাদের আলাপের মাঝখানে অসময়ে সেই মূর্ত্তিমান ইস্কুল এসে হাজির। আমাদের সকলেরই ধাতের মধ্যে এক জায়গায় একটা ছাত্র বাসা করে আছে বোধ করি। আমি যে এ-হেন দুর্ব্বৃত্ত আমিও কেমন থমকে গেলুম। আর আমাদের মক্ষি,—তার মুখ দেখেই মনে হল সে এক মুহূর্ত্তেই ক্লাসের সব চেয়ে ভালো ছাত্রী হয়ে একেবারে প্রথম সারে গম্ভীর হয়ে বসে গেল—তার হঠাৎ যেন মনে পড়ে গেল পৃথিবীতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার একটা দায় আছে। এক-একটা মানুষ রেলের পয়েণ্টস্‌ম্যানের মত পথের ধারে বসে থাকে তারা ভাবনার গাড়িকে

খামকা এক লাইন থেকে আর এক লাইনে চালান করে দেয়।

চন্দ্রনাথবাবু ঘরে ঢুকেই সঙ্কুচিত হয়ে ফিরে যাবার চেষ্টা করছিলেন—"মাপ করবেন আমি"—কথাটা শেষ করতে না করতেই মক্ষি তাঁর পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করলে, আর বল্লে, মাষ্টার মশায়, যাবেন না, আপনি বসুন।—সে যেন ডুব-জলে পড়ে গেছে, মাষ্টারমশায়ের আশ্রয় চায়। ভীরু! কিম্বা আমি হয়ত ভুল বুঝচি। এর ভিতরে হয়ত একটা ছলনা আছে। নিজের দাম বাড়াবার ইচ্ছা। মক্ষি হয়ত আমাকে আড়ম্বর করে জানাতে চায় যে, তুমি ভাব্‌চ, তুমি আমাকে অভিভূত করে দিয়েচ! কিন্তু তোমার চেয়ে চন্দ্রনাথবাবুকে, আমি ঢের বেশি শ্রদ্ধা করি!—তাই কর না। মাষ্টারমশায়দের ত শ্রদ্ধা করতেই হবে। আমি ত মাষ্টারমশায় নই—আমি ফাঁকা শ্রদ্ধা চাইনে। আমি ত বলেইচি ফাঁকিতে আমার পেট ভরবে না;—আমি বস্তু চিনি।

চন্দ্রনাথবাবু স্বদেশীর কথা তুল্লেন। আমার ইচ্ছে ছিল তাঁকে এক-টানা বকে যেতে দেব, কোনো জবাব করব না। বুড়ো-মানুষকে কথা কইতে দেওয়া ভালো—তাতে তাদের মনে হয় তারাই বুঝি সংসারের কলে দম দিচ্চে—বেচারারা জান্‌তে পারে না তাদের রসনা যেখানে চল্‌চে সংসার তার থেকে অনেক দূরে চল্‌চে। প্রথমে খানিকটা চুপ করেই ছিলুম—কিন্তু সন্দীপচন্দ্রের ধৈর্য্য আছে এ বদ্‌নাম তার পরম শত্রুরাও দিতে পারবে না। চন্দ্রনাথবাবু যখন বল্লেন, দেখুন আমরা কোনো দিনই চাষ করিনি, আজ এখনি হাতে হাতে ফসল পাব এমন আশা যদি করি তবে—

আমি থাকতে পারলুম না—আমি বল্লুম, আমরা ত ফসল চাইনে। আমরা বলি মাফলেষু কদাচন।

চন্দ্রনাথবাবু আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন—বল্লেন, তবে আপনারা কি চান?

আমি বল্লুম, কাঁটাগাছ—যার আবাদে কোন খরচ নেই।

মাষ্টারমশায় বল্লেন, কাঁটাগাছ পরের রাস্তা কেবল বন্ধ করে না, নিজের রাস্তাতেও সে জঞ্জাল।

আমি বল্লুম, ওটা হল ইস্কুলে পড়াবার নীতিবচন। আমরা ত খড়ি-হাতে বোর্ডে বচন লিখ্‌চিনে। আমাদের বুক জ্বলচে এখন সেইটেই বড় কথা—এখন আমরা পরের পায়ের তেলোর কথা মনে রেখেই পথে কাঁটা দেব—তারপরে যখন নিজের পায়ে বিঁধবে তখন না হয় ধীরে সুস্থে অনুতাপ করা যাবে। সেটা এমনিই কি বেশি? মরবার বয়স যখন হবে তখন ঠাণ্ডা হবার সময় হবে, যখন জ্বলুনির বয়স তখন ছটফট করাটাই শোভা পায়!

চন্দ্রনাথবাবু একটু হেসে বল্লেন, ছট্‌ফট্‌ করতে চান করুন কিন্তু সেইটেকেই বীরত্ব কিম্বা কৃতিত্ব মনে করে নিজেকে বাহবা দেবেন না। পৃথিবীতে যে জাত আপনার জাতকে বাঁচিয়েচে তারা ছটফট করেনি তারা কাজ করেচে। কাজটাকে যারা বরাবর বাঘের মত দেখে এসেচে তারাই আচম্‌কা ঘুম থেকে জেগে উঠেই মনে করে অকাজের অপথ দিয়েই তারা তাড়াতাড়ি সংসারে তরে যাবে।

খুব একটা কড়া জবাব দেবার জন্যই যখন কোমর বেঁধে দাঁড়াচ্চি এমন সময় নিখিল এল। চন্দ্রনাথবাবু উঠে মক্ষির দিকে চেয়ে বল্লেন, আমি এখন যাই, মা, আমার কাজ আছে।

তিনি চলে যেতেই আমি আমার সেই ইংরিজি বইটা দেখিয়ে নিখিলকে বল্লুম, মক্ষিরাণীকে এই বইটার কথা বল্‌ছিলুম।

পৃথিবীর সাড়ে পনেরো আনা মানুষকে মিথ্যের দ্বারা ফাঁকি দিতে হয় আর এই ইস্কুলমাষ্টারের চিরকেলে ছাত্রটিকে সত্যের দ্বারা ফাঁকি দেওয়াই সহজ। নিখিলকে জেনেশুনে ঠক্‌তে দিলেই তবে ও ভালো করে ঠকে। তাই ওর সঙ্গে দেখা-বিন্তির খেলাই ভালো খেলা।

নিখিল বইটার নাম পড়ে দেখে চুপ করে রইল। আমি বল্লুম, মানুষ নিজের এই বাসের পৃথিবীটাকে নানান্ কথা দিয়ে ভারি অস্পষ্ট করে তুলেচে, এই সব লেখকেরা ঝাঁটা হাতে করে উপরকার ধুলো উড়িয়ে দিয়ে ভিতরকার বস্তুটাকে স্পষ্ট করে তোলবার কাজে লেগেচে। তাই আমি বলছিলুম এ বইটা তোমার পড়ে দেখা ভালো।

নিখিল বল্লে আমি পড়েচি।

আমি বল্লুম, তোমার কি বোধ হয় ?

নিখিল বল্লে এরকম বই নিয়ে যারা সত্য-সত্য ভাবতে চায় তাদের পক্ষে ভালো—যারা ফাঁকি দিতে চায় তাদের পক্ষে বিষ।

আমি বল্লুম, তার অর্থ টা কি ?

নিখিল বল্লে, দেখ, আজকের দিনের সমাজে যে লোক এমন কথা বলে যে, নিজের সম্পত্তিতে কোনো মানুষের একান্ত অধিকার নেই সে যদি নির্লোভ হয় তবেই তার মুখে একথা সাজে—আর সে যদি স্বভাবতই চোর হয় তবে কথাটা তার মুখে ঘোর মিথ্যে। প্রবৃত্তি যদি প্রবল থাকে তবে এসব বইয়ের ঠিক মানে পাওয়া যাবে না।

৩

আমি বল্লুম, প্রবৃত্তিই ত প্রকৃতির সেই গ্যাস্‌পোষ্ট্ যার আলোতে আমরা এসব রাস্তার খোঁজ পাই। প্রবৃত্তিকে যারা মিথ্যে বলে তারা চোখ উপ্‌ড়ে ফেলেই দিব্য দৃষ্টি পাবার দুরাশা করে।

নিখিল বল্লে, প্রবৃত্তিকে আমি তখনি সত্য বলে মনে মানি যখন তার সঙ্গে-সঙ্গেই নিবৃত্তিকেও সত্য বলি। চোখের ভিতরে কোনো জিনিষ গুঁজে দেখ্‌তে গেলে চোখ্‌কেই নষ্ট করি, দেখতেও পাইনে। প্রবৃত্তির সঙ্গেই একান্ত জড়িয়ে যারা সব জিনিষ দেখতে চায় তারা প্রবৃত্তিকেও বিকৃত করে সত্যকেও দেখতে পায় না।

আমি বল্লুম, দেখ নিখিল, ধর্ম্মনীতির সোনাবাঁধানো চষমার ভিতর দিয়ে জীবনটাকে দেখা তোমার একটা মানসিক বাবুগিরি,— এইজন্যেই কাজের সময় তুমি বাস্তবকে ঝাপ্‌সা দেখ, কোনো কাজ তুমি জোরের সঙ্গে করতে পার না।

নিখিল বল্লে, জোরের সঙ্গে কাজ করাটাকেই আমি কাজ করা বলিনে।

তবে ?

মিথ্যা তর্ক করে কি হবে ? এসব কথা নিয়ে নিস্ফল বক্‌তে গেলে এর লাবণ্য নষ্ট হয়।

আমার ইচ্ছে ছিল মক্ষি আমাদের তর্কে যোগ দেয়। সে এ পর্য্যন্ত একটি কথা না বলে চুপ করে বসে ছিল। আজ হয়ত আমি তার মনটাকে কিছু বেশি নাড়া দিয়েছি। তাই মনের মধ্যে দ্বিধা লেগে গেছে—ইস্কুল মাষ্টারের কাছে পাঠ বুঝে নেবার ইচ্ছে হচ্চে।

কি জানি আজকের মাত্রাটা অতিরিক্ত বেশি হয়েছে কিনা। কিন্তু বেশ করে নাড়া দেওয়াটা দরকার। চিরকাল যেটাকে অনড়

বলে মন নিশ্চিন্ত আছে সেটা যে নড়ে এইটিই গোড়ায় জানা চাই।

নিখিলকে বল্লুম, তোমার সঙ্গে কথা হল ভালই হল। আমি আর একটু হলেই এ বইটা মক্ষিরাণীকে পড়তে দিচ্ছিলুম।

নিখিল বল্লে, তাতে ক্ষতি কি? ও বই যখন আমি পড়েচি তখন বিমলই বা পড়বে না কেন? আমার কেবল একটি কথা বুঝিয়ে বলবার আছে। আজকাল য়ুরোপ মানুষের সব জিনিষকেই বিজ্ঞানের তরফ থেকে যাচাই করচে—এমনিভাবে আলোচনা চল্‌চে যেন মানুষ পদার্থটা কেবলমাত্র দেহতত্ত্ব, কিম্বা জীবতত্ত্ব, কিম্বা মনস্তত্ত্ব, কিম্বা বড়জোর সমাজতত্ত্ব—কিন্তু মানুষ যে তত্ত্ব নয়, মানুষ যে সব-তত্ত্বকে নিয়ে সব-তত্ত্বকে ছাড়িয়ে অসীমের দিকে আপনাকে মেলে দিচ্চে, দোহাই তোমাদের, সে কথা ভুলোনা। তোমরা আমাকে বল, আমি ইস্কুল মাষ্টারের ছাত্র—আমি নই, সে তোমরা—মানুষকে তোমরা সায়ান্সের মাষ্টারের কাছ থেকে চিন্‌তে চাও—তোমাদের অন্তরাত্মার কাছ থেকে নয়।

আমি বল্লুম, নিখিল, আজকাল তুমি এমন উত্তেজিত হয়ে আছ কেন?

সে বল্লে, আমি যে স্পষ্ট দেখছি তোমরা মানুষকে ছোট করচ, অপমান করচ।

কোথায় দেখচ?

হাওয়ার মধ্যে, আমার বেদনার মধ্যে। মানুষের মধ্যে যিনি সব চেয়ে বড়, যিনি তাপস, যিনি সুন্দর, তাঁকে তোমরা কাঁদিয়ে মারতে চাও!

এ কী তোমার পাগলামির কথা!

নিখিল হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, দেখ সন্দীপ, মানুষ মরণান্তিক দুঃখ পাবে কিন্তু তবু মরবে না এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় আছে, তাই আমি সব সইতে প্রস্তুত হয়েছি— জেনে শুনে, বুঝে সুঝে।

এই কথা বলেই সে ঘরের থেকে বেরিয়ে চলে গেল। আমি অবাক্ হয়ে তার এই কাণ্ড দেখচি এমন সময় হঠাৎ একটা শব্দ শুনে দেখি টেবিলের উপর থেকে দুটো তিনটে বই মেঝের উপর পড়ল, আর মক্ষিরাণী ত্রস্তপদে আমার থেকে যেন একটু দূর দিয়ে চলে গেল।

অদ্ভুত মানুষ ঐ নিখিলেশ। ও বেশ বুঝেচে ওর ঘরের মধ্যে একটা বিপদ ঘনিয়ে এসেচে কিন্তু তবু আমাকে ঘাড় ধরে বিদায় করে দেয় না কেন? আমি জানি ও অপেক্ষা করে আছে বিমল কি করে। বিমল যদি ওকে বলে তোমার সঙ্গে আমার জোড় মেলেনি তবেই ও মাথা হেঁট করে মৃদু-স্বরে বল্‌বে, তাহলে দেখচি ভুল হয়ে গেছে। ভুলকে ভুল বলে মান্‌লেই সব চেয়ে বড় ভুল করা হয় একথা বোঝবার জোর ওর নেই। আইডিয়ায় মানুষকে যে কত কাহিল করে তার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত হল নিখিল। ও রকম পুরুষ মানুষ আর দ্বিতীয় দেখিনি—ও নিতান্তই প্রকৃতির একটা খেয়াল। ওকে নিয়ে একটা ভদ্র রকমের গল্প কি নাটক গড়াও চলে না, ঘর করা ত দূরের কথা।

তার পরে মক্ষি—বেশ বোধ হচ্ছে আজকে ওর ঘোর ভেঙে গেছে। ও যে কোন্ স্রোতে ভেসেচে হঠাৎ আজ সেটা বুঝতে

পেরেচে। এখন ওকে জেনে-শুনে হয় ফিরতে হবে নয় এগোতে হবে। তা নয়, এখন থেকে ও একবার এগোবে একবার পিছবে। তাতে আমার ভাবনা নেই। কাপড়ে যখন আগুন লাগে তখন ভয়ে যতই ছুটোছুটি করে আগুন ততই বেশি করে জ্বলে ওঠে। ভয়ের ধাক্কাতেই ওর হৃদয়ের বেগ আরো বেশি করে বেড়ে উঠবে। আরো ত এমন দেখেছি। সেই ত বিধবা কুসুম ভয়েতে কাঁপতে কাঁপতেই আমার কাছে এসে ধরা দিয়েছিল। আর আমাদের হষ্টেলের কাছে যে ফিরিঙ্গি মেয়ে ছিল সে আমার উপরে রাগ করলে; এক-একদিন মনে হত সে আমাকে রেগে যেন ছিঁড়ে ফেলে দেবে। সেদিনকার কথা আমার বেশ মনে আছে যেদিন সে চিৎকার করে যাও যাও বলে আমাকে ঘর থেকে জোর করে তাড়িয়ে দিলে—তারপরে যেমনি আমি চৌকাঠের বাইরে পা বাড়িয়েছি অমনি সে ছুটে এসে আমার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে মেঝেতে মাথা ঠুকতে ঠুকতে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। ওদের আমি খুব জানি—রাগ বল, ভয় বল, লজ্জা বল, ঘৃণা বল এ সমস্তই জ্বালানি কাঠের মত ওদের হৃদয়ের আগুনকে বাড়িয়ে তুলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে জিনিষ এ আগুনকে সামলাতে পারে সে হচ্চে আইডিয়াল। মেয়েদের সে বালাই নেই। ওরা পুণ্যি করে, তীর্থ করে, গুরু ঠাকুরের পায়ের কাছে গড় হয়ে পড়ে' প্রণাম করে—আমরা যেমন করে আপিস করি—কিন্তু আইডিয়ার ধার দিয়ে যায় না।

আমি নিজের মুখে ওকে বেশি কিছু বল্‌ব না—এখনকার কালের কতকগুলো ইংরেজি বই ওকে পড়তে দেব। ও

ক্রমে ক্রমে বেশ স্পষ্ট করে বুঝতে পারুক্ যে, প্রবৃত্তিকে বাস্তব বলে স্বীকার করা ও শ্রদ্ধা করাই হচ্ছে মডারন্। প্রবৃত্তিকে লজ্জা করা, সংযমকে বড় জানাটা মডারন্ নয়। "মডারন্" এই কথাটাব যদি আশ্রয় পায় তাহলেই ও জোর পাবে—কেননা ওদের তীর্থ চাই, গুরু ঠাকুর চাই, বাঁধা সংস্কার চাই—শুধু আইডিয়া ওদের কাছে ফাঁকা।

যাই হোক্, এ নাট্যটা পঞ্চম অঙ্ক পর্য্যন্ত দেখা যাক্। এ কথা জাঁক করে বল্‌তে পারব না আমি কেবলমাত্র দর্শক, উপরের তলায় রয়াল সীটে বসে মাঝে মাঝে কেবল হাততালি দিচ্চি। বুকের ভিতরে টান পড়চে, থেকে থেকে শিরগুলো ব্যথিয়ে উঠচে। রাত্রে বাতি নিবিয়ে বিছানায় যখন শুই তখন এতটুকু ছোঁওয়া, এতটুকু চাওয়া, এতটুকু কথা অন্ধকার ভর্ত্তি করে কেবলি ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সকালে ঘুম থেকে উঠে মনের ভিতরটায় একটা পুলক ঝিলমিল্ করতে থাকে,—মনে হয় যেন রক্তের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গে একটা সুরের ধারা বইচে।

এই টেবিলের উপরকার ফোটো-ষ্ট্যাণ্ডে নিখিলের ছবির পাশে মক্ষির ছবি ছিল। আমি সে ছবিটি খুলে নিয়েছিলুম। কাল মক্ষিকে সেই ফাঁকটা দেখিয়ে বল্লুম, কৃপণের কৃপণতার দোষেই চুরি হয় অতএব এই চুরির পাপটা কৃপণে চোরে ভাগাভাগি করে নেওয়াই উচিত। কি বলেন?

মক্ষি একটু হাস্‌লে, বল্লে, ও ছবিটা ত তেমন ভালো ছিল না।

আমি বল্লুম, কি করা যাবে? ছবি ত কোনো মতেই ছবির চেয়ে ভালো হয় না। ও যা তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাক্‌ব।

মক্ষি একখানা বই খুলে তার পাতা ওল্‌টাতে লাগল। আমি বল্লুম, আপনি যদি রাগ করেন আমি ওর ফাঁকটা কোনো রকম করে ভরিয়ে দেব।

আজ ফাঁকটা ভরিয়েচি। আমার এ ছবিটা অল্প বয়সের—তখনকার মুখটা কাঁচা-কাঁচা, মনটাও সেই রকম ছিল। তখনও ইহকাল পরকালের অনেক জিনিষ বিশ্বাস করতুম। বিশ্বাসে ঠকায় বটে কিন্তু ওর একটা মস্ত গুণ এই, ওতে মনের উপর একটা লাবণ্য দেয়।

নিখিলের ছবির পাশে আমার ছবি রইল—আমরা দুই বন্ধু।

•

নিখিলেশের আত্মকথা

আগে কোনোদিন নিজের কথা ভাবিনি। এখন প্রায় মাঝে-মাঝে নিজেকে বাইরে থেকে দেখি। বিমল আমাকে কেমন চোখে দেখে সেইটে আমি দেখবার চেষ্টা করি। বড় গম্ভীর—সব জিনিষকে বড় বেশি গুরুতর করে দেখা আমার অভ্যাস।

আর কিছু না, জীবনটাকে কেঁদে ভাসিয়ে দেওয়ার চেয়ে হেসে উড়িয়ে দেওয়াই ভালো। তাই করেই ত চল্‌চে। সমস্ত জগতে আজ যত দুঃখ ঘরে-বাইরে ছড়িয়ে আছে তাকে ত আমরা মনে-মনে ছায়ার মত মায়ার মত উড়িয়ে দিয়ে তবেই অনায়াসে নাচ্চি খাচ্চি—তাকে যদি এক মুহূর্ত্ত সত্য বলে ধরে রেখে দেখতে পারতুম তাহলে কি মুখে অন্ন রুচত, না, চোখে ঘুম থাক্‌ত?

কেবল নিজেকেই সেই সমস্ত উড়ে-যাওয়া ভেসে-যাওয়ার দলে দেখতে পারিনে। মনে করি কেবল আমারই দুঃখ জগতের বুকে

অনন্তকালের বোঝা হয়ে-হয়ে জমে উঠছে। তাই এত গম্ভীর—তাই নিজের দিকে তাকালে দুই চক্ষের জলে বক্ষ ভেসে যায়!

ওরে হতভাগা, একবার জগতের সদরে দাঁড়িয়ে সমস্তর সঙ্গে আপনাকে মিলিয়ে দেখনা। সেখানে যুগ-যুগান্তের মহামেলায় লক্ষ-কোটি লোকের ভিড়ে বিমল তোমার কে? সে তোমার স্ত্রী! কাকে বল তোমার স্ত্রী? ঐ শব্দটাকে নিজের ফুঁয়ে ফুলিয়ে তুলে দিনরাত্রি সাম্‌লে বেড়াচ্চ—জান, বাইরে থেকে একটা পিন্ ফুট্‌লেই এক মুহূর্ত্তে হাওয়া বেরিয়ে গিয়ে সমস্তটা চুপ্‌সে যাবে!

আমার স্ত্রী, অতএব ও আমারই! ও যদি বল্‌তে চায়, না, আমি আমিই—তখনই আমি বল্‌ব, সে কেমন করে হবে, তুমি যে আমার স্ত্রী! স্ত্রী! ওটা কি একটা যুক্তি, ওটা কি একটা সত্য? ঐ কথাটার মধ্যে একটা আস্ত মানুষকে আগাগোড়া পুরে ফেলে কি তালা বন্ধ করে রাখা যায়?

স্ত্রী! এই কথাটিকে যে আমার জীবনের যা কিছু মধুর যা কিছু পবিত্র সব দিয়ে বুকের মধ্যে মানুষ করেচি, একদিনো ওকে ধূলোর উপর নামাইনি। ঐ নামে কত পূজার ধূপ, কত সাহানার বাঁশি, কত বসন্তের বকুল, কত শরতের শেফালি! ও যদি কাগজের খেলার নৌকার মত আজ হঠাৎ নর্দ্দমার ঘোলা জলে ডুবে যায় তাহলে সেই সঙ্গে আমার—

ঐ দেখ, আবার গাম্ভীর্য্য! কাকে বল্‌চ নর্দ্দমা, কাকে বল্‌চ ঘোলা জল? ওসব হল রাগের কথা। তুমি রাগ করবে বলেই জগতে এক জিনিষ আর হবে না। বিমল যদি তোমার না হয় ত সে তোমার নয়ই, যতই চাপাচাপি রাগারাগি করবে ততই ঐ

কথাটাই আরো বড় করে প্রমাণ হবে। বুক ফেটে যায় যে—তা যাক্। তাতে বিশ্ব দেউলে হবে না, এমন কি, তুমিও দেউলে হবে না। জীবনে মানুষ যা-কিছু হারায় তার সকলের চেয়েও মানুষ অনেক বেশি বড়—সমস্ত কান্নার সমুদ্র পেরিয়েও তার পার আছে—এই জন্যেই সে কাঁদে, নইলে কাঁদ্‌তও না।

কিন্তু সমাজের দিক থেকে—সে সব কথা সমাজ ভাবুক্‌গে, যা করতে হয় করুক্। আমি কাঁদ্‌চি আমার আপন কান্না, সমাজের কান্না নয়। বিমল যদি বলে সে আমার স্ত্রী নয়, তাহলে আমার সামাজিক স্ত্রী যেখানে থাকে থাক্, আমি বিদায় হলুম।

দুঃখ ত আছেই। কিন্তু একটা দুঃখ বড় মিথ্যে হবে, সেটা থেকে নিজেকে যে-করে পারি বাঁচাবই। কাপুরুষের মত একথা মনে করতে পারব না যে, অনাদরে আমার জীবনের দাম কমে গেল। আমার জীবনের মূল্য আছে—সেই মূল্য দিয়ে আমি কেবল আমার ঘরের অন্তঃপুরটুকু কিনে রাখবার জন্যে আসিনি। আমার যা বড় ব্যবসা সে কিছুতেই দেউলে হবে না, আজ এই কথাটা খুব সত্য করে ভাববার দিন এসেছে।

আজ যেমন নিজেকে তেমনি বিমলকেও সম্পূর্ণ বাইরে থেকে দেখ্‌তে হবে। এতদিন আমি আমারই মনের কতকগুলি দামী আইডিয়াল দিয়ে বিমলকে সাজিয়ে ছিলুম। আমার সেই মানসী মূর্ত্তির সঙ্গে সংসারে বিমলের সব জায়গায় যে মিলছিল তা নয় কিন্তু তবু আমি তাকে পূজা করে এসেচি আমার মানসীর মধ্যে।

সেটা আমার গুণ নয়, সেইটেই আমার মহদ্দোষ। আমি

লোভী—আমি আমার সেই মানসী তিলোত্তমাকে মনে মনে ভোগ করতে চেয়েছিলুম—বাইরের বিমল তার উপলক্ষ্য হয়ে পড়েছিল। বিমল যা সে তাইই—তাকে যে আমার খাতিরে তিলোত্তমা হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। বিশ্বকর্ম্মা আমারই ফরমাস খাট্‌চেন না কি ?

তাহলে আজ একবার আমাকে সমস্ত পরিষ্কার করে দেখে নিতে হবে। মায়ার রঙে যে সব চিত্র বিচিত্র করেচি সে আজ খুব শক্ত করে মুছে ফেলব। এতদিন অনেক জিনিষ আমি দেখেও দেখিনি। আজ একথা স্পষ্ট বুঝেছি বিমলের জীবনে আমি আকস্মিক মাত্র; বিমলের সমস্ত প্রকৃতি যার সঙ্গে সত্য মিল্‌তে পারে সে হচ্চে সন্দীপ। এইটুকু জানাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

কেননা আজ আমার নিজের কাছেও নিজের বিনয় করবার দিন নেই। সন্দীপের মধ্যে অনেক গুণ আছে যা লোভনীয়, সেই গুণে আমাকেও এতদিন সে আকর্ষণ করে এসেছে কিন্তু খুব কম করেও যদি বলি তবু একথা আজ নিজের কাছে বল্‌তে হবে যে, মোটের উপর সে আমার চেয়ে বড় নয়। স্বয়ম্বর সভায় আজ আমার গলায় যদি মালা না পড়ে, যদি মালা সন্দীপই পায় তবে এই উপেক্ষায় দেবতা তাঁরই বিচার করলেন যিনি মালা দিলেন—আমার নয়। আজ আমার একথা অহঙ্কার করে বলা নয়। আজ নিজের মূল্যকে নিজের মধ্যে যদি একান্ত সত্য করে' না জানি, ও না স্বীকার করি, আজকেকার এই আঘাতকে যদি আমার এই মানবজন্মের চরম অপমান বলেই মেনে নিতে

হয়, তাহলে আমি আবর্জ্জনার মত সংসারের আঁস্তাকুড়ে গিয়ে পড়ব, আমার দ্বারা আর কোনো কাজই হবে না।

অতএব আজ সমস্ত অসহ্য দুঃখের ভিতর দিয়েও আমার মনের মধ্যে একটা মুক্তির আনন্দ জাগুক্। চেনাশোনা হল— বাহিরকেও বুঝলুম অন্তরকেও বুঝলুম। সমস্ত লাভ লোকসান মিটিয়ে যা বাকি রইল, তাই আমি। সে ত পঙ্গু আমি নয়, দরিদ্র-আমি নয়। সে অন্তঃপুরের রোগীর পথ্যে মানুষ-করা রোগা-আমি নয়, সে বিধাতার শক্তহাতের-তৈরি-আমি। যা তার হবার তা হয়ে গেছে, আর তার কিছুতে মার নেই।

এইমাত্র মাষ্টারমশায় আমার কাছে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে আমাকে বল্লেন, নিখিল, শুতে যাও, রাত একটা হয়ে গেছে।

অনেক রাত্রে বিমল খুব গভীর ঘুমে ঘুমিয়ে না পড়লে আমার পক্ষে শুতে যাওয়া ভারি কঠিন হয়। দিনের বেলা তার সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয় কথাবার্ত্তাও চলে,—কিন্তু বিছানার মধ্যে একলা-রাতের নিস্তব্ধতায় তার সঙ্গে কি কথা বল্‌ব? আমার সমস্ত দেহমন লজ্জিত হয়ে ওঠে।

আমি মাষ্টারমশায়কে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি এখনো ঘুমোননি কেন?

তিনি একটু হেসে বল্লেন, আমার এখন ঘুমোবার বয়স গেছে, এখন জেগে থাকবার বয়স।

এই পর্য্যন্ত লেখা হয়ে শুতে যাব-যাব করচি এমন সময়ে আমার জানলার সামনের আকাশে শ্রাবণের মেঘ হঠাৎ একটা জায়গায় ছিন্ন হয়ে গেল—আর তারি মধ্যে থেকে একটি বড় তারা

জ্বল্‌জ্বল্‌ করে উঠল। আমার মনে হল আমাকে সে বল্‌লে, কত সম্বন্ধ ভাঙচে গড়চে স্বপ্নের মত—কিন্তু আমি ঠিক আছি;—আমি বাসরঘরের চিরপ্রদীপের শিখা; আমি মিলনরাত্রির চিরচুম্বন।

সেই মুহূর্ত্তে আমার সমস্ত বুক ভরে উঠে মনে হল—এই বিশ্ববস্তুর পর্দ্দার আড়ালে আমার অনন্তকালের প্রেয়সী স্থির হয়ে বসে আছে। কত জন্মে কত আয়নায় ক্ষণে ক্ষণে তার ছবি দেখ্‌লুম—কত ভাঙা আয়না, বাঁকা আয়না, ধূলোয় অস্পষ্ট আয়না। যখনি বলি আয়নাটা আমারই করে নিই, বাক্সর ভিতর ভরে রাখি, তখনি ছবি সরে যায়। থাক্‌ না, আমার আয়নাতেই বা কি, আর ছবিতেই বা কি! প্রেয়সী, তোমার বিশ্বাস অটুট্‌ রইল, তোমার হাসি ম্লান হবে না, তুমি আমার জন্যে সীমন্তে যে সিঁদুরের রেখা এঁকেছ প্রতিদিনের অরুণোদয় তাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়ে রাখ্‌চে।

একটা সয়তান অন্ধকারের কোণে দাঁড়িয়ে বল্‌চে এসব তোমার ছেলেভোলানো কথা। তা হোক্‌ না, ছেলেকে ত ভোলাতেই হবে—লক্ষ ছেলে, কোটি ছেলে, ছেলের পর ছেলে—কত ছেলের কত কান্না! এত ছেলেকে কি মিথ্যে দিয়ে ভোলানো চলে? আমার প্রেয়সী আমাকে ঠকাবে না—সে সত্য, সে সত্য—এই জন্যে বারে-বারে তাকে দেখ্‌লুম, বারে-বারে তাকে দেখ্‌ব—ভুলের ভিতর দিয়েও তাকে দেখেচি, চোখের জলের ঘন কুয়াশার মধ্য দিয়েও তাকে দেখা গেল। জীবনের হাটের ভিড়ের মধ্যে তাকে দেখেচি, হারিয়েচি, আবার দেখেচি, মরণের ফুকরের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে গিয়েও তাকে দেখব। ওগো নিষ্ঠুর, আর পরিহাস

কোরো না—যে পথে তোমার পায়ের চিহ্ন পড়েছে, যে বাতাসে তোমার এলোচুলের গন্ধ ভরে আছে এবার যদি তার ঠিকানা ভুল করে থাকি তবে সেই ভুলে আমাকে চিরদিন কাঁদিয়ো না। ঐ ঘোম্‌টা-খোলা তারা আমাকে বল্‌চে, না, না, ভয় নেই, যা চিরদিন থাকবার তা চিরদিনই আছে।

এইবার দেখে আসি আমার বিমলকে,—সে বিছানায় এলিয়ে পড়ে ঘুমিয়ে আছে। তাকে না জাগিয়ে তার ললাটে একটি চুম্বন রেখে দিই। সেই চুম্বন আমার পূজার নৈবেদ্য। আমার বিশ্বাস মৃত্যুর পরে আর সবই ভুলব, সব ভুল, সব কান্না—কিন্তু এই চুম্বনের স্মৃতির স্পন্দন কোনো একটা জায়গায় থেকে যাবে—কেননা, জন্মের পর জন্মে এই চুম্বনের মালা যে গাঁথা হয়ে যাচ্চে সেই প্রেয়সীর গলায় পরানো হবে বলে।

এমন সময়ে আমার ঘরের মধ্যে আমার মেজো ভাজ এসে ঢুক্‌লেন। তখন আমাদেব পাহারার ঘড়িতে ঢং ঢং করে দুটো বাজ্‌ল।

ঠাকুরপো, তুমি করচ কি? লক্ষ্মী ভাই, শুতে যাও—তুমি নিজেকে এমন করে দুঃখ দিয়ো না। তোমার চেহারা যা হয়ে গেছে সে আমি চোখে দেখ্‌তে পারিনে!

এই বল্‌তে বল্‌তে তাঁর চোখ দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল পড়তে লাগ্‌ল।

আমি একটি কথাও না বলে তাঁকে প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে শুতে গেলুম।

বিমলার আত্মকথা

গোড়ায় কিছুই সন্দেহ করিনি, ভয় করিনি; আমি জানতুম দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করচি। পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণে কি প্রচণ্ড

উল্লাস! নিজের সর্ব্বনাশ করাই নিজের সব চেয়ে আনন্দ এই কথা সেদিন প্রথম আবিষ্কার করেছিলুম।

জানিনে, হয়ত এমনি করেই একটা অস্পষ্ট আবেগের ভিতর দিয়ে এই নেশাটা একদিন আপনিই কেটে যেত। কিন্তু সন্দীপ বাবু যে থাক্‌তে পারলেন না, তিনি যে নিজেকে স্পষ্ট করে তুল্লেন। তাঁর কথার সুর যেন স্পর্শ হয়ে আমাকে ছুঁয়ে যায়, তাঁর চোখের চাহনি যেন ভিক্ষা হয়ে আমার পায়ে ধরে। অথচ তার মধ্যে এমন একটা ভয়ঙ্কর ইচ্ছার জোর, যেন সে নিষ্ঠুর ডাকাতের মত আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে ছিঁড়ে নিয়ে যেতে চায়।

আমি সত্য কথা বল্‌ব এই দুর্দ্দান্ত ইচ্ছার প্রলয়-মূর্ত্তি দিনরাত আমার মনকে টেনেছে। মনে হতে লাগ্‌ল বড় মনোহর নিজেকে একেবারে ছারখার করে দেওয়া! তাতে কত লজ্জা, কত ভয়, কিন্তু বড় তীব্র মধুর সে!

আর কৌতূহলের অন্ত নেই,—যে মানুষকে ভাল করে জানিনে, যে মানুষকে নিশ্চয় করে পাব না, যে মানুষের ক্ষমতা প্রবল, যে মানুষের যৌবন সহস্রশিখায় জ্বলচে, তার ক্ষুব্ধ কামনার রহস্য—সে কি প্রচণ্ড, কি বিপুল! এ ত কখনো কল্পনাও করতে পারি নি। যে সমুদ্র বহুদূরে ছিল, পড়া বইয়ের পাতায় যার নাম শুনেচি মাত্র—এক ক্ষুধিত বন্যায় মাঝখানের সমস্ত বাধা ডিঙিয়ে, যেখানে খিড়কির ঘাটে আমি বাসন মাজি, জল তুলি, সেইখানে আমার পায়ের কাছে ফেনা এলিয়ে দিয়ে তার অসীমতা নিয়ে সে লুটিয়ে পড়ল!

আমি গোড়ায় সন্দীপ বাবুকে ভক্তি করতে আরম্ভ করেছিলুম

কিন্তু সে ভক্তি গেল ভেসে—তাঁকে শ্রদ্ধাও করিনে, এমন কি, তাঁকে অশ্রদ্ধাই করি। আমি খুব স্পষ্ট করেই বুঝেছি আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁর তুলনাই হয় না। এও আমি, প্রথমে না হোক্, ক্রমে ক্রমে জান্‌তে পেরেচি যে সন্দীপের মধ্যে যে জিনিষটাকে পৌরুষ বলে ভ্রম হয় সেটা চাঞ্চল্য মাত্র।

তবু আমার এই রক্তে-মাংসে এই ভাবে-ভাবনায় গড়া বীণাটা ওরই হাতে বাজতে লাগ্‌ল। সেই হাতটাকে আমি ঘৃণা করতে চাই এবং এই বীণাটাকে,—কিন্তু বীণা ত বাজ্‌ল। আর সেই সুরে যখন আমার দিনরাত্রি ভরে উঠ্‌ল তখন আমার আর দয়ামায়া রইল না। এই সুরের রসাতলে তুমিও মজ, আর তোমার যা কিছু আছে সব মজিয়ে দাও এই কথা আমার শিরার প্রত্যেক কম্পন, আমার রক্তের প্রত্যেক ঢেউ আমাকে বল্‌তে লাগ্‌ল।

এ কথা আর বুঝতে বাকি নেই যে আমার মধ্যে একটা কিছু আছে যেটা—কি বল্‌ব! যার জন্যে মনে হয় আমার মরে যাওয়াই ভালো।

মাষ্টার মশায় যখন একটু ফাঁক পান আমার কাছে এসে বসেন। তাঁর একটা শক্তি আছে তিনি মনটাকে এমন একটা শিখরের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন যেখান থেকে নিজের জীবনের পরিধিটাকে এক মুহূর্ত্তেই বড় করে দেখতে পাই—বরাবর যেটাকে সীমা বলে মনে করে এসেচি তখন দেখি সেটা সীমা নয়।

কিন্তু কি হবে! আমি অমন করে দেখতেই চাই নে। যে নেশায় আমাকে পেয়েচে সেই নেশাটা ছেড়ে যাক্ এমন ইচ্ছাও যে আমি সত্য করে করতে পারিনে। সংসারের

দুঃখ ঘটুক, আমার মধ্যে আমার সত্য পলে-পলে কালো হয়ে মরুক্ কিন্তু আমার এই নেশা চিরকাল টিঁকে থাক্ এই ইচ্ছা যে কিছুতেই ছাড়াতে পারচিনে। আমার ননদ মুন্নুর স্বামী যখন মদ খেয়ে মুন্নুকে মারত, তারপরে মেরে অনুতাপে হাউ হাউ করে কাঁদত, শপথ করে বল্‌ত আর কখনো মদ ছোঁব না, আবার তার পর দিন সন্ধ্যাবেলাতেই মদ নিয়ে বসত—দেখে আমার সর্ব্বাঙ্গ রাগে ঘৃণায় জ্বলত। আজকে দেখি আমার মদ খাওয়া যে তার চেয়ে ভয়ানক—এ মদ কিনে আন্‌তে হয় না, গ্লাসে ঢাল্‌তে হয় না—রক্তের ভিতর থেকে আপ্‌না-আপনি তৈরি হয়ে উঠচে। কি করি! এম্‌নি করেই কি জীবন কাটবে?

এক একবার চম্‌কে উঠে আপনার দিকে তাকাই আর ভাবি আমি আগাগোড়া একটা দুঃস্বপ্ন—এক সময়ে হঠাৎ দেখতে পাব এ-আমি সত্য নয়। এযে ভয়ানক অসংলগ্ন, এর যে আগার সঙ্গে গোড়ার মিল নেই—এযে মায়া যাদুকরের মত কালো কলঙ্ককে ইন্দ্রধনুর রঙে রঙে রঙীন করে তুলেচে। এযে কি হল, কেমন করে হল, কিছুই বুঝতে পারচি নে।

একদিন আমার মেজ জা এসে হেসে বল্লেন, আমাদের ছোট রাণীর গুণ আছে! অতিথিকে এত যত্ন, সে যে ঘর ছেড়ে এক তিল নড়তে চায় না। আমাদের সময়েও অতিথিশালা ছিল কিন্তু অতিথির এত বেশি আদর ছিল না—তখন একটা দস্তুর ছিল স্বামীদেরও যত্ন করতে হত। বেচারা ঠাকুরপো একাল ঘেঁষে জন্মেছে বলেই ফাঁকিতে পড়ে গেছে। ওর উচিত ছিল অতিথি হয়ে এ বাড়িতে আসা, তাহলে কিছুকাল টিকতে পারত—এখন

বড় সন্দেহ। ছোট রাক্ষুসী, একবার কি তাকিয়ে দেখতেও নেই ওর মুখের ছিরি কি রকম হয়ে গেছে!

এ সব কথা একদিন আমার মনে লাগ্‌তই না; তখন ভাবতুম আমি যে ব্রত নিয়েছি এরা তার মানেই বুঝতে পারে না। তখন আমার চারিদিকে একটা ভাবের আব্রু ছিল—তখন ভেবেছিলুম আমি দেশের জন্য প্রাণ দিচ্চি আমার লজ্জা সরমের দরকার নেই।

কিছুদিন থেকে দেশের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। এখনকার আলোচনা, মডারন্ কালের স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ, এবং অন্য হাজার রকমের কথা। তারই ভিতরে-ভিতরে ইংরিজি কবিতা এবং বৈষ্ণব কবিতার আমদানি—সেই সমস্ত কবিতার মধ্যে এমন একটা সুর লাগানো চল্‌চে যেটা হচ্ছে খুব মোটা তারের সুর। এই সুরের স্বাদ আমার ঘরে আমি এতদিন পাইনি—আমার মনে হতে লাগ্‌ল, এইটেই পৌরুষের সুর, প্রবলের সুর।

কিন্তু আজ আর কোনো আড়াল রইল না—কেন যে সন্দীপ বাবু দিনের পর দিন বিনা কারণে এমন করে কাটাচ্চেন, কেনই যে আমি যখন-তখন তাঁর সঙ্গে বিনা প্রয়োজনের আলাপ-আলোচনা করচি আজ তার কিছুই জবাব দেবার নেই।

তাই আমি সেদিন নিজের উপর, আমার মেজ জায়ের উপর, সমস্ত জগতের ব্যবস্থার উপর খুব রাগ করে বল্লুম, না, আমি আর বাইরের ঘরে যাব না—মরে গেলেও না।

দুদিন বাইরে গেলুম না। সেই দুদিন প্রথম পরিষ্কার করে বুঝলুম কত দূরে গিয়ে পৌঁচেছি। মনে হল যেন একেবারে

জীবনের স্বাদ চলে গেছে। যেন সমস্তই ছুঁয়ে-ছুঁয়ে ঠেলে-ঠেলে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। মনে হল কার জন্যে যেন আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করে আছে—যেন সমস্ত গায়ের রক্ত বাইরের দিকে কান পেতে রয়েছে।

খুব বেশি করে কাজ করবার চেষ্টা করলুম। আমার শোবার ঘরের মেজে যথেষ্ট পরিষ্কার ছিল—তবু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে ঘড়া-ঘড়া জল ঢালিয়ে সাফ করালুম। আলমারীর ভিতর জিনিষ-পত্র এক ভাবে সাজানো ছিল, সে সমস্ত বের করে ঝেড়ে ঝুড়ে বিনা প্রয়োজনে অন্য রকম করে সাজালুম। সেদিন নাইতে আমার বেলা দুটো হয়ে গেল। সেদিন বিকেলে চুল বাঁধা হল না, কোনোমতে এলোচুলটা পাকিয়ে জড়িয়ে নিয়ে ভাঁড়ার ঘরটা গোছাবার কাজে লোকজনকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলা গেল। দেখি ইতিমধ্যে ভাঁড়ারে চুরি অনেক হয়ে গেছে—তা নিয়ে কাউকে বক্‌তে সাহস হল না, পাছে একথা কেউ মনে-মনেও জবাব করে, এতদিন তোমার চোখ দুটো ছিল কোথা ?

সেদিন ভূতে পাওয়ার মত এই রকম গোলমাল করে কাটল। তার পরদিনে বই পড়বার চেষ্টা করলুম। কি পড়লুম কিছুই মনে নেই—কিন্তু এক-একবার দেখি ভুলে অন্যমনস্ক হয়ে বই-হাতে ঘুরতে ঘুরতে অন্তঃপুর থেকে বাইরে যাবার রাস্তার জান্‌লার একটা খড়খড়ি খুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। সেইখান থেকে আঙিনার উত্তর দিকে আমাদের বাইরের এক-সার ঘর দেখা যায়। তার মধ্যে একটা ঘর মনে হল আমার জীবন-সমুদ্রের ওপারে চলে গিয়েছে। সেখানে আর খেয়া বইবে না। চেয়ে আছি ত চেয়েই

আছি। নিজেকে মনে হল আমি যেন পর্শু দিনকার আমির ভূতের মত—সেই সব জায়গাতেই আছি তবুও নেই।

এক সময় দেখতে পেলুম, সন্দীপ একখানা খবরের কাগজ হাতে করে ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে এলেন। স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম তাঁর মুখের ভাবে বিষম চাঞ্চল্য। এক-একবার মনে হতে লাগ্‌ল যেন উঠোনটার উপর বারান্দার রেলিংগুলোর উপর রেগে-রেগে উঠ্‌ছেন। খবরের কাগজটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন—যদি পারতেন ত খানিকটা আকাশ যেন ছিঁড়ে ফেলে দিতেন। প্রতিজ্ঞা আর থাকে না। যেই আমি বৈঠকখানার দিকে যাব মনে করচি এমন সময় হঠাৎ দেখি পিছনে আমার মেজ জা দাঁড়িয়ে! "ওলো, অবাক্ করলি যে!"—এই কথা বলেই তিনি চলে গেলেন। আমার বাইরে যাওয়া হল না।

পরের দিন সকালে গোবিন্দর মা এসে বল্লে, ছোটরাণীমা ভাঁড়ার দেবার বেলা হল।

আমি বল্লুম, হরিমতিকে বের করে নিতে বল্।—এই বলে চাবির গোছা ফেলে দিয়ে জান্‌লার কাছে বসে বিলিতি শেলাইয়ের কাজ কর্‌তে লাগলুম। এমন সময়ে বেহারা এসে একখানা চিঠি আমার হাতে দিয়ে বল্লে, সন্দীপ বাবু দিলেন।—সাহসের আর অন্ত নেই;—বেহারাটা কি মনে করলে? বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগ্‌ল। চিঠি খুলে দেখি তাতে কোন সম্ভাষণ নেই, কেবল এই কটি কথা আছে,—"বিশেষ প্রয়োজন। দেশের কাজ। সন্দীপ"

রইল আমার শেলাই পড়ে। তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একটুখানি চুল ঠিক করে নিলুম। সাড়িটা যেমন ছিল

তাই রইল, জ্যাকেট একটা বদল করলুম। আমি জানি তাঁর চোখে এই জ্যাকেট্‌টির সঙ্গে আমার একটি বিশেষ পরিচয় জড়িত আছে।

আমাকে যে-বারান্দা দিয়ে বাইরে যেতে হবে তখন সেই বারান্দায় বসে আমাব মেজো জা তাঁর নিয়মমত সুপুরি কাটচেন। আজ আমি কিছুই সঙ্কোচ করলুম না। মেজো জা জিজ্ঞাসা করলেন—বলি চলেচ কোথায়?

আমি বল্লুম, বৈঠকখানা ঘরে।

এত সকালে? গোষ্ঠলীলা বুঝি?

আমি কোনো জবাব না দিয়ে চলে গেলুম। মেজো জা গান ধরলেন—

"রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে!
অগাধ জলের মকর যেমন,
ও তার চিটে চিনি জ্ঞান নেই!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনাদৃতা

১

দুইটি কন্যা ও তিনটি পুত্রের ভার স্বামীর হাতে সঁপিয়া দিয়া হরমণি যখন চির অবসর গ্রহণ করিল, নীলু বড় ফাঁপরে পড়িয়া গেল। সে বেচারা ছাপাখানায় কাজ করিত, বেতন যাহা পাইত মাসে মাসে স্ত্রীর হাতে দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিত, সামান্য ২০৲ টাকায় কি করিয়া এতগুলি প্রাণীর ভরণপোষণ সম্ভব তাহা তাহাকে একদিনও ভাবিতে হয় নাই। প্রত্যহ নিয়মিত ৯॥ টার সময় সে ডাক দিত, "বড় বৌ, ভাত বাড়, আমি নাইতে যাচ্ছি।" স্নান সারিয়া যেখানে হর পাখা হাতে ভাত আগলাইয়া মাছি তাড়াইতেছে বসিয়া গিয়া সপাসপ্ নাকে মুখে ভাত গুঁজিয়া পানটি হাতে লইয়া আপিসের দিকে চলিয়া যাইত। নীলুর খাওয়ার কোন কষ্ট ছিল না, মাছটি তরকারীটি যে সময়কার যা পাওয়া যাইত, নীলুর পাতে পড়িতই পড়িত, পরিবারের সকলেই তাহার মত রাজভোগে আছে সে বিষয়ে তাহার কোন সন্দেহ ছিল না এবং মধ্যে মধ্যে স্ত্রীলোকের যে আহার সম্বন্ধে অতিরিক্ত লোভ আছে এবং সেটা যে অত্যন্ত নিন্দনীয় সে কথা চাণক্যের শ্লোক মিশাইয়া স্ত্রীকে বুঝাইয়া দিত। হর চুপ করিয়া শুনিত; স্বামী চলিয়া গেলে ছেলেগুলিকে খাওয়াইবার সময় তাহার চোখের জল সামলান দায় হইত। খোকা দুধ না হইলে আর ভাত খাইবে না; পটলা এখন খাইবে না, মার সঙ্গে খাইবে, মা

নিজের জন্য বড় মাছ লুকাইয়া রাখিয়াছে; টুলি বলে, বাবা কেন সব তরকারী খাইয়া ফেলে, আমাদের জন্যে একটুও রাখে না; কচির সবে বিবাহ হইয়াছে সে মাকে ধমকায়, না খাওয়াইতে পারিবি ত শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দিস্ না কেন? কচি জানে না তাহার গহনায় ২৷৷০ ভরি সোনা কম পড়িয়াছিল, তাহা পূরণ করিতে না পারিলে তাহার শ্বশুর বধূকে স্থান দিতে পারিবে না। "লক্ষ্মী আমার, সোনা আমার, আজকের মত খাও, কাল দিদিমার বাড়ী যাব, কত সন্দেশ আনব, সব তোমাদের দেব"; এইরূপ এক-একদিন এক-এক ছলনা করিয়া ছেলেদের ভুলাইয়া নিজে যে হর ফ্যানের জলে ভাত চটকাইয়া নুন মাখিয়া খাইত তাহাতে তাহার তিলমাত্র দুঃখ ছিল না, সে কুটাও নিজে না গিলিয়া যদি ছেলেদের দিতে পারিত তবেই তাহার আপশোষের নিবারণ হইত।

হরমণির ভায়েদের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না, কিন্তু সেখানে হাত পাতিয়া নিজের দৈন্য স্বীকার করিতে সে অত্যন্ত কুণ্ঠা বোধ করিত। কচির বিবাহ মামাদের সাহায্যে হইয়াছে, আবার সে একা নয়, তার অন্য দুইটি সধবা বোনেরও তাহারি সমান অবস্থা, বিধবা বোনটি মার কাছেই থাকে; মা সকলকেই মাসে ২।৫ টাকা করিয়া দেন। টানাটানির সংসারে সে টাকা-কয়টি ছেলেদের অসুখ-বিসুখে ডাক্তারের ফিতে ও পথ্যতে কোথায় তলাইয়া যাইত। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, দুশ্চিন্তা ও অনাহারের ফল ফলিল—দারুণ যক্ষ্মা ধরিল, নিজে বুঝিতে পারিয়া একটি দিনের জন্যও স্বামীকে সে কথা জানায় নাই—জানাইতেও হইল না, নীলু একদিন আপিসের ফেরতা বাড়ী আসিয়া দেখিল কলেরায়

স্ত্রী আক্রান্ত। পাড়ার হাতুড়ে ডাক্তারের দ্বারা সেদিন চিকিৎসা চলিল, পরদিন যখন মৃত্যু ঘনাইয়া আসিল তখন শ্বশুরবাড়ী খবর পাঠাইল; ডাক্তার সঙ্গে লইয়া যখন ভাই আসিল, তখন হরমণির ছুটি হইয়া গিয়াছে।

২

চোরবাগানের ঘোষাল বাড়ীর কর্ত্রী রোগ ও বৃদ্ধ বয়সে অনেক শোকের তাড়নায় ভগ্নদেহা। সংসারের সমস্ত ভার বিধবা কন্যা শঙ্করীর উপর, মাতার পরিচর্য্যা হইতে খুঁটিনাটি কোন কাজটি সে অন্যকে করিতে দিত না এবং তার মত সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারে এমন কর্ম্মদক্ষ বধূও তাদের ঘরে ছিল না; যে দুটি ছিল তাহারা বিবাহ অবধি সেবা পাইয়াছে বলিয়া সেবা করিতে অনভ্যস্ত।

হরমণির মৃত্যুর পর শোকাকুলা জননীকে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়া শঙ্করী ভগ্নীপতির সংসার ঘাড়ে লইল। মাসীর সকল যত্ন ব্যর্থ করিয়া মাতৃদুগ্ধবঞ্চিত কোলের সন্তানটি উপযুক্ত খাদ্যাভাবে মায়ের অনুসরণ করিল। শঙ্করীরও রুগ্না মাতাকে ফেলিয়া অধিক দিন থাকিবার উপায় নাই। সে টাকার জোগাড় করিয়া অবিলম্বে কচিকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইয়া দিল; এবং পটলা ও টুলুর তত্ত্বাবধান করিবার জন্য নীলুর এক দূরসম্পর্কীয়া গরীব আত্মীয়াকে নীলুর তরফ হইতে মাসিক ২৲ টাকা সাহায্য অঙ্গীকার করিয়া দেশ হইতে আনাইল। নীলু বিস্তর আপত্তি জানাইল যে সে নিজে খাইতে পায় না আবার এ এক পরের বোঝা সে কেমন করিয়া বহিবে। বরং শঙ্করী যদি টুলুকে সঙ্গে লইয়া যায়, নীলু

তাহা হইলে বাড়ী বিক্রয় করিয়া পটুলাকে লইয়া আপিসের কাছাকাছি মেসে গিয়া থাকে। কিন্তু এ কথায় শঙ্করী কান দিল না; এমনিইত সে পূজা আহ্নিকেরও সময় পায় না, ভোর ৫টা হইতে রাত্রি ১১টা পর্য্যন্ত এক মুহূর্ত্তও অবকাশ নাই, এর উপর আবার টুলিকে লইয়া গেলে ধকল ত বাড়িবেই, তাছাড়া ভ্রাতৃ-জায়ারাও বিশেষ সন্তুষ্ট হইবে না; ছোট মেয়ে, একটু বালৃসালেই মাও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবেন; সাত পাঁচ ভাবিয়া টুলির মুখের দিকে চাহিয়া চোখের জল সম্বরণ করিয়া শঙ্করী সেই দিনই মায়ের কাছে চলিয়া আসিল।

আষাঢ় মাস। যেমন বৃষ্টি তেমনি ঝড়। রাস্তা ঘাট জলে ডুবিয়া গিয়াছে। কলিকাতার জনসমাকীর্ণ পথে লোক নাই, জায়গায়-জায়গায় আরোহীপূর্ণ ট্রাম চলৎশক্তিহীন অবস্থায় দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে; সাঁতার ছাড়া ভিন্ন গম্য স্থানে পৌঁছান অসম্ভব দেখিয়া যাত্রীরা কেহ ট্রাম কোম্পানিকে গালি দিয়া যৎকিঞ্চিৎ স্বস্তি বোধ করিতেছে; কেহ বা কোন বছরে কোন সময়টিতে ঠিক এমনিতর বর্ষা নাবিয়াছিল তার দিন ক্ষণ লইয়া অপর একজনের সহিত তুমুল ঝগড়া বাধাইয়া তুলিয়াছে; আর একজন সেই অতীত দিনে হাওয়ার বেগে ছিন্ন ছাতাটি হাতে লইয়া পান-ওয়ালার চালার নীচে আশ্রয় লইয়াছিল, বৃষ্টি কম পড়িতে খানিক দূর অগ্রসর হইয়া ট্রাম ধরিয়া টিকিট কিনিতে কোমরে হাত দিয়া দেখে পয়সার গেঁজেটি নাই, সেই করুণ কাহিনী শুনাইয়া অতীত লোকসানকে বর্ত্তমান আসর জমাইবার কাজে লাগাইতেছে।

প্রকৃতির এই নিষ্প্রয়োজন বাড়াবাড়িতে সকলকারি কাজে

একটা না একটা বাগ্‌ড়া পড়িয়াছে কেবল পাড়ার ডানপিঠে ছেলেগুলোর আনন্দের সীমা নাই। ঘোষালদের কিলু একখানা জলচৌকিতে বসিয়া পরমানন্দে নৌকা বাহিতেছিল, তার ছোট ভাই পানু আরো খানিক আগে মোড়ের মাথায় তারি মত সুশান্ত গুটিকতক ছেলেকে সাঁতার শিখাইতেছিল; সে দৌড়ে আসিয়া এক সময় দাদাকে খবর দিল, "ওরে পালা, পালা, নীলু পিসে গাড়ী করে আসছে, এখুনি দিদিমাকে বলে দেবে।" কলতলায় কাদা ধুইয়া পরিত্যক্ত ধুতি কোমরে আঁটিতে আঁটিতে দুটি ভাই উপরে হাজির হইয়া দেখিল, পিসিমা ফুলুরী ভাজিতেছেন, আর নীলু পিসের আগমনবার্ত্তা জানান হইল না।

৩

ঝড়ের বেগ কমিয়া গিয়াছে, বৃষ্টি ধরে-ধরে। শঙ্করী টুলুর হাত ধরিয়া একেবারে মায়ের ঘরে উপস্থিত হইল। হাঁপাইতে-হাঁপাইতে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া গেল, "দেখলে মা একবার কাণ্ড-খানা! বল্লে না, কইলে না, এমন দিনে মানষে যখন কুকুর বেড়ালটা ঘরের বার করে না, হতচ্ছাড়া কি না এই এক ফোঁটা মেয়েকে লোকেদের নাচ্‌দরজায় নামিয়ে চলে গেল! ভাগ্যিস্ আজ সকাল সকাল কাপড় কাচ্‌তে গেছ্‌লুম, দেখি কলের কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছে, মাথা দিয়ে যেন মা গঙ্গার স্রোত বইছে; ছুটে পানুর কাপড়খানা টেনে এনে পরিয়ে এই তোমার কাছে আন্‌ছি।"

মা। "তাত দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমি ঘাটের মড়া, আমাকে আর জ্বালাস্‌নে। বৌ কর্ত্তাদের জিজ্ঞেস করে যা ব্যবস্থা হয় কর্। হ্যাঁরে টুলি, বাপ্ কোথায় গেল?"

৬

টুলি। "বাবা ডিল্লি, বালিতে কালা এচেচে তাই আমাকে মাচির কাছে যেতে বল্লে।"

শঙ্করী। "শুনেছিলুম তাদের আপিস দিল্লিতে উঠে যাবে তাই বুঝি বাড়ীখানা ভাড়া দিয়ে মেয়েটাকে এখানে রেখে পটলাকে নিয়ে চলে গেল। আচ্ছা বাপ্ যাহোক! সে ফেল্‌তে পারে, আমরা ত আর হরর পেটের মেয়ে ভাসিয়ে দিতে পারি না।

এই ছোট্ট চার বছরের মেয়েটি ঘোষাল-বাড়ীর মূর্ত্তিমতী অশান্তি-স্বরূপা হইয়া দাঁড়াইল। বসত বাড়ী ভাড়া দিয়া সেই যে নীলু ডুব মারিল তা দিল্লি গেল কি মক্কায় গেল কেহ কোন খবর পাইল না।

অল্প দিনেই বড় বউ আবিষ্কার করিয়া ফেলিল যে যেদিন হইতে এই ছোটলোকের মেয়ে তাদের ঘরে আসিয়াছে সেদিন হইতে তার ছেলেমেয়েগুলি আর বাগ্ মানে না। পড়াশুনো করে না, দুপুর বেলায় ঐ মা খেগো মেয়েটার সঙ্গে দস্যিবৃত্তি করিয়া বেড়ায়। এরূপ অবস্থায় এ বাড়ীতে থাকা অসম্ভব। ছোট বউ বলে, খুকীর খাবার যতই সাবধানে রাখে কে ঢাকা খুলিয়া খাইয়া যায়, ছোট বাবুর গন্ধতৈল, এসেন্সের শিশি কে রোজ ভাঙ্গিয়া রাখিয়া দেয়; ছাদে কাপড় শুকাইতে দিলে বাছিয়া বাছিয়া দেশী কাপড়গুলির খুঁট্ কে দাঁতে করিয়া ছিঁড়িয়া দেয়; এসব অত্যাচার ঠাকুরঝির জন্যই হইয়াছে, তিনি আদরে আদরে মেয়েটার মাথা খাইতেছেন, মা কি আর কারো মরে না গা, তা বলিয়া কি সে যা খুসী করিবে? শঙ্করীর আদর মানে সে সময়মত টুলিকে ডাকিয়া দুবেলা খাওয়ায়, মামীদের অনুযোগ শুনিলেই তাকে কখনো কখনো ঘরে বন্ধ করিয়া শাস্তি দেয়, কখনো বা নানাপ্রকার সদুপদেশ দিয়া বুঝাইবার

চেষ্টা করে যে মামাতো ভাই বোনদের সহিত তার আকাশ-পাতাল প্রভেদ, তারা যত খুসী দুষ্টামি করিতে পারে কিন্তু টুলিকে এই বয়স হইতেই শিশুসুলভ চঞ্চলতা দমন করিয়া, মামাদের অনুগ্রহে যে দুবেলা পেট ভরিয়া ভাত পাইতেছে সেজন্য মামীদের নিকট সর্ব্বদাই জোড়হাতে কৃতজ্ঞতা জানাইতে হইবে। টুলু ত সবই বোঝে! সে কখনো রাগিয়া ছোট দুটি হাতে প্রাণপণে মাসীর পিঠে কিল বর্ষণ করে, কখনো, "আমাকে মায়ের কাছে রেখে আয়, আর আমি তোদের বাড়ী থাক্‌ব না", বলিয়া হাত পা ছুঁড়িয়া কাঁদিতে থাকে।

অনেক দিন ধরিয়া বড় বউয়ের সাধ শাশুড়ী-ননদ-হীন নিষ্কণ্টক সংসারের গৃহিণীপনা করে; পূজাবকাশে স্বামী বাড়ী আসিলে সে নানা তর্কযুক্তি দেখাইয়া স্বামীর সঙ্গে তার কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেল। ধনীকন্যা ছোট বউও ঘন ঘন বাপের বাড়ী যাতায়াত আরম্ভ করিল। টুলুর উপর দোষ চাপাইয়া দুই বধূ নিজের নিজের মনস্কামনা সাধিবার অবসর পাইলেন; লাভের মধ্যে সে বেচারী সকলকার চক্ষুশূল হইল।

৪

ভগবান যাদের কষ্ট দিয়াছেন রগড়াইয়া রগড়াইয়া তাদেরও দিন কাটিয়া যায়। মামারা টুলুর বিবাহ দিয়াছে। সে যেদিন শ্বশুরবাড়ী গেল সকলেই যেন পরিত্রাণ পাইল, যেন বাড়ীর অলক্ষ্মী বিদায় হইল, কেবল শঙ্করী বিছানায় শুইয়া বুকের উপর একটি ছোট কোমল হস্তস্পর্শের অভাবে চোখের জলে বালিশ ভাসাইয়া দিল। তার নারী-হৃদয়ের সুপ্ত মাতৃত্ব টুলুর স্পর্শে জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে তার ছোট বালিশটি বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া চুমা খাইতে লাগিল আর ধীরে ধীরে তার উপর

হাত বুলাইতে লাগিল—যেন সে টুলির মাথায় হাত বুলাইতেছে। ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিয়া টুলির কত মঙ্গল কামনা করিল কিন্তু দরবারে গরীব শঙ্করীর দরখাস্ত নামঞ্জুর হইল। বিবাহের অনতিবিলম্বে ক্ষতবিক্ষতদেহা টুলুকে লইয়া তার শ্বশুর দিয়া গেল ও উঠানে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া গেল, "এই তোমাদের মেয়ে রইল, আবার যদি ওমুখো হয় তা হলে এটুকুও আর রইবে না।"

শঙ্করী কিছু সুধাইল না। রক্তমাখা অচেতনপ্রায় বালিকাকে কোলে তুলিয়া লইয়া বিছানায় শোয়াইয়া ক্ষতস্থানের রক্ত ধুইয়া জলপটি বাঁধিয়া দিল, মায়ের ঘর হইতে ওডিকলন আনিয়া মাথায় দিয়া বাতাস করিতে লাগিল। একবার কেবল মাসীর দিকে চাহিয়া টুলি বলিল, "উঃ, মাসি, বড় ব্যথা!" বলিয়াই আবার চোখ বন্ধ করিল। রাত্রে জ্বরের ঘোরে সে ভুল বকিতে লাগিল। টুলুর সৎ-শাশুড়ীকে পাড়ার সকলে ভয় করিত ও বধূ আসিলে তার পরিণাম কল্পনা করিয়া অনেক সহৃদয়ার গায়ে কাঁটা দিত। কর্ত্তাকে গিন্নী নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইত, লোকে বলিত পাড়াগেঁয়ে মাগী কি ঔষধ করিয়া অত বড় ষণ্ডামার্ক পুরুষটাকে বশ করিয়াছে। বিবাহের পর টুলু বুঝিল কি খাইয়া শ্বশুর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে—গালি হইতে ঝাঁটা পর্য্যন্ত অভাগার কিছুই বাদ যাইত না। টুলু তার অংশ হইতে কিছু পাইলে তার ভাগ হালকা হইবে বলিয়া বৃদ্ধের কিছু আশা হইয়াছিল—কিন্তু দানে ন ক্ষয়ং যাতি, ভাগ করিয়াও বেগ কমিল না। বধূ আসার সঙ্গে সঙ্গে ঠিকে ঝি ও বামনীর অনাবশ্যকতা বুঝিয়া গিন্নী তাদের বিদায় দিল। রান্না, বাসন-মাজা, ঘর-লেপা, জল-তোলা এইসকল সামান্য

কাজ যদি বধূর দ্বারা না হইবে ত লোকে ছেলের বিবাহ দেয় কেন?—টুলুকে দম দিবার সময় শাশুড়ী জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিত না।

সেদিন উপরের কলে জল নাই, প্রকাণ্ড এক মাটির কলসী করিয়া জল ভরিয়া আনিতে শাশুড়ী টুলিকে হুকুম করিল এবং বিলম্ব হইতেছে বলিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া তার পিতার নানাপ্রকার সদ্গতি কামনা করিয়া যেই তাকেও যমালয়ে যাইবার পথনির্দ্দেশ করিবে অমনি হোঁচোট খাইয়া কলসীসমেত টুলু পড়িয়া গেল। কলসী ভাঙ্গিল দেখিয়া গিন্নি ছুটিয়া আসিয়া বারকতক চুলের মুঠি ধরিয়া টুলুর মাথা সিঁড়িতে ঠুকিয়া দিল এবং লাথির উপর লাথি মারিয়া তাকে একতলা অবধি গড়াইয়া দিল। টুলুর চীৎকারে শ্বশুর আসিলে তাকে মামার বাড়ী রাখিয়া আসিতে হুকুম করিল। হুকুম তামিল করিতে সে বিলম্ব করিল না।

আজ সকলে ভুলিয়া গেল যে টুলি তাদের কত অপ্রিয় ছিল। ছোটবাবু স্বয়ং সর্ব্বোৎকৃষ্ট ডাক্তার লইয়া আসিল ও নিজের হাতে ঔষধ পান করাইতে লাগিল। ছোট বউ খুকীকে ঘুম পাড়াইয়া শঙ্করীর হাতের পাখা কাড়িয়া লইয়া বাতাস দিতে লাগিল, টুলুর শয্যাপার্শ্বে মাদুর বিছাইয়া শঙ্করীকে শুইতে কত অনুরোধ করিল কিন্তু শঙ্করী টুলুর হাতখানি চাপিয়া ধরিয়া পাষাণ-মূর্ত্তির মত তার দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

তবু এবারও বিধাতার দয়া হইল না—টুলু বাঁচিয়া উঠিল। সংসারে যার স্থান এত সঙ্কীর্ণ যে পাশ ফিরিবারও জায়গা হয় না, তারই সেই অতি দুঃখের জায়গাটুকু খালি হইতে চায় না।

শ্রীমাধুরীলতা দেবী।

নব্য-দর্শন

(মুখপত্র)

সবুজপত্র-সম্পাদক-সমীপেষু,—

মহাশয়, আপনি আমাকে দর্শন সম্বন্ধে কিছু লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। আপনার অনুরোধ আজ্ঞাবিশেষ—সুতরাং শিরোধার্য্য। কিন্তু অনেক দিন হইতে ভাবিতেছি আপনাদের পাঠকদের মনোরঞ্জনার্থ কি লিখিব? দর্শন সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিবার আছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের বৈজ্ঞানিক পাঠকগণ অনেক কথা চান না—তাঁহারা চান নিখুঁৎ খাঁটি সত্য। পূর্ব্বেই প্রকাশ থাকে বৈজ্ঞানিক কলে কাটা কিম্বা ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মে বাঁধা নিখুঁৎ সত্য যোগাইতে আমি সম্পূর্ণ অপারগ। অবশ্য একথা শুনিয়া আপনারা অনেকেই ভ্রূকুঞ্চিত করিবেন। আপনাদের ভ্রূকুঞ্চন আমি বিলক্ষণ বুঝি। আপনারা অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর ধরিয়া "আমাদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাও" এই প্রার্থনা বা আব্দার দেবদেবী-গণের নিকট করিয়া আসিতেছেন। আপনারা অন্ধকারের মাধুর্য্য আর উপভোগ করিতে পারেন না—এমন কি গোধূলীর আলোছায়া আপনাদের নিকট বিসদৃশ ঠেকে। আপনারা চান কঠোর প্রচণ্ড সূর্য্যালোক—যে সূর্য্যালোকে আপনাদের আজন্ম-অন্ধ চক্ষু বিকশিত হইবে, আর সেই দিব্যচক্ষে মহাদেবের ন্যায় আপনারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান নিরীক্ষণ করিবেন।

আমার মনের গড়ন কিন্তু সম্পূর্ণ বিভিন্ন। আমার আলোক

ভাল লাগে না—আমার ভাল লাগে অন্ধকার। আলোকে সমস্ত প্রকাশ পায়। কিন্তু অন্ধকার সমস্ত লুকাইয়া রাখে, কাজেই তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে ইচ্ছা হয় ও চেষ্টা জন্মে। আপনারা অনেকেই কঠোপনিষদে যম ও নচিকেতার উপাখ্যান পড়িয়াছেন। নচিকেতা অনেক চেষ্টা করিলেন "মৃত্যুর পর কি হয় ?"—যমপ্রমুখাৎ এই প্রশ্নের একটি ছাঁকা উত্তর পাইতে। কিন্তু যম যদিও নচিকেতাকে সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত ছিলেন, তথাপি ঐ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না। যদি যম নচিকেতার মনোরথ পূর্ণ করিতেন, তাহা হইলে আজ আমরা হিন্দুর দর্শন দেখিতে পাইতাম না। হয় ত বলিবেন, দর্শন পাইতাম না বটে—কিন্তু শান্তি পাইতাম। পাইতেন কি না, সে সম্বন্ধেও বিশেষ সন্দেহ আছে। কারণ এমন অনেক বিষয় আছে যেখানে ignorance is bliss.

সত্যের অন্বেষণ দর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য বটে। কিন্তু সত্য কি ? অনেকের মতে আমাদের দেশের মুনিঋষিগণ বহুপূর্ব্বে সত্য আবিষ্কার করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের কর্ত্তব্য পুরাতনলিপি সমুদায় উদ্ধার করিয়া সেই পুরাতন সত্যের পুনরাবিষ্কার করা। নূতন সত্য আর কিছুই নাই। কাজেই নূতন করিয়া সত্য আবিষ্কারের চেষ্টার প্রয়োজন নাই। আর যদি আপনি দুর্ভাগ্যক্রমে কোন নূতন সত্য বাহির করেন, তাহাও পুরাতনের সহিত মিলাইয়া লইতে হইবে। চলিত সাধুভাষায়, পুরাতন ও নূতনের সমন্বয়সাধন করিতে হইবে। যদি তাহা না পারেন, তাহা হইলে আপনার নূতন-আবিষ্কৃত সত্য জলাঞ্জলি দিতে হইবে। ফলকথা, ইহাঁদের বিশেষ চিন্তা একটি ধারাবাহী নদীবিশেষ।

নদীর স্রোত যেমন একটি নির্দ্দিষ্ট খাত ধরিয়া সমুদ্রের দিকে ধাবমান্, চিন্তার স্রোতও সেইরূপ একটি নির্দ্দিষ্ট খাত ধরিয়া সত্যের দিকে ধাবমান্। যতক্ষণ আপনি সেই স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া চলিয়াছেন, ততক্ষণ ভাল। কিন্তু যখনি আপনি সেই স্রোত ছাড়িয়া দক্ষিণে কি বামে পড়িলেন, অমনি বুঝিতে হইবে আপনি সত্য ছাড়িয়া মিথ্যায় হাবুডুবু খাইতেছেন।

যাঁহারা উপরোক্ত মত পোষণ করেন, তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, আমাদের দেশে পুরাকালে কোনো বিষয়েই সকলে একমত ছিল না। ধর্ম্ম, দর্শন, আইনকানুন—সর্ববত্রই নানা মুনির নানা মত। আজ আমরা ব্যক্তিগত পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়া ঐক্য-স্থাপনের চেষ্টায় ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি। কিন্তু আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের ঐ প্রকার কৃত্রিম ঐক্যের উপর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না। তাঁহারা হিন্দু-সমাজের ঐক্য বজায় রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন বটে, কিন্তু ঐক্যের নামে তাঁহারা ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তার মূলে কুঠারাঘাত করেন নাই। তাহার প্রমাণ, চার্ব্বাকের নাস্তিক্যবাদ ও জড়বাদ, বৌদ্ধের নির্ব্বাণবাদ, সাংখ্যের প্রকৃতিপুরুষবাদ, আর বেদান্তের অদ্বৈতবাদ। কালক্রমে বেদান্ত ছাড়া আর সমুদয় মত লুপ্তপ্রায়। আর আমাদের নিজেদের বিশ্বাস যে, বেদান্তই ভারতীয় চিন্তার শেষ কথা। ইহার ফলে আমরা স্বাধীন চিন্তার ইচ্ছা ও শক্তি হারাইতে বসিয়াছি। কারণ এখন বেদান্তই দেশের একমাত্র চিন্তাস্রোত, আর ব্যক্তিগত চিন্তা সেই স্রোতের সহিত মিলাইয়া একীভূত করিতে না পারিলেই আমাদের ভয় হয় মহা ভ্রম উপস্থিত। আমাদের বর্ত্তমান চিন্তাক্ষেত্রের অবস্থা আর মধ্য-

যুগে য়ুরোপের অবস্থা অনেকটা এক। সেকালের পণ্ডিতগণ Bible এবং Aristotle ছাড়া অন্য কিছু বুঝিতেন না বা জানিতেন না। এই দুয়ের সহিত যাহার মিল নাই তাহা চিন্তার বহির্ভূত। প্রায় পাঁচশত বৎসর ব্যাপিয়া পাশ্চাত্য জগতের চিন্তাস্রোত Bible এবং Aristotle এর চিন্তাস্রোতের সহিত মিলিয়া চলিল। শেষে একদিন Descartes, Bacon প্রভৃতি মনীষীগণ বুঝিলেন পুরাতনে আর মানবাত্মা তৃপ্ত হইবার নয়—নূতন আবিষ্কার, নূতন বিজ্ঞান, নূতন দর্শন, নূতন ধর্ম্মের প্রয়োজন। সেই দিনে য়ুরোপে চিন্তার এক নূতন ফোয়ারা ছুটিল, আর আজ সেই ফোয়ারা হইতে কত নূতন নদনদী উৎপন্ন হইয়া সেখানে প্রবাহিত হইতেছে।

আমাদের দেশেও কিছু কিছু পুরাতন বর্জ্জন করিয়া কিছু কিছু নূতন সৃষ্টির বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। নূতন সৃষ্টি,—সমন্বয় নয়। আজকাল সমন্বয় কথাটি আমাদের বড় মনে ধরিয়াছে। আমরা নূতন পুরাতন, পূর্ব্ব পশ্চিম, সাকার নিরাকার, হিন্দু ব্রাহ্ম ইত্যাদি সকল বিষয়ের ও সকল পদার্থেরই যেন-তেন-প্রকারেণ সমন্বয়সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়াছি। আমার বিশ্বাস ভারতের বর্ত্তমান অবস্থায় সমন্বয়ের ন্যায় গুপ্ত শত্রু আর দ্বিতীয় নাই। যেখানে উভয় পক্ষেই সমবল, সেখানেই সমন্বয় হওয়া সম্ভব। কিন্তু যে ক্ষেত্রে একজন অপর অপেক্ষা হীনবল, সে ক্ষেত্রে সমন্বয় হয় না—সেখানে একজন অপরকে গ্রাস করে। আগে নূতন সৃষ্টি করুন, নূতনকে নিজের চিন্তার ও জীবনের অঙ্গীভূত করিয়া সবল করিয়া তুলুন, তারপর পুরাতনের সহিত নূতনের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া সমন্বয়সাধন করিবেন। তাহাতে নূতনের সংস্পর্শে পুরাতন

সজীবতর হইয়া উঠিবে, আর নূতন, পুরাতনের তুলনায় নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি করিয়া মহৎ হইতে মহত্তর হইতে চেষ্টা করিবে।

আমরা প্রায়ই নদীর সহিত চিন্তার তুলনা দিয়া থাকি। উপমাটি একেবারে সঠিক্ না হইলেও বড় উপযোগী। নদীর সহিত চিন্তার তুলনা দিয়া আমরা চিন্তার একত্ব নির্দ্দেশ করি। নদী বিভিন্ন জলকণার সমষ্টি হইলেও তাহার একটি একত্ব আছে। সেইরূপে চিন্তা বহু চিন্তাকণার সমষ্টি হইলেও তাহার একটি একত্ব আছে। এই একত্বের গুণে আমরা ত্রিকালের মধ্য দিয়া নানা রূপরস সত্বেও বিশ্বের একত্ব অল্পাধিক্ পরিমাণে সৃষ্টি করি ও উপলব্ধি করি। অনেকের বিশ্বাস একত্ব একটি নিত্য পদার্থ বা পদার্থের গুণ, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ওটি আমাদের মনগড়া চিন্তার সৃষ্টি। আজ যে আমি এক, ইহার কারণ আমার নিজের চিন্তার ও চেষ্টার সাহায্যে আমার মানসিক ও ভৌতিক জীবনের একত্ব অল্পাধিক পরিমাণে উৎপাদন করিতে আমি সমর্থ হইয়াছি। আজ যে হিন্দুসমাজ এক, তাহার কারণ যুগযুগান্তর হইতে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ নানা উপায় ও কৌশলে বহু বাধাবিঘ্ন সত্বেও অল্পাধিক পরিমাণে হিন্দুসমাজের সেই একত্ব সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আর আমার বিশ্বাস বৈদান্তিক বা mystic বিশ্বের যে একত্ব নির্দ্দেশ করেন, সে একত্বও অল্পাধিক পরিমাণে চিন্তার সৃষ্টি। যিনি যোগী তিনি নিজের চেষ্টায় ও সাধনায় সেই একত্ব সৃষ্টি করেন—আবার সেই একত্বই ধ্যান করেন।

চিন্তায় যে সৃজনী বা আদ্যাশক্তি আছে, তাহা আমাদের বড় একটা মনে থাকে না। জনসাধারণের বিশ্বাস মানুষের মন ছাপার কলমাত্র

—Printing-press—যাহা আছে তাহাই প্রকাশ বা পরিষ্কার করে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা ভাবি বহির্জগৎ এক দিকে, মানুষের মন অপর দিকে ; আর এই দুয়ের মিলন বা সামঞ্জস্যই সত্য। কাজেই যখনই আমরা এই সামঞ্জস্য দেখিতে না পাই, তখনই বলি—মিথ্যা, ভ্রম ইত্যাদি। ইহারই নাম বস্তুতন্ত্রতা (Realism)। আজ বিজ্ঞানচর্চ্চার গুণে আমাদের দেশে বস্তুতন্ত্রতার প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম্ম, দর্শন, Art, সর্ব্বত্রই আমরা "বাস্তবের" অন্বেষণে ব্যস্ত। যদি কোন লেখক কি ভাবুক বাস্তবের পরিবর্ত্তে নিজের মনের কথা কিছু বলেন কি লেখেন, অমনি আমরা তাহা কাল্পনিক বলিয়া উড়াইয়া দি। আমরা ভুলিয়া যাই যে, যাহাকে আমরা "বাস্তব" বলি, তাহাও অল্পাধিক পরিমাণে চিন্তার সৃষ্টি,—আর আজ যাহাকে আমরা "অবাস্তব" বলিয়া উপেক্ষা করিতেছি, তাহাও হয় ত কালক্রমে আমাদের চিন্তার ও জীবনের সঙ্গে একীভূত হইয়া "বাস্তব" হইয়া উঠিবে।

মানব-চিন্তার ইতিহাস পাঠে বুঝা যায় যে, চিন্তার দুইটি শত্রু —একটী বস্তুতন্ত্রতা (Realism), আর একটী ন্যায়শাস্ত্র (Logic); এ দুয়ের সহিত মনের কি সম্বন্ধ ভবিষ্যতে আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। পত্রান্তে এই মাত্র বলিয়া রাখিলাম যে, যতদিন ইহারা ভৃত্যের ন্যায় চিন্তার হুকুম সরবরাহ করে, ততদিন ইহারা বিশেষ উপযোগী,—কিন্তু যখন ভৃত্যের পদ ছাড়িয়া ইহারা চিন্তার মনিব হইবার উপক্রম করে, তখনই আমার ভয় হয়, মানবাত্মার শেষদশা সন্নিকট। ইতি

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী।

সাহিত্যে খেলা

জগৎ-বিখ্যাত ফরাসী ভাস্কর রোডঁ্যা—যিনি নিতান্ত জড় প্রস্তরের দেহ থেকে অসংখ্য জীবিত-প্রায় দেব দানব কেটে বার করেছেন, তিনিও শুনতে পাই, যখন-তখন হাতে কাদা নিয়ে, আঙ্গুলের টিপে মাটির পুতুল তয়ের করে থাকেন। এই পুঁতুল গড়া হচ্ছে তাঁর খেলা। শুধু রোডঁ্যা কেন, পৃথিবীর শিল্পীমাত্রেই এই শিল্পের খেলা খেলে থাকেন। যিনি গড়্‌তে জানেন, তিনি শিবও গড়্‌তে পারেন, বাঁদরও গড়তে পারেন। আমাদের সঙ্গে বড় বড় শিল্পীদের তফাৎ এইটুকু যে তাঁদের হাতে এক করতে আর হয় না। সম্ভবতঃ এই কারণে কলারাজ্যের মহাপুরুষদের যা-খুসি-তাই কর্‌বার যে অধিকার আছে, ইতর-শিল্পীদের সে অধিকার নেই। স্বর্গ হতে দেবতারা মধ্যে মধ্যে ভূতলে অবতীর্ণ হওয়াতে কেউ আপত্তি করেন না, কিন্তু মর্ত্তবাসীদের পক্ষে রসাতলে গমন করাটা বিশেষ নিন্দনীয়। অথচ এ কথা অস্বীকার কর্‌বার যো নেই যে, যখন এ জগতে দশটা দিক আছে তখন সেই সব-দিকেই গতায়াত কর্‌বার প্রবৃত্তিটি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। মন উঁচুতেও উঠতে চায় নীচুতেও নাম্‌তে চায়, বরং সত্য কথা বল্‌তে গেলে, সাধারণ লোকের মন, স্বভাবতই যেখানে আছে তারি চার পাশে ঘুরে বেড়াতে চায়—উড়্‌তেও চায় না, ডুবতেও চায় না। কিন্তু সাধারণ লোকে, সাধারণ লোক্‌কে, কি ধর্ম্ম, কি নীতি, কি কাব্য,—সকল রাজ্যেই

অহরহ ডানায় ভর দিয়ে থাক্‌তেই পরামর্শ দেয়। একটু উঁচুতে না চড়্‌লে আমরা দর্শক এবং শ্রোতৃমণ্ডলীর নয়ন-মন আকর্ষণ করতে পারিনে। বেদীতে না বসলে, আমাদের উপদেশ কেউ মানে না; রঙ্গমঞ্চে না চড়লে আমাদের অভিনয় কেউ দেখে না; আর কাষ্ঠমঞ্চে না দাঁড়ালে আমাদের বক্তৃতা কেউ শোনে না। সুতরাং জনসাধারণের চোখের সম্মুখে থাকবার লোভে আমরাও অগত্যা চব্বিশ ঘণ্টা টংয়ে চড়ে থাক্‌তে চাই, কিন্তু পারিনে। অনেকের পক্ষে নিজের আয়ত্তের বহির্ভূত উচ্চস্থানে ওঠবার চেষ্টাটাই মহাপতনের কারণ হয়। এ সব কথা বলবার অর্থ এই যে, কষ্টকর হলেও, আমাদের পক্ষে অবশ্য মহাজনদের পথ অনুসরণ করাই কর্ত্তব্য; কিন্তু ডাইনে বাঁয়ে ছোটখাট গলিঘুঁচিতে খেলাচ্ছলে প্রবেশ কর্‌বার যে অধিকার তাঁদের আছে সে অধিকারে আমরা কেন বঞ্চিত হব? গান কর্‌তে গেলেই যে সুর তারায় চড়িয়ে রাখ্‌তে হবে, কবিতা লিখ্‌তে হলেই যে মনের শুধু গভীর ও প্রখর ভাব প্রকাশ কর্‌তে হবে, এমন কোন নিয়ম থাকা উচিত নয়। শিল্পরাজ্যে খেলা করবার প্রবৃত্তির ন্যায় অধিকারও বড়-ছোট সকলেরি সমান আছে। এমন কি, একথা বল্লেও অত্যুক্তি হয় না যে, এ পৃথিবীতে একমাত্র খেলার ময়দানে ব্রাহ্মণ-শূদ্রের প্রভেদ নাই। রাজার ছেলের সঙ্গে দরিদ্রের ছেলেরও খেলায় যোগ দেবার অধিকার আছে। আমরা যদি একবার সাহস করে কেবলমাত্র খেলা কর্‌বার জন্য সাহিত্য-জগতে প্রবেশ করি, তাহ'লে নির্ব্বিবাদে সে জগতের রাজা-রাজড়ার দলে মিশে যাব। কোনরূপ উচ্চ আশা নিয়ে সেক্ষেত্রে উপস্থিত হলেই নিম্ন-শ্রেণীতে পড়ে যেতে হবে।

২

লেখকেরাও অবশ্য দশের কাছে হাততালির প্রত্যাশা রাখেন, বাহবা না পেলে মনঃক্ষুণ্ণ হন—কেননা, তাঁরাই হচ্ছেন যথার্থ সামাজিক জীব, বাদবাকী সকলে কেবলমাত্র পারিবারিক। বিশ্ব মানবের মনের সঙ্গে নিত্য নূতন সম্বন্ধ পাতানোই হচ্ছে কবি-মনের নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম। এমন কি, কবির আপন মনের গোপন কথাটিও গীতি-কবিতাতে রঙ্গভূমির স্বগতোক্তি স্বরূপেই উচ্চারিত হয়, যাতে করে সেই মর্ম্মকথা, হাজার লোকের কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু উচ্চমঞ্চে আরোহণ করে উচ্চৈঃস্বরে উচ্চবাচ্য না করলে যে জনসাধারণের নয়নমন আকর্ষণ করা যায় না এমন কোন কথা নেই। সাহিত্য-জগতে যাঁদের খেলা করবার প্রবৃত্তি আছে, সাহস আছে ও ক্ষমতা আছে—মানুষের নয়নমন আকর্ষণ করবার সুযোগ বিশেষ করে তাঁদের কপালেই ঘটে। মানুষে যে খেলা দেখতে ভালবাসে তার পরিচয় ত আমরা এই জড় সমাজেও নিত্যই পাই। টাউনহলে বক্তৃতা শুনতেই বা ক জন যায়—আর গড়ের মাঠে ফুটবল খেলা দেখতেই বা ক জন যায়? অথচ এ কথাও সত্য যে, টাউনহলের বক্তৃতার উদ্দেশ্য অতি মহৎ—ভারত-উদ্ধার—আর গড়ের মাঠের খেলোয়াড়দের ছুটোছুটি দৌড়াদৌড়ি আগাগোড়া অর্থশূন্য এবং উদ্দেশ্যবিহীন। আসল কথা এই যে, মানুষের দেহমনের সকলপ্রকার ক্রিয়ার মধ্যে ক্রীড়া শ্রেষ্ঠ—কেননা তা উদ্দেশ্যহীন। মানুষে যখন খেলা করে তখন সে এক আনন্দ ব্যতীত অপর কোনও ফলের আকাঙ্ক্ষা রাখে না। যে খেলার ভিতর আনন্দ নেই, কিন্তু উপরি-পাওনার আশা

আছে তার নাম খেলা নয়, জুয়াখেলা ;—ও ব্যাপার সাহিত্যে চলে না, কেননা ধর্ম্মতঃ জুয়াখেলা লক্ষ্মীপূজার অঙ্গ, সরস্বতীপূজার নয়। এবং যেহেতু খেলার আনন্দ নিরর্থক অর্থাৎ অর্থগত নয়, সে কারণ তা কারও নিজস্ব হতে পারে না। এ আনন্দে সকলেরি অধিকার সমান।

সুতরাং সাহিত্যে খেলা-কর্‌বার অধিকার যে আমাদের আছে, শুধু তাই নয়—স্বার্থ এবং পরার্থ এ দুয়ের যুগপৎ সাধনের জন্য মনোজগতে খেলা করাই হচ্ছে আমাদের পক্ষে সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। যে লেখক সাহিত্যক্ষেত্রে ফলের চাষ কর্‌তে ব্রতী হন, যিনি কোনরূপ কার্য্য-উদ্ধারের অভিপ্রায়ে লেখনী ধারণ করেন, তিনি গীতের মর্ম্মও বোঝেন না, গীতার ধর্ম্মও বোঝেন না ; কেননা খেলা হচ্ছে জীবজগতে একমাত্র নিষ্কাম্ কর্ম্ম, অতএব মোক্ষলাভের একমাত্র উপায়। স্বয়ং ভগবান বলেছেন যদিচ তাঁর কোনই অভাব নেই তবুও তিনি এই বিশ্ব সৃজন করেছেন, অর্থাৎ সৃষ্টি তাঁর লীলামাত্র। কবির সৃষ্টিও এই বিশ্বসৃষ্টির অনুরূপ—সে সৃজনের মূলে কোনও অভাব দূর করবার অভিপ্রায় নেই—সে সৃষ্টির মূল অন্তরাত্মার স্ফূর্ত্তি এবং তার ফুল আনন্দ। এককথায় সাহিত্যসৃষ্টি জীবাত্মার লীলামাত্র এবং সে লীলা বিশ্বলীলার অন্তর্ভূত—কেননা জীবাত্মা পরমাত্মার অঙ্গ এবং অংশ।

৩

সাহিত্যের উদ্দেশ্য সকলকে আনন্দ দেওয়া,—কারো মনোরঞ্জন করা নয়। এ দুয়ের ভিতর যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ আছে, সেইটি ভুলে গেলেই লেখকেরা নিজে খেলা না করে, পরের জন্যে খেলনা তৈরি কর্‌তে বসেন। সমাজের মনোরঞ্জন কর্‌তে গেলে সাহিত্য যে স্বধর্ম্মচ্যুত হয়ে পড়ে তার প্রমাণ বাংলাদেশে আজ দুর্লভ

নয়। কাব্যের ঝুমঝুমি, বিজ্ঞানের চুষিকাঠি, দর্শনের বেলুন, রাজনীতির রাঙালাঠি, ইতিহাসের ন্যাকড়ার পুতুল, নীতির টিনের ভেঁপু এবং ধর্ম্মের জয়ঢাক, এই সব জিনিষে সাহিত্যের বাজার ছেয়ে গেছে। সাহিত্য-রাজ্যে খেলনা পেয়ে পাঠকের মনস্তুষ্টি হতে পারে কিন্তু তা গড়ে লেখকের মনস্তুষ্টি হতে পারে না। কারণ পাঠকসমাজ যে খেলনা আজ আদর করে, কাল সেটিকে ভেঙ্গে ফেলে ;—সে প্রাচ্যই হোক আর পাশ্চাত্যই হোক, কাশীরই হোক কি জর্ম্মাণীরই হোক, দুদিন ধরে তা কারও মনোরঞ্জন করতে পারে না। আমি জানি যে পাঠকসমাজকে আনন্দ দিতে গেলে তাঁরা প্রায়শঃই বেদনা বোধ করে থাকেন। কিন্তু এতে ভয় পাবার কিছু নেই—কেননা কাব্যজগতে যার নাম আনন্দ তারি নাম বেদনা। সে যাই হোক, পরের মনোরঞ্জন করতে গেলে সরস্বতীর বরপুত্রও যে নটবিটের দলভুক্ত হয়ে পড়েন—তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ স্বয়ং ভারতচন্দ্র। কৃষ্ণচন্দ্রের মনোরঞ্জন করতে বাধ্য না হলে তিনি বিদ্যা-সুন্দর রচনা করতেন না, কিন্তু তাঁর হাতে বিদ্যা ও সুন্দরের অপূর্ব্ব মিলন সঙ্ঘটিত হ'ত ; কেননা Knowledge এবং Art উভয়ই তাঁর সম্পূর্ণ করায়ত্ত ছিল। "বিদ্যাসুন্দর" খেলনা হলেও রাজার বিলাসভবনের পাঞ্চালিকা—সুবর্ণে গঠিত, সুগঠিত এবং মণিমুক্তায় অলঙ্কৃত ; তাই আজও তার যথেষ্ট মূল্য আছে, অন্ততঃ জহুরির কাছে। অপর পক্ষে এ যুগে পাঠক হচ্ছে জনসাধারণ—সুতরাং তাঁদের মনোরঞ্জন করতে হলে, আমাদের অতি সস্তা খেলনা গড়তে হবে—নইলে তা বাজারে কাট্‌বে না। এবং সস্তা করার অর্থ খেলো করা। বৈশ্য লেখকের পক্ষেই শূদ্র পাঠকের মনোরঞ্জন করা সঙ্গত। অতএব সাহিত্যে আর যাই করনা কেন, পাঠকসমাজের মনোরঞ্জন করবার চেষ্টা ক'রোনা।

৪

তবে কি সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককে শিক্ষা দেওয়া? অবশ্য নয়। কেননা কবির মতিগতি শিক্ষকের মতিগতির সম্পূর্ণ বিপরীত। স্কুল না বন্ধ হলে যে খেলার সময় আসে না। এ ত সকলেরি জানা কথা। কিন্তু সাহিত্য রচনা যে আত্মার লীলা এ কথা শিক্ষকেরা স্বীকার কর্‌তে প্রস্তুত নন। সুতরাং, শিক্ষা ও সাহিত্যের ধর্ম্মকর্ম্ম যে এক নয়—এ সত্যটি একটু স্পষ্ট করে দেখিয়ে দেওয়া আবশ্যক। প্রথমতঃ শিক্ষা হচ্ছে সেই বস্তু যা লোকে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও গলাধঃকরণ কর্‌তে বাধ্য হয়, অপর পক্ষে কাব্যরস লোকে শুধু স্বেচ্ছায় নয়, সানন্দে পান করে;—কেননা শাস্ত্রমতে সে রস অমৃত। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষের মনকে বিশ্বের খবর জানানো; সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের মনকে জাগানো। কাব্য যে সংবাদপত্র নয়—এ কথা সকলেই জানেন। তৃতীয়তঃ অপরের মনের অভাব পূর্ণ করবার উদ্দেশেই শিক্ষকের হস্তে শিক্ষা জন্মলাভ করেছে—কিন্তু কবির নিজের মনের পরিপূর্ণতা হতেই সাহিত্যের উৎপত্তি। সাহিত্যের উদ্দেশ্য যে আনন্দ দান করা—শিক্ষা দান করা নয়—একটি উদাহরণের সাহায্যে তার অকাট্য প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে। বাল্মীকি আদিতে মুনি ঋষিদের জন্য রামায়ণ রচনা করেছিলেন,—জনগণের জন্য নয়। এ কথা বলা বাহুল্য যে, বড় বড় মুনিঋষিদের কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু রামায়ণ শ্রবণ করে মহর্ষিরাও যে কতদূর আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন তার প্রমাণ—তাঁরা কুশীলবকে তাদের যথাসর্ব্বস্ব, এমন কি কৌপিন পর্য্যন্ত,

পেলা দিয়েছিলেন। রামায়ণ কাব্য হিসাবে যে অমর, এবং জনসাধারণ আজও যে তার শ্রবণে পঠনে আনন্দ উপভোগ করে তার একমাত্র কারণ আনন্দের ধর্ম্মই এই যে তা সংক্রামক। অপর পক্ষে লাখে একজনও যে যোগ-বাশিষ্ট রামায়ণের ছায়া মাড়ান না তার কারণ এ বস্তু লোককে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল, আনন্দ দেবার জন্যে নয়। আসল কথা এই যে, সাহিত্য কস্মিনকালেও স্কুলমাষ্টারির ভার নেয়নি। এতে দুঃখ কর্‌বার কোনও কারণ নেই। দুঃখের বিষয় এই যে, স্কুলমাষ্টারেরা এ কালে সাহিত্যের ভার নিয়েছেন।

কাব্যরস নামক অমৃতে যে আমাদের অরুচি জন্মেছে তার জন্য দায়ী—এ যুগের স্কুল এবং তার মাষ্টার। কাব্য—পড়বার ও বোঝবার জিনিষ কিন্তু স্কুল-মাষ্টারের কাজ হচ্ছে বই পড়ানো ও বোঝানো। লেখক এবং পাঠকের মধ্যে এখন স্কুল-মাষ্টার দণ্ডায়মান। এই মধ্যস্থদের কৃপায় আমাদের সঙ্গে কবির মনের মিলন দূরে যাক্ চার চক্ষুর মিলনও ঘটে না। স্কুলঘরে আমরা কাব্যের রূপ দেখতে পাইনে—শুধু তার গুণ শুনি। টীকা ভাষ্যের প্রসাদে আমরা কাব্যসম্বন্ধে সকল নিগূঢ়তত্ত্ব জানি কিন্তু সে যে কি বস্তু তা চিনি নে। আমাদের শিক্ষকদের প্রসাদে আমাদের এ জ্ঞান লাভ হয়েছে যে পাথুরেকয়লা হীরার সবর্ণ না হলেও সগোত্র—অপর পক্ষে হীরক ও কাচ যমজ হলেও সহোদর নয়। এর একের জন্ম পৃথিবীর গর্ভে, অপরটির মানুষের হাতে; এবং এ উভয়ের ভিতর এক দা-কুমড়ার সম্বন্ধ ব্যতীত অপর কোনও সম্বন্ধ নেই। অথচ এত জ্ঞান সত্ত্বেও আমরা

সাহিত্যে কাচকে হীরা এবং হীরাকে কাচ বলে নিত্য ভুল করি এবং হীরা ও কয়লাকে এক-শ্রেণীভুক্ত করতে তিলমাত্রও দ্বিধা করি নে;—কেননা ওরূপ করা যে সঙ্গত তার বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আমাদের মুখস্থ আছে। সাহিত্য—শিক্ষার ভার নেয় না, কেননা মনোজগতে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে কবির কাজের ঠিক উল্টো। কারণ কবির কাজ হচ্ছে কাব্য সৃষ্টি করা, আর শিক্ষকের কাজ হচ্ছে প্রথমে তা বধ করা এবং তারপরে তার শবচ্ছেদ করা এবং ঐ উপায়ে তার তত্ত্ব আবিষ্কার করা এবং প্রচার করা। এই সব কারণে নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে কারও মনোরঞ্জন করাও সাহিত্যের কাজ নয়,—কাউকেও শিক্ষা দেওয়ায় নয়। সাহিত্য ছেলের হাতের খেলনাও নয়, গুরুর হাতের বেতও নয়। বিচারের সাহায্যে এইমাত্রই প্রমাণ করা যায়। তবে বস্তু যে কি, তার জ্ঞান অনুভূতি-সাপেক্ষ, তর্ক সাপেক্ষ নয়। সাহিত্যে মানবাত্মা খেলা করে এবং সেই খেলার আনন্দ উপভোগ করে— এ কথার অর্থ যদি স্পষ্ট না হয় তাহলে কোন সুদীর্ঘ ব্যাখ্যার দ্বারা তা স্পষ্টতর করা আমার অসাধ্য।

এই সব কথা শুনে আমার জনৈক শিক্ষাভক্ত বন্ধু এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে সাহিত্য খেলাচ্ছলে শিক্ষা দেয়। এ কথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, সরস্বতীকে কিণ্ডার-গার্ডেনের শিক্ষয়িত্রীতে পরিণত করবার জন্য, যতদূর শিক্ষা-বাতিকগ্রস্ত হওয়া দরকার আমি আজও ততদূর হতে পারিনি।

বীরবল।

টীকা টিপ্পনী

বীরবল যে বলেচেন আনন্দ দেওয়া এবং মনোরঞ্জন করা এক জিনিষ নয় একথা আমাদের ভেবে দেখবার সময় হয়েচে।

এ কথাটির মূলসূত্র যদি আমরা চাই ত সে হচ্চে "নায়মাত্মা-বলহীনেন লভ্যঃ।" দুর্ব্বল যে সে আপনাকে পায় না। আপনাকে সত্য করে পাওয়াই আনন্দ। আপনার সেই সত্যে পৌঁছন জোরের কথা। চিন্তায় বল, ভাবে বল, কর্ম্মে বল যে মানুষ সেই সত্যকে আশ্রয় করে চলে সে কখনো লোকের মুখ তাকায় না। সে আপনার আনন্দে নিন্দা ও মৃত্যুকে পর্য্যন্ত ভয় করে না।

কিন্তু "আপনার আনন্দ" "আপনার সত্য" একথা বল্লেই কোনো কোনো বিজ্ঞ লোক বিরক্ত হয়ে ওঠেন। তাঁরা বলেন তুমি কি আপনার খেয়ালটাকেই ভাব-সাগরের কর্ণধার করেচ? যদি তা করে থাক তা হলে পারে যাবে না, তলিয়ে যাবে।

এই সব বিজ্ঞ লোকেরা কানে কিছু কম শোনেন। খুব চীৎকার করে যদি বলা যায় খেয়ালের কথা মোটেই হয় নি, তবু তাঁরা সেটা কানে নেন না। তাঁরা কথা-কাটাকাটি করতে এত মত্ত হয়ে ওঠেন যে, কথাটা যে কি সে দিকে তাঁদের হুঁসই থাকে না।

আনন্দ খেয়াল নয়, সত্য খেয়াল নয়।

তবে যে তুমি বলচ "আপনার আনন্দ" "আপনার সত্য"?

তার অর্থ হচ্চে এই যে, যে জিনিষটা বিশ্বের তাকে অপরোক্ষ ভাবে আপনার করে পেলে তবেই তাকে পাওয়া হয়। বাইরে তাকে জড় করতে থাকলে পাওয়াই হয় না। এইজন্যে আমাদের অধ্যাত্মশাস্ত্রে বলে আত্মার মধ্যে পরমাত্মাকে দেখলে তবেই তাঁকে সত্য করে দেখা হয়।

বিশ্বের সত্য বিশ্বের আনন্দকে তাঁরাই আপনার করে পান যাঁরা শক্তিশালী প্রতিভাশালী। এইজন্য তাঁদের কাজের উৎস, ভাবের উৎস আপনার মধ্যেই। সে উৎস তাঁদের সৃষ্ট নয়, কারণ, তা জগতের ; সে উৎস তাঁদের আপনার, কারণ, সে তাঁদের অন্তরের।

উৎস যদি নিজের মধ্যে না থাকে, আমার বেহারা যদি ভাঁড়ে করে তৃষ্ণার জল তুলে আনে, তবে সে এক বিষম ভাবনা। কি জানি সে হয় ত সরকারী নর্দ্দমা থেকে আনে, কিম্বা হয় ত যে কুণ্ডর উপর তার ভরসা, দিন না যেতেই সেটা শুকিয়ে যাবে।

বিশ্বের আনন্দ যার নিজের মধ্যে, সেই ত প্রতিভাশালী লোক ; আনন্দকে সেই নির্ভয়ে প্রচার করে থাকে। এই কাজটিতে অনেক-সময়ে দশের সঙ্গে তার লাঠালাঠি বেধে যায়। কারণ দস্তুরের বাঁধা বরাদ্দের উপর যাদের ভরসা, খাঁটি আনন্দকে তারা চিনতে পারে না। দস্তুরের ছাপ দেখে তবেই তারা জিনিষের দাম যাচাই করে। তারা তক্‌মা-পরা দরোয়ান-জি, দেউড়িতে বসে আছে ; যদি সত্যের দোহাই দিয়ে তাদের বলা যায়, "পাঁড়ে-জি, মাল তুমি নিজের মধ্যে পরখ করেই দেখনা", --সে চোখ পাকিয়ে বলে, "নিজে ! সেটা আবার কে ! সে আছে কোথায় ? আমি নিজেকে চিনিনে, আমি চিনি ছাপ-মারা মার্কা।"

আমরা বলি, "নিজে" বলে একটা পদার্থ আছে সেটা কেবল নিজেকে দেখবার জন্য নয়, সেইখানেই আমরা সমস্তকে দেখি। সেটা যদি ঢাকা পড়ে তা হলে সেই ঢাকাটাকেই সমস্ত বলে মনে হয়। তখন ঠুলিটাকেই মনে হয় সনাতন জগৎ।

এই জায়গাতেই ফ্যারিসিদের সঙ্গে যিশুর গোল বেধেছিল। এ গোল আজও মেটেনি।

আনন্দের কারবার তাদেরই, অন্তরের মধ্যে যাদের উৎস; মনোরঞ্জনের কারবার তাদেরই, বাইরের পরেই যাদের একমাত্র ভরসা। লোকে যা শুনতে চায় তারা তাই শুনিয়ে গুজরান চালায়। লোকের মত, লোকের পছন্দই তাদের নিক্তি, তাদের কষ্টিপাথর।

রামায়ণ পড়ে দেখলে যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত খাঁটি কবিকে দেখা যায়—উত্তরকাণ্ডে মেকি ধরা পড়ে। কেননা উত্তরকাণ্ড লোকরঞ্জনের কাণ্ড। যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত রামচন্দ্র দশমুখকে ভয় করেন নি বলে সীতা উদ্ধার করতে পেরেচেন, আর উত্তরকাণ্ডে দুর্ম্মুখকে ভয় করেচেন বলে সীতা হারিয়েচেন। যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত রামচন্দ্র গুহক, বানর, বিভীষণের মিতা; উত্তরকাণ্ডে তিনি শূদ্রক তপস্বীকে বধ করলেন; কেননা সেখানে তাঁর আদর্শ লোকধর্ম্মের বন্ধনে, নিত্য-ধর্ম্মের আনন্দে নয়। যুদ্ধকাণ্ড পর্য্যন্ত রামচন্দ্র বীর, উত্তরকাণ্ডে রামচন্দ্র ভীরু।

উত্তরকাণ্ডের কবি লোকশিক্ষা দিতে বসেছিলেন—অর্থাৎ লোকে যেটাকে ভালো বলে, সেইটেই লোকের কানে ভালো বলা তাঁর কাজ হয়েছিল। ঋষিরা বাল্মীকির ছয়কাণ্ড রামায়ণে আনন্দ পেয়েছিলেন, আর লোকে বড় খুসী হয়েছিল অবাল্মীকির উত্তরকাণ্ড রামায়ণে। রামায়ণের আনন্দই হচ্চেন সীতা, তিনি সত্য, তাঁর সতীত্ব আমরা তাঁর জীবনে দেখেচি,—সেই আনন্দকে বধ করেচেন উত্তরকাণ্ডের লেখক, কারণ সতীত্বকে তিনি লোকশ্রুতির মধ্যে দেখতে চেয়েচেন। তিনি মনে করেচেন, এই আনন্দকে বধ করাটাই

বাহাদুরী—আমরাও আজ পর্য্যন্ত তাই নিয়ে বাহবা দিয়ে আস্‌চি। কারণ ভীরুতাকেই পৌরুষ বলে না চালাতে পারলে আমাদের সান্ত্বনা নেই, আমরা, যা সত্য তাকে মান্‌তে পারচিনে বহুর শাসনে, তাই যা মানচি তাকেই সত্য বলচি জগঝম্প বাজিয়ে। তার কারণ আমরা আজ কাব্যের ভিতরে নেই, আমরা কাব্যের বাইরে; আমরা উত্তরকাণ্ডে। আমাদের সীতা, যিনি আমাদের সত্য, আমাদের সুন্দর, তিনি কেঁদে বল্‌চেন, "মা বসুন্ধরা, আমাকে গ্রহণ কর! ঐ লোকরঞ্জনকারী তাঁর ঘরের স্যাকরা দিয়ে গড়া বানানো-সীতাকে নিয়ে বাজার দরে তার দাম কসে খুসী থাকুন!"

শিক্ষা নিয়ে আমাদের সরকারি শিক্ষাবিধান সভায় একটা গোলমাল চলচে।

ডাক্তার ওয়াট্‌সন্ বলেন, কিছুকাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এত ছেলে পাস্ করচে যে, সেটা ক্রমে একটা বিভীষিকা হয়ে উঠ্‌ল।

ইংরেজপক্ষ আমাদের এই বলে দোষ দিচ্চেন যে, এই নিয়ে তোমরা যে খুসী হচ্চ সেটা বিদ্যার দিকে তাকিয়ে নয়, ব্যবসার দিকে তাকিয়ে। ছেলে যে সত্যই কিছু শিখ্‌বে সেটা তোমাদের কাছে গৌণ কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের কারখানা-ঘরের ছাপ নিয়ে চাকরির বাজারে সে কোনোমতে বিকিয়ে যাবে এইটেই তোমাদের কাছে মুখ্য। চাকরির লোভে-পড়ে তোমরা দেশের শিক্ষার ষ্ট্যাণ্ডার্ড্ খাটো করে দিলে।

এখানে মুস্কিল হচ্চে এই যে, ইংরেজপক্ষ তাঁদের য়ুনিভার্সিটির সঙ্গে আমাদের য়ুনিভার্সিটির তুলনা করে থাকেন।

সেটা অন্যায়। তার কারণ, তাঁদের দেশে শিক্ষা সর্ব্বসাধারণের

মধ্যে ব্যাপ্ত। শিক্ষার যে অংশটা সব চেয়ে কম, মানুষের যেটুকু না হলে নয় সেটুকুর ব্যবস্থা দেশের মেয়েপুরুষ সকলের জন্যেই আছে।

অতএব নীচের দিকে যখন মোটা প্রয়োজনটা মেটানো হয়েচে উপরের দিকে তখন আদর্শের সূক্ষ্মতার দিকে মন দেওয়া যেতে পারে।

আমাদের দেশে আশু দরকার হয়েচে শিক্ষাটাকে যতটা পারা যায় ছড়িয়ে দেওয়া,—ইংরেজের সে দরকার মোটেই নেই। এমন স্থলে ভরা-পেটের বিচার খালি-পেটের বিচারের সঙ্গে মোটেই মেলেনা।

মোটা প্রয়োজনটাই যখন প্রবল, আদর্শটা তখন খাটো না হয়ে উপায় নেই। এ কথা মান্‌তে রাজি আছি য়ুরোপীয় য়ুনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েটদের সঙ্গে এখানকার য়ুনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েটের সমান ওজন নয়। তার কারণ আমাদের দেশের য়ুনিভার্সিটিকে একটা মাঝারি চালে চল্‌তে হয়। খুব উঁচু চালও নয়, নেহাৎ নীচু চালও নয়। একই সঙ্গে শিক্ষাকে যথাসম্ভব উপরে টেনে রেখে যথাসম্ভব চারদিকে ছড়িয়ে দেবার ভার তাকে নিতে হয়েচে।

দেশের অবস্থা ও প্রয়োজন থেকে স্বতন্ত্র য়ুনিভার্সিটি বলে কোনো একটা অবচ্ছিন্ন পদার্থ নেই। আমাদের য়ুনিভার্সিটি আমাদের বিশেষ দায় অনুসারে স্বভাবতই একটা বিশেষ চাল অবলম্বন করেচে। যাদের সে দায় নেই তারা সে চালকে নিন্দে করতে পারে। কি করা যায়! নিন্দে মাথায় করে নিতে হবে কিন্তু চাল বদ্‌লানো শক্ত।

যদি কেবলমাত্র ইংরেজের হাতে য়ুনিভার্সিটির ভার থাকত তা হলে তাঁরা উচ্চশিক্ষাকে খুবই উচ্চ করে তোলবার জন্যে মজুর

লাগিয়ে দিতেন—ভুলে যেতেন, উপর এবং নীচের মাঝখানে মইটা নেই। অতি সূক্ষ্ম এবং সঙ্কীর্ণ একটা উচ্চ শিক্ষা উচ্চে বসে চোখবুজে হাওয়া খেত, নীচের সঙ্গে তার কোনো কারবার থাকৃত না।

কিন্তু আমরা, যারা আমাদের দেশের প্রয়োজন বুঝি—ইচ্ছা করচি বাংলা দেশের পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে মোটামুটি পাস-করা ছেলে অজস্র ছাড়িয়ে যাক্। কেরানিগিরি করবার জন্যে নয়—বিশ্বের সঙ্গে দেশের একটা সাধারণ যোগের রাস্তা খুলে দেবার জন্যে—যে রাস্তা দিয়ে ক্রমে ক্রমে আমাদের ঘরে ঘরে একদিন সর্ব্বজগতের পণ্য কিছু কিছু এসে পৌঁছতে পারবে; শিক্ষার প্রাণস্রোত আমাদের সমস্ত দেশের নাড়ির মধ্যে সঞ্চার করে দেবার জন্যে, যাতে-করে কেবল দু-দশ জন লোকের নয়, সমস্ত দেশের চিত্ত জাগরুক হয়ে ওঠে।

ইংরেজই আমাদের তীব্রস্বরে পরিহাস করে এসেচেন যে, তোমাদের শিক্ষিতমণ্ডলীর সঙ্গে জনমণ্ডলীর যোগ নেই। আমাদের শিক্ষা যদি অসম্ভব রকমের অত্যুচ্চ শিক্ষা হত তাহলে সে যোগ যে কতদিনে হত তা বল্‌তে পারিনে।

কারণ, অত্যুচ্চ পর্য্যন্ত উঠ্‌তে পারে অতি অল্প লোক। সেই অল্প লোকের দ্বারা দেশে শিক্ষার ব্যাপ্তি হতে পারত না। আজ আমরা অবজ্ঞা করে বলে থাকি দেশে বি-এ, এম্‌-এ, ছড়াছড়ি যাচ্চে। ধানের ক্ষেতে বীজ যে এমনি করে ছড়াছড়ি যায় নইলে হেমন্তে পেটভরার মত অন্ন হয় না। এ ত বিলিতি সীজন্ ফ্লাউয়ারের সৌখীন কেয়ারি নয়।

এর জবাবে অপরপক্ষ বল্‌তে পারেন, বেশ ত নিম্নশিক্ষাকে খুব করে ব্যাপ্ত করে দাও, তাই বলে উচ্চ শিক্ষার মাথা হেঁট কোরোনা। কিন্তু নিম্নশিক্ষাকে দেশব্যাপী করা আমাদের সাধ্যের মধ্যে নেই। সেটা কোন্‌ যুগে হবে সেই ভরসা করে এখন যে-রাস্তাটা আছে, সে ভাঙা হোক বাঁকা হোক, তাকে আগে-ভাগে বন্ধ করে বসে থাক্‌তে পারিনে।

যে পর্য্যন্ত দেশে নিম্নশিক্ষা ফলাও না হবে সে পর্য্যন্ত মোটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড আশ্রয় করে যত বেশি সংখ্যায় পাস-করা ছেলে দেশে ছড়িয়ে পড়ে ততই কল্যাণ। তার কারণ এ নয় যে, ভালোকে আমরা শ্রদ্ধা করিনে, তার কারণ, উপস্থিত ক্ষেত্রে মন্দের ভালো ছাড়া আমাদের আর গতি নেই। এই মন্দের ভালোর রাস্তাটা কাটিয়ে গিয়ে আশা করি একদিন নিছক ভালোর দেশে গিয়ে পৌঁছব।

তাই বলে এ কথা যেন কেউ না মনে করেন যে, যে-পদ্ধতিটা চল্‌চে এর মধ্যে গলদ কিছু নেই বা এর উন্নতি করা চলে না এমন কথা আমরা কল্পনা করি। সেদিক থেকে অনেক কথা বল্‌বার আছে; এখন সে থাক্‌। আজকাল বিস্তর ছেলে পাস করচে বলে আতঙ্কে যাঁরা সেই পাসের পথটাকে আরো সরু করতে চান আপাতত দয়াধর্ম্মের দোহাই দিয়ে তাঁদের বল্‌চি, তোমরা ত গোড়াটা রাখইনি, তারপরে যদি আবার আগাটাকেও সূক্ষ্ম করে ছাঁটো তাহলে এই মুড়ো জিনিষটাকে নিয়ে আমরা করব কি?

যাত্রা

যতক্ষণ স্থির হয়ে থাকি
ততক্ষণ জমাইয়া রাখি
যত কিছু বস্তুভার।
ততক্ষণ নয়নে আমার
নিদ্রা নাই;
ততক্ষণ এ বিশ্বেরে কেটে কেটে খাই
কীটের মতন;
ততক্ষণ
দুঃখের বোঝাই শুধু বেড়ে যায় নূতন নূতন;
এ জীবন
সতর্ক বুদ্ধির ভারে নিমেষে নিমেষে
বৃদ্ধ হয় সংশয়ের শীতে পক্ককেশে।

যখন চলিয়া যাই সে চলার বেগে
বিশ্বের আঘাত লেগে
আবরণ আপনি যে ছিন্ন হয়,
বেদনার বিচিত্র সঞ্চয়
হতে থাকে ক্ষয়।

পুণ্য হই সে চলার স্নানে,
চলার অমৃতপানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ।

ওগো আমি যাত্রী তাই—
চিরদিন সম্মুখের পানে চাই।
কেন মিছে
আমারে ডাকিস্ পিছে ?
আমি ত মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে
র'বনা ঘরের কোণে থেমে।
আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা,
হাতে মোর তারি ত বরণডালা।
ফেলে দিব আর সব ভার,
বার্দ্ধক্যের স্তূপাকার
আয়োজন!

ওরে মন,
যাত্রার আনন্দগানে পূর্ণ আজি অনন্ত গগন।
তোর রথে গান গায় বিশ্বকবি,
গান গায় চন্দ্র তারা রবি।

২৯ পৌষ।
সুরুল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সবুজ পত্র

ঐতিহাসিক

আমাদের সাহিত্য, আমাদের ইতিহাস কোনটাই তেমন সারবান নহে, সমস্তই চুটকী শ্রেণীর অন্তর্গত—এই একটা অপবাদ আজকাল শুনা যাইতেছে। সাহিত্যে চুটকী চলিতে পারে কিন্তু ভাগ্যবিধাতার দপ্তরখানায় বসিয়া যাঁরা জীর্ণপত্র ঘাঁটিয়া বহুযত্নে অতীতের পাকা দলিল বাহির করিতেছেন ও তাহা হইতেই ভাবীযুগের নজির খাড়া করিয়া তুলিতেছেন তাঁরাও যদি মোটা মোটা ভলুমে সারবান ইতিহাস না লিখিয়া এমন কিছু লেখেন যার মধ্যে তত্ত্বের গাম্ভীর্য্য নষ্ট হইয়া গল্পের চাপল্য প্রকাশ হইতে থাকে তবে সেটা প্রবীণোচিত হয় না। কারণ ইতিহাসটা বিজ্ঞানের জ্ঞাতি কুটুম্ব, তাকে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের চালে চলিয়া আপন মর্য্যাদা রাখিতে হইবে। রস-সাহিত্যের সঙ্গে সে যদি কুটুম্বিতা করিতে যায় তবে ত তার কুলনাশ অনিবার্য্য।

ইংলণ্ডে দেখিতে পাই যে এক একটা ধূয়া এক এক সময়ে সমস্ত দেশের বুদ্ধিকে পাইয়া বসে। ধর্ম্মতত্ত্বের শাসন হইতে ইংলণ্ড যখন খালাস পাইল তখন বিজ্ঞানের ধূয়া তাকে চাপিয়া ধরিল। স্থির হইল, বিশ্বে যা-কিছুর মধ্যে দৃষ্টি চলে বা চলে না সকলই বিজ্ঞানের সাহায্যে মানববুদ্ধির দখলে আসিবে। বিজ্ঞানের তখন প্রচণ্ড প্রতাপ। তার সমারোহ দেখিয়া বিলাতের লোকেরা নিশ্চিত আশা করিয়াছিল যে বিশ্বে আর কিছু গুপ্ত থাকিবে না, যেখানে যা-কিছু অস্পষ্ট আছে সব স্পষ্ট হইয়া যাইবে। ধর্ম্ম তার স্বর্গ-নরক লইয়া, জীব তার জন্ম-মৃত্যু লইয়া, জাতি তার উত্থান-পতন লইয়া যে সব জটিল হেঁয়ালী-জালে আপনাকে ঢাকিয়া ছিল এতকাল পরে বিজ্ঞান সে সব পরিষ্কার করিয়া দিবে।

সেই সময়ে "বৈজ্ঞানিক প্রণালী"র খুব খাতির হইল। অন্যান্য বিষয়ে এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর প্রয়োগ হইতে বড় বেশী দেরী হইল না, কেবল ইতিহাস তখনকার মত রক্ষা পাইল। ইংরেজিতে ইতিহাস তখনো সাহিত্যেরই সরিক হইয়া ছিল; শুধু পণ্ডিত নয়, জনসাধারণও সেই ইতিহাস পড়িত। গিবন, কার্লাইল, মেকলে হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রীন, লেকি পর্য্যন্ত সকলেই যে সকল ইতিহাস লিখিয়াছিলেন তাহা কেবল ইতিহাস নহে সাহিত্যও বটে। বিজ্ঞানের হাত এড়াইয়া ইতিহাস যে এমন ভাবে চলিয়াছিল তার কারণ ইতিহাস সাহিত্যের অঙ্গ হওয়াতে তার উপর পণ্ডিতদের অবজ্ঞা ছিল; তাঁরা ভাবিতেন যে ইতিহাস নাটক নভেল পদ্যের মত অসার, উহাতে বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগ করিতে গেলে মজুরি পোষাইবে না।

এমন সময়ে এক দিন সীলি-প্রমুখ নূতন ঐতিহাসিকেরা সগর্ব্বে ঘোষণা করিলেন—ইতিহাস একটা বিজ্ঞান; যাঁরা আগে ইতিহাস লিখিতেন তাঁরা ইতিহাসের নামে উপন্যাস চালাইয়াছেন। তাঁরা জনসাধারণকে চোখ রাঙাইয়া বলিলেন, ইতিহাস পড়া তোমাদের কর্ম্ম নয়; তোমরা নাটক নভেল পড়। আজ হইতে ইতিহাস কেবল বিশেষজ্ঞরা লিখিবেন এবং বিদ্বানেরা পড়িবেন। নব্য ঐতিহাসিকেরা ঠিক করিয়াছিলেন যে ইতিহাসের একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে সেটা হচ্ছে কার্য্য-কারণ নির্ণয়ের দ্বারা কতগুলি Laws of History —ঐতিহাসিক মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করা। প্রাকৃত বিজ্ঞানের তত্ত্বের মত কতকগুলি ঐতিহাসিক তত্ত্ব আছে এ তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁরা ভাবিয়াছিলেন যে এ কাজ শক্ত হইবে না যদি এমন ঐতিহাসিক জোটে যাঁর বুদ্ধি রীতিমত শান-দেওয়া, নথিপত্রের পেটের কথা বাহির করিতে যাঁর অধ্যবসায় প্রশস্ত, যিনি নিপুণভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগ করিতে পারেন এবং সর্ব্বোপরি যাঁর মন ভাবাতিশয্যের (Sentimentalism) কুয়াশা হইতে একেবারে মুক্ত।

সত্যের অনুসন্ধানে যাঁরা এমন করিয়া দল বাঁধিয়া বাহির হইলেন তাঁরা যে গোড়াতেই এমন একটা মায়ামৃগের পিছনে ছুটিবেন এমনটা আশঙ্কা করা যায় নাই। অঙ্কশাস্ত্র যেমন নিরেট সত্য বা প্রাকৃত বিজ্ঞান, যেমন খাঁটি বিজ্ঞান ইতিহাস কখনই সেরূপ নহে। বিজ্ঞান যেমন ভাবে প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ নির্ণয় করে, ইতিহাসে তেমন হইবার উপায় নাই। ঘটনাপর্য্যায়ের জোড়গুলি ভাঙিয়া তার কারণ বাহির করিবার শক্তি কোনো ঐতিহাসিকেরই নাই।

এবং গবেষণা দ্বারা কোনো বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকই এ পর্য্যন্ত এমন কোনো চিরন্তন ঐতিহাসিক নিয়ম বাহির করিতে পারিলেন না যার সাহায্যে যে-কোনো ঘটনার নির্দ্দিষ্ট পরিণাম আগে হইতে নির্ণয় করা যাইবে। এমন কি, পেটের জ্বালা ধরিলে লোকে ক্ষেপিয়া ওঠে এই সনাতন ঐতিহাসিক বুলিরও অসত্যতা অনেকবার অনেক স্থানে প্রমাণ হইয়া গিয়াছে।

বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকেরা মনে করিয়াছিলেন যে ইতিহাস পাঠকদিগকে কেবল আনন্দ দিবে না, ব্যবহারিক শিক্ষাও দিবে। কিন্তু পৃথিবীর কার্য্যক্ষেত্রে চারিত্রনীতি বা রাষ্ট্রনীতি ইতিহাসের শিক্ষার দ্বারা পাকা হইয়াছে এমন ত কোথাও দেখা গেল না। ঐতিহাসিক নিয়মের পরে মানুষের এত বেশী শ্রদ্ধা নাই যে সেই অনুসারে সে চলিবে এবং এ কথা মানিতেই হইবে যে শ্রদ্ধা করিবার তেমন হেতুও এ পর্য্যন্ত কোনো ঐতিহাসিকই দেখাইতে পারেন নাই। আসল কথা, অন্যের বেলায় যে নিয়ম খাটিয়াছে নিজের বেলাতেও তাহা খাটিবে একথা স্বভাবতই মানুষের বিশ্বাস করা শক্ত। রোমের বিশাল সাম্রাজ্য তখনকার য়ুরোপে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার, তার মধ্যেও যে বিনাশ প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা রোমক ঐতিহাসিকগণ বুঝিতে পারেন নাই; তাঁরা ভাবিয়াছিলেন রোম চিরকাল সমান থাকিবে। শত শতাব্দী পরে য়ুরোপের বিচক্ষণ ঐতিহাসিকেরা বিস্তর গবেষণা করিয়া রোমক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণ স্থির করিয়াছেন কিন্তু নিজেদের সাম্রাজ্যের বেলায় কারো কোনো হুঁস নাই। যে পথ দিয়া রোম গিয়াছে, স্পেন গিয়াছে সেই পথ দিয়া তাঁদের সাম্রাজ্যও যাইতে পারে এ দুশ্চিন্তা

তাঁদের বড় একটা বিচলিত করে না, বরঞ্চ দেখা যায় তাঁরা অতি দূর ভবিষ্যতের হিসাব করিতেছেন। সাম্রাজ্যের অতিবৃদ্ধিতে সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্ব্বল করিয়া তোলে, তাই বলিয়া পৃথিবীর কোন্ পরাক্রমশালী জাতি সাম্রাজ্য-বিস্তারে কুণ্ঠিত ?

আসল কথা, ঐতিহাসিক কার্য্যকারণ স্থির করা বা রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া ঐতিহাসিকের মুখ্য উদ্দেশ্য নহে, আমাদের অতীতকে আমাদের সাম্নে ধরাই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। মুখ্যত ইতিহাসের কাছে আমরা জানিতে চাই আমরা কেমন ছিলাম। কেমন ছিল ভারতের সেই গৌরবের যুগ যখন মৌর্য্যেরা সমস্ত ভারতবর্ষে এক সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। পাটলীপুত্রের কত না ঐশ্বর্য্য কত না দীপ্তি, আবার তারই পাশে ছায়ানিবিড় আম্রকাননতলে গ্রামগুলিতে কত না শান্তি ছিল। ঐশ্বর্য্যে, গৌরবে ভারতবর্ষ যখন উজ্জ্বল, তার ভাণ্ডার যখন ভরা, ঠিক তখনই ভগবান বুদ্ধ তার অন্তরের দৈন্য বুঝিয়াছিলেন এবং যে অমৃত মন্ত্রে মানুষ মুক্ত হইবে সেই মন্ত্র ভারতবর্ষে ঘোষণা করিয়াছিলেন। কেমন ছিলেন সেই রাজতপস্বী যিনি রাজার আসন হইতে দন্ত প্রচার করেন নাই ধর্ম্ম প্রচার করিয়া গিয়াছেন, কেমনই বা ছিলেন সেই শ্রেষ্ঠী-সকল যাঁরা সেই মহাভিক্ষুকের ভিক্ষাপাত্র নিজের সর্ব্বস্বে ভরিয়া দিয়া নিজেদের ধন্য মনে করিতেন। আবার চৈতন্যদেব তাঁর দেব-মূর্ত্তি, তাঁর উজ্জ্বল করুণাপূর্ণ বিশাল দুই চক্ষু লইয়া যে বাংলা দেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই আমাদের ছায়ায় ঢাকা, পাখীর গানে ভরা বাংলা দেশই বা কেমন ছিল। সেই শান্ত, সেই বলিষ্ঠ সেই নানা ভাব নানা চিন্তাপূর্ণ ভারতবর্ষের যে একটি

স্বরূপ আমরা দেখিতে চাই সে কি কেবল কার্য্যকারণ খুঁজিবার জন্য ?

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে ঐতিহাসিকের জটার মধ্য হইতে মন্দাকিনীর মত স্বচ্ছ ভাষার ধারা বাহির হওয়া চাই। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে যে সকল ইতিহাস লেখা হইয়াছে তাহা পাদটীকা ও পরিশিষ্টে পূর্ণ এবং তাহা সুপাঠ্য নহে। বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকেরা ভাবিয়াছিলেন যে, সত্য লইয়া যে বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের কারবার তাহার আর সুন্দর হওয়ার প্রয়োজন কি ? ঘটনার পরম্পরাকে এবং ঘটনার ভিতর দিয়া জাতীয় জীবনস্রোতের গতিভঙ্গীকে ছবির মতন পাঠকের সম্মুখে ধরিবার নিমিত্ত যে শক্তির প্রয়োজন তাহা তাঁরা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন নাই। তাঁরা মনে করিতেন—ভাষার লালিত্য চিন্তাশীলতার অভাব প্রমাণ করে। অধ্যাপক সিলি কহিয়াছিলেন—Break the drowsy spell of narrative। ফলে পাঠকের Drowsiness আরো বাড়িয়া গিয়াছিল এবং কাহিনীর Spell যে আজও ভাঙে নাই সে ত সকলেরই জানা। আজকাল আবার বিলাতের ঐতিহাসিক-দিগের মত বদলাইতে আরম্ভ করিয়াছে।

আসল কথা, ঐতিহাসিক সাহিত্যকার এবং ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিকে যে কথা লইয়া বিবাদ হইতেছিল সেটা এই যে, ইতিহাসে হৃদয়বৃত্তি ও কল্পনাবৃত্তির কোনো স্থান আছে, কি নাই। পূর্ব্বে যে সব ইতিহাস লেখা হইয়াছিল তার মধ্যে ঐতিহাসিকের মনের ঝোঁকটা কোন্ দিকে বেশ বোঝা যাইত। পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকদিগের ন্যায় তাঁরা নিজের লেখা হইতে সাবধানে নিজেকে দূরে সরাইয়া রাখিতেন

না। তাঁরা ঘটনাকে কেবল বুদ্ধি দ্বারা বিশ্লেষণ করিতেন না হৃদয় দ্বারা উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিতেন। বৈজ্ঞানিক ঐতিহাসিকেরা হৃদয়কে অবিশ্বাস করেন; তাঁরা কেবল বুদ্ধি দ্বারা সত্য উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন—ভুলিয়া যান যে দৃশ্য ঘটনার পশ্চাতে যে জীবনের বেগ ইতিহাসকে চালনা করে তাহা মানুষ কেবল বুদ্ধি দ্বারা বুঝিতে পারিবে না। সত্য ত চাইই, তাই বলিয়া যার লিখিত দলিল আছে তাই কেবল সত্য এ ভুল যেন না করি। এ কথা যেন ভুলিয়া না যাই যে দলিলের অতীত দেশে যে সত্য বিরাজ করে, যাহা কেবল সমগ্রচিত্তের বোধের দ্বারাই বোঝা যায়—তাহা সুগভীর। যাঁরা কেবল ঘটনার ভিতর দিয়া ফরাসী-বিপ্লবের নিগূঢ় প্রাণের গতি লক্ষ্য করিতে চেষ্টা পাইবেন তাঁদের শ্রম ব্যর্থ হইবে। ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে কেবল কার্লাইল স্বীয় কল্পনাশক্তি দ্বারা ফরাসী-বিপ্লবের অর্থ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। Ranke তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য সত্বেও ইংলণ্ডের ইতিহাসে ধর্ম্মসংস্কার অথবা কৃষক-বিদ্রোহের সময়কার উত্তেজনা আমাদের মনের ভিতর সঞ্চার করিতে সক্ষম হন নাই এবং Puritanism-এর মধ্যে নিহিত অর্থও বুঝিতে পারেন নাই। Thierry, Michelet, Mommsen-কে এই হিসাবে আমাদের আদর্শ করা যাইতে পারে। অর্থনীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে Marshal বলিয়াছেন—

"The Economist needs imagination above all to put him on the track of those causes of events which are remote or lie below the surface."

যদি অর্থনীতিশাস্ত্র সম্বন্ধে একথা সত্য হয় তবে ইতিহাস সম্বন্ধে যে উহা কতদূর সত্য তাহা বলা বাহুল্য।

এ কথা ভুলিলে চলিবে কেন যে কলের ইতিহাস লিখিতেছ না, মানুষের ইতিহাস লিখিতেছ। মানুষের প্রাণ আছে, নানা রকম বৃত্তি প্রবৃত্তি আছে যাহা কোনো বৈজ্ঞানিক প্রণালীতেই বিশ্লেষণ করা যাইবে না, যাহা কেবল নিজের কল্পনা দ্বারা বুঝিয়া লইতে হইবে। মনকে মন দিয়াই বুঝিতে হইবে নচেৎ যাহা বোঝা যাইবে তাহা সত্য নহে। যে ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিক বাংলায় স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস লিখিবেন তিনি যদি কেবল নথিপত্রের দিকে চাহিয়াই ইতিহাস লেখেন তবে সে ইতিহাসে কতকগুলি ফেল-করা স্বদেশী কোম্পানীর নাম, জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যর্থ চেষ্টা, আমাদের নিজেদের মধ্যে দলাদলি এবং সংবাদপত্রের মিথ্যা বাক্যজাল ছাড়া আর কি পাওয়া যাইবে?—অথবা তিনি হয় ত প্রমাণ এইকুটু করিবেন যে স্বদেশী-আন্দোলনের ফলে দেশের লোক দেশী কাপড় পরিতে আরম্ভ করিয়াছিল।—ইহাই কি সত্য যে স্বদেশী-আন্দোলনের চরম দেশের লোকের দেশী কাপড় পরা? এ কথা মানিতেই হইবে যে ঘটনায় যাহা ঘটিয়াছে তাহা অপেক্ষা বড় সত্য আমরা মনের মধ্যে লাভ করিয়াছিলাম। কোন্ অন্ত-র্দৃষ্টির দ্বারা বাঙালী বুঝিতে পারিয়াছিল যে আমরা মরিব না বাঁচিব—আমরা অতি বুদ্ধিমানেরা ত দেখিতেছি যে মরণ ছাড়া আর আমাদের গতি নাই, তবে কোথা হইতে উচ্চারিত হইল এই আশার বাণী? কে জাগাইয়া তুলিল আমাদের মনের মধ্যে এই অকারণ বাঁধনহারা সুখ? আমাদের কাছে যাহা ধ্রুব, যাহা

মহান, যাহা কোম্পানী-ফেলের চেয়ে ঢের বেশী সত্য,—আমাদের আশার কথা, আমাদের উৎসাহের কথা, আমাদের সেদিনকার উদ্দীপনা, সুদূর ভবিষ্যতে যে ঐতিহাসিক তখনকার পাঠকদের সম্মুখে ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিবেন তাঁর কেবল বুদ্ধি ও অধ্যবসায় থাকিলে চলিবে না; সকল মহৎ আন্দোলনের পশ্চাতে থাকিয়া যে শক্তি অঘটন ঘটায়—যে শক্তির কথায় কবি গাহিয়াছেন—

তোমার বিধান
কেমনে কি ইন্দ্রজাল করে যে নির্ম্মাণ
সঙ্গোপনে সবার নয়ন-অন্তরালে
কেহ নাহি জানে। তোমার নির্দ্দিষ্ট কালে
মুহূর্ত্তেই অসম্ভব আসে কোথা হতে
আপনারে ব্যক্ত করি আপন আলোতে
চির-প্রতীক্ষিত চির-সম্ভবের বেশে।

সেই শক্তিকে মনপ্রাণ দিয়া অনুভব করিতে হইবে, নচেৎ তাঁর সকল শ্রম ব্যর্থ হইবে।

এ কথা সত্য যে, সমসাময়িক সাহিত্য, ঘটনা ও লোকচরিতের মধ্য দিয়াই অতীতের মনকে অনুভব করিতে হইবে এবং সেই সমস্ত দলিল-নির্ব্বাচনে একটা বিচার-শক্তির প্রয়োজন যাহাকে বৈজ্ঞানিক বলা যাইতে পারে কিন্তু সকলের চেয়ে প্রয়োজন অতীতের মনকে গ্রহণ করিবার শক্তি, অতীতের প্রতি একটা শ্রদ্ধা ও উৎসাহ। কারণ শ্রদ্ধা ভিন্ন অতীতের রহস্য বোঝা যাইবে না—ইহাই প্রকৃত ঐতিহাসিকের বিশেষত্ব।

আমরা আমাদের দেশে এমন ঐতিহাসিককে চাই যিনি তাঁহার

কল্পনার দ্বারা আমাদের অতীতকে জীবন্ত করিয়া তুলিবেন, যিনি তাঁহার শ্রদ্ধার দ্বারা আমাদের মনে শ্রদ্ধার সঞ্চার করিবেন, যিনি বিচার করিয়া আমাদের অন্যায় অহঙ্কারকে তিরস্কৃত করিবেন এবং আমাদের অমূলক লজ্জাকে লজ্জিত করিবেন, যিনি নিজের অটল বিশ্বাসদ্বারা আমাদিগকে প্রতিষ্ঠা দিবেন, নিজের আশা দ্বারা আমাদিগকে আশা যোগাইবেন এবং অতীতের মহৎ আদর্শ দেখাইয়া আমাদের ভবিষ্যতের আদর্শ এই দেশের কালো আকাশে আলোর রেখায় আঁকিয়া দিবেন।

শ্রীকিরণশঙ্কর রায়।

ঘরে-বাইরে

বিমলার আত্মকথা

বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে দেখি, সন্দীপ দরজার দিকে পিঠ করে ব্রিটিশ একাডেমিতে প্রদর্শিত ছবির তালিকার একখানা বই নিয়ে মন দিয়ে দেখচেন। আর্ট সম্বন্ধে সন্দীপ নিজেকে বিচক্ষণ বলেই জানেন। একদিন আমার স্বামী তাঁকে বল্লেন যে, আর্টিষ্টদের যদি গুরুমশায়ের দরকার হয় তবে তুমি বেঁচে থাক্‌তে যোগ্য লোকের অভাব হবে না।

এমন করে খোঁচা দিয়ে কথা বলা আমার স্বামীর স্বভাব নয়, কিন্তু আজকাল তাঁর মেজাজ একটু বদ্‌লে এসেচে—সন্দীপের অহঙ্কারে তিনি ঘা দিতে পারলে ছাড়েন না।

সন্দীপ বল্লেন, তুমি কি ভাব, আর্টিষ্টদের আর গুরুকরণ দরকার নেই?

স্বামী বল্লেন, আর্ট সম্বন্ধে আর্টিষ্টদের কাছ থেকেই আমাদেব মত মানুষকে চিরকাল নতুন নতুন পাঠ নিয়ে চল্‌তে হবে, কেননা এর কোনো একটিমাত্র বাঁধা পাঠ নেই।

সন্দীপ আমার স্বামীর বিনয়কে বিদ্রূপ করে খুব হাস্‌লেন, বল্লেন, নিখিল, তুমি ভাব দৈন্যটাই হচ্চে মূলধন, ওটাকে যত খাটাবে ঐশ্বর্য্য ততই বাড়বে। আমি বল্‌চি, অহঙ্কার যার নেই, সে স্রোতের শ্যাওলা, চারিদিকে কেবল ভেসে ভেসে বেড়ায়।

আমার মনের ভাব অদ্ভুত রকম ছিল। একদিকে ইচ্ছেটা

তর্কে আমার স্বামীর জিত হয়, সন্দীপের অহঙ্কারটা একটু কমে, অথচ সন্দীপের অসঙ্কোচ অহঙ্কারটাই আমাকে টানে—সে যেন দামী হীরের ঝক্‌ঝকানি, কিছুতেই তাকে লজ্জা দেবার জো নেই; এমন কি, সূর্য্যের কাছেও সে হার মানতে চায় না, বরঞ্চ তার স্পর্দ্ধা আরো বেড়ে যায়।

আমি ঘরে ঢুকলুম। জানি আমার পায়ের শব্দ সন্দীপ শুনতে পেলেন কিন্তু যেন শোনেন নি এমনি ভান করে বইটা দেখতেই লাগলেন। আমার ভয়, পাছে আর্টের কথা পেড়ে বসেন। কেননা আর্টের ছুতো করে সন্দীপ আমার সামনে যে-সব ছবির যে-সব কথার আলোচনা করতে ভালোবাসেন আজো আমার তাতে লজ্জা বোধ করার অভ্যাস ঘোচেনি। লজ্জা লুকোবার জন্যেই আমাকে দেখাতে হত যেন এর মধ্যে লজ্জার কিছু নেই।

তাই একবার মুহূর্ত্তকালের জন্যে ভাবছিলুম ফিরে চলে যাই,—এমন সময়ে খুব একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মুখ তুলে সন্দীপ আমাকে দেখে যেন চম্‌কে উঠ্‌লেন। বল্লেন, এই যে আপনি এসেচেন!

কথাটার মধ্যে, কথার সুরে, তাঁর দুই চোখে, একটা চাপা ভৎর্সনা। আমার এমন দশা যে, এই ভৎর্সনাকেও মেনে নিলুম। আমার উপর সন্দীপের যে দাবী জন্মেচে তাতে আমার দু'-তিন দিনের অনুপস্থিতিও যেন অপরাধ। সন্দীপের এই অভিমান যে আমার প্রতি অপমান সে আমি জানি, কিন্তু রাগ করবার শক্তি কই।

কোনো জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলুম। যদিও আমি অন্য-দিকে চেয়ে ছিলুম তবু বেশ বুঝতে পারছিলুম সন্দীপের দুই চক্ষের

নালিশ আমার মুখের সামনে যেন ধন্না দিয়ে পড়েই ছিল, সে আর নড়তে চাচ্ছিল না। এ কি কাণ্ড! সন্দীপ কোনো-একটা কথা তুল্‌লে সেই কথার আড়ালে একটু লুকিয়ে বাঁচি যে! বোধ হয় পাঁচ মিনিট কি দশ মিনিট যখন এমনি করে লজ্জা অসহ্য হয়ে এল তখন আমি বল্লুম, আপনি কি দরকারে আমাকে ডেকেছিলেন?

সন্দীপ ঈষৎ চম্‌কে উঠে বল্লেন, কেন, দরকার কি থাকতেই হবে? বন্ধুত্ব কি অপরাধ? পৃথিবীতে যা সব-চেয়ে বড় তার এতই অনাদর? হৃদয়ের পূজাকে কি পথের কুকুরের মত দরজার বাইরের থেকে খেদিয়ে দিতে হবে, মক্ষিরাণী?

আমার বুকের মধ্যে দুর্‌দুর্‌ করতে লাগল। বিপদ ক্রমশই কাছে ঘনিয়ে আস্‌চে, আর তাকে ঠেকিয়ে রাখা যায় না। আমার মনের মধ্যে পুলক আর ভয় দুইই সমান হয়ে উঠল। এই সর্ব্বনাশের বোঝা আমি আমার পিঠ দিয়ে সামলাব কি করে? আমাকে যে পথের ধূলোর উপর মুখ-থুব্‌ড়ে পড়তে হবে!

আমার হাত পা কাঁপছিল। আমি খুব শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে বল্লুম, সন্দীপবাবু, আপনি দেশের কি কাজ আছে বলে আমাকে ডেকেচেন, তাই আমার ঘরের কাজ ফেলে এসেচি।

তিনি একটু হেসে বল্লেন, আমি ত সেই কথাই আপনাকে বলছিলুম। আমি যে পূজার জন্যেই এসেচি, তা জানেন? আপনার মধ্যে আমি আমার দেশের শক্তিকেই প্রত্যক্ষ দেখতে পাই সে-কথা কি আপনাকে বলিনি? ভূগোলবিবরণ ত একটা সত্য বস্তু নয়—শুধু সেই ম্যাপটার কথা স্মরণ করে কি কেউ জীবন দিতে পারে?

যখন আপনাকে সামনে দেখতে পাই তখনি ত বুঝতে পারি, দেশ কত সুন্দর কত প্রিয়, প্রাণে তেজে কত পরিপূর্ণ! আপনি নিজের হাতে আমার কপালে জয়টীকা পরিয়ে দেবেন তবেই ত জানব আমি আমার দেশের আদেশ পেয়েচি, তবেই ত সেই কথা স্মরণ করে লড়তে লড়তে মৃত্যুবাণ খেয়ে যদি মাটিতে লুটিয়ে পড়ি তবে বুঝব সে কেবলমাত্র ভূগোলবিবরণের মাটি নয়, সে একখানা আঁচল—কেমন আঁচল জানেন? আপনি সেদিন সেই যে একখানি সাড়ি পরেছিলেন, লাল মাটির মত তার রং, আর তার চওড়া পাড় একটি রক্তের ধারার মত রাঙা, সেই সাড়ির আঁচল,—সে কি আমি কোনো দিন ভুলতে পারব? এই সব জিনিষই ত জীবনকে সতেজ, মৃত্যুকে রমণীয় করে তোলে।

বল্‌তে বল্‌তে সন্দীপের দুই চোখ জ্বলে উঠ্‌ল। চোখে সে ক্ষুধার আগুন কি পূজার সে আমি বুঝতে পারলুম না। আমার সেই দিনের কথা মনে পড়ল যেদিন আমি প্রথম ওঁর বক্তৃতা শুনেছিলুম। সেদিন, তিনি অগ্নিশিখা না মানুষ সে আমি ভুলে গিয়েছিলুম। সাধারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করা চলে—তার অনেক কায়দাকানুন আছে; কিন্তু আগুন যে আরেক জাতের, সে এক-নিমেষে চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়, প্রলয়কে সুন্দর করে তোলে। মনে হতে থাকে, যে-সত্য প্রতিদিনের শুক্‌নো কাঠে হেলাফেলার মধ্যে লুকিয়ে ছিল, সে আজ আপনার দীপ্যমান মূর্ত্তি ধরে চারিদিকের সমস্ত কৃপণের সঞ্চয়গুলোকে অট্টহাস্যে দগ্ধ করতে ছুটে চলেচে।

এর পরে আমার কিছু বলবার শক্তি ছিল না। আমার ভয়

হ'তে লাগল এখনি সন্দীপ ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরবেন। কেননা তাঁর হাত চঞ্চল আগুনের শিখার মতই কাঁপছিল, আর তাঁর চোখের দৃষ্টি আমার উপর যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গের মত এসে পড়ছিল।

সন্দীপ বলে উঠলেন, আপনারা সব ছোটো ছোটো ঘোরো নিয়মকেই কি বড় করে তুল্‌বেন? আপনাদের এমন প্রাণ আছে যার একটু আভাসেই আমরা জীবন-মরণকে তুচ্ছ করতে পারি সে কি কেবল অন্দরের ঘোম্‌টা-মোড়া জিনিস? আজ আর লজ্জা করবেন না, লোকের কানা-ঘুষায় কান দেবেন না, আজ বিধি-নিষেধে তুড়ি মেরে মুক্তির মাঝখানে ছুটে বেরিয়ে আসুন।

এমনি করে সন্দীপবাবুর কথায় দেশের স্তবের সঙ্গে যখন আমার স্তব মিশিয়ে যায়—তখন সঙ্কোচের বাঁধন আর টেঁকে না, তখন রক্তের মধ্যে নাচন ধরে। যত দিন আর্ট আর বৈষ্ণব কবিতা, আর স্ত্রীপুরুষের সম্বন্ধ নির্ণয়, আর বাস্তব অবাস্তবের বিচার চল্‌ছিল ততদিন আমার মন গ্লানিতে কালো হয়ে উঠছিল। আজ সেই অঙ্গারের কালিমায় আবার আগুন ধরে উঠল—সেই দীপ্তিই আমার লজ্জা নিবারণ করলে। মনে হতে লাগল আমি যে রমণী সেটা যেন আমার একটা অপরূপ দৈবী মহিমা।

হায়রে, আমার সেই মহিমা আমার চুলের ভিতর দিয়ে এখনি কেন একটা প্রত্যক্ষ দীপ্তির মত বেরয় না? আমার মুখ দিয়ে এমন কোনো একটা কথা উঠচে না কেন যা মন্ত্রের মত এখনি সমস্ত দেশকে অগ্নিদীক্ষায় দীক্ষিত করে দেয়?

এমন সময়ে হাউ-মাউ করে কাঁদতে কাঁদতে আমার ঘরে

ক্ষেমা দাসী এসে উপস্থিত। সে বলে, আমার মাইনে চুকিয়ে দাও, আমি চলে যাই, আমি সাতজন্মে এমন—হাউ হাউ হাউ হাউ!

কি? ব্যাপারটা কি?

মেজোরাণীমার দাসী থাকো অকারণে গায়ে পড়ে ক্ষেমার সঙ্গে ঝগড়া করেচে—তাকে যা মুখে আসে তাই বলে গাল দিয়েচে।

আমি যত বলি, আচ্ছা সে আমি বিচার করব—কিছুতেই ক্ষেমার কান্না আর থামে না।

সকাল বেলায় দীপক রাগিণীর যে সুর এমন জমে উঠেছিল তার উপরে যেন বাসন-মাজার জল ঢেলে দিলে। মেয়েমানুষ যে পদ্মবনের পঙ্কজ তার তলাকার পঙ্ক ঘুলিয়ে উঠল। সেটাকে সন্দীপের কাছে তাড়াতাড়ি চাপা দেবার জন্যে আমাকে তখনি অন্তঃপুরে ছুট্‌তে হল। দেখি আমার মেজো জা সেই বারান্দায় বসে এক-মনে মাথা নীচু করে সুপুরি কাটচেন,—মুখে একটু হাসি লেগে আছে, গুন্ গুন্ করে গান করচেন, "রাই আমার চলে যেতে ঢলে পড়ে,"—ইতিমধ্যে কোথাও যে কিছু অনর্থপাত হয়েছে তার কোনো লক্ষণ তাঁর কোনোখানেই নেই।

আমি বল্লুম, মেজোরাণী তোমার থাকো ক্ষেমাকে এমন মিছি-মিছি গাল দেয় কেন?

তিনি ভুরু তুলে আশ্চর্য্য হয়ে বল্লেন, ওমা, সত্যি নাকি? মাগীকে ঝাঁটাপেটা করে দূর করে দেব। দেখ দেখি এই সকাল বেলায় তোমার বৈঠকখানার আসর মাটি করে দিলে! ক্ষেমারও আচ্ছা আক্কেল দেখচি, জানে তার মনিব বাইরের বাবুর সঙ্গে

একটু গল্প করচে—একেবারে সেখানে গিয়ে উপস্থিত—লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে বসেচে। তা ছোটরাণী, এ সব ঘরকন্নার কথায় তুমি থেকো না, তুমি বাইরে যাও, আমি যেমন করে পারি সব মিটিয়ে দিচ্চি।

আশ্চর্য্য মানুষের মন! এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তার পালে এমন উল্টো হাওয়া লাগে! এই সকাল বেলায় ঘরকন্না ফেলে বাইরে সন্দীপের সঙ্গে বৈঠকখানায় আলাপ আলোচনা করতে যাওয়া, আমার চিরকালের অন্তঃপুরের অভ্যস্ত আদর্শে এমনি সৃষ্টি-ছাড়া বলে মনে হল যে, আমি কোনো উত্তর না দিয়ে ঘরে চলে গেলুম।

নিশ্চয় জানি ঠিক সময় বুঝে মেজোরাণী নিজে থাকোকে টিপে দিয়ে ক্ষেমার সঙ্গে ঝগড়া করিয়েচেন। কিন্তু আমি এমনি টল্‌মলে জায়গায় আছি যে এসব নিয়ে কোনো কথাই কইতে পারিনে। এই ত সেদিন নন্‌কু দরোয়ানকে ছাড়িয়ে দেবার জন্যে প্রথম ঝাঁজে আমার স্বামীর সঙ্গে যে রকম উদ্ধতভাবে ঝগড়া করেছিলুম শেষ পর্য্যন্ত তা টিঁক্‌ল না। দেখ্‌তে দেখ্‌তে নিজের উত্তেজনাতেই নিজের মধ্যে একটা লজ্জা এল। এর মধ্যে আবার মেজোরাণী এসে আমার স্বামীকে বল্লেন, ঠাকুরপো, আমারি অপরাধ। দেখ ভাই আমরা সেকেলে লোক, তোমার ঐ সন্দীপবাবুর চালচলন কিছুতেই ভালো ঠেকে না—সেই জন্যে ভালো মনে করেই আমি দরোয়ানকে—তা এতে যে ছোটোরাণীর অপমান হবে এ কথা মনেও করিনি, বরঞ্চ ভেবেছিলুম উল্টো! হায়রে পোড়া কপাল, আমার যেমন বুদ্ধি!

এমনি করে দেশের দিক থেকে পূজার দিক থেকে যে কথাটাকে

এত উজ্জ্বল করে দেখি সেইটেই যখন নীচের দিক থেকে এমন করে ঘুলিয়ে উঠতে থাকে তখন প্রথমটা হয় রাগ, তার পরেই মনে গ্লানি আসে।

আজ শোবার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে জানলার কাছে বসে বসে ভাবতে লাগ্‌লুম, চারদিকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে জীবনটা আসলে কতই সরল হতে পারে! ঐ যে মেজোরাণী নিশ্চিন্ত মনে বারান্দায় বসে সুপুরি কাট্‌চেন ঐ সহজ আসনে বসে সহজ কাজের ধারা আমার কাছে আজ অমন দুর্গম হয়ে উঠল! রোজ রোজ নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, এর শেষ কোন্‌খানে? আমি কি মরে যাব, সন্দীপ কি চলে যাবে, এ সমস্তই কি রোগীর প্রলাপের মত সুস্থ হয়ে উঠে একেবারে ভুলে যাব—না ঘাড়মোড় ভেঙে এমন সর্ব্বনাশের তলায় তলিয়ে যাব যেখান থেকে ইহজীবনে আমার আর উদ্ধার নেই? জীবনের সৌভাগ্যকে সরলভাবে গ্রহণ করতে পারলুম না—এমন করে ছারখার করে দিলুম কি করে?

আমার এই শোবার ঘর, যে ঘরে আজ ন বৎসর আগে নতুন বৌ হয়ে পা দিয়েছিলুম, সেই ঘরের সমস্ত দেয়াল ছাদ মেজে আজ আমার মুখের দিকে চেয়ে আজ অবাক্ হয়ে আছে। এম্ এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আমার স্বামী কলকাতা থেকে ভারতসাগরের কোন্ এক দ্বীপের অনেক দামী এই পর-গাছাটি কিনে এনেছিলেন। এই ক'টি মাত্র পাতা, কিন্তু তাতে লম্বা যে একটি ফুলের গুচ্ছ ফুটেছিল সে যেন সৌন্দর্য্যের কোন্ পেয়ালা একেবারে উপুড় করে ঢেলে দেওয়া, ইন্দ্রধনু যেন ঐ ক'টি পাতার কোলে ফুল হয়ে জন্ম নিয়ে দোল খাচ্চে। সেই ফুটন্ত পরগাছাটিকে আমরা

দুজনে মিলে আমাদের শোবার ঘরের এই জানলার কাছে টাঙিয়ে রেখেচি। সেই একবার ফুল হয়েছিল, আর হয়নি, আশা আছে আবার আর একদিন ফুল ফুটবে। আশ্চর্য্য এই যে, অভ্যাসমত আজো এই গাছে আমি রোজ জল দিচ্চি, আশ্চর্য্য এই যে, সেই নারকেল দড়ি দিয়ে পাকে পাকে আঁট করে বাঁধা এই পাতা-কয়টির বাঁধন আল্‌গা হ'ল না—তার পাতাগুলি আজো সবুজ আছে।

আজ চার বছর হল আমার স্বামীর একটি ছবি হাতির দাঁতের ফ্রেমে বাঁধিয়ে ঐ কুলুঙ্গির মধ্যে রেখে দিয়েছিলুম। ওর দিকে দৈবাৎ যখন আমার চোখ পড়ে আর চোখ তুল্‌তে পারিনে। আজ ছ'দিন আগেও রোজ সকালে স্নানের পর ফুল তুলে ঐ ছবির সামনে রেখে প্রণাম করেচি। কতদিন এই নিয়ে স্বামীর সঙ্গে আমার তর্ক হয়ে গেছে।

একদিন তিনি বল্‌লেন, তুমি যে আমাকে আমার চেয়ে বড় করে তুলে পূজো কর এতে আমার বড় লজ্জা বোধ হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেন তোমার লজ্জা ?

স্বামী বল্লেন, শুধু লজ্জা নয় ঈর্ষা।

আমি বল্লুম, শোনো একবার কথা ? তোমার আবার ঈর্ষা কাকে ?

স্বামী বল্লেন, ঐ মিথ্যে আমিটাকে। এর থেকে বুঝতে পারি এই সামান্য আমাকে নিয়ে তোমার সন্তোষ নেই, তুমি এমন অসামান্য কাউকে চাও যে তোমার বুদ্ধিকে অভিভূত করে দেবে আরেকটা আমাকে তুমি মন দিয়ে গড়ে তোমার মন ভোলাচ্চ।

আমি বল্লুম, তোমার এই কথাগুলো শুন্‌লে আমার রাগ হয়।

তিনি বল্লেন, রাগ আমার উপরে করে কি হবে, তোমার অদৃষ্টের উপরে কর। তুমি ত আমাকে স্বয়ম্বরসভায় বেছে নাওনি, যেমনটি পেয়েচ তেমনি তোমাকে চোখ বুজে নিতে হয়েচে—কাজেই দেবত্ব দিয়ে আমাকে যতটা পার সংশোধন করে নিচ্চ। দময়ন্তী স্বয়ম্বরা হয়েছিলেন বলেই দেবতাকে বাদ দিয়ে মানুষকে নিতে পেরেছিলেন, তোমরা স্বয়ম্বরা হতে পারনি বলেই রোজ মানুষকে বাদ দিয়ে দেবতার গলায় মালা দিচ্চ।

সেদিন এই কথাটা নিয়ে এত রাগ করেছিলুম যে আমার চোখ দিয়ে জল পড়ে গিয়েছিল। তাই মনে করে আজ ঐ কুলুঙ্গিটার দিকে চোখ তুল্‌তে পারিনে।

ঐ যে আমার গয়নার বাক্সের মধ্যে আর-এক ছবি আছে। সেদিন বাইরের বৈঠকখানা ঘর ঝাড়পোঁচ করবার উপলক্ষ্যে সেই ফোটোষ্ট্যাণ্ডখানা তুলে এনেচি, সেই যার মধ্যে আমার স্বামীর ছবির পাশে সন্দীপের ছবি আছে। সে ছবি ত পূজো করিনে, তাকে প্রণাম করা চলে না—সে রইল আমার হীরে মাণিক মুক্তোর মধ্যে ঢাকা। সে লুকোনো রইল বলেই তার মধ্যে এত পুলক! ঘরে সব দরজা বন্ধ করে তবে তাকে খুলে দেখি। রাত্রে আস্তে আস্তে কেরোসিনের বাতিটা উস্কে তুলে তার সাম্‌নে ঐ ছবিটা ধরে চুপ করে চেয়ে বসে থাকি। তার পরে রোজই মনে করি এই কেরোসিনের শিখায় ওকে পুড়িয়ে ছাই করে চিরদিনের মত চুকিয়ে ফেলে দিই—আবার রোজই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে আমার হীরে মাণিক মুক্তোর নীচে তাকে চাপা দিয়ে চাবি বন্ধ করে রাখি। কিন্তু, পোড়ারমুখী, এই

হীরে মাণিক মুক্তো তোকে দিয়েছিল কে? এর মধ্যে কত দিনের কত আদর জড়িয়ে আছে! তারা আজ কোথায় মুখ লুকোবে? মরণ হলে যে বাঁচি!

সন্দীপ একদিন আমাকে বলেছিলেন, দ্বিধা করাটা মেয়েদের প্রকৃতি নয়। তার ডাইনে বাঁয়ে নেই, তার একমাত্র আছে সাম্‌নে তিনি বারবার বলেন, দেশের মেয়েরা যখন জাগবে তখন তারা পুরুষের চেয়ে ঢের বেশি স্পষ্ট করে বল্‌বে, "আমরা চাই", —সেই চাওয়ার কাছে কোনো ভালো মন্দ কোনো সম্ভব অসম্ভবের তর্ক বিতর্ক টিঁক্‌তে পারবে না।—তাদের কেবল এক কথা, "আমরা চাই!" আমি চাই, এই বাণীই হচ্চে সৃষ্টির মূল বাণী—সেই বাণীই কোনো শাস্ত্র বিচার না করে আগুন হয়ে সূর্য্যে তারায় জ্বলে উঠেচে।—ভয়ঙ্কর তার প্রণয়ের পক্ষপাত—মানুষকে সে কামনা করেচে বলেই যুগ যুগান্তরের লক্ষ লক্ষ প্রাণীকে তার সেই কামনার কাছে বলি দিতে দিতে এসেচে। সৃজন প্রলয়ের সেই ভয়ঙ্করী "আমি চাই" বাণী আজ মেয়েদের মধ্যেই মূর্ত্তিমতী। সেই জন্যেই ভীরু পুরুষ সৃজনের সেই আদিম বন্যাকে বাঁধ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখবার চেষ্টা করচে পাছে সে তাদের কুম্‌ড়ো ক্ষেতের মাচাগুলোকে অট্টকলহাস্যে ভাসিয়ে দিয়ে নাচতে নাচতে চলে যায়। পুরুষ মনে করে আছে এই বাঁধকে সে চিরকালের মত পাকা করে বেঁধে রেখেচে। জম্‌চে, জল জম্‌চে, —হ্রদের জলরাশি আজ শান্ত গম্ভীর, আজ সে চলেও না, আজ সে বলেও না, পুরুষের রান্নাঘরের জলের জালা নিঃশব্দে ভর্ত্তি করে। কিন্তু চাপ আর সইবে না, বাঁধ ভাঙবে,—তখন এতদিনের

বোবা শক্তি "আমি চাই" "আমি চাই" বলে গর্জ্জন কর্‌তে কর্‌তে ছুট্‌বে।

সন্দীপের এই কথা আমার মনের মধ্যে যেন ডমরু বাজাতে থাকে। তাই আমার আপনার সঙ্গে যখন আপনার বিরোধ বাধে, যখন লজ্জা আমাকে ধিক্কার দিতে থাকে তখন সন্দীপের কথা আমার মনে আসে। তখন বুঝতে পারি আমার এ লজ্জা কেবল লোকলজ্জা—সে আমার মেজো জায়ের মূর্ত্তি ধরে বাইরে বসে বসে সুপুরি কাট্‌তে কাট্‌তে কটাক্ষপাত করচে। তাকে আমি কিসের গ্রাহ্য করি! "আমি চাই" এই কথাটাকেই নিঃসঙ্কোচে অবাধে অন্তরে বাহিরে সমস্ত শক্তি দিয়ে বল্‌তে পারাই হচ্চে আপনার পূর্ণ প্রকাশ—না বল্‌তে পারাই হচ্চে ব্যর্থতা। কিসের ঐ পরগাছা, কিসের ঐ কুলুঙ্গি—আমার এই উদ্দীপ্ত আমিকে ব্যঙ্গ করে অপমান করে এমন সাধ্য ওদের কী আছে!

এই বলে তখনি ইচ্ছে হল, ঐ পরগাছাটাকে জানলার বাইরে ফেলে দিই—ছবিটাকে কুলুঙ্গি থেকে নামিয়ে আনি—প্রলয় শক্তির লজ্জাহীন উলঙ্গতা প্রকাশ হোক্। হাত উঠেছিল কিন্তু বুকের মধ্যে বিঁধল, চোখে জল এল—মেজের উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম। কি হবে, আমার কি হবে! আমার কপালে কি আছে!

সন্দীপের কথা

আমি নিজের লেখা আত্মকাহিনী যখন পড়ে দেখি তখন ভাবি, এই কি সন্দীপ? আমি কি কথা দিয়ে তৈরি? আমি কি রক্তমাংসের মলাটে মোড়া একখানা বই?

পৃথিবী চাঁদের মত মরা জিনিষ নয়, সে নিশ্বাস ফেল্‌চে, তার সমস্ত নদী সমুদ্র থেকে বাষ্প উঠচে,—সেই বাষ্পে সে ঘেরা, তার চতুর্দ্দিকে ধূলো উড়চে, সেই ধূলোর ওড়নায় সে ঢাকা। বাইরে থেকে যে দর্শক এই পৃথিবীকে দেখবে, এই বাষ্প আর ধূলোর উপর থেকে প্রতিফলিত আলোই কেবল সে দেখতে পাবে। সে কি এর দেশ মহাদেশের স্পষ্ট সন্ধান পাবে ?

এই পৃথিবীর মত যে মানুষ সজীব তার অন্তর থেকে কেবলি আইডিয়ার নিশ্বাস উঠচে, এই জন্যে বাষ্পে সে অস্পষ্ট ; যেখানে তার ভিতরের জলস্থল, যেখানে সে বিচিত্র, সেখানে তাকে দেখা যায় না,—মনে হয় সে যেন আলো-ছায়ার একটা মণ্ডল।

আমার বোধ হচ্চে যেন সজীব গ্রহের মত আমি আমার সেই আইডিয়ার মণ্ডলটাকেই আঁক্‌চি। কিন্তু আমি যা চাই, যা ভাবি, যা সিদ্ধান্ত করচি আমি যে আগাগোড়া কেবল তাইই, তা ত নয়,—আমি যা ভালোবাসিনে যা ইচ্ছে করিনে আমি যে তাও। আমার জন্মাবার আগেই যে আমার সৃষ্টি হয়ে গেছে—আমি ত নিজেকে বেছে নিতে পারিনি, হাতে যা পেয়েচি তাকে নিয়েই কাজ চালাতে হচ্চে।

এ কথা আমি বেশ জানি, যে বড় সে নিষ্ঠুর। সর্ব্বসাধারণের জন্যে ন্যায় আর অসাধারণের জন্যে অন্যায়। মাটির তলাটা আগাগোড়া সমান, আগ্নেয় পর্ব্বত তাকে আগুনের শিঙের ভয়ঙ্কর গুঁতো মেরে তবে উঁচু হয়ে ওঠে। সে চারদিকের প্রতি ন্যায় বিচার করে না, তার বিচার নিজের প্রতিই। সফল অন্যায়পরতা এবং অকৃত্রিম নিষ্ঠুরতার জোরেই মানুষ বল জাত বল এ পর্য্যন্ত

লক্ষপতি মহীপতি হয়ে উঠেচে। ১-কে দিব্যি চোখ বুজে গিলে খেয়ে তবেই ২ দুই হয়ে উঠতে পারে—নইলে ১-এর সমতল লাইন একটানা হয়ে চল্‌ত।

আমি তাই অন্যায়ের তপস্যাকেই প্রচার করি। আমি সকলকে বলি, অন্যায়ই মোক্ষ,—অন্যায়ই বহ্নিশিখা; সে যখনি দগ্ধ না করে তখনি ছাই হয়ে যায়। যখনি কোনো জাত বা মানুষ অন্যায় করতে অক্ষম হয় তখনি পৃথিবীর ভাঙা কুলোয় তার গতি।

কিন্তু তবু এ আমার আইডিয়া, এ পূরোপূরি আমি নয়। যতই অন্যায়ের বড়াই করি না কেন, আইডিয়ার উড়্‌নির মধ্যে ফুটো আছে, ফাঁক আছে, তার ভিতর থেকে একটা জিনিস বেরিয়ে পড়ে সে নেহাৎ কাঁচা অতি নরম। তার কারণ, আমার অধিকাংশ আমার পূর্ব্বেই তৈরি হয়ে গেছে।

আমার চ্যালাদের নিয়ে আমি মাঝে মাঝে নিষ্ঠুরের পরীক্ষা করি। একদিন বাগানে চড়িভাতি কর্‌তে গিয়েছিলুম্‌। একটা ছাগল চরে বেড়াচ্ছিল, আমি সবাইকে বল্লুম, কে ওর পিছনের একখানা পা এই দা দিয়ে কেটে আন্‌তে পারে? সকলেই যখন ইতস্ততঃ করছিল আমি নিজে গিয়ে কেটে নিয়ে এলুম। আমাদের দলের মধ্যে সকলের চেয়ে যে লোক নিষ্ঠুর সে এই দৃশ্য দেখে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেল। আমার শান্ত অবিচলিত মুখ দেখে সকলেই নির্ব্বিকার মহাপুরুষ বলে আমার পায়ের ধূলো নিলে। অর্থাৎ সেদিন সকলেই আমার আইডিয়ার বাষ্পমণ্ডলটাই দেখলে; কিন্তু যেখানে আমি, নিজের দোষে না ভাগ্যদোষে,

দুর্ব্বল সকরুণ, যেখানে ভিতরে ভিতরে বুক ফাটছিল সেখানে আমাকে ঢাকা দেওয়াই ভালো।

বিমল-নিখিলকে নিয়ে আমার জীবনের এই যে একটা অধ্যায় জমে উঠচে এর ভিতরেও অনেকটা কথা ঢাকা পড়চে। ঢাকা পড়ত না যদি আমার মধ্যে আইডিয়ার কোনো বালাই না থাক্‌ত। আমার আইডিয়া আমার জীবনটাকে নিয়ে আপনার মৎলবে গড়চে কিন্তু সেই মৎলবের বাইরেও অনেকখানি জীবন বাকি পড়ে থাক্‌চে—সেইটের সঙ্গে আমার মৎলবের সঙ্গে সম্পূর্ণ মিল থাকে না—এই জন্যে তাকে চেপে চুপে ঢেকে ঢুকে রাখতে চাই—নইলে সমস্তটাকে সে মাটি করে দেয়।

প্রাণ জিনিষটা অস্পষ্ট, সে যে কত বিরুদ্ধতার সমষ্টি তার ঠিক নেই। আমরা আইডিয়াওয়ালা মানুষ তাকে একটা বিশেষ ছাঁচে ঢেলে একটা কোনো বিশেষ আকারে সুস্পষ্ট করে জান্‌তে চাই—সেই জীবনের সুস্পষ্টতাই জীবনের সফলতা। দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর থেকে সুরু করে আজকের দিনের আমেরিকার ক্রোড়পতি রকেফেলার পর্য্যন্ত সকলেই নিজেকে তলোয়ারের কিম্বা টাকার বিশেষ একটা ছাঁচে ঢেলে জমিয়ে দেখতে পেরেচে বলেই নিজেকে সফল করে জেনেচে।

এইখানেই আমাদের নিখিলের সঙ্গে আমার তর্ক বাধে। আমিও বলি আপনাকে জানো, সেও বলে আপনাকে জানো। কিন্তু সে যা বলে তাতে দাঁড়ায় এই আপনাকে না জানাটাই হচ্চে জানা। সে বলে, তুমি যা'কে ফল পাওয়া বল, সে হচ্চে আপনাকে বাদ দিয়ে ফলটুকুকে পাওয়া। ফলের চেয়ে আত্মা বড়।

আমি বল্লুম, কথাটা নেহাৎ ঝাপসা হল।

নিখিল বল্লে, উপায় নেই। প্রাণটা কলের চেয়ে অস্পষ্ট, তাই বলে' প্রাণটাকে কল বলে' সোজা করে' জান্‌লেই যে প্রাণটাকে জানা হয় তা নয়। তেমনি আত্মা ফলের চেয়ে অস্পষ্ট তাই আত্মাকে ফলের মধ্যে চরম করে দেখাই যে আত্মাকে সত্য দেখা তা বল্‌ব না।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, তবে তুমি কোথায় আত্মাকে দেখচ? কোন্ নাকের ডগায়, কোন্ ভ্রূর মাঝখানে?

সে বল্লে, আত্মা যেখানে আপনাকে অসীম জান্‌চে, যেখানে ফলকে ছেড়ে এবং ছাড়িয়ে চলে যাচ্চে।

তাহলে নিজের দেশ সম্বন্ধে কি বল্‌বে?

ঐ একই কথা। দেশ যেখানে বলে, আমি আমাকেই লক্ষ্য করব, সেখানে সে ফল পেতে পারে কিন্তু আত্মাকে হারায়— যেখানে সকলের চেয়ে বড়কে সকলের বড় করে' দেখে সেখানে সকল ফলকেই সে খোয়াতে পারে কিন্তু আপনাকে সে পায়।

ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত কোথায় দেখেচ?

মানুষ এত বড় যে, সে যেমন ফলকে অবজ্ঞা করতে পারে তেমনি দৃষ্টান্তকেও। দৃষ্টান্ত হয় ত নেই—বীজের ভিতরে ফুলের দৃষ্টান্ত যেমন নেই; কিন্তু বীজের ভিতরে ফুলের বেদনা আছে। তবু, দৃষ্টান্ত কি একেবারেই নেই? বুদ্ধ বহু শতাব্দী ধরে যে সাধনায় সমস্ত ভারতবর্ষকে জাগিয়ে রেখেছিলেন, সে কি ফলের সাধনা?

নিখিলের কথা আমি যে একেবারেই বুঝতে পারিনে তা

নয়। কিন্তু সেইটিই হল আমার মুস্কিল। ভারতবর্ষে আমার জন্ম —সাত্বিকতার বিষ রক্তের মধ্যে থেকে একেবারে মরতে চায় না। আপনাকে বঞ্চিত করার পথে চলা যে পাগলামি এ কথা মুখে যতই বলি এটাকে একেবারে উড়িয়ে দেবার সাধ্য নেই। এই জন্যেই আমাদের দেশে আজকাল অদ্ভুত ব্যাপার চল্‌চে। ধর্ম্মের ধূয়ো দেশের ধূয়ো দুটিকেই পুরো দমে এক সঙ্গে চালাচ্চি—ভগবদ্গীতা এবং বন্দেমাতরং আমাদের দুইই চাই—তাতে দুটোর কোনোটাই যে স্পষ্ট হতে পারচে না, তাতে এক সঙ্গেই গড়ের বাদ্য এবং সানাই বাজানো চলচে, এ আমরা বুঝচিনে। আমার জীবনের কাজ হচ্চে এই বেসুরো গোলমালটাকে থামানো, আমি গড়ের বাদ্যটাকেই বাহাল রাখবো—সানাই আমাদের সর্ব্বনাশ করেচে। প্রবৃত্তির যে জয়পতাকা আমাদের হাতে দিয়ে মা প্রকৃতি, মা শক্তি, মা মহামায়া রণক্ষেত্রে আমাদের পাঠিয়েচেন তাকে আমরা লজ্জা দেব না। প্রবৃত্তিই সুন্দর, প্রবৃত্তিই নির্ম্মল, যেমন নির্ম্মল ভুঁইচাঁপা ফুল, যে কথায় কথায় স্নানের ঘরে ভিনোলিয়া সাবান মাখতে ছোটে না।

একটা প্রশ্ন ক'দিন ধরে মাথায় ঘুরচে, কেন বিমলের সঙ্গে জীবনটাকে জড়িয়ে ফেল্‌তে দিচ্চি? আমার জীবনটা ত ভেসে-যাওয়া কলার ভেলা নয় যে যেখানে-সেখানে ঠেক্‌তে ঠেক্‌তে চল্‌বে।

সেই কথাই ত বল্‌ছিলুম, যে-একটিমাত্র আইডিয়ার ছাঁচে জীবনটাকে পরিমিত করতে চাই জীবন তাকে ছাপিয়ে যায়। থেকে থেকে মানুষ ছিট্‌কে ছিট্‌কে পড়ে। এবারে আমি যেন বেশী দূরে ছিট্‌কে পড়েছি।

বিমল যে আমার কামনার বিষয় হয়ে উঠেচে সেজন্যে আমার কোনো মিথ্যে লজ্জা নেই। আমি যে স্পষ্ট দেখচি ও আমাকে চায়—ওই ত আমার স্বকীয়া। গাছে ফল বোঁটায় ঝুলে আছে—সেই বোঁটার দাবীকেই চিরকালের বলে মান্‌তে হবে না কি? ওর যত রস যত মাধুর্য্য সে যে আমার হাতে সম্পূর্ণ খসে পড়বার জন্যেই—সেইখানেই একেবারে আপনাকে ছেড়ে দেওয়াই ওর সার্থকতা,—সেই ওর ধর্ম্ম, ওর নীতি। আমি সেইখানেই ওকে পেড়ে আনব, ওকে ব্যর্থ হতে দেব না।

কিন্তু আমার ভাবনা এই যে, আমি জড়িয়ে পড়চি, মনে হচ্চে আমার জীবনে বিমল বিষম একটা দায় হয়ে উঠবে। আমি পৃথিবীতে এসেচি কর্ত্তৃত্ব করতে—আমি লোককে চালনা করব কথায় এবং কাজে,—সেই লোকের ভিড়ই আমার যুদ্ধের ঘোড়া, আমার আসন তার পিঠের উপরে, তার রাশ আমার হাতে, তার লক্ষ্য সে জানেনা শুধু আমিই জানি, কাঁটায় তার পায়ে রক্ত পড়বে কাদায় তার গা ভরে যাবে, তাকে বিচার করতে দেব না তাকে ছোটাব।

সেই আমার ঘোড়া আজ দরজায় দাঁড়িয়ে অস্থির হয়ে খুর দিয়ে মাটি খুঁড়চে, তার হ্রেষাধ্বনিতে সমস্ত আকাশ আজ কেঁপে উঠল, কিন্তু আমি করচি কি? দিনের পর দিন আমার কি নিয়ে কাটুচে? ওদিকে আমার এমন শুভদিন যে বয়ে গেল?

আমার ধারণা ছিল আমি ঝড়ের মত ছুটে চলতে পারি—ফুল ছিঁড়ে আমি মাটিতে ফেলে দিই কিন্তু তাতে আমার চলার ব্যাঘাত

করে না। কিন্তু এবার যে আমি ফুলের চারদিকে ফিরে ফিরে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চি ভ্রমরেরই মত; ঝড়ের মত নয়।

তাইত বলি, নিজের আইডিয়া দিয়ে নিজেকে যে রঙে আঁকি সব জায়গায় সে রং ত পাকা হয়ে ধরে না, হঠাৎ দেখতে পাই সেই সামান্য মানুষটাকে। কোন-এক অন্তর্যামী যদি আমার জীবন-বৃত্তান্ত লিখতেন তাহলে নিশ্চয় দেখা যেত আমার সঙ্গে আর ঐ পাঁচুর সঙ্গে বেশি তফাৎ নেই—এমন কি, ঐ নিখিলেশের সঙ্গে। কাল রাত্রে আমার আত্মকাহিনীর খাতাটা নিয়ে খুলে পড়-ছিলুম। তখন সবে বি, এ, পাশ করেচি, ফিলজফিতে মগজ ফেটে পড়চে বল্লেই হয়। তখন থেকেই পণ করেছিলুম নিজের হাতে বা পরের হাতে গড়া কোনো মায়াকেই জীবনের মধ্যে স্থান দেব না—জীবনটাকে আগাগোড়া একেবারে নিরেট বাস্তব করে তুল্‌ব। কিন্তু তার পর থেকে আজ পর্য্যন্ত সমস্ত জীবনকাহিনীটাকে কি দেখচি? কোথায় সেই ঠাস্ বুনোনি? এ যে জালের মত—সূত্র বরাবর চলেচে—কিন্তু সূত্র যতখানি, ফাঁক তার চেয়ে বেশী বই কম নয়। এই ফাঁকাটার সঙ্গে লড়াই করে করে এ'কে সম্পূর্ণ হার মানানো গেল না। কিছুদিন বেশ একটু নিশ্চিন্ত হয়ে জোরের সঙ্গেই চল্‌ছিলুম—আজ দেখি আবার একটা মস্ত ফাঁক।

আজ দেখি মনের মধ্যে ব্যথা লাগচে। "আমি চাই; হাতের কাছে এসেচে; ছিঁড়ে নেব"—এ হল খুব স্পষ্ট কথা, খুব সংক্ষেপ রাস্তা,—এই রাস্তায় যারা জোরের সঙ্গে চল্‌তে পারে তারাই সিদ্ধিলাভ করে এই কথা আমি চিরদিন বলে আসচি। কিন্তু ইন্দ্রদেব এই তপস্যাকে সহজ করতে দিলেন না, তিনি কোথা

থেকে বেদনার অপ্সরীকে পাঠিয়ে দিয়ে সাধকের দৃষ্টিকে বাষ্পজালে অস্পষ্ট করে দেন।

দেখচি বিমলা জালে-পড়া হরিণীর মত ছট্‌ফট্‌ করচে, তার বড় বড় দুই চোখে কত ভয় কত করুণা, জোর করে বাঁধন ছিঁড়তে গিয়ে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত—ব্যাধ ত এই দেখে খুসী হয়। আমার খুসী আছে কিন্তু ব্যথাও আছে। সেইজন্যে কেবলি দেরি হয়ে যাচ্চে—তেমন জোরে ফাঁস কষতে পারচিনে।

আমি জানি দু'বার-তিনবার এমন এক-একটা মুহূর্ত্ত এসেচে যখন আমি ছুটে গিয়ে বিমলার হাত চেপে ধরে তাকে আমার বুকের উপর টেনে আনলে সে একটি কথা বল্‌তে পারত না,—সেও বুঝতে পারছিল এখনি একটা কি ঘট্‌তে যাচ্চে যার পর থেকে জগৎসংসারের সমস্ত তাৎপর্য্য একেবারে বদ্‌লে যাবে;—সেই পরম অনিশ্চিতের গুহার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে তার মুখ ফ্যাকাশে তার দুই চক্ষে ভয় অথচ উদ্দীপনার দীপ্তি; এই সময়টুকুর মধ্যে একটা কিছু স্থির হয়ে যাবে তারি জন্যে সমস্ত আকাশ-পাতাল নিঃশ্বাস রোধ করে যেন থম্‌কে দাঁড়িয়ে; কিন্তু সেই মুহূর্ত্তগুলিকে বয়ে যেতে দিয়েচি—নিঃসঙ্কোচ বলের সঙ্গে নিশ্চিতপ্রায়কে এক নিমেষে নিশ্চিত হয়ে উঠতে দিই নি। এর থেকে বুঝতে পারচি এতদিন যে সব বাধা আমার প্রকৃতির মধ্যে লুকিয়ে ছিল তারা আজ আমার রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়েচে।

যে রাবণকে আমি রামায়ণের প্রধান নায়ক বলে শ্রদ্ধা করি সেও এমনি করেই মরেছিল। সীতাকে আপনার অন্তঃপুরে না এনে সে অশোক বনে রেখেছিল—অতবড় বীরের অন্তরের মধ্যে

ঐ এক জায়গায় একটু যে কাঁচা সঙ্কোচ ছিল তারই জন্যে সমস্ত লঙ্কাকাণ্ডটা একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেল। এই সঙ্কোচটুকু না থাক্‌লে সীতা আপন সতী নাম ঘুচিয়ে রাবণকে পূজো করত। এই রকমেরই একটু সঙ্কোচ ছিল বলেই, যে-বিভীষণকে তার মারা উচিত ছিল, তাকে রাবণ চিরদিন দয়া এবং অবজ্ঞা করলে, আর ম'ল নিজে।

জীবনের ট্রাজেডি এইখানেই। সে ছোট হয়ে হৃদয়ের এক তলায় লুকিয়ে থাকে তার পরে বড়কে এক মুহূর্ত্তে কাৎ করে দেয়। মানুষ আপনাকে যা বলে জানে মানুষ তা নয়, সেইজন্যেই এত অঘটন ঘটে।

নিখিল যে এমন অদ্ভুত—তাকে দেখে' যে এত হাসি, তবু ভিতরে ভিতরে এও কিছুতে অস্বীকার করতে পারিনে যে, সে আমার বন্ধু। প্রথমটা তার কথা বেশি কিছু ভাবিনি কিন্তু যতই দিন যাচ্চে তার কাছে লজ্জা পাচ্চি কষ্টও বোধ হচ্চে। এক-একদিন আগেকার মত তার সঙ্গে খুব করে' গল্প করতে তর্ক করতে যাই, কিন্তু উৎসাহটা কেমন অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে—এমন কি, যা কখনো করিনে তাও করি, তার মতের সঙ্গে মত মেলাবার ভান করে থাকি। কিন্তু এই কপটতা জিনিষটা আমার সয় না, এটা নিখিলেরও সয় না—এইখানে ওর সঙ্গে আমার মিল আছে।

তাই জন্যে আজকাল নিখিলকে এড়িয়ে চল্‌তে চাই, কোনো মতে দেখাটা না হলেই বাঁচি। এই সব হচ্চে দুর্ব্বলতার লক্ষণ। অপরাধের ভূতটাকে মান্‌বামাত্রই সে একটা সত্যকার জিনিষ হয়ে

দাঁড়ায়—তখন তাকে যতই অবিশ্বাস করিনা কেন, সে চেপে ধরে। আমি নিখিলের কাছে এইটেই অসঙ্কোচে জানাতে চাই এ সব জিনিষকে বড় করে বাস্তব করে দেখতে হবে। যা সত্য তার মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বের কোনো ব্যাঘাত থাকা উচিত নয়।

কিন্তু এ কথাটা আর অস্বীকার করতে পারচিনে এইবার আমাকে দুর্ব্বল করেচে। আমার এই দুর্ব্বলতায় বিমল মুগ্ধ হয় নি—আমার অসঙ্কোচ পৌরুষের আগুনেই সেই পতঙ্গিনী তার পাখা পুড়িয়েচে। আবেশের ধোঁয়ায় যখন আমাকে আচ্ছন্ন করে তখন বিমলার মনও আবিষ্ট হয় কিন্তু তখন ওর মনে ঘৃণা জন্মে; তখন আমার গলা থেকে ওর স্বয়ম্বরের মালা ফিরিয়ে নিতে পারে না বটে কিন্তু সেটা দেখে' ও চোখ বুজতে চায়।

কিন্তু ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে গেছে, আমাদের দুজনেরই। বিমলাকে যে ছাড়তে পারব এমন শক্তিও নিজের মধ্যে দেখচিনে। তাই বলে নিজের পথটাও আমি ছাড়তে পারব না। আমার পথ লোকের ভিড়ের পথ—এই অন্তঃপুরের খিড়কির দরজার পথ নয়। আমি আমার স্বদেশকে ছাড়তে পারব না, বিশেষত আজকের দিনে,—বিমলাকে আজ আমি আমার স্বদেশের সঙ্গে মিশিয়ে নেব। যে পশ্চিমের ঝড়ে আমার স্বদেশলক্ষ্মীর মুখের উপর থেকে ন্যায়-অন্যায়ের ঘোমটা উড়ে গেছে সেই ঝড়েই বিমলার মুখে বধূর ঘোম্‌টা খুল্‌বে—সেই অনাবরণে তার অগৌরব থাক্‌বে না। জন-সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর দুল্‌বে তরী, উড়বে তাতে বন্দেমাতরং জয়পতাকা, চারিদিকে গর্জ্জন আর ফেনা—সেই নৌকোই একসঙ্গে আমাদের শক্তির দোলা আর প্রেমের দোলা। বিমলা সেখানে

মুক্তির এমন একটা বিরাট রূপ দেখবে যে তার দিকে চেয়ে তার সকল বন্ধন বিনা লজ্জায় এক সময়ে নিজের অগোচরে খসে যাবে। এই প্রলয়ের রূপে মুগ্ধ হয়ে নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে ওর এক মুহূর্ত্তের জন্যে বাধবে না। যে নিষ্ঠুরতাই প্রকৃতির সহজ শক্তি সেই পরমাসুন্দরী নিষ্ঠুরতার মূর্ত্তি আমি বিমলার মধ্যে দেখেচি। মেয়েরা যদি পুরুষের কৃত্রিম বন্ধন থেকে মুক্তি পেত তা হলে পৃথিবীতে কালীকে প্রত্যক্ষ দেখতে পেতুম—সেই দেবী নির্লজ্জ, সে নির্দ্দয়। আমি সেই কালীর উপাসক—বিমলাকে সেই প্রলয়ের মাঝখানে টেনে নিয়ে আমি একদিন কালীর উপাসনা করব। এবার তারই আয়োজন করি।

নিখিলেশের আত্মকথা

ভাদ্রের বন্যায় চারিদিক টলমল করচে—কচি ধানের আভা যেন কচিছেলের কাঁচা দেহের লাবণ্য। আমাদের বাড়ীর বাগানের নীচে পর্য্যন্ত জল এসেচে। সকালের রৌদ্রটি এই পৃথিবীর উপরে একেবারে অপর্য্যাপ্ত হয়ে পড়েচে, নীল আকাশের ভালোবাসার মত।

আমি কেন গান গাইতে পারিনে? খালের জল ঝিল্‌মিল্‌ করচে, গাছের পাতা ঝিক্‌মিক্‌ করচে, ধানের ক্ষেত ক্ষণে ক্ষণে শিউরে শিউরে চিক্‌চিকিয়ে উঠচে—এই শরতের প্রভাত সঙ্গীতে আমিই কেবল বোবা। আমার মধ্যে সুর অবরুদ্ধ, আমার মধ্যে বিশ্বের সমস্ত উজ্জ্বলতা আট্‌কা পড়ে যায়, ফিরে যেতে পায় না। আমার এই প্রকাশহীন দীপ্তিহীন আপনাকে যখন দেখতে পাই তখন বুঝতে পারি পৃথিবীতে কেন আমি বঞ্চিত। আমার সঙ্গ দিনরাত্রি কেউ সইতে পার্ব্বে কেন?

বিমল যে প্রাণের বেগে একেবারে ভরা। সেই জন্যে এই ন-বছরের মধ্যে এক মুহূর্ত্তের জন্যে সে আমার কাছে পুরোনো হয়নি। কিন্তু আমার মধ্যে যদি কিছু থাকে সে কেবল বোবা গভীরতা, সে ত কলধ্বনিত বেগ নয়। আমি কেবল গ্রহণ করতেই পারি কিন্তু নাড়া দিতে পারিনে। আমার সঙ্গ মানুষের পক্ষে উপবাসের মত—বিমল এতদিন যে কি দুর্ভিক্ষের মধ্যেই ছিল, তা আজকের ওকে দেখে বুঝতে পারচি। দোষ দেব কাকে?

হায় রে, ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

আমার মন্দির যে শূন্য থাকবার জন্যেই তৈরি—ওর যে দরজা বন্ধ। আমার যে দেবতা ছিল সে মন্দিরের বাইরেই বসেছিল, এতকাল তা বুঝতে পারিনি। মনে করেছিলুম, অর্ঘ্য সে নিয়েছে বরও সে দিয়েচে—কিন্তু শূন্য মন্দির মোর, শূন্য মন্দির মোর!

প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসে পৃথিবীর এই ভরা-যৌবনে আমরা দুজনে শুক্লপক্ষে আমাদের শামলদহর বিলে বোটে করে বেড়াতে যেতুম। কৃষ্ণা পঞ্চমীতে যখন সন্ধ্যা বেলাকার জ্যোৎস্না ফুরিয়ে গিয়ে একেবারে তলায় এসে ঠেকত তখন আমরা বাড়ী ফিরে আসতুম। আমি বিমলকে বলতুম, গানকে বারে বারে আপন ধূয়োয় ফিরে আস্‌তে হয়;—জীবের মিলন-সঙ্গীতের ধুয়োই হচ্চে এইখানে, এই খোলা প্রকৃতির মধ্যে; এই ছল্‌ছল্‌-করা জলের উপরে যেখানে "বায়ু বহে পূরবৈয়াঁ," যেখানে শ্যামল পৃথিবী মাথায় ছায়ার ঘোমটা টেনে নিস্তব্ধ জ্যোৎস্নায় কূলে কূলে কান পেতে সারারাত আড়ি পাতচে, সেইখানেই স্ত্রীপুরুষের প্রথম চার চক্ষের

মিলন হয়েছিল, দেয়ালের মধ্যে নয়,—তাই এখানে আমরা একবার করে সেই আদি যুগের প্রথম মিলনের ধূয়োর মধ্যে ফিরে আসি, যে মিলন হচ্চে হরপার্ব্বতীর মিলন, কৈলাসে মানস-সরোবরের পদ্মবনে। আমার বিবাহের পর দুবছর কলকাতায় পরীক্ষার হাঙ্গামে কেটেচে—তার পরে আজ এই সাত বছর প্রতি ভাদ্রমাসের চাঁদ আমাদের সেই জলের বাসরঘরে বিকশিত কুমুদবনের ধারে তার নীরব শুভশঙ্খ বাজিয়ে এসেচে। জীবনের সেই এক সপ্তক এমনি করে কাট্‌ল। আজ দ্বিতীয় সপ্তক আরম্ভ হয়েচে।

ভাদ্রের সেই শুক্লপক্ষ এসেচে সে কথা আমি ত কিছুতেই ভুল্‌তে পারচিনে। প্রথম তিন দিন ত কেটে গেল—বিমলের মনে পড়েচে কি না জানিনে কিন্তু মনে করিয়ে দিল না। সব একেবারে চুপ হয়ে গেল; গান থেমে গেচে।

ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

বিরহে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দিরের শূন্যতার মধ্যেও বাঁশি বাজে—কিন্তু বিচ্ছেদে যে মন্দির শূন্য হয় সে মন্দির বড় নিস্তব্ধ, সেখানে কান্নার শব্দও বেসুরো শোনায়!

আজ আমার কান্না বেসুরো লাগচে। এ কান্না আমার থামাতেই হবে। আমার এই কান্না দিয়ে বিমলকে আমি বন্দী করে রাখব এমন কাপুরুষ যেন আমি না হই। ভালোবাসা যেখানে একেবারে মিথ্যা হয়ে গেচে সেখানে কান্না যেন সেই মিথ্যাকে বাঁধতে না চায়। যতক্ষণ আমার বেদনা প্রকাশ পাবে ততক্ষণ বিমল একেবারে মুক্তি পাবে না।

কিন্তু তাকে আমি সম্পূর্ণ মুক্তি দেব, নইলে মিথ্যার হাত থেকে আমিও মুক্তি পাব না। আজ তাকে আমার সঙ্গে বেঁধে রাখা নিজেকেই মায়ার জালে জড়িয়ে রাখা মাত্র। তাতে কারো কিছুই মঙ্গল নেই, সুখ ত নেইই। ছুটি দাও, ছুটি নাও— দুঃখ বুকের মাণিক হবে যদি মিথ্যা থেকে খালাস পেতে পার!

আমার মনে হচ্চে যেন এইবার আমি একটা জিনিষ বুঝতে পারার কিনারায় এসেচি। স্ত্রীপুরুষের ভালোবাসাটাকে সকলে মিলে ফুঁ দিয়ে দিয়ে তার স্বাভাবিক অধিকার ছাড়িয়ে এতদূর পর্য্যন্ত তাকে বাড়িয়ে তুলেচি যে, আজ তাকে সমস্ত মনুষ্যত্বের দোহাই দিয়েও বশে আন্‌তে পারচিনে। ঘরের প্রদীপকে ঘরের আগুন করে তুলেচি। এখন তাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া নয়, তাকে অবজ্ঞা করবার দিন এসেচে। প্রবৃত্তির হাতের পূজা পেয়ে পেয়ে সে দেবীর রূপ ধরে দাঁড়িয়েচে; কিন্তু তার সামনে পুরুষের পৌরুষ বলি দিয়ে তাকে রক্তপান করাতে হবে এমন পূজা আমরা মান্‌ব না। সাজে-সজ্জায় লজ্জা-সরমে গানে-গল্পে হাসি-কান্নায় যে ইন্দ্রজাল সে তৈরি করেচে তাকে ছিন্ন করতে হবে।

কালিদাসের ঋতুসংহার কাব্যের উপর বরাবর আমার একটা ঘৃণা আছে। পৃথিবীর সমস্ত ফুলের সাজি, সমস্ত ফলের ডালি কেবলমাত্র প্রেয়সীর পায়ের কাছে পড়ে পঞ্চশরের পূজার উপচার যোগাচ্চে জগতের আনন্দলীলাকে এমন করে ক্ষুণ্ণ করতে মানুষ পারে কি করে? এ কোন্ মদের নেশায় কবির চোখ ঢুলে পড়েচে? আমি যে মদ এতদিন পান করছিলুম তার রং এত

লাল নয় কিন্তু তার নেশা ত এম্‌নিই তীব্র। এই নেশার ঝোঁকেই আজ সকাল থেকে গুন্‌গুন্‌ করে মরচি,—

ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর!

শূন্য মন্দির! বল্‌তে লজ্জা করে না? এত বড় মন্দির কিসে তোমার শূন্য হল? একটা মিথ্যাকে মিথ্যা বলে জেনেচি তাই বলে জীবনের সমস্ত সত্য আজ উজাড় হয়ে গেল?

শোবার ঘরের শেল্‌ফ থেকে একটা বই আন্‌তে আজ সকালে গিয়েছিলুম। কতদিন দিনের বেলায় আমার শোবার ঘরে আমি ঢুকিনি। আজ দিনের আলোতে ঘরের দিকে তাকিয়ে বুকের ভিতরটা কেমন করে উঠল! সেই আন্‌লাটিতে বিমলের কোঁচানো সাড়ি পাকানো রয়েচে, এক কোণে তার ছাড়া শেমিজ আর জামা ধোবার জন্যে অপেক্ষা করচে। আয়নার টেবিলের উপর তার চুলের কাঁটা, মাথার তেল, চিরুনি, এসেন্সের সিসি, সেই সঙ্গে সিঁদুরের কৌটোটিও! টেবিলের নীচে তার ছোট্ট সেই একজোড়া জরি দেওয়া চটি জুতো,—একদিন যখন বিমল কোনোমতেই জুতো পরতে চাইত না সেই সময়ে আমি ওর জন্যে আমার এক লক্ষ্ণৌয়ের সহপাঠী মুসলমান বন্ধুর যোগে এই জুতো আনিয়ে দিয়েছিলুম। কেবলমাত্র শোবার ঘর থেকে আর ঐ বারান্দা পর্য্যন্ত এই জুতো পরে' যেতে সে লজ্জায় মরে গিয়েছিল। তার পরে বিমল অনেক জুতো ক্ষয় করেচে কিন্তু এই চটি জোড়াটি সে আদর করে রেখে দিয়েচে। আমি তাকে ঠাট্টা করে বলেছিলুম, যখন ঘুমিয়ে থাকি লুকিয়ে আমার পায়ের ধূলো নিয়ে তুমি আমার পূজো কর —আমি তোমার পায়ের ধূলো নিবারণ করে আজ আমার এই জাগ্রত

দেবতার পূজো করতে এসেচি। বিমল বল্লে, যাও তুমি অমন করে বোলো না তাহলে কখ্খনো ও জুতো পরব না।—এই আমার চির-পরিচিত শোবার ঘর—এর একটি গন্ধ আছে যা আমার সমস্ত হৃদয় জানে—আর বোধ হয় কেউ তা পায় না। এই সমস্ত অতি ছোট ছোট জিনিষের মধ্যে আমার রসপিপাসু হৃদয় তার কত যে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিকড় মেলে রয়েছে তা আজ যেমন করে অনুভব করলুম তেমন আর কোনোদিন করিনি। কেবল মূল শিকড়টি কাটা পড়লেই যে প্রাণ ছুটি পায় তা ত নয়, ঐ চটি জোড়াটা পর্য্যন্ত তাকে টেনে ধরতে চায়। সেই জন্যেই ত লক্ষ্মী ত্যাগ করলেও তাঁর ছিন্ন পদ্মের পাপ্‌ড়িগুলোর চারিদিকে মন এমন করে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।—দেখতে দেখতে হঠাৎ কুলুঙ্গিটার উপর চোখ পড়ল। দেখি আমার সেই ছবি তেমনিই রয়েচে, তার সাম্‌নে অনেক দিনের শুক্‌নো কালো ফুল পড়ে আছে। এমনতর পূজার বিকারেও ছবির মুখে কোনো বিকার নেই। এ ঘর থেকে এই শুকিয়ে-যাওয়া কালো ফুলই আজ আমার সত্য উপহার! এরা যে এখনো এখানে আছে তার কারণ এদের ফেলে দেওয়ারও দরকার নেই। যাই হোক্, সত্যকে আমি তার এই নীরস কালো মূর্ত্তিতেই গ্রহণ করলুম—কবে সেই কুলুঙ্গির ভিতরকার ছবিটারই মত নির্ব্বিকার হতে পারব?

এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে বিমল ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে শেল্‌ফের দিকে যেতে যেতে বল্লুম, Amiel's Journal বইখানা নিতে এসেচি। এই কৈফিয়ৎ-টুকু দেবার কি যে দরকার ছিল তা ত জানিনে। কিন্তু এখানে আমি যেন অপরাধী, যেন অনধিকারী, যেন এমন কিছুর মধ্যে চোখ দিতে

এসেছি যা লুকানো, যা লুকিয়ে থাকবারই যোগ্য। বিমলের মুখের দিকে আমি তাকাতে পারলুম না, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলুম।

বাইরে আমার ঘরে বসে যখন বই পড়া অসম্ভব হয়ে উঠল, যখন জীবনের যা-কিছু সমস্তই যেন অসাধ্য হয়ে দাঁড়াল—কিছু দেখতে বা শুনতে, বল্‌তে বা করতে লেশমাত্র আর প্রবৃত্তি রইল না, যখন আমার সমস্ত ভবিষ্যতের দিন সেই একটা মুহূর্ত্তের মধ্যে জমাট হয়ে অচল হয়ে আমার বুকের উপর পাথরের উপর চেপে বসল ঠিক সেই সময়ে পঞ্চু একটা ঝুড়িতে গোটাকতক ঝুনো নারকেল নিয়ে আমার সাম্‌নে রেখে গড় হয়ে প্রণাম করলে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, এ কি পঞ্চু ? এ কেন ?

পঞ্চু আমার প্রতিবেশী জমিদার হরিশ কুণ্ডুর প্রজা, মাষ্টার মশায়ের যোগে তার সঙ্গে আমার পরিচয়। একে আমি তার জমিদার নই, তার উপরে সে গরীবের একশেষ—ওর কাছ থেকে কোনো উপহার গ্রহণ করবার অধিকার আমার নেই। মনে ভাব-ছিলুম বেচারা বোধ হয় আজ নিরুপায় হয়ে বকশিশের ছলে অন্ন সংগ্রহের এই পন্থা করেচে।

পকেটের টাকার থলি থেকে দুটো টাকা বের করে যখন ওকে দিতে যাচ্চি তখন ও জোড়-হাত করে বল্লে, না হুজুর নিতে পারব না।

সে কি পঞ্চু ?

না, তবে খুলে বলি। বড় টানাটানির সময় একবার হুজুরের সরকারী বাগান থেকে আমি নারকেল চুরি করেছিলুম। কোন্ দিন মরব তাই শোধ করে দিতে এসেচি।

Amiel's Journal পড়ে আজ আমার কোনো ফল হত না—কিন্তু পঞ্চুর এই এক-কথায় আমার মন খোলসা হয়ে গেল। একজন স্ত্রীলোকের সঙ্গে মিলন-বিচ্ছেদের সুখদুঃখ ছাড়িয়ে এ পৃথিবী অনেক দূর বিস্তৃত। বিপুল মানুষের জীবন; তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে তবেই যেন নিজের হাসি-কান্নার পরিমাপ করি।

পঞ্চু আমার মাষ্টার মশায়ের একজন ভক্ত। কেমন করে এর সংসার চলে তা আমি জানি। রোজ ভোরে উঠে একটা চাঙারিতে করে পান দোক্তা রঙীন সুতো ছোটো আয়না চিরুনি প্রভৃতি চাষার মেয়েদের লোভনীয় জিনিষ নিয়ে হাঁটু-জল ভেঙে বিল পেরিয়ে সে নম-শূদ্রদের পাড়ায় যায়; সেখানে এই জিনিষ-গুলোর বদলে মেয়েদের কাছ থেকে ধান পায়। তাতে পয়সার চেয়ে কিছু বেশি পেয়ে থাকে। যেদিন সকাল সকাল ফিরতে পারে সেদিন তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে বাতাসাওয়ালার দোকানে বাতাসা কাট্‌তে যায়। সেখান থেকে ফিরে বাড়ী এসে শাঁখা তৈরি করতে বসে—তাতে প্রায় রাত দুপুর হয়ে যায়। এমন বিষম পরিশ্রম করেও বছরের মধ্যে কেবল কয়েক মাস ছেলে-পুলে নিয়ে দুবেলা দুমুঠো খাওয়া চলে। তার আহারের নিয়ম এই যে, খেতে বসেই সে একঘটি জল খেয়ে পেট ভরায়, আর তার খাদ্যের মস্ত একটা অংশ হচ্চে সস্তা দামের বীজে-কলা। বছরে অন্তত চারমাস তার একবেলার বেশি খাওয়া জোটে না।

আমি এক সময়ে এ'কে কিছু দান করতে চেয়েছিলুম। মাষ্টারমশায় আমাকে বল্লেন, তোমার দানের দ্বারা মানুষকে তুমি নষ্ট করতে পার দুঃখ নষ্ট করতে পার না। আমাদের বাংলা

দেশে পঞ্চু ত একলা নয়। সমস্ত দেশের স্তনে আজ দুধ শুকিয়ে এসেচে। সেই মাতার দুধ তুমি ত অমন করে টাকা দিয়ে বাইরে থেকে জোগাতে পারবে না!

এই সব কথা ভাববার কথা। স্থির করেছিলুম এই ভাবনাতেই প্রাণ দেব। সেদিন বিমলকে এসে বল্লুম—বিমল, আমাদের দুজনের জীবন দেশের দুঃখের মূল ছেদনের কাজে লাগাব।

বিমল হেসে বল্লে, তুমি দেখচি আমার রাজপুত্র সিদ্ধার্থ, দেখো শেষে আমাকে ভাসিয়ে চলে যেয়ো না।

আমি বল্লুম, সিদ্ধার্থের তপস্যায় তাঁর স্ত্রী ছিলেন না, আমার তপস্যায় স্ত্রীকে চাই।

এমনি করে কথাটা হাসির উপর দিয়েই গেল। আসলে বিমল স্বভাবত, যাকে বলে, মহিলা। ও যদিও গরিবের ঘর থেকে এসেচে কিন্তু ও রাণী। ও জানে, যারা নীচের শ্রেণীর, তাদের সুখদুঃখ ভালোমন্দর মাপকাঠি চিরকালের জন্যই নীচের দরের। তাদের ত অভাব থাকবেই কিন্তু সে অভাব তাদের পক্ষে অভাবই নয়। তারা আপনার হীনতার বেড়ার দ্বারাই সুরক্ষিত। যেমন ছোটো পুকুরের জল আপনার পাড়ির বাঁধনেই টিঁকে থাকে। পাড়িকে কেটে বড় করতে গেলেই তার জল ফুরিয়ে পাঁক বেরিয়ে পড়ে। যে আভিজাত্যের অভিমানে খুব ছোটো ছোটো ভাগের মধ্যে ভারতবর্ষ খুব ছোটো ছোটো গৌরবের আসন ঘের দিয়ে রেখেচে, যাতে-করে ছোটো ভাগের হীনতার গণ্ডির মধ্যেও নিজের মাপ-অনুযায়ী একটা কৌলিন্য এবং স্বাতন্ত্র্যের গর্ব্ব স্থান পায়, বিমলের রক্তে সেই অভিমান প্রবল। সে ভগবান মনুর দৌহিত্রী

বটে। আমার মধ্যে বোধ হয় গুহক এবং একলব্যের রক্তের ধারাটাই প্রবল; আজ যারা আমার নীচে রয়েচে তাদের নীচ বলে আমার থেকে একেবারে দূরে ঠেলে রেখে দিতে পারিনে। আমার ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়। আমি স্পষ্টই জানি আমার নীচের লোক যত নাবচে ভারতবর্ষই নাবচে, তারা যত মরচে ভারতবর্ষই মরচে।

বিমলকে আমার সাধনার মধ্যে পাইনি। আমার জীবনে আমি বিমলকে এতই প্রকাণ্ড করে তুলেচি যে, তাকে না পাওয়াতে আমার সাধনা ছোটো হয়ে গেছে। আমার জীবনের লক্ষ্যকে কোণে সরিয়ে দিয়েচি বিমলকে জায়গা দিতে হবে বলে। তাতে-করে' হয়েচে এই যে, তাকেই দিনরাত সাজিয়েচি পরিয়েচি শিখিয়েচি, তাকেই চিরদিন প্রদক্ষিণ করেচি,—মানুষ যে কত বড়, জীবন যে কত মহৎ সে কথা স্পষ্ট করে মনে রাখতে পারিনি।

তবু এর ভিতরেও আমাকে রক্ষা করেচেন আমার মাষ্টারমশায় —তিনিই আমাকে যতটা পেরেচেন বড়র দিকে বাঁচিয়ে রেখেচেন, নইলে আজকের দিনে আমি সর্ব্বনাশের মধ্যে তলিয়ে যেতুম। আশ্চর্য্য ঐ মানুষটি। আমি ওঁকে আশ্চর্য্য বলচি এই জন্যে যে আজকের আমার এই দেশের সঙ্গে কালের সঙ্গে ওঁর এমন একটা প্রবল পার্থক্য আছে। উনি আপনার অন্তর্যামীকে দেখতে পেয়েচেন সেইজন্যে আর কিছুতে ওঁকে ভোলাতে পারে না। আজ যখন আমার জীবনের দেনাপাওনার হিসাব করি তখন একদিকে একটা মস্ত ঠিকে-ভুল, একটা বড় লোকসান ধরা পড়ে, কিন্তু

লোকসান ছাড়িয়ে উঠতে পারে এমন একটি লাভের অঙ্ক আমার জীবনে আছে সে কথা যেন জোর করে বল্‌তে পারি।

আমাকে যখন উনি পড়ানো শেষ করেচেন তার পূর্ব্বেই পিতৃবিয়োগ হয়ে আমি স্বাধীন হয়েচি। আমি মাষ্টারমশায়কে বল্লুম, আপনি আমার কাছেই থাকুন, অন্য জায়গায় কাজ করবেন না।

তিনি বল্লেন, দেখ, তোমাকে আমি যা দিয়েচি তার দাম পেয়েচি, তার চেয়ে বেশি যা দিয়েচি তার দাম যদি নিই তাহলে আমার ভগবানকে হাটে বিক্রি ক'রা হবে।

বরাবর তাঁর বাসা থেকে রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় করে চন্দ্রকান্ত বাবু আমাকে পড়াতে এসেচেন, কোনোমতেই আমাদের গাড়ি ঘোড়া তাঁকে ব্যবহার করাতে পারলুম না। তিনি বল্‌তেন, আমার বাবা চিরকাল বটতলা থেকে লালদিঘি পর্য্যন্ত হেঁটে গিয়ে আফিস করে আমাদের মানুষ করেচেন, শেয়ারের গাড়িতেও কখনো চাপেন নি, আমরা হচ্চি পুরুষানুক্রমে পদাতিক।

আমি বল্লুম, না হয় আমাদের বিষয়কর্ম্মসংক্রান্ত একটা কাজ নিন।

তিনি বল্লেন, না বাবা, আমাকে তোমাদের বড়মানুষীর ফাঁদে ফেলো না, আমি মুক্ত থাক্‌তে চাই।

তাঁর ছেলে এখন এম্ এ পাস করে চাক্‌রি খুঁজচে। আমি বল্লুম, আমার এখানে তার একটা কাজ হতে পারে।—ছেলেরও সেই ইচ্ছে খুব ছিল। প্রথমে সে তার বাপকে এই কথা জানিয়েছিল, সেখানে সুবিধে পায়নি। তখন লুকিয়ে আমাকে

আভাস দেয়। তখনি আমি উৎসাহ করে চন্দ্রকান্তবাবুকে বল্লুম। তিনি বল্লেন, না, এখানে তার কাজ হবে না।—তাকে এতবড় সুযোগ থেকে বঞ্চিত করাতে ছেলে বাপের উপর খুব রাগ করেচে। সে রেগে পত্নীহীন বুড়ো বাপকে একলা ফেলে রেঙ্গুনে চলে গেল।

তিনি আমাকে বারবার বলেচেন, দেখ নিখিল, তোমার সম্বন্ধে আমি স্বাধীন, আমার সম্বন্ধে তুমি স্বাধীন, তোমার সঙ্গে আমার এই সম্বন্ধ। কল্যাণের সম্বন্ধকে অর্থের অনুগত করলে পরমার্থের অপমান করা হয়।

এখন তিনি এখানকার এণ্ট্রেন্স স্কুলের হেডমাষ্টারি করেন। এতদিন তিনি আমাদের বাড়ীতে পর্য্যন্ত থাক্‌তেন না। এই কিছুদিন থেকে আমি প্রায় সন্ধেবেলায় তাঁর বাসায় গিয়ে রাত্রি এগারোটা দুপুর পর্য্যন্ত নানা কথায় কাটিয়ে আস্‌ছিলুম। বোধ হয় ভাবলেন তাঁর ছোট ঘর এই ভাদ্রমাসের গুমটে আমার পক্ষে ক্লেশকর, সেইজন্যেই তিনি নিজে আমার এখানে আশ্রয় নিয়েচেন। আশ্চর্য্য এই, বড়মানুষের পরেও তাঁর গরিবের মতই সমান দয়া, বড়মানুষের দুঃখকেও তিনি অবজ্ঞা করেন না।

বাস্তবকে যত একান্ত করে দেখি ততই সে আমাদের পেয়ে বসে—আভাসমাত্রে সত্যকে যখন দেখি তখনই মুক্তির হাওয়া গায়ে লাগে। বিমল আজ আমার জীবনে সেই বাস্তবকেই এত বেশি তীব্র করে তুলেচে যে সত্য আমার পক্ষে আজ আচ্ছন্ন হবার জো হয়েচে। তাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কোথাও আমার দুঃখের আর সীমা খুঁজে পাচ্চিনে। তাই আজ আমার এতটুকু ফাঁককে

লোক-লোকান্তরে ছড়িয়ে দিয়ে শরতের সমস্ত সকাল ধরে গান গাইতে বসেচি—

এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর,
শূন্য মন্দির মোর!

যখন চন্দ্রকান্তবাবুর জীবনের বাতায়ন থেকে সত্যকে দেখ্‌তে পাই তখন ও গানের মানে একেবারেই বদ্‌লে যায়,—তখন

বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোয়াঁয়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া?

যত দুঃখ যত ভুল সব যে ঐ সত্যকে না পেয়ে। সেই সত্যকে জীবনভরে না নিয়ে দিনরাত এমন করে কেমনে কাটবে? আর ত পারিনে, সত্য, তুমি এবার আমার শূন্য মন্দির ভরে দাও! (ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চোর

(ডিকিন্সের Dr. Marigold গল্পের আভাসে রচিত)

সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—কলুর ছেলে, বাপ-দাদার মত ঘানি ঠেলে খাব তা না, ইস্কুলের মাষ্টার মশাই পাঁচুদা বাবার মাথায় কি খেয়াল ঢুকিয়ে দিলেন, সে একেবারে পণ করে বস্‌ল ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে ভদ্দর লোক করবে। তা বেশ! ভদ্দর লোকের ছেলেরা লাঙ্গল ধর্‌তে শিখুক আর চাষাভুষোর ছেলেগুলো কানে কলম গুঁজুক—সব উল্টো না হলে আর কলিকাল বল্‌বে কেন! একেবারে একটানা গোরুর ল্যাজ মল্‌তে মল্‌তে বাবার মেজাজ হয়েচে একরোখা। ভদ্দর লোক হতে হবে যখন একবার তার মুখ দিয়ে বেরিয়েছে তখন মেরে-পিটে ভদ্দর না করে আমাকে ছাড়বে না।

মাষ্টার মশাই বিপদটি ঘটালেন :কিন্তু লোকটি খাসা, একেবারে সদাশিব। তাঁর হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে বাবা ভাবলে ছেলের জন্মে আর ভাবতে হবে না, বিদ্যের সাগর লাফ দিয়ে ডিঙিয়ে ছেলেটা সংসারে একটা বিপরীত লঙ্কাকাণ্ড করে বস্‌বে। যতক্ষণ বাড়ী থাকতুম বাবা একদিকে গোরুকে ঠেলা দিত, একদিকে আমাকে। বই হাতে করে চেঁচিয়ে পড়তে হত। ঘানির ক্যাঁচক্যাঁচানির সঙ্গে সুর মিলিয়ে দুই গালে হাত দিয়ে কনুই দুটো দুই হাঁটুর উপর রেখে পিঁড়িতে বসে কপালে চোখ তুলে দুল্‌তে দুল্‌তে সুর করে চেঁচাতুম "কয়ে আকার ক কাক," "দুই এক্কে দুই, দু দুগুণে চার।" গোরুগুলো ভাবত ছোঁড়াটা আমাদের চেয়েও অধম, ঘানিও ঠেলে না,

তেলও বের করে না, শুধু শুধু চেঁচিয়ে মরে। তার উপরে চোখে-ঠুলির আরামটুকুও আমার ছিলনা—বইয়ের পাতার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাক্‌তে হত।

বহুতর কানমলার ভিতর দিয়ে যখন কথামালায় পৌঁছলুম, বাবা আর থাক্‌তে পার্‌ল না, সহর থেকে একসঙ্গে একজোড়া জুতো আর একটা ছাতা কিনে আমাকে ভদ্দর-আনার পয়লা ধাপে চড়িয়ে দিল। সেই থেকে আমার বইয়ের বোঝা যত বাড়তে লাগল সঙ্গে সঙ্গে বাবুয়ানার আসবাবও বাবা যোগাতে লাগল।

দশ বছর বয়সে একটি চার বছরের মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে হল। মা ছিল না, দেখবার কেউ নেই বলে বাবা অনেক দিন বউ ঘরে আনে নি। আমাকে মাঝে মাঝে শ্বশুর-বাড়ী পাঠাত বটে কিন্তু সেখানে স্ত্রীর চেয়ে স্ত্রীর ঠাকুরমার সঙ্গেই আমার আসর জমত সুতরাং স্ত্রী যে কি রত্ন তখন পর্য্যন্ত মালুম করিনি।

যে বছর ছাত্রবৃত্তি দেব একদিন হাট-বারে বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে হাট থেকে ফিরে এসেই বাবার খুব চেপে জ্বর এল। রাত্রে আমাকে বল্লে, "ওরে ন্যাপ্‌লা! বৌমাকে আন্‌তে পাঠা, তাকে অনেকদিন আনা হয়নি।" বৌ এল, কিন্তু তার সেবা বাবা বেশিদিন ভোগ কর্‌ল না, ভাদ্রমাসের দিনসাতেক থাক্‌তেই সংসার থেকে বিদায় নিল। দিনকতক এমন হল, বাড়ীতে ঢুক্‌তেই প্রাণ হাঁপিয়ে উঠ্‌ত। দাওয়ার উপর সেই তার পীঁড়েখানি, দেওয়ালের গায়ে পেরেকে ঝোলানো ছেঁড়া ছাতা, দরজার পাশে হুঁকোটি; সব ঠিক আছে, কেবল নেই আমার বাবা। ছেলেবেলা থেকে মাকে পাইনি, বাবার কোলেই মায়ের কোল পাতা ছিল।

একটি দিনের তরেও মনে পড়ে না যে বাবা কখনো গায়ে হাত তুলেছে।

ঘানি ত ছেড়েইচি তার পরে আবার বই ছেড়ে এবার বৌ নিয়ে পড়লুম। পরিবারটি আমার নেহাৎ নিন্দের ছিলনা। কিন্তু কি বল্‌ব, দেহে তার রাগটা বড় বেশি। তের বছর তার সঙ্গে ঘর করেছি তবু বেঁচে আছি,—মানুষের প্রাণ এতই কঠিন! সে যখন রাগ্‌ত পোষা কুকুরটার ল্যাজটা তার পেটের সঙ্গে সমান হয়ে যেত; আমার ল্যাজ নেই কিন্তু সমস্ত দেহটাকেই ঐ ল্যাজের মত গুটিয়ে ফেলবার ইচ্ছে হত।

মেয়েটাকে যখন জন্ম দিলে ভাবলুম এইবারে রাগের ঝাঁজ কিছু মরবে। উল্‌টো হল, আগে একজনের উপর রাগ ফলাত এখন আরেকটাকে পেলে। ফুলি চার বছরেরটি হলে তাকে এমনি বেদম মার আরম্ভ কর্‌ল যে সে আমি দেখতে না পেরে বাইরে বেড়িয়ে পড়তুম। বল্লে বিশ্বাস কর্‌বে না, অসহ্য হয়ে দুই একবার তাকে মেরেওচি,—কিন্তু সে মার শেষকালে গিয়ে পড়ত আমার ফুলুর পিঠেই, তাতে তার দুঃখের হিসেব বেড়েই চল্‌ত।

কিন্তু আমার ফুলরাণীর কি সহ্যগুণই ছিল! তার একটি-মাথা ভোম্‌রার মত কালো কুচ্‌কুচে কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল ছিল, সে চুল মুঠো করে ধরে তার মা যখন দেওয়ালে মাথা ঠুকে দিত, ওগো, তখন যে আমি উন্মাদ হয়ে যাই নি, সেইটেই আমার জীবনের সব চেয়ে আশ্চর্য্য! বলিনি, তার কি সহ্যগুণই ছিল? চোখ দিয়ে দর্‌দর্‌ করে জল পড়ছে, আর আমার গলা জড়িয়ে ধরে বল্‌চে, "বাবা, তুই ভয় পাস্‌নে বাবা। আমার

কিছু লাগেনি। আমি ত লাগে বলে কাঁদিনে, মা আর মার্‌বে না, ছেড়ে দেবে, বলে কাঁদি।" সেই একরত্তি দুধের মেয়ে, তার সে সব কথা মনে হলে বুক ফেটে যায়।

আবার এদিকে ফুলুর মা তাকে যত্ন করতে কসুর কর্‌ত না। সাজিমাটি দিয়ে তার কাপড় কেচে কেচে একেবারে ধব্‌ধবে করে রাখ্‌ত; সে যা যা খেতে ভালোবাস্‌ত নিজের হাতে তৈরি করে রেখে দিত। ফুলি কোনো জিনিষের জন্যে আবদার ধরলে সে যেমন করে-হোক্ সাত কোশ তফাতে হেঁটে গিয়েও তাকে জুগিয়ে এনে দিত। কে জানে বাপু মেয়েমানুষের মন, যার জন্যে কোনো কষ্টকে কষ্ট বলে গায়ে মাখ্‌ত না, বুঝিনা তাকে আবার কোন্ প্রাণে ধরে ধরে ঠেঙাত!

এই সময় ফুলির রোজ ঘুস্‌ঘুসে জ্বর আসতে লাগল—বোধকরি কোনো রকমে ঠাণ্ডা লেগেছিল। সেই জ্বরে ফুলি একেবারে মাকে ত্যাগ কর্‌ল। মার কাছে শোবে না, মার হাতে ওষুধ খাবে না, আমি ঘরে না থাক্‌লে এক ফোঁটা জলও মার হাত থেকে নেবে না।

সেদিন ফুলির জ্বরটা বেড়েছিল। পিদীম জ্বেলে দিয়ে বৌ পথ্যি তৈরী কর্‌তে গেল। আমি ফুলুকে গল্প বলে ভোলাবার চেষ্টা করছিলুম। খানিকক্ষণ চুপ্‌টি করে থেকে আমাকে ডাক্‌ল, "বাবা!"

"কেন রে?"

"আমার নাম ফুলরাণী হল কেন সেই গল্প বল্।"

"বল্‌ছি। আমাদের উঠনে তোর ঠাকুর্দ্দা অনেক ফুলগাছ লাগিয়েছিল। তুই যখন হলি, সব গাছে তখন ফুল ধরেছিল।

একদিন তোর মা একখানা কাঁথা পেড়ে সেখানে তোকে শুইয়ে রেখে কি কর্‌তে ঘরে গেল। আমি চেয়ে চেয়ে দেখি যত ফুল ফুটেছে সব চেয়ে আমার ছোট্ট ফুট্‌ফুটে মেয়েটি সেরা, তাই তোর নাম দিলুম ফুলরাণী।"

"দেখ্ বাবা, আজো ঠিক তেম্‌নি ফুল ফুটেছে।" চিরদিনের মত ফুলুর কথা বন্ধ হল, আমার কাঁধে তার মাথাটি লুটিয়ে পড়ল। কতক্ষণ এম্‌নি করে তাকে নিয়ে বসে রইলুম জানি না। কোন্ সময় তাকে বিছানায় শুইয়ে রান্নাঘরে ছুটে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লুম—

"ওরে সয়তানী, আর আমার ফুলরাণীর চুলের মুঠি তুই ধর্‌তে পারবিনে রে! সে তোর কাছ থেকে পালিয়ে গেছে।"

কথাটা কিছু কড়া হল। তখন কি আমার জ্ঞান ছিল? কিন্তু সেই দিন থেকে তার মুখে আর রা ছিল না। যখন তার মাথায় রাগ চাপ্‌ত সে দুই হাতে নিজেকে ধরে ঝাঁকানি দিত, তাতেও ঠাণ্ডা না হলে কবাটে মাথা কুটে রক্তপাত করে ছাড়্‌ত।

এই রকম কোনোমতে দিন কাট্‌তে লাগল। একদিন আমরা দুজনে পথের ধারের ভাঙা বেড়াটা সার্‌ছি দেখি একটি ছোট মেয়ের চুল ধরে টান্‌তে টান্‌তে এক মাগী রাস্তা দিয়ে হন্ হন্ করে গালাগাল দিতে দিতে চলেছে, আর মেয়েটা, "ওমা, আর মারিস্ না রে মা, আর মারিস্ না রে!" বলে ফুক্‌রে ফুক্‌রে কাঁদছে, আর থেকে থেকে তার মার হাঁটু জড়িয়ে জড়িয়ে ধর্‌ছে। আমার স্ত্রী সেই শুনে পাগলের মত ছুটে চলে গেল, পরের দিন রায়েদের পুকুরে তার দেহ ভেসে উঠল।

আমিই শুধু বাকী রইলুম। আমি ঘরের জীব, ঘরটি আমার

ভেঙে গিয়ে আমাকে ভাসিয়ে দিল। সারাদিন বাইরে বাইরে কাজ করি কিন্তু কার জন্যে এত খাটছি যখন চেতন হয় সমস্ত শরীর মন ভেঙে পড়ে।

একদিন পাঁচুদাদা বল্লেন, "ছাখ্ ন্যাপ্‌লা! তোকে এত বলি তবুও তুই দ্বিতীয় সংসার কর্‌বি নে। এক কাজ কর্। তোর ফুলির মত একটি ছোট মেয়ে নিয়ে মানুষ কর্, মনে করিস্ তোর ফুলিই ফিরে এসেছে।"

এ ত মন্দ কথা নয়।

মেয়ের খোঁজে ফিরতে লাগ্‌লুম। নিজের জাতের মধ্যে কাউকে পেলুম না যে মেয়ে বিলিয়ে দিতে চায়। শেষ অনেক খোঁজ করে একটি মেয়ে পেলুম।

সে বোবা আর কালা। নইলে মেয়ে দেবে কেন?

তার মাথাভরা কালো কোঁকড়া চুল দেখেই আমি তাকে কোলে তুলে একেবারে বাড়ী নিয়ে এলুম। এরও নাম দিলুম ফুলরাণী। সে ত কেবল মানুষের মত নয়, অবোলা জন্তুর মত আমার পোষ মান্‌লে—যেখানে যাই সঙ্গে সঙ্গে ফিরত, এক মুহূর্ত্ত আমাকে ছেড়ে থাক্‌তে চাইত না। সে কখন্ আপনা-আপনি আমার ঘরের কাজ বাগানের কাজ শিখে নিল, দিনের মধ্যে কখনো তার হাত কামাই যেত না।

এ মেয়েকে ত কেউ বিয়ে করবে না, মনে করলুম ভালোই হল, কোনোদিন কেঁদে আমার ঘর থেকে ওকে বিদায় কর্‌তে হবে না। কিন্তু পাঁচুদাদা আমার মনের মধ্যে বড় একটা ধোঁকা লাগিয়ে দিলে। সে বল্লে মানুষের প্রাণ না পাখী, কখন্ আছে

কখন নেই। তুই যদি খাম্‌খা মারা যাস্ তা হলে ও মেয়ের গতি হবে কি?

সে ত ঠিক কথা, এই যে গদাই এত বড় জোয়ান, আমার চেয়ে পাঁচ বছরের ছোট, তিন দিনের জ্বরে মারা পড়ল। কখন কি হয় বলা যায় কি! আমার অভাবে ঐ বোবা কালা মেয়ের দিকে ত কেউ ফিরে তাকাবে না। তাকে বল্লেম, পাঁচু দাদা, একটা পরামর্শ দাও!

পাঁচু দাদা বল্লে, কল্‌কাতায় বোবা-কালাদের শেখাবার জন্যে ভালো ইস্কুল আছে। তুই ফুলিকে সেই ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দে; সেখানে ওকে লিখ্‌তে পড়তে শেখাবে, আর এমন হাতের কাজ শিখিয়ে দেবে যে, ও নিজের গুজরান নিজেই চালাতে পারবে!

মন ঠিক করতে অনেকদিন লাগল। কাছের ধনকে কিছুতেই কাছে রাখ্‌তে পারিনে এমনি আমার কপালের লিখন! দীর্ঘ-নিশ্বাস ছেড়ে বল্লেম, আচ্ছা, ওকে কলকাতাতেই পাঠিয়ে দেব। ও যদি আমার সেই ফুলিই হত তাহলে এতদিনে ত ওকে শ্বশুরবাড়ী ঘর করতে যেতে হত!

আমাকে ছেড়ে যেতে হবে বলে মেয়েটা ত ক'দিন ধরে আমার সঙ্গে সঙ্গে কেঁদে কেঁদে ফিরতে লাগ্‌ল। বোবার কান্না বড় দুঃখের কান্না, সে কিছুতেই সহ্য করতে পারা যায় না—কিন্তু সেও আমি সইলুম। একদিন পাঁচুদাদাকে সঙ্গে করে নিয়ে আমার ফুলুকে কলকাতার ইস্কুলে দিয়ে এলুম। চলে আসবার সময় সে আমার চাদর চেপে ধরে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তখন আমার চোখের জল আর কিছুতেই থাম্‌তে চায়

না। পাঁচুদাদা যদি না থাক্‌ত তাহলে তখনি মেয়েটাকে ফিরিয়ে আন্‌তুম।

আবার আমার ঘর খালি! কিন্তু এবারকার এ ফাঁকাটা সে ফাঁকের মত নয়। এ ফাঁক আবার একদিন ভরে উঠ্‌বে। কিন্তু দিন ত কাটাতে হবে। ফুলুকে মনে করে তার জন্যে একটি শান-বাঁধানো ঘর বানালুম। সেই ঘর সাজিয়ে তোলা আমার এক কাজ হল। আমার স্ত্রী থাক্‌তে আমার যে সব হাঁড়িকুঁড়ি বাসনকোসন ছিল, এতদিন তার কোনো আদর ছিল না। সেগুলি আমি মেজেঘষে মেরামত করে তক্‌তকে করে গুছিয়ে রেখে দিতে লাগ্‌লুম। আমার স্ত্রীর গয়না একটা হাঁড়ির মধ্যে ঘরে মেজের নীচে পোঁতা ছিল। সে আর-একবার আমি খুঁড়ে তুলে নেড়েচেড়ে গুণেগেঁথে ঝেড়েপুঁছে মনে মনে ফুলিকে দান করলুম। ভালোদেখে রবিবর্ম্মার ছবি কিনে দেয়ালে টাঙিয়ে দিলুম,—একটা মেদিনীপুরের মাদুর এনে তার তক্তপোষের উপর পাতলুম। মনে মনে ভয় ছিল কি জানি কলকাতা থেকে ফিরে এলে মেয়ের যদি আমাদের ঘরদুয়োর পছন্দ না হয়।

আমাদের পাড়ার জটাধর রায় এসে উঁকি মেরে বলে, কি নেপালখুড়ো, ঘরে তোমার লাট্‌সাহেবের নেমন্তন্ন আছে না কি? আমি হেসে বলি, আটক কি ভাই, কলিকালে সবই উল্টোপাল্টা। —আমাদের বামুনপাড়ার চাটুয্যেদের ছেলেরা এসে আমার ঘর দেখে ত রেগে জ্বল্‌তে থাকে। তাদের ভাবখানা এই, দেখেছ একবার, কলুর বেটা দুটো অক্ষর লিখ্‌তে পড়তে শিখে একেবারে নবাব হয়ে উঠেচে! কোন্‌দিন আমাদের সপের উপর

এসেই বা বসে!—আমি কথাটি কইনে। এবর যে আমি কার জন্যে সাজাচ্চি সে ত গাঁয়ের কোনো লোক জানেনা—তারা বলে, পিপিড়ার পাখা ওঠে মরিবার তরে!

দুটো বছর গেল, আমার ফুলুর শিক্ষার মেয়াদ শেষ হল। আমার আকাশ জুড়ে আজ আগমনীর গান বাজচে। তখন পূজোর ছুটির সময়। আমাকে ত প্রতিমা গড়তে হয়নি, আমার ঘরে আমার এই বোবাকালা মেয়েটির মধ্যে পার্ব্বতী এসেচেন। বামুনপাড়ার চাটুয্যেদের ঘরে যে প্রতিমা দাঁড়িয়েচে সে কি আমার এই উমার চেয়ে বেশী কথা কইতে পারে?

আমার সব সাধ মিট্‌ল। আমার মত হতভাগা যা আশা কর্‌তে পারে তার চেয়ে অনেক বেশী সুখে আমাদের দিন যেতে লাগ্‌ল।

কিন্তু কাছের ধনকে দূরে নিয়ে যাবার জন্যেই জগৎজুড়ে দিনরাত ষড়যন্ত্র চল্‌চে। বিধাতার একটা কোন পেয়াদা আছে সে হার গাঁথ্‌তে দেবেনা, সে সুতো ছিঁড়বে। এবার আমার বুকের মাণিককে বাইরে ছিনিয়ে নেবার জন্যে কোথা থেকে একটা দূত এসে উপস্থিত হল! একে কোনোদিন চিনিনে কিন্তু তবু ঘরের মধ্যে এর পথ আটক করতে পারিনে।

বয়স তার অল্প—পঁচিশ কি ছাব্বিশ হবে। চোখ দুটো কেমন তার ভাবে-ভোলা রকমের। নধর দেহ, গৌর বর্ণ। তখন পড়ন্ত বেলা, আমাদের বাড়ীর সামনের রাস্তায় তাকে দেখ্‌লুম। কিন্তু কোথাও যে সে যাবে, কিছু যে তার দরকার আছে এমন বোধ হল না, অথচ আমার ঘরের মধ্যেও আসে না কেন? একবার মনে হল, পথ হারিয়েচে, পথ জিজ্ঞাসা করবার জন্যে

কোনো মানুষ খুঁজ্‌চে বুঝি? কিন্তু পাশ দিয়ে গোরুর গাড়ি নিয়ে গাড়োয়ান গেল তাকে কিছুই জিজ্ঞাসা করলে না।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে তার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াতেই সে চল্‌তে আরম্ভ করলে, যেন সে পথিকমাত্র, এতক্ষণ যেন সে চলছিল। তাই দেখেই আমার সন্দেহ হল লোকটার একটা-কিছু মৎলব আছে। তাকে ডাক্‌ দিলুম, "ও মশায়!" কথাটা সে কানেই নিল না। আরো গলা চড়িয়ে বল্লুম, "শুন্‌চেন মশায়?" শোনার ত কোনো লক্ষণ নেই।

যাক্‌ গে, যে যেতে চায় তাকে যেতে দেওয়াই ভালো—ডাকাডাকি করে লাভ কি? কিন্তু তার পরে দেখা গেল যেতে মোটেই চায় না, আর ডাকাডাকি যে আমি করচি তা নয়—যে জাযগা থেকে ডাক আস্‌চে ঠিক সে জায়গায় সাড়াও মিল্‌ছে। সব কথা ক্রমে বলচি।

আমার ফুলুর মুখে কথা নেই কিন্তু কোনদিন হাসির অভাব ছিল না। তার চোখের কালো তারার মধ্যে পর্য্যন্ত হাসি। কদিন দেখ্‌চি সে হাসিও আজ বোবা হয়ে এসেচে। বিধাতা ত তাকে চুপ করিয়েই রেখেচেন কিন্তু সকল দেহ যে তার কথা কইত সেও যেন আজ-কাল বন্ধ, তার শরীরে আর ঢেউ খেল্‌চে না। যদি জিজ্ঞাসা করি, "ফুলি, তোর কি হয়েছে মা?" অমনি এক-মুখ হাসি দিয়ে সে তার জবাব দেয়। কিন্তু সে হাসি যেন কেমন ফ্যাকাশে। আজ পর্য্যন্ত কখনো তাকে এক মুহূর্ত্ত কাজ কামাই করতে দেখিনি—কিন্তু সেদিন সকালবেলা দেখি বাঁশ-তলায় চুপটি করে করে বসে খিড়কীর পুকুরটার দিকে কেমন হয়ে চেয়ে

ছিল। আমার মন খারাপ হয়ে গেল। ভাবলুম, বোবার মন অন্ধকার, সেখানে সব জায়গায় আমাদের দৃষ্টি চলে না, বোধ হয় পূর্ব্বজন্মকার একটা কোন্ দুঃখু সেখানে জমা হয়ে আছে।

সেদিন মহাজনদের হিসেব চুকতে গিয়েছিলুম, ফিরে আসতে সন্ধে এল। বাড়ীর সাম্‌নে আস্‌তেই দেখি সেদিনকার সেই মানুষটা আমারই বাড়ী থেকে বেরিয়ে ঠিক আমার সাম্‌নে এসে পড়ল। তাই বটে! চোর না হয়ে ত যায় না। হাত চেপে ধরলুম, দেখি আঙুলে তার আংটি—এই আংটিই ত আমি ফুলুকে দিয়েছিলুম। আংটি তুমি কোথায় পেলে? কোনো জবাবই করে না। ভারি রাগ হল। তাকে হিড়হিড় করে ঘরের মধ্যে টেনে এনে আমার চাদর দিয়ে কসে তাকে খোঁটার সঙ্গে বাঁধলুম। লোকটা তবু একটা কথা বল্লে না। তার ভাবখানা এই, আমাকে বাঁধাটা অনাবশ্যক, না বাঁধলেও নড়ব না। ভাবলুম থানা থেকে চৌকিদার নিয়ে আসি, কথা বলাবার ফন্দী তারা জানে।

এমন সময় ঘরে ফুলু এসে পড়ল। লোকটাকে দেখে তার মুখ শাদা হয়ে গেল। হবেই ত, ওরই হাত থেকে ত আংটি ছিনিয়ে নিয়েচে। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, ফুলু, এ ত তোমারি আংটি?—সে ঘাড় নেড়ে জানালে হাঁ।—আমি বল্লুম, ভয় কোরো না, এ'কে আমি এখনি পুলিসে দিচ্চি, আর উৎপাত করবে না।

দেখি ফুলুর চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগল। যত বলি, কাঁদিস্ কেন মা, ততই তার কান্না বেড়ে যায়।

আমার এ কাহিনী আর কি বল্‌ব? এইটুকু বল্লেই সবাই বুঝতে পারবে যেখানে এ গল্প শেষ হল সেখানে ফুলির কান্না ফুরিয়ে

হাসি দেখা দিল—কিন্তু সে হাসির রং বেল-ফুলের মত ফুট্‌ফুটে নয়, রক্ত-করবীর মত লজ্জায় টুক্‌টুকে।

আংটি চুরিটার প্রমাণ হল না বটে কিন্তু চুরি করে নিয়ে গেল যার আংটি তাকে,—আমার ফুলরাণীকে।

কেমন করে জান্‌ব, ওদের বোবা-কালাদের ইস্কুলে পুরুষদের বিভাগে এই ছেলেটা পড়ত ;—সেইখানে দুরের থেকে বোবায় বোবায় চোখে চোখে দেখা এবং শোনা দুইই। নিঃশব্দে সব কথাবার্ত্তা হয়ে গেছে, অন্তর্যামী ছাড়া কেউ শোনে নি।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, জাত কি ?—জাতে মেলে না। পণ্ডিতের কাছে গেলেম সে বলে বিয়ে ত চল্‌বে না।

ফুলুকে এসে বল্লুম, ও ফুলু জাতে বাধে যে !—তার মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেল। সে দিনটা আর কিছু বল্লুম না। রাতও গেল কেটে। পরের দিন তার চোখ দুটো দেখি ফুলে লাল হয়ে উঠেচে।

তখন তার চোখ দুটি থেকে বিধান পেলেম। যারা বোবা কালা তারা সবাই এক জাতের, যারা কথা কয় তাদের জাতের আর সীমা সংখ্যা নেই।

ছোঁড়াটা সাহেবের বাগানের মালী। আমার ফুলরাণী সেই ফুলের দেশে রাজত্ব করতে চল্‌ল।

তার পরে দিনকতক আমি কাঁদলেম। তার পরে ভাবচি আর যাই হোক্ মরতে পারব নিশ্চিন্ত হয়ে।

শ্রীমাধুরীলতা দেবী।

আদর্শ

সেকালের মেয়ের সহিত একালের মেয়েদের তুলনায়-সমালোচনা অনেকবার হইয়া গিয়াছে, সে চর্ব্বিত-চর্ব্বণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক। যতই ইচ্ছা এবং চেষ্টা করি না কেন, ঠিক সেই ছাঁচে নিজেদের ফের ঢালাই করা, সেই সংস্করণ অক্ষরে অক্ষরে পুনর্মুদ্রিত করা এখন অসম্ভব, ইহা নিশ্চিত। কারণ অধিকাংশ লোকই চারিপাশের চাপে গড়িয়া উঠে, এবং সমাজ সেই চাপ দিবার যন্ত্রবিশেষ। এক এক সময় এই সামাজিক চাপে মেয়েদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, কিন্তু স্বভাব কিম্বা শিক্ষার গুণে কিম্বা দোষে অধিকাংশস্থলে তাহারা চীন-রমণীর পায়ের ন্যায় সেই চাপ অনুসারে নিজেদের গড়িয়া লয়,—এমন কি একটু ঢিলা পড়িলে অস্বস্তি বোধ করে,—অভ্যাসের এমনি মহিমা! কোন শঙ্কর মহারাজের এক কলমের টানে, এক পরোয়ানার জোরে যদি একদিনে বাঙ্গলাদেশে অবরোধপ্রথা রহিত হইয়া যায় (হায় রে দুরাশা!) তাহলে বাঙ্গালীর মেয়ে কি প্রথমে সত্য সত্যই সন্তুষ্ট হয়? যেমন "স্বভাব ম'লেও যায় না", তেমনি স্বাধীনতাও পাইলেই লওয়া যায় না,—তাহার মূল্য বুঝিতে পারা, তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারার জন্য আগে শিক্ষা দরকার; এবং সে শিক্ষার জন্য সময় দরকার। তবে সামাজিক মন বলিয়া যদি কোন পদার্থ থাকে, তাহা অজ্ঞাতসারেও শ্রেয়ঃপথে চলিবে, ইহাই আমাদের আশা ও প্রার্থনা। আমরা চাই,—যতই অন্ধ ও দুর্ব্বলভাবে

হউক না কেন,—তবুও আমরা চাই যে, যাহা সত্য তাহাই ধরি, যাহা ভাল তাহাই করি, যাহা সুন্দর তাহাই গড়ি। "সেকাল গেছে বইয়া",—আর ফিরিবে না। এখন একালে কঃ পন্থা, —তাহাই জিজ্ঞাস্য।

আমাদের দেশে এত বিভিন্নপ্রকার লোকাচার প্রচলিত যে, মনে হয়—যাহা নাই ভারতে তাহা নাই জগতে। এখানকার প্রকৃতিও যেমন বহুরূপী, সম্প্রদায়ও তেমনি অসংখ্য, রীতিনীতিও তেমনি জটিল। আমাদের অগাধ শাস্ত্রসমুদ্র মন্থন করিয়া, না পাওয়া যায় হেন মত নাই,—আমাদের বিপুল দেশে অনুসন্ধান করিলে, না মেলে হেন প্রথা নাই। কোন একটি ইংরাজ রাজপুরুষ বলিয়াছেন না কি যে ভারতবর্ষে পঞ্চম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সভ্যতার সকল স্তরই বিদ্যমান। কথাটি লাখ কথার এক কথা। কৌলিন্য ও ব্রহ্মচর্য্য, নাস্তিকতা ও পৌত্তলিকতা, হিঁদুয়ানি ও ম্লেচ্ছপনা, অহিংসা ও নরবলি, সাহেবিয়ানা ও স্বদেশীয়ানা, শাক্ত ও বৈষ্ণব প্রভৃতি পরস্পর-বিরোধী ভাব, মত ও আচার কিরূপে এমন নির্ব্বিবাদে এক দেশে, এক কালে, এক সম্প্রদায়ে, এমন কি এক গৃহতলে পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি বাস করিতে পারে, তাহা বিদেশী বুঝিবে কি,—আমাদেরই বুঝিয়া ওঠা ভার।

তবে কি আমাদের দেশ এক নহে, আমরা এক জাতি নহি? —অতীতে কি ছিল ঠিক বলিতে পারি না,—সম্পূর্ণ "স্বরাজ" না থাকুক, অন্ততঃ "স্ব স্ব রাজ" ছিল বোধ হয়। কিন্তু আচারে আজকাল আমরা যেমন সঙ্কীর্ণ, মত ও বিশ্বাসে তেমনি চিরকালই আমরা কিছু অতিরিক্ত উদার। আমাদের দোষও তাই, আমাদের

গুণও তাই। ভারতমাতা নির্ব্বিচারে সকল দেশের সকল কালের ধর্ম্মকর্ম্মকে নিজের অঙ্কে স্থান দিয়াছেন,—গ্রহণ, পালন ও রক্ষা করিয়াছেন, কোন অতিথিকে ফিরান নাই।

কিন্তু জাতিগঠন করিতে হইলে একটা নির্দ্দিষ্ট কিছু হওয়া চাই। মানুষ স্বভাবতঃ সর্ব্বজনীন জীব নহে;—আগে বিশেষ দেশের বিশেষ কালের মানুষ হইয়া সে জন্মায়, তাহার পর সাধনার ফলে বিশ্বমানবের অংশীদার হইয়া উঠিলে তবে তাহাকে মানায়। জীবাত্মার স্বাতন্ত্র্য হইতে ক্রমে পরমাত্মার সাযুজ্যে পৌঁছিতে পারিলে তবে ত সুখ,—নহিলে সাকার নিরাকারের কোন অর্থই থাকে না, সবই একাকার। সেই বিশিষ্ট আকারটি আমাদের নিজের জাতকে দিবার সময় আসিয়াছে, এখন যেন সৃজনের পূর্ব্বে নীহারিকার ন্যায় আমাদের অবস্থা।

নিরাকার উপদেশ অপেক্ষা সাকার দৃষ্টান্ত ভাল। ছেলেবয়স হইতে বুড়াবয়স পর্য্যন্ত অনেকপ্রকার পরিবর্ত্তনের মধ্যেও ত প্রত্যেক মানুষের ভিতরকার ঐক্য বজায় থাকে, নষ্ট হয় না। সেইরূপ আমাদের আপাতদৃষ্ট বৈচিত্র্য এবং বিশৃঙ্খলতার মধ্যেও যে এক আছে, তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহাকে প্রকাশ করিতে হইবে, তাহাকে নব কলেবর ধারণ করিতে হইবে।

হিন্দু জাতির মুস্কিল এই যে, তাহার সেই সূক্ষ্মশরীর এতই সূক্ষ্ম যে, মনশ্চক্ষেও ধরা কঠিন। হিন্দুত্বের প্রাণ কিসে এবং কোথায়, সে সম্বন্ধে এলাহাবাদের এক কাগজ কিছুকাল পূর্ব্বে যে প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন, তাহার বিভিন্ন উত্তর হইতে এই বিষয়ের দুরূহতা প্রতিপন্ন হইবে।

কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে কিম্বা বুঝাইতে না পারিলেও আমরা মনে মনে জানি আমরা এক। কেবল ইংরাজরাজের সূত্রপাত হইতে আচম্‌কা নানা নূতন ভাবের ও কাজের প্রেরণায় এবং তাড়নায় আমাদের স্বাভাবিক পরিণতি এত বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে সব-দিকের সামঞ্জস্য রক্ষা করা কঠিন। সময়ে যে ঐক্যবিধান করে তাহা মানানসহি হয়, কিন্তু সুবিধার খাতিরে রাতারাতি জোরজবরদস্তি করিয়া যে বাহ্য ঐক্যসাধন করিতে হয়, তাহা প্রায়ই সৌষ্ঠবহীন।

আমাদের চিরনিদ্রিত দেশ-কুম্ভকর্ণের ঘুম যে সম্প্রতি ভাঙ্গিয়াছে এবং তাহার অর্দ্ধাঙ্গিনী ভারত-ললনাও যে জাগিয়াছে, তাহার প্রমাণ সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা পাওয়া যাইতেছে। এখনই সুসময়। "সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই" কালে,—এ কথা আমাদের সকলেরই মনে করা উচিত, অন্ততঃ যাহাদের "এই দেশে"র জন্য কিছু করিবার কিছুমাত্র অভিপ্রায় আছে। বর্ত্তমান কাল-পুরুষের নিঃশ্বাস বেগে পড়িতেছে, তাহার রক্ত জোরে বহিতেছে, তাহার নাড়ীর গতি চঞ্চল। এই সুযোগে যিনি যাহা করিবেন তাহার ফল হইবার যত সম্ভাবনা, প্রত্যেকের হাতে জাতিগঠনে সহায়তা করিবার যত ক্ষমতা দেখা যায়, এমন দৃষ্টান্ত অন্যান্য দেশকালে বিরল।

কিন্তু এ সময়ে অবিবেচনার ফলও সেই পরিমাণ মন্দ হইবার সম্ভাবনা, তাই সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে হইবে। এখন প্রথম ধাক্কা সামলাইয়াছি। ভালই হউক, মন্দই হউক, আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সমাজসংস্কারের যে স্তরে আমাদের তুলিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেখান হইতে আমরা চারিধার দেখিবার, বুঝিবার ও যাচাই করিয়া লইবার

সুবিধা পাইয়াছি। এই মৃৎপ্রদীপের দেশে এতদিনে বৈলাতিক ভাবের বৈদ্যুত আলো চোখে সহিয়া গিয়াছে,—এখন আর অন্ধভাবে কাজ করিবার ওজুহা নাই। "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" বলিবার কাল গিয়াছে। এখন "প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।"

সেই সদ্‌গুরু আমাদের উপদেশ দিন, একালের বাঙ্গালীর মেয়ে কোন্ আদর্শ শিরোধার্য্যপূর্ব্বক জীবনপথে অগ্রসর হইবে! সীতা সাবিত্রীর কথা তুলিবেন না। সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। তাঁহারা চিরকালই আমাদের চিত্তাকাশে তারার ন্যায় জ্বল্‌জ্বল্ করিবেন, কিন্তু তারার আলোয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না। ওদিকে পশ্চিম সমুদ্র পারে নানাপ্রকার নব-নারীদলের বিদ্রোহ রণযাত্রার রক্তবর্ণ মশালের আলো আমাদের নবজাগ্রত চক্ষু ও চিত্তে ধাঁধা লাগাইতেছে। সেই বিদেশিনীকে "তোমারে সঁপেছি প্রাণ" বলিয়া আমরা কেহ কেহ তাহার পায়ে সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিতেছি, কিন্তু সত্যই কি আমরা তাহাকে "চিনি গো চিনি তোমারে" বলিতে পারি? এই তারা ও মশালের আলোর মধ্যবর্ত্তী স্নিগ্ধোজ্জ্বল স্থিরজ্যোতি সন্ধ্যাপ্রদীপ কে জ্বালিয়া দিবে?

আমরা দৈনিক জীবনের সহযাত্রী চাহি,—যিনি আমাদের সুখদুঃখ সুবিধা-অসুবিধা বুঝিবেন, আমাদের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করিবেন, অথচ যিনি আমাদের কাজে কর্ম্মে, গৃহে সমাজে, আচারে অনুষ্ঠানে, ভাবে ভাষায়, চাল চলনে অধিনেত্রী হইবেন; কোন একজন বিশেষ দেবী বা মানবী নহেন, কিন্তু বহুকালের বহুলোকের সাময়িক আত্মপ্রকাশ—শুধু কথার সমষ্টি নহে, কিন্তু এখনকার আদর্শ বঙ্গরমণীর সুস্পষ্ট ধ্যানমূর্ত্তি।

আমরা আধুনিক বঙ্গনারী "কি করব, কি বেশ ধরব", কি প্রকার গৃহস্থালী, কিরূপ সামাজিক আচরণ অবলম্বন করিব, যাহাতে কালে একটি সুশোভন, সুসঙ্গত, সুশৃঙ্খল নব্য বঙ্গসমাজ গড়িয়া উঠিতে পারে—যে সমাজ গতকালের সহিত যোগ ত্যাগ না করিয়াও অনাগতকালের প্রতি মনোযোগ করিবে? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয়ের দোষ বর্জ্জনপূর্ব্বক গুণের মিলন সাধিতে হইবে, সে কথা "বলিতে সহজ বটে, করিতে তা' নয়।" কি প্রণালীতে, কোন্ পরিমাণে কোন্ মশলা বা দ্রব্য মিশ্রিত করা হয়, তাহার উপরেই আহার্য্যের তার এবং ঔষধের গুণ নির্ভর করে। অযথা মাত্রায় অমৃতও বিষে পরিণত হয়। আপাততঃ আমরা অধিকাংশ লোক অন্তরে ও বাহিরে,—বিশেষতঃ বাহিরে,—যে-ভাবে পূর্ব্ব পশ্চিম মিলাইয়াছি, তাহাতে দুইয়ের একত্রীকরণ হইয়াছে মাত্র, একীকরণ হয় নাই। এই রাসায়নিক মিলনটি যদি আমরা ঘটাইতে পারি, তাহলে আমাদের মেয়েরা তাহার সুফল ভোগ করিবে। দুই নৌকায় পা দিয়া টলমল করিবার বিপদ হইতে যেন তাহাদের উদ্ধার করিয়া যাইতে পারি।

এ সকল বিষয়ে এত মতভেদ ও গোলযোগের কারণ এই যে, চিন্তা ও কার্য্য পাশাপাশি চলিলেও, সমান পদবিক্ষেপে চলে না। এ যেন ধীরগামী বৃদ্ধের সহিত চঞ্চল বালকের বিচরণ। বৃদ্ধ শান্তদান্ত সমাহিতচিত্তে, নতনেত্রে, অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সমভাবে চলিয়াছেন, ভূত ভবিষ্যতের ছবি মনোমধ্যে বায়োস্কোপের ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে সরিয়া যাইতেছে, বর্ত্তমানের সহিত যোগসূত্রস্বরূপ বালকটির লীলাখেলা দেখিয়া মাঝে মাঝে হাসিতেছেন, কখনো কখনো তাহার সরল চতুর প্রশ্নের উত্তর দিতেছেন, আবার

মনোরাজ্যে প্রবেশ করিতেছেন; বালকটি হাস্যোজ্জ্বল মুখে চারিদিকে চাহিতে চাহিতে বৃদ্ধের হাত ধরিয়া চলিয়াছে, কিন্তু তাহার ন্যায় গুরুগম্ভীরভাবে চলা কি তাহার পোষায়? সে কখনো লাফায়, কখনো প্রজাপতির পিছনে ছোটে, কখনো পথপার্শ্বের ফুল কুড়ায়, কখনো অকারণ-আনন্দে দৌড়িয়া অগ্রসর হয়, আবার দৌড়িয়া পিছাইয়া আসিয়া তাঁহার হাত ধরে, তাঁহাকে অসংখ্য অসম্ভব প্রশ্নে বিব্রত করিয়া তোলে, এবং উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়াই আপনার কথা সাত-কাহন করিয়া বকিয়া যায়। অথচ দুইজনেরই পরস্পরকে নহিলে চলে না। এই জুড়িই জীবনশকটের বাহন, তাই আমাদের এমন অপূর্ব্ব তরঙ্গায়িত গতি!

চিন্তাশীল ভাবুক লোক যতক্ষণ কথায় বা লেখায় তাঁহার বিচারের ফল প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, এদিকে ততক্ষণ তাঁহার নিজেরই সংসারের কাজ সেই মতামতের পরিণতির অপেক্ষায় বন্ধ থাকিতে পারে না,—যেন তেন প্রকারে তাঁহাকে চলিতে এবং চালাইতে হইবেই। সেই জন্য আমাদের কথায় ও কাজে এত গরমিল, আমাদের জীবনে ও মনে এত অসঙ্গতি পদে পদে দৃষ্ট হয়। কর্ম্ম প্রথমে ঝোঁকের মাথায় হয় ত বিপথে চলিতে থাকে, তারপর চিন্তা যখন তাহার নাগাল পায় তখন তাহাকে সৎপরামর্শ দিয়া গতিবেগ মন্দ করাইয়া কিছুদূর ফিরাইয়া আনে,—আবার সে এগাইয়া যায়, আবার চিন্তার আকর্ষণে পিছু হটে। সেই জন্য জীবনের গতিরেখা সরল নহে,—ঐ প্রকার কুটিল, অর্থাৎ অগ্রপশ্চাৎ করিতে করিতে তবে সে অগ্রসর হয়,—যেমন সেই বালক পিছাইয়া আসিয়া আবার বৃদ্ধের সঙ্গ ধরে।

ঋষিগণ ধর্ম্মের পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় কহিয়াছেন, কিন্তু কর্ম্মের পথ যে কতক পরিমাণ করাতের ন্যায়, সে তথ্য তাঁহারা জানিতেন কি না কে জানে! সকল কাজই যদি বিবেচনাপূর্ব্বক করিতে হইত, তাহলে বোধ হয় মানুষ এক পাও এদিক ওদিক নড়িতে পারিত না, স্থানু হইয়া থাকিত। চিরাগত সংস্কার ও সামাজিক প্রথা এই সঙ্কট হইতে আমাদের পরিত্রাণ করে। সুতরাং সেগুলিকে হঠাৎ উড়াইয়া দেওয়া কিছু নয়। আর সেগুলির পিছনেও আমাদের পূর্ব্বপুরুষের চিন্তা রহিয়াছে, সেগুলি কিছু আকাশ হইতে পড়ে নাই। কর্ম্ম যখন চিন্তাকে ছাড়াইয়া চলিয়া যায়, তখন এই পূর্ব্ব-সংস্কারই তাহাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করে ও ধাত্রীর ন্যায় নূতন চিন্তা-সমাগমের অপেক্ষা করে। সেকালের হিন্দুগণ সকল বিষয়েরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিয়া তবে ছাড়িতেন,—এস্থলেও তাঁহারা চিন্তার অতি স্বাধীনতা এবং কর্ম্মে অতি অধীনতা স্বীকার করিয়া এই বৈষম্যের মীমাংসা করিয়াছেন।

কিন্তু আজকাল জ্ঞাতসারে মতে ও কাজে অত তফাৎ করা আমাদের মনঃপূত নহে। সম্পূর্ণরূপে না পারিলেও, অন্ততঃ কিয়ৎপরিমাণে বিশ্বাস অনুযায়ী জীবনযাপন করিবার চেষ্টাও ত করা উচিত?—তাই বলি সেকালের জীবনযাত্রার যতই সৌন্দর্য্য ও সামঞ্জস্য থাক্ না কেন, একালে আমরা তাহা ফিরাইয়া আনিতে পারিব না, কারণ আমরা আজকাল তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না, সে সরল নির্ভরের ভাব হারাইয়াছি। তখন ছিল পূর্ব্বানুবৃত্তির কাল, বাধ্যতার কাল;—এখন হইয়াছে পরীক্ষার কাল, স্বাধীনতার কাল। যস্মিন কালে যদাচারঃ। এখন

পৃথিবীময় স্বাধীনতার হাওয়া বহিতেছে, কেহ কাহারো অধীনতা স্বীকার করিতে নারাজ। "পড়ে এই কলির ফেরে সব যেরে ভেঙে চূরে ভেসে যায়।" এই ভাঙ্গনের দিনে, উচ্ছৃঙ্খলতার মুখে, আমরা মেয়েরা যদি একটু মাথা ঠাণ্ডাভাবে হাল ধরিতে না পারি, তাহলে সংসারতরী যে কোন্ রসাতলে তলাইয়া যাইবে তাহার ঠিকানা নাই।

পরিবর্ত্তনের কালে অসামঞ্জস্য অবশ্যম্ভাবী। মনে করিলেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর নব্য বঙ্গসমাজ অহিরাবণের ন্যায় বর্ম্মচর্ম্মসমাবৃত যোদ্ধৃবেশে অবতীর্ণ হইবে না। যিনি এই সকল বিপরীত ভাব মত এবং আচারের কথঞ্চিৎ "সমন্বয়" সাধন করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই জানেন সে কাজ কত দুঃসাধ্য। কিন্তু অসাধ্য নহে,—যদি আমরা সকলে মিলিয়া চেষ্টা করি। স্রোতে গা ভাসাইয়া না দিয়া কেহ কোন বিষয়ে যুগোপযোগী অনুষ্ঠানের ইচ্ছা বা চেষ্টার কোন পরিচয় দিতেছেন দেখিলেও আনন্দ বোধ হয়। পরদেশী সঁইয়ার গলায় মাল্যদান যখন কপালে লেখা আছেই, তখন নিজে জাতিভ্রষ্ট না হইয়া তাঁহাকে কিরূপে জাতে তুলিয়া লওয়া যায়, ইহাই সমস্যা।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি কাজ করে সকলেই, কিন্তু ভাবে দুই চারি-জন মাত্র। অথচ এই ভাবনাই কার্য্যসিদ্ধির উপায়। চিন্তা ও কর্ম্ম পরস্পর-আশ্রিত,—যেমন বুদ্ধি ও হৃদয়, দক্ষিণ-হস্ত ও বামহস্ত। কামার কুমোর ছুতার প্রভৃতি যেমন আমাদের ভবের হাটের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সরবরাহ করে, ভাবুক লোক ও চিন্তা-শীল লেখক তেমনি আমাদের ভবলীলার আধ্যাত্মিক প্রয়োজন

সাধন করেন। কিন্তু তাঁহাদের বাণীর জন্য মনকে প্রস্তুত করিয়া রাখার ভার আমাদের হাতে। অনেকে তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়াও স্বচ্ছন্দে দিনপাত করে,—কিন্তু শেষ-রক্ষা হয় কি না সন্দেহ।

বাঁচিয়া থাকিতে গেলে যখন শিখিতেই হইবে, তখন "ঠেকে শেখা" অপেক্ষা "দেখে শেখা" ভাল। যাহারা হাটে কেনাবেচা করিয়াই দিন কাটায়, তাহাদের হয় ত ভাবের কথা কহিবার বা শুনিবার অবসর থাকে না, সব সময় দরকারও বোধ হয় না। কিন্তু মেয়েদের প্রধান কর্ম্মই গার্হস্থ্যধর্ম্ম,—সেই ধর্ম্মপালনের সহায়স্বরূপ ভাবের আদর্শ স্পষ্টরূপে মনে অঙ্কিত হওয়া চাই, জীবনের ভার বহিবে সংসারের ঝঞ্ঝা সহিবে, এরূপ দৃঢ় অটল আশ্রয় অন্তরে সঞ্চিত থাকা চাই। শক্ত কাম্বিসের ছবি আপনি দাঁড়াইতে পারে, কিন্তু নরম কাগজের ছবি না বাঁধাইলে লুটাইয়া গুটাইয়া নষ্ট হইয়া যায়।

"বাঙ্গালা দেশের হৃদয় হতে কখন্ আপনি" অপরূপ রূপে মাতৃমূর্ত্তি বাহির হইবেন জানিনা; কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা তাঁহার-একটা কাল্পনিক ছবি আঁকিবার চেষ্টা করি না কেন? ভারত-শিল্পীগণের দ্বারস্থ হইলাম, তাঁহারা তুলিকা ও লেখনী তুলিয়া লউন, এবং নিজের একটি পরমপ্রিয় কন্যা থাকিলে তাহাকে কিরূপে মানুষ করিতেন,—কেবলমাত্র বিবাহের পাত্রী নহে, কিন্তু জীবনের যাত্রী হিসাবে তাহাকে গড়িতে চাহিলে কি কি মালমশলা ব্যবহার ও কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিতেন, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত সুস্পষ্ট বর্ণনা দানে আমাদের বাধিত করুন। আমাদের

মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষা ও দেশের হিতাহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত জানিয়া নিশ্চয়ই আমরা তাঁহাদের সদুপদেশ গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইব না।

"পৃথিবী জুড়িয়া বেজেছে বিষাণ",—কে জানে ভবিষ্যতের গর্ভে কোন্ মহাপ্রলয় সৃজিত হইতেছে? যাহাই আসুক্ ও যাহাই হউক্, আমরা নিজেদের প্রস্তুত রাখিলে তরঙ্গের অভিঘাত অগ্রাহ্য করিতে পারিব। আধুনিক বঙ্গরমণীকে কোন্ ছাঁচে ঢালিলে ভাল হয় সে বিষয়ে একটা স্পষ্ট ধারণা থাকিলে অনেক নিষ্ফলতা ও বাক্‌বিতণ্ডা হইতে অব্যাহতি পাইব। এখন "বুঝিতে বোঝাতে দিন চলে যায়, ব্যথা থেকে যায় ব্যথা।"

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

প্রিগ্

"প্রিগ্" কথাটি ইংরাজী। বাংলায় এর জুড়ি নেই।—এর থেকে মোটামুটি দুরকম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়ঃ—

(১) ঐ জাতীয় জীব বাংলাদেশে কোনও কালে ছিল না এবং

(২) বাংলাদেশে চিরকালই সবাইই প্রিগ্। এ ছাড়া এই সত্যটুকুর উপরে আরো অনেক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা যায় যথা—

(১) প্রিগ্‌কে প্রিগ্ বলবার মত মনোভাব বাংলা দেশে ছিল না, কারণ—

(২) বাংলা দেশে নৃতত্ত্ব-বিদ্যার চর্চ্চা নূতন, ইত্যাদি। কিন্তু "প্রিগ্ বস্তুটি কি সেই কথা আলোচনা করবার জন্যই এ প্রবন্ধ লেখা।

আমার গোড়াপত্তন দেখেই বুদ্ধিমান পাঠক বুঝতে পেরেচেন যে প্রিগ্ এক জাতীয় মনুষ্য। এ অনুমান সত্য।

কিন্তু, মানুষের জাতিভাগ করা বড় সহজ কর্ম্ম নয়। মনু যা করতে গিয়ে হার মেনেছেন আমি তা করতে সাহস পাইনে।—তাই আমি প্রিগ্‌কে মানুষের এক জাতি না বলে, প্রিগত্বকে মানব-মনের একটি বিশেষ অবস্থা বলে বর্ণনা করতে চাই। কারণ প্রিগ্ যে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত আগাগোড়াই প্রিগ্ এবং চিরকালই প্রিগ্ তা আমি বলতে চাইনে।

প্রিগত্বের বর্ণনা করা যেতে পারে, কিন্তু ব্যাখ্যা করা যায় না। তাই নানা রকম করে ব্যাপারখানা কি তা বোঝাতে চেষ্টা করচি।

জার্ম্মান ভাষায় প্রিগকে "ঊর্দ্ধনাসা" বলে অভিহিত করা হয়।

সকলেই জানেন যে উক্ত অঙ্গ স্বভাবত নীচের দিকেই ঝুলে থাকে। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সঙ্গে মাটির সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ঠ, কেননা শাস্ত্রমতে পৃথিবী গন্ধগুণ। প্রিগ্ হচ্ছেন তিনি, যিনি মাটিকে বাদ দিয়ে কেবল আকাশের দিকেই নাসিকাটিকে চালাতে চান।

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম অর্থাৎ ধূলো, ঘাম, ধোঁয়া ও কেরোসিনের আলো এই কটায় মিলে তো সংসার। এগুলো থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে "পরিষ্কার" হয়ে যাঁরা থাকতে চান, তাঁদের প্রিগ্ নামে অভিহিত করা যায়।

প্রকৃতির ঘরে যারা সত্যিসত্যি বাস করেছে তারা জানে যে আকাশের অবস্থা প্রায়ই বিশ্রী। হয় বিশ্রী গরম, না হয় বিশ্রী ঠাণ্ডা, না হয় বিশ্রী বাদুলে। তারা জানে যে বাতাস প্রায় সব সময়েই একটা আপদবিশেষ। প্রিগের কিন্তু এই আকাশ বাতাসের উপর "কবিত্ব" করার আর অবধি নেই।

মানুষকে যারা চিনতে চেষ্টা করেছে তারা জানে যে মানুষ মাত্রেই দোষে-গুণে-গড়া।—মানুষের বেশী ভালবাসবারও কিছু নেই—বেশী ঘৃণা করবারও কিছু নেই;—চেষ্টা করলে সবাইকেই অল্প-বিস্তর ভালবাসা যায়। কিন্তু ভালবাসলেই যে তার সঙ্গে চিরকাল সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না করা যায় তাও নয়। তোমার ভালবাসার লোকটির শরীর ও মনে কমবেশী ধূলো মাটি আছে। প্রিগ্ কিন্তু এ সত্য দেখতে চান না—তিনি ধরে বসে আছেন "পবিত্র প্রেম"। তিনি মানুষকে "ভাল" এবং "মন্দ" এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে বসে আছেন এবং এর একভাগ থেকে আর-এক ভাগে যাবার কোনও পথই দেখতে পান না।

উপরের এ সব কথা থেকে এটা যেন কেউ না ভাবেন যে প্রিগ সংসারটাকে কেবল অসম্ভব রকম "ভাল" বলেই দেখেন। যিনি অসম্ভব রকম "মন্দ" বলে সংসারটাকে দেখেন তিনিও প্রিগ্। কারণ প্রিগত্বের ধর্ম্ম হচ্ছে একটা বুলির সাহায্যে সংসারকে বোঝবার চেষ্টা করা। জীবনের জাল হরেক রঙের হরেক রকম সূতো দিয়ে বোনা। কোন একটি সূত্র ধরে তার নিরাকরণ করবার যো নেই। এ কথা যাঁরা ভুলে যান তাঁরাই প্রিগ। ঘরে দরজা দিয়ে সংসার সম্বন্ধে যাঁরা দার্শনিক তত্ত্ব আবিষ্কার করতে যান, তাঁদের প্রিগ না হয়ে উপায় নেই। তুলোর বাক্সে কাবুলী-আঙ্গুরের মত জীবন যাঁরা যাপন করেন তাঁরাই হচ্ছেন প্রিগ্।

এ রকম জীবনযাত্রা আমাদের দেশে গত দু তিন পুরুষ থেকেই সম্ভব হয়েছে। তার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রিগ্ হবার সম্ভাবনা আমাদের দেশে অল্পই ছিল। একদিকে উচ্চশিক্ষা এবং অপর দিকে ঘরে বসে পোলাও-কালিয়া খাবার সংস্থান এবং শক্তি এই দুয়ের সমাবেশেই প্রিগত্বটা বেশী জেঁকে ওঠে। কাজেই, প্রিগ-জীবটা আমাদের দেশে নূতন—কিন্তু এতদিন এ শব্দটি ব্যবহৃত হয় নি—কারণ আমাদের দেশে নূতন কিছু হ'লে আমরা অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য তাকে সিঁদুর চন্দন দিয়ে পূজো করি।

আসল কথা হচ্ছে এই যে, গত দু পুরুষের লোকেরা অর্থাৎ আমাদের বাপদাদারা প্রায় আগাগোড়া প্রিগ। আমরা আপাততঃ এঁদের প্রিগ বলে বুঝতে শিখছি। কাজেই এ কথাটার চলন নিকট-ভবিষ্যতে বহুলরূপে হবে বলে আশা করা যায়। এখনও আমাদের দেশে প্রিগ যে বড় কম তা নয় কিন্তু তাকে সিঁদুর

চন্দন লেপে পূজো করবার ভাবটা আমাদের অনেকটা কেটে যাচ্ছে।

কিন্তু এখনও বোধ হয় প্রিগকে ঠিক চেনাতে পারি নি। দু চারটে উদাহরণ দেব।

রয়াল রীডারের জর্জ ওয়াসিংটন একজন মস্ত বড়-দরের প্রিগ, তার প্রমাণ তাঁর সেই চেরীর গল্প। নয় বছরের যে বালক বাপকে গম্ভীরভাবে বলতে পারে "পিতা আমি মিথ্যা কথা বলিতে পারি না," সে যদি প্রিগ না হয় তবে সংসারে প্রিগ কেউ নেই, কেউ ছিল না, এবং কেউ হবে না। কেন, বাপু, মিথ্যা কথা বলতে পারনা কেন? মনে কি করেছ যে সংসারে কেবল খাঁটি সত্য কথা বলে চালাবে? সংসারকে অত সহজ পাও নি!

আসল কথা হচ্ছে যে, দর্শনের কেতাবে ভাল-মন্দ, সত্য-মিথ্যা ইত্যাদির মধ্যে যে রকম স্পষ্ট বিভাগ করা যায়—সংসারে তা যায় না। বেশীর ভাগ ব্যাপারেই খাঁটি সত্য কথা বলা যায় না;—জানলে তো বলব? যিনি প্রতিজ্ঞা করে বসেছেন "পিতা, আমি মিথ্যা বলিতে পারি না" তিনি গোড়াতে তো এক মস্ত মিথ্যা কথা বল্‌লেনই—তা ছাড়া এ কথাও জানিয়ে রাখলেন যে তিনি চিরজন্ম চারিদিকে গঙ্গাজল ছিটিয়ে আর গোবর নিকিয়ে একটা অসম্ভব রকম সহজ এবং ছোট্ট সংসারে বাস করবেন—যে সংসারটা মোটেই সত্যিকার সংসারের মতন নয়। এর ফলে হয় তো তিনি কেবল সত্যি কথাই বলবেন কিন্তু সে সব কথা বলবার কোনও দরকার আছে কিনা সন্দেহ।

যাই হোক, আমাদের দেশের গত পুরুষের প্রিগত্ব প্রায় সবই

এই জাতীয় প্রিগত্ব। তাঁরা সব অসম্ভব রকমের "ভাল লোক" ছিলেন। ভাল হবার বেশ একটা অত্যন্ত সহজ কলও তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন—সেটার নাম হচ্ছে "বিবেকবুদ্ধি"।

আমাদের দেশের কোন একটি খ্যাতনামা ব্যক্তির সম্বন্ধে একটি সত্য গল্প এইরূপঃ—তাঁহার এক ভৃত্য একদা যথারীতি বাজারের পয়সা চুরি করিয়া ধরা পড়ে। তাহাকে মনিবের নিকট আনা হইলে তিনি অশ্রুগদ্গদ স্বরে তাহাকে এইরূপ অভিভাষণ করিলেন "বাপু হে, তোমার কি বিবেকবুদ্ধি নাই? তোমাকে আমি খাওয়াই পরাই এবং পুত্রসম স্নেহ করি, তোমার কর্ত্তব্যবুদ্ধি কি এতই অপরিপক্ক!" ইত্যাদি। এ গল্পটা হ'তে প্রসঙ্গচ্ছলে আর এক তথ্য আবিষ্কার করা যায়!—প্রিগ হচ্ছেন অসম্ভব রকম গম্ভীরপ্রকৃতির লোক—মন-খুলে হাসতে তাঁকে প্রায়ই দেখা যায় না।

যাই হোক, গতযুগের প্রিগত্বটা আগগোড়াই এই জাতীয় বিবেকবুদ্ধি-সংক্রান্ত।

সংসারটাকে তাঁরা এক হিসাবে বেশ সহজ করে নিয়ে ছিলেন। মানুষের মনের মধ্যে এমন এক আশ্চর্য্য কল তাঁরা দেখেছিলেন যার থেকে প্রত্যেক জিনিষের এবং প্রত্যেক অবস্থার ভাল-মন্দ এক মুহূর্ত্তে বেছে নেওয়া যায়। এবং যে ভালটা বেছে নেয়, সর্ব্বদা সে-ই "ভাল লোক"।

এ সম্বন্ধে প্রথম বক্তব্য হচ্ছে এই যে, এ রকম মতে ভাল লোক হওয়া অত্যন্ত সহজ। তা ছাড়া এ মতের আর-এক অদ্ভুত ফল হচ্ছে এই যে, বিবেক দিয়ে মানুষকেও চিনে নেওয়া যায় এক

মুহূর্ত্তে। মানুষসম্বন্ধেও আমাদের ঠাকুর্দ্দার আমলের লোকেরা অতি সত্বর বিচার করতে পারতেন—একটা লোক ভাল কি মন্দ সে সম্বন্ধে স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে তাঁদের বেশী কষ্ট হো'ত না। পারলে তো ভালই ; কিন্তু বিবেক-নামক অমন নির্ভুল কষ্টিপাথর মনুষ্য-নামক জীবের অন্তরে ত নেই—আর মানুষও যে এক নয় বহু। যে লোকটা আজকে খুন করেছে—কালকে যে সে একটা লোককে জলে-ডোবা থেকে বাঁচাতে গিয়ে মর-মর হয়েছিল, তার কি ?

এ বিবেকসম্বন্ধীয় প্রেগত্ব যদিও আপাতত অনেকটা কমেছে তবু আজো একেবারে যায় নি। সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে এর একটা দৃষ্টান্ত সহজেই চোখে পড়ে। কিছুদিন আগে অবশ্য আমাদের সাহিত্য-সমালোচনা অত্যন্ত সহজ ছিল। কেতাবটা "ভাল" কি "মন্দ" সেই বিচারই আমরা করতাম—কিন্তু সেটা প্রায় লেখক "ভাল লোক" কি "মন্দ লোক" এই বিচারেই পর্য্যবসিত হোত। কাজেই হয় "আহা আহা, বাহা বাহা ! এমন কি আর পড়ব ? এমন কি আর শুনব ?" না হয়—

"চণ্ডালের হাত দিয়া পোড়াও পুস্তকে
"ভস্মরাশি করে ফেল কর্ম্মনাশা জলে।"

আজকাল আমরা তা আর করি নে ;—কিন্তু বইটা থেকে সমাজের উপকার কি অপকার হবে তা খুব চট্ করে বলে ফেলতে পারি। আসলে কিন্তু সমাজের জন্য নিয়মধার্য্য করা, মানুষকে বিচার করার চেয়ে সহজ হ'লেও, একটা কেতাবের মর্ম্ম

উদ্ধার করা ঢের কঠিন। কিন্তু প্রিগ তো আর কিছু বুঝতে চেষ্টা করা আবশ্যক মনে করেন না। তিনি যে সূত্র ধরে বসে আছেন সেই সূত্রের উপর নখের আঁচড় দিয়ে নানারকম সুর ও তান বার করতেই তিনি ব্যস্ত। অনেক ভেবেচিন্তে অনেক কষ্ট স্বীকার করে যা বুঝতে হয় তিনি তাকে বিচার করতে ব্যস্ত।

প্রিগ শেষ পর্য্যন্ত এটা বোঝেন না যে বুঝতে চেষ্টা করাটাই হচ্ছে মানুষের আসল কর্ম্ম;—বিচার করা নয়।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসু।

কৃপণতা

দেশের কাজে যাঁরা টাকা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছেন তাঁদের কেহ কেহ আক্ষেপ করিতেছিলেন যে, টাকা কেহ সহজে দিতে চাহেন না, এমন কি, যাঁদের আছে এবং যাঁরা দেশানুরাগের আড়ম্বর করিতে ছাড়েন না তাঁরাও।

ঘটনা ত এই কিন্তু কারণটা কি খুঁজিয়া বাহির করা চাই। রেলগাড়ির পয়লা দোস্‌রা শ্রেণীর কামরার দরজা বাহিরের দিকে টানিয়া খুলিতে গিয়া যে ব্যক্তি হয়রান হইয়াছে তাকে এটা দেখাইয়া দেওয়া যাইতে পারে যে, দরজা হয় বাহিরের দিকে খোলে, নয় ভিতরের দিকে। দুই দিকেই সমান খোলে এমন দরজা বিরল।

আমাদের দেশে ধনের দরজাটা বহুকাল হইতে এমন করিয়া বানানো যে, সে ভিতরের দিকের ধাক্কাতেই খোলে। আজ তাকে বাহিরের দিকে টান দিবার দরকার হইয়াছে কিন্তু দরকারের খাতিরে কলকব্‌জা ত একেবারে একদিনেই বদল করা যায় না। সামাজিক মিস্ত্রিটা বুড়ো, কানে কম শোনে, তাকে তাগিদ দিতে গেলেই গরম হইয়া ওঠে।

মানুষের শক্তির মধ্যে একটা বাড়তির ভাগ আছে। সেই শক্তি মানুষের নিজের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি। জন্তুর শক্তি পরিমিত বলিয়াই তারা কিছু সৃষ্টি করে না, মানুষের শক্তি পরিমিতের বেশি বলিয়াই তারা সেই বাড়তির ভাগ লইয়া আপনার সভ্যতা সৃষ্টি করিতে থাকে।

কোনো একটি দেশের সম্বন্ধে বিচার করিতে হইলে এই কথাটি ভাবিয়া দেখিতে হইবে, যে, সেখানে মানুষ আপন বাড়তি অংশ দিয়া কি সৃষ্টি করিয়াছে, অর্থাৎ জাতির ঐশ্বর্য্য আপন বসতির জন্য কোন্ ইমারৎ বানাইয়া তুলিতেছে?

ইংলণ্ডে দেখিতে পাই সেখানকার মানুষ নিজের প্রয়োজনটুকু সারিয়া বহু যুগ হইতে ব্যয় করিয়া আসিতেছে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাতন্ত্র্য গড়িয়া তুলিতে এবং তাকে জাগাইয়া রাখিতে।

আমাদের দেশের শক্তির অতিরিক্ত অংশ আমরা খরচ করিয়া আসিতেছি রাষ্ট্রতন্ত্রের জন্য নয়, পরিবারতন্ত্রের জন্য। আমাদের শিক্ষাদীক্ষা ধর্ম্মকর্ম্ম এই পরিবারতন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া নিজেকে প্রকাশ করিতেছে।

আমাদের দেশে এমন অতি অল্পলোকই আছে যার অধিকাংশ সামর্থ্য প্রতিদিন আপন পরিবারের জন্য ব্যয় করিতে না হয়। উমেদারির দুঃখে ও অপমানে আমাদের তরুণ যুবকদের চোখের গোড়ায় কালী পড়িল, মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল, কিসের জন্য? নিজের প্রয়োজনটুকুর জন্য ত নয়। বাপ মা বৃদ্ধ, ভাইক'টিকে পড়াইতে হইবে, দুটি বোনের বিবাহ বাকি, বিধবা বোন তার মেয়ে লইয়া তাদের বাড়িতেই থাকে, আর আর যত অনাথ অপোগণ্ডের দল আছে অন্য কোথাও তাদের আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করেই না।

এদিকে জীবনযাত্রার চাল বাড়িয়া গেছে, জিনিষপত্রের দাম বেশি, চাকরির ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ, ব্যবসাবুদ্ধির কোনো চর্চ্চাই হয় নাই। কাঁধের জোর কমিল, বোঝার ভার বাড়িল, এই বোঝা

দেশের একপ্রান্ত হইতে অন্যপ্রান্ত পর্য্যন্ত। চাপ এত বেশি যে, নিজের ঘাড়ের কথাটা ছাড়া আর কোনো কথায় পূরা মন দিতে পারা যায় না। উঞ্ছবৃত্তি করি, লাথিঝাঁটা খাই, কন্যার পিতার গলায় ছুরি দিই, নিজেকে সকল রকমে হীন করিয়া সংসারের দাবি মেটাই।

রেলে ইষ্টিমারে যখন দেশের সামগ্রীকে দূরে ছড়াইয়া দিত না, বাহিরের পৃথিবীর সঙ্গে আমদানি রফতানি একপ্রকার বন্ধ ছিল আমাদের সমাজের ব্যবস্থা তখনকার দিনের। তখন ছিল বাঁধের ভিতরকার বিধি। এখন বাঁধ ভাঙিয়াছে, বিধি ভাঙে নাই।

সমাজের দাবি তখন ফলাও ছিল। সে দাবি যে কেবল পরিবারের বৃহৎ পরিধির দ্বারা প্রকাশ পাইত তাহা নহে—পরিবারের ক্রিয়াকর্ম্মেও তার দাবি কম ছিল না। সেই সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্ম পালপার্ব্বন আত্মীয় প্রতিবেশী অনাহূত রবাহূত সকলকে লইয়া। তখন জিনিষপত্র সস্তা, চালচলন সাদা, এই জন্য ওজন যেখানে কম আয়তন সেখানে বেশি হইলে অসহ্য হইত না।

এদিকে সময় বদ্‌লাইয়াছে কিন্তু সমাজের দাবি আজো খাটো হয় নাই। তাই জন্মমৃত্যুবিবাহ প্রভৃতি সকল রকম পারিবারিক ঘটনাই সমাজের লোকের পক্ষে বিষম দুর্ভাবনার কারণ হইল। এর উপর নিত্যনৈমিত্তিকের নানাপ্রকার বোঝা চাপানোই রহিয়াছে।

এমন উপদেশ দিয়া থাকি পূর্ব্বের মত সাদাচালে চলিতেই বা দোষ কি? কিন্তু মানবচরিত্র শুধু উপদেশে চলে না,—এ ত ব্যোমযান নয় যে উপদেশের গ্যাসে তার পেট ভরিয়া দিলেই সে উধাও হইয়া চলিবে। দেশকালের টান বিষম টান।

যখন দেশে কালে অসন্তোষের উপাদান অল্প ছিল, তখন সন্তোষ মানুষের সহজ ছিল। আজকাল আমাদের আর্থিক অবস্থার চেয়ে ঐশ্বর্য্যের দৃষ্টান্ত অনেক বেশি বড় হইয়াছে। ঠিক যেন এমন একটা জমিতে আসিয়া পড়িয়াছি যেখানে আমাদের পায়ের জোরের চেয়ে জমির ঢাল অনেক বেশি,—সেখানে স্থির দাঁড়াইয়া থাকা শক্ত, অথচ চলিতে গেলে সুস্থভাবে চলার চেয়ে পড়িয়া মরার সম্ভাবনাই বেশি।

বিশ্বপৃথিবীর ঐশ্বর্য্য ছাতা জুতা থেকে আরম্ভ করিয়া গাড়ি বাড়ি পর্য্যন্ত নানা জিনিষে নানা মূর্ত্তিতে আমাদের চোখের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে,—দেশের ছেলেবুড়ো সকলের মনে আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিমুহূর্ত্তে বাড়াইয়া তুলিতেছে। সকলেই আপন সাধ্যমত সেই আকাঙ্ক্ষার অনুযায়ী আয়োজন করিতেছে। ক্রিয়াকর্ম্ম যা কিছু করি না কেন সেই সর্ব্বজনীন আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তাল রাখিয়া করিতে হইবে। লোক ডাকিয়া খাওয়াইব কিন্তু পঞ্চাশ বছর আগেকার রসনাটা এখন নাই একথা ভুলিবার জো কি!

বিলাতে প্রত্যেক মানুষের উপর এই চাপ নাই। যতক্ষণ বিবাহ না করে ততক্ষণ সে স্বাধীন, বিবাহ করিলেও তার ভার আমাদের চেয়ে অনেক কম। কাজেই তার শক্তির উদ্বৃত্ত অংশ অনেকখানি নিজের হাতে থাকে। সেটা অনেকে নিজের ভোগে লাগায় সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষ যে-হেতুক মানুষ এই জন্য সে নিজেকে নিজের মধ্যেই নিঃশেষ করিতে পারে না। পরের জন্য খরচ করা তার ধর্ম্ম। নিজের বাড়তি শক্তি যে অন্যকে না দেয়, সেই শক্তি দিয়া সে নিজেকে নষ্ট করে, সে পেটুকের

মত আহারের দ্বারাই আপনাকে সংহার করে। এমনতর আত্ম-ঘাতকগুলো পয়মাল হইয়া বাকি যারা থাকে তাদের লইয়াই সমাজ। বিলাতে সেই সমাজে সাধারণের দায় বহন করে, আমাদের দেশে পরিবারের দায়।

এদিকে নূতন শিক্ষায় আমাদের মনের মধ্যে এমন একটা কর্ত্তব্যবুদ্ধি জাগিয়া উঠিতেছে যেটা একালের জিনিষ। লোক-হিতের ক্ষেত্র আমাদের মনের কাছে আজ দূরব্যাপী—দেশবোধ বলিয়া একটা বড় রকমের বোধ আমাদের মনে জাগিয়াছে। কাজেই বন্যা কিম্বা দুর্ভিক্ষে লোকসাধারণ যখন আমাদের দ্বারে আসিয়া দাঁড়ায় তখন খালি-হাতে তাকে বিদায় করা আমাদের পক্ষে কঠিন। কিন্তু কুল রাখাই আমাদের বরাবরের অভ্যাস, শ্যাম রাখিতে গেলে বাধে। নিজের সংসারের জন্য টাকা আনা, টাকা জমানো, টাকা খরচ করা আমাদের মজ্জাগত; সেটাকে বজায় রাখিয়া বাহিরের বড় দাবিকে মানা দুঃসাধ্য। মোমবাতির দুই মুখেই শিখা জ্বালানো চলে না। বাছুর যে গাভীর দুধ পেট ভরিয়া খাইয়া বসে সে গাভী গোয়ালার ভাঁড় ভর্ত্তি করিতে পারে না;—বিশেষত তার চরিয়া খাবার মাঠ যদি প্রায় লোপ পাইয়া থাকে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদের আর্থিক অবস্থার চেয়ে আমাদের ঐশ্বর্য্যের দৃষ্টান্ত বড় হইয়াছে। তার ফল হইয়াছে জীবনযাত্রাটা আমাদের পক্ষে প্রায় মরণযাত্রা হইয়া উঠিয়াছে। নিজের সম্বন্ধে ভদ্রতারক্ষা করিবার শক্তি অল্পলোকের আছে, অনেকে ভিক্ষা করে, অনেকে ধার করে, হাতে কিছু জমাইতে পারে এমন হাত

ত প্রায় দেখি না। এই জন্য এখনকার কালের ভোগের আদর্শ আমাদের পক্ষে দুঃখভোগের আদর্শ।

ঠিক এই কারণেই নূতনকালের ত্যাগের আদর্শটা আমাদের শক্তিকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গেছে। কেননা, আমাদের ব্যবস্থাটা পারিবারিক, আমাদের আদর্শটা সর্ব্বজনীন। ক্রমাগতই ধার করিয়া ভিক্ষা করিয়া এই আদর্শটাকে ঠেলাঠেলি করিয়া চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে। যেটাকে আদর্শ বলিয়া গণ্য করিয়াছি সেটাকে ভালো করিয়া পালন করিতে অক্ষম হওয়াই চারিত্রনৈতিক হিসাবে দেউলে হওয়া। তাই, ভোগের দিক দিয়া যেমন আমাদের দেউলে অবস্থা, ত্যাগের দিক দিয়াও তাই। এই জন্যই চাঁদা তুলিতে, বড়লোকের স্মৃতি রক্ষা করিতে, বড় ব্যবসা খুলিতে, লোকহিতকর প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে গিয়া নিজেকে ধিক্কার দিতেছি ও বাহিরের লোকের কাছে নিন্দা সহিতেছি।

আমাদের জন্মভূমি সুজলা সুফলা, চাষ করিয়া ফসল পাইতে কষ্ট নাই। এই জন্যই এমন এক সময় ছিল, যখন কৃষিমূলক সমাজে পরিবার বৃদ্ধিকে লোকবল বৃদ্ধি বলিয়া গণ্য করিত। কিন্তু এমনতর বৃহৎ পরিবারকে একত্র রাখিতে হইলে তাহার বিধিবিধানের বাঁধন পাকা হওয়া চাই, এবং কর্ত্তাকে নির্ব্বিচারে না মানিয়া চলিলে চলে না। এই কারণে এমন সমাজে জন্মিবামাত্র বাঁধা নিয়মে জড়িত হইতে হয়। দান ধ্যান পুণ্যকর্ম্ম প্রভৃতি সমস্তই নিয়মে বদ্ধ; যারা ঘনিষ্ঠভাবে একত্র থাকিবে তাদের মধ্যে যাতে কর্ত্তব্যের আদর্শের বিরোধ না ঘটে, অর্থাৎ নিজে চিন্তা না করিয়া যাতে একজন ঠিক

অন্ধজনের মতই চোখ বুজিয়া চলিতে পারে সেই ভাবের যত বিধিবিধান।

প্রকৃতির প্রশ্রয় যেখানে কম, যেখানে মানুষের প্রয়োজন বেশি অথচ ধরণীর দাক্ষিণ্য বেশি নয় সেখানে বৃহৎ পরিবার মানুষের বলবৃদ্ধি করে না, ভারবৃদ্ধিই করে। চাষের উপলক্ষ্যে মানুষকে যেখানে এক জায়গায় স্থির হইয়া বসিতে হয় সেইখানেই মানুষের ঘনিষ্ঠতার সম্বন্ধ চারিদিকে অনেক ডালপালা ছড়াইবার জায়গা এবং সময় পায়। যারা লুটপাট করে, পশু চরাইয়া বেড়ায়, দূর-দেশ হইতে অন্ন সংগ্রহ করে তারা যতটা পারে ভারমুক্ত হইয়া থাকে। তারা বাঁধা-নিয়মের মধ্যে আট্‌কা পড়ে না; তারা নূতন নূতন দুঃসাহসিকতার মধ্যে ছুটিয়া গিয়া নূতন নূতন কাজের নিয়ম আপন বুদ্ধিতে উদ্ভাবিত করে। এই চিরকালের অভ্যাস ইহাদের রক্তমজ্জার মধ্যে আছে বলিয়াই সমাজ-বন্ধনের মধ্যেও ব্যক্তির স্বাধীনতা যত কম খর্ব্ব হয় ইহারা কেবলি তার চেষ্টা করিতে থাকে। রাজা থাক্ কিন্তু কিসে রাজার ভার না থাকে এই ইহাদের সাধনা, ধন আছে কিন্তু কিসে তাহা দরিদ্রের বুকের উপর চাপিয়া না বসে এই তপস্যায় তারা আজও নিবৃত্ত হয় নাই।

এমনি করিয়া ব্যক্তি যেখানে মুক্ত সেখানে তার আয়ও মুক্ত, তার ব্যয়ও মুক্ত। সেখানে যদি কোনো জাতি দেশহিত বা লোকহিত ব্রত গ্রহণ করে তবে তার বাধা নাই। সেখানে সমস্ত মানুষ আপনাদের ইতিহাসকে আপনাদের শক্তিতেই গড়িয়া তুলিতেছে, বাহিরের ঠেলা বা বিধাতার মারকে তারা শিরোধার্য্য করিয়া লইতেছে না। পুঁথি তাহাদের বুদ্ধিকে চাপা দিবার যত চেষ্টা করে তারা ততই তাহা

কাটিয়া বাহির হইতে চায়। জ্ঞান ধর্ম্ম ও শক্তিকে কেবলি স্বাধীন অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী করিবার প্রয়াসই তাদের ইতিহাস।

আর পরিবারতন্ত্র জাতির ইতিহাস বাঁধনের পর বাঁধনকে স্বীকার করিয়া লওয়া। যতবারই মুক্তির লক্ষণ দেখা দেয় ততবারই নূতন শৃঙ্খলকে সৃষ্টি করা বা পুরাতন শৃঙ্খলকে আঁটিয়া দেওয়াই তার জাতীয় সাধনা। আজ পর্য্যন্ত ইতিহাসের সেই প্রক্রিয়া চলিতেছে। নীতিধর্ম্মকর্ম্ম সম্বন্ধে আমরা আমাদের কৃত্রিম ও সঙ্কীর্ণ বাঁধন কাটিবার জন্য যেই একবার করিয়া সচেতন হইয়া উঠি অমনি আমাদের অভিভাবক আমাদের বাপদাদার আফিমের কৌটা হইতে আফিমের বড়ি বাহির করিয়া আমাদের খাওয়াইয়া দেয়, তার পরে আবার সনাতন স্বপ্নের পালা।

যাই হোক্, ঘরের মধ্যে বাঁধনকে আমরা মানি। সেই পবিত্র বাঁধন-দেবতার পূজা যথাসর্ব্বস্ব দিয়া জোগাইয়া থাকি এবং তার কাছে কেবলি নরবলি দিয়া আসিতেছি। এমন অবস্থায় দেশহিত সম্বন্ধে আমাদের কৃপণতাকে পশ্চিম দেশের আদর্শ-অনুসারে বিচার করিবার সময় আসে নাই। সর্ব্বদেশের সঙ্গে অবাধ যোগবশত দেশে একটা আর্থিক পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে এবং সেই যোগবশতই আমাদের আইডিয়ালেরও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত এই পরিবর্ত্তন পরিণতি লাভ করিয়া সমস্ত সমাজকে আপন মাপে গড়িয়া না লয় ততদিন দোটানায় পড়িয়া পদে পদে আমাদিগকে নানা ব্যর্থতা ভোগ করিতে হইবে। ততদিন এমন কথা প্রায়ই শুনিতে হইবে, আমরা মুখে বলি এক, কাজে করি আর, আমাদের যতকিছু ত্যাগ সে কেবল বক্তৃতায় বচনত্যাগ।

কিন্তু আমরা যে স্বভাবতই ত্যাগে কৃপণ এত বড় কলঙ্ক আমাদের প্রতি আরোপ করিবার বেলায় এই কথাটা ভাবিয়া দেখা উচিত যে, পরিবারের প্রতি দায়িত্ব রক্ষা করিতে গিয়া এই বৃহৎ দেশের প্রায় প্রত্যেক লোক প্রায় প্রত্যহ যে দুঃসহ ত্যাগ স্বীকার করিতেছে জগতে কোথাও তার তুলনা নাই।

নূতন আদর্শ লইয়া আমরা যে কি পর্য্যন্ত টানাটানিতে পড়িয়াছি তার একটা প্রমাণ এই যে, আমাদের দেশের একদল শিক্ষক আমাদের সন্ন্যাসী হইতে বলিতেছেন। গৃহের বন্ধন আমাদের সমস্ত বুদ্ধিকে ও শক্তিকে এমন করিয়া পরাহত করিয়া রাখে যে হিতব্রত সত্যভাবে গ্রহণ করিতে হইলে সে বন্ধন একেবারে ছেদন করিতে হইবে এ কথা না বলিয়া উপায় নাই। বর্ত্তমান কালের আদর্শ আমাদের যে-সব যুবকদের মনে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছে তারা দেখিতে পাই সেই আগুনে স্বভাবতই আপন পারিবারিক দায়িত্ববন্ধন জ্বালাইয়া দিয়াছে।

এমনি করিয়া যারা মুক্ত হইল তারা দেশের দুঃখ দারিদ্র্য মোচন করিতে চলিয়াছে কোন্ পথে? তারা দুঃখের সমুদ্রকে ব্লটিং কাগজ দিয়া শুষিয়া লইবার কাজে লাগিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আজকাল "সেবা" কথাটাকে খুব বড় অক্ষরে লিখিতেছি ও সেবকের তক্‌মাটাকে খুব উজ্জ্বল করিয়া গিল্টি করিলাম।

কিন্তু ফুটা কলস ক্রমাগতই কত ভর্ত্তি করিব? কেবলমাত্র সেবা করিয়া চাঁদা দিয়া দেশের দুঃখ দূর হইবে কেমন করিয়া? দেশে বর্ত্তমান দারিদ্র্যের মূল কোথায়, কোথায় এমন ছিদ্র যেখান দিয়া সমস্ত সঞ্চয় গলিয়া পড়িতেছে, আমাদের রক্তের মধ্যে কোথায়

সেই নিরুদ্যমের বিষ যাতে আমরা কোনোমতেই আপনাকে বাঁচাইয়া তুলিতে উৎসাহ পাই না সেটা ভাবিয়া দেখা এবং সেইখানে প্রতিকার-চেষ্টা আমাদের প্রধান কাজ।

অনেকে মনে করেন দারিদ্র্য জিনিষটা কোনো একটা ব্যবস্থার দোষে বা অভাবে ঘটে। কেহ বলেন যৌথ কারবার চলিলে দেশে টাকা আপনিই গড়াইয়া আসিবে, কেহ বলেন ব্যবসায়ে সমবায় প্রণালীই দেশে দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়। যেন এই রকমের কোনো-না-কোনো একটা প্যাঁচা আছে যা লক্ষ্মীকে আপনি উড়াইয়া আনে।

য়ুরোপে আমাদের নাজির আছে। সেখানে ধনী কেমন করিয়া ধনী হইল, নির্ধন কেমন করিয়া নির্ধনতার সঙ্গে দল বাঁধিয়া লড়াই করিতেছে সে আমরা জানি। সেই উপায়গুলিই যে আমাদেরও উপায় এই কথাটা সহজেই মনে আসে।

কিন্তু আসল কথাটাই আমরা ভুলি। ঐশ্বর্য্য বা দারিদ্র্যের মূলটা উপায়ের মধ্যে নয়, আমাদের মানসপ্রকৃতির মধ্যে। হাতটা যদি তৈরি হয় তবে হাতিয়ারটা জোগানো শক্ত হয় না। যারা একটা বিশেষ উদ্দেশ্যকে মনের মধ্যে চিন্তা করিয়া মিলিতে পারে তারা স্বভাবতই বাণিজ্যেও মেলে অন্য সমস্ত প্রয়োজনের কাজেও মেলে। যারা কেবলমাত্র প্রথার বন্ধনে তাল পাকাইয়া মিলিয়া থাকে, যাহাদিগকে মিলনের প্রণালী নিজেকে উদ্ভাবন করিতে হয় না, কতকগুলো নিয়মকে চোখ বুজিয়া মানিয়া যাইতে হয় তারা কোনোদিন কোনো অভিপ্রায় মনে লইয়া নিজের সাধনায় মিলিতে পারে না। যেখানে তাদের বাপদাদার শাসন নাই সেখানে তারা কেবলি ভুল করে, অন্যায় করে, বিবাদ করে,—সেখানে তাদের

ঈর্ষা, তাদের লোভ, তাদের অবিবেচনা। তাদের নিষ্ঠা পিতামহের প্রতি; উদ্দেশ্যের প্রতি নয়। কেন না চিরদিন যারা মুক্ত তারা উদ্দেশ্যকে মানে, যারা মুক্ত নয় তারা অভ্যাসকে মানে।

এই কারণেই পরিবারের বাহিরে কোনো বড় রকমের যোগ আমাদের প্রকৃতির ভিতর দিয়া আজও সম্পূর্ণ সত্য হইয়া ওঠে নাই। অথচ এই পারিবারিক যোগটুকুর উপর ভর দিয়া আজিকার দিনের পৃথিবীতে আমাদের প্রাণরক্ষা বা মানরক্ষা প্রায় অসম্ভব। আমরা নদীতে গ্রামের ঘাটে ঘাটে যে নৌকা বাহিয়া এতদিন আরামে কাটাইয়া দিলাম, এখন সেই নৌকা সমুদ্রে আসিয়া পড়িল। আজ এই নৌকাটাই আমাদের পরম বিপদ।

নৌকাটা যেখানে ঢেউয়ের ঘায়ে সর্ব্বদাই টল্‌মল করিতেছে সেখানে আমাদের স্বভাবের ভীরুতা ঘুচিবে কেমন করিয়া? প্রতি কথায় প্রতি হাওয়ায় যে আমাদের বুক দুরদুর করিয়া ওঠে। আমরা নূতন নূতন পথে নূতন নূতন পরীক্ষায় চলিব কোন্ ভরসায়?

সকলের চেয়ে সর্ব্বনাশ এই যে, এই বহুযুগসঞ্চিত ভীরুতা আমাদিগকে মুক্তভাবে চিন্তা করিতে দিতেছে না। এই কথাই বলিতেছে তোমাদের বাপদাদা চিন্তা করেন নাই, মানিয়া চলিয়াছেন, দোহাই তোমাদের, তোমরাও চিন্তা করিয়ো না, মানিয়া চল।

তারপরে সেই মানিয়া চলিতে চলিতে দুঃখে দারিদ্র্যে অজ্ঞানে অস্বাস্থ্যে যখন ঘর বোঝাই হইয়া উঠিল তখন সেবাধর্ম্মই প্রচার কর আর চাঁদার খাতাই বাহির কর মরণ হইতে কেহ বাঁচাইতে পারিবে না।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অজানা

এই দেহটির ভেলা নিয়ে দিয়েছি সাঁতার গো,
এই দু'দিনের নদী হব পার গো।
তার পরে যেই ফুরিয়ে যাবে বেলা,
ভাসিয়ে দেব ভেলা।
তার পরে তার খবর কি যে ধারিনে তার ধার গো,
তারপরে সে কেমন আলো, কেমন অন্ধকার গো।

আমি যে অজানার যাত্রী সেই আমার আনন্দ।
সেই ত বাধায় সেই ত মেটায় দ্বন্দ্ব।
জানা আমায় যেমনি আপন ফাঁদে
শক্ত করে বাঁধে
অজানা সে সাম্‌নে এসে হঠাৎ লাগায় ধন্দ,
এক-নিমেষে যায় গো ফেঁসে অমনি সকল বন্ধ।

অজানা মোর হালের মাঝি, অজানাই ত মুক্তি,
তার সনে মোর চিরকালের চুক্তি।
ভয় দেখিয়ে ভাঙায় আমার ভয়
প্রেমিক সে নির্দ্দয়।
মানে না সে বুদ্ধিসুদ্ধি বৃদ্ধ-জনার যুক্তি,
মুক্তারে সে মুক্ত করে ভেঙে তাহার শুক্তি।

ভাবিস্ বসে যেদিন গেছে সেদিন কি আর ফিরবে ?
সেই কূলে কি এই তরী আর ভিড়বে ?
ফিরবেনা রে, ফিরবে না আর, ফিরবে না ;
সেই কূলে আর ভিড়বে না।
সামনেকে তুই ভয় করেচিস ! পিছন তোরে ঘিরবে
এমনি কি তুই ভাগ্যহারা ? ছিঁড়বে বাঁধন, ছিঁড়বে !

ঘণ্টা যে ঐ বাজ্‌ল কবি, হোক্ রে সভাভঙ্গ !
জোয়ার-জলে উঠেছে তরঙ্গ !
এখনো সে দেখায় নি তার মুখ,
তাই ত দোলে বুক !
কোন্ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ,
কোন্ সাগরের কোন্ কূলে গো কোন্ নবীনের রঙ্গ !

২৬ মাঘ
পদ্মাতীর।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শরৎ

ইংরেজের সাহিত্যে শরৎ প্রৌঢ়। তার যৌবনের টান সবটা আলগা হয় নাই, ওদিকে তাকে মরণের টান ধরিয়াছে। এখনো সব চুকিয়া যায় নাই কেবল সব ঝরিয়া যাইতেছে।

একজন আধুনিক ইংরেজ কবি শরৎকে সম্ভাষণ করিয়া বলিতেছেন, "তোমার ঐ শীতের আশঙ্কাকুল গাছগুলাকে কেমন যেন আজ ভূতের মত দেখাইতেছে; হায় রে, তোমার ঐ কুঞ্জবনের ভাঙা হাট, তোমার ঐ ভিজা পাতার বিবাগী হইয়া বাহির হওয়া! যা অতীত এবং যা আগামী তাদের বিষণ্ণ বাসরশয্যা তুমি রচিয়াছ। যা-কিছু ম্রিয়মান তুমি তাদেরই বাণী, যত-কিছু গতস্যশোচনা তুমি তারই অধিদেবতা।"

কিন্তু এ শরৎ আমাদের শরৎ একেবারেই নয়, আমাদের শরতের নীল চোখের পাতা দেউলে-হওয়া যৌবনের চোখের জলে ভিজিয়া ওঠে নাই। আমার কাছে আমাদের শরৎ শিশুর মূর্ত্তি ধরিয়া আসে। সে একেবারে নবীন। বর্ষার গর্ভ হইতে এইমাত্র জন্ম লইয়া ধরণী ধাত্রীর কোলে শুইয়া সে হাসিতেছে।

তার কাঁচা দেহখানি; সকালে শিউলিফুলের গন্ধটি সেই কচি-গায়ের গন্ধের মত। আকাশে আলোকে গাছেপালায় যা-কিছু রং দেখিতেছি সে ত প্রাণেরই রং, একেবারে তাজা।

প্রাণের একটি রং আছে। তা ইন্দ্রধনুর গাঁঠ হইতে চুরি করা লাল নীল সবুজ হল্‌দে প্রভৃতি কোনো বিশেষ রং নয়;

তা কোমলতার রং। সেই রং দেখিতে পাই ঘাসে পাতায়, আর দেখি মানুষের গায়ে। জন্তুর কঠিন চর্ম্মের উপরে সেই প্রাণের রং ভালো করিয়া ফুটিয়া ওঠে নাই সেই লজ্জায় প্রকৃতি তাকে রং-বেরঙের লোমের ঢাকা দিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছে। মানুষের গা-টিকে প্রকৃতি অনাবৃত করিয়া চুম্বন করিতেছে।

যাকে বাড়িতে হইবে তাকে কড়া হইলে চলিবে না, প্রাণ সেইজন্য কোমল। প্রাণ জিনিষটা অপূর্ণতার মধ্যে পূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেই ব্যঞ্জনা যেই শেষ হইয়া যায়; অর্থাৎ যখন, যা আছে কেবলমাত্র তাই আছে, তার চেয়ে আরো-কিছুর আভাস নাই তখন মৃত্যুতে সমস্তটা কড়া হইয়া ওঠে, তখন লাল নীল সকল রকম রংই থাকিতে পারে কেবল প্রাণের রং থাকে না।

শরতের রংটি প্রাণের রং। অর্থাৎ তাহা কাঁচা, বড় নরম। রৌদ্রটি কাঁচা সোনা, সবুজটি কচি, নীলটি তাজা। এইজন্য শরতে নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে, যেমন বর্ষায় নাড়া দেয় আমাদের ভিতর-মহলের হৃদয়কে, যেমন বসন্তে নাড়া দেয় আমাদের বাহির-মহলের যৌবনকে।

বলিতেছিলাম শরতের মধ্যে শিশুর ভাব। তার, এই-হাসি, এই-কান্না। সেই হাসিকান্নার মধ্যে কার্য্যকারণের গভীরতা নাই, তাহা এম্‌নি হাল্কাভাবে আসে এবং যায় যে, কোথাও তার পায়ের দাগ-টুকু পড়ে না,—জলের ঢেউয়ের উপরটাতে আলোছায়া ভাইবোনের মত যেমন কেবলই দুরন্তপনা করে অথচ কোনো চিহ্ন রাখে না।

ছেলেদের হাসিকান্না প্রাণের জিনিষ, হৃদয়ের জিনিষ নহে। প্রাণ জিনিষটা ছিপের নৌকার মত ছুটিয়া চলে তাতে মাল

বোঝাই নাই ; সেই ছুটিয়া-চলা প্রাণের হাসিকান্নার ভার কম। হৃদয় জিনিষটা বোঝাই নৌকা, সে ধরিয়া রাখে, ভরিয়া রাখে,—তার হাসিকান্না চলিতে চলিতে ঝরাইয়া ফেলিবার মত নয়। যেমন ঝরণা, সে ছুটিয়া চলিতেছে বলিয়াই ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। তার মধ্যে ছায়া আলোর কোনো বাসা নাই, বিশ্রাম নাই। কিন্তু এই ঝরণাই উপত্যকায় যে সরোবরে গিয়া পড়িয়াছে, সেখানে আলো যেন তলায় ডুব দিতে চায়, সেখানে ছায়া জলের গভীর অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে। সেখানে স্তব্ধতার ধ্যানের আসন।

কিন্তু প্রাণের কোথাও আসন নাই, তাকে চলিতেই হইবে, তাই শরতের হাসিকান্না কেবল আমাদের প্রাণপ্রবাহের উপরে ঝিকিমিকি করিতে থাকে, যেখানে আমাদের দীর্ঘনিশ্বাসের বাসা সেই গভীরে গিয়া সে আট্‌কা পড়ে না। তাই দেখি শরতের রৌদ্রের দিকে তাকাইয়া মনটা কেবল চলি চলি করে, বর্ষার মত সে অভিসারের চলা নয়, সে অভিমানের চলা।

বর্ষায় যেমন আকাশের দিকে চোখ যায় শরতে তেমনি মাটির দিকে। আকাশ-প্রাঙ্গণ হইতে তখন সভার আস্তরণখানা গুটাইয়া লওয়া হইতেছে, এখন সভার জায়গা হইয়াছে মাটির উপরে। একেবারে মাঠের এক পার হইতে আর এক পার পর্য্যন্ত সবুজে ছাইয়া গেল, সেদিক হইতে আর চোখ ফেরানো যায় না।

শিশুটি কোল জুড়িয়া বসিয়াছে সেইজন্যই মায়ের কোলের দিকে এমন করিয়া চোখ পড়ে। নবীন প্রাণের শোভায় ধরণীর কোল আজ এমন ভরা। শরৎ বড় বড় গাছের ঋতু নয়, শরৎ ফসলক্ষেতের ঋতু। এই ফসলের ক্ষেত একেবারে মাটির কোলের

জিনিষ। আজ মাটির যত আদর সেইখানেই হিল্লোলিত, বনস্পতি দাদারা একধারে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া তাই দেখিতেছে।

এই ধান, এই ইক্ষু, এরা যে ছোট, এরা যে অল্পকালের জন্য আসে, ইহাদের যত শোভা যত আনন্দ সেই দুদিনের মধ্যে ঘনাইয়া তুলিতে হয়। সূর্য্যের আলো ইহাদের জন্য যেন পথের ধারের পানসত্রের মত—ইহারা তাড়াতাড়ি গণ্ডূষ ভরিয়া সূর্য্যকিরণ পান করিয়া লইয়াই চলিয়া যায়—বনস্পতির মত জল বাতাস মাটিতে ইহাদের অন্নপানের বাঁধা বরাদ্দ নাই; ইহারা পৃথিবীতে কেবল আতিথ্যই পাইল, আবাস পাইল না। শরৎ পৃথিবীর এই সব ছোটদের এই সব ক্ষণজীবীদের ক্ষণিক উৎসবের ঋতু। ইহারা যখন আসে তখন কোল ভরিয়া আসে, যখন চলিয়া যায় তখন শূন্য প্রান্তরটা শূন্য আকাশের নীচে হা-হা করিতে থাকে। ইহারা পৃথিবীর সবুজ মেঘ, হঠাৎ দেখিতে দেখিতে ঘনাইয়া ওঠে, তার পরে প্রচুর ধারায় আপন বর্ষণ সারিয়া দিয়া চলিয়া যায়, কোথাও নিজের কোনো দাবি-দাওয়ার দলিল রাখে না।

আমরা তাই বলিতে পারি, হে শরৎ, তুমি শিশিরাশ্রু ফেলিতে ফেলিতে গত এবং আগতের ক্ষণিক মিলনশয্যা পাতিয়াছ। যে বর্ত্তমানটুকুর জন্য অতীতের চতুর্দ্দোলা দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া আছে, তুমি তারি মুখচুম্বন করিতেছ, তোমার হাসিতে চোখের জল গড়াইয়া পড়িতেছে।

মাটির কন্যার আগমনীর গান এই ত সেদিন বাজিল। মেঘের নন্দীভৃঙ্গী শিঙা বাজাইতে বাজাইতে গৌরী শারদাকে এই কিছু দিন হইল ধরা-জননীর কোলে রাখিয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ার গান

বাজিতে আর ত দেরী নাই; শ্মশানবাসী পাগলটা এল বলিয়া,—তাকে ত ফিরাইয়া দিবার জো নাই;—হাসির চন্দ্রকলা তার ললাটে লাগিয়া আছে, কিন্তু তার জটায় জটায় কান্নার মন্দাকিনী।

শেষকালে দেখি ঐ পশ্চিমের শরৎ আর এই পূর্ব্বদেশের শরৎ একই জায়গায় আসিয়া অবসান হয়—সেই দশমী রাত্রির বিজয়ার গানে। পশ্চিমের কবি শরতের দিকে তাকাইয়া গাহিতেছেন, "বসন্ত তার উৎসবের সাজ বৃথা সাজাইল, তোমার নিঃশব্দ ইঙ্গিতে পাতার পর পাতা খসিতে খসিতে সোনার বৎসর আজ মাটিতে মিশিয়া মাটি হইল যে!"—তিনি বলিতেছেন, "ফাল্গুনের মধ্যে মিলন-পিপাসিনীর যে রস-ব্যাকুলতা তাহা শান্ত হইয়াছে, জৈষ্ঠ্যের মধ্যে তপ্ত-নিশ্বাস-বিক্ষুব্ধ যে হৃৎস্পন্দন তাহা স্তব্ধ হইয়াছে। ঝড়ের মাতনে লণ্ডভণ্ড অরণ্যের গায়ন সভায় তোমার ঝোড়ো বাতাসের দল তাহাদের প্রেতলোকের রুদ্রবীণায় তার চড়াইতেছে তোমারি মৃত্যুশোকের বিলাপগান গাহিবে বলিয়া। তোমার বিনাশের শ্রী তোমার সৌন্দর্য্যের বেদনা ক্রমে সুতীব্র হইয়া উঠিল, হে বিলীয়মান মহিমার প্রতিরূপ!"

কিন্তু তবুও পশ্চিমে যে শরৎ, বাষ্পের ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া আসে, আর আমাদের ঘরে যে শরৎ, মেঘের ঘোমটা সরাইয়া পৃথিবীর দিকে হাসি মুখখানি নামাইয়া দেখা দেয়, তাদের দুইয়ের মধ্যে রূপের এবং ভাবের তফাৎ আছে। আমাদের শরতে আগমনীটাই ধুয়া। সেই ধুয়াতেই বিজয়ার গানের মধ্যেও উৎসবের তান লাগিল। আমাদের শরতে বিচ্ছেদ-বেদনার ভিতরেও একটা কথা লাগিয়া আছে যে, বারে বারে নূতন করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া

আসিবে বলিয়াই চলিয়া যায়—তাই ধরার আঙিনায় আগমনী-গানের আর অন্ত নাই। যে লইয়া যায় সেই আবার ফিরাইয়া আনে। তাই সকল উৎসবের মধ্যে বড় উৎসব এই হারাইয়া ফিরিয়া পাওয়ার উৎসব।

কিন্তু পশ্চিমে শরতের গানে দেখি পাইয়া হারানোর কথা। তাই কবি গাহিতেছেন, "তোমার আবির্ভাবই তোমার তিরোভাব। যাত্রা এবং বিদায় এই তোমার ধূয়া, তোমার জীবনটাই মরণের আড়ম্বর; আর তোমার সমারোহের পরম পূর্ণতার মধ্যেও তুমি মায়া, তুমি স্বপ্ন।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

টীকা টিপ্পনী

গত জ্যৈষ্ঠমাসের মানসী-পত্রিকাতে প্রকাশ যে, জনৈক তীর্থ-যাত্রী ৺কাশীধামে পদার্পণ করবামাত্র, এই সত্য আবিষ্কার করেছেন

সবুজ পত্র

যে—"যে পাদপে বিংশ শতাব্দীর বাংলায় 'সবুজপত্র' গজাইতেছে, সেই পাদপের মূল শতশতাব্দীর নিম্নতম স্তরে প্রোথিত,—যুগে যুগে কত সবুজপত্র তাহাতে গজাইয়াছে, পীতপত্রে পরিণত হইয়া ঝরিয়া পড়িয়া গিয়াছে, তাহার খবর কে রাখে ?"

এ খবর অবশ্য কেউ রাখে না—কেননা, সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলির ঝরা-পাতার হিসেব রাখা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নয় এবং তা রেখেও কোন ফল নেই। শুষ্কপত্রের সুমুখে যাঁরা শ্রদ্ধাভরে জোড়হস্ত হয়ে থাকেন, তাঁদেরও মনে রাখা কর্ত্তব্য যে সে পত্রের যদি কিছু মূল্য থাকে তো সে এই কারণে যে তা এককালে সবুজ ছিল। হরিতের স্মৃতি উদ্রেক করাতেই পীতের মাহাত্ম্য। সবুজপত্র যে কালবশে পীতপত্রে পরিণত হয় এবং অন্তিমে কালগ্রাসে পতিত হয় এ সত্য এতই প্রত্যক্ষ যে তার সাক্ষাৎকারের জন্য কারও আর তীর্থযাত্রা করবার দরকার নেই। চোখ থাকলে ঘরে বসেই তার পরিচয় লাভ করা যায়। ভবিষ্যতে মৃত্যু আছে জেনে বর্ত্তমানে প্রাণ নিত্য নব-রাগে দেখা দিতে ভয় পায় না। তবে "যে পাদপে বিংশ শতাব্দীর বাংলায় সবুজপত্র গজাইতেছে তার

মূল যে শত শতাব্দীর নিম্নস্তরে প্রোথিত” এ কথা শুনে আমরা আশ্বস্ত হলুম। কেননা অনেকের ধারণা যে এ পত্র নোবেল প্রাইজের সঙ্গে সঙ্গে Ibsen-এর দেশ থেকে আনা হয়েছে। এরূপ সন্দেহ করবার অবশ্য কোনরূপ বৈধ কারণ নেই। যে দেশে ছমাস রাত আর ছমাস দিন সে দেশে পাতার রঙ সবুজ না হবারই কথা ;—সম্ভবতঃ তা ছমাস নীল আর ছমাস পীত।

সে যাই হোক্, আমাদের দেশের সভ্যতার বট যে অক্ষয় বট তার একমাত্র কারণ এ নয় যে যুগে যুগে তার কোনও-না-কোনও শাখায় নব-কিশলয়ের আবির্ভাব হয়। এ বট যে অক্ষয় তার প্রধান কারণ এই যে—এই সনাতন বৃক্ষের গায়ে নানা দেশের নানা বৃক্ষের জোড়-কলম বসানো যায়। যুগে যুগে নব নব সত্য অঙ্গীকার করবার শক্তিতে হিন্দুর মন বঞ্চিত নয়। সুতরাং বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালী যদি কোনও নূতন সত্যকে মনে স্থান দিতে পেরে থাকে তার থেকে এই প্রমাণ হয় যে বাঙ্গালীর আত্মা বলহীন নয় এবং বাঙ্গালীর জীবনও সম্ভবতঃ ফলহীন হবে না।

আসলে সত্য এই যে, আত্মার অক্ষয় বটের মূল কোনও দেশ-বিশেষের কোনও স্তর-বিশেষে প্রোথিত নয়—কাশীতেও নয় প্রয়াগেও নয়, কেননা এই বিশ্বই হচ্ছে সেই সনাতন বৃক্ষ—

“ঊৰ্দ্ধ মুলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বথঃ সনাতনঃ।

মানবাত্মা এই সনাতন অশ্বত্থের শাখামাত্র। এবং এই অসংখ্য শাখাসকল আপাতদৃষ্টিতে আকারে এবং বিস্তারে যতই পৃথক হোক না,—মূলতঃ এক। মানব-মনের শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় একই

অনাদি রস সঞ্চারিত হচ্ছে, একই চৈতন্য নানা আকারে নানা বর্ণে বিকশিত হয়ে উঠছে এবং সকলের ভিতর একই প্রাণের বন্ধন আছে। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর বাংলার সবুজপত্রের আড়ালে যদি ঊনবিংশ শতাব্দীর স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া উঁকি মারে তাতে আক্ষেপের কোনও কারণ নেই।

তবে বাংলার সবুজপত্রের অন্তরে Ibsen-এর কোনও প্রভাব আছে কি না সে হচ্ছে স্বতন্ত্র প্রশ্ন—এবং সে প্রশ্নের উত্তর দিতে আমরা অপারগ। কেননা Ibsen-এর সঙ্গে আমাদের কস্মিনকালেও বিশেষ পরিচয় ছিল না এবং বহুকাল যাবৎ ও ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ নেই। আমাদের ধারণা ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ভগ্নস্তূপের ভিতর তাঁর সমাধি হয়ে গেছে। ইউরোপে যে লেখকের অপমৃত্যু হয় তার প্রেতাত্মা যে শিক্ষিত বাঙ্গালীর ঘাড়ে চেপে বসে—এর প্রমাণ ত বঙ্গসাহিত্যে নিত্যই পাওয়া যায়। তাই বলে "সবুজপত্র" যে Ibsenism-এ ভরপুর—এ কথা আমরা স্বীকার করতে পারিনে। এমন কি Ibsen-এর নাটকেও Ibsenism-এর অস্তিত্ব আছে কি না সে বিষয়েও আমাদের সন্দেহ আছে। কেননা কোন দেশের কোন বড় লেখক কোনও Ism-এর বশীভূত নন। Ism হচ্ছে সমালোচকদের হাতেগড়া পদার্থ। যাঁদের কোনরূপ রসজ্ঞান নেই তাঁরাই সাহিত্য চুইয়ে এই ism নামক কষ নিষ্কাসিত করে সরস্বতীর মন্দিরের বহির্দ্বারে তারই কারবার করেন। এ কষ যদি "সবুজপত্রে"র শিরার ভিতর প্রবেশ করে থাকে ত সে যুগধর্ম্মের গুণে। কে না জানে যে স্বাধীনতার

আকাশবাণী আজকের দিনে বাতাসে ঘোষণা করে ? "যো আপ্‌সে আতা উস্‌কে আনে দেও"—এই বচনের দোহাই দিয়ে আমরা তা পাঠক-সমাজকে গ্রাহ্য কর্‌তে অনুরোধ কর্‌তে পারি।

সবুজপত্রের গল্প, কবিতা যে Ibsenism-এর কোঠায় পড়ে গেছে এ বিষয়ে সমালোচকেরা স্থিরনিশ্চিত। কিন্তু সাহিত্য আর্ট প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে উক্ত পত্রের মতামত যে কোন্ ism-এর অন্তর্ভূর্ত—সমালোচকেরা আজও তা ঠাওর করে উঠতে পারেন নি। তাঁরা এই পর্য্যন্ত জানেন যে আমরা স্বাতন্ত্র্যের পক্ষপাতী—বস্তুতন্ত্রতার নয় এবং সেই কারণে আমরা "আনন্দ" "সৃষ্টি" ইত্যাদি কতকগুলি নামজাদা শব্দের অন্তরালে আমাদের অস্পষ্ট মনোভাব সকল লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করি। আমাদের ঐ মতামত সত্য হোক মিথ্যা হোক তা যে বিদেশী কিম্বা বিজাতীয় নয়—এর পরিচয় অলঙ্কারশাস্ত্রে পাওয়া যায়। নজির স্বরূপে নিম্নে মম্মটভট্টের মত উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :—

"নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং
হ্লাদৈকময়ীমনন্য পরতন্ত্রাম।
নবরসরুচিরাং নির্ম্মিতি—
মাদধতী ভারতী কবের্জ্জয়তি॥

(কাব্যপ্রকাশ)

অন্বার্থ—

কবির সৃষ্টি ব্রহ্মার সৃষ্টির উপর জয়লাভ করে। কেননা ব্রহ্মার সৃষ্টি নিয়তিদ্বারা নিয়মিত, সুখদুঃখময়, পরমাণু-আদি উপাদান এবং কর্ম্মাদি-সহকারী-কারণ-পরতন্ত্র এবং ষড়্‌রসযুক্ত। অপর পক্ষে

কবির সৃষ্টি নিয়তির নিয়মমুক্ত, কেবলমাত্র আনন্দময়—কোনরূপ বাহ্যবস্তু কিম্বা বাহ্য ঘটনার অধীন নয় অতএব অনন্য-পরতন্ত্র এবং নবরসযুক্ত। এককথায় বস্তুতন্ত্রতা জড়জগতের ধর্ম্ম এবং স্বাতন্ত্র্য মনোজগতের।

দরিদ্র চারুদত্ত

ভাসের "দরিদ্র চারুদত্তের" সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে বহুদিন যাবৎ আমার বিশেষ কৌতূহল ছিল, কেননা শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয় আমাদের পূর্ব্ব হতেই জানিয়ে রেখেছিলেন যে মৃচ্ছকটিক উক্ত নাটকের ভিত্তির উপরেই রচিত হয়েছিল। সম্প্রতি এই নাটকখানি আমার হস্তগত হয়েছে। প্রথমেই চোখে পড়ে যে, মৃচ্ছকটিকের সঙ্গে "দরিদ্র চারুদত্তের" আকারগত কোনও সাদৃশ্য নেই;—একখানি দশ অঙ্কের নাটক আর একখানি চার অঙ্কের। আমাদের মতে এরূপ হবার কারণ এই যে, শাস্ত্রী মহাশয় ভাসের পূর্ণাবয়ব নাটকখানির আজও সাক্ষাৎ পাননি—যদিচ তিনি এ কথা স্বীকার করেন না। শাস্ত্রী মহাশয় ক এবং খ চিহ্নিত দুখানি হস্তলিখিত পুঁথি হতে "দরিদ্র চারুদত্তের" পাঠ উদ্ধার করেছেন। তিনি প্রধানতঃ খ পুস্তকের পাঠই অনুসরণ করেছেন, কেননা "ক" পুস্তক এত প্রমাদপূর্ণ যে তা নির্ভর-যোগ্য নয়। কিন্তু "ক" পুস্তকের যেটি সব চাইতে বড় ভুল কথা, সেইটি তিনি সত্য হিসেবে গ্রাহ্য করেছেন। সে কথা এই —"অবসিতং চারুদত্তম্"—অর্থাৎ এইখানেই চারুদত্তের শেষ হল। চতুর্থ অঙ্কের শেষে ভরতবাক্যের অভাব থেকেই শাস্ত্রী মহাশয়ের বোঝা উচিত ছিল, যে "দরিদ্র চারুদত্ত" ঐখানেই শেষ হয়

নি। তা ছাড়া মৃচ্ছকটিকের সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে—তিনিই জানেন যে "হঞ্জে গেণ্‌হ এদং অলংকারএমং চারুদত্তং অভিরমিদুং গচ্ছম্‌হ"—এ কথা সে নাটকের শেষ কথা হতে পারে না।

"দরিদ্র চারুদত্তের" চতুর্থাঙ্কের অন্তে ঐ একই কথা আছে। "এহি ইমং অলঙ্কারং গহ্নিঅ অয্য চারুদত্তং অভিসরিস্মামো"। এ দুয়ের ভিতর যা কিছু পার্থক্য তা প্রাকৃতে। "ওলো এই গহনা পরে আমি অভিসার কর্‌ব"—দাসীকে সম্বোধন করে, নায়িকার এ উক্তিতে এ নাটকের সকল কথা ফুরোয় না বরং এ কথায় আশা দেয় যে এর পরেই গল্প জমে আস্‌বে। ঘটনা-চক্র অন্ততঃ কাব্যজগতে মাঝ-পথে আটকে যায় না—সে চক্র শেষটা হয় মিলন নয় বিয়োগে গিয়ে দাঁড়ায়; অন্ততঃ সব দেশের সেকেলে নাটকে তাই হত। তা ছাড়া অপর একটি কারণেও চতুর্থ অঙ্কে চারুদত্তের অবসান হওয়া আমার মতে অসম্ভব। এ নাটকখানি যদি চার অঙ্কে শেষ হত তাহলে মৃচ্ছকটিক দশ অঙ্ক হত না। এই দুই নাটকের প্রথম চার অঙ্ক মিলিয়ে দেখলে দেখা যায় যে যিনি মৃচ্ছকটিককে নিজের রচনা বলে চালাতে চেষ্টা করেছিলেন, কাব্যরাজ্যে তাঁর তুল্য চোর আর দ্বিতীয় নেই। তিনি "দরিদ্র চারুদত্ত" হতে ঘটনা, কথোপকথন, শ্লোকপ্রভৃতি সব অক্ষরে অক্ষরে চুরি করেছেন, এমন কি পাত্রপাত্রীদের নূতন নামকরণ কর্‌বার সাহসও তাঁর ছিল না। নায়ক সেই চারুদত্ত, নায়িকা বসন্তসেনা, বিদূষক মৈত্রেয়, চেটী রদনিকা—এক ভাসের সলজ্জক মৃচ্ছকটিকে শর্ব্বিলক নাম ধারণ করেছে; তার কারণ বোধ হয় মৃচ্ছকটিককার তাঁর গ্রন্থে লজ্জার নাম-গন্ধেরও

সংস্রব রাখতে চাননি। সুতরাং এ হেন গুণী যে স্বীয় প্রতিভা-বলে ছটি ছটি গোটা অঙ্ক রচনা করেছিলেন, প্রথম অঙ্কে যে সকল ঘটনার সূত্রপাত করা হয়েছে সেই সকল ঘটিয়ে ফুটিয়ে তুলেছিলেন,—এ হতেই পারে না। কবি শূদ্রক সম্ভবতঃ "দ্বিরদেন্দ্র-গতি, চকোরনেত্র, পরিপূর্ণেন্দুমুখ সুবিগ্রহ, দ্বিজমুখ্যতম, অগাধ-সত্ত্ব"—এ সবই ছিলেন। চোর কবি ত সুন্দর বলেই প্রসিদ্ধ। কিন্তু শূদ্রক-নৃপ যে মৃচ্ছকটিক নামক প্রকরণের "চকার সর্ব্বং কিল"—এ কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা। শূদ্রক যে "পরবারণ-বাহু-যুদ্ধ-লুব্ধ" ছিলেন এ কথা সহজেই বিশ্বাস হয়, কারণ কাব্যরাজ্যে তিনি যে বলের পরিচয় দিয়েছিলেন, সে হচ্ছে বাহুবল। এ রাজ্যে তাঁর অপূর্ব্ব কীর্ত্তির যথার্থ নাম চুরি নয় ডাকাতী। এই রাজ-কবি দরিদ্র চারুদত্তের দেহে যে অতিরিক্ত গদ্যপদ্যাংশের যোজনা করে মৃচ্ছকটিককে অঙ্কে অঙ্কে প্রকরণভঙ্গ দোষে দূষিত করেছেন, আমার বিশ্বাস, খোঁজ করে দেখলে দেখা যাবে তাও শূদ্রকের স্বরচিত নয় কিন্তু চোরাইমাল। মৃচ্ছকটিকে প্রকাশ যে শূদ্রক দশদিন-সহিত শতাব্দ আয়ুলাভ করে, অন্তিমে অগ্নিপ্রবেশ করে-ছিলেন—সম্ভবতঃ এই চুরি পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে। সে যাই হোক, আমার ধ্রুববিশ্বাস দরিদ্র চারুদত্ত চার অঙ্কে অবসিত হয় নি। নাটকমাত্রেরই একটি পরমায়ু আছে যা অকালে খণ্ডিত হতে পারে না। অতএব শ্রীযুক্ত গণপতি শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা এই যে, তিনি মালায়লমের মঠে মঠে দরিদ্র চারুদত্তের খণ্ডিত অঙ্গের অনুসন্ধান করুন।

চণ্ডীদাসের পদাবলী

শ্রীযুক্ত নীলরতন মুখোপাধ্যায় বি-এ কর্ত্তৃক সম্পাদিত "চণ্ডীদাসের পদাবলী" সাহিত্য-পরিষৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। "দরিদ্র চারুদত্ত" অঙ্গহীন বলে আমরা দুঃখ করেছি কিন্তু মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের "চণ্ডীদাসে" সে দোষ নেই, এ সংগ্রহ যদি কোন দোষে দুষ্ট হয় ত সে অতিকায়ত্ব। এ গ্রন্থে অনেকখানি মাল আছে—তবে তার কতটা খাঁটি আর কতটা বাজে বলা কঠিন। এই বাহুল্যের হেতু সম্পাদক মহাশয় নিজেই নির্ণয় করে দিয়েছেন। তিনি বলেন ঃ—"আমি চণ্ডীদাসের নামাঙ্কিত যত পদ পাইয়াছি, বিনা বিচারে তাহা গ্রহণ করিয়া আমার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছি"—এইরূপ বিনা বিচারে তাঁর ভাণ্ডার পূর্ণ করবার কৈফিয়ৎ স্বরূপে তিনি বলেন ঃ—"আমি যে একজন খুব ভাল জহুরি এ বিশ্বাস আমার নাই। কষ্টিপাথরে কষিয়া খাঁটি সোনা ধরিয়া দিব, আর মেকি বাদ দিতে পারিবই, এমন স্পর্দ্ধা রাখি না।"

এমন স্পর্দ্ধা বোধ হয় কেহই রাখেন না, তবে চোখের আন্দাজ বলে একটা জিনিষ আছে যার সাহায্যে লোকে সোনা পিতলের পার্থক্য ধরতে পারে। রত্নপরীক্ষার জন্য অদ্যাবধি কোনওরূপ কষ্টিপাথর আবিষ্কৃত হয় নি, অথচ, কাচ থেকে মণির তফাৎ মানুষে নিত্যই করে থাকে, কেবল ঐ চোখেরই সাহায্যে। তিনি আরও বলেন যে "কোন্ গানটি চণ্ডীদাসের, কোন্‌টি নয়, অর্থাৎ কোন্‌টির ভিতর চণ্ডীদাসত্ব আছে আর কোন্‌টির ভিতর নাই এত বিচার করিবার শক্তি আমার নাই।"

এর উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রাচীন সাহিত্যের সংগ্রহকার মাত্রেই স্বল্পাধিক পরিমাণে পরীক্ষার দ্বারা, সাচ্চা ঝুঁটার ভেদ

নির্ণয় করতে বাধ্য। যিনি এ বিচারের দায় সম্পূর্ণরূপে এড়াতে চান—তিনি সম্পাদক নাম গ্রহণ করবার অধিকারী নন। যেমন রঙের বিচারে চোখ ভরসা, তেমনি গানের বিচারে কান এবং কবিতার বিচারে কান ও প্রাণ ভরসা। চোখ কান যে আমাদের নিত্য ঠকায় তা আমরা সকলেই জানি। সত্যাসত্যের বিচারে ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য অবশ্য সকল সময়ে গ্রাহ্য নয়। কেবলমাত্র কানের ও প্রাণের উপর নির্ভর করে, কোন্ গানটি চণ্ডীদাসের আর কোন্‌টি নয়, তা স্থির করতে গেলে; আমরা দু এক জায়গায় অবশ্য ভুল করব, কিন্তু আগাগোড়া নয়। কেননা যে বস্তু নিয়ে বহুকাল ধরে নিত্য কারবার করা যায়, সে বিষয়ে মানুষের একটা instinct জন্মে যায়। আসল জহুরি সেই instinct-এর উপরেই নির্ভর করেন, কষ্টিপাথরের উপর নয়, কেননা নিকষের গায়ে সোনার রেখাও মানুষকে নিজের চোখ দিয়েই চিন্‌তে হয়।

যদিচ চণ্ডীদাসের চণ্ডীদাসত্ব কষে বার করবার মত কোনও কষ্টিপাথর আমাদের হাতে নেই, তবু এ কবির সঙ্গে আমাদের যে স্বল্প পরিচয় আছে, তার থেকেই আমরা ভরসা করে বলতে পারি যে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগসূচক যে সকল অপরিচিত পদ তাঁর গ্রন্থভুক্ত করেছেন, সম্ভবতঃ তার অনেকগুলিই চণ্ডীদাসের রচিত নয়। সুবলের বৃকভানু রাজার পুরীতে গমন, পঞ্চ-বালকের দশাবতারের অভিনয় প্রদর্শন, সুবলধৃত কৃষ্ণ-রূপ দর্শনে শ্রীরাধিকার মূর্চ্ছাগমন, আহিরিণী-কর্ত্তৃক শ্রীমতীর ঝাড়ন্-ফুঁকন, তৎপরে সুবলকর্ত্তৃক রাজকুমারীর কর্ণে বিশ অক্ষরের কৃষ্ণমন্ত্রদান, এবং উক্ত উপায়ে তাঁর চৈতন্য সম্পাদন, এই সকল

অদ্ভুত ব্যাপার যে সকল পদে বর্ণিত হয়েছে তা কখনই চণ্ডী-দাসের হাত থেকে বেরোয় নি। এ সকল পদের ভাষা চণ্ডীদাসের বাংলা নয়, তার চাইতে ঢের বেশি সংস্কৃত ঘেঁসা। এর থেকেই সম্পাদক মহাশয়ের সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল যে ও-সব পদ চণ্ডীদাসের লেখা কি না? তার পর এই রকম সব অপ্রকৃত ঘটনার প্রতি চণ্ডীদাসের যে তিলমাত্রও অনুরাগ ছিল, এর পরিচয় তাঁর পূর্ব্ব পরিচিত পদে আমরা পাই নি। শ্রীকৃষ্ণের স্বয়ং দৌত্যের একটি কবিতায় চণ্ডীদাস বাজিকরের বর্ণনা করেছেন, কিন্তু সে বাজি লৌকিক বাজি—যে বাজির সঙ্গে আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে—কিন্তু সুবলের দৌত্যে যে বাজির বর্ণনা আছে—সে হচ্ছে অলৌকিক বাজি। এইরূপ অলৌকিক ঘটনার সাহায্যে রাধিকার মোহ উৎপাদন করা কখনও চণ্ডীদাসের অনুমত হতে পার্‌ত না, কেননা তিনি জান্‌তেন যে, এ জগতে আসল ইন্দ্রজাল হচ্ছে অন্তরের বস্তু—বাহিরের নয় এবং তিনি এ সত্যও জানতেন যে, রক্তমাংসের দেহধারী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দর্শনেই, পীরিতি বলিয়া এ তিন আখরের 'ত্রিশূল রাধার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল, ঐন্দ্রজালিকের জাল-কৃষ্ণের দর্শনে নয়।

সে যাই হোক, উক্ত পদগুলি কোন হিসেবেই গ্রন্থমুখে স্থান পেতে পারে না। "সখী কেবা শুনাইল শ্যাম নাম"—এই ছত্রই চণ্ডীদাসের পদাবলীর প্রথম ছত্র, এই হচ্ছে বাংলার সাহিত্য সমাজের বদ্ধমূল সংস্কার। এ বিষয়ে বৈষ্ণব আলঙ্কারিক এবং ইংরাজি শিক্ষিতসম্প্রদায় উভয়েই সম্পূর্ণ এক-মত। পূর্ব্বোক্ত চিরাগত সংস্কারের উচ্ছেদসাধন করা সম্ভবপরও নয়, উচিতও নয়।

প্রথমে শ্যামের নাম শ্রবণ, পরে বিশাখাকর্ত্তৃক লিখিত পটে শ্যাম-মূর্ত্তি দর্শন, তৎপরে সাক্ষাদ্দর্শন, এই পারম্পর্য্যে রাধিকার পূর্ব্ব-রাগের ক্রমবিকাশের একটি ধারা পাওয়া যায়—যার সঙ্গে মানুষের মন সায় দেয়। সুতরাং আমাদের মতে, সম্পাদক মহাশয় কর্ত্তৃক চণ্ডীদাসের নবাবিষ্কৃত পদগুলি পরিশিষ্টে ফেলা উচিত ছিল। সম্পাদক মহাশয় বলেন—"এখন চণ্ডীদাসের নামের ছাপ দেখিলেই তাহা সংগ্রহ করিতে হইবে, বিচার করিয়া ত্যাগ করিবার সময় এখনও হয় নাই"—এ কথা আমরা স্বীকার করি। আমাদের বক্তব্য এই যে, যে পদে চণ্ডীদাসের নামের ছাপ আছে কিন্তু হাতের ছাপ নেই—সে পদকে প্রথম পর্য্যায়ে ভুক্ত করা সঙ্গত নয়। যে সকল উপেক্ষিত পদ এতদিন ঘরের কোণে গা ঢাকা দিয়ে ছিল সেগুলিকে টেনে বার করাতে আপত্তি নেই—কিন্তু তাদের স্বস্থান সাহিত্যের সদর নয়, মফঃস্বল।

সম্পাদক মহাশয় পদসম্বন্ধে যেমন "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" এই পদ্ধতি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেছেন, বানানসম্বন্ধে তা অক্ষরে অক্ষরে বিস্মরণ করেছেন। তিনি সজোরে বলেছেন—"আমি বানানগুলিকে শুদ্ধ করিয়া লিখিয়াছি"—এর কারণ তাঁর বিশ্বাস, তাঁর বই খোল্‌বামাত্র, "ষখী কেবা যুনাইলে শ্যামনাম" এই পদ আমাদের চোখে পড়লে আমরা তাঁকে গালি দিতুম। এ ভয় করবার কোনও কারণ নেই। ওপদ ওরূপে ছাপা হলে আমাদের চোখে নতুন লাগত বটে কিন্তু পড়তে কোনও বাধা হত না। বাঙ্গালীর রসনা ষত্বণত্ব হ্রস্বদীর্ঘের ভেদ স্বীকার করে না। সুতরাং যিনি যে ভাবেই লিখুন, আমরা একই ভাবে পড়ব। সকার

এবং ইকারের অদল-বদল করাতে আমাদের কোনই আপত্তি নেই—কিন্তু অপর স্বর এবং ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে শুদ্ধ করে নেওয়াতেই বিপদ আছে। প্রাচীন বাংলার বানান শুধরে নেওয়া অতি সহজ—কেননা অনেকের বিশ্বাস বানানের শুদ্ধাশুদ্ধ নির্ণয় কর্‌বার কষ্টিপাথর আছে এবং সে হচ্ছে সংস্কৃত; কিন্তু এ বিশ্বাস ভুল। বাংলা সংস্কৃতের অপভ্রংশ নয়, মাগধী প্রাকৃতের স্ববংশ সুতরাং সংস্কৃতের কষ্টিপাথরে কষে বাংলা কথার রূপ নির্ণয় কর্‌তে গেলে সে কথার উপর অত্যাচার করা হয়। যদি সম্পাদক মহাশয় পদবলীর বানান না শুধরে নিতেন, তাহলে আমরা অনেক বাংলা কথার প্রাকৃতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের চাক্ষুষ পরিচয় লাভ কর্‌তে পারতুম। সংস্কৃতের ছাঁচে ঢেলে বাংলা শব্দের আকৃতি ও প্রকৃতি নষ্ট করার নাম তাকে শুদ্ধ করা নয়। অনেক বাংলা কথার সংস্কৃত বানান প্রাকৃত ব্যাকরণের হিসেবে অশুদ্ধ বানান। দুঃখের বিষয় এই যে শুদ্ধ বাতিকগ্রস্ত লোকদের বিশ্বাস যে বাংলা ভাষার জাত না মেরে দিলে তাকে আর জাতে তোলা যায় না।

স্ত্রীশিক্ষা

আমরা শ্রীমতী লীলা মিত্রের কাছ হইতে স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে একখানি চিঠি পাইয়াছি তাহা আলোচনা করিয়া দেখিবার যোগ্য। চিঠিখানি এই :—

একদল লোক বলেন স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন নাই, কারণ স্ত্রীলোক শিক্ষিতা হইলে পুরুষের নানা বিষয়ে নানা অসুবিধা। শিক্ষিতা স্ত্রী স্বামীকে দেবতা বলিয়া মনে করে না, স্বামিসেবায় তার তেমন মন থাকে না, পড়াশুনা লইয়াই সে ব্যস্ত ইত্যাদি।

আবার আর একদল বলেন, স্ত্রীশিক্ষার প্রয়োজন খুবই আছে, কেননা আমরা পুরুষরা শিক্ষিত, আমরা যাহাদের লইয়া ঘর-সংসার করিব তাহারা যদি আমাদের ভাব চিন্তা আশা আকাঙ্ক্ষা বুঝিতেই না পারে তবে আমাদের পারিবারিক সুখের ব্যাঘাত হইবে ইত্যাদি।

দুই দলেই নিজেদের দিক হইতে স্ত্রীশিক্ষার বিচার করিতেছেন। নারীর যে পুরুষের মত ব্যক্তিত্ব আছে, সে যে অন্যের জন্য সৃষ্ট নয়, তাহার নিজের জীবনের যে সার্থকতা আছে তাহা স্ত্রীশিক্ষার স্বপক্ষের বা বিপক্ষের কোনো উকিল স্বীকার করেন না। উকিলরা যে পক্ষ লইয়াছেন বস্তুত তাহা তাঁহাদের নিজেরই পক্ষ। মাম্‌লার নিষ্পত্তিতে যাঁহাদের প্রকৃত স্বার্থ তাঁহাদের কথা কাহারও মনে উদয় হয় না, এইটেই আশ্চর্য্য।

বিদ্যা যদি মনুষ্যত্বলাভের উপায় হয় এবং বিদ্যালাভে যদি মানবমাত্রেরই সহজাত অধিকার থাকে তবে নারীকে কোন্ নীতির

দোহাই দিয়া সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইতে পারে বুঝিতে পারি না।

আবার যাঁরা স্ত্রীলোককে তাঁহাদের নিজের জন্যই সৃষ্ট বলিয়া স্থির করিয়া বসিয়াছেন তাঁরা যেটুকু বিদ্যা স্ত্রীর জন্য উচ্ছিষ্ট রাখিতে চান তাহা হইতে স্ত্রীলোকের মনুষ্যত্বের যথোচিত পুষ্টি আশা করা বাতুলতা।

যাঁহারা শিক্ষাদানে স্ত্রীপুরুষ উভয়কেই সমভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত তাঁহারা সাধারণ পুরুষের পংক্তিতে পড়েন না; তাঁহাদের আসন অনেক উচ্চে, সুতরাং তাঁহাদের কথা ছাড়িয়া দেওয়াই উচিত।

অতএব গরজ যাঁহাদের তাঁহাদিগকেই কার্য্যক্ষেত্রে নামিতে হইবে। নিজের উদ্যমে ও শক্তিতে নিজেকে মুক্ত না করিলে অন্যে মুক্তি দিতে পারে না। অন্যে যেটাকে মুক্তি বলিয়া উপস্থিত করে সেটা বন্ধনেরই অন্য মূর্ত্তি। পুরুষ যে স্ত্রীশিক্ষার ছাঁচ গড়িয়াছে সেটা পুরুষের খেলার যোগ্য পুতুল গড়িবার ছাঁচ।

কিন্তু যিনি এ কার্য্যে অবতীর্ণা হইবেন তাঁহাকে সাধারণ স্ত্রীলোকের মত গতানুগতিক হইলে চলিবে না। সংসারের লোকে যাহাকে সুখ বলে সেটাকে তিনি আদর্শ করিবেন না। একথা তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে সন্তান গর্ভে ধারণ করাই তাঁহার চরম সার্থকতা নয়। তিনি পুরুষের আশ্রিতা, লজ্জাভয়ে লীনাঙ্গিনী সামান্য ললনা নহেন, তিনি তাহার শঙ্কটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী, এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসার-পথে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।

এই চিঠির মূল কথাটা আমি মানি। যাহা কিছু জানিবার যোগ্য তাহাই বিদ্যা, তাহা পুরুষকেও জানিতে হইবে, মেয়েকেও জানিতে হইবে,—শুধু কাজে খাটাইবার জন্য যে, তাহা নয়, জানিবার জন্যই।

মানুষ জানিতে চায়, সেটা তার ধর্ম্ম; এইজন্য জগতের আবশ্যক অনাবশ্যক সকল তত্ত্বই তার কাছে বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। সেই তার জানিতে চাওয়াকে যদি খোরাক না জোগাই কিম্বা তাকে কুপথ্য দিয়া ভুলাইয়া রাখি, তবে তার মানব-প্রকৃতিকেই দুর্ব্বল করি এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু মানুষকে পুরা পরিমাণে মানুষ করিব এ কথা আমাদের সকলের অন্তরের কথা নয়। যখন সর্ব্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব হয় তখন একদল শিক্ষিত লোক বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথা হইতে? বোধ হয় শীঘ্রই এ সম্বন্ধে রসিক লোকে প্রহসন লিখিবেন; যাহাতে দেখা যাইবে,—বাবুর চাকর কবিতা লিখিতেছে কিম্বা নক্ষত্রলোকের নাড়ি-নক্ষত্র গণনা করিবার জন্য বড় বড় অঙ্ক ফাঁদিয়া বসিয়াছে, বাবু তাহাকে ধুতি কোঁচাইবার জন্য ডাকিতে সাহস করিতেছেন না, পাছে তার ধ্যানের ব্যাঘাত হয়। মেয়েদের সম্বন্ধেও সেই এক কথা যে, তারা যদি লেখাপড়া শেখে তবে যে ঝাঁটা বঁটি ও শিলনোড়া বাবুদের ভাগে পড়ে।

অথচ ইঁহাদের তর্কের যুক্তিটা এই যে, মেয়েদের প্রকৃতিই স্বতন্ত্র। কিন্তু তাই যদি হয় তবে তাঁহাদের ভয়টা কিসের? পৃথিবীকে আমরা চ্যাপ্টা ভাবি কিন্তু তাহা গোল এ কথা জানিলে পুরুষের

পৌরুষ কমে না; তেমনি বাসুকির মাথার উপর পৃথিবী নাই এ খবরটা পাইলে মেয়েদের মেয়েলিভাব নষ্ট হইবে এ কথা যদি বলি তবে বুঝিতে হইবে মেয়েরা মেয়েই নয়, আমরা তাহাদিগকে অজ্ঞানের ছাঁচে ঢালিয়া মেয়ে করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছি।

বিধাতা একদিন পুরুষকে পুরুষ এবং মেয়েকে মেয়ে করিয়া সৃষ্টি করিলেন এটা তাঁর একটা আশ্চর্য্য উদ্ভাবন, সে কথা কবি হইতে আরম্ভ করিয়া জীবতত্ত্ববিৎ সকলেই স্বীকার করেন। জীবলোকে এই যে একটা ভেদ ঘটিয়াছে এই ভেদের মুখ দিয়া একটা প্রবল শক্তি এবং পরম আনন্দের উৎস উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছে। ইস্কুলমাষ্টার কিম্বা টেক্‌স্‌ট্‌বুক কমিটি তাঁহাদের এক্সেসাইজের খাতা কিম্বা পাঠ্য ও অপাঠ্য বইয়ের বোঝা দিয়া এই শক্তি এবং সৌন্দর্য্য-প্রবাহের মুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিতে পারেন এমন কথা আমি মানি না। মোটের উপর বিধাতা এবং ইস্কুলমাস্টার এই দুইয়ের মধ্যে আমি বিধাতাকে বেশি বিশ্বাস করি। সেইজন্য আমার ধারণা এই যে, মেয়েরা যদিবা কাণ্ট্ হেগেলও পড়ে তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দূর-ছাই করিবে না।

কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষাপ্রণালীতে মেয়ে পুরুষে কোথাও কোনো ভেদ থাকিবে না এ কথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়। বিদ্যার দুটো বিভাগ আছে। একটা বিশুদ্ধ জ্ঞানের, একটা ব্যবহারের। যেখানে বিশুদ্ধ জ্ঞান সেখানে মেয়ে-পুরুষের পার্থক্য নাই কিন্তু যেখানে ব্যবহার সেখানে পার্থক্য আছেই। মেয়েদের মানুষ হইতে শিখাইবার জন্য বিশুদ্ধ জ্ঞানের শিক্ষা চাই কিন্তু তার উপরে মেয়েদের মেয়ে হইতে শিখাইবার জন্য যে

ব্যবহারিক শিক্ষা তার একটা বিশেষত্ব আছে এ কথা মানিতে দোষ কি ?

মেয়েদের শরীরের এবং মনের প্রকৃতি পুরুষের হইতে স্বতন্ত্র বলিয়াই তাহাদের ব্যবহারের ক্ষেত্র স্বভাবতই স্বতন্ত্র হইয়াছে। আজকাল বিদ্রোহের ঝোঁকে একদল মেয়ে এই গোড়াকার কথাটাকেই অস্বীকার করিতেছেন। তাঁরা বলেন, মেয়েদের ব্যবহারের ক্ষেত্র পুরুষের সঙ্গে একেবারে সমান।

এটা তাঁদের নিতান্তই ক্ষোভের কথা। ক্ষোভের কারণ এই যে, পুরুষ আপন কর্ম্মের পথ ধরিয়া জগতে নানা বিচিত্র ক্ষেত্রে কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছে কিন্তু মেয়েদের কর্ম্ম যেখানে, সেখানে অধিকাংশ বিষয়েই তাহাদিগকে দায়ে পড়িয়া পুরুষের অনুগত হইতে হইয়াছে। এই আনুগত্যকে তাঁরা অনিবার্য্য বলিয়া মনে করেন না।

তাঁরা বলেন, পুরুষ এতদিন কেবলমাত্র গায়ের জোরেই মেয়েদের কাঁধের উপর এই আনুগত্যটা চাপাইয়া দিয়াছে। জগতের সর্ব্বত্রই এই কথাটা যদি এতদিন ধরিয়া সত্য হইয়া থাকে, যদি মেয়েদের প্রকৃতির বিরুদ্ধে পুরুষের শক্তি তাহাদিগকে সংসারের তলায় ফেলিয়া রাখিয়া থাকে তবে বলিতেই হইবে দাসত্বই মেয়েদের পক্ষে স্বাভাবিক। দাসত্ব বলিতে এই বোঝায়, দায়ে পড়িয়া অনিচ্ছা-সত্ত্বে পরের দায় বহন করা। যাদের পক্ষে এটা প্রকৃতিসিদ্ধ নয়, তারা বরঞ্চ মরে তবু এমন উৎপাত সহ্য করে না।

এতদিনের মানবের ইতিহাসে যদি এই কথাটাই সর্ব্ব দেশে সপ্রমাণ হইয়া থাকে যে, দাসীত্ব মেয়েদের স্বাভাবিক, তবে পৃথিবীর সেই অর্দ্ধেক মানুষের লজ্জায় সমস্ত পৃথিবী আজ মুখ তুলিতে

পারিত না। কিন্তু আমি বলি, বিদ্রোহী মেয়েরা স্বজাতির বিরুদ্ধে এই যে অপবাদ ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছেন এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

আসল কথা এই, স্ত্রী হওয়া, মা হওয়া, মেয়েদের স্বভাব, দাসী হওয়া নয়। ভালোবাসার অংশ মেয়েদের স্বভাবে বেশি আছে—এ নহিলে সন্তান মানুষ হইত না, সংসার টিঁকিত না। স্নেহ আছে বলিয়াই মা সন্তানের সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই; প্রেম আছে বলিয়াই স্ত্রী স্বামীর সেবা করে, তার মধ্যে দায় নাই।

কিন্তু দায় আসিয়া পড়ে যখন স্নেহপ্রেমের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সম্বন্ধ না হয়। সকল স্বামীকেই সকল স্ত্রী যদি স্বভাবতই ভালোবাসিতে পারিত তাহা হইলে কথাই ছিল না, তাহা সম্ভবপর নহে। অথচ যতদিন সমাজ বলিয়া একটা পদার্থ আছে ততদিন মানুষকে অনেক বিষয়ে এবং অনেক পরিমাণে একটা নিয়ম মানিয়া চলিতেই হইবে।

কিন্তু সেই নিয়ম সৃষ্টি করিবার সময় সমাজ ভিতরে ভিতরে স্বভাবেরই অনুসরণ করিতে থাকে। মেয়েদের সম্বন্ধে সমাজ আপনিই এটা ধরিয়া লইয়াছে যে মেয়েদের পক্ষে ভালোবাসাটাই সহজ। তাই মেয়েদের সম্বন্ধে নিয়ম ভালোবাসার নিয়ম। সমাজ তাই মেয়েদের কাছে এই দাবী করে যে, তারা এমন করিয়া কাজ করিবে যেন তারা সংসারকে ভালোবাসিতেছে। বাপ মা ভাই বোন স্বামী ও ছেলেমেয়ের সেবা তারা করিবে।—তাদের কাজ ভালোবাসার কাজ, এইটেই তাদের আদর্শ।

এইজন্য মেয়েদের সংসারে কোনো কারণে যেখানে তাদের ভালোবাসা নাই, সেখানেও তাহাদিগকে সমাজ ভালোবাসার আদর্শেই বিচার করিয়া থাকে। যে স্বামীকে স্ত্রী ভালোবাসিতে পারে নাই

তার সম্বন্ধেও তার ব্যবহারকে ভালোবাসার মাপকাঠিতেই মাপিতে হয়। সংসারকে সে ভালোবাসুক আর না বাসুক তার আচরণকে কষিয়া দেখিবার ঐ একটিমাত্র কষ্টিপাথর আছে সেটা ভালোবাসার কষ্টিপাথর।

ভালোবাসার ধর্ম্মই আত্মসমর্পণে, সুতরাং তার গৌরবও তাহাতেই। যেটাকে আনুগত্য বলিয়া লজ্জা করা হইতেছে সেটা লজ্জার বিষয় হয়, যদি তাহাতে প্রীতি না থাকে, কেবলমাত্র দায় থাকে। মেয়েরা আপনার স্বভাবের দ্বারাই সমাজে এমন একটা জায়গা পাইয়াছে যেখানে সংসারের কাছে তারা আত্মসমর্পণ করিতেছে। যদি কোনো কারণে সমাজের এমন অবস্থা ঘটে যাতে এই আত্মসমর্পণ ভালোবাসার আদর্শ হইতে বহুল পরিমাণে ভ্রষ্ট হইয়া থাকে, তবে তাহা মেয়েদের পক্ষে পীড়া ও অবমাননা।

মেয়েরা স্বভাবতই ভালোবাসে এবং একনিষ্ঠ আত্মসমর্পণের আদর্শকেই সামাজিক শিক্ষায় তাদের মনে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে—এই সুবিধাটুকু ধরিয়া অনেক স্বার্থপর পুরুষ তাদের প্রতি অত্যাচার করে। যেখানে পুরুষ যথার্থ পৌরুষের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট সেখানে মেয়েরা আপন উচ্চ আদর্শের দ্বারাই পীড়িত ও বঞ্চিত হইতে থাকে ইহার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে যত বেশি এমন আর কোনো দেশে আছে কিনা আমি সন্দেহ করি। কিন্তু তাই বলিয়া এ কথাটাকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না যে, সমাজে মেয়েরা যে ব্যবহারের ক্ষেত্রটি অধিকার করিয়াছে সেখানে স্বভাববশতই তারা আপনিই আসিয়া পৌঁছিয়াছে, বাহিরের কোনো অত্যাচার তাহাদিগকে বাধ্য করে নাই।

এ কথা মনে রাখিতে হইবে সমাজে পুরুষের দাসত্ব মেয়েদের

চেয়ে অল্প নহে বরঞ্চ বেশি। এতকালের সভ্যতার সাধনার পরেও মানুষের সমাজ আজও দাসের হাতের খাটুনিতে চলিতেছে। এ সমাজে যথার্থ স্বাধীনতা অতি অল্প লোকেই ভোগ করে। রাজ্যতন্ত্রে বাণিজ্যতন্ত্রে এবং সমাজের সর্ব্ববিভাগেই দাসের দল প্রাণপাত করিয়া সমাজ-জগন্নাথের প্রকাণ্ড রথ টানিয়া চলিতেছে। কোথায় লইয়া চলিতেছে তাহাও জানেনা, কাহার রথ টানিতেছে তাহাও দেখিতে পায় না। সমস্ত জীবন দিনের পর দিন এমন দায় বহন করিতেছে যাহার মধ্যে প্রীতি নাই সৌন্দর্য্য নাই। এই দাসত্বের বারো-আনা-ভাগ পুরুষের কাঁধে চাপিয়াছে। মেয়েদের ভালোবাসার উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে এইজন্য মেয়েদের দায় ভালোবাসার দায়; পুরুষের শক্তির উপরই সমাজ ঝোঁক দিয়াছে এইজন্য পুরুষের দায় শক্তির দায়। অবস্থাগতিকে সেই দায় এত অতিরিক্ত হইতে পারে যাহাতে ভালোবাসা উৎপীড়িত হয় ও শক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। তখন সমাজের সংস্কার আবশ্যক হয়। সেই সংস্কারের জন্য আজ সমস্ত মানবসমাজে বেদনা জাগিয়াছে। কিন্তু সংস্কার যতদূর পর্য্যন্তই যাক্ সৃষ্টির গোড়া পর্য্যন্ত গিয়া পৌঁছিবে না এবং শেষ পর্য্যন্ত কবির দল এই বলিয়া আনন্দ করিতে পারিবেন যে, পুরুষ পুরুষই থাকিবে মেয়েরা মেয়ে থাকিয়া যাইবে বলিয়াই তার "সঙ্কটে সহায়, দুরূহ চিন্তায় অংশী এবং সুখে দুঃখে সহচরী হইয়া সংসারে তাহার প্রকৃত সহযাত্রী হইবেন।"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সবুজ পত্র

বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্য

অনেকে বলে থাকেন যে আমাদের সাহিত্যের সত্যযুগ উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গেই এদেশ থেকে অন্তর্ধান হয়েছে। এখন ঘোর কলি, কেননা এ যুগে সাহিত্যের যে একটিমাত্র পদ অবশিষ্ট আছে, সে হচ্ছে সমালোচনা,—এবং আমাদের যত কিছু লাফাঝাঁপি সে সব ঐ এক পায়ের—তারপর ভবিষ্যতে যখন উক্ত পদের আস্ফালন বন্ধ হবে, তখন মন্বন্তর। এ সব কথা শুনে আমি হতাশ হয়ে পড়িনে, কেননা অতীতের চাইতে ভবিষ্যতের প্রতি আমার ভক্তি ও ভালবাসা দুইই বেশী আছে। আমরা ইভলিউসন-পন্থী—সুতরাং আমাদের সত্যযুগ পিছনে পড়ে নেই, সুমুখে গড়ে উঠছে। আমাদের কল্পিত-ধরার স্বর্গ অতীতের ভুঁই ফুঁড়ে উঠবে না, বর্ত্তমানের ভিত্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং আমাদের কাছে অতীতের অপেক্ষা বর্ত্তমান ঢের বেশি মূল্যবান। অতীতের সাহায্যে আমরা বড় জোর বর্ত্তমানের ব্যাখ্যা করতে পারি, তাও আবার আংশিক ভাবে,—কিন্তু বর্ত্তমানের সাহায্যে আমরা ভবিষ্যৎ রচনা করতে পারি। আবিষ্কার করার

চাইতে নির্ম্মাণ করা যে-পরিমাণে শ্রেষ্ঠ, অতীতের জ্ঞানের চাইতে বর্ত্তমানের জ্ঞান লাভ করা সেই পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, মানুষে বর্ত্তমানকেই সব চাইতে কম চেনে এবং কম জানে। এ পৃথিবীতে যা চিরপরিচিত তাই সব চেয়ে অপরিচিত। যা চব্বিশ ঘণ্টা আমাদের চোখের সুমুখে থাকে, তার দিকে আমরা বড় একটা দৃষ্টিপাত করিনে। ঐ কারণেই বর্ত্তমানের চেহারা আমাদের চোখে পড়ে না, এবং তার রূপ আমাদের মনে ধরে না। তা ছাড়া বর্ত্তমান একটি প্রবাহ,—দিনের পর দিন হচ্ছে কালের ঢেউয়ের পরে ঢেউ,—সুতরাং এ বর্ত্তমানের ইয়ত্তা করতে হলে কালের ঢেউ গুণতে হয়;—অপর পক্ষে অতীত হচ্ছে একটি জমাট নিরেট জড় পদার্থ, তার চারিদিকে ভক্তিভরে প্রদক্ষিণ করা যায়, সুতরাং অতীতের গুণকীর্ত্তন করা সহজ, বিশেষতঃ চোখ বুজে। আর এক কথা,—স্বদেশের অতীত হচ্ছে প্রতি জাতির পৈতৃক স্থাবর সম্পত্তি, এবং তা' সমাজের ভোগ-দখলের বিষয়, অতএব তার প্রতি সাংসারিক মনের টানও বেশী, মানও বেশী। বর্ত্তমানের দুর্ভাগ্য এই যে, তা অস্থাবর। এবং তার যা ভোগ সে শুধু কর্ম্মভোগ। এই কারণে বর্ত্তমানকে ছোঁয়া যায়, ধরা যায় না। বর্ত্তমান সাহিত্য হচ্ছে বর্ত্তমানেরই একটি অঙ্গ, কাজেই বর্ত্তমান সাহিত্যিকরা গেঁয়ো যোগীর ন্যায় সমাজের কাছে ভক্তি পাওয়া দূরে থাক্, ভিখও পান না। অথচ এই উপেক্ষিত বর্ত্তমানই যখন আমাদের অদূর ভবিষ্যতের নির্ভরস্থল, তখন এ যুগের সাহিত্যের যথাসম্ভব পরিচয় নেবার চেষ্টা করাটা আবশ্যক। চেষ্টা করলে হয়ত এর ভিতর থেকেও একটা আশার চেহারা বার করা যেতে পারে।

আমাদের পক্ষে নব-সাহিত্যের নিন্দা করা যেমন সহজ, প্রশংসা করা তেমনি কঠিন। কেননা খ্যাতনামা লেখকদের বিচার কর্‌বার অধিকার যেখানে কারও নেই, সেখানে অখ্যাতনামা লেখকদের উপরে জজ্‌ হয়ে বসবার অধিকার সকলেরি আছে। জন্মাবধি উঠতে বসতে খেতে শুতে যে বস্তুর সুখ্যাতি শুনে আসছি, সে বস্তু যে মহার্ঘ, এ বিশ্বাস অজ্ঞাতসারে আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায়। গুরু-জনদের তৈরী মত আমরা বিনাবাক্যে মেনে নেই, কেননা তা মেনে নেবার ভিতর মনের কোনও খাটুনি নেই। যদি আমরাই চিন্তামার্গে ক্লেশ করব তাহলে গুরুর দরকার কি? আর যদি আমরাই পূজা করব তাহলে পুরোহিতের দরকার কি? কেননা গুরুপুরোহিতেরা সমাজের হাতে-গড়া, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক labour saving machines. নব-সাহিত্যের দুর্ভাগ্যই এই যে, তা অতীতের ডিপ্লোমা নিয়ে আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয় না। এ সাহিত্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করতে হ'লে নিজের অনুভূতি দিয়ে তা যাচাই করতে হয়, নিজের বুদ্ধি দিয়ে তা পরীক্ষা করতে হয়। আমরা ক'জনে সে পরিশ্রমটুকু করতে রাজি? সুতরাং নব-সাহিত্যের প্রশংসার চাইতে নিন্দাই যে বেশীর ভাগ শোনা যায়, তাতে আশ্চর্য্য হবার কোনও কারণ নেই। এই সকল নিন্দাবাদের বিচারসূত্রেই আমরা প্রকারান্তরে নব-সাহিত্যের গুণাগুণের বিচার কর্‌তে চাই।

নব-সাহিত্যের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তা অপর্য্যাপ্ত ও সস্তা, বিশেষত্বহীন ও প্রতিভাহীন, চুটকি ও নকল। আমি একে একে এই সকল অভিযোগের উত্তর দিতে চেষ্টা করব।

নব-সাহিত্যের পরিমাণ যে অপর্য্যাপ্ত তা অস্বীকার কর্‌বার যো

নেই। বর্ত্তমানে এত নিত্য নূতন পুস্তক এবং পুস্তিকা, পত্র এবং পত্রিকা ভূমিষ্ঠ হচ্ছে যে, এ যুগের তুলনায় "বঙ্গদর্শনের" যুগের বঙ্গ-সরস্বতীকে বন্ধ্যা বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের নামে এই অপবাদ ছিল যে, বাঙ্গালী রসনা-সর্ব্বস্ব—বিংশ শতাব্দীতে আমরা যদি কিছু হই ত রচনা-সর্ব্বস্ব। এমন কি এই নব যুগধর্ম্মের শাসনে গত যুগের অনেক পাকা বক্তারা কেঁচে আবার লেখক হয়ে উঠছেন, নইলে যে তাঁদের গাদে পড়ে থাক্‌তে হয়।

এক কথায়, আজকের দিনে বাঙ্গলার সাহিত্য-সমাজ লোকে লোকারণ্য; এবং এ জনতার মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আছেন। বঙ্গসাহিত্যের মন্দিরে বঙ্গ-মহিলারা যে শুধু প্রবেশ লাভ করেছেন তা নয়, অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসেছেন। বসেছেন বলা বোধ হয় ঠিক হল না, কারণ এস্থলে এঁরা বসে নেই, পুরুষদের সঙ্গে সমানে পা ফেলে চল্‌ছেন। ইংরাজি রাজনীতির ভাষায় যাকে বলে Peaceful penetration, সেই পদ্ধতি অনু-সরণ করে স্ত্রীজাতি আমাদের সাহিত্যরাজ্য ধীরে ধীরে এতটা দখল করে নিচ্ছেন যে, আমার সময়ে সময়ে আশঙ্কা হয় এ রাজ্য হয়ত ক্রমে নারীরাজ্য হয়ে উঠবে। এ আশঙ্কা যে নিতান্ত অমূলক নয়, তার প্রমাণ গত মাসের "ভারতবর্ষের" প্রতি দৃষ্টিপাত কর্‌লেই প্রত্যক্ষ কর্‌তে পার্‌বেন। সাহিত্য-সমাজের এই পরদা-পার্টিতে অন্ততঃ চল্লিশ জন ভদ্রমহিলা যোগদান করে-ছিলেন। যে দেশে স্ত্রীশিক্ষা নেই, সে দেশে স্ত্রীসাহিত্যের এতটা প্রসার ও পশার বৃদ্ধির ভিতর কি একটু রহস্য নেই? এতেই কি প্রমাণ হয় না যে, এই নব সাহিত্যের মূলে এমন একটি

অজ্ঞাত অবাধ্য এবং অদম্য শক্তি নিহিত আছে, যার স্ফূর্ত্তি কোনরূপ বাহ্য ঘটনার অধীন নয়? বালিকাবিদ্যালয় ও বিশ্ব-বিদ্যালয়, উভয় স্থলেই নব সাহিত্য যে সমভাবে ও সমতেজে অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হচ্ছে,—এর থেকে বোঝা উচিত যে, আমাদের জাতীয় মন কোনও নৈসর্গিক কারণে সহসা অসম্ভব রকম উর্ব্বর হয়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে আশার বীজ বপন করাই সঙ্গত, নিরাশার নয়ন-আসার নয়।

এস্থলে নিজের কৈফিয়ৎ স্বরূপে, একটা কথা বলে রাখা আবশ্যক। কেউ মনে করবেন না যে আমি লেখিকাদের উপর কোনরূপ কটাক্ষ করে এসব কথা বলছি। কেননা—তাঁদের প্রবন্ধে এক স্বাক্ষর ব্যতীত, স্ত্রীহস্তের অপর কোনও চিহ্ন নেই। ওসব প্রবন্ধ শ্রী-স্বাক্ষরিত হলে তার থেকে মতিভ্রংশতার পরিচয় কেউ পেতেন না। এদেশে স্ত্রীপুরুষের যে কোনও প্রভেদ আছে তা বঙ্গসাহিত্য থেকে ধরবার যো নেই।

এত বেশী লোক যে এত বেশী লেখা লিখছে, তাতে আনন্দিত হবার অপর কারণও আছে। এই অজস্র রচনা এই সত্যের পরিচয় দেয় যে, বাঙ্গালীজাতি এ যুগে আত্মপ্রকাশের জন্য ব্যাকুল হয়েছে। যদি কেউ এস্থলে একথা বলেন যে, বাঙ্গালীর রচনা যে-পরিমাণে প্রকাশিত হচ্ছে, সে-পরিমাণে কিছুই প্রকাশ করছে না—তার উত্তরে আমি বলব যে, বাঙ্গালীর জাতীয় আত্মা আজও গড়ে' ওঠেনি, এবং সে আত্মা গড়ে' তোলবার পক্ষে সাহিত্য হচ্ছে একমাত্র না হলেও, একটি প্রধান উপায়। মানুষের দেহ যেমন দৈহিক ক্রিয়াগুলির চর্চ্চার সাহায্যে গড়ে' ওঠে, মানুষের

মনও তেমনি মানসিক ক্রিয়ার সাহায্যে গড়ে' ওঠে। জাতীয় আত্মা আবিষ্কার করবার বস্তু নয়, নির্ম্মাণ করবার বস্তু। আত্মাকে প্রকাশ কর্‌বার উদ্যম এবং প্রযত্ন থেকেই আত্মার আবির্ভাব হয়, কেননা সৃষ্টি বহির্মুখী। অবশ্য আমি তাই বলে' এ দাবী করি নে যে, আজকাল যত কথা ছাপায় উঠছে তার সকল কথাই জাতীয় মনের উপর ছাপ রেখে যাবে। "সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর"—ভারতচন্দ্রের এ উক্তি ব্যক্তির পক্ষে যেমন সত্য, জাতির পক্ষে তেমনি সত্য। সুতরাং বাঙ্গালীজাতি যে অনেক বাক্য বৃথা ব্যয় করছেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যে কথা বলবার কোনও আবশ্যকতা ছিল না, সে কথা বলা হয়েছে বলেই যে তা' টিঁকে যাবে, এ ভয় পাবার কোনও কারণ নেই। সাহিত্য-জগৎও যোগ্যতরের উদ্বর্ত্তনের নিয়মের অধীন। কালের নির্ম্মম কবলে পড়ে' যা ক্ষীণজীবী তা অচিরে বিনাশপ্রাপ্ত হবেই হবে। তবে বহু লোকে বহু কথা বল্‌লে, অনেক সত্য কথা উক্ত হবার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। নানা মুনির নানা মত থাকাটা দুঃখের বিষয় নয়; নানা মুনির মতের ঐক্যটাই সাহিত্য-সমাজে আসল দুঃখের বিষয়। কেননা সে মত যদি ভুল হয় তাহলে সাহিত্যের ষোল কড়াই কাণা হয়ে যায়। এবং মুনিদের যে মতিভ্রম হয়—এ-কথা সংস্কৃতেও লেখা আছে। এ যুগের বঙ্গ-সরস্বতী বহুভাষী হলেও যে বহুরূপী নন্, এ ত প্রত্যক্ষ সত্য। তবে আমাদের সাহিত্যের সুর যে একঘেয়ে তার কারণ আমাদের জীবন বৈচিত্র্য-হীন, এবং এই বৈচিত্র্যহীনতার চর্চ্চা আমরা একটা জাতীয় আর্ট করে তুলেছি। উদাহরণ স্বরূপে দেখানো যেতে পারে যে আমাদের

বদ্ধমূল ধারণা এই যে, নানা যন্ত্র এক সুরে বেঁধে তাতে এক সুর বাজালেই ঐক্যতান হয়। আর্ট-জগতে এই অদ্বৈতবাদের হাত থেকে উদ্ধার না পেলে বঙ্গসাহিত্য মুক্তিলাভ করবে না, এবং যতদিন এ দেশে আবার নূতন চৈতন্যের আবির্ভাব না হবে, ততদিন আমরা এক কথাই একশ-বার বল্‌ব, কেননা সে কথা বলার ভিতরেও মন নেই, শোনার ভিতরেও মন নেই। তাই বলে আমাদের সকল লেখাপড়া একেবারেই অনর্থক নয়,—আমরা আর কিছু করি আর না করি, ভাবী গুণীর জন্য আসর জাগিয়ে রাখ্‌ছি। পাঠক-সমাজকে ঘুমিয়ে পড়তে না দেওয়াটাও একটা কম কাজ নয়।

আমরা সদলবলে সাহিত্য তৈরি করি আর না করি, সদলবলে পাঠক তৈরি কচ্ছি।

পূর্ব্বে যা বলা গেল, তা অবশ্য সকলের সমান মনঃপূত হবে না, কিন্তু এ কথা আপনারা সকলেই স্বীকার করতে বাধ্য যে, যে ক্ষেত্রে লেখকের সংখ্যা অগণ্য, সে ক্ষেত্রে কোনও লেখক-এরণ্ড সাহিত্য-দ্রুম স্বরূপে গ্রাহ্য হবেন না,—এ বড় কম লাভের কথা নয়। হাজার অপ্রিয় হলেও একথা সম্পূর্ণ সত্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যের কোন কোন এরণ্ড এমন মহাবোধিবৃক্ষত্ব লাভ করেছিলেন যে, অদ্যাবধি বঙ্গ-সাহিত্যের পুরোনো পাণ্ডারা তাঁদের গায়ে সিঁদুর লেপে অপরকে পূজা করতে বলেন। অমুকে কি লিখেছেন কেউ না জানলেও, তিনি যে একজন বড় লেখক তা সকলেই জানেন—এমন প্রথিত-যশঃ প্রবীণ সাহিত্যিকের দৃষ্টান্ত বঙ্গদেশে বিরল নয়।

এ সাহিত্যের বিরুদ্ধে চুটকিত্বের যে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, সে অপবাদের সত্যাসত্য একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার। ছোট গল্প, খণ্ড-কবিতা, সংক্ষিপ্ত সমালোচনা, এবং প্রক্ষিপ্ত দর্শনই এ সাহিত্যের প্রধান সম্বল। সমালোচকদের মতে এই কৃশতাই হচ্ছে এ সাহিত্যের দুর্ব্বলতার লক্ষণ। বিংশ শতাব্দীতে যে কোনও নূতন মেঘনাদবধ, বৃত্রসংহার কিম্বা শকুন্তলা-তত্ত্ব লেখা হয় নি, এ কথা সত্য। এ যুগের কবিদের বাহু যে আজানুলম্বিত নয়, তার জন্য আমাদের লজ্জিত হবার কোনও কারণ নেই। বধ এবং সংহার ছাড়া কাব্যের যে অপর কোনও কর্ত্তব্য নেই, একথা একালে মানা কঠিন। আর যদি এ কথা সত্য হয় যে মার্‌কাট্‌ ব্যাপার না থাকলে কাব্য মহাকাব্য হয় না—তাহলে বল্‌তে হয় যে, সাহিত্য-জগতের এমন কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই, যার দরুন যুগে যুগে সকলকে শুধু মহাকাব্যই লিখ্‌তে হবে। Paradise Lost-এর পরে ইংরাজি ভাষায় আর দ্বিতীয় মহাকাব্য লেখা হয় নি, এবং ফরাসী ভাষায় ও-শ্রেণীর কাব্য কস্মিনকালেও রচিত হয় নি, তাই বলে ফরাসী সাহিত্য এবং মিল্‌টনের পরবর্ত্তী ইংরাজি সাহিত্যের যে কোনরূপ গৌরব নেই, একথা বলবার দুঃসাহস কোনও পাশ্চাত্য সমালোচক তাঁদের রক্তমাংসের শরীরে ধারণ করেন না।

তারপর আমরা যে শকুন্তলার চাইতে দ্বিগুণ বড় শকুন্তলা-তত্ত্ব রচনা করিনে, তার জন্য আমাদের কাছে পাঠকসমাজের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। তত্ত্ব হচ্ছে বস্তুর সার—অতএব সংক্ষিপ্ত। এ বিশ্বটি এত বিরাট যে, তাকে সচরাচর অনন্ত

ও অসীম বলা হয়ে থাকে, অথচ তাত্ত্বিকেরা বিশ্বতত্ত্ব দুচারটি ক্ষীণ সূত্রেই আবদ্ধ করে থাকেন। সুতরাং আমরা কোনও সৃষ্ট পদার্থের বিষয় দুশ'-হাত তত্ত্বজাল বুন্‌তে সাহসী হইনে, অন্ততঃ কোনও কাব্য-রত্নকে সে জালে জড়াতে চাইনে। কাব্যের আগুনের পরিচয় দেবার জন্য তাকে সমালোচনার ছাই চাপা দেওয়াটা সুবিবেচনার কার্য্য নয়—কেননা সে গুণের পরিচায়ক হচ্ছে অনুভূতি।

এ যুগের রচনার নাতিদীর্ঘতা এই সত্যেরই প্রমাণ দেয় যে, এ কালের লেখকেরা পাঠকদের মান্য করতে শিখেছেন।—হিন্দুস্থানীরা বলেন যে "আক্কেলিকো ইসারা বাস্"। যাঁদের শ্রোতার আক্কেলের উপর কোনও আস্থা নেই, তাঁরাই একটুখানি কথাকে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে ফুলিয়ে অনেকখানি করে' তুলতে ব্যস্ত।

সমালোচকদের মতে বর্ত্তমানের আর-একটি অপরাধ এই যে, এ যুগে এমন কোনও লেখক জন্মগ্রহণ করেন নি, যাঁর প্রতিভায় দেশ উজ্জ্বল করে রেখেছে। এ আমাদের দুর্ভাগ্য, দোষ নয়; প্রতিভার জন্মের রহস্য কোনও দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক অদ্যাবধি উদ্‌ঘাটন করতে পারেন নি। তবে এটুকু আমরা জানি যে, প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থার আনুকূল্য চাই। একথা যদি সত্য হয়, তাহলে স্বীকার করতেই হবে যে, নূতন সাহিত্য গড়বার যে সুযোগ গত শতাব্দীর লেখকেরা পেয়েছিলেন—সে সুযোগ আমরা অনেকটা হারিয়েছি।

গত যুগের লেখকেরা সবাই প্রধান না হোন,—সবাই স্বাধীন ছিলেন। তৎপূর্ব্ব-যুগের বঙ্গ-সাহিত্যের চাপের ভিতর থেকে

তাঁদের তেড়ে-ফুঁড়ে উঠতে হয়নি। একটি সম্পূর্ণ নূতন এবং অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য ও সৌন্দর্য্যশালী সাহিত্যের সংস্পর্শেই উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গসাহিত্য জন্মলাভ করে। সে সাহিত্যের উপর প্রাক্‌ব্রিটিশযুগের বঙ্গসাহিত্যের কোনরূপ প্রভুত্ব ছিল না। অন্নদা-মঙ্গলের ভাষা ও ছন্দের কোনরূপ খাতির রাখলে মাইকেল মেঘনাদবধ রচনা করতেন না, এবং বিদ্যাসুন্দরের প্রণয়কাহিনীর কোনরূপ খাতির রাখলে, বঙ্কিমচন্দ্র দুর্গেশনন্দিনী রচনা করতেন না। Milton এবং Scott যাঁদের গুরু—তাঁদের কাছে ভারতচন্দ্রের ঘেঁসবার অধিকার ছিল না।

কিন্তু আজকের দিনে ইংরাজি সাহিত্য আমাদের কাছে এতটা পরিচিত এবং গা-সওয়া হয়ে এসেছে যে, তার থেকে আমরা আর বিশেষ কোনও নূতন উদ্দীপনা কিম্বা উত্তেজনা লাভ করিনে। আমাদের মনে ইংরাজি সাহিত্যের প্রথম পরিচয়ের চমক্ ভেঙ্গেছে, কিন্তু বিশেষ পরিচয়ের প্রভাব স্থান পায়নি। সুতরাং আমরা গত-যুগের সাহিত্যেরই জের টেনে আস্‌ছি। আমাদের পক্ষে তাই নতুন কিছু করা একরকম অসম্ভব বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতিভাশালী লেখকের সাক্ষাৎ আমরা সেই যুগে পাই, যে যুগে একটা নূতন এবং প্রবল ভাবের প্রবাহ, হয় ভিতর থেকে ওঠে, নয় বাইরে থেকে আসে। গত যুগে যে ভাবের জোয়ার বাইরে থেকে এসেছিল, এ যুগে তার তোড় এত কমে এসেছে যে, ভাটা সুরু হয়েছে বলা যেতে পারে। এদিকে ভিতর থেকেও একটা নূতন কোনও ভাবের উৎস খুলে যায়নি। বরং সমাজের মনের টান আজ পুরাতনের দিকে—এও ত ভাবের প্রবাহের

ভাটার অন্যতম লক্ষণ। এই ভাটার মুখে নতুন কিছু করতে হলে, কালের স্রোতের উজান বইতে হয়—তা করা সহজ নয়। এ অবস্থায় যা করা সহজ তা হচ্ছে সনাতন জ্যাঠামি। সুতরাং নব সাহিত্যকে বিশেষত্বহীন এবং প্রতিভাহীন বলায়, সহৃদয়তার পরিচয় দেওয়া হয় না। আরও বিপদের কথা এই যে, আমরা উভয় সঙ্কটে পড়েছি। কেননা, যদি আমরা গত-শতাব্দীর সাহিত্যের অনুসরণ করি, তাহলে সমালোচকদের মতে আমরা নকল-সাহিত্য রচনা করি—আর যদি অনুকরণ না করি, তাহলে পূর্ব্বোক্ত মতে আমরা কাব্যের উচ্চ আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হই। অথচ আসল ঘটনা এই যে, নবযুগ কতক অংশে পূর্ব্ব যুগের অধীন, এবং কতক অংশে স্বাধীন। এই কারণে নবীন সাহিত্যিকেরা গতযুগের সাহিত্যের কোন কোন অংশের অনুকরণ করতে অক্ষম, এবং কোন কোন অংশের অনুসরণ করতে বাধ্য। একালে যে মেঘনাদবধ কিম্বা দুর্গেশনন্দিনীর অনুকরণে গদ্য এবং পদ্য কাব্য রচিত হয় না, তার কারণ, বাঙ্গালী জাতির মনের কলে Scott, Milton, Mill ও Comte-এর চাবির দম ফুরিয়ে এসেছে।—অপর পক্ষে বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যের উপর রবীন্দ্রনাথের প্রভাব অতিবিস্তৃত এবং অপ্রতিহত, তা অস্বীকার করবার যোও নেই, প্রয়োজনও নেই। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বর্ত্তমান কাব্য-সাহিত্যের একমাত্র আদর্শ বলে যে, সে সাহিত্যের কোনও মূল্য কিম্বা মর্য্যাদা নেই, এ কথায় শুধু স্থূলদর্শিতার পরিচয় দেওয়া হয়। সুতরাং নব-সাহিত্যকে নকল-সাহিত্য বলার কি সার্থকতা আছে, তাও একটু পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে, পরের লেখার অনুকরণ

কিম্বা অনুসরণ করে সাহিত্য রচনা করা যায় না। এ কথাটা ষোল-আনা সত্য নয়। ও উপায়ে অবশ্য কালিদাস হওয়া যায় না, কিন্তু শ্রীহর্ষ হওয়া যায়। "রত্নাবলী" মালবিকাগ্নিমিত্রের ছাঁচে ঢালা, অথচ সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি উপাদেয় নাটক। পৃথিবীর মহাপ্রাণ কবিদের স্পর্শে বহু লেখক প্রাণবন্ত হয়ে ওঠেন, এবং এই কারণেই তাঁদের অবলম্বন করেই সাহিত্যের নানা school গড়ে' ওঠে। ফরাসী এবং জর্ম্মান সাহিত্যে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। গেটের আনুগত্য স্বীকার করাতে শিলারের প্রতিভার হ্রাস হয় নি। Victor Hugo-র পদাঙ্ক অনুসরণ করে Musset অ-কবির দেশে গিয়ে পড়েন নি। এবং Flaubert-এর কাছে শিক্ষানবিশী করার দরুণ Guy de Mau passant-র গল্প সাহিত্য-সমাজে উপেক্ষিত হয় নি। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যেও এরূপ ঘটনার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যাকে আমরা বৈষ্ণব কবিতা বলি, তা চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির পদাবলীর অনুকরণেই রচিত হয়েছিল, কিন্তু তাই বলে, জ্ঞানদাস গোবিন্দ-দাস লোচনদাস অনন্তদাসের রচনার যে কোন মূল্য নেই, এ কথা কোনও সমালোচক সজ্ঞানে বলতে পারবেন না। আর যদি এ কথা সত্য হয় যে, পর-সাহিত্যের অনুকরণে সাহিত্য গঠিত হয় না—তাহলে উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গলায় সাহিত্য রচিত হয় নি,—কেননা, গত-শতাব্দীর মধ্যযুগের গল্প এবং উপন্যাস, কাব্য এবং মহাকাব্য, সবই যে সাহিত্যের অনুকরণে রচিত হয়েছিল, সে সাহিত্য আমাদের নিতান্তই পর। তা অপর দেশের, অপর জাতের, অপর ভাষায় লিখিত। এ সত্ত্বেও আমরা গতযুগের এই আহেলা

বিলাতী সাহিত্যকে বাঙ্গলা-সাহিত্য বলে আদর করি। তার কারণ এই যে, যে সাহিত্য উপর-সাহিত্য, তা অপরই হোক্ আর আপনই হোক, মানব-মনের উপর তার প্রভাব অনিবার্য্য।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে এবং অনুসরণে যে কাব্য-সাহিত্য রচিত হয়েছে, তা নকল সাহিত্য বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

এই নব-কবিদের রচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে প্রথমেই নজরে পড়ে যে, এ সকল রচনা, ভাষার পারিপাট্যে এবং আকারের পরিচ্ছিন্নতায়, পূর্ব্বযুগের কবিতার অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। যেমন কেবলমাত্র মনের আনন্দে গান গাইলে তা সঙ্গীত হয় না, তেমনি কেবলমাত্র মনের আবেগে স্বচ্ছন্দে লিখে গেলেও, তা কবিতা হয় না। মনের ভাবকে ব্যক্ত করবার ক্ষমতার নামই রচনা-শক্তি। মনের ভাবকে গড়ে' না তুলতে পারলে তা মূর্ত্তি-ধারণ করে না, আর যার মূর্ত্তি নেই তা অপরের দৃষ্টির বিষয়ীভূত হতে পারে না। কবিতা শব্দকায়। ছন্দ মিল ইত্যাদির গুণেই সে কায়ার রূপ ফুটে ওঠে। মনোভাবকে তার অনুরূপ দেহ দিতে হলে, শব্দজ্ঞান থাকা চাই, ছন্দমিলের কাণ থাকা চাই। এ জ্ঞান লাভ করবার জন্য সাধনা চাই, কেননা সাধনা ব্যতীত কোন আর্টে কৃতিত্ব লাভ করা যায় না। নব-কবিরা যে সে সাধনা করে থাকেন, তার কারণ এ ধারণা তাঁদের হৃদয়ঙ্গম হয়েছে যে, লেখা জিনিষটে একটা আর্ট। নবীন কবিদের রচনার সহিত হেমচন্দ্রের কবিতাবলী কিম্বা নবীনচন্দ্রের "অবকাশরঞ্জনী"র তুলনা করলে, নবযুগের কবিতা পূর্ব্বযুগের কবিতার অপেক্ষা আর্ট-অংশে

যে কত শ্রেষ্ঠ, তা স্পষ্টই প্রতীয়মান হবে। শব্দের সম্পদে এবং সৌন্দর্য্যে, গঠনের সৌষ্ঠবে এবং সুষমায়, ছন্দে ও মিলে, তালে ও মানে, এ শ্রেণীর কবিতা সাহিত্যের ইভলিউসানের একধাপ উপরে উঠে গেছে। এ স্থলে হয় ত পূর্ব্বপক্ষ এই আপত্তি উত্থাপন কর্‌বেন যে, ভাবের অভাব থেকেই ভাষার এই সব কারিগরি জন্মলাভ করে। যে কবিতার দেহের সৌন্দর্য্য নেই, তার যে আত্মার ঐশ্বর্য্য আছে,—এ কথা আমি স্বীকার কর্‌তে পারিনে। এলোমেলো ঢিলেঢালা ভাষার অন্তরে ভাবের দিব্যমূর্ত্তি দেখবার মত অন্তর্দৃষ্টি আমার নেই। প্রচ্ছন্নমূর্ত্তি ও পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি একরূপ নয়। ভাব যে কাব্যের আত্মা, এবং ভাষা তার দেহ,—একথা আমি স্বীকার করি। কিন্তু কাব্যের দেহ থেকে আত্মা পৃথক করা অসম্ভব বল্‌লেও অত্যুক্তি হয় না। কোথায় দেহের শেষ হয় এবং আত্মার সূত্রপাত হয়, সে সন্ধান কোনও দার্শনিকের জানা নেই। যাঁর রসজ্ঞান আছে তাঁর কাছে এ সব তর্কের কোনও মূল্য নেই। কবিতা-রচনার আর্ট নবীন কবিদের অনেকটা করায়ত্ত হয়েছে—এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে তাঁদের লজ্জা পাবার কোনও কারণ নেই। ভারতচন্দ্র মালিনীর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, "আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে, এবে বুড়া তবু কিছু গুঁড়া আছে শেষে।" স্বয়ং ভারতচন্দ্রের কবিতার যদি ঠাট্‌ বাদ দেওয়া যায়, তাহলে যে গুঁড়া অবশিষ্ট থাকে তাতে ফোঁটা দেওয়াও চলে না, কেননা সে গুঁড়া চন্দনের নয়। অথচ ভারতচন্দ্র যে কবি, সে বিষয়ে আমার মনে কোনও সন্দেহ নেই। নবীন কবিদের যে ভাব-সম্পদ নেই, একথা বলায় আমার

বিশ্বাস, কেবলমাত্র অন্যমনস্কতার পরিচয় দেওয়া হয়। মহাকবি ভাস বলেছেন যে পৃথিবীতে ভাল কাজ করবার লোক সুলভ, চেনবার লোকই দুর্ল্লভ।

মহাকাব্যের দিন যে চলে গেছে, তার প্রমাণ বর্ত্তমান ইউরোপেও পাওয়া যায়। সে দেশে কবিতা আজও লেখা হয়ে থাকে, কিন্তু হাতে-বহরে সে সবই ছোট। ফরাসী দেশের বিখ্যাত লেখক আঁদ্রে গীদ্ বলেন যে, গীতাঞ্জলি মুষ্টিমেয় না হলে বর্ত্তমান ইউরোপ তা করযোড়ে গ্রহণ করত না। তাঁর ধারণা ছিল যে, ভারতবর্ষে রামায়ণ মহাভারতের চাইতে ছোট কিছু লেখা হয়নি এবং হতে পারে না। এ কথা অবশ্য সত্য নয়। সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন একদিকে রামায়ণ মহাভারত আছে, অপরদিকে তেমনি দু-লাইন চার লাইন কবিতারও ছড়াছড়ি। ভারতবর্ষে পূর্ব্বে যা ছিল না, সে হচ্ছে এ দুয়ের মাঝামাঝি কোনও পদার্থ। এ কালে আমরা যে ব্যাস বাল্মীকির অনুকরণ না করে, অমরু, ভর্ত্তৃহরির অনুসরণ করি, সে যুগধর্ম্মের প্রভাবে। যে কারণে ইউরোপে আর মহাকাব্য লেখা হয় না, সেই একই কারণে এ দেশেও মহাকাব্য লেখা স্থগিত রয়েছে। এ যুগের কবিতা হচ্ছে হৃদয়ের স্বগতোক্তি, সুতরাং সে উক্তি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের চাইতে দীর্ঘ হতে পারে না। কিন্তু একালে গল্প আমরা গদ্যে বলি, কেননা আমরা আবিষ্কার করেছি যে দুনিয়ার কথা দুনিয়ার লোকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য গদ্যের পথই প্রশস্ত। সুতরাং গল্পের উত্তরোত্তর দেহ সঙ্কুচিত হওয়াটা ক্রমোন্নতির লক্ষণ নয়। ইউরোপে আজও গদ্যে এমন এমন নভেল লেখা হয়ে থাকে, যা আকারে মহাভারতের

সমান না হলেও, রামায়ণের তুল্যমূল্য। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নভেলিষ্ট Tolstoy-র এক একখানি নভেল এক এক-খানি মহাকাব্য বিশেষ। ও-দেশের গদ্য-সাহিত্যে যেমন একদিকে ব্যাস বাল্মীকি আছে, অপর দিকে তেমনি অমরু ভর্ত্তৃহরিরও অভাব নেই। যে ক্ষেত্রে হাজার হাজার পাতার দুচারটি গল্প জন্মলাভ করছে—সেই ক্ষেত্রেই আবার দু পাতা চার পাতার হাজার হাজার গল্প জন্মলাভ করছে—এতেই পরিচয় দেয় যে, ইউরোপের মনের ক্ষেত্র কত সরস, কত সতেজ, কত উর্ব্বর। সুতরাং আমাদের নব গদ্য-সাহিত্যে যে ছোট গল্প ছাড়া আর কিছু গজায় না, তাতে অবশ্য এ সাহিত্যের দৈন্যেরই পরিচয় দেয়। কিন্তু এ দীনতা ইউরোপীয় সাহিত্যের তুলনায় যতটা ধরা পড়ে, উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-সাহিত্যের তুলনায় ততটা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে, গত যুগের গল্প-সাহিত্যে সঞ্জীবচন্দ্রের "কণ্ঠমালা" এবং তারক গাঙ্গুলির "স্বর্ণলতা" ব্যতীত আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। এ যুগের গল্প-লেখকেরা যে সাধারণতঃ ছোট গল্প রচনার পক্ষপাতী তার কারণ এই যে, আমাদের জীবন ও মন এতই বৈচিত্র্যহীন, এবং সে মনে ও সে জীবনে ঘটনা এত অল্পই ঘটে, এবং যা ঘটে তাও এতটা বিশেষত্বহীন যে, তার থেকে কোনও বিরাট-কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করা যায় না। এ অবস্থায় আমাদের পক্ষে Anna Karenina কিম্বা Les Miserables গড়তে বসায় বাচালতার পরিচয় দেওয়া হয়—প্রতিভার নয়।

এ সমাজে যা পাওয়া যায়, এবং সম্ভবতঃ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, সে হচ্ছে ছোট গল্পের খোরাক্। আমাদের জীবনের

রঙ্গভূমি যতই সঙ্কীর্ণ হোক্ না কেন, তারই মধ্যে হাসি-কান্নার অভিনয় নিত্য চলছে, কেননা আমরা আমাদের মনুষ্যত্ব খর্ব্ব করেও নিজেদের মানুষ ছাড়া অপর কোনও শ্রেণীর জীবে পরিণত করতে পারি নি। ভয় আশা, উদ্যম নৈরাশ্য, ভক্তি ঘৃণা, মমতা নিষ্ঠুরতা, ভালবাসা দ্বেষহিংসা, বীরত্ব কাপুরুষতা, এক-কথায় যা নিয়ে এই মানবজীবন—তা miniature-য়ে এ সমাজে সবই মেলে। সুতরাং যখন রবীন্দ্রনাথ আমাদের গল্প-সাহিত্যের এই নূতন পথটি খুলে দিলেন, তখন আমরা দলে দলে সোৎসাহে সেই পথে এসে পড়লুম। এ অবশ্য আপশোষের কথা নয়। এবং এর জন্যও দুঃখ করবার দরকার নেই যে, এ পথে এখন এমন বহুলোক দেখা যায়, যাদের কাজ হচ্ছে শুধু সে পথের ভিড় বাড়ানো। কি ধর্ম্মে, কি সাহিত্যে, কোনও মহাজন-কর্ত্তৃক একটি নূতন পন্থা অবলম্বিত হলে, সেখানে চিরদিনই এমনি জনসমাগম হয়ে থাকে, তার মধ্যে দুচারজন শুধু এগিয়ে যান। এর থেকে এ প্রমাণ হয় না যে, সে পথ বিপথ,—কিন্তু এই প্রমাণ হয় যে, বেশির ভাগ লোক দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য। Many are called but few are chosen—বাইবেলের এ কথা হচ্ছে এ সম্বন্ধে শেষ কথা। এ যুগে কোন অসাধারণ প্রতিভাশালী উপন্যাসকার না থাকলেও এমন অনেক গল্প লেখা হয়ে থাকে যা গত-শতাব্দীর কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর লেখকের কলম হতে বেরত না। সুতরাং নব-সাহিত্যে যদি chosen few থাকেন, তাহলে আমাদের ভগ্নোদ্যম হবার কারণ নেই।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

অভিনবের ডায়ারী

রসের অলৌকিকত্ব

দিঙ্নাগ বল্লেন যে, আজকাল ব্যাপার বড় গুরুতর হয়ে উঠেছে। ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদ, পুরাণ সমস্ত রসাতল যাবার জোগাড় হয়েছে। কিছু ভাল লাগলেই লোকে বলে, 'আহা কি আনন্দ! কবি যখন কাব্য লেখেন, তিনি বলেন "আমার আনন্দে আমি লিখ্‌ছি, এ আমার লেখা, এ আমার লীলা।" একটা কাব্য ভাল কি মন্দ তার বিচার করতে গিয়ে লোকে বলে, "এটা এমন ভাল লাগ্‌ছে, এটাতে আমরা এত আনন্দ পাচ্ছি, এটা খুব একটা উঁচুদরের কাব্য।" শুধু ভাল লাগার দ্বারা কাব্যের বিচার করতে হবে—এও ত বড় বিপদের কথা হয়ে দাঁড়াল! ভাল লাগার পিছনে, ভাল মন্দ, সত্য মিথ্যা, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট অনেক কারণ রয়েছে। সে সমস্ত কারণের অনুসন্ধান না করে', শুধু ভাল লাগে বলেই কোন কবিতাকে শ্রেষ্ঠ, আর ভাল লাগে না বলেই কোন কবিতাকে নিকৃষ্ট বলা যায় না। আমার যেটা ভাল লাগে, তোমার সেটা ভাল লাগে না। তোমার যেটা ভাল লাগে, আর একজনের হয় ত সেটা ভাল লাগে না। এ ত এক এক জায়গায় এক এক রকম। ভাললাগার ত কোন একটা মাপ-কাঠি নেই, যার দ্বারা কাব্যের ভালমন্দ বিচার করা চল্‌তে পারে। তর্কের ভূমিতে সেই ব্যক্তিগত অনুভূতি ছাড়া আর একটা প্রামাণ্যের অস্তিত্ব মান্‌তেই হবে। আনন্দ অনেক

রকমই হতে পারে। কবিতা পড়ে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, তেমনি আবার রসগোল্লা খেয়েও ত আনন্দ পাওয়া যায়। তারপর এক বিষয়ে যখন দশজন আনন্দ পায়, তখন তাদের সকলের আনন্দ কিছু সমান হতে পারে না। আনন্দ পাওয়া, ভাললাগা—এ ত মানুষের ব্যক্তিগত ভাব, তা' দিয়ে কখনও কোন সাহিত্যের বিচার চল্‌তে পারে না। গোড়ায় একটা আনন্দ বস্তু আছে, সেটা সকলের মধ্যেই এক; তারি ভিন্ন ভিন্ন রকমের প্রকাশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের ভাললাগা, মন্দলাগার সৃষ্টি হয়। কোন রচনার ভালমন্দ বিচার করতে হলে এই আনন্দ বস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে তার ভালমন্দ বিচার করতে হবে। রসগোল্লা খেতে যে ভাল লাগে, তাকেও ত তাহলে আনন্দ বলা চলে,—এবং সে আনন্দের সঙ্গে কাব্যের আনন্দের তফাৎই বা থাকে কোনখানে? কাব্যের ভাললাগাকে আনন্দ আনন্দ বলে' সকলে যে তাকে একেবারে কুলীন করে তুলেছেন, এটা নিতান্তই বাড়াবাড়ি।

দেশজ্ঞ টানে দিঙ্নাগ যখন এক-নিঃশ্বাসে এই পর্য্যন্ত বলে' থাম্‌লেন, তখন ভট্টনায়ক তার কথায় আপত্তি করে উঠ্‌লেন। ভট্টনায়কের মুখখানি একেবারে মুণ্ডিত, দাড়ি গোঁফের চিহ্ন নাই; নাকটা বেশ উঁচু, বড় বড় দুটো চোখ প্রতিভায় জ্বলজ্বল্ করছে। যে বিষয়ে তিনি আলোচনা করেন, তার অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত তাঁর দৃষ্টি পৌঁছে যায়, অথচ তাঁর কথার ভিতর একটু দার্শনিকতার ঝাঁজও আছে। তিনি বল্লেন,—আপনি এ কি বল্‌চেন। কাব্যে যাকে লোকে বলে "ভাললাগা" সেটা ত রস, সেটাকে ত লোকে চিরকালই আনন্দময় বলে' থাকে। রস স্বগুণেই চিরকাল শ্রেষ্ঠ

কুলীন হয়ে রয়েছে। এ কৌলীন্যে আধুনিকতার গন্ধ বিন্দুমাত্রও নাই। রসও যা' আনন্দও তা'। মনের ভাব উদ্রিক্ত হয়ে যখন একটা প্রকাশময়, আনন্দময় চেতনার মধ্যে আত্মার বিশ্রাম ঘটিয়ে দেয়, তাকেই বলা যায় আনন্দ, তাকেই বলা যায় রস। রস বা আনন্দকে যখন আমরা একটা চল্‌তি ডাকনাম দিতে চাই, তখন তাকে বলি "ভাললাগা"।

ভট্টনায়কের এই কথা শুনে দিঙ্নাগ একটু মুচ্‌কি হেসে বল্লেন, "আমার বুদ্ধিটা কিছু মোটা। আমরা যে সত্যকে আঁক্‌ড়ে ধরি তাকে একটু মোটা রকমেই ধরি, আমাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের এমন শক্তি নেই যে তার সাহায্যে আমরা কোন বস্তুকে চিনে নিতে পারি। তাই আপনাদের ও-সমস্ত হেঁয়ালীর কথা আমরা বুঝতে পারি না। আমরা যেটা পাই সেটা হাতে হাতে পাই। কৌলীন্য ও অকৌলীন্যের উপমার ছায়ায় আশ্রয় নিলে ত কোন লাভ নেই। দেখতে হবে যে "ভাললাগা" জিনিসটা এক রকম ছাড়া দুরকম হতে পারে কিনা? একবার যদি বল্লেন "ভাললাগা", তবে তার মধ্যে অন্য কোনরকমের ভেদ ত আনবার জো নেই। পেটুকের মিষ্টান্ন ভাল লাগে, কৃপণের ধন ভাল লাগে, দাতার দান ভাল লাগে,—এ সবই ত ভাললাগা। ভাললাগা হিসাবে ত এদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কারণ ভাললাগা ত একটা জিনিস, তার মধ্যে তোমরা পার্থক্য আন্‌বে কোনখান থেকে? তবে যে তাদের মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাওয়া যায়, সেটা বস্তুর পার্থক্য। "ভাললাগার" বস্তুর পার্থক্য অনুসারে ভাললাগার পার্থক্য দেখ্‌তে পাই। কিন্তু ভাললাগার মধ্যে

ভাললাগার কোন পার্থক্য নেই। আর যদি কোন ভেদ থাকৃত, তবু তা দেখ্‌বার কারও কোন সাধ্য ছিল না, কারণ ভাললাগা মন্দলাগা ত যার তার ব্যক্তিগত; তার ত কোন একটা সামাজিক মানদণ্ড থাকৃতে পারে না। কাজেই ভাললাগার উৎকর্ষাপকর্ষ বিচার করতে গেলে সেটা তার বিষয়কে অবলম্বন করেই করতে হবে।

ভট্টনায়ক উত্তর করলেন, "দেখুন দিঙ্নাগবাবু, যে ভুলটা সকলে সাধারণতঃ করে' থাকে, সেটা আপনিও করেছেন দেখছি! কাব্যনাটকের যে রস বা আনন্দ সেটাকে "ভাললাগা" বল্লে এই দোষ হয় যে, লোকে অন্য পাঁচরকম ভাললাগার সঙ্গে সেটাকে ঘুলিয়ে ফেলে একটা মহা গণ্ডগোল বাধিয়ে দেয়। আনন্দ বল্লেই বা রক্ষা কোথায়? কারণ কাব্যের আনন্দটাকে যেমন অপভ্রষ্টভাবে অনেক সময় ভাললাগা বলা হয়ে থাকে, তেমনি ইন্দ্রিয়জ "ভাললাগা"কেও আনন্দ নাম দিয়ে আমরা অনেক সময়ে তার মান বাড়িয়ে দিয়ে থাকি, অথচ এই লৌকিক আনন্দ বা ভাললাগা, আর কাব্যের আনন্দ বা "ভাললাগা"—এ দুয়ের মধ্যে স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ। কাজেই গোড়াকার সেই কথাটা ঠিক না হয়ে গেলে, এ বিষয়ে আমরা যতই তর্ক করি না কেন, কোনও মীমাংসা হবে না,—শুধু ভাগাসিদ্ধি বা Fallacy of Four terms হয়ে যাবে।

ভট্টনায়কের কথা শেষ হতে না হতেই রুদ্রটবাবু বলে' উঠ্‌লেন যে, "এদিক ওদিক করে' কথা কইলে ত চল্‌বে না, যে কথাটা উঠেছে সেইটার উত্তর দিন। ভাললাগার মধ্যে

আপনারা কেমন করে' ভেদ দেখাতে পারেন, সেটা একবার বুঝিয়ে দিন ত দেখি।" মেঘ্লা দিনের গুমট্ গরমের মধ্যে দ্বিপ্রহরের মত তার মুখের দীপ্তিতে একটা তাপও ছিল চাপও ছিল, কিন্তু কোন স্নিগ্ধতা ছিল না। প্রচুর পুঁথির চাপে তার মুখখানাকে যেন একটা পিরামিডের মত নিরেট্ করে তুলেছিল।

ভট্টনায়ক বল্লেন যে, "হাঁ তাই ত, আমি ত এই বল্‌তেই যাচ্ছিলাম যে, সাধারণতঃ যাকে ইন্দ্রিয়জ "ভাললাগা" বলা যায়, তার মধ্যে কোন বিশেষ তফাৎ নেই—সে কথা ঠিক। রসগোল্লা খেতে ভাললাগাও যা', আর পোলাও খেতে ভাল-লাগাও তা'। অর্থাৎ শুধু ভাললাগার দিক্ থেকে দেখ্‌তে গেলে, এ দুয়ের মধ্যে বিশেষ কোন ভেদ নাই, কাজেই তাদের মধ্যে পরস্পরের যে প্রভেদ সেটা কেবল বিষয়ের প্রভেদ। এই ইন্দ্রিয়জ "ভাললাগা" বা ভোগের বিচার করতে গেলেই আমরা তার বস্তুর বিচার করে থাকি। এই ইন্দ্রিয়জ ভোগের দ্বারা আমরা জগতের সঙ্গে আমাদের যোগস্থাপন করি, এবং তাই নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে কাড়াকাড়ি করি।

কাজেই এই ইন্দ্রিয়জ ভোগ সর্ব্বদাই বহির্ম্মুখী। সেখানে শুধু ভাললাগাতেই বিশ্রাম নেই, ভাললাগার বস্তুটি কাছে রাখা চাই, পাওয়া চাই, আপনার করা চাই। এক বস্তু এক সময়ে দশজনের কাছে থাকতে পারে না। কাজেই এই ভাললাগার বস্তু নিয়ে লোকের মধ্যে পরস্পর বিরোধ বেধে যায়। কাজেই এখানে প্রত্যেকের ভাললাগার জিনিসগুলিকে তার আয়ত্তাধীন

করবার জন্য, কোন্‌খানে ভাললাগা উচিত কোন্‌খানে উচিত নয়, তার একটা সীমা স্থির করবার দরকার হয়। এবং এই বস্তুবিচারই "ভাললাগার" ভালমন্দর মাপকাঠি হয়।

ভাললাগার সঙ্গে বস্তু এত মাখামাখি হয়ে রয়েছে যে, বস্তু বাদ দিলে ভাললাগা ধ্বংস হয়ে যায়। এই ভাললাগাটি বজায় রাখবার জন্য, তার আশ্রয়-বস্তুগুলিকে পরস্পরের মধ্যে আপোষে ভাগাভাগি করে' দেবার জন্য নিয়মের দরকার। এই নিয়মের উপরেই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। এটা একদিকে যেমন বিধি-নিষেধ বা Morality-র ক্ষেত্র, অপরদিকে তেমনি রাষ্ট্রসংযম বা State-এর ক্ষেত্র, ধর্ম্ম বা Law-এর ক্ষেত্র। এখানে ভাললাগা মন্দলাগা বা ব্যক্তিগত অনুভূতি দ্বারা কাজের ভালমন্দের বিচার হয় না। ভালমন্দর মাপকাঠি এস্থলে স্বতন্ত্র। কাব্য সম্বন্ধে ত এ কথা বলা চলে না, কারণ এ রাজ্যে ত বস্তুর হুড়াহুড়ি নেই; সেখানে বিশ্রাম হচ্ছে আনন্দে, রসে, মাধুর্য্যে—"সত্ত্বোদ্রেক প্রকাশানন্দময় সংবিদ বিশ্রান্তি সতত্ত্বেন ভোগেন ভুজ্যতে",—এটা একটা আনন্দময়, রসময়, প্রকাশময় বিশ্রাম। কাব্যের রস উপভোগে কারও সহিত কারও কোন দ্বন্দ্ব হতে পারে না, কারণ এ রসের মধ্যেই রসের বিশ্রাম,—বস্তু নিয়ে ত এখানে মারামারি নেই।

কাজেই অন্য বিষয় সম্বন্ধে ভালমন্দ বল্লে যা বুঝা যায়, এখানে ভালমন্দ বল্লে তা বুঝা যায় না।

রুদ্রট। "আপনি কি বলতে চান যে, কাব্যরসের জন্য কোনও বস্তুর দরকার হয় না? এ ত বড় অদ্ভুত কথা বলে'

মনে হচ্ছে। আমরা ত জানি যে অন্য আর পাঁচটা শাস্ত্রে যে সমস্ত বিষয়ের কথা বলা হয়, কাব্যের বিষয়ও তাই। অন্য পাঁচটা শাস্ত্র যেমন বস্তুগত, কাব্যও তেমনি। তবে তফাৎ এই যে, কাব্য সেই কথাগুলিই একটু সরস করে' বলে। শব্দ আর অর্থ নিয়েই ত কাব্য;—বস্তু ছাড়া শব্দও হয় না, অর্থও হয় না। কাজেই বস্তুর সঙ্গে ও কাব্যের সঙ্গে যে সম্পর্ক, সেটা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তাকে কোন রকমে এড়ান যায় না, তাই অস্বীকার করাও চলে না। এই দেখুন না, অমুকের কবিত্বশক্তি আছে বল্লে আমরা কি বুঝি? না, তার মনে নানারকমের বিষয় বা বস্তু উদয় হয়। আর সেগুলি প্রকাশ করবার মত শব্দ তার চট্‌পট্‌ মনে পড়ে। কাজেই অন্য শাস্ত্রের সঙ্গে কাব্যের যে বড় বেশী একটা তফাৎ আছে, তা নয়। তবে হাঁ, আপনি বল্‌তে পারেন যে, কাব্যে যেটুকু বলা হয়, সেটুকু বেশ সরস করে বলা হয়। এ ছাড়া কাব্য সম্বন্ধে আর অন্য কোনরকম দাবীই আপনারা কর্‌তে পারেন না।

ভট্টনায়ক। বেশ ত, আপনার কথা না হয় মেনে নেওয়া গেল, তাতে আমি কিছু ক্ষতি দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। আপনি বল্‌ছেন যে, অন্য শাস্ত্রের সঙ্গে কাব্যের এইটুকু মাত্র তফাৎ যে, কাব্যের মধ্যে রস আছে। আমিও ত ঠিক সেই কথা বল্‌ছি যে, রস থাক্‌লেই বলব কাব্য, নৈলে শুধু শব্দার্থ যতই চমৎকার হোক্ না কেন, তাকে কখনও কাব্য বলব না। শব্দার্থকে কাব্যের শরীর বলুন, তাতে আমার আপত্তি নেই,—তবে তার প্রাণ হচ্ছে রস। শরীর ছাড়া প্রাণের অভিব্যক্তি দেখ্‌তে পাই না বটে,

তাই বলে' শরীর এবং প্রাণ একই জিনিস, একথা বল্‌তে পারি নে। প্রাণ না থাকলে শরীর একটা পাঞ্চভৌতিক বিকার। সেটা খুব মোটারকমের বস্তু সন্দেহ নেই, কিন্তু তাই বলে' একথা বলা চল্‌বে না যে, বস্তু থেকে রস হয়েছে, শরীর থেকে প্রাণ হয়েছে। প্রাণ যেমন শরীরের মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে, রসও তেমনি শব্দার্থের মধ্য দিয়ে আপনাকে প্রকাশ করে। প্রাণ যেমন নিজের বলে নিজের উপযোগী দেহ নির্ম্মাণ করেছে, তেমনি রসও তার আপন উচ্ছ্বাসে আপনার উপযোগী শব্দার্থের সৃষ্টি করে,—এবং তারই অবলম্বনে আপনাকে প্রকাশ করে থাকে। যেমন প্রাণের আনন্দ থেকে অনন্তজীবদেহের সৃষ্টি হয়, তেমনি কবির আনন্দ বা রস থেকে কাব্যকুঞ্জের বিচিত্রলীলার সৃষ্টি হয়। প্রাণের মধ্যে যেমন প্রাণের আর কোন দেহ নেই, তেমনি রসের মধ্যেও রসের আর কোন দ্বিতীয় দেহ নেই। একে আনন্দ বল্লেও বলা যায়, চিৎ বল্লেও বলা যায়, প্রকাশ বল্লেও বলা যায়, আবার রস বল্লেও বলা যায়। এটা এমন একটা অখণ্ড সত্তা যে, এখানে চিৎ আর আনন্দের কোনও প্রভেদ নেই। এখানে দুই বল্‌তে কিছু নেই, একটা অখণ্ড রসোপলব্ধি আনন্দাস্বাদ ছাড়া আর কিছুই নেই। এই রস ও আনন্দ একই কথা। আপনার খেলার মধ্যে, লীলার মধ্যে এ আপনিই প্রকাশ হয়ে রয়েছে। একে প্রকাশ করবার জন্য কোন প্রমাণান্তরের আবশ্যক হয় না। একে কেউ উৎপন্নও করে না, প্রকাশও করে না। এর উপর কাহারও কোন হাত নেই —এমন কি, যে কবির মধ্যে এর আবির্ভাব হয়েছে, তারও নয়।

"রাখ কৌতুক নিত্য নূতন,
ওগো কৌতুকময়ী!
আমার অর্থ, তোমার তত্ত্ব,
বলে দাও মোরে, অয়ি!
আমি কিগো বীণা যন্ত্র তোমার,
ব্যথায় পীড়িয়া হৃদয়ের তার,
মূর্চ্ছনা ভরে গীতঝঙ্কার
ধ্বনিছ মর্ম্ম মাঝে?
আমার মাঝারে করিছ রচনা,
অসীম বিরহ, অপার বাসনা,
কিসের লাগিয়া বিশ্ববেদনা
মোর বেদনায় বাজে?
মোর প্রেমে দিয়ে তোমার রাগিণী,
কহিতেছ কোন্ অনাদি কাহিনী,
কঠিন আঘাতে, ওগো মায়াবিনী
জাগাও গভীর সুর!
হবে যবে তব লীলা অবসান,
ছিঁড়ে যাবে তার, থেমে যাবে গান,
আমারে কি ফেলে করিবে প্রয়াণ
তব রহস্যপুর?"

এবার দিঙ্নাগ একটু অসহিষ্ণু হয়ে উঠে তাঁর মোটা হাত-খানা টেবিলের উপর চাপ্ড়ে বল্লেন যে, কবিতা দিয়ে কবিতার

সমর্থন, এও যেমন এক বিষম argument in a circle, তেমনি রসকে আনন্দ বলাও একটা ভয়ানক আজগুবি ব্যাপার। রস মাত্রই আনন্দাত্মক, এটুকু পর্য্যন্ত স্বীকার করতে আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু তা বলে রসকে কখনও আনন্দ বলা চলে না, কারণ তাহলে রসমাত্রই আনন্দাত্মক না বলে আনন্দমাত্রই আনন্দাত্মক বলা যেতে পারত, কিন্তু সে কথার কোন অর্থ থাকত না। "রসো বৈ সঃ রসোহ্যে বায়ং লব্ধানন্দী ভবতি"—পরমেশ্বর রসস্বরূপ। পরমেশ্বরের রস পেয়েই জীব আনন্দিত হয়। এখানেও রস আর আনন্দ যে একই বস্তু, এমন বলা হয় নি। পুত্রকে পেয়ে মাতার আনন্দ হয়, তাই বলে কি বল্‌তে হবে যে পুত্রই আনন্দ? বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে যে পার্থক্য, রস ও আনন্দের মধ্যেও সেই প্রভেদ।

ভট্টনায়ক। রস আনন্দাত্মক বল্লেই যে রস আনন্দ হতে পারে না, এ কথা আপনি কি বুদ্ধিতে ঠিক করলেন! একে সংস্কৃতে বলে বিকল্প—"শব্দজ্ঞানানুপাতীবস্তুশূন্যো বিকল্পঃ"। রস ও আনন্দ এই উভয়ের মধ্যে যে বাস্তবিক কোন পার্থক্য আছে তা নয়, ওটা একটা কথার জের মাত্র। লোকে বলে "রাহুর মাথা" "পুরুষের চৈতন্য", তাই বলে কি রাহু মাথা ছাড়া একটা স্বতন্ত্র বস্তু, না পুরুষ চৈতন্য ছাড়া আর কিছু! রসের আনন্দই বলুন আর রস আনন্দাত্মকই বলুন, ও একই কথা,—এবং ওর মানে এই যে, রসও যা' আনন্দও তা'। "রসং হ্যে বায়ং লব্ধানন্দী ভবতি," এর মানে এ নয় যে, ব্রহ্মের রস পেয়ে লোক আনন্দিত হয়, এবং রস আর আনন্দ এক বস্তু নয়, কারণ আনন্দ ছাড়া যে আর

কোন রসস্বরূপ আছে, তা উপনিষদের সিদ্ধান্ত নয়। "ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ"। তার মানে এই যে, সৎ, চিৎ এবং আনন্দ, এই তিনটিই পরস্পর অভিন্ন এক তত্ত্ব। যাকে রস বলছ, তাকেই আনন্দ বল্‌তে হবে,—কারণ আনন্দ ছাড়া "রসতত্ত্ব" বলে' ব্রহ্মের আর কোন স্বতন্ত্র তত্ত্ব নেই। পুত্রকে পেয়ে আনন্দ পাই, অথচ পুত্র আনন্দ নয়, এ সমস্ত ছেলেমানুষী তর্কের আড়ম্বর করে শুধু কথা বাড়াচ্ছেন মাত্র, কারণ আমরা ত বলিনি যে—"রস পেয়ে আমরা আনন্দ পাই"; আমরা বলছি যে, রসও যা' আনন্দও তা', আনন্দময়ত্বই হচ্ছে রসের লক্ষণ। কাজেই কোন রসটা শ্রেষ্ঠ, কোন রসটা নিকৃষ্ট, এ কথা বলা চলে না,—এবং বাহির থেকে একটা রসের আদর্শও খাড়া করা চলতে পারে না,—কারণ সে যে সকলের চেয়ে উঁচুতে, তার ত কোন মাপকাঠিতেই নাগাল পাওয়া যাবে না। সে যে ব্রহ্মস্বাদ সহোদর, অন্য ভাললাগার সঙ্গে ত রসের কোন তুলনা হতে পারে না। অন্য ভাললাগার সঙ্গে আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে সম্বন্ধ। কাজেই সেখানে ভাললাগার সঙ্গে একটা মন্দলাগাও রয়েছে, কিন্তু কাব্যের রসের মধ্যে কোন মন্দলাগা নেই। এখানে সর্ব্বদাই স্বর্গ-মন্দাকিনীর রসনির্ঝর উচ্ছ্বসিত হচ্ছে। তাতে আমাদের দৈনিক পানাবগাহনের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, এবং এই জন্য তাকে আমরা এমন বিশেষ করে' আনন্দময় বলে', আর সবরকম আনন্দ বা ভাললাগার থেকে স্বতন্ত্র আসনে বসাতে পারি। কবি এ বিশ্বাসে এতই দৃঢ়প্রতিষ্ঠ যে, সহস্র আঘাত করলেও তিনি ফুলের মুচকি হাসিতে তার উত্তর দিয়ে থাকেন, কখনও কৈফিয়ৎ দেন না।

"তারা হেসে যায়, তুমি হাস বসে মুচকি"। যে দেহে কবির কৈফিয়ৎ লেখা হয়, সেটা তার মর্ত্ত্যের দেহ,—তাঁর দেবদেহে ছায়ার কলঙ্কটুকুও নেই। সেখানে শুধু আলো, শুধু উৎসব, শুধু আনন্দ। মর্ত্ত্যের দেহে হুল ফোটে বলেই সেখানে কৈফিয়তের ঝাড়পোঁছ করতে হয়।

দিঙ্নাগ। অন্য পাঁচরকম অনুভূতি বা আনন্দ থেকে রসকে তোমরা কেমন করে এমন স্বতন্ত্রভাবে অলৌকিক করে দেখ্‌তে চাও, তা' তোমরাই বুঝতে পার। তোমাদের হেঁয়ালী-চ্ছন্দের আবরণের মধ্যে থেকে শুধু Mysticism-এর বুলি আওড়ালে ত চল্‌বে না। রস যখন অনুভূতিগ্রাহ্য, তখন রসও বস্তু। রসানুভূতির জন্য প্রথম বস্তু চাই, দ্বিতীয় কারণ চাই, তৃতীয় কর্ত্তা চাই। জ্ঞান যেমন বস্তুকে ধরে' জন্মায়, শূন্যকে ধরে' জন্মায় না,—সেইরূপ ভয়, বিস্ময়, করুণা, ঘৃণা, প্রীতি প্রভৃতি রসও বস্তুর আশ্রয়েই জন্মায়। বস্তু আশ্রয় ছাড়া জন্মাতে পারে না! যে বস্তু হতে কোন বিপদের আশঙ্কা একেবারে নেই, তাকে দেখে ভয়ের অনুভূতি হয় না। কবিতাবিশেষ লিখে বা পড়ে' যে আনন্দানুভব হয়, তাতে বর্ত্তমানের প্রত্যক্ষ এবং অতীতের বহুতর স্মৃতি ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। রসমাত্রই হয় বর্ত্তমান বস্তুর সাক্ষাৎকার, নাহয় পূর্ব্ব প্রত্যক্ষ বস্তুর সাক্ষাৎকারের স্মৃতি হতেই উৎপন্ন হয়; শূন্য হতে কিংবা কেবল মনের ভিতর হতে আপনি জন্মায় না। কবিমাত্রেরই যেমন আপনার কৃতিত্বে, এবং আপনার আত্মপ্রকাশে একটা আনন্দ আছে, তেমনি পাঠকমাত্রেরই পূর্ব্বানুভূত বস্তুকে অবলম্বন

করে তার স্মৃতিতে আনন্দ হতে পারে, কিন্তু সে আনন্দ নিতান্তই তার ব্যক্তিগত সুখদুঃখের স্মৃতি ছাড়া আর কিছুই নয়,—তার দ্বারা কবিতার উৎকর্ষাপকর্ষের বিচার করা যায় না। পদাবলীগান শুনে একজন লম্পট অজস্র অশ্রুপাত করেছিল। সকলে কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বল্লে যে, কীর্ত্তনীয়া যখন বঁধু বঁধু বলে ডাকছিল তখন আমার এক ব্যক্তির কথা মনে পড়ে' গেল, যে সেও আমাকে ঐ ভাবেই ডাকত।

নানা লোকে নানা কারণে ভিন্ন ভিন্ন কবিতা বা ভিন্ন ভিন্ন কবিকে ভালবাসে। এই সকল কারণের মধ্যে কোন্‌টা রসানুভূতির প্রমাণ, আর কোনটা অবান্তর বস্তুর উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহা দ্বারাই কোনটি কাব্য-বিচারে গ্রহণীয় আর কোনটি বা বর্জ্জনীয় তাহা মীমাংসা হবে। কেবল ভাললাগা বা না-লাগার দ্বারা এ বিচার হতে পারে না।

ভট্টনায়ক। আবার "রস" শব্দের অর্থ গুলিয়ে ফেলে ভাগাসিদ্ধি করে' ফেলবার যোগাড় করেছেন দেখছি। আপনি যে বিস্ময় ভয় প্রভৃতিকে রস নাম দিয়ে এখানে তর্ক জুড়ে দিয়েছেন, সেগুলি অনুভূতি বা Feeling মাত্র। কিন্তু আমরা যে কাব্য-রস সম্বন্ধে এখানে বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছি, সেটা হচ্ছে একটা অলৌকিক প্রকাশ। কাব্যে যে বিস্ময়, ভয়, করুণার উদ্রেক হয়, সেগুলি সাধারণ সর্ব্বজনসিদ্ধ লৌকিক বিস্ময় ভয় করুণা নয়। কারণ সেখানে সমস্ত রসের বিশ্রাম হচ্ছে আনন্দে। সেখানে ভয়ে ভীতি নেই, শোকে দুঃখ নেই, রৌদ্রে ক্রোধ নেই,—আছে কেবল তৃপ্তি, আনন্দ। বিয়োগান্ত ব্যাপারের অভিনয়ে আমাদের

চোখে জল আসে বটে, কিন্তু সেটা দুঃখের অশ্রুজল নয়, সেটা অন্তরের একটা সরস ভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। তাতে যদি লোক দুঃখই পাবে, তবে তা শোনবার জন্য লোকের এত আগ্রহ হবে কেন?

করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্
স চেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।
কিঞ্চতেষু যদা দুঃখং ন কোঽপিস্যাত্ত দুন্মুখঃ
অশ্রুপাতাদয়স্তদ্বৎ দ্রুতত্বাৎ চেতৎ সমতাঃ॥

কাজেই লৌকিক বিস্ময় ভয় শোক বল্‌তে যে জিনিসটা বোঝায়, কাব্যের বিস্ময় ভয় শোক বল্‌তে তা বোঝায় না; এটা একেবারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু—কাজেই লৌকিক বিস্ময় ভয় সম্বন্ধে যে কথা খাটে, যা নিয়ে আপনি তর্ক করচেন, তার একটিও এখানে খাট্‌বে না। এই রসানুভূতিকে যে আপনারা কেবলই ব্যক্তিগত ব্যক্তিগত বলে দোষ দিয়ে বেড়াচ্ছেন, সেটা নিতান্তই আপনাদের কপালের দোষ। কারণ রসানুভূতি জিনিসটা একেবারেই ব্যক্তিত্বশূন্য বা Impersonal, ইহার কোন বেদ্য বস্তুও নেই বা জ্ঞাতাও নেই। সেজন্যই প্রাচীনেরা একে বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্য বলে বর্ণনা করেছেন। কারণ এতে কোনও ব্যক্তিগত সাংসারিক সুখদুঃখের লেশমাত্রও নেই। কাব্যের রসবেদনা অপর কোনও ব্যক্তির স্বাভাবিক সুখদুঃখের সত্য কাহিনী নয়, কারণ সেগুলি সমস্তই এমন কাল্পনিক যে, অপরের ব্যথা মনে করে' যে তার সঙ্গে সহানুভূতি করব, তার উপায় নেই। অথচ এটা কবি

বা পাঠকের নিজের দরদও নয়,—তাই ওটা পরেরও বটে, পরেরও নয়,—আবার নিজের হয়েও নিজের নয়। সাধারণতঃ Feeling বা অনুভূতি বল্‌তে আমরা যা বুঝি, তা' সকল সময়েই বাস্তবকে অবলম্বন করে' উৎপন্ন হয়, তা' সকল সময়েই আমাদের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েচে, কিন্তু কাব্যের আলম্বন উদ্দীপন ত সেরকম নয়। এখানে সবই অবাস্তব, সবই কাল্পনিক, তারা সত্য বা বাস্তবিক ভাবে স্থূল জগতে নেই বলেই তাদের সম্বন্ধে লৌকিক প্রত্যক্ষ চল্‌তে পারে না, এবং প্রত্যক্ষ চল্‌তে পারে না বলেই তার সম্বন্ধে অনুমান বা স্মৃতিও চল্‌তে পারে না। কীর্ত্তনীয়ার গান শুনে যার নিজের পিয়ারীর কথা মনে হয়ে চোখ দিয়ে জল পড়েছিল, তার সে ব্যাপারটাকে যদি কাব্যরসের আস্বাদন বলা যায়, তাহলে যে-কোনও রকমের স্মরণ হলেই তাকে কাব্য বল্‌তে হয়, কারণ স্মৃতিমাত্রই কোন না কোনও স্মারক বস্তুর ব্যাপারের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত কোন সুখ-দুঃখের স্মৃতিই কাব্যরসের নিয়ামক বা সম্পাদক নয়। বাস্তব বলেই সেগুলিকে আমরা স্মৃতি বল্‌তে বাধ্য। কাব্যরস ত স্মৃতি নয়, কাহারও ত সেটা আপনার জীবনের ব্যক্তিসাক্ষিক ঘটনা নয়। অনেক সময় অবশ্য কাব্যরসের সঙ্গে আরও পাঁচ রকম আনন্দ জড়িত থাকে, হয় ত স্মৃতি জড়িত থাকে, হয় ত বা কোনওখানে পূর্ব্বানুভূত কোনও ঘটনার আভাস থাকে, কোনও খানে বা একটা ধর্ম্মের ভাব মিশ্রিত হয়ে থাকে। তা ত হবেই, সবরকমের ভাবই যে মানুষের মধ্যে সব সময়ে খেল্‌ছে। কিন্তু তাই বলে' সে সমস্তগুলিকেই কাব্য রসের কোঠায় ফেলা

যেতে পারে না। বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনে যদি কৃষ্ণের কথা মনে হয়ে ভক্তিতে কেউ বিভোর হয়, তাহলে সেটাকে যে আমরা কোনও রকমে কাব্যরসের আস্বাদ বলব, এবং সেই খাতিরে যে কাব্যত্ব হিসাবে পদাবলীর প্রশংসা করব, তার সম্ভাবনা মাত্রও নেই। কিন্তু সেই পদাবলী শুনে যদি অনির্দ্দিষ্টভাবে নরনারীর প্রেমের সঙ্গীতটি প্রাণে বেজে উঠে, তবে সে আনন্দকে আমরা কাব্যরসের আস্বাদ ছাড়া আর কিছুই বলতে পারিনে। কাব্যরসের বৈচিত্র্যই এই যে, এখানে সমস্ত ব্যক্তিগত বিশেষ ভাব একেবারে লয় পেয়ে নির্ব্বিশেষের মধ্যে বিশেষের আনন্দ-লীলা চলতে থাকে। বিধাতার বাস্তব জগতের অনেক উর্দ্ধে এর স্থান। কবিই সেই জগতের প্রজাপতি, এবং আনন্দপিপাসু রসিকমাত্রেই তাঁর প্রজা।

"অপারে কাব্য সংসারে কবিরেবঃ প্রজাপতি
যথাস্মৈ রোচতে বিশ্বং তথেদং পরিবর্ত্ততে।"

ভট্টনায়কের এই কথা শেষ হতেই রুদ্রট জিজ্ঞাসা করে' উঠলেন যে, আপনি যা বলছেন তাই যদি হবে, তাহলে কাব্য হোল কি না হোল, তার বিচারক হবে কে? এবং কাব্যের উদ্দেশ্যই বা কি? আকাশে বিদ্রূপের হাসি ঝিক্‌মিক করে' উঠল এবং একটা দম্‌কা বাতাসে রাশিকৃত ঝরা-পাতা আমাদের গায়ে উড়ে এসে পড়ল—সেদিনকার মত কথা বন্ধ হয়ে গেল।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্ত

বলাকা

সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোতখানি বাঁকা
আঁধারে মলিন হল,—যেন খাপে ঢাকা
বাঁকা তলোয়ার ;
দিনের ভাঁটার শেষে রাত্রির জোয়ার
এল তার ভেসে-আসা তারাফুল নিয়ে কালো জলে ;
অন্ধকার গিরিতটতলে
দেওদার তরু সারে সারে ;
মনে হল সৃষ্টি যেন স্বপ্নে চায় কথা কহিবারে,
বলিতে না পারে স্পষ্ট করি',
অব্যক্ত ধ্বনির পুঞ্জ অন্ধকারে উঠিছে গুমরি' ।

সহসা শুনিনু সেই ক্ষণে
সন্ধ্যার গগনে
শব্দের বিদ্যুৎছটা শূন্যের প্রান্তরে
মুহূর্তে ছুটিয়া গেল দূর হতে দূরে দূরান্তরে

হে হংস-বলাকা,
ঝঞ্ঝা-মদরসে মত্ত তোমাদের পাখা
রাশি রাশি আনন্দের অট্টহাসে
বিস্ময়ের জাগরণ তরঙ্গিয়া চলিল আকাশে।
ঐ পক্ষধ্বনি,
শব্দময়ী অপ্সর-রমণী,
গেল চলি স্তব্ধতার তপোভঙ্গ করি'।
উঠিল শিহরি
গিরিশ্রেণী তিমির মগন,
শিহরিল দেওদার বন।

মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্ব্বত চাহিল হ'তে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ ;
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি'
মাটির বন্ধন ফেলি'
ওই শব্দরেখা ধরে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
এ সন্ধ্যার স্বপ্ন টুটে' বেদনার ঢেউ উঠে জাগি'

সুদূরের লাগি,
হে পাখা বিবাগী!
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে,
"হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্‌খানে!"

হে হংস-বলাকা,
আজ রাত্রে মোর কাছে খুলে দিলে স্তব্ধতার ঢাকা!
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।
তৃণদল
মাটির আকাশ পরে ঝাপটিছে ডানা;
মাটির আঁধার নীচে কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।
দেখিতেছি আমি আজি
এই গিরিরাজি,
এই বন, চলিয়াছে উন্মুক্ত ডানায়
দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, অজানা হইতে অজানায়।
নক্ষত্রের পাখার স্পন্দনে
চমকিছে অন্ধকার আলোর ক্রন্দনে।

শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে
অস্পষ্ট অতীত হতে অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে।
শুনিলাম আপন অন্তরে
অসংখ্য পাখীর সাথে
দিনেরাতে
এই বাসা-ছাড়া পাখী ধায় আলো অন্ধকারে
কোন্ পার হ'তে কোন্ পারে!
ধ্বনিয়া উঠিছে শূন্য নিখিলের পাখার এ গানে—
"হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে!"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

———

ঘরে-বাইরে

বিমলার আত্মকথা

সেই সময়ে হঠাৎ সমস্ত বাংলা দেশের চিত্ত যে কেমন হয়ে গেল তা বল্‌তে পারিনে। যাটহাজার সগর-সন্তানের ছাইয়ের পরে এক মুহূর্ত্তে যেন ভাগীরথীর জল এসে স্পর্শ করলে। কত যুগযুগান্তরের ছাই, রসাতলে পড়ে ছিল, কোনো আগুনের তাপে জ্বলে না, কোনো রসের মিশালে দানা বাঁধে না; সেই ছাই হঠাৎ একেবারে কথা কয়ে উঠ্‌ল, বল্লে, "এই যে আমি!"

বইয়ে পড়েচি, গ্রীস্‌ দেশের কোন্‌ মূর্ত্তিকর দেবতার বরে আপনার মূর্ত্তির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন, কিন্তু সেই রূপের থেকে প্রাণের মধ্যে একটা ক্রমশঃ বিকাশ, একটা সাধনার যোগ আছে; কিন্তু আমাদের দেশের শ্মশানের ভস্মরাশির মধ্যে সেই রূপের ঐক্য ছিল কোথায়? সে যদি পাথরের মত আঁট শক্ত জিনিস হত, তা হলেও ত বুঝতুম—অহল্যা পাষাণীও ত একদিন মানুষ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এ যে সব ছড়ানো, এ যে সৃষ্টিকর্ত্তার মুঠোর ফাঁক দিয়ে কেবলি গলে' গলে' পড়ে, বাতাসে উড়ে উড়ে যায়, এ যে রাশ হয়ে থাকে, কিছুতে এক হয় না। অথচ সেই জিনিষ হঠাৎ একদিন আমাদের ঘরের আঙিনার কাছে এসে মেঘগর্জ্জনে বলে উঠ্‌ল, অয়মহং ভো!

তাই আমাদের সেদিন মনে হল, এ সমস্তই অলৌকিক। এই বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত কোনো সুধারসোন্মত্ত দেবতার মুকুটের থেকে মাণিকের

মত একেবারে আমাদের হাতের উপর খসে পড়ল; আমাদের অতীতের সঙ্গে আমাদের এই বর্ত্তমানের কোনো স্বাভাবিক পারম্পর্য্য নেই। এ দিনটি আমাদের সেই ওষুধের মত যা খুঁজে বের করিনি, যা কিনে আনিনি, যা কোনো চিকিৎসকের কাছ থেকে পাওয়া নয়, যা আমাদের স্বপ্নলব্ধ।

সেই জন্যে মনে হল আমাদের সব দুঃখ সব তাপ আপনি মন্ত্রে সেরে যাবে। সম্ভব অসম্ভবের কোনো সীমা কোথাও রইল না। কেবলি মনে হতে লাগ্‌ল, "এই হ'ল বলে,' হ'ল বলে' !"

আমাদের সেদিন মনে হয়েছিল ইতিহাসের কোনো বাহন নেই, পুষ্পক-রথের মত সে আপনি চলে আসে—অন্তত তার মাতলিকে কোনো মাইনে দিতে হয় না; তার খোরাকির জন্য কোনো ভাবনা নেই, কেবল ক্ষণে ক্ষণে তার মদের পেয়ালা ভরতি করে দিতে হয়—আর তার পরেই হঠাৎ একেবারে সশরীরে স্বর্গপ্রাপ্তি।

আমার স্বামী যে অবিচলিত ছিলেন তা নয়। কিন্তু সমস্ত উত্তেজনার মধ্যে তাঁকে যেন একটা বিষাদ এসে আঘাত করত। যেটা সামনে দেখা যাচ্চে তার উপর দিয়েও তিনি যেন আর-একটা কিছুকে দেখ্‌তে পেতেন। মনে আছে সন্দীপের সঙ্গে তর্কে তিনি একদিন বলেছিলেন, সৌভাগ্য হঠাৎ এসে আমাদের দরজার কাছে হাঁক দিয়ে যায়, কেবল দেখাবার জন্যে যে তাকে গ্রহণ করবার শক্তি আমাদের নেই; তাকে ঘরের মধ্যে নিমন্ত্রণ করে বসাবার কোনো আয়োজন আমরা করি নি।

সন্দীপ বল্‌লেন, দেখ নিখিল, তুমি দেবতাকে মান না সেই

জন্যেই এমন নাস্তিকের মত কথা কও! আমরা প্রত্যক্ষ দেখচি দেবী বর দিতে এসেচেন আর তুমি অবিশ্বাস করচ?

আমার স্বামী বল্‌লেন, আমি দেবতাকে মানি সেই জন্যেই অন্তরের মধ্যে নিশ্চিত জানি তাঁর পূজা আমরা জোটাতে পারলুম না। বর দেবার শক্তি দেবতার আছে কিন্তু বর নেবার শক্তি আমাদের থাকা চাই।

আমার স্বামীর এই রকমের কথায় আমার ভারি রাগ হ'ত। আমি তাঁকে বল্‌লুম, তুমি মনে কর দেশের এই উদ্দীপনা, এ কেবলমাত্র একটা নেশা। কিন্তু নেশায় কি শক্তি দেয় না?

তিনি বল্‌লেন, শক্তি দেয় কিন্তু অস্ত্র দেয় না।

আমি বল্লুম, শক্তি দেবতা দেন, সেইটেই দুর্লভ, আর অস্ত্র ত সামান্য কামারেও দিতে পারে।

স্বামী হেসে বল্লেন, কামার ত অমনি দেয় না, তাকে দাম দিতে হয়।

সন্দীপ বুক ফুলিয়ে বল্লেন, দাম দেব গো দেব!

স্বামী বল্লেন, যখন দেবে তখন আমি উৎসবের রসনচৌকি বায়না দেব।

সন্দীপ বল্লেন, তোমার বায়নার আশায় আমরা বসে নেই। আমাদের নিকড়িয়া উৎসব কড়ি দিয়ে কিন্‌তে হবে না।

বলে' তিনি তাঁর ভাঙা মোটা গলায় গান ধরলেন—

আমার নিকড়িয়া-রসের রসিক কানন ঘুরে ঘুরে
নিকড়িয়া বাঁশের বাঁশি বাজায় মোহন সুরে।

আমার দিকে চেয়ে হেসে বল্লেন, মক্ষিরাণী, গান যখন প্রাণে

আসে তখন গলা না থাকলেও যে বাধে না এইটে প্রমাণ করে দেবার জন্যেই গাইলুম। গলার জোরে গাইলে গানের জোর হাল্কা হয়ে যায়। আমাদের দেশে হঠাৎ ভরপূর গান এসে পড়েচে, এখন নিখিল বসে বসে গোড়া থেকে সারগম সাধতে থাকুক্, ইতিমধ্যে আমরা ভাঙা গলায় মাতিয়ে তুল্‌ব।

আমার ঘর বলে, তুই কোথায় যাবি,
বাইরে গিয়ে সব খোয়াবি,—
আমার প্রাণ বলে, তোর যা আছে সব
যাক্ না উড়ে পুড়ে।

আচ্ছা, না হয় আমাদের সর্ব্বনাশই হবে, তার বেশি ত নয়, রাজি আছি, তাতেই রাজি আছি।

ওগো, যায় যদি ত যাক্ না চুকে,
সব হারাব হাসিমুখে,
আমি এই চলেছি মরণসুধা
নিতে পরাণ পূরে।

আসল কথা হচ্ছে নিখিল, আমাদের মন ভুলেচে, আমরা সুসাধ্য-সাধনের গণ্ডির মধ্যে টিঁকতে পারব না, আমরা অসাধ্য সাধনের পথে বেরিয়ে পড়ব।

ওগো, আপন যারা কাছে টানে
এ রস তারা কেই বা জানে,
আমার বাঁকা পথের বাঁকা সে যে
ডাক দিয়েছে দূরে!

এবার বাঁকার টানে সোজার বোঝা
পড়ুক ভেঙে-চূরে।

মনে হল আমার স্বামীর কিছু বলবার আছে, কিন্তু তিনি বল্লেন না, আস্তে আস্তে চলে গেলেন।

সমস্ত দেশের উপর এই যে একটা প্রবল আবেগ হঠাৎ ভেঙে পড়ল, ঠিক এই জিনিষটাই আমার জীবনের মধ্যে আর-এক সুর নিয়ে ঢুকেছিল। আমার ভাগ্যদেবতার রথ আসচে, কোথা থেকে তার সেই চাকার শব্দে দিনরাত্রি আমার বুকের ভিতর গুর-গুর করচে। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হতে লাগ্‌ল একটা কি পরমাশ্চর্য্য এসে পড়ল বলে,—তার জন্যে আমি কিছুমাত্র দায়ী নই। পাপ? যে ক্ষেত্রে পাপ পুণ্য, যে ক্ষেত্রে বিচার বিবেক, যে ক্ষেত্রে দয়া মায়া, সে ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ সরে যাবার পথ হঠাৎ আপনিই যে খুলে গেছে। আমি ত এ'কে কোনো দিন কামনা করি নি, এর জন্যে প্রত্যাশা করে' বসে' থাকি নি, আমার সমস্ত জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখ, এর জন্যে আমার ত কোনো জবাবদিহি নেই! এতদিন এক-মনে আমি যার পূজা করে এলুম বর দেবার বেলা এ যে এল আর-এক দেবতা! তাই, সমস্ত দেশ যেমন জেগে উঠে সম্মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলে উঠেছে "বন্দেমাতরং"—আমার প্রাণ তেম্‌নি করে তার সমস্ত শিরা-উপশিরার কুহরে কুহরে আজ বাজিয়ে তুলেচে, বন্দে—কোন্ অজানাকে, অপূর্ব্বকে, কোন্ সকল-সৃষ্টিছাড়াকে!

দেশের সুরের সঙ্গে আমার জীবনের সুরের অদ্ভুত এই মিল! এক-একদিন অনেক রাত্রে আস্তে আস্তে আমার বিছানা থেকে

উঠে খোলা ছাদের উপর দাঁড়িয়েচি। আমাদের বাগানের পাঁচিল পেরিয়ে আধপাকা ধানের ক্ষেত, তার উত্তরে গ্রামের ঘন গাছের ফাঁকের ভিতর দিয়ে নদীর জল এবং তারো পরপারে বনের রেখা, সমস্তই যেন বিরাট রাত্রির গর্ভের মধ্যে কোন্‌-এক ভাবী সৃষ্টির ভ্রূণের মত অস্ফুট আকারে ঘুমিয়ে রয়েচে। আমি সামনের দিকে চেয়ে দেখ্‌তে পেয়েচি, আমার দেশ দাঁড়িয়ে আছে আমারি মত একটি মেয়ে। সে ছিল আপন আঙিনার কোণে—আজ তাকে হঠাৎ অজানার দিকে ডাক পড়েচে। সে কিছুই ভাববার সময় পেলে না, সে চলেচে সামনের অন্ধকারে—একটা দীপ জ্বেলে নেবারও সবুর তার সয় নি। আমি জানি এই সুপ্তরাত্রে তার বুক কেমন করে উঠ্‌চে পড়চে। আমি জানি, যে-দূর থেকে বাঁশি ডাক্‌চে ওর সমস্ত মন এমনি করে সেখানে ছুটে গেছে যে ওর মনে হচ্চে যেন পেয়েচি, যেন পৌঁছেচি, যেন এখন চোখ বুজে চল্লেও কোনো ভয় নেই। না, এ ত মাতা নয়। সন্তানকে স্তন দিতে হবে, অন্ধকারের প্রদীপ জ্বালাতে হবে, ঘরের ধূলো ঝাঁট দিতে হবে, সে কথা ত এর খেয়ালে আসে না। এ আজ অভিসারিকা। এ আমাদের বৈষ্ণব পদাবলীর দেশ। এ ঘর ছেড়েচে কাজ ভুলেচে। এর আছে কেবল অন্তহীন আবেগ—সেই আবেগে সে চলেচে মাত্র, কিন্তু পথে কি কোথায় সে কথা তার মনেও নেই। আমিও সেই অন্ধকার রাত্রির অভিসারিকা। আমি ঘরও হারিয়েচি, পথও হারিয়েচি। উপায় এবং লক্ষ্য দুইই আমার কাছে একেবারে ঝাপসা হয়ে গেছে, কেবল আছে আবেগ আর চলা। ওরে নিশাচরী, রাত যখন রাঙা হয়ে পোহাবে তখন

ফেরবার পথের যে চিহ্নও দেখ্‌তে পাবি নে! কিন্তু ফিরব কেন, মরব। যে কালো অন্ধকার বাঁশি বাজাল সে যদি আমার সর্ব্বনাশ করে, কিছুই যদি সে আমার বাকি না রাখে তবে আর আমার ভাবনা কিসের? সব যাবে, আমার কণাও থাকবে না, চিহ্নও থাক্‌বে না, কালোর মধ্যে আমার সব কালো একেবারে মিশিয়ে যাবে, তার পরে কোথায় ভালো কোথায় মন্দ, কোথায় হাসি কোথায় কান্না!

সেদিন বাংলা দেশে সময়ের কলে পূরো ইষ্টিম দেওয়া হয়েছিল। তাই যা সহজে হবার নয় তা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ধাঁধাঁ করে হয়ে উঠ্‌ছিল। বাংলা দেশের যে কোণে আমরা থাকি, এখানেও কিছুই আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না এমনি মনে হতে লাগ্‌ল। এত দিন আমাদের এদিকে বাংলা দেশের অন্য অংশের চেয়ে বেগ কিছু কম ছিল। তার প্রধান কারণ, আমার স্বামী বাইরের দিক থেকে কারো উপর কোনো চাপ দিতে চান না। তিনি বল্‌তেন, দেশের নামে ত্যাগ যারা করবে তারা সাধক, কিন্তু দেশের নামে উপদ্রব যারা করবে তারা শত্রু; তারা স্বাধীনতার গোড়া কেটে স্বাধীনতার আগায় জল দিতে চায়।

কিন্তু সন্দীপবাবু যখন এখানে এসে বসলেন তাঁর চেলারা চারদিক থেকে আনাগোনা করতে লাগল, মাঝে মাঝে হাটে বাজারে বক্তৃতাও হতে থাক্‌ল, তখন এখানেও ঢেউ উঠতে লাগল। একদল স্থানীয় যুবক সন্দীপের সঙ্গে জুটে গেল। তাদের মধ্যে এমন অনেকে ছিল যারা গ্রামের কলঙ্ক। উৎসাহের দীপ্তির দ্বারা তারাও ভিতরে বাহিরে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। এটা বেশ বোঝা গেল, দেশের হাওয়ার মধ্যে যখন আনন্দ বইতে থাকে

তখন মানুষের বিকৃতি আপনি সেরে যায়। মানুষের পক্ষে সুস্থ, সরল, সবল হওয়া বড় কঠিন যখন দেশে আনন্দ না থাকে।

এই সময়ে সকলের চোখ পড়ল আমার স্বামীর এলাকা থেকে বিলিতি নুন, বিলিতি চিনি, বিলিতি কাপড় এখনো নির্ব্বাসিত হয় নি। এমন কি, আমার স্বামীর আম্‌লারা পর্য্যন্ত এই নিয়ে চঞ্চল এবং লজ্জিত হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। অথচ কিছুদিন পূর্ব্বে আমার স্বামী যখন এখানে স্বদেশী জিনিষের আমদানি করেছিলেন তখন এখানকার ছেলে বুড়ো সকলেই তা নিয়ে মনে মনে এবং প্রকাশ্যে হাসাহাসি করেছিল। দিশি জিনিষের সঙ্গে যখন আমাদের স্পর্দ্ধার যোগ ছিল না তখন তাকে আমরা মনে প্রাণে অবজ্ঞা করেচি। এখনো আমার স্বামী তাঁর সেই দিশি ছুরিতে দিশি পেন্সিল কাটেন, খাগড়ার কলমে লেখেন, পিতলের ঘটিতে জল খান এবং সন্ধ্যার সময়ে শামাদানে দিশি বাতি জ্বালিয়ে লেখাপড়া করেন—কিন্তু তাঁর এই অত্যন্ত সাদা ফিকে রঙের স্বদেশীতে আমরা মনের মধ্যে কোনো রস পাইনি। বরঞ্চ তখন তাঁর বসবার ঘরে আস্‌বাবের দৈন্যে আমি বরাবর লজ্জা বোধ করে এসেছি, বিশেষতঃ বাড়িতে যখন ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা আর কোনো সাহেব-সুবোর সমাগম হত। আমার স্বামী হেসে বল্‌তেন, এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে তুমি অত বিচলিত হচ্চ কেন?

আমি বল্‌তুম, ওরা যে আমাদের অসভ্য অজ্‌বুগ মনে করে যাবে।

তিনি বল্‌তেন, তা যখন মনে করবে তখন আমিও এই কথা মনে করব ওদের সভ্যতা চাম্‌ড়ার উপরকার সাদা পালিশ পর্য্যন্ত, বিশ্বমানুষের ভিতরকার লাল রক্তধারা পর্য্যন্ত পৌঁছয় নি।

. ওঁর ডেস্কে একটি সামান্য পিতলের ঘটিকে উনি ফুলদানি করে ব্যবহার করতেন। কতদিন কোনো সাহেব আস্‌বার খবর পেলে আমি লুকিয়ে সেটিকে সরিয়ে বিলিতি রঙীন কাঁচের ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে রেখেচি।

আমার স্বামী বল্‌তেন, দেখ বিমল, ফুলগুলি যেমন আত্মবিস্মৃত আমার এই পিতলের ঘটিটিও তেমনি। কিন্তু তোমার ঐ বিলিতি ফুলদানি অত্যন্ত বেশি করে জানায় যে ও ফুলদানি, ওতে গাছের ফুল না রেখে পশমের ফুল রাখা উচিত।

তখন এ সম্বন্ধে তাঁর একমাত্র উৎসাহদাতা ছিলেন, মেজরাণী। তিনি একেবারে হাঁপিয়ে এসে বল্‌তেন, ঠাকুরপো, শুনেচি আজকাল দিশি সাবান উঠেচে নাকি—আমাদের ত ভাই সাবান মাখার দিন উঠেই গেচে, তবে ওতে যদি চর্ব্বি না থাকে তাহলে মাখ্‌তে পারি। তোমাদের বাড়িতে এসে অবধি ঐ এক অভ্যেস হয়ে গেচে। অনেক দিন ত ছেড়েই দিয়েচি তবু সাবান না মেখে আজো মনে হয় যেন স্নানটা ঠিকমত হল না।

এতেই আমার স্বামী ভারি খুসি। বাক্স বাক্স দিশি সাবান আস্‌তে লাগ্‌ল। সে কি সাবান, না সাজিমাটির ড্যালা! আমি বুঝি জানিনে? স্বামীর আমলে মেজরাণী যে বিলিতি সাবান মাখ্‌তেন আজও সমানে তাই চল্‌চে, একদিনও কামাই নেই; ঐ দিশি সাবান দিয়ে তাঁর কাপড়কাচা চল্‌তে লাগ্‌ল।

আর একদিন এসে বল্লেন, ভাই ঠাকুরপো, দিশি কলম নাকি উঠেচে, সে ত আমার চাই। মাথা খাও আমাকে এক বাণ্ডিল—

ঠাকুরপো মহা উৎসাহিত। কলমের নাম ধরে যত রকমের

দাঁতনের কাঠি তখন বেরিয়েছিল সব মেজরাণীর ঘরে বোঝাই হতে লাগ্‌ল। ওতে ওঁর কোনো অসুবিধে ছিল না, কেননা লেখাপড়ার সম্পর্ক ওঁর ছিল না বল্লেই হয়। ধোবার বাড়ির হিসেব সজ্‌নের ডাঁটা দিয়ে লেখাও চলে। তাও দেখেচি লেখবার বাক্সের মধ্যে ওঁর সেই পুরোনো কালের হাতির দাঁতের কলমটি আছে, যখন কালে ভদ্রে লেখার সখ যায় তখন ঠিক সেইটেরই উপরে হাত পড়ে।

আসল কথা, আমি যে আমার স্বামীর খেয়ালে যোগ দিইনে সেইটের কেবল জবাব দেবার জন্যেই উনি এই কাণ্ডটি করতেন। অথচ আমার স্বামীকে ওঁর এই ছলনার কথা বল্‌বার জো ছিল না। বল্‌তে গেলেই তিনি এমন মুখ করে চুপ করে থাক্‌তেন যে বুঝতুম যে, উল্টো ফল হল। এ সব মানুষকে ঠকানোর হাত থেকে বাঁচাতে গেলেই ঠক্‌তে হয়।

মেজরাণী সেলাই ভালোবাসেন; একদিন যখন সেলাই করচেন তখন আমি স্পষ্টই তাঁকে বল্লুম, এ তোমার কি কাণ্ড! এদিকে তোমার ঠাকুরপোর সাম্‌নে দিশি কাঁচির নাম করতেই তোমার জিব দিয়ে জল পড়ে ওদিকে সেলাই করবার বেলা বিলিতি কাঁচি ছাড়া যে তোমার এক দণ্ড চলে না!

মেজরাণী বল্লেন, তাতে দোষ হয়েচে কি, কত খুসি হয় বল্‌দেখি? ছোটবেলা থেকে ওর সঙ্গে যে একসঙ্গে বেড়েচি, তোদের মত ওকে আমি হাসিমুখে কষ্ট দিতে পারিনে। পুরুষ মানুষ, ওর আর ত কোনো নেশা নেই—এক, এই দিশি দোকান নিয়ে খেলা, আর, ওর এক সর্ব্বনেশে নেশা তুই—এইখেনেই ও মজ্‌বে!

আমি বল্লুম, যাই বল, পেটে এক মুখে এক ভালো নয়।

মেজরাণী হেসে উঠ্‌লেন, বল্লেন, ওলো সরলা, তুই যে দেখি বড্ড বেশি সিধে, একেবারে গুরুমশায়ের বেত কাঠির মত— মেয়েমানুষ অত সোজা নয়—সে নরম বলেই অমন একটু-আধটু নুয়ে থাকে, তাতে দোষ নেই।

মেজরাণীর সেই কথাটি ভুল্‌ব না, "ওর এক সর্ব্বনেশে নেশা তুই, এইখেনেই ও মজ্‌বে!"

আজ আমার কেবলি মনে হয়, পুরুষমানুষের একটা নেশা চাই কিন্তু সে নেশা যেন মেয়েমানুষ না হয়।

আমাদের শুকসায়রের হাট এ জেলার মধ্যে মস্ত বড় হাট। এখানে জোলার এধারে নিত্য বাজার বসে, আর জোলার ওধারে প্রতি-শনিবারে হাট লাগে। বর্ষার পর থেকেই এই হাট বেশি করে জমে। তখন নদীর সঙ্গে জোলার যোগ হয়ে যাতায়াতের পথ সহজ হয়ে যায়। তখন সুতো এবং আগামী শীতের জন্যে গরম কাপড়ের আমদানি খুব বেড়ে ওঠে।

সেই সময়টাতে দিশি কাপড় আর দিশি নুন-চিনির বিরোধ নিয়ে বাংলা দেশের হাটে হাটে তুমুল গণ্ডগোল বেধেছে। আমাদের সকলেরই খুব একটা জেদ চড়ে গেচে। আমাকে সন্দীপ এসে বল্লেন এত বড় হাট বাজার আমাদের হাতে আছে এটাকে আগাগোড়া স্বদেশী করে তুলতে হবে, এই এলাকা থেকে বিলিতি অলক্ষ্মীকে কুলোর হাওয়া দিয়ে বিদায় করা চাই।

আমি কোমর বেঁধে বল্লুম, চাই বইকি।

সন্দীপ বল্লেন, এ নিয়ে নিখিলের সঙ্গে আমার অনেক কথা-

কাটাকাটি হয়ে গেছে, কিছুতে পেরে উঠ্‌লুম না। ও বলে, বক্তৃতা পর্য্যন্ত চল্‌বে কিন্তু জবরদস্তি চল্‌বে না।

আমি একটু অহঙ্কার করেই বল্লুম, আচ্ছা, সে আমি দেখ্‌চি।

আমি জানি আমার উপর আমার স্বামীর ভালোবাসা কত গভীর। সেদিন আমার বুদ্ধি যদি স্থির থাক্‌ত তাহলে আমার পোড়া মুখ নিয়ে এমন দিনে সেই ভালোবাসার উপর দাবী করতে যেতে আমার লজ্জায় মাথা কাটা যেত। কিন্তু সন্দীপকে যে দেখাতে হবে আমার শক্তি কত! তাঁর কাছে আমি যে শক্তিরূপিণী! তিনি তাঁর আশ্চর্য্য ব্যাখ্যার দ্বারা বার-বার আমাকে এই কথাই বুঝিয়েচেন যে, পরমাশক্তি এক-একজন বিশেষ মানুষের কাছে এক-একজন বিশেষ মানুষেরই রূপে দেখা দেন;—তিনি বলেন, আমরা বৈষ্ণবতত্ত্বের হ্লাদিনীশক্তিকে প্রত্যক্ষ দেখবার জন্যেই এত ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছি, যখন কোথাও দেখ্‌তে পাই তখনি স্পষ্ট বুঝতে পারি আমার অন্তরের মধ্যে যে ত্রিভঙ্গ বাঁশি বাজাচ্ছেন তাঁর বাঁশির অর্থটা কি। বল্‌তে বল্‌তে এক একদিন গান ধরতেন,—

যখন দেখা দাওনি রাধা তখন বেজেছিল বাঁশি।
এখন চোখে চোখে চেয়ে সুর যে আমার গেল ভাসি'!
তখন নানা তানের ছলে
ডাক ফিরেছে জলে স্থলে,
এখন আমার সকল কাঁদা রাধার রূপে উঠ্‌ল হাসি'।

এই সব কেবলি শুন্‌তে শুন্‌তে আমি ভুলে গিয়েছিলুম যে, আমি বিমলা। আমি শক্তিতত্ত্ব, আমি রসতত্ত্ব, আমার কোনো বন্ধন নেই, আমার মধ্যে সমস্তই সম্ভব, আমি যা-কিছুকে স্পর্শ করচি

তাকেই নূতন করে সৃষ্টি করচি;—নূতন করে সৃষ্টি করেছি আমার এই জগৎকে, আমার হৃদয়ের পরশমণি ছোঁয়াবার আগে শরতের আকাশে এত সোনা ছিল না, আর মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমি নূতন করচি ঐ বীরকে, ঐ সাধককে, ঐ আমার ভক্তকে, ঐ জ্ঞানে উজ্জ্বল, তেজে উদ্দীপ্ত, ভাবের রসে অভিষিক্ত অপূর্ব্ব প্রতিভাকে;—আমি যে স্পষ্ট অনুভব করচি, ওর মধ্যে প্রতিক্ষণে আমি নূতন প্রাণ ঢেলে দিচ্চি, ও আমার নিজেরই সৃষ্টি। সেদিন অনেক অনুরোধ করে সন্দীপ তাঁর একটি বিশেষ ভক্ত বালক অমূল্যচরণকে আমার কাছে এনেছিলেন, একদণ্ড পরেই আমি দেখ্‌তে পেলুম, তার চোখের তারার মধ্যে একটা নূতন দীপ্তি জ্বলে উঠ্‌ল, বুঝলুম সে আদ্যাশক্তিকে দেখ্‌তে পেয়েচে, বুঝতে পারলুম ওর রক্তের মধ্যে আমারি সৃষ্টির কাজ আরম্ভ হয়েচে। পরদিন সন্দীপ আমাকে এসে বল্লেন, এ কি মন্ত্র তোমার, ও বালক ত আর সেই বালক নেই, ওর পল্‌তেয় এক মুহূর্ত্তে শিখা ধরে গেছে। তোমার এ আগুনকে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখ্‌বে কে? একে একে সবাই আস্‌বে। একটি একটি করে প্রদীপ জ্বল্‌তে জ্বল্‌তে একদিন যে দেশে দেয়ালির উৎসব লাগ্‌বে!

নিজের এই মহিমার নেশায় মাতাল হয়েই আমি মনে মনে ঠিক করেছিলুম, ভক্তকে আমি বরদান করব। আর এও আমার মনে ছিল আমি যা চাইব তাকে কেউ ঠেকাতে পারবে না।

সেদিন সন্দীপের কাছ থেকে ফিরে এসেই চুল খুলে ফেলে আমি নতুন করে চুল বাঁধলুম। ঘাড়ের থেকে এঁটে চুলগুলকে মাথার উপরের দিকে টেনে তুলে আমার মেম আমাকে এক রকম

খোঁপা বাঁধতে শিখিয়েছিলেন আমার স্বামী আমার সেই খোঁপা খুব ভালোবাস্‌তেন—তিনি বল্‌তেন, ঘাড় জিনিষটা যে কত সুন্দর হতে পারে তা বিধাতা কালিদাসের কাছে প্রকাশ না করে' আমার মত অকবির কাছে খুলে দেখালেন,—কবি হয়ত বল্‌তেন, পদ্মের মৃণাল, কিন্তু আমার কাছে মনে হয়, যেন মশাল, তার ঊর্দ্ধে তোমার কালো খোঁপার কালো শিখা উপরের দিকে জ্বলে উঠেচে। এই বলে তিনি আমার সেই চুল তোলা ঘাড়ের উপর—হায় রে সে কথা আর কেন ?

তার পরে তাঁকে ডেকে পাঠালুম। আগে এমন ছোটখাটো সত্য মিথ্যা নানা ছুতোয় তাঁর ডাক পড়ত—কিছুদিন থেকে ডাকবার সব উপলক্ষ্যই বন্ধ হয়ে গেছে; বানাবার শক্তিও নেই।

নিখিলেশের কথা

পঞ্চুর স্ত্রী যক্ষ্মায় ভুগে ভুগে মরেচে। পঞ্চুকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। সমাজ হিসেব করে বলেচে খরচ লাগ্‌বে সাড়ে তেইশ টাকা।

আমি রাগ করে বল্লুম, নাই বা করলি প্রায়শ্চিত্ত, তোর ভয় কিসের ?

সে ক্লান্ত গোরুর মত তার ধৈর্য্যভারপূর্ণ চোখ তুলে বল্লে, মেয়েটি আছে বিয়ে দিতে হবে। আর, বউয়েরও ত গতি করা চাই।

আমি বল্লুম, পাপই যদি হয়ে থাকে এতদিন ধরে তার প্রায়শ্চিত্ত ত কম হয় নি!

সে বল্লে, আজ্ঞে কম কি! ডাক্তার-খরচায় জমি-জমা কিছু

বিক্রী আর বাকি সমস্ত বন্ধক পড়ে গেচে। কিন্তু দান-দক্ষিণে ব্রাহ্মণ-ভোজন না হলে ত খালাস পাইনে।

তর্ক করে' কি হবে? মনে মনে বল্লুম, যে-ব্রাহ্মণ ভোজন করে, তাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কবে হবে?

একে ত পঞ্চু বরাবরই উপবাসের ধার ঘেঁসে কাটিয়েচে, তার উপরে এই স্ত্রীর চিকিৎসা এবং সৎকার উপলক্ষে সে একেবারে অগাধ জলে পড়ল। এই সময়ে কোনো রকম করে একটা সান্ত্বনা পাবার জন্যে সে এক সন্ন্যাসী সাধুর চ্যালাগিরি সুরু করলে। তাতে হল এই, তার ছেলেমেয়েরা যে খেতে পাচ্চে না সেইটে ভুলে থাকবার একটা নেশায় সে ডুবে রইল। বুঝে নিলে সংসারটা কিছুই না—সুখ যেমন নেই, তেমনি দুঃখটাও স্বপ্নমাত্র। অবশেষে একদিন রাত্রে ছেলে মেয়ে চারিটিকে ভাঙা ঘরে ফেলে রেখে সে বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

এ সব কথা আমি কিছুই জানতুম না। আমার মনটার মধ্যে তখন সুরাসুরের মন্থন চলছিল। মাষ্টার মশায় যে পঞ্চুর ছেলে মেয়েগুলিকে নিজের বাসায় রেখে মানুষ করচেন সে কথাও আমাকে জানান নি। তখন তাঁর নিজের ছেলে তার বৌকে নিয়ে রেঙ্গুন চলে গেছে; ঘরে তিনি একলা, তাঁর আবার সমস্ত দিন ইস্কুল।

এমনি করে একমাস যখন কেটে গেছে তখন একদিন সকাল বেলায় পঞ্চু এসে উপস্থিত। তার বৈরাগ্যের ঘোর ভেঙেচে। যখন তার বড় ছেলে মেয়ে দুটি তার কোলের কাছে মাটির উপর বসে তাকে জিজ্ঞাসা করলে, বাবা তুই কোথায় গিয়েছিলি, সব-ছোট ছেলেটি তার কোল দখল করে বসলে, আর সেজ মেয়েটি পিঠের

উপর পড়ে তার গলা জড়িয়ে ধরলে, তখন কান্নার পর কান্না, কিছুতে তার কান্না থাম্‌তে চায় না। বল্‌তে লাগ্‌ল, মাষ্টার বাবু, এগুলোকে দুবেলা পেট ভরে খাওয়াব সে শক্তিও নেই, আবার এদের ফেলে রেখে দৌড় মারব সে মুক্তিও নেই, এমন করে বেঁধে মার কেন? আমি কি পাপ করেছিলুম?

এদিকে যে ব্যবসাটুকু ধরে কোনোমতে তার দিন চলছিল তার সূত্র ছিন্ন হয়ে গেছে। প্রথম দিনকতক ঐ যে মাষ্টার-মশায়ের ওখানে সে বাসা পেলে, সেইটেকেই সে টেনে চল্‌তে লাগল, তার নিজের বাড়িতে নড়বার নাম করতেও চায় না। শেষকালে মাষ্টার মশায় তাকে বল্লেন, পঞ্চু, তুমি বাড়িতে যাও নইলে তোমার ঘর দুয়ারগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আমি তোমাকে কিছু টাকা ধার দিচ্চি, তুমি কাপড়ের ব্যবসা করে অল্প অল্প করে শোধ দিয়ো।

প্রথমটা পঞ্চুর মনে একটু খেদ হল—মনে করলে দয়াধর্ম্ম বলে একটা জিনিষ জগতে নেই। তারপরে টাকাটা নেবার বেলায় মাষ্টার মশায় যখন হ্যাণ্ডনোট লিখিয়ে নিলেন তখন ভাবলে, শোধ ত করতে হবে এমন উপকারের মূল্য কি! মাষ্টারমশায় কাউকে বাইরের দিকে দান করে ভিতরের দিকে ঋণী করতে নিতান্ত নারাজ—তিনি বলেন, মনের ইজ্জৎ চলে গেলে মানুষের জাত মারা হয়।

হ্যাণ্ডনোটে টাকা নেওয়ার পর পঞ্চু মাষ্টার মশায়কে খুব বড় করে প্রণাম করতে আর পারলে না, পায়ের ধুলোটা বাদ পড়ল। মাষ্টার মশায় মনে মনে হাসলেন, তিনি প্রণামটা খাটো করতে

পারলেই বাঁচেন। তিনি বলেন, আমি শ্রদ্ধা করব আমাকে শ্রদ্ধা করবে মানুষের সঙ্গে এই সম্বন্ধই আমার খাঁটি, ভক্তি আমার পাওনার অতিরিক্ত।

পঞ্চু কিছু ধুতি সাড়ি কিছু শীতের কাপড় কিনে আনিয়ে চাষীদের ঘরে ঘরে বেচে বেড়াতে লাগ্‌ল। নগদ দাম পেত না বটে, তেমনি কিছু বা ধান কিছু বা পাট কিছু বা অন্য ফসল যা হাতে হাতে আদায় করে আন্‌ত সেটা দামে কাটা যেত না। দুমাসের মধ্যেই সে মাষ্টার মশায়ের এককিস্তি সুদ এবং আসলের কিছু শোধ করে দিলে এবং এই ঋণশোধের অংশ প্রণামের থেকে কাটান্ পড়ল। পঞ্চু নিশ্চয় মনে করতে লাগ্‌ল, মাষ্টার মশায়কে সে যে একদিন গুরু বলে ঠাউরেছিল, ভুল করেছিল, লোকটার কাঞ্চনের প্রতি দৃষ্টি আছে।

এই রকমে পঞ্চুর দিন চলে যাচ্ছিল। এমন সময় স্বদেশীর বান খুব প্রবল হয়ে এসে পড়ল। আমাদের এবং আশপাশের গ্রাম থেকে যে সব ছেলে কলকাতার স্কুলে কলেজে পড়ত তারা ছুটির সময় বাড়ি ফিরে এল, তাদের অনেকে স্কুল কলেজ ছেড়ে দিলে; তারা সবাই সন্দীপকে দলপতি করে স্বদেশী প্রচারে মেতে উঠল। এদের অনেকেই আমার অবৈতনিক স্কুল থেকে এণ্ট্রেন্স পাস করে গেছে, অনেককেই আমি কলকাতায় পড়বার বৃত্তি দিয়েচি। এরা একদিন দল বেঁধে আমার কাছে এসে উপস্থিত। বল্লে আমাদের শুকসায়রের হাট থেকে বিলিতি সুতো র‍্যাপার প্রভৃতি একেবারে উঠিয়ে দিতে হবে।

আমি বল্লুম, সে আমি পারব না।

তারা বল্লে, কেন, আপনার লোকসান হবে?

বুঝলুম, কথাটা আমাকে একটু অপমান করে বলবার জন্যে। আমি বল্‌তে যাচ্ছিলুম, আমার লোকসান নয়, গরীবের লোকসান।

মাষ্টার মশায় ছিলেন, তিনি বলে উঠ্‌লেন, হাঁ, ওঁর লোকসান বই কি, সে লোকসান ত তোমাদের নয়!

তারা বল্লে, দেশের জন্যে—

মাষ্টার মশায় তাদের কথা চাপা দিয়ে বল্লেন, দেশ বল্‌তে মাটি ত নয়, এই সমস্ত মানুষইত। তা তোমরা কোনোদিন একবার চোখের কোণে এদের দিকে তাকিয়ে দেখেচ? আর আজ হঠাৎ মাঝখানে পড়ে এরা কি নুন খাবে আর কি কাপড় পরবে তাই নিয়ে অত্যাচার করতে এসেচ, এরা সইবে কেন, আর এদের সইতে দেব কেন?

তারা বল্লে, আমরা নিজেও ত দিশি নুন, দিশি চিনি, দিশি কাপড় ধরেচি!

তিনি বল্লেন, তোমাদের মনে রাগ হয়েচে, জেদ হয়েচে, সেই নেশায় তোমার যা করচ খুসি হয়ে করচ—তোমাদের পয়সা আছে, তোমরা দুপয়সা বেশি দিয়ে দিশি জিনিস কিন্‌চ, তোমাদের সেই খুসিতে ওরা ত বাধা দিচ্চে না! কিন্তু ওদের তোমরা যা করাতে চাচ্চ সেটা কেবল জোরের উপরে। ওরা প্রতিদিনই মরণ-বাঁচনের টানাটানিতে পড়ে ওদের শেষ-নিশ্বাস পর্য্যন্ত লড়চে কেবলমাত্র কোনোমতে টিঁকে থাকবার জন্যে—ওদের কাছে দুটো পয়সার দাম কত সে তোমরা কল্পনাও করতে পার না,—ওদের সঙ্গে তোমাদের তুলনা কোথায়? জীবনের মহলে বরাবর তোমরা এক-

কোঠায় ওরা আর-এক কোঠায় কাটিয়ে এসেচে—আর আজ তোমাদের দায় ওদের কাঁধের উপর চাপাতে চাও, তোমাদের রাগের ঝাল ওদের দিয়ে মিটিয়ে নেবে? আমি ত এ'কে কাপুরুষতা মনে করি। তোমরা নিজে যতদূর পর্য্যন্ত পার কর, মরণ পর্য্যন্ত, আমি বুড়োমানুষ, নেতা বলে তোমাদের নমস্কার করে পিছনে পিছনে চল্‌তে রাজি আছি, কিন্তু ঐ গরীবদের স্বাধীনতা দলন করে তোমরা যখন স্বাধীনতার জয়পতাকা আস্ফালন করে বেড়াবে তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াব, তাতে যদি মরতে হয় সেও স্বীকার!

তারা প্রায় সকলেই মাষ্টার মশায়ের ছাত্র, স্পষ্ট কোনো কটু কথা বল্‌তে পারল না, কিন্তু রাগে তাদের রক্ত গরম হয়ে বুকের মধ্যে ফুটতে লাগল। আমার দিকে চেয়ে বল্লে, দেখুন, সমস্ত দেশ আজ যে ব্রত গ্রহণ করেচে কেবল আপনি তাতে বাধা দেবেন?

আমি বল্লুম, আমি বাধা দিতে পারি এমন সাধ্য আমার কি আছে! আমি বরং প্রাণপণে তার আনুকূল্য করব।

এম্ এ ক্লাসের ছাত্রটি বাঁকা হাসি হেসে বল্লে, কি আনুকূল্যটা করচেন?

আমি বল্লুম, দিশি মিল্ থেকে দিশি কাপড় দিশি সুতো আনিয়ে আমাদের হাটে রাখিয়েচি—এমন কি, অন্য এলাকার হাটেও আমার সুতো পাঠাই—

সে ছাত্রটি বলে উঠ্‌ল, কিন্তু আমরা আপনার হাটে গিয়ে দেখে এসেচি, আপনার দিশি সুতো কেউ কিনচে না।

আমি বল্লুম, সে আমার দোষ নয়, আমার হাটের দোষ নয়; তার একমাত্র কারণ, সমস্ত দেশ তোমাদের ব্রত নেয় নি।

মাষ্টার মশায় বল্লেন, শুধু তাই নয়, যারা ব্রত নিয়েচে তারা বিব্রত করবারই ব্রত নিয়েচে। তোমরা চাও, যারা ব্রত নেয়নি তারাই ঐ সুতো কিনে', যারা ব্রত নেয়নি এমন জোলাকে দিয়ে, কাপড় বোনাবে, আর যারা ব্রত নেয়নি তাদের দিয়ে এই কাপড় কেনাবে। কি উপায়ে? না তোমাদের গায়ের জোরে, আর জমিদারের পেয়াদার তাড়ায়! অর্থাৎ ব্রত তোমাদের, কিন্তু উপবাস করবে ওরা, আর উপবাসের পারণ করবে তোমরা!

সায়ান্স ক্লাসের ছাত্রটি বল্লে, আচ্ছা বেশ উপবাসের কোন্ অংশটা আপনারাই নিয়েচেন শুনি!

মাষ্টার মশায় বল্লে, শুন্‌বে? দিশি মিল্ থেকে নিখিলের সেই সুতো নিখিলকেই কিন্‌তে হচ্চে, নিখিলই সেই সুতোয় জোলাদের দিয়ে কাপড় বোনাচ্চে, তাঁতের ইস্কুল খুলে বসেচে, তারপরে বাবাজির যে রকম ব্যবসা-বুদ্ধি তাতে সেই সুতোয় গামছা যখন তৈরী হবে তখন তার দাম দাঁড়াবে কিঙখাবের টুকরোর মত, সুতরাং সে গামছা নিজেই কিনে উনি ওঁর বসবার ঘরের পরদা খাটাবেন, সে পর্দ্দায় ওঁর ঘরের আব্রু থাকবে না; ততদিনে তোমাদের যদি ব্রত সাঙ্গ হয় তখন দিশি কারুকার্য্যের নমুনা দেখে তোমরাই সব চেয়ে চেঁচিয়ে হাসবে; আর, কোথাও যদি সেই রঙীন গামছার অর্ডার এবং আদর মেলে সে ইংরেজের কাছে।

এতদিন ওঁর কাছে আছি, মাষ্টার মশায়ের এমনতর শান্তিভঙ্গ

হতে আমি কোনোদিন দেখি নি। আমি বেশ বুঝতে পারলুম, কিছুদিন থেকে ওঁর হৃদয়ের মধ্যে একটা বেদনা নিঃশব্দে জমে আস্‌চে—সে কেবল আমাকে ভালোবাসেন বলে। সেই বেদনাতেই ওঁর ধৈর্য্যের বাঁধ ভিতরে ভিতরে ক্ষয় করে দিয়েচে।

মেডিকাল-কলেজের ছাত্র বলে উঠ্‌ল, আপনারা বয়সে বড়, আপনাদের সঙ্গে তর্ক আমরা করব না। তা হলে এক কথায় বলুন, আপনাদের হাট থেকে বিলিতি মাল আপনারা সরাবেন না ?

আমি বল্লুম, না সরাব না, কারণ, সে মাল আমার নয়।

এম্ এ ক্লাসের ছাত্রটি ঈষৎ হেসে বল্লে, কারণ, তাতে আপনার লোকসান আছে ?

মাষ্টার মশায় বল্লেন, হাঁ তাতে ওঁর লোকসান আছে সুতরাং সে উনিই বুঝবেন।

তখন ছাত্রেরা সকলে উচ্চৈস্বরে "বন্দেমাতরং" বলে চীৎকার করে বেরিয়ে গেল।

এর কিছুদিন পরেই মাষ্টার মশায় পঞ্চুকে আমার কাছে নিয়ে এসে উপস্থিত। ব্যাপার কি ?

ওদের জমিদার হরিশকুণ্ডু পঞ্চুকে একশো টাকা জরিমানা করেচে।

কেন, ওর অপরাধ কি ?

ও বিলিতি কাপড় বেচেচে। ও জমিদারকে গিয়ে হাতে পায়ে ধরে বল্লে, পরের কাছে ধার-করা টাকায় কাপড় ক'খানা কিনেচে এইগুলো বিক্রী হয়ে গেলেই ও এমন কাজ আর কখনো

করবে না। জমিদার বল্লে, সে হচ্চে না, আমার সাম্‌নে কাপড়গুলো পুড়িয়ে ফেল্ তবে ছাড়া পাবি। ও থাক্‌তে না পেরে হঠাৎ বলে ফেল্লে, আমার ত সে সামর্থ্য নেই, আমি গরীব; আপনার যথেষ্ট আছে, আপনি দাম দিয়ে কিনে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলুন। শুনে জমিদার লাল হয়ে উঠে বল্লে, হারামজাদা, কথা কইতে শিখেচ বটে,—লাগাও জুতি! এই বলে এক চোট অপমান ত হয়েই গেল, তার পরে একশো টাকা জরিমানা! এরাই সন্দীপের পিছনে পিছনে চীৎকার করে বেড়ায় বন্দেমাতরং! এরা দেশের সেবক!

কাপড়ের কি হল?

পুড়িয়ে ফেলেচে।

সেখানে আর কে ছিল?

লোকের সংখ্যা ছিল না, তারা চীৎকার করতে লাগ্‌ল বন্দে-মাতরং। সেখানে সন্দীপ ছিলেন তিনি এক মুঠো ছাই তুলে নিয়ে বল্লেন, ভাই সব, বিলিতি ব্যবসার অন্ত্যেষ্টি সৎকারে তোমাদের গ্রামে এই প্রথম চিতার আগুন জ্বলল—এই ছাই পবিত্র—এই ছাই গায়ে মেখে ম্যানচেষ্টারের জাল কেটে ফেলে নাগা সন্ন্যাসী হয়ে তোমাদের সাধনা করতে বেরতে হবে!

আমি পঞ্চুকে বল্লুম, পঞ্চু তোমাকে ফৌজদারী করতে হবে।

পঞ্চু বল্লে, কেউ সাক্ষি দেবে না।

কেউ সাক্ষি দেবে না? সন্দীপ! সন্দীপ!

সন্দীপ তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্লে, কি, ব্যাপারটা কি?

এই লোকটার কাপড়ের বস্তা ওর জমিদার তোমার সাম্‌নে পুড়িয়েচে তুমি সাক্ষি দেবে না?

সন্দীপ হেসে বল্লে, দেব বই কি। কিন্তু আমি যে ওর জমিদারের পক্ষে সাক্ষী!

আমি বল্লুম, সাক্ষি আবার জমিদারের পক্ষে কি! সাক্ষি ত সত্যের পক্ষে!

সন্দীপ বল্লে, যেটা ঘটেচে সেটাই বুঝি একমাত্র সত্য?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, অন্য সত্যটা কি?

সন্দীপ বল্লে, যেটা ঘটা দরকার। যে সত্যকে আমাদের গড়ে তুল্‌তে হবে সেই সত্যের জন্যে অনেক মিথ্যে চাই, যেমন মায়া দিয়ে এই জগৎ গড়া হচ্চে। পৃথিবীতে যারা সৃষ্টি করতে এসেচে তারা সত্যকে মানে না, তারা সত্যকে বানায়।

অতএব—

অতএব তোমরা যাকে মিথ্যে সাক্ষি বল আমি সেই মিথ্যে সাক্ষি দেব। যারা রাজ্য বিস্তার করেচে, সাম্রাজ্য গড়েচে, সমাজ বেঁধেচে, ধর্ম্মসম্প্রদায় স্থাপন করেচে, তারাই তোমাদের বাঁধা সত্যের আদালতে বুক ফুলিয়ে মিথ্যে সাক্ষি দিয়ে এসেচে। যারা শাসন করবে তারা মিথ্যেকে ডরায় না, যারা শাসন মানবে তাদের জন্যেই সত্যের লোহার শিকল। তোমরা কি ইতিহাস পড়নি? তোমরা কি জান না, পৃথিবীর বড় বড় রান্নাঘরে যেখানে রাষ্ট্রযজ্ঞে পলিটিক্সের খিচুড়ি তৈরি হচ্চে সেখানে মস্‌লাগুলো সব মিথ্যে!

জগতে অনেক খিচুড়ি পাকানো হয়েচে এখন—

না গো, তোমরা খিচুড়ি পাকাবে কেন, তোমাদের টুঁটি চেপে ধরে খিচুড়ি গেলাবে। বঙ্গবিভাগ করবে, বল্‌বে তোমাদের

সুবিধের জন্যেই; শিক্ষার দরজা এঁটে বন্ধ করতে থাক্‌বে, বল্‌বে তোমাদেরই আদর্শ অত্যুচ্চ করে তোলবার সদভিপ্রায়ে; তোমরা সাধু হয়ে অশ্রুপাত করতে থাক্‌বে আর আমরা অসাধু হয়ে মিথ্যের দুর্গ শক্ত করে বানাব। তোমাদের অশ্রু টিঁক্‌বে না কিন্তু আমাদের দুর্গ টিঁক্‌বে।

মাষ্টার মশায় আমাকে বল্লেন, এসব তর্ক করবার কথা নয় নিখিল। আমাদের ভিতরেই এবং সকলের মূলেই যে একটি বিরাট সত্য আছে একথা যে-লোক নিজের ভিতর থেকেই উপলব্ধি না করতে পারে সে লোক কেমন করে' বিশ্বাস করবে যে সেই অন্তরতম সত্যকেই সমস্ত আবরণ মোচন করে' প্রকাশ করাই মানুষের চরম লক্ষ্য, বাইরের জিনিষকে স্তূপাকার করে তোলা লক্ষ্য নয়।

সন্দীপ হেসে উঠে বল্লে, আপনার এ কথা মাষ্টার মশায়ের মত কথাই হয়েছে! এ সকল কেবল বইয়ের পাতায় দেখা যায়, চোখের পাতায় দেখ্‌চি বাইরের জিনিষকে স্তূপাকার করে তোলাই মানুষের চরম লক্ষ্য, আর সেই লক্ষ্যকে যারা বড়রকম করে' সাধন করেচে তারা ব্যবসার বিজ্ঞাপনে প্রতিদিন বড় অক্ষরে মিথ্যা কথা বলে, তারা রাষ্ট্রনীতির সদর খাতায় খুব মোটা কলমে জাল হিসাব লেখে, তাদের খবরের কাগজ মিথ্যার বোঝাই জাহাজ, আর মাছি যেমন করে সান্নিপাতিক জ্বরের বীজ বহন করে তাদের ধর্ম্মপ্রচারকেরা তেমনি করে মিথ্যাকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে বেড়ায়। আমি তাদেরই শিষ্য—আমি যখন কন্‌গ্রেসের দলে ছিলুম তখন আমি বাজার বুঝে আধ-সের সত্যে সাড়ে-পনেরো

সের জল মেশাতে কিছুমাত্র লজ্জা করি নি, আজ আমি সে দল থেকে বেরিয়ে এসেচি আজও আমি এই ধর্ম্মনীতিকেই সার জেনেচি যে সত্য মানুষের লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য হচ্চে ফললাভ।

মাষ্টার মশায় বল্লেন, সত্যফল লাভ।

সন্দীপ বল্লে, হাঁ সেই ফসল মিথ্যের আবাদে তবে ফলে। পায়ের নীচের মাটি একেবারে চিরে গুঁড়িয়ে ধুলো করে দিয়ে তবে সেই ফসল ফলে। আর যা সত্য, যা আপ্‌নি জন্মায় সে হচ্চে আগাছা, কাঁটাগাছ, তার থেকেই যারা ফলের আশা করে তারা কীটপতঙ্গের দল।

এই বলেই সন্দীপ বেগে বেরিয়ে চলে গেল। মাষ্টার মশায় একটু হেসে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, জান নিখিল, সন্দীপ অধার্ম্মিক নয় ও বিধার্ম্মিক। ও অমাবস্যার চাঁদ; চাঁদই বটে কিন্তু ঘটনা ক্রমে পূর্ণিমার উল্টো দিকে গিয়ে পড়েচে।

আমি বল্লুম, সেই জন্যে চিরদিনই ওর সঙ্গে আমার মতের মিল নেই কিন্তু ওর প্রতি আমার স্বভাবের আকর্ষণ আছে। ও আমার অনেক ক্ষতি করেচে, আরো করবে, কিন্তু ওকে আমি অশ্রদ্ধা করতে পারিনে।

তিনি বল্লেন, সে আমি ক্রমে বুঝতে পারচি। আমি অনেক-দিন আশ্চর্য্য হয়ে ভেবেচি, সন্দীপকে এতদিন তুমি কেমন করে সহ্য করে আছ। এমন কি, এক-একদিন আমার সন্দেহ হয়েচে এর মধ্যে তোমার দুর্ব্বলতা আছে। এখন দেখ্‌তে পাচ্চি ওর সঙ্গে তোমার কথারই মিল নেই কিন্তু ছন্দের মিল রয়েচে।

আমি কৌতুক করে বল্লুম, মিত্রে মিত্রে মিলে অমিত্রাক্ষর!

হয় ত আমাদের ভাগ্যকবি প্যারাডাইস্ লষ্ট-এর মত একটা এপিক লেখবার সঙ্কল্প করেচেন।

মাষ্টারমশায় বল্লেন, এখন পঞ্চুকে নিয়ে কি করা যায়?

আমি বল্লুম, আপনি বলেছিলেন, যে-বিঘেকয়েক জমির উপর পঞ্চুর বাড়ি আছে সেটাতে অনেকদিন থেকে ওর মৌরসি স্বত্ব জন্মেছে, সেই স্বত্ব কাঁচিয়ে দেবার জন্যে ওর জমিদার অনেক চেষ্টা করচে—ওর সেই জমিটা আমি কিনে নিয়ে সেইখানেই ওকে আমার প্রজা করে রেখে দিই।

আর ওর একশো টাকার জরিমানা?

সে জরিমানার টাকা কিসের থেকে আদায় হবে? জমি যে আমার হবে।

আর ওর কাপড়ের বস্তা?

আমি আনিয়ে দিচ্চি। আমার প্রজা হয়ে ও যেমন ইচ্ছে বিক্রি করুক্, দেখি ওকে কে বাধা দেয়?

পঞ্চু হাত জোড় করে বল্লে, হুজুর রাজায় রাজায় লড়াই, পুলিশের দারোগা থেকে উকিল ব্যারিষ্টর পর্য্যন্ত শকুনি গৃধিনীর পাল জমে যাবে, সবাই দেখে আমোদ করবে কিন্তু মরবার বেলায় আমিই মরব।

কেন তোর কি করবে?

ঘরে আমার আগুন লাগিয়ে দেবে, ছেলে মেয়ে সুদ্ধু নিয়ে পুড়ব।

মাষ্টার মশায় বল্লেন, আচ্ছা, তোর ছেলেমেয়েরা কিছুদিন আমার ঘরেই থাক্‌বে, তুই ভয় করিস্ নে—তোর ঘরে বসে তুই

যেমন ইচ্ছে ব্যবসা কর্ কেউ তোর গায়ে হাত দিতে পারবে না। অন্যায়ের কাছে তুই হার মেনে পালাবি এ আমি হতে দেব না। যত সইব বোঝা ততই বাড়বে।

সেই দিনই পঞ্চুর জমি কিনে রেজেষ্ট্রি করে আমি দখল করে বস্‌লুম। তার পর থেকে ঝুটোপুটি চল্‌ল।

পঞ্চুর বিষয়-সম্পত্তি ওর মাতামহের। পঞ্চু ছাড়া তার ওয়ারেশ কেউ ছিল না, এই কথাই সকলের জানা। হঠাৎ কোথা থেকে এক মামী এসে জুটে জীবনস্বত্বের দাবী করে তার পুঁটুলি, তার প্যাট্‌রা, হরিনামের ঝুলি এবং একটি প্রাপ্তবয়স্ক বিধবা ভাইঝি নিয়ে পঞ্চুর ঘরের মধ্যে উপস্থিত।

পঞ্চু অবাক্ হয়ে বল্লে, আমার মামী ত বহুকাল হল মারা গেছে।

তার উত্তর, প্রথম-পক্ষের মামী মারা গেছে বটে, দ্বিতীয়-পক্ষের অভাব হয় নি।

কিন্তু মামার মৃত্যুর অনেক পরে যে মামী মরেচে, দ্বিতীয় পক্ষের ত সময় ছিল না।

স্ত্রীলোকটি স্বীকার করলে দ্বিতীয়-পক্ষটি মৃত্যুর পরের নয় মৃত্যুর পূর্ব্বের। সতীনের ঘর করবার ভয়ে বাপের বাড়ি ছিল, স্বামীর মৃত্যুর পরে প্রবল বৈরাগ্যে সে বৃন্দাবনে চলে যায়; কুণ্ডু-জমিদারের আম্‌লারা এসব কথা কেউ কেউ জানে, বোধকরি প্রজাদেরও কারো কারো জানা আছে, আর জমিদার যদি জোরে হাঁক দেয় তবে বিবাহের সময় যারা নিমন্ত্রণ খেয়েছিল তারাও বেরিয়ে আস্‌তে পারে।

সেদিন দুপুর-বেলা পঞ্চুর এই দুর্গ্রহ নিয়ে যখন আমি খুব ব্যস্ত আছি এমন সময় অন্তঃপুর থেকে বিমলা আমাকে ডেকে পাঠালেন।

আমি চমকে উঠ্‌লুম, জিজ্ঞাসা করলুম, কে ডাক্‌চে?

বল্লে, রাণীমা।

বড় রাণীমা?

না, ছোট রাণীমা।

ছোটরাণী? মনে হল একশো বছর ছোটরাণী আমাকে ডাকেনি।

বৈঠকখানা ঘরে সবাইকে বসিয়ে রেখে আমি অন্তঃপুরে চল্লুম। শোবার ঘরে গিয়ে বিমলাকে দেখে আরো আশ্চর্য্য হলুম যখন দেখা গেল, সর্ব্বাঙ্গে, বেশি নয়, অথচ বেশ একটু সাজের আভাস আছে। কিছুদিন এই ঘরটার মধ্যেও যত্নের লক্ষণ দেখিনি, সব এমন এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল যে, মনে হত যেন ঘরটা সুদ্ধ অন্যমনস্ক হয়ে গেছে। ওরি মধ্যে আগেকার মত আজ একটু পারিপাট্য দেখতে পেলুম।

আমি কিছু না বলে বিমলার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। বিমলার মুখ একটু লাল হয়ে উঠ্‌ল, সে ডান হাত দিয়ে তার বাঁ হাতের বালা দ্রুতবেগে ঘোরাতে ঘোরাতে বল্লে, দেখ, সমস্ত বাংলা দেশের মধ্যে কেবল আমাদের এই হাটটার মধ্যেই বিলিতি কাপড় আসচে এটা কি ভালো হচ্চে?

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কি করলে ভালো হয়?

ঐ জিনিষগুলো বের করে দিতে বল না!

জিনিষগুলো ত অমার নয়!

কিন্তু হাট ত তোমার?

হাট আমার চেয়ে তাদের অনেক বেশি যারা ঐ হাটে জিনিষ কিনতে আসে।

তারা দিশি জিনিষ কিনুক না।

যদি কেনে ত আমি খুসি হব, কিন্তু যদি না কেনে?

সে কি কথা? ওদের এত বড় আস্পর্দ্ধা হবে? তুমি হলে—

আমার সময় অল্প, এ নিয়ে তর্ক করে কি হবে? আমি অত্যাচার করতে পারব না।

অত্যাচার ত তোমার নিজের জন্যে নয়, দেশের জন্যে,—

দেশের জন্যে অত্যাচার করা দেশের উপরেই অত্যাচার করা। সে কথা তুমি বুঝতে পার্‌বে না।

এই বলে আমি চলে এলুম। হঠাৎ আমার চোখের সামনে সমস্ত জগৎ যেন দীপ্যমান হয়ে উঠ্‌ল। মাটির পৃথিবীর ভার যেন চলে গেছে, সে যে আপনার জীবপালনের সমস্ত কাজ করেও আপনার নিরন্তর বিকাশের সমস্ত পর্য্যায়ের ভিতরেও একটি অদ্ভুত শক্তির বেগে দিন রাত্রিকে জপমালার মত ফেরাতে ফেরাতে যুগে যুগে আকাশের মধ্যে ছুটে চলেচে সেইটে আমি আমার রক্তের মধ্যে অনুভব করলুম। কর্ম্মভারের সীমা নেই অথচ মুক্তি-বেগেরও সীমা নেই! কেউ বাঁধবে না, কেউ বাঁধবে না, কিছুতেই বাঁধবে না। অকস্মাৎ আমার মনের গভীরতা থেকে একটা বিপুল আনন্দ যেন সমুদ্রের জলস্তম্ভের মত আকাশের মেঘকে গিয়ে স্পর্শ করলে।

নিজেকে বারবার জিজ্ঞাসা করলুম, হঠাৎ তোমার এ হ'ল কি? প্রথমটা স্পষ্ট উত্তর পাওয়া গেল না, তার পরে পারিষ্কার বুঝলুম, এই কয়দিন যে বন্ধন দিনরাত আমার মনের ভিতরে এমন পীড়া দিয়েচে আজ তার একটা মস্ত ফাঁক দেখা গেল। আমি ভারি আশ্চর্য্য হলুম আমার মনের মধ্যে কোনো ঘোর ছিল না। ফোটোগ্রাফের প্লেটে যে রকম করে ছবি পড়ে আমার দৃষ্টিতে বিমলার সমস্ত-কিছু তেমনি করে অঙ্কিত হল। আমি স্পষ্ট দেখ্‌তে পেলুম বিমলা আমার কাছ থেকে কাজ আদায় করবার জন্যে বিশেষ করে সাজ করেছে। আজকের দিনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি কখনই বিমলাকে এবং বিমলার সাজকে তফাৎ করে দেখিনি। আজ ওর বিলিতি খোঁপার চূড়াকে কেবলমাত্র চুলের কুণ্ডলী বলেই দেখ্‌লুম—শুধু তাই নয়, একদিন এই খোঁপা আমার কাছে অমূল্য ছিল, আজ দেখি এ স্বস্তা দামে বিকোবার জন্যে প্রস্তুত।

সন্দীপের সঙ্গে আমার দেশ নিয়ে পদে পদে বিরোধ হয়, কিন্তু সে সত্যকার বিরোধ;—কিন্তু বিমলা দেশের নাম করে যে কথাগুলো বল্‌চে সে কেবলমাত্র সন্দীপের ছায়া দিয়ে গড়া, আইডিয়া দিয়ে নয়,—এই ছায়ার যদি বদল হয় ওর কথারও বদল হবে। এই সমস্তই আমি খুব স্বচ্ছ করে দেখ্‌লুম, লেশমাত্র কুয়াসা কোথাও ছিল না।

আমার সেই শোবার ঘরের ভাঙা খাঁচাটির ভিতর থেকে যখন সেই হেমন্ত মধ্যাহ্নের খোলা আলোর মধ্যে বেরিয়ে এলুম, তখন একদল শালিখ আমার বাগানের গাছের তলায় অকস্মাৎ কি কারণে

ভারি উত্তেজনার সঙ্গে কিচিমিচি বাধিয়েচে; বারান্দার সাম্‌নে দক্ষিণে খোয়া-ফেলা রাস্তার দুইধারে সারি সারি কাঞ্চন গাছ অজস্র গোলাপী ফুলের মুখরতায় আকাশকে অভিভূত করে দিয়েছে; অদূরে মেঠো পথের প্রান্তে শূন্য গোরুর গাড়ি আকাশে পুচ্ছ তুলে মুখ থুব্‌ড়ে পড়ে আছে, তারই বন্ধনমুক্ত জোড়া গোরুর মধ্যে একটা, ঘাস খাচ্চে, আর-একটা রৌদ্রে শুয়ে পড়ে আছে, আর তার পিঠের উপর একটা কাক ঠোকর মেরে মেরে কীট উদ্ধার করচে—আরামে গোরুটার চোখ বুজে এসেচে। আজ আমার মনে হল, বিশ্বের এই যা-কিছু খুব সহজ অথচ অত্যন্ত বৃহৎ আমি তারি স্পন্দিত বক্ষের খুব কাছে এসে বসেচি, তারই আতপ্ত নিশ্বাস ঐ কাঞ্চন ফুলের গন্ধের সঙ্গে মিশে আমার হৃদয়ের উপরে এসে পড়চে। আমার মনে হল, আমি আছি এবং সমস্তই আছে, এই দুইয়ে মিলে আকাশ জুড়ে যে সঙ্গীত বাজচে সে কি উদার, কি গভীর, কি অনির্ব্বচনীয় সুন্দর।

তার পরে মনে পড়ল, দারিদ্র্য এবং চাতুরীর ফাঁদে আট্‌কা-পড়া পঞ্চু; সেই পঞ্চুকে যেন দেখ্‌লুম আজ হেমন্তের রৌদ্রে বাংলার সমস্ত উদাস মাঠ বাট জুড়ে ঐ গোরুটার মত চোখ বুজে পড়ে আছে—কিন্তু আরামে নয়, ক্লান্তিতে, ব্যাধিতে, উপবাসে। সে যেন বাংলার সমস্ত গরীব রায়তের প্রতিমূর্ত্তি। দেখ্‌তে পেলুম পরম আচারনিষ্ঠ ফোঁটাকাটা স্থূলতনু হরিশকুণ্ডু। সেও ছোট নয়, সেও বিরাট্, সে যেন বাঁশবনের তলায় বহুকালের বদ্ধ পচা দীঘির উপর তেলা সবুজ একটা অখণ্ড সরের মত এপার থেকে ওপার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে বিষ বুদ্‌বুদ উদ্‌গার করচে।

যে প্রকাণ্ড তামসিকতা একদিকে উপবাসে কৃশ, অজ্ঞানে অন্ধ, অবসাদে জীর্ণ, আর-একদিকে মুমূর্ষুর রক্তশোষণে স্ফীত হয়ে আপনার অবিচলিত জড়ত্বের তলায় ধরিত্রীকে পীড়িত করে পড়ে আছে, শেষ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে,—এই কাজটা মুল্‌তবি হয়ে পড়ে রয়েচে শত শত বৎসর ধরে'। আমার মোহ ঘুচুক, আমার আবরণ কেটে যাক্‌, আমার পৌরুষ অন্তঃপুরের স্বপ্নের জালে ব্যর্থ হয়ে জড়িয়ে পড়ে থাকে না যেন! আমরা পুরুষ, মুক্তিই আমাদের সাধনা, আইডিয়ালের ডাক শুনে আমরা সাম্‌নের দিকে ছুটে চলে যাব, দৈত্যপুরীর দেয়াল ডিঙিয়ে বন্দিনী লক্ষ্মীকে আমাদের উদ্ধার করে আনতে হবে—যে মেয়ে তার নিপুণ হাতে আমাদের সেই অভিযানের জয়পতাকা তৈরী করে দিচ্চে সেই আমাদের সহধর্ম্মিণী, আর ঘরের কোণে যে আমাদের মায়াজাল বুন্‌চে, তার ছদ্মবেশ ছিন্ন করে' তার মোহমুক্ত সত্যকার পরিচয় যেন আমরা পাই,—তাকে আমাদের নিজেরই কামনার রসে-রঙে অপ্‌সরী সাজিয়ে তুলে যেন নিজের তপস্যা ভঙ্গ করতে না পাঠাই! আজ আমার মনে হচ্চে আমার জয় হবে,—আমি সহজের রাস্তায় দাঁড়িয়েচি, সহজ চোখে সব দেখ্‌চি —আমি মুক্তি পেয়েচি, আমি মুক্তি দিলুম, যেখানে আমার কাজ সেইখানেই আমার উদ্ধার।

আমি জানি বেদনায় বুকের নাড়ীগুলা আবার এক-একবার টন্‌টন্‌ করে উঠ্‌বে। কিন্তু সেই বেদনাকেও আমি এবার চিনে নিয়েচি—তাকে আমি আর শ্রদ্ধা করতে পারব না। আমি জানি সে কেবলমাত্রই আমার—তার দাম কিসের? যে দুঃখ বিশ্বের

সেই ত আমার গলার হার হবে। হে সত্য, বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও,—কিছুতেই আমাকে ফিরে যেতে দিয়োনা ছলনার ছদ্ম-স্বর্গলোকে। আমাকে একলা পথের পথিক যদি কর সে পথ তোমারই পথ হোক্—আমার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে তোমার জয়ভেরী বেজেচে আজ!

সন্দীপের আত্মকথা

সেদিন অশ্রুজলের বাঁধ ভাঙে আর কি। আমাকে বিমলা ডাকিয়ে আন্‌লে কিন্তু খানিকক্ষণ তার মুখ দিয়ে কথা বের হল না, তার দুই চোখ ঝকঝক করতে লাগল। বুঝলুম নিখিলের কাছে কোনো ফল পায়নি। যেমন করে হোক ফল পাবে সেই অহঙ্কার ওর মনে ছিল কিন্তু সে আশা আমার মনে ছিল না। পুরুষেরা যেখানে দুর্ব্বল, মেয়েরা সেখানে তাদের খুব ভালো করেই চেনে, কিন্তু পুরুষেরা যেখানে খাঁটি পুরুষ মেয়েরা সেখানকার রহস্য ঠিক ভেদ করতে পারে না। আসল কথা, পুরুষ, মেয়ের কাছে রহস্য, আর মেয়ে, পুরুষের কাছে রহস্য, এই যদি না হবে, তাহলে এই দুটো জাতের ভেদ জিনিষটা প্রকৃতির পক্ষে নেহাৎ একটা অপব্যয় হত।

অভিমান! যেটা দরকার সেটা ঘটল না কেন, সে হিসেব মনে নেই, কিন্তু, আমি যেটা মুখ ফুটে চাইলুম সেটা কেন ঘটল না এইটেই হ'ল খেদ। ওদের ঐ আমির দাবিটাকে নিয়ে যে কত রং কত ভঙ্গী, কত কান্না কত ছল, কত হাবভাব তার আর অন্ত নেই; ঐটেতেই ত ওদের মাধুর্য্য। ওরা আমাদের চেয়ে ঢের বেশি ব্যক্তিবিশেষ। আমাদের যখন বিধাতা তৈরি করছিলেন তখন

ছিলেন তিনি ইস্কুলমাষ্টার, তখন তাঁর ঝুলিতে কেবল পুঁথি আর তত্ত্ব; আর ওদের বেলা তিনি মাষ্টারিতে জবাব দিয়ে হয়ে উঠেচেন আর্টিষ্ট; তখন তুলি আর রঙের বাক্স!

তাই সেই অশ্রুভরা অভিমানের রক্তিমায় যখন বিমলা সূর্য্যাস্তের দিগন্তরেখায় একখানি জলভরা আগুনভরা রাঙা মেঘের মত নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল সে আমার ভারি মিষ্টি দেখ্‌তে লাগ্‌ল। আমি খুব কাছে গিয়ে তার হাত চেপে ধরলুম; সে হাত ছাড়িয়ে নিলে না, থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠল। বল্‌লুম, মক্ষি, আমরা দুজনে সহযোগী, আমাদের এক লক্ষ্য। বস তুমি।

এই বলে বিমলাকে একটা চৌকিতে বসিয়ে দিলুম। আশ্চর্য্য! এতখানি বেগ কেবল এইটুকুতে এসে ঠেকে গেল। বর্ষার যে পদ্মা ভাঙতে ভাঙতে ডাক্‌তে ডাক্‌তে আস্‌চে, মনে হয় সামনে কিছু-আর রাখ্‌বে না, সে হঠাৎ একটা-জায়গায় যেন বিনা কারণে তার ভাঙনের সোজা লাইন ছেড়ে একেবারে এপার থেকে ওপারে চলে গেল। তার তলার দিকে কোথায় কি বাধা লুকিয়েছিল মকরবাহিনী নিজেও তা জান্‌ত না। আমি বিমলার হাত চেপে ধরলুম, আমার দেহ-বীণার ছোট বড় সমস্ত তার ভিতরে ভিতরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠ্‌ল, কিন্তু ঐ আস্থায়ীতেই কেন থেমে গেল, অন্তরা পর্য্যন্ত কেন পৌঁছল না? বুঝতে পারলুম জীবনের স্রোতঃপথের গভীরতম তলাটা বহুকালের গতি দিয়ে তৈরি হয়ে গেছে, ইচ্ছার বন্যা যখন প্রবল হয়ে বয় তখন সেই তলার পথটাকে কোথাও বা ভাঙে, আবার কোথাও বা এসে ঠেকে যায়! ভিতরে একটা সঙ্কোচ কোথাও রয়ে গেচে, সেটা কি? সে কোনো-একটা জিনিষ নয়, সে

অনেকগুলোতে জড়ানো। সেই জন্যে তার চেহারা স্পষ্ট বুঝতে পারিনে, এই কেবল বুঝি সেটা একটা বাধা। এই বুঝি, আমি আসলে যা তা আদালতের সাক্ষ্য দ্বারা কোনোকালে পাকা দলিলে প্রমাণ হবে না। আমি নিজের কাছে নিজে রহস্য, সেই জন্যেই নিজের উপর এমন প্রবল টান; ওকে আগাগোড়া সম্পূর্ণ চিনে ফেল্লেই ওকে টান মেরে ফেলে দিয়ে একেবারে তুরীয় অবস্থা হয়ে যেত।

চৌকিতে বসে দেখতে-দেখতে বিমলার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল। মনে মনে সে বুঝলে তার একটা ফাঁড়া কেটে গেল। ধূমকেতু ত পাশ দিয়ে সোঁ করে চলে গেল কিন্তু তার আগুনের পুচ্ছের ধাক্কায় ওর মনপ্রাণ কিছুক্ষণের জন্য যেন মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল। আমি এই ঘোরটাকে কাটিয়ে দেবার জন্যে বল্‌লুম, বাধা আছে কিন্তু তা নিয়ে খেদ করব না, লড়াই করব! কি বল রাণী।

বিমলা একটু কেশে তার বদ্ধ স্বরকে কিছু পরিষ্কার করে নিয়ে শুধু বল্লে, হাঁ।

আমি বল্‌লুম, কি করে কাজটা আরম্ভ করতে হবে তারি প্ল্যানটা একটু স্পষ্ট করে ঠিক করে নেওয়া যাক্‌।

বলে' আমি আমার পকেট থেকে পেন্সিল কাগজ বের করে নিয়ে বস্‌লুম। কলকাতা থেকে আমাদের দলের যে-সব ছেলে এসে পড়েচে তাদের মধ্যে কি রকম কাজের বিভাগ করে দিতে হবে তারি আলোচনা করতে লাগলুম—এমন সময়ে হঠাৎ মাঝখানে বিমলা বলে উঠল, এখন থাক্‌, সন্দীপ বাবু, আমি পাঁচটার সময় আস্‌ব, তখন সব কথা হবে।—এই বলেই সে তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল।

বুঝলুম, এতক্ষণ চেষ্টা করে কিছুতে আমার কথায় বিমলা মন দিতে পারছিল না; নিজের মনটাকে নিয়ে এখন কিছুক্ষণ ওর একলা থাকা চাই। হয়ত বিছানায় পড়ে ওকে কাঁদতে হবে।

বিমলা চলে গেলে ঘরের ভিতরকার হাওয়া যেন আরও বেশি মাতাল হয়ে উঠল। সূর্য্য অস্ত যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে তবে যেমন আকাশের মেঘ রঙে রঙে রঙীন হয়ে ওঠে, তেমনি বিমলা চলে যাওয়ার পরে আমার মনটা রঙিয়ে রঙিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। মনে হতে লাগ্‌ল ঠিক সময়টাকে 'বয়ে যেতে দিয়েচি। এ কি কাপুরুষতা! আমার এই অদ্ভুত দ্বিধায় বিমলা বোধ হয় আমার পরে অবজ্ঞা করেই চলে গেল! করতেও পারে।

এই নেশার আবেশে রক্তের মধ্যে যখন ঝিম্‌ঝিম্‌ করচে এমন সময় বেহারা এসে খবর দিলে অমূল্য আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। ক্ষণকালের জন্য ইচ্ছে হল তাকে এখন বিদায় করে দিই,—কিন্তু মন স্থির করবার পূর্ব্বেই সে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়ল।

তারপর নুন চিনি কাপড়ের লড়াইয়ের খবর। তখনি ঘরের হাওয়া থেকে নেশা ছুটে গেল। মনে হল স্বপ্ন থেকে জাগ্‌লুম। কোমর বেঁধে দাঁড়ালুম। তার পরে চল রণক্ষেত্রে! হর হর ব্যোম্‌ ব্যোম্‌!

খবর এই, হাটে কুণ্ডুদের যে সব প্রজা মাল আনে তারা বশ মেনেচে। নিখিলের পক্ষের আমলারা প্রায় সকলেই গোপনে আমাদের দলে। তারা অন্তর্‌ টিপুনি দিচ্চে! মাড়োয়ারিরা বল্‌চে, আমাদের কাছ থেকে কিছু দণ্ড নিয়ে বিলিতি কাপড় বেচতে দিন, নইলে ফতুর হয়ে যাব। মুসলমানেরা কিছুতেই বাগ মানচে না।

একটা চাষী তার ছেলে মেয়েদের জন্যে সস্তা দামের জর্ম্মন শাল কিনে নিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের দলের এখানকার গ্রামের একজন ছেলে তার সেই শাল ক'টা কেড়ে নিয়ে পুড়িয়ে দিয়েচে। তাই নিয়ে গোলমাল চল্‌চে। আমরা তাকে বলচি তোকে দিশি গরম কাপড় কিনে দিচ্চি। কিন্তু সস্তা দামের দিশি গরম কাপড় কোথায়? রঙীন কাপড় ত দেখিনে। কাশ্মিরী শাল ত ওকে কিনে দিতে পারিনে। সে এসে নিখিলের কাছে কেঁদে পড়েচে। তিনি সেই ছেলেটার নামে নালিশ করবার হুকুম দিয়েচেন। নালিশের ঠিকমত তদ্বির যাতে না হয় আমলারা তার ভার নিয়েচে, এমন কি, মোক্তার আমাদের দলে।

এখন কথা হচ্চে, যার কাপড় পোড়াব তার জন্যে যদি দিশি কাপড় কিনে দিতে হয়, তার পরে আবার মামলা চলে, তাহলে তার টাকা পাই কোথায়? আর ঐ পুড়তে পুড়তে বিলিতি কাপড়ের ব্যবসা যে গরম হয়ে উঠবে। নবাব যখন বেলোয়ারী ঝাড়-ভাঙার শব্দে মুগ্ধ হয়ে ঘরে ঘরে ঝাড় ভেঙে বেড়াত তখন ঝাড়ওয়ালার ব্যবসার খুব উন্নতি হয়েছিল।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই, সস্তা অথচ দিশি গরম কাপড় বাজারে নেই। শীত এসে পড়েচে এখন বিলিতি শাল র‍্যাপার মেরিনো রাখ্‌ব কি তাড়াব?

আমি বল্লুম, যে লোক বিলিতি কাপড় কিনবে তাকে দিশি কাপড় বখশিশ দেওয়া চল্‌বে না। দণ্ড তারই হওয়া চাই, আমাদের নয়। মামলা যারা করতে যাবে তাদের ফসলের খোলায় আগুন লাগিয়ে দেব, গায়ে হাত বুলিয়ে কিছু হবে না। ওহে অমূল্য,

অমন চম্‌কে উঠলে চল্‌বে না। চাষীর খোলায় আগুন দিয়ে রোসনাই করায় আমার সখ নেই। কিন্তু এ হল যুদ্ধ। দুঃখ দিতে যদি ডরাও তাহলে মধুর রসে ডুব মার, রাধাভাবে ভোর হয়ে ক বল্‌তেই মাটিতে লুটিয়ে পড়।

আর বিলিতি গরম কাপড়? যত অসুবিধেই হোক্‌ ও কিছুতেই চল্‌বে না। বিলিতির সঙ্গে কোনো কারণেই কোনো খানেই রফা করতে পারব না। বিলিতি রঙীন র‍্যাপার যখন ছিল না তখন চাষীর ছেলে মাথার উপর দিয়ে দোলাই জড়িয়ে শীত কাটাত এখনো তাই করবে। তাতে তাদের সখ মিটবে না জানি, কিন্তু সখ মেটাবার সময় এখন নয়।

হাটে যারা নৌকো আনে তাদের মধ্যে অনেককে ছলে বলে বাধ্য করবার পথে কতকটা আনা গেছে। তাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় হচ্চে মিরজান, সে কিছুতেই নরম হল না। এখানকার নায়েব কুলদাকে জিজ্ঞাসা করা গেল ওর ঐ নৌকোখানা ডুবিয়ে দিতে পার কিনা? সে বল্লে, সে আর শক্ত কি, পারি; কিন্তু দায় ত শেষকালে আমার ঘাড়ে পড়বে না?—আমি বল্‌লুম দায়টাকে কারো ঘাড়ে পড়বার মত আল্‌গা জায়গায় রাখা উচিত নয়, তবু—নিতান্তই যদি পড়-পড় হয় ত আমিই ঘাড় পেতে দেব।

হাট হয়ে গেলে মিরজানের খালি নৌকো ঘাটে বাঁধা ছিল। মাঝিও ছিল না। নায়েব কৌশল করে একটা যাত্রার আসরে তাদের নিমন্ত্রণ করিয়েছিল। সেই রাত্রে নৌকোটাকে খুলে স্রোতের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে তাকে ফুটো করে তার মধ্যে রাবিশের বস্তা চাপিয়ে তাকে ডুবিয়ে দেওয়া হল।

মীরজান সমস্তই বুঝলে। সে একেবারে আমার কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে হাত জোড় করে বল্লে, হুজুর গোস্তাকি হয়েছিল, এখন—

আমি বল্‌লুম, এখন সেটা এমন স্পষ্ট করে বুঝতে পারলে কি করে ?

তার জবাব না দিয়ে সে বল্লে, সে নৌকোখানার দাম দু হাজার টাকার কম হবে না, হজুর! এখন আমার হুঁস হয়েচে—এবাবকার মত কসুর যদি মাপ করেন—

বলে সে আমার পায়ে জড়িয়ে ধরল। তাকে বল্‌লুম, আর দিন দশেক পরে আমার কাছে আস্‌তে। এই লোকটাকে যদি এখন দু হাজার টাকা দেওয়া যায় তা হলে এ'কে কিনে রাখতে পারি। এরই মত মানুষকে দলে আন্‌তে পারলে তবে কাজ হয়। কিছু বেশি করে টাকার যোগাড় করতে না পারলে কোনো ফল হবেনা।

বিকেলবেলায় বিমলা ঘরে আস্‌বামাত্র চৌকী থেকে উঠে তাকে বল্‌লুম, রাণী, সব হয়ে এসেচে, আর দেরি নেই, এখন টাকা চাই।

বিমলা বল্লে, টাকা ? কত টাকা ?

আমি বল্‌লুম, খুব বেশি নয়, কিন্তু যেখান থেকে হোক্ টাকা চাই!

বিমলা জিজ্ঞাসা করলে, কত চাই বলুন!

আমি বল্‌লুম, আপাতত কেবল পঞ্চাশ হাজার মাত্র।

টাকার সংখ্যাটা শুনে বিমলা ভিতরে ভিতরে চম্‌কে উঠলে কিন্তু বাইরে সেটা গোপন করে গেল। বার বার সে কি করে বল্‌বে, যে, পারব না।

আমি বল্‌লুম, রাণী, অসম্ভবকে সম্ভব করতে পার তুমি!

করেওচ। কি যে করেচ যদি দেখাতে পারতুম ত দেখতে। কিন্তু এখন তার সময় নয় ; একদিন হয় ত সময় আস্‌বে। এখন টাকা চাই।

বিমলা বল্লে, দেব।

আমি বুঝলুম, বিমলা মনে মনে ঠিক করে নিয়েচে ওর গয়না বেচে দেবে। আমি বল্‌লুম, তোমার গয়না এখন হাতে রাখতে হবে, কখন কি দরকার হয় বলা যায় না।

বিমলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি বল্‌লুম, তোমার স্বামীর টাকা থেকে এ টাকা নিতে হবে।

বিমলা আরো স্তম্ভিত হয়ে গেল। খানিক পরে সে বল্লে, তাঁর টাকা আমি কেমন করে নেব ?

আমি বল্‌লুম, তাঁর টাকা কি তোমার টাকা নয় ?

সে খুব অভিমানের সঙ্গেই বল্লে, নয় !

আমি বল্‌লুম, তা হলে সে টাকা তারও নয়। সে টাকা দেশের। দেশের যখন প্রয়োজন আছে তখন এ টাকা নিখিল দেশের কাছ থেকে চুরি করে রেখেচে।

বিমলা বল্লে, আমি সে টাকা পাব কি করে ?

যেমন করে হোক্‌। তুমি সে পারবে। যাঁর টাকা তুমি তাঁর কাছে এনে দেবে। বন্দেমাতরং ! বন্দেমাতরং এই মন্ত্রে আজ লোহার সিন্ধুকের দরজা খুলবে, ভাণ্ডার-ঘরের প্রাচীর খুল্‌বে, আর যারা ধর্ম্মের নাম করে সেই মহাশক্তিকে মানে না তাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাবে ! মক্ষি, বল বন্দেমাতরং !

বন্দেমাতরং।

ক্রমশঃ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার তুমি

যে চোখে তোমারে, প্রিয়ে, দেখে সর্ব্বজন
সে চোখে তোমারে যদি আমি হেরিতাম
তা হলে তোমার পায়ে জীবন যৌবন
সব কি গো নির্ব্বিচারে দিতে পারিতাম ?
তুমি যে আমার চোখে কি মহারতন
দর্পণ কখনো তার পায় কি আভাস ?
বিশ্ব যদি পেত কভু আমার নয়ন
আমার "তোমা"কে নিয়ে হ'ত সে উদাস।
আমার অন্তরচক্ষু, দেহের নয়নে
লুপ্ত করিয়াছে, রবি চন্দ্রেরে যেমন,
অন্তর হেরিছে তার অন্তরের ধনে,
এ যেন ঋষির মহামন্ত্রের দর্শন।
আমার "তুমিটি" সে যে সবার "তোমাকে"
নিত্য মোর আনন্দের অন্তরালে ঢাকে।

শ্রীকালিদাস রায়।

সবুজ পত্র

নূতন বসন

সর্ব্বদেহের ব্যাকুলতা কি বল্‌তে চায় বাণী,
তাই আমার এই নূতন বসনখানি।
নূতন সে মোর হিয়ার মধ্যে, দেখ্‌তে কি পায় কেউ?
সেই নূতনের ঢেউ
অঙ্গ বেয়ে পড়ল ছেয়ে নূতন বসনখানি।
দেহ-গানের তান যেন এই নিলেম বুকে টানি।

আপনাকে ত দিলেম তা'রে, তবু হাজার বার
নূতন করে দিই যে উপহার।
চোখের কালোয় নূতন আলো ঝলক দিয়ে ওঠে,
নূতন হাসি ফোটে,
তারি সঙ্গে, যতন-ভরা নূতন বসনখানি
অঙ্গ আমার নূতন করে' দেয় যে তা'রে আনি।

চাঁদের আলো চাইবে রাতে বনছায়ার পানে
বেদন-ভরা শুধু চোখের গানে।
মিল্‌ব তখন বিশ্বমাঝে আমরা দোঁহে একা,
যেন নূতন দেখা।
তখন আমার অঙ্গ ভরি নূতন বসনখানি
পাড়ে পাড়ে ভাঁজে ভাঁজে করবে কানাকানি।

ওগো, আমার হৃদয় যেন সন্ধ্যারি আকাশ,
রঙের নেশায় মেটেনা তার আশ।
তাই ত বসন রাঙিয়ে পরি কখনো বা ধানী,
কখনো জাফ্‌রাণী,
আজ তোরা দেখ্‌ চেয়ে আমার নূতন বসনখানি
বৃষ্টি-ধোওয়া আকাশ যেন নবীন আস্‌মানী।

অকূলের এই বর্ণ, এ যে দিশাহারার নীল,
অন্য পারের বনের সাথে মিল।
আজকে আমার সকল দেহে বইচে দূরের হাওয়া
সাগর পানে ধাওয়া।
আজকে আমার অঙ্গে আনে নূতন কাপড়খানি
বৃষ্টি-ভরা ঈশান কোণের নব মেঘের বাণী॥

পদ্মা
১২ই অগ্রহায়ণ
১৩২২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঘরে-বাইরে

সন্দীপের আত্মকথা

আমরা পুরুষ, আমরা রাজা, আমরা খাজনা নেব। আমরা পৃথিবীতে এসে অবধি পৃথিবীকে লুঠ করচি। আমরা যতই তার কাছে দাবী করেচি ততই সে আমাদের বশ মেনেচে। আমরা পুরুষ আদিকাল থেকে ফল পেড়েচি, গাছ কেটেচি, মাটি খুঁড়েচি, পশু মেরেচি, পাখী মেরেচি, মাছ মেরেচি। সমুদ্রের তলা থেকে, মাটির নীচে থেকে, মৃত্যুর মুখের থেকে আদায়, আদায়, আমরা কেবলই আদায় করে এসেচি—আমরা সেই পুরুষ জাত। বিধাতার ভাণ্ডারে কোনো লোহার সিন্ধুককে আমরা রেয়াৎ করি নি—আমরা ভেঙেচি আর কেড়েচি।

এই পুরুষদের দাবী মেটানোই হচ্চে ধরণীর আনন্দ। দিনরাত সেই অন্তহীন দাবী মেটাতে মেটাতেই পৃথিবী উর্ব্বরা হয়েচে, সুন্দরী হয়েচে, সার্থক হয়েচে, নইলে জঙ্গলের মধ্যে ঢাকা পড়ে সে আপনাকে আপনি জান্‌ত না। নইলে তার হৃদয়ের সকল দরজাই বন্ধ থাকত; তার খনির হীরে খনিতেই থেকে যেত, তার শুক্তির মুক্তো আলোতে উদ্ধার পেত না।

আমরা পুরুষ কেবল আমাদের দাবীর জোরে মেয়েদের আজ উদ্ঘাটিত করে দিয়েচি। কেবলি আমাদের কাছে আপনাকে দিতে দিতে তারা ক্রমে ক্রমে আপনাকে বড় করে বেশি করে পেয়েচে। তারা তাদের সমস্ত সুখের হীরে এবং দুঃখের মুক্তো আমাদের

রাজকোষে জমা করে দিতে গিয়েই তবে তার সন্ধান পেয়েছে। এমনি করে পুরুষের পক্ষে নেওয়াই হচ্চে যথার্থ দান, আর মেয়েদের পক্ষে দেওয়াই হচ্চে যথার্থ লাভ।

বিমলার কাছে খুব একটা বড় হাঁক হেঁকেচি। মনের ধর্ম্মই না কি আপনার সঙ্গে না-হক্ ঝগড়া করা, তাই প্রথমটা একটা খট্‌কা লেগেছিল। মনে হয়েছিল, এটা বড় বেশি কঠিন হল। একবার ভাবলুম, ওকে ডেকে বলি, না, তোমার এ সব ঝঞ্ঝাটে গিয়ে কাজ নেই, তোমার জীবনে কেন এমন অশান্তি এনে দেব? ক্ষণকালের জন্যে ভুলে গিয়েছিলুম, পুরুষ জাত এইজন্যেই ত সকর্ম্মক, আমরা অকর্ম্মকদের মধ্যে ঝঞ্ঝাট বাধিয়ে অশান্তি ঘটিয়ে তাদের অস্তিত্বকে সার্থক করে তুল্‌ব যে। আমরা আজ পর্য্যন্ত মেয়েদের যদি কাঁদিয়ে না আস্‌তুম তা হলে তাদের দুঃখের ঐশ্বর্য্য-ভাণ্ডারের দরজা যে আঁটাই থাকৃত। পুরুষ যে ত্রিভুবনকে কাঁদিয়ে ধন্য করবার জন্যই! নইলে তার হাত এমন সবল, তার মুঠো এমন শক্ত হবে কেন?

বিমলার অন্তরাত্মা চাইচে যে, আমি সন্দীপ তার কাছে খুব বড় দাবী করব, তাকে মরতে ডাক দেব। এ না হলে সে খুসি হবে কেন? এতদিন সে ভালো করে কাঁদতে পায়নি বলেই ত আমার পথ চেয়ে বসেছিল। এতদিন সে কেবলমাত্র সুখে ছিল বলেই ত আমাকে দেখবামাত্র তার হৃদয়ের দিগন্তে দুঃখের নববর্ষা একেবারে নীল হয়ে ঘনিয়ে এল। আমি যদি দয়া করে তার কান্না থামাতেই চাই তাহলে জগতে আমার দরকার ছিল কি!

আসলে আমার মনের মধ্যে যে একটুখানি খট্‌কা বেধেছিল তার প্রধান কারণ এটা যে টাকার দাবী। টাকা জিনিষটা যে পুরুষ

মানুষের। ওটা চাইতে যাওয়ার মধ্যে একটু ভিক্ষুকতা এসে পড়ে। সেইজন্যে টাকার অঙ্কটাকে বড় করতে হল। এক আধ হাজার হলে সেটাতে অত্যন্ত চুরির গন্ধ থাকে, কিন্তু পঞ্চাশ হাজারটা হল ডাকাতি।

তা ছাড়া, আমার খুব ধনী হওয়া উচিত ছিল। এতদিন কেবলমাত্র টাকার অভাবে আমার অনেক ইচ্ছা পদে পদে ঠেকে গেচে, এটা, আর যাকে হোক্, আমাকে কিছুতেই শোভা পায় না। আমার ভাগ্যের পক্ষে এটা অন্যায় যদি হত তাঁকে মাপ কর্‌তুম কিন্তু এটা রুচিবিরুদ্ধ সুতরাং অমার্জ্জনীয়। বাসা ভাড়া করলে মাসে মাসে আমি যে তার ভাড়ার জন্যে মাথায় হাত দিয়ে ভাবব, আর রেলে চাপবার সময় অনেক চিন্তা করে টাকার থলি টিপে টিপে ইণ্টারমিডিয়েটের টিকিট কিন্‌ব এটা আমার মত মানুষের পক্ষে ত দুঃখকর নয়, হাস্যকর। আমি বেশ দেখতে পাই নিখিলের মত মানুষের পক্ষে পৈতৃক সম্পত্তিটা বাহুল্য। ও গরীব হলে ওকে কিছুই বেমানান্ হ'ত না। তাহলে ও অনায়াসে অকিঞ্চনতার স্যাকরা গাড়িতে ওর চন্দ্রমাষ্টারের জুড়ি হতে পারত।

আমি জীবনে অন্তত একবার পঞ্চাশ হাজার টাকা হাতে নিয়ে নিজের আরামে এবং দেশের প্রয়োজনে দুদিনে সেটা উড়িয়ে দিতে চাই। আমি আমীর, আমার এই গরীবের ছদ্মবেশটা দুদিনের জন্যেও ঘুচিয়ে একবার আয়নায় আপনাকে দেখে নিই, এই আমার একটা সখ্ আছে।

কিন্তু বিমলা পঞ্চাশ হাজারের নাগাল সহজে কোথাও পাবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। হয়ত শেষকালে সেই দুচার হাজারেই ঠেক্‌বে। তাই সই। অর্দ্ধংত্যজতি পণ্ডিতঃ বলেচে, কিন্তু

ত্যাগটা যখন নিজের ইচ্ছায় নয় তখন হতভাগ্য পণ্ডিত বারো আনা, এমন কি, পনর আনাও ত্যজতি।

এই পর্য্যন্ত লিখেচি,—এ গেল আমার খাষের কথা। এ সব কথা আমার অবকাশের সময় আরো ফুটিয়ে তোলা যাবে। এখন অবকাশ নেই। এখানকার নায়েব খবর পাঠিয়েচে, এখনি একবার তার কাছে যাওয়া চাই; শুন্‌চি একটা গোলমাল বেধেচে।

* * * *

নায়েব বল্লে, যে-লোকটার দ্বারা নৌকো ডোবানো হয়েছিল, পুলিস তাকে সন্দেহ করেচে; লোকটা পুরোনো দাগী—তাকে নিয়ে টানাটানি চল্‌চে। লোকটা সেয়ানা, তার কাছ থেকে কথা আদায় করা শক্ত হবে। কিন্তু বলা যায় কি! বিশেষত নিখিল রেগে রয়েচে, নায়েব স্পষ্ট ত কিছু করতে পারবে না। নায়েব আমাকে বল্লে, দেখুন, আমাকে যদি বিপদে পড়তে হয় আমি আপনাকে ছাড়ব না।—

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আমাকে যে জড়াবে তার ফাঁস কোথায়?

নায়েব বল্লে, আপনার লেখা একখানা, আর অমূল্যবাবুর লেখা তিনখানা চিঠি আমার কাছে আছে।

এখন বুঝচি, যে-চিঠিখানা লিখে নায়েব আমার কাছ থেকে জবাব আদায় করে রেখেছিল সেটা এই কারণেই জরুরি—তার আর কোনো প্রয়োজন ছিল না। এসব চাল নূতন শেখা যাচ্চে। যেমন করে শত্রুর নৌকো ডুবিয়েচি প্রয়োজন হলেই তেমনি

করে যে মিত্রকেও অনায়াসে ডোবাতে পারি আমার পরে নায়েবের এই শ্রদ্ধাটুকু ছিল। শ্রদ্ধা আরও অনেকখানি বাড়ত যদি চিঠিখানার জবাব লিখে-না-দিয়ে মুখে-দেওয়া যেত।

এখন কথা হচ্চে এই, পুলিসকে ঘুষ দেওয়া চাই এবং যদি আরো কিছু দূর গড়ায় তাহলে যে-লোকটার নৌকো ডুবনো গেছে আপসে তারও ক্ষতিপূরণ করতে হবে। এখন বেশ বুঝতে পারচি, এই যে বেড়-জালটি পাতা হচ্চে এর মুনফার একটা মোটা অংশ নায়েবের ভাগেও পড়বে। কিন্তু মনে মনে সে-কথাটা চেপেই রাখতে হচ্চে। মুখে আমিও বলচি বন্দেমাতরং, আর সেও বল্‌চে বন্দেমাতরং।

এ সব ব্যাপারে যে-আসবাব দিয়ে কাজ চালাতে হয় তার ফাটা অনেক ;—যেটুকু পদার্থ টিঁকে থাকে তার চেয়ে গলে' পড়ে ঢের বেশি। ধর্ম্মবুদ্ধিটা না কি লুকিয়ে মজ্জার মধ্যে সেঁধিয়ে বসে আছে সেইজন্যে নায়েবটার উপর প্রথম দফায় খুব রাগ হয়েছিল, আর-একটু হলেই দেশের লোকের কপটতা সম্বন্ধে খুব কড়া কথা এই ডায়ারীতে লিখ্‌তে বসেছিলুম। কিন্তু ভগবান যদি থাকেন তাঁর কাছে আমার এই কৃতজ্ঞতাটুকু স্বীকার করতেই হবে তিনি আমার বুদ্ধিটাকে পরিষ্কার করে দিয়েচেন—নিজের ভিতরে কিম্বা নিজের বাইরে কিছু অস্পষ্ট থাকবার জো নেই। অন্য যাকেই ভোলাই, নিজেকে কখনই ভোলাইনে। সেইজন্যে বেশিক্ষণ রাগ্‌তে পারলুম না। যেটা সত্য সেটা ভালোও নয় মন্দও নয়, সেটা সত্য, এইটেই হল বিজ্ঞান। মাটি যতটা জল শুষে নেয় সেটুকু বাদে যে জলটা থাকে সেইটে নিয়েই জলাশয়।

বন্দেমাতরমের নীচের তলার মাটিতে খানিকটা জল শুষবে—সে জল আমিও শুষ্‌ব, ঐ নায়েবও শুষবে—তারপরেও যেটা থাক্‌বে সেইটেই হল বন্দেমাতরং। এ'কে কপটতা বলে' গাল দিতে পারি কিন্তু এটা সত্য—এ'কে মান্‌তে হবে। পৃথিবীর সকল বড় কাজেরই তলায় একটা স্তর জমে যেটা কেবল পাঁক; মহা-সমুদ্রের নীচেও সেটা আছে।

তাই বড় কাজ করবার সময় এই পাঁকের দাবীর হিসেবটি ধরা চাই। অতএব নায়েব কিছু নেবে এবং আমারও কিছু প্রয়োজন আছে; সে প্রয়োজনটা বড় প্রয়োজনের অন্তর্গত,—কারণ, ঘোড়াই কেবল দানা খাবে তা নয়, চাকাতেও কিছু তেল দিতে হয়।

যাই হোক্ টাকা চাই। পঞ্চাশ হাজারের জন্যে সবুর করলে চল্‌বে না। এখনি যা পাওয়া যায় তাই সংগ্রহ করতে হবে। আমি জানি, এই সমস্ত জরুর যখন তাগিদ্ করে আখেরকে তখন ভাসিয়ে দিতে হয়। আজকের দিনের পাঁচ হাজার পশু দিনের পঞ্চাশ হাজারের অঙ্কুর মুড়িয়ে খায়। আমি ত তাই নিখিলকে বলি, যারা ত্যাগের রাস্তায় চলে তাদের লোভকে দমন করতেই হয় না, যারা লোভের রাস্তায় চলে পদে পদে তাদের লোভকে ত্যাগ করতে হয়। পঞ্চাশ হাজারকে আমি ত্যাগ করলুম, নিখিলের মাষ্টার মশায় চন্দ্রবাবুকে ওটা ত্যাগ করতে হয় না।

ছ'টা যে রিপু আছে তার মধ্যে প্রথম-দু'টো এবং শেষ-দু'টো হচ্চে পুরুষের, আর মাঝখানের দুটো হচ্চে কাপুরুষের। কামনা করব, কিন্তু লোভ থাক্‌বে না, মোহ থাকবে না। তা

থাক্‌লেই কামনা হল মাটি। মোহ জিনিষটা থাকে অতীতকে আর ভবিষ্যৎকে জড়িয়ে। বর্ত্তমানকে পথ ভোলাবার ওস্তাদ হচ্চে তারা। এখনি যেটা দরকার সেটাতে যারা মন দিতে পারেনি, যারা অন্য-কালের বাঁশি শুন্‌চে, তারা বিরহিণী শকুন্তলার মত; কাছের অতিথির হাঁক তারা শুন্‌তে পায় না, সেই শাপে দূরের যে অতিথিকে তারা মুগ্ধ হয়ে কামনা করে তাকে হারায়। যারা কামনার তপস্বা তাদেরই জন্যে মোহ-মুদ্গর। কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ।

সেদিন আমি বিমলার হাত চেপে ধরেছিলুম, তারি রেস্ ওর মনের মধ্যে বাজ্‌চে। আমার মনেও তার ঝঙ্কারটা থামে নি। এই রেস্-টুকুকে তাজা রেখে দিতে হবে। এইটেকেই যদি বারবার অভ্যস্ত করে' মোটা করে তুলি তাহলে এখন যেটা গানের উপর দিয়ে চল্‌চে তখন সেটা তর্কে এসে নাববে। এখন আমার কোনো কথায় বিমলা "কেন" জিজ্ঞাসা করবার ফাঁক পায় না। যে-সব মানুষের মোহ জিনিষটাতে দরকার আছে তাদের বরাদ্দ বন্ধ করে কি হবে? এখন আমার কাজের ভিড়—অতএব এখনকার মত রসের পেয়ালার এই উপরকার আমেজ পর্য্যন্তই থাক্, তলানি-পর্য্যন্ত গেলে গোলমাল বাধবে। যখন তার ঠিক সময় আস্‌বে তখন তাকে অবজ্ঞা করব না। হে কামী, লোভকে ত্যাগ কর, এবং মোহকে ওস্তাদের হাতের বীণাযন্ত্রের মত সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে তা'র মিহি তারে মীড় লাগাতে থাক।

এদিকে কাজের আসর আমাদের জমে উঠেছে। আমাদের দলবল ভিতরে ভিতরে ছড়িয়ে গেছে। ভাই-বেরাদর বলে

অনেক গলা ভেঙে শেষকালে এটা বুঝেছি গায়ে হাত বুলিয়ে কিছুতেই মুসলমানগুলোকে আমাদের দলে আনতে পারবো না। ওদের একেবারে নীচে দাবিয়ে দিতে হবে, ওদের জানা চাই জোর আমাদেরই হাতে। আজ ওরা আমাদের ডাক মানে না, দাঁত বের করে হাঁউ করে ওঠে, একদিন ওদের ভালুক নাচ নাচাব।

নিখিল বলে, ভারতবর্ষ যদি সত্যকার জিনিষ হয় তাহলে ওর মধ্যে মুসলমান আছে।

আমি বলি, তা হতে পারে, কিন্তু কোন্‌খানটাতে আছে তা জানা চাই এবং সেইখানটাতেই জোর করে ওদের বসিয়ে দিতে হবে—নইলে ওরা বিরোধ করবেই।

নিখিল বলে, বিরোধ বাড়িয়ে দিয়ে বুঝি তুমি বিরোধ মেটাতে চাও?

আমি বলি, তোমার প্ল্যান্‌ কি?

নিখিল বলে, বিরোধ মেটাবার একটি মাত্র পথ আছে।

আমি জানি, সাধুলোকের-লেখা গল্পের মত নিখিলের সব তর্কই শেষকালে একটা উপদেশে এসে ঠেকবেই। আশ্চর্য্য এই, এতদিন এই উপদেশ নিয়ে নাড়াচাড়া করচে কিন্তু আজও এগুলোকে ও নিজেও বিশ্বাস করে! সাধে আমি বলি, নিখিল হচ্চে একেবারে জন্ম-স্কুল-বয়্‌! গুণের মধ্যে, ও খাঁটি মাল। চাঁদ সদাগরের মত ও অবাস্তবের শিবমন্ত্র নিয়েচে, বাস্তবের সাপের দংশনকে ও মরেও মান্‌তে চায় না। মুস্কিল এই, এদের কাছে মরাটা শেষ প্রমাণ নয়, ওরা চক্ষু বুজে ঠিক করে রেখেচে তার উপরেও কিছু আছে।

অনেকদিন থেকে আমার মনে একটি প্ল্যান আছে; সেটা যদি খাটাবার সুযোগ পাই তাহলে দেখ্‌তে দেখ্‌তে সমস্ত দেশে আগুন লেগে যাবে। দেশকে চোখে দেখ্‌তে না পেলে আমাদের দেশের লোক জাগ্‌বে না। দেশের একটা দেবী-প্রতিমা চাই। কথাটা আমার বন্ধুদের মনে লেগেছিল, তারা বল্লে, আচ্ছা, একটা মূর্ত্তি বানানো যাক্। আমি বল্লুম, আমরা বানালে চল্‌বে না, যে-প্রতিমা চলে আস্‌চে তাকেই আমাদের স্বদেশের প্রতিমা করে তুল্‌তে হবে। পূজার পথ আমাদের দেশে গভীর করে' কাটা আছে, সেই রাস্তা দিয়েই আমাদের ভক্তির ধারাকে দেশের দিকে টেনে আন্‌তে হবে।

এই নিয়ে নিখিলের সঙ্গে কিছুকাল পূর্ব্বে আমার খুব তর্ক হয়ে গেছে। নিখিল বল্লে, যে কাজকে সত্য বলে শ্রদ্ধা করি তাকে সাধন করবার জন্যে মোহকে দলে টানা চল্‌বে না। •

আমি বল্লুম, মিষ্টান্নমিতরেজনাঃ, মোহ নইলে ইতর লোকের চলেই না; আর পৃথিবীর বারো-আনা-ভাগ ইতর। সেই মোহকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যেই সকল দেশে দেবতার সৃষ্টি হয়েচে—মানুষ আপনাকে চেনে।

নিখিল বল্লে, মোহকে ভাঙবার জন্যেই দেবতা। রাখবার জন্যে অপদেবতা।

আচ্ছা বেশ, অপদেবতাই সই, সেটাকে নইলে কাজ এগোয় না। দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে মোহটা খাড়াই আছে, তাকে সমানে খোরাক দিচ্চি অথচ তার. কাছ থেকে কাজ আদায় করচিনে এই দেখনা, ব্রাহ্মণকে ভূদেব বলচি, তার পায়ের

ধূলো নিচ্চি, দান-দক্ষিণেরও অন্ত নেই, অথচ এত বড় একটা তৈরি জিনিষকে বৃথা নষ্ট হতে দিচ্চি, কাজে লাগাচ্চিনে। ওদের ক্ষমতাটা যদি পূরো ওদের হাতে দেওয়া যায় তাহলে সেই ক্ষমতা দিয়ে যে আমরা আজ অসাধ্য সাধন করতে পারি। কেননা, পৃথিবীতে একদল জীব আছে তারা পদতলচর, তাদের সংখ্যাই বেশি; তারা কোনো কাজই করতে পারে না যদি না নিয়মিত পায়ের ধূলো পায়, তা পিঠেই হোক্ আর মাথাতেই হোক্। এদের খাটাবার জন্যেই মোহ একটা মস্ত শক্তি। সেই শক্তি-শেলগুলোকে এতদিন আমাদের অস্ত্রশালায় শান দিয়ে এসেচি, আজ সেটা হানবার দিন এসেচে আজ কি তাদের সরিয়ে ফেল্‌তে পারি?

কিন্তু নিখিলকে এ সব কথা বোঝানো ভারি শক্ত। সত্য জিনিষটা ওর মনে একটা নিছক প্রেজুডিসের মত দাঁড়িয়ে গেছে। যেন সত্য বলে কোনো একটা বিশেষ পদার্থ আছে। আমি ওকে কতবার বলেছি, যেখানে মিথ্যাটা সত্য সেখানে মিথ্যাই সত্য। আমাদের দেশ এই কথাটা বুঝত বলেই অসঙ্কোচে বল্‌তে পেরেচে অজ্ঞানীর পক্ষে মিথ্যাই সত্য। সেই মিথ্যা থেকে ভ্রষ্ট হলেই সত্য থেকে সে ভ্রষ্ট হবে। দেশের প্রতিমাকে যে-লোক সত্য বলে' মান্‌তে পারে দেশের প্রতিমা তার মধ্যে সত্যের মতই কাজ করবে। আমাদের যে-রকমের স্বভাব কিম্বা সংস্কার তাতে আমরা দেশকে সহজে মানতে পারিনে কিন্তু দেশের প্রতিমাকে অনায়াসে মান্‌তে পারি। এটা যখন জানা কথা, তখন যারা কাজ উদ্ধার করতে চায় তারা এইটে বুঝেই কাজ করবে।

নিখিল হঠাৎ ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠে বল্লে, সত্যের সাধনা করবার শক্তি তোমরা খুইয়েচ বলেই, তোমরা হঠাৎ আকাশ থেকে একটা মস্ত ফল পেতে চাও। তাই শত শত বৎসর ধরে দেশের যখন সকল কাজই বাকী তখন তোমরা দেশকে দেবতা বানিয়ে বর পাবার জন্যে হাত পেতে বসে রয়েচ।

আমি বল্লুম, অসাধ্য সাধন করা চাই, সেই জন্যই দেশকে দেবতা করা দরকার।

নিখিল বল্লে, অর্থাৎ সাধ্যের সাধনায় তোমাদের মন উঠচে না। যা-কিছু আছে সমস্ত এম্‌নিই থাক্‌বে কেবল তার ফলটা হবে আজগুবি!

আমি বল্লুম, নিখিল, তুমি যা বল্‌চ, ওগুলো উপদেশ। একটা বিশেষ বয়সে ওর দরকার থাক্‌তে পারে, কিন্তু মানুষের যখন দাঁত ওঠে তখন ও চল্‌বে না। স্পষ্টই চোখের সাম্‌নে দেখতে পাচ্চি, কোনোদিন স্বপ্নেও যার আবাদ করিনি সেই ফসল হুহু করে' ফলে উঠচে—কিসের জোরে? আজ দেশকে দেবতা বলে মনের মধ্যে দেখতে পাচ্চি বলে। এইটেকেই মূর্ত্তি দিয়ে চিরন্তন করে তোলা এখনকার প্রতিভার কাজ। প্রতিভা তর্ক করে না, সৃষ্টি করে। আজ দেশ যা ভাবচে, আমি তাকে রূপ দেব। আমি ঘরে ঘরে গিয়ে বলে বেড়াব, দেবী আমাকে স্বপ্নে দেখা দিয়েচেন, তিনি পূজো চান। আমরা ব্রাহ্মণদের গিয়ে বল্‌ব, দেবীর পূজারি তোমরাই—সেই পূজো বন্ধ আছে বলেই তোমরা নাবতে বসেচ। তুমি বল্‌বে, আমি মিথ্যা বল্‌চি! না, এ সত্য,—আমার মুখ থেকে এই কথাটি

শোন্‌বার জন্যে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ লোক অপেক্ষা করে রয়েচে, সেই জন্যেই বল্‌চি এ কথা সত্য! যদি আমার বাণী আমি প্রচার করতে পারি তাহলে তুমি দেখতে পাবে এর আশ্চর্য্য ফল!

নিখিল বল্লে, আমার আয়ু কত দিনইবা! তুমি যে ফল দেশের হাতে তুলে দেবে, তারো পরের ফল আছে, সেটা হয়ত এখন দেখা যাবে না।

আমি বল্লুম, আমি আজকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই আমার।

নিখিল বল্লে, আমি কালকের দিনের ফলটা চাই, সেই ফলটাই সকলের।

আসল কথা, বাঙালীর যে-একটা বড় ঐশ্বর্য্য আছে, কল্পনাবৃত্তি, সেটা হয়ত নিখিলের ছিল কিন্তু বাইরের থেকে একটা ধর্ম্মবৃত্তির বনস্পতি বড় হয়ে উঠে ওটাকে নিজের আওতায় মেরে ফেল্লে বলে। ভারতবর্ষে এই যে দুর্গা, জগদ্ধাত্রীর পূজা বাঙালী উদ্ভাবন করেচে এইটেতে সে নিজের আশ্চর্য্য পরিচয় দিয়েচে। আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, এ দেবী পোলিটিকাল দেবী। মুসলমানের শাসনকালে বাঙালী যে দেশ-শক্তির কাছ থেকে শত্রুজয়ের বর কামনা করেছিল এ দুই দেবী তারই দুই রকমের মূর্ত্তি। সাধনার এমন আশ্চর্য্য বাহ্যরূপ ভারতবর্ষের আর কোন্ জাত গড়তে পেরেচে?

কল্পনার দিব্যদৃষ্টি নিখিলের একেবারেই অন্ধ হয়ে গেছে বলেই সে আমাকে অনায়াসে বল্‌তে পারলে, মুসলমান-শাসনে বর্গি বল,

শিখ বল, নিজের হাতে অস্ত্র নিয়ে ফল চেয়েছিল, বাঙালী তার দেবীমূর্ত্তির হাতে অস্ত্র দিয়ে মন্ত্র পড়ে' ফল কামনা করেছিল, কিন্তু দেশ দেবী নয়, তাই, ফলের মধ্যে কেবল ছাগমহিষের মুণ্ডপাত হল। যেদিন কল্যাণের পথে দেশের কাজ করতে থাকব, সেই দিনই যিনি দেশের চেয়ে বড়, যিনি সত্য দেবতা, তিনি সত্য ফল দেবেন।

মুস্কিল হচ্চে, কাগজে কলমে লিখ্‌লে নিখিলের কথা শোনায় ভালো—কিন্তু আমার কথা কাগজে লেখবার নয়, লোহার খন্তা দিয়ে দেশের বুক চিরে চিরে লেখবার। পণ্ডিত যে রকম কৃষিতত্ত্ব ছাপার কালিতে লেখে, সে রকম নয়, লাঙলের ফলা দিয়ে চাষী যে রকম মাটির বুকে আপনার কামনা অঙ্কিত করে সেই রকম।

বিমলার সঙ্গে যখন আমার দেখা হল, আমি বল্লুম, যে-দেবতার সাধনা করবার জন্য লক্ষ যুগের পর পৃথিবীতে এসেছি তিনি যতক্ষণ আমাকে প্রত্যক্ষ না দেখা দিয়েছেন, ততক্ষণ তাঁকে আমার সমস্ত দেহ মন দিয়ে কি বিশ্বাস করতে পেরেচি? তোমাকে যদি না দেখতুম তাহলে আমার সমস্ত দেশকে আমি এক করে দেখতে পেতুম না, একথা আমি তোমাকে কতবার বলেছি, জানিনে তুমি আমার কথা ঠিক বুঝতে পার কি না। একথা বোঝানো ভারি শক্ত যে, দেবলোকে দেবতারা থাকেন অদৃশ্য, মর্ত্ত্য লোকেই তাঁরা দেখা দেন।

বিমলা একরকম করে আমার দিকে চেয়ে বল্লে, তোমার কথা খুব স্পষ্টই বুঝতে পেরেচি।—এই-প্রথম বিমলা আমাকে "আপনি" না বলে "তুমি" বল্লে।

আমি বল্লুম, অর্জ্জুন যে-কৃষ্ণকে তাঁর সামান্য সারথিরূপে সর্ব্বদা দেখতেন তাঁরও একটি বিরাটরূপ ছিল, সেও একদিন অর্জ্জুন দেখেছিলেন ;—তখন তিনি পুরো সত্য দেখেছিলেন। আমার সমস্ত দেশের মধ্যে আমি তোমার সেই বিরাট রূপ দেখেছি। তোমারই গলায় গঙ্গা ব্রহ্মপুত্রের সাতনলী হার ; তোমারি কালো চোখের কাজল-মাখা পল্লব আমি দেখতে পেয়েছি নদীর নীল জলের বহু দূরপারের বনরেখার মধ্যে ; আর কচি ধানের ক্ষেতের উপর দিয়ে তোমার ছায়া-আলোর রঙিন ডুরে শাড়িটি লুটিয়ে লুটিয়ে যায় ; আর তোমার নিষ্ঠুর তেজ দেখেচি জ্যৈষ্ঠের যে-রৌদ্রে সমস্ত আকাশটা যেন মরুভূমির সিংহের মত লাল জিব্ বের করে দিয়ে হা হা করে শ্বস্‌তে থাকে! দেবী যখন তাঁর ভক্তকে এমন আশ্চর্য্যরকম করে দেখা দিয়েচেন তখন তাঁরি পূজা আমি আমার সমস্ত দেশে প্রচার করব, তবে আমার দেশের লোক জীবন পাবে। "তোমারি মুরতি গড়ি মন্দিরে মন্দিরে!" কিন্তু সে কথা সকলে স্পষ্ট করে বোঝেনি। তাই আমার সঙ্কল্প সমস্ত দেশকে ডাক দিয়ে আমার দেবীর মূর্ত্তিটি নিজের হাতে গড়ে' এমন করে' তার পূজো দেব যে, কেউ তাকে আর অবিশ্বাস করতে পারবে না। তুমি আমাকে সেই বর দাও, সেই তেজ দাও!

বিমলার চোখ বুজে এল। সে যে-আসনে বসেছিল সেই আসনের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে যেন পাথরের মূর্ত্তির মতই স্তব্ধ হয়ে রইল। আমি আর খানিকটা বল্লেই সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেত। খানিক পরে সে চোখ মেলে বলে উঠল,—ওগো প্রলয়ের পথিক, তুমি পথে বেরিয়েচ, তোমার পথে বাধা দেয় এমন সাধ্য কারো নেই।

আমি যে দেখতে পাচ্চি আজ তোমার ইচ্ছার বেগ কেউ সাম্‌লাতে পারবে না। রাজা আস্‌বে, তোমার পায়ের কাছে তার রাজদণ্ড ফেলে দিতে, ধনী আস্‌বে তার ভাণ্ডার তোমার কাছে উজাড় করে দেবার জন্যে, যাদের আর কিছুই নেই তারাও কেবলমাত্র মরবার জন্য তোমার কাছে এসে সেধে পড়বে। ভালো মন্দর বিধি বিধান সব ভেসে যাবে, সব ভেসে যাবে! রাজা আমার, দেবতা আমার, তুমি আমার মধ্যে যে কি দেখেচ তা জানিনে, কিন্তু আমি আমার এই হৃৎপদ্মের উপরে তোমার বিশ্বরূপ যে দেখলুম। তার কাছে আমি কোথায় আছি! সর্ব্বনাশ গো সর্ব্বনাশ, কি তার প্রচণ্ড শক্তি! যতক্ষণ সে আমাকে না সম্পূর্ণ মেরে ফেল্‌বে ততক্ষণ আমি ত আর বাঁচিনে, আমি ত আর পারিনে, আমার যে বুক ফেটে গেল।

বল্‌তে বল্‌তে সে চৌকির উপর থেকে মাটির উপর পড়ে গিয়ে আমার দুই পা জড়িয়ে ধরলে। তার পরে ফুলে' ফুলে' কান্না কান্না কান্না!

এই ত হিপ্‌নটিজ্‌ম! এই শক্তিই পৃথিবী জয় করবার শক্তি। কোনো উপায় নয়, উপকরণ নয়, এই সম্মোহন! কে বলে সত্যমেব জয়তে! জয় হবে মোহের।—বাঙালী সে কথা বুঝেছিল, তাই বাঙালী এনেছিল দশভূজার পূজা, বাঙালী গড়েছিল সিংহ-বাহিনীর মূর্ত্তি। সেই বাঙালী আবার আজ মূর্ত্তি গড়বে, জয় করবে বিশ্ব কেবল সম্মোহনে—বন্দেমাতরং!

আস্তে আস্তে হাতে ধরে বিমলাকে চৌকির উপরে উঠিয়ে বসালুম। এই উত্তেজনার পরে অবসাদ আসবার আগেই তাকে

বল্লুম, বাংলা দেশে মায়ের পূজা প্রতিষ্ঠা করবার ভার তিনি আমার উপরেই দিয়েচেন, কিন্তু আমি যে গরীব।

বিমলার মুখ তখনো লাল, চোখ তখনো বাষ্পে ঢাকা; সে গদ্‌গদ কণ্ঠে বল্লে, তুমি গরীব কিসের? যার যা-কিছু আছে সব যে তোমারি। কিসের জন্যে বাক্স ভরে আমার গয়না জমে রয়েচে? আমার সমস্ত সোনা-মাণিক তোমার পূজোয় নাও না কেড়ে, আমার কিছুই দরকার নেই।

এর আগে আর-একবার বিমলা গয়না দিতে চেয়েছিল—আমার কিছুতে বাধে না, ঐখানটায় বাঁধল। সঙ্কোচটা কিসের আমি ভেবে দেখেচি। চিরদিন পুরুষই মেয়েকে গয়না দিয়ে সাজিয়ে এসেচে, মেয়ের হাত থেকে গয়না নিতে গেলে কেমন যেন পৌরুষে ঘা পড়ে।

কিন্তু এখানে নিজেকে ভোলা চাই। আমি নিচ্চিনে। এ মায়ের পূজা, সমস্তই সেই পূজায় ঢাল্‌ব। এমন সমারোহ করে করতে হবে যে তেমন পূজা এদেশে কেউ কোনো দিন দেখেনি! চিরদিনের মত নূতন বাংলার ইতিহাসের মর্ম্মের মাঝখানে এই পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। এই পূজাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠদানরূপে দেশকে দিয়ে যাব। দেবতার সাধনা করে দেশের মূর্খেরা, দেবতার সৃষ্টি করবে সন্দীপ।

এ ত গেল বড় কথা। কিন্তু ছোট কথাও যে পাড়তে হবে। আপাতত অন্তত তিন হাজার টাকা না হলে ত চল্‌বেই না, পাঁচ হাজার হলেই বেশ সুডোল ভাবে চলে। কিন্তু এতবড় উদ্দীপনার মুখে হঠাৎ এই টাকার কথাটা কি বলা চলে? কিন্তু আর সময় নেই।

সঙ্কোচের বুকে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে বলে ফেল্লুম,—রাণী, এদিকে আমা ভাণ্ডার শূন্য হয়ে এল, কাজ বন্ধ হয় বলে'!

অমনি বিমলার মুখে একটা বেদনার কুঞ্চন দেখা দিলে। আমি বুঝলুম, বিমলা ভাবচে, আমি এখনই বুঝি সেই পঞ্চাশ হাজার দাবী করচি। এই নিয়ে ওর বুকের উপর পাথর চেপে রয়েচে—বোধ হয় সারারাত ভেবেচে, কিন্তু কোনো কিনারা পায়নি। প্রেমের পূজার আর কোনো উপচার ত হাতে নেই, হৃদয়কে ত স্পষ্ট করে আমার পায়ে ঢেলে দিতে পারচে না, সেই জন্যে ওর মন চাচ্চে এই মস্ত একটা টাকাকে ওর অবরুদ্ধ আদরের প্রতিরূপ করে আমার কাছে এনে দিতে। কিন্তু কোনো রাস্তা না পেয়ে ওর প্রাণ হাঁপিয়ে উঠচে। ওর ঐ কষ্টটা আমার বুকে লাগচে। ওযে এখন সম্পূর্ণ আমারি; উপ্‌ড়ে তোলবার দুঃখ এখন ত আর দরকার নেই, এখন ওকে অনেক যত্নে বাঁচিয়ে রাখতে হবে।

আমি বল্‌লুম, রাণী, এখন সেই পঞ্চাশ হাজারের বিশেষ দরকার নেই, হিসেব করে' দেখচি পাঁচ হাজার, এমন কি তিন হাজার হলেও চলে যাবে।

হঠাৎ টানটা কমে গিয়ে বিমলার হৃদয় একেবারে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সে যেন একটা গানের মত বল্‌লে, পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব!

যে সুরে রাধিকা গান গেয়েছিল—

বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল
স্বর্গে মর্ত্ত্যে তিন ভুবনে নাইক যাহার মূল।
বাঁশির ধ্বনি হাওয়ায় ভাসে,
সবার কানে বাজ্‌বে না সে,
দেখ্‌লো চেয়ে যমুনা ঐ ছাপিয়ে গেল কূল!

এ ঠিক সেই সুরই, আর সেই গানই, আর সেই একই কথা—"পাঁচ হাজার তোমাকে এনে দেব।" "বঁধুর লাগি কেশে আমি পরব এমন ফুল!" বাঁশির ভিতরকার ফাঁকটি সরু বলেই, চারদিকে তার বাধা বলেই, এমন সুর—অতিলোভের চাপে বাঁশিটি যদি ভেঙে আজ চ্যাপ্‌টা করে দিতুম, তাহলে শোনা যেত,—কেন, এত টাকায় তোমার দরকার কি? আর আমি মেয়েমানুষ অত টাকা পাবই বা কোথা? ইত্যাদি ইত্যাদি। রাধিকার গানের সঙ্গে তার একটি অক্ষরও মিল্‌ত না। তাই বল্‌চি, মোহটাই হল সত্য,—সেইটেই বাঁশি, আর মোহ বাদ দিয়ে সেটা হচ্চে ভাঙা বাঁশির ভিতরকার ফাঁক—সেই অত্যন্ত নির্ম্মল শূন্যতাটা যে কি তার আস্বাদ নিখিল আজকাল কিছু পেয়েচে, ওর মুখ দেখ্‌লেই সেটা বোঝা যায়। আমার মনেও কষ্ট লাগে। কিন্তু নিখিলের বড়াই, ও সত্যকে চায়, আমার বড়াই, আমি মোহটাকে পারৎপক্ষে হাত থেকে ফস্‌কাতে দেব না। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী—অতএব এ নিয়ে দুঃখ করে কি হবে?

বিমলার মনটাকে সেই উপরের হাওয়াতেই উড়িয়ে রাখবার জন্য পাঁচ হাজার টাকা সংক্ষেপে সেরে ফেলে ফের আবার সেই মহিষমর্দ্দিনীর পূজোর মন্ত্রণায় বসে গেলুম। পূজোটা হবে কবে এবং কখন? নিখিলের এলাকায় রুইমারীতে অঘ্রাণের শেষে যে হোসেনগাজির মেলা হয়, সেখানে লক্ষ লক্ষ লোক আসে, সেইখানে পূজোটা যদি দেওয়া যায় তাহলে খুব জমাট হয়। বিমলা উৎসাহিত হয়ে উঠল। ও মনে করলে এ ত বিলিতি কাপড় পোড়ানো নয়, লোকের ঘর জ্বালানো নয়, এতবড় সাধু প্রস্তাবে

নিখিলের কোনো আপত্তি হবে না। আমি মনে মনে হাস্‌লুম,— যারা ন বছর দিন রাত্তির এক-সঙ্গে কাটিয়েচে, তারাও পরস্পরকে কত অল্প চেনে! কেবল ঘরকন্নার কথাটুকুতেই চেনে, ঘরের বাইরের কথা যখন হঠাৎ উঠে পড়ে তখন তারা আর থই পায় না। ওরা ন বছর ধরে ঘরে বসে বসে এই কথাটাই ক্রমাগত বিশ্বাস করে এসেচে যে, ঘরের সঙ্গে বাইরের অবিকল মিল বুঝি আছেই, আজ ওরা বুঝতে পারচে কোনোদিন যে-দুটোকে মিলিয়ে নেওয়া হয়নি আজ তারা হঠাৎ মিলে যাবে কি করে?

যাক্, যারা ভুল বুঝেছিল তারা ঠেকতে ঠেকতে ঠিক করে বুঝে নিক্ তা নিয়ে আমার বেশি চিন্তা করবার দরকার নেই। বিমলাকে ত এই উদ্দীপনার বেগে বেলুনের মত অনেকক্ষণ উড়িয়ে রাখা সম্ভব নয়, অতএব এই হাতের কাজটা যত শীঘ্র পারা যায় সেরে নিতে হচ্চে। বিমলা যখন চৌকি থেকে উঠে দরজা পর্য্যন্ত গেছে আমি নিতান্ত যেন উড়ো রকম ভাবে বল্লুম, রাণী, তাহলে টাকাটা কবে—

বিমলা ফিরে দাঁড়িয়ে বল্লে, এই মাসের শেষে মাসকাবারের সময়—

আমি বল্লুম, না, দেরি হলে চল্‌বে না।

তোমার কবে চাই?

কালই।

আচ্ছা কালই এনে দেব।

নিখিলেশের আত্মকথা

আমার নামে কাগজে প্যারাগ্রাফ এবং চিঠি বেরতে সুরু

হয়েচে—শুনৃচি একটা ছড়া এবং ছবি বেরবে তারও উদ্যোগ হচ্চে। রসিকতার উৎস খুলে গেছে, সেই সঙ্গে অজস্র মিথ্যে কথার ধারাবর্ষণে সমস্ত দেশ একেবারে পুলকিত। জানে যে এই পঙ্কিল রসের হোরিখেলায় পিচ্‌কিরিটা তাদেরই হাতে—আমি ভদ্রলোক রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলেচি, আমার গায়ের আবরণখানা সাদা রাখবার উপায় নেই।

লিখেছে, আমার এলেকায় আপামর সাধারণ সকলেই স্বদেশীর জন্যে একেবারে উৎসুক হয়ে রয়েচে কেবল আমার ভয়েই কিছু করতে পারচে না,—দুই একজন সাহসী যারা দিশি জিনিষ চালাতে চায়, জমিদারী চালে আমি তাদের বিধিমতে উৎপীড়ন করচি। পুলিসের সঙ্গে আমার তলে তলে যোগ আছে, ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে আমি গোপনে চিঠি চালাচালি করচি এবং বিশ্বস্তসূত্রে খবরের কাগজ খবর পেয়েচে যে, পৈতৃক খেতাবের উপরেও স্বোপার্জ্জিত খেতাব যোগ করে দেবার জন্যে আমার আয়োজন ব্যর্থ হবে না। লিখেচে, "স্বনামা পুরুষো ধন্য, কিন্তু দেশের লোক বিনামার ফরমাস দিয়াছে, সে খবরও আমরা রাখি!"—আমার নামটা স্পষ্ট করে দেয় নি, কিন্তু বাইরের অস্পষ্টতার ভিতর থেকে সেটা খুব বড় করে ফুটে উঠেচে।

এদিকে মাতৃবৎসল হরিশকুণ্ডুর গুণগান করে কাগজে চিঠির পর চিঠি বেরচ্চে। লিখেচে, মায়ের এমন সেবক দেশে যদি বেশি থাকৃত তাহলে এতদিনে ম্যাঞ্চেষ্টারের কারখানা-ঘরের চিম্‌নিগুলো পর্য্যন্ত বন্দেমাতরমের সুরে সমস্বরে রামশিঙে ফুঁকৃতে থাকৃত।

এদিকে আমার নামে লাল কালীতে লেখা একখানা চিঠি

এসেচে, তাতে খবর দিয়েচে কোথায় কোথায় কোন্ কোন্ লিভার-পুলের নিমকহালাল জমিদারের কাছারি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েচে। বলেচে, ভগবান পাবক এখন থেকে এই পাবনের কাজে লাগলেন ; মায়ের যারা সন্তান নয় তারা যাতে মায়ের কোল জুড়ে থাক্‌তে না পারে তার ব্যবস্থা হচ্চে।

নাম সই করেচে, "মায়ের কোলের অধমসরিক, শ্রীঅম্বিকাচরণ গুপ্ত।"

আমি জানি, এ সমস্তই আমার এখানকার সব ছাত্রদের রচনা। আমি ওদের দুই-একজনকে ডেকে সেই চিঠিখানা দেখালুম। বি, এ, গম্ভীর ভাবে বল্লে, আমরাও শুনেচি, দেশে একদল লোক মরিয়া হয়ে রয়েচে স্বদেশীর বাধা দূর করতে তারা না করতে পারে এমন কাজ নেই।

আমি বল্লুম, তাদের অন্যায় জবরদস্তিতে দেশের একজন লোকও যদি হার মানে তাহলে সেটাতে সমস্ত দেশের পরাভব।

ইতিহাসে এম্, এ, বল্লেন, বুঝতে পারচি নে।

আমি বল্লুম, আমাদের দেশ, দেবতাকে থেকে পেয়াদাকে পর্য্যন্ত ভয় করে করে আধমরা হয়ে রয়েচে, আজ তোমরা মুক্তির নাম করে সেই জুজুর ভয়কে ফের আর-এক নামে যদি দেশে চালাতে চাও, অত্যাচারের দ্বারা কাপুরুষতাটার উপরে যদি তোমাদের দেশের জয়ধ্বজা রোপন করতে চাও তাহলে দেশকে যারা ভালোবাসে তারা সেই ভয়ের শাসনের কাছে এক চুল মাথা নীচু করবে না!

ইতিহাসে এম্, এ, বল্লেন, এমন কোন্ দেশ আছে যেখানে রাজ্যশাসন ভয়ের শাসন নয়?

আমি বল্লুম, এই ভয়ের শাসনের সীমা কোন্ পর্য্যন্ত সেইটের দ্বারাই দেশের মানুষ কতটা স্বাধীন জানা যায়। ভয়ের শাসন যদি চুরি ডাকাতি এবং পরের প্রতি অন্যায়ের উপরেই টানা যায় তাহলে বোঝা যায় যে প্রত্যেক মানুষকে অন্য মানুষের আক্রমণ থেকে স্বাধীন করবার জন্যেই এই শাসন। কিন্তু মানুষ নিজে কি কাপড় পরবে, কোন্ দোকান থেকে কিন্‌বে, কি খাবে, কার সঙ্গে বসে খাবে এও যদি ভয়ের শাসনে বাঁধা হয় তাহলে মানুষের ইচ্ছাকে একেবারে গোড়া-ঘেঁষে অস্বীকার করা হয়। সেটাই হল মানুষকে মনুষ্যত্ব থেকে বঞ্চিত করা।

ইতিহাসে এম, এ, বল্লেন, অন্য দেশের সমাজেও কি মানুষের ইচ্ছাকে গোড়া-ঘেঁসে কাটবার কোথাও কোনো ব্যবস্থা নেই?

আমি বল্লুম, কে বল্লে নেই? মানুষকে নিয়ে দাসব্যবসা যে-দেশে যে-পরিমাণে আছে সে-পরিমাণেই মানুষ আপনাকে নষ্ট করচে।

এম্, এ, বল্লেন, তাহলে ঐ দাসব্যবসাটা মানুষেরই ধর্ম্ম, ওটাই মনুষ্যত্ব।

বি, এ, বল্লেন, সন্দীপবাবু এ সম্বন্ধে সেদিন যে দৃষ্টান্ত দিলেন সেটা আমাদের মনে খুব লেগেছে! এই যে ওপারে হরিশকুণ্ডু আছেন জমিদার, কিম্বা সান্‌কিভাঙার চক্রবর্ত্তীরা, ওঁদের সমস্ত এলেকা ঝাঁট দিয়ে আজ একছটাক বিলিতি নুন পাবার জো নেই। কেন? কেননা বরাবরই ওঁরা জোরের উপরে চলেচেন;—যারা স্বভাবতই দাস, প্রভু না থাকাটাই হচ্চে তাদের সকলের চেয়ে বড় বিপদ।

এফ, এ, প্লাক্‌ড্ ছোকরাটি বল্লে, একটা ঘটনা জানি, চক্রবর্ত্তীদের একটি কায়স্থ প্রজা ছিল। সে তার একটা হাট নিয়ে চক্রবর্ত্তীদের কিছুতে মান্‌ছিল না। মাম্‌লা করতে করতে শেষকালে তার এমন দশা হল যে খেতে পায় না। যখন দুদিন তার ঘরে হাঁড়ি চড়্‌ল না তখন স্ত্রীর রূপোর গয়না বেচতে বেরল; এই তার শেষ সম্বল। জমিদারের শাসনে গ্রামের কেউ তার গয়না কিন্‌তেও সাহস করে না। জমিদারের নায়েব বল্লে, আমি কিন্‌ব, পাঁচ টাকা দামে। দাম তার টাকা ত্রিশ হবে। প্রাণের দায়ে পাঁচ টাকাতেই যখন সে রাজি হল তখন তার গয়নার পুঁটুলি নিয়ে নায়েব বল্লে, এই পাঁচ টাকা তোমার খাজনা বাকিতে জমা করে নিলুম।—এই কথা শুনে আমরা সন্দীপবাবুকে বলেছিলুম, চক্রবর্ত্তীকে আমরা বয়কট করব। সন্দীপবাবু বল্লেন, এই সমস্ত জ্যান্ত লোককেই যদি বাদ দাও তাহলে কি ঘাটের মড়া নিয়ে দেশের কাজ করবে? এরা প্রাণপণে ইচ্ছে করতে জানে; এরাই ত প্রভু। যারা ষোল আনা ইচ্ছে করতে জানে না, তারা, হয় এদের ইচ্ছেয় চল্‌বে, নয় এদের ইচ্ছেয় মরবে। তিনি আপনার সঙ্গে তুলনা করে বল্লেন, আজ চক্রবর্ত্তীর এলেকায় একটি মানুষ নেই যে, স্বদেশী নিয়ে টুঁ শব্দটি করতে পারে—অথচ নিখিলেশ হাজার ইচ্ছে করলেও স্বদেশী চালাতে পারবেন না।

আমি বল্লুম, আমি স্বদেশীর চেয়ে বড় জিনিস চালাতে চাই, সেইজন্যে স্বদেশী চালানো আমার পক্ষে শক্ত। আমি মরা খুঁটি চাইনে ত, আমি জ্যান্ত গাছ চাই। আমার কাজে দেরী হবে।

ঐতিহাসিক হেসে বল্লে, আপনি মরা খুঁটিও পাবেন না, জ্যান্ত

গাছও পাবেন না। কেননা, সন্দীপবাবুর কথা আমি মানি—পাওয়া মানেই কেড়ে নেওয়া। একথা শিখতে আমাদের সময় লেগেছে, কেননা, এগুলো ইস্কুলের শিক্ষার উল্টো শিক্ষা। আমি নিজের চোখে দেখেছি, কুণ্ডুদের গোমস্তা গুরুচরণ ভাদুড়ি টাকা আদায় করতে বেরিয়েছিল—একটা মুসলমান প্রজার বেচে কিনে নেবার মত কিছু ছিল না। ছিল তার যুবতী স্ত্রী। ভাদুড়ি বল্লে, তোর বউকে নিকে দিয়ে টাকা শোধ করতে হবে। নিকে করবার উমেদার জুটে গেল, টাকাও শোধ হল। আপনাকে বলচি, স্বামীটার চোখের জল দেখে' আমার রাত্রে ঘুম হয়নি, কিন্তু যতই কষ্ট হোক্ আমি এটা শিখেচি যে, যখন টাকা আদায় করতেই হবে তখন, যে-মানুষ ঋণীর স্ত্রীকে বেচিয়ে টাকা সংগ্রহ করতে পারে, মানুষ-হিসেবে সে আমার চেয়ে বড়;—আমি পারিনে, আমার চোখে জল আসে, তাই সব ফেঁসে যায়। আমার দেশকে কেউ যদি বাঁচায় তবে এই সব গোমস্তা, এই সব কুণ্ডু, এই সব চক্রবর্ত্তীরা!

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম, বল্লুম, তাই যদি হয়, তবে এই সব গোমস্তা, এই সব কুণ্ডু, এই সব চক্রবর্ত্তীদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার কাজই আমার। দেখ, দাসত্বের যে বিষ মজ্জার মধ্যে আছে সেইটেই যখন সুযোগ পেয়ে বাইরে ফুটে ওঠে তখনি সেটা সাংঘাতিক দৌরাত্ম্যের আকার ধরে। বউ হয়ে যে মার খায় শাশুড়ি হয়ে সেই সব চেয়ে বড় মার মারে। সমাজে যে-মানুষ মাথা হেঁট করে থাকে সে যখন বরযাত্র হয়ে বেরয় তখন তার উৎপাতে মানী গৃহস্থর মান রক্ষা করা অসাধ্য। ভয়ের শাসনে

তোমরা নির্ব্বিচারে কেবলি সকল-তা'তেই সকলকে মেনে এসেচ, সেইটেকেই ধর্ম্ম বল্‌তে শিখেচ, সেই জন্যেই আজকে অত্যাচার করে সকলকে মানানোটাকেই তোমরা ধর্ম্ম বলে মনে করচ। আমার লড়াই দুর্ব্বলতার ঐ নিদারুণতার সঙ্গে!

আমার এসব কথা অত্যন্ত সহজ কথা—সরল লোককে বল্‌লে বুঝতে তার মুহূর্ত্তমাত্র দেরী হয় না, কিন্তু আমাদের দেশে যে-সব এম্, এ, ঐতিহাসিক বুদ্ধির প্যাঁচ কষচে সত্যকে পরাস্ত করবার জন্যেই তাদের প্যাঁচ।

এদিকে পঞ্চুর জাল মামীকে নিয়ে ভাবচি। তাকে অপ্রমাণ করা কঠিন। সত্য ঘটনার সাক্ষির সংখ্যা পরিমিত, এমন কি, সাক্ষি না থাকাও অসম্ভব নয় কিন্তু যে ঘটনা ঘটেনি জোগাড় করতে পারলে তার সাক্ষির অভাব হয় না। আমি যে মৌরসী স্বত্ব পঞ্চুর কাছ থেকে কিনেচি সেইটে কাঁচিয়ে দেবার এই ফন্দি।

আমি নিরুপায় দেখে ভাবছিলুম পঞ্চুকে আমার নিজ এলাকাতেই জমি দিয়ে ঘরবাড়ি করিয়ে দিই। কিন্তু মাষ্টার মশায় বল্লেন, অন্যায়ের কাছে সহজে হার মান্‌তে পারব না। আমি নিজে চেষ্টা দেখব।

আপনি চেষ্টা দেখবেন?

হাঁ আমি।

এ সমস্ত মামলা মকদ্দমার ব্যাপার—মাষ্টার মশায় যে কি করতে পারেন বুঝতে পারলুম না। সন্ধ্যাবেলায় যে সময়ে রোজ আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয় সেদিন দেখা হল না। খবর নিয়ে জানলুম, তিনি তাঁর কাপড়ের বাক্স আর বিছানা নিয়ে বেরিয়ে

গেছেন, চাকরদের কেবল এইটুকু বলে গেছেন, তাঁর ফিরতে দু-চার দিন দেরী হবে। আমি ভাবলুম, সাক্ষী সংগ্রহ করবার জন্যে তিনি পঞ্চুদের মামার বাড়িতেই বা চলে গেচেন। তা যদি হয় আমি জানি সে তাঁর বৃথা চেষ্টা হবে। জগদ্ধাত্রী পূজো, মহরম এবং রবিবারে জড়িয়ে তাঁর ইস্কুলের কয়দিন ছুটি ছিল তাই ইস্কুলেও তাঁর খোঁজ পাওয়া গেল না।

হেমন্তের বিকেলের দিকে দিনের আলোর রঙ যখন ঘোলা হয়ে আস্‌তে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে মনেরও রং বদল হয়ে আসে। সংসারে অনেক লোক আছে যাদের মনটা কোঠা বাড়িতে বাস করে। তারা "বাহির" বলে পদার্থকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে চল্‌তে পারে। আমার মনটা আছে যেন গাছতলায়। বাইরের হাওয়ার সমস্ত ইসারা একেবারে গায়ের উপরে এসে পড়ে, আলো অন্ধকারের সমস্ত মীড় বুকের ভিতরে বেজে ওঠে। দিনের আলো যখন প্রখর থাকে তখন সংসার তার অসংখ্য কাজ নিয়ে চারদিকে ভিড় করে দাঁড়ায়, তখন মনে হয় জীবনে এ ছাড়া আর কিছুরই দরকার নেই। কিন্তু যখন আকাশ ম্লান হয়ে আসে, যখন স্বর্গের জানলা থেকে মর্ত্ত্যের উপর পর্দ্দা নেমে আস্‌তে থাকে, তখন আমার মন বলে, জগতে সন্ধ্যা আসে সমস্ত সংসারটাকে আড়াল করবার জন্যেই,—এখন কেবল একের সঙ্গ অনন্ত অন্ধকারকে ভরে তুলবে, এইটেই ছিল জলস্থল-আকাশের একমাত্র মন্ত্রণা। দিনের মধ্যে যে প্রাণ অনেকের মধ্যে বিকশিত হয়ে উঠবে সন্ধ্যার সময় সেই প্রাণই একের মধ্যে মুদে আস্‌বে, আলো অন্ধকারের ভিতরকার অর্থটাই ছিল এই। আমি সেটাকে অস্বীকার করে কঠিন হয়ে

থাক্‌তে পারিনে,—তাই সন্ধ্যাটি যেই জগতের উপর প্রেয়সীর কালো চোখের তারার মত অনিমেষ হয়ে ওঠে তখন আমার সমস্ত দেহমন বল্‌তে থাকে,—সত্য নয়, একথা কখনোই সত্য নয়, যে, কেবলমাত্র কাজই মানুষের আদি অন্ত;—মানুষ একান্তই মজুর নয়, হোক্ না সে সত্যের মজুরী, ধর্ম্মের মজুরী;—সেই তারার আলোয় ছুটি-পাওয়া কাজের-বাইরেকার মানুষ, সেই অন্ধকারের অমৃতে ডুবে মরবার মানুষটিকে তুই কি চিরদিনের মত হারালি, নিখিলেশ? সমস্ত সংসারের অসংখ্যতাও যে জায়গায় মানুষকে লেশমাত্র সঙ্গ দিতে পারে না, সেইখানে যে-লোক একলা হয়েচে সে কি ভয়ানক একলা!

সেদিন বিকেলবেলাটা ঠিক যখন সন্ধ্যার মোহানাটিতে এসে পৌঁচেছে, তখন আমার কাজ ছিল না, কাজে মনও ছিল না, মাষ্টার মশায়ও ছিলেন না, শূন্য বুকটা যখন আকাশে কিছু-একটা আঁকড়ে ধরতে চাচ্ছিল তখন আমি বাড়িভিতরের বাগানে গেলুম। আমার চন্দ্রমল্লিকা ফুলের বড় সখ। আমি টবে করে' নানা রঙের চন্দ্রমল্লিকা বাগানে সাজিয়েছিলুম, যখন সমস্ত গাছ ভরে' ফুল ফুটে উঠত তখন মনে হত সবুজ সমুদ্রে ঢেউ লেগে রঙের ফেনা উঠেচে। কিছুকাল আমি বাগানে যাইনি, আজ মনে মনে একটু হেসে বল্লুম, আমার বিরহিণী চন্দ্রমল্লিকার বিরহ ঘুচিয়ে আসিগে।

বাগানে যখন ঢুক্‌লুম তখন কৃষ্ণ প্রতিপদের চাঁদটি ঠিক আমাদের পাঁচিলের উপরটিতে এসে মুখ বাড়িয়েচে। পাঁচিলের তলাটিতে নিবিড় ছায়া—তারই উপর দিয়ে বাঁকা হয়ে চাঁদের আলো বাগানের পশ্চিম দিকে এসে পড়েচে। ঠিক আমার মনে

হল চাঁদ যেন হঠাৎ পিছন দিক থেকে এসে অন্ধকারের চোখ টিপে ধরে মুচকে হাস্‌চে।

পাঁচিলের যে-ধারটিতে গ্যালারির মত করে' থাকে-থাকে চন্দ্রমল্লিকার টব সাজানো রয়েচে সেই দিকে গিয়ে দেখি সেই পুষ্পিত সোপান-শ্রেণীর তলায় ঘাসের উপরে কে চুপ করে' শুয়ে আছে। আমার বুকের মধ্যে ধড়াস্‌ করে উঠল। আমি কাছে যেতেই সেও চম্‌কে উঠে তাড়াতাড়ি উঠে বস্‌ল।

তার পর কি করা যায়? আমি ভাবচি আমি এইখান থেকে ফিরে যাব কি না, বিমলাও নিশ্চয় ভাবছিল সে উঠে চলে যাবে কি না। কিন্তু থাকাও যেমন শক্ত, চলে যাওয়াও তেম্‌নি। আমি কিছু-একটা মন স্থির করার পূর্ব্বেই বিমলা উঠে দাঁড়িয়ে মাথায় কাপড় দিয়ে বাড়ির দিকে চল্‌ল।

সেই একটুখানি সময়ের মধ্যেই বিমলার দুর্ব্বিষহ দুঃখ আমার কাছে যেন মূর্ত্তিমান হয়ে দেখা দিল। সেই মুহূর্ত্তে আমার নিজের জীবনের নালিশ কোথায় দূরে ভেসে গেল! আমি তাকে ডাক্‌লুম, বিমলা!

সে চম্‌কে দাঁড়াল। কিন্তু তখনো সে আমার দিকে ফিরল না। আমি তার সাম্‌নে এসে দাঁড়ালুম। তার দিকে ছায়া, আমার মুখের উপর চাঁদের আলো পড়ল। সে দুই হাত মুঠো করে চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বল্লুম, বিমলা, আমার এই পিঁজ্‌রের মধ্যে চারিদিক বন্ধ, তোমাকে কিসের জন্যে এখানে ধরে রাখব? এমন করে ত তুমি বাঁচবে না!

বিমলা চোখ বুজেই রইল, একটি কথাও বল্লে না।

আমি বল্লুম, তোমাকে যদি এমন জোর করে বেঁধে রাখি তাহলে আমার সমস্ত জীবন যে একটা লোহার শিকল হয়ে উঠ্‌বে। তাতে কি আমার কোনো সুখ আছে?

বিমলা চুপ করেই রইল।

আমি বল্লুম, এই আমি তোমাকে সত্য বল্‌চি—আমি তোমাকে ছুটি দিলুম। আমি যদি তোমার আর-কিছু না হতে পারি অন্তত আমি তোমার হাতের হাতকড়া হব না!

এই বলে আমি বাড়ির দিকে চলে গেলুম। না, না, এ আমার ঔদার্য্য নয়, এ আমার ঔদাসীন্য ত নয়ই। আমি যে ছাড়তে না পারলে কিছুতেই ছাড়া পাব না। যাকে আমার হৃদয়ের হার করব তাকে চিরদিন আমার হৃদয়ের বোঝা করে রেখে দিতে পারব না। অন্তর্যামীর কাছে আমি জোড়হাতে কেবল এই প্রার্থনাই করচি আমি সুখ না পাই, নেই পেলুম; দুঃখ পাই সেও স্বীকার কিন্তু আমাকে বেঁধে রেখে দিয়ো না। মিথ্যাকে সত্য বলে ধরে রাখার চেষ্টা যে নিজেরই গলা চেপে ধরা। আমার সেই আত্মহত্যা থেকে আমাকে বাঁচাও!

বৈঠকখানার ঘরে এসে দেখি মাষ্টার মশায় বসে আছেন। তখন ভিতরে ভিতরে আবেগে আমার মন দুলচে। মাষ্টার মশায়কে দেখে আমি অন্য কোনো কথা জিজ্ঞাসা করবার আগে বলে উঠলুম—মাষ্টার মশায়, মুক্তিই হচ্চে মানুষের সব চেয়ে বড় জিনিষ। তার কাছে আর-কিছুই নেই, কিছু-ইনা!

মাষ্টার মশায় আমার এই উত্তেজনায় আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন। কিছু না বলে আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

আমি বল্লুম, বই পড়ে কিছুই বোঝা যায় না। শাস্ত্রে পড়েছিলুম, ইচ্ছাটাই বন্ধন, সে নিজেকে বাঁধে অন্যকে বাঁধে। কিন্তু শুধু কেবল কথা ভয়ানক ফাঁকা। সত্যি যেদিন পাখীকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিতে পারি সেদিন বুঝ্‌তে পারি পাখীই আমাকে ছেড়ে দিলে। যাকে আমি খাঁচায় বাঁধি সে আমাকে আমার ইচ্ছেতে বাঁধে, সেই ইচ্ছের বাঁধন যে শিকলের বাঁধনের চেয়ে শক্ত। আমি তোমাকে বলছি পৃথিবীতে এই কথাটি কেউ বুঝ্‌তে পারচে না। সবাই মনে করচে, সংস্কার আর কোথাও করতে হবে। আর কোথাও না, কোথাও না, কেবল ইচ্ছের মধ্যে ছাড়া!

মাষ্টার মশায় বল্লেন, আমরা মনে করি, যেটা ইচ্ছে করেচি সেটাকে হাতে করে পাওয়াই স্বাধীনতা,— কিন্তু, আসলে, যেটা ইচ্ছে করেচি সেটাকে মনের মধ্যে ত্যাগ করাই স্বাধীনতা।

আমি বল্লুম, মাষ্টার মশায়, অমন করে কথায় বল্‌তে গেলে টাক্-পড়া উপদেশের মত শোনায় কিন্তু যখনই চোখে ওকে আভাস মাত্রেও দেখি তখন যে দেখি ঐটেই অমৃত। দেবতারা এইটেই পান করে' অমর। সুন্দরকে আমরা দেখতেই পাই নে যতক্ষণ না তাকে আমরা ছেড়ে দিই! বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেক্‌জাণ্ডার করেন নি, একথা যে তখন মিথ্যেকথা যখন এটা শুক্‌নো গলায় বলি, এই কথা কবে গান গেয়ে বল্‌তে পারব? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই সব প্রাণের কথা ছাপার বইকে ছাপিয়ে পড়বে কবে, একেবারে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গার নির্ঝরের মত?

হঠাৎ মনে পড়ে গেল মাষ্টার মশায় ক'দিন ছিলেন না,—

কোথায় ছিলেন তা জানিও নে। একটু লজ্জিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনি ছিলেন কোথায় ?

মাষ্টার মশায় বল্লেন, পঞ্চুর বাড়িতে।

পঞ্চুর বাড়িতে ? এই চারদিন সেখানেই ছিলেন ?

হাঁ, মনে ভাবলুম যে-মেয়েটি পঞ্চুর মামী সেজে এসেচে তার সঙ্গেই কথাবার্ত্তা কয়ে দেখব। আমাকে দেখে প্রথমটা সে একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেল ;—ভদ্রলোকের ছেলে হয়েও যে এত বড় অদ্ভুত কেউ হতে পারে এ কথা সে মনে করতেও পারে নি। দেখ্‌লে যে আমি রয়েই গেলুম। তার পরে তার লজ্জা হতে লাগ্‌ল। আমি তাকে বল্লুম, মা, আমাকে ত তুমি অপমান করে তাড়াতে পারবে না। আর, আমি যদি থাকি তাহলে পঞ্চুকেও রাখব ; ওর মা-হারা সব ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, তারা পথে বেরবে এ ত আমি দেখ্‌তে পারব না।—দুদিন আমার কথা চুপ করে শুন্‌লে,—হাঁও বলে না, নাও বলে না, শেষকালে আজ দেখি পোঁটলা-পুঁট্‌লি বাঁধচে। বল্লে, আমরা বৃন্দাবনে যাব, আমাদের পথ-খরচ দাও।—বৃন্দাবনে যাবে না জানি কিন্তু একটু মোটা রকম পথ খরচ দিতে হবে। তাই তোমার কাছে এলুম।

আচ্ছা সে যা দরকার তা দেব।

বুড়িটা লোক খারাপ নয়। পঞ্চু ওকে জলের কলসী ছুঁতে দেয় না, ঘরে এলে হাঁ হাঁ করে' ওঠে তাই নিয়ে ওর সঙ্গে খুঁটিনাটি চল্‌ছিল। কিন্তু ওর হাতে আমার খেতে আপত্তি নেই শুনে আমাকে যত্নের একশেষ করেচে। চমৎকার রাঁধে। আমার

উপরে পঙ্কুর ভক্তিশ্রদ্ধা যা একটুখানি ছিল তাও এবার চুকে গেল। আগে ওর ধারণা ছিল অন্তত আমি লোকটা সরল, কিন্তু এবার ওর ধারণা হয়েচে আমি যে বুড়িটার হাতে খেলুম সেটা কেবল তাকে বশ করবার ফন্দী। সংসারে ফন্দীটা চাই বটে কিন্তু তাই বলে একেবারে ধর্ম্মটা খোয়ানো? মিথ্যে সাক্ষিতে আমি বুড়ির উপর যদি টেক্কা দিতে পারতুম, তাহলে বটে বোঝা যেত।—যাহোক বুড়ি বিদায় হলেও কিছুদিন আমাকে পঙ্কুর ঘর আগ্‌লে থাক্‌তে হবে—নইলে হরিশকুণ্ডু কিছু একটা সাংঘাতিক কাণ্ড করে বস্‌বে। সে না কি ওর পারিষদদের কাছে বলেচে,—আমি ওর একটা জাল মামী জুটিয়ে দিলুম, ও বেটা আমার উপর টেক্কা মেরে কোথা থেকে এক জাল বাবার জোগাড় করেচে; দেখি ওর বাবা ওকে বাঁচায় কি করে?

আমি বল্লুম, ও বাঁচতেও পারে মরতেও পারে, কিন্তু এই যে এরা দেশের লোকের জন্যে হাজার রকম ছাঁচের ফাঁস-কল তৈরি করচে, ধর্ম্মে, সমাজে, ব্যবসায়ে, সেটার সঙ্গে লড়াই করতে করতে যদি হারও হয় তাহলেও আমরা সুখে মরতে পারব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অলঙ্কারের সূত্রপাত

যে দেশে কাব্য আছে সে দেশে অলঙ্কারও আছে এবং থাকা উচিত। গ্রীসে আরিষ্টটেল ছিলেন এবং এদেশে ভামহ থেকে আরম্ভ করে বিশ্বনাথ পর্য্যন্ত পর পর যত আলঙ্কারিক জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের নামের তালিকা প্রস্তুত করলে একখানি ছোট-খাট ক্যাটালগ তৈরি হয়।

অলঙ্কার যে কেবল প্রাচীন সাহিত্যেই ছিল তা নয়, নব-সাহিত্যেও আছে। এ দুয়ের ভিতর যা প্রভেদ—সে নামের এবং রূপের। একালে আমরা যাঁদের Critic বলি সেকালে তাঁদের আলঙ্কারিক বলত। অনেকের বিশ্বাস যে, সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের কারবার শুধু উপমা, অনুপ্রাস, শ্লেষ, জমক নিয়েই। এ ধারণা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কাব্যের দোষগুণ-বিচারই সে শাস্ত্রেরও মুখ্য উদ্দেশ্য। Criticism-এর উদ্দেশ্যও তাই। তবে বর্ত্তমান ইউরোপে যে Criticism-এর একটা শাস্ত্র গড়ে তোলা হয় নি, তার কারণ সে দেশের Critic-রা ক্রমান্বয়ে এই সত্যের পরিচয় পেয়েছেন যে, সে দেশের কবিরা সমালোচকদের রাজশাসন মানেন না। সেখানে কাব্য যুগে যুগে নূতন মূর্ত্তি ধারণ করে সুতরাং এক যুগের অলঙ্কার-শাস্ত্র আর-এক যুগে অর্থশূন্য এবং উপহাসাস্পদ হয়ে পড়ে। ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে Critic-রা তাঁদের মতামত Codify করতে যে তিলমাত্রও দ্বিধা করতেন না তার কারণ আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা সকল বিষয়েই একটা বাঁধাবাঁধি নিয়মের অত্যন্ত পক্ষপাতী

ছিলেন। এমন কি কালিদাসের ন্যায় অপূর্ব্ব প্রতিভাশালী কবিও অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধি-নিষেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। দর্শনের সঙ্গে তার টীকাভাষ্যের যে সম্বন্ধ, কাব্যের সঙ্গে অলঙ্কারের সেই একই সম্বন্ধ;—উভয়েরই উদ্দেশ্য হচ্চে মূল সূত্রের এবং মূল কাব্যের ব্যাখ্যা করা, বিচার করা। এবং দর্শনশাস্ত্রের ভাষ্য-কাররাই যেমন কালক্রমে তার গুরু হয়ে উঠেন তেমনি কাব্য-শাস্ত্রের ভাষ্যকাররাই কালক্রমে তার গুরু হয়ে উঠেন এবং কবি-সমাজ সেই গুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার কর্‌তে বাধ্য হয়। মহাপ্রভু চৈতন্য সার্ব্বভৌমকে বলেছিলেন যে, তিনি বেদান্ত মানেন, কিন্তু আচার্য্যকে মানেন না, অর্থাৎ উপনিষদ্ মানেন কিন্তু তার শাঙ্কর-ভাষ্য মানেন না। ভগবানের অবতার ব্যতীত এত বড় কথা বল্‌বার সাহস এদেশে সেকালে কোনও রক্তমাংসের দেহধারী মানবের ছিল না এবং কবিরা আর যাই হো'ন না কেন, অবতার বলে লোক-সমাজে কখনই গ্রাহ্য হন নি। সুতরাং তাঁরা বিনা আপত্তিতে অলঙ্কার-শাস্ত্রের দ্বারা শাসিত হতেন।

এ বিষয়ে ইংলণ্ডের মনোভাব ভারতবর্ষের ঠিক উল্টো—ইংরাজি সাহিত্যিকেরা কস্মিন্‌কালেও কোনরূপ অলঙ্কার-শাস্ত্রের অধীনতা স্বীকার করেন নি। জীবনে ও মনে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখাই হচ্ছে ইংরাজি সভ্যতার ধর্ম্ম ও কর্ম্ম। কিন্তু ফরাসীদের মনোভাব এ দুয়ের মাঝামাঝি। তাঁদের বিশ্বাস যে, রচনা কতকগুলি বিধিবদ্ধ নিয়মের অধীন না হলে তা আর্ট হয় না এবং রচনাকে আর্ট করে তোলাই ফরাসী-লেখকদের জীবনের ব্রত। সাহিত্যের ভাষা এবং রীতি (style) সম্বন্ধে সাহিত্যে তাঁরা একটা স্পষ্ট

আদর্শ উচ্চে ধরে রাখতে চান। এই জন্যই ফরাসীবিপ্লবের প্রচণ্ড ধাক্কায় পুরাকালের সমাজশাসনের সকল ব্যবস্থা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলেও French Academy আজও টি'কে আছে। ফরাসী সাহিত্যের এই প্রিভি-কাউন্সিলে সমগ্র সাহিত্যের চূড়ান্ত বিচার আজও হয়ে থাকে। এই পণ্ডিতমণ্ডলী প্রধানতঃ রচনার রীতির বিচার করেন,—নীতির নয়; সাহিত্যের এই ব্যবস্থাপক সভা অদ্যাবধি সাহিত্যের সুরীতি সযত্নে রক্ষা করে আস্‌ছেন;—এর ফলে, ফরাসী গদ্য যে আদর্শ গদ্য এ কথা সমগ্র ইউরোপে সর্ব্ববাদীসম্মত। অপর পক্ষে ইংলণ্ডে, লেখা সম্বন্ধে অবাধ স্বাধীনতার ফলাফল ইংরাজি সাহিত্যে স্পষ্ট দেখা যায়। একদিকে যেমন অসাধারণ প্রতিভাশালী লেখকদের হাতে ইংরাজি রচনা অপূর্ব্ব বৈচিত্র্য, শ্রী ও শক্তি লাভ করে, অপর দিকে সাধারণ লেখকদের হাতে সে রচনা তেমনি অসংযত শিথিল, দীর্ঘসূত্র ও গুরুভার হয়ে পড়ে। ইংরাজি ভাষায় সচরাচর যে ভাবে গদ্য লেখা হয় তার ভিতর বিশেষ কোন নৈপুণ্য কিম্বা গুণপনার পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রচলিত ফরাসী গদ্যের তুলনায় প্রচলিত ইংরাজি গদ্য নিতান্ত কাঁচা। ইংলণ্ডের প্রতি বড় লেখকের রচনা-রীতি স্বতন্ত্র এবং অসামান্য। ও-দেশের গদ্য সাহিত্যে ইংরাজি-রীতি বলে কোনও-একটি সামান্য রীতি নেই। এই আর্টহীন, অযত্নপ্রসূত সাহিত্যের প্রভাবেই বাঙ্গলা-গদ্য এতটা ঢিলে এবং এলোমেলো হয়ে পড়েছে। এটি নিতান্তই দুঃখের বিষয়। কেননা ইংরাজি সাহিত্যের রচনা সুশৃঙ্খল না হলেও ভাবের স্বাতন্ত্র্যে ও চিন্তার স্বাধীনতায় সে সাহিত্য যথেষ্ট সবল এবং সচল। ইংরাজেরা বলেন যে, তাঁরা পৃথিবীর সকল ক্ষেত্রে bungle through

করে অবশেষে জয়লাভ করেন। ইংরাজি গদ্যের বাহ্যিক অনুকরণে আমরা যা লিখি তা অকারণে বিশৃঙ্খল; কেননা আমাদের প্রাণের ভিতর এমন কোনও উদ্দাম শক্তি নেই যা আত্মপ্রকাশের জন্য আর্টের সকল বন্ধন ছিন্ন করতে বাধ্য। তারপর আমাদের মনের উপর ইংরাজি সাহিত্যের একাধিপত্য যদি না থাকত তাহলে আমরা সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রকে একেবারেই উপেক্ষা করতুম না। এবং সে শাস্ত্রকে মান্য করতে শিখলে, আমরা সকল আলঙ্কারিকের মতে রচনার যেটি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি—বৈদর্ভীরীতি, বাঙ্গলা লেখায় নিশ্চয়ই সেইটির চর্চ্চা করতুম। এ রীতির প্রধান গুণ প্রসাদগুণ। এ রীতির রচনা—সহজ, সরল, পরিষ্কার, ও পরিচ্ছিন্ন। ভাষাকে হীরকের মত স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল, সারালো এবং ধারালো করে তোলাই এ রীতির উদ্দেশ্য। সুতরাং এ রীতিতে সব রকম বাহুল্য ও আতিশয্য—এক কথায় ভাষার ও ভাবের বাড়াবাড়ি—সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। ফরাসী গদ্য-বন্ধ এই বৈদর্ভীরীতি অবলম্বন করেই পৃথিবীর আদর্শ গদ্য হয়ে উঠেছে। এবং যে কারণে ফরাসীজাতি এ রীতির পক্ষপাতী, সে-কারণ আমাদের মধ্যেও বিদ্যমান। ফ্রান্সের কবি, আলঙ্কারিক, দার্শনিক প্রায় সকলেই এ বিষয়ে একমত যে, যেহেতু ফরাসীজাতি রোমান্ সভ্যতার উত্তরাধিকারী—সে কারণ যে গুণে ল্যাটিন্-সাহিত্যের বিশেষত্ব এবং শ্রেষ্ঠত্ব—সে গুণের চর্চ্চা করা ফরাসী লেখকদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য; নচেৎ ফরাসী সাহিত্য তার স্বধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে তার স্বরাজ্য হারাবে। এ রাজ্য আলোর রাজ্য—ধোঁয়ার রাজ্য নয়। ফরাসীরা জাতীয় মনকে ইতালীর সূর্য্যালোকে উদ্ভাসিত করতে চায়,

—জর্ম্মণীর কুয়াশায় আবৃত করতে চায় না। সাহিত্য-জগতের এই সূর্য্য-উপাসকদের নিকট বাক্যের প্রকাশ-গুণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ বলে গ্রাহ্য হয়েছে। আমরাও নিজেদের সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণ-সভ্যতার উত্তরাধিকারী বলে গর্ব্ব করি, যে সভ্যতার সর্ব্বপ্রধান মন্ত্র হচ্ছে গায়ত্রী। এ কথা যদি সত্য হয় তাহলে প্রসাদগুণই বঙ্গসাহিত্যের প্রধান গুণ হওয়া কর্ত্তব্য। তবে যে আমাদের মন সাহিত্যে দীপশিখার মত জ্বলে ওঠে না, কিন্তু নেবানো বাতির মত শুধু ধোঁয়ায়, তার একটি কারণ এই যে, আমরা বাহুল্যের অত্যন্ত পক্ষপাতী। শিখার দেহ একটুখানি; ধোঁয়ার অনেকখানি; আর তা ছাড়া শিখা নিজের স্বাতন্ত্র্য এবং স্পষ্ট রূপ বজায় রেখেই চারিদিকে আলো ছড়ায়—অপর পক্ষে ধোঁয়া যত বেশি এলিয়ে যায় এবং যত বেশি আকার-হীন ও অস্পষ্ট হয়ে যায় ততই তা চারিয়ে যায়।

আলো ধরে-ছুঁয়ে পাওয়া যায় না, কেননা আলো পদার্থ নয়,—ও শুধু বিশ্বের হৃদয়ের কাঁপুনি। অপর পক্ষে ধোঁয়া যে শুধু পাওয়া যায় তাই নয়, ও বস্তু গলাধঃকরণও করা যায়।

বৈদর্ভীরীতি সাহিত্যের সাধন-রীতি-স্বরূপে গ্রাহ্য করা আমাদের পক্ষে যে তেমন স্বাভাবিক নয় তার একটি বিশেষ কারণ আছে। ল্যাটিন্ সাহিত্য একটিমাত্র নগরীর—রোমের—সাহিত্য; সুতরাং সে সাহিত্যে একটিমাত্র রীতিই প্রাধান্যলাভ করেছিল। পৃথিবীর সকল পথ রোমে গেলেও, রোমান্‌রা সভ্যতার একটিমাত্র পথ ধরেই চলেছিলেন, এবং ফরাসীজাতি আজ পর্য্যন্ত মনোজগতে সেই এক পথেরই পথিক। সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাস এর সম্পূর্ণ বিপরীত। এ সাহিত্য নানা যুগে, এই বিশাল ভারতবর্ষের নানা দেশে নানা

আকারে, নানা ভঙ্গীতে দেখা দিয়েছে। এক ভাষা ব্যতীত এ সাহিত্যের অপর কোনই ঐক্য নেই। বৈদিক সাহিত্যের কথা ছেড়ে দিলেও সংস্কৃত সাহিত্য প্রথমতঃ প্রাচীন এবং নব্য এই দুই পর্য্যায়ে বিভক্ত। কাব্য বল, অলঙ্কার বল, দর্শন বল, সব এই দুই শ্রেণী-ভুক্ত। তা ছাড়া দেশভেদে, রচনারীতিরও বহুতর প্রভেদ ছিল। এই নানা রীতির মধ্যে অন্ততঃ এমন দুটি রীতি ছিল, যার একটি আর-একটির সম্পূর্ণ বিপরীত। দণ্ডী বলেছেন যে, যে-সকল গুণের সদ্ভাবে বৈদর্ভীরীতির সৃষ্টি হয় সেই সকল গুণের বিপর্য্যয়েই গৌড়ীয়রীতির জন্ম। শুধু দণ্ডী নয়, বামনাচার্য্য প্রভৃতি সকল প্রাচীন আলঙ্কারিকেরা এ বিষয়ে একমত। শব্দাড়ম্বর, অনুপ্রাসের ঘনঘটা, সমাসবহুলতা, অপ্রসিদ্ধার্থক শব্দের প্রয়োগ, অত্যুক্তি, পুনরুক্তি এই সবই হচ্ছে গৌড়ীয়রীতির সম্বল ও সম্পদ। এ গৌড় কোন্ গৌড় তা কারও জানা নেই, কেননা সেকালে ভারতবর্ষে পঞ্চ-গৌড় ছিল। তবু এই নামের গুণেই বাঙ্গালী আজ গৌড়ীয়রীতিকে আত্মসাৎ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে। কিন্তু কৃতকার্য্য হতে পার্‌ছে না। এক মেঘনাদবধ-কার ব্যতীত অদ্যাবধি আর কেউ এ রীতিতে কৃতিত্ব লাভ কর্‌তে পারেন নি। আমরা গদ্য রচনায় যে রীতি অবলম্বন করেচি সে হচ্ছে ইঙ্গ-গৌড়ীয়রীতি—কেননা ইংরাজি গদ্যের অনুকরণ এবং অনুবাদ থেকেই বাঙ্গলা গদ্যের উৎপত্তি। এক্ষেত্রে লেখার একটা নূতন পথ ধরবার ইচ্ছে হওয়াটা কারও কারও পক্ষে স্বাভাবিক। প্রচলিত পদ্ধতি ত্যাগ করে নূতন পদ্ধতি অবলম্বন করবার মুখে মহাতর্ক উপস্থিত হয়। আজকে বাঙ্গলা সাহিত্যে সেই তর্ক উঠেছে অর্থাৎ অলঙ্কারের সূত্রপাত হয়েছে।

(২)

"অথাতো বাক্যজিজ্ঞাসা"—এই হচ্ছে অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রথম সূত্র। যদিচ সে শাস্ত্রে কোথাও এ প্রশ্ন সূত্রের আকার ধারণ করেনি, তবুও কি ভাষায় কাব্য রচনা করা কর্ত্তব্য, সে বিষয়ে সকল আচার্য্যই যথেষ্ট আলোচনা করেছেন, কেননা রীতির সঙ্গে ভাষার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ।

কোন্ ভাষায় বঙ্গ সাহিত্য রচনা করা কর্ত্তব্য এ প্রশ্ন আমাদের পক্ষে বিশেষ করে জিজ্ঞাস্য, কেননা বাঙ্গলায় মুখের ভাষা এক, বইয়ের ভাষা আর। এর উত্তরে একদল বলেন যে, যে ভাষা আমরা বই পড়ে শিখি, সেই ভাষাতেই বই লেখা কর্ত্তব্য।

ভারতচন্দ্রের মত এর ঠিক উল্টো। তিনি বলেন—

"পড়িয়াছি যেই মত বর্ণিবারে পারি।
কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদগুণ না হবে রসাল।
অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়েছেন কয়ে।
যে হোক সে হোক ভাষা কাব্য রস লয়ে॥

প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যের অদ্বিতীয় শিল্পীর এই মত আমি শিরোধার্য্য করি—কাব্য যে "রস লয়ে" এ কথা কেউ অস্বীকার কর্‌বেন না, তবে "রস" যে কি বস্তু সে বিষয়ে অবশ্য ভীষণ মতভেদ আছে। এস্থলে আমি রসতত্ত্বের বিচার কর্‌তে চাই নে, কেননা প্রায়ই দেখতে পাই যে; লোকে রসশাস্ত্রের আলোচনায় রসজ্ঞানের পরিচয় দেন না।

আমার বক্তব্য এই যে, "পড়িয়াছি যেই মত" সেই মত "বর্ণিবার" চেষ্টা করলে রচনা প্রসাদগুণে বঞ্চিত হয়। অতএব "যাবনী মিশাল" মাতৃভাষাতেই কাব্য রচনা করা উচিত, এককথায় বৈদর্ভীরীতি অবলম্বন করাই বঙ্গ সরস্বতীর পক্ষে শ্রেয়ঃ।

বামনাচার্য্য বলেছেন—বৈদর্ভীরীতি "সমগ্রগুণা" অর্থাৎ কাব্যের সকল গুণ এক প্রসাদগুণেরই অন্তর্ভূত। এই প্রসাদগুণ লাভ করতে হলে যে মাতৃভাষার আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক, এ কথা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিতে হলে, আলঙ্কারিকেরা অপরাপর যে সকল গুণের বিচার করেছেন সে সকলের উল্লেখ করা দরকার। দণ্ডীর মতে, অর্থব্যক্তি (Clarity) সমতা (Unity) কান্তি (Restraint) মাধুর্য্য (Beauty) ঔদার্য্য (Refinement) এই সকল গুণই হচ্ছে বৈদর্ভীরীতির প্রাণ। ফরাসী আলঙ্কারিকেরাও এই ক'টিই রচনার প্রধান গুণ বলে গ্রাহ্য করেন।

বলা বাহুল্য যে, যে ভাষা আমরা সব চাইতে ভাল জানি এবং যে ভাষার উপর আমাদের দখল সব চাইতে বেশি, সেই ভাষায় লিখলেই রচনায় এ সকল গুণ থাকবার সম্ভাবনা বেশি। শুধু তাই নয়—কোনও কৃত্রিম ভাষায় লিখতে গেলে, আলঙ্কারিকদের মতে যা দোষ বলে গণ্য, রচনাকে সে দোষমুক্ত করা অত্যন্ত কঠিন। ঈষৎ অন্যমনস্ক হলেই সে সব দোষ রচনায় আপনি এসে পড়বে।

আমি এখানে দুটি চারটি দোষের উল্লেখ করছি। প্রথম "অপার্থ" অর্থাৎ যে শব্দের যে অর্থ নয় সেই অর্থে সেই শব্দ ব্যবহার করা। তারপর "একার্থ" অর্থাৎ একই অর্থের শব্দ একের চাইতে বেশি বার ব্যবহার করা ;—একে পুনরুক্তি দোষও বলা যেতে পারে।

তার পর "সংশয়" অর্থাৎ যেখানে কোন বস্তু নিশ্চয় করে বলবার অভিপ্রায় আছে সেখানে যদি শব্দ-প্রয়োগের দোষে সংশয় উৎপন্ন করা হয় তাহলে বাক্য, সংশয়দোষে দুষ্ট হয়। তারপর "শব্দহীনতা" অর্থাৎ অভিধান ব্যাকরণাদির প্রতি লক্ষ্য না করে, শব্দের যদি অঙ্গ বিকৃত করে দেওয়া যায়, তাহলে সে শব্দ অশিষ্ট হয়ে পড়ে। বাঙ্গালীর মুখে মুখে যে-সংস্কৃতশব্দের প্রচলন নেই সেরূপ শব্দ ব্যবহার করতে গেলে আমাদের রচনায় শব্দহীনতা দোষ অতি সহজেই এসে পড়ে। পদে পদে যদি অভিধান এবং ব্যাকরণের পাতা উল্টোতে হয় তাহলে লেখককে যে কতদূর বিপন্ন হয়ে পড়তে হয় তা সহজেই বুঝতে পারেন। যে কথা আমরা যে ভাবে মুখে বলি সে কথা ঠিক সেই ভাবে লিখলে এ বিপদ আমরা এড়িয়ে যেতে পারি, কেননা—আমরা যা বলি প্রাকৃত ব্যাকরণ অনুসারে তাই শুদ্ধ। ইঙ্গ-গৌড়ীয় রীতির রচনাতে এ সকল দোষ পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে দেখা যায়। অপরের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের এ রীতির রচনা এ সকল দোষমুক্ত নয়। দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি তাঁর প্রথম বয়েসের কাব্য সকল ইঙ্গ-গৌড়ীয় রীতিতে এবং সীতারাম প্রভৃতি তাঁর শেষ কাব্য-সকল বৈদর্ভীরীতিতে রচিত। দুর্গেশনন্দিনীর গদ্য বিভক্তিহীন সংস্কৃত ভাষায় লিখিত আর সীতারামের গদ্য মাতৃভাষায় লিখিত। এ দুয়ের পার্থক্য উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্টই দেখানো যায়।

নিম্নে তাঁর রচনার দুটি নমুনা উদ্ধৃত করে দিচ্চি। এ দুটির ভিতর বিষয়ের ঐক্য আছে সুতরাং ভাষার পার্থক্য অতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে—

"তিলোত্তমার বয়স ষোড়শ বৎসর, সুতরাং তাঁহার দেহায়তন প্রগল্‌ভ-বয়সী রমণীদিগের ন্যায় অদ্যাপি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। দেহায়তনে ও মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকাভাব ছিল। সুগঠিত সুগোল ললাট অপ্রশস্ত নহে, অথচ অতিপ্রশস্তও নহে, নিশীথকৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায় প্রশান্ত ভাবপ্রকাশক; তৎপার্শ্বে অতি নিবিড় বর্ণ কুঞ্চিতালক কেশসকল ভ্রূযুগে, কপোলে, গণ্ডে, অংসে, উরসে আসিয়া পড়িয়াছে; মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে অন্ধকারময় কেশরাশি সুবিন্যস্ত মুক্তাহারে গ্রথিত রহিয়াছে; ললাটতলে ভ্রূযুগ সুবঙ্কিম, নিবিড় বর্ণ, চিত্রকর-লিখিতবৎ হইয়াও কিঞ্চিৎ অধিক সূক্ষ্মাকার, আর এক সূতা স্থূল হইলে নির্দ্দোষ হইত। পাঠক কি চঞ্চল চক্ষু ভালবাস? তবে তিলোত্তমা তোমার মনোরঞ্জিনী হইতে পারিবে না। তিলোত্তমার চক্ষু অতি শান্ত; তাহাতে 'বিদ্যুদ্দামস্ফুরণ চকিত' কটাক্ষ নিক্ষেপ হইত না।"

(দুর্গেশনন্দিনী)

বঙ্কিমচন্দ্র এই স্থলে প্রশ্ন করেছেন—"তিলোত্তমা একাকিনী কক্ষ-বাতায়নে বসিয়া কি করিতেছেন?" উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন। তিলোত্তমা বই পড়্‌বার চেষ্টা কর্‌ছিলেন—প্রথমে কাদম্বরী, তারপর সুবন্ধু-কৃত বাসবদত্তা, তারপর গীতগোবিন্দ। তিলোত্তমা এসব কাব্য পড়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ পড়েন নি, কেননা সুবন্ধু-কৃত বাসবদত্তা এবং গীতগোবিন্দ কুমারীপাঠ্য পুস্তক নয়, কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীর লেখক যে পড়েছিলেন তার পরিচয় দুর্গেশনন্দিনীর রূপ-বর্ণনাতেই পাওয়া যায়।

"তা, সেদিন গঙ্গারামের কোন কাজ করা হইল না। রমার মুখখানি বড় সুন্দর! কি সুন্দর আলোই তার উপর পড়িয়াছিল। সেই কথা

ভাবিতেই গঙ্গারামের দিন গেল। বাতির আলো বলিয়াই কি অমন দেখাইল? তা হ'লে মানুষ রাত্রিদিন বাতির আলো জ্বালিয়া বসিয়া থাকে না কেন? কি মিস্‌মিসে কোঁকড়া কোঁকড়া চুলের গোছা! কি ফলান রঙ! কি ভুরু! কি চোখ! কি ঠোঁট—যেমন রাঙা তেমনই পাতলা! কি গড়ন! তা কোন্‌টাই বা গঙ্গারাম ভাবিবে? সবই যেন দেবীদুর্ল্লভ। গঙ্গরাম ভবিল, 'মানুষ যে এমন সুন্দর হয়, তা জানেতম না! একবার যে দেখিলাম, আমার যেন জন্ম সার্থক হইল। আমি তাই ভাবিয়া যে কয় বৎসর বাঁচিব, সুখে কাটাইতে পারিব'।"

(সীতারাম)

বঙ্কিমচন্দ্রের কাঁচাহাতের লেখার সঙ্গে তাঁর পাকাহাতের লেখার তুলনা করলেই দেখা যায় যে—বঙ্কিমচন্দ্রের নজির আমাদের মতই সমর্থন করে। অর্থাৎ "সীতারামের" ভাষাই আমাদের যথার্থ আদর্শ, দুর্গেশনন্দিনীর ভাষা নয়। কেননা, আমরা যদি সাহিত্যে মৌখিক ভাষা গ্রাহ্য করি, তাহলে আমাদের রচনা—সগুণ না হোক্ নির্দ্দোষ হবে। যে পথে বঙ্কিমচন্দ্রের পদস্খলন হয়েছে, সে পথে বুক ফুলিয়ে চল্‌তে গেলে আমাদের চিৎ-পতন অনিবার্য্য। সুতরাং দুর্গেশনন্দিনীর রূপবর্ণনায় অলঙ্কার-শাস্ত্রের কোন্ কোন্ নিয়ম ভঙ্গ করা হয়েছে, তা একটু খুলে দেখিয়ে দেওয়া দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন যে "তাঁহার দেহায়তন প্রগল্‌ভবয়সী রমণী-দিগের ন্যায় অদ্যাপি সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।" "প্রগল্‌ভ" শব্দের অর্থ দাম্ভিক, নির্লজ্জ ইত্যাদি; অতএব "প্রগল্‌ভ-বয়সী" এই যুক্ত পদের কোন অর্থ হয় না। এখানে অপার্থ দোষ ঘটেছে। "প্রগল্‌ভ" শব্দের উক্ত প্রয়োগে—"অভিধানকোষতঃ পদার্থনিশ্চয়" এই সূত্র উপেক্ষা করা হয়েছে। তারপর "বয়সী" এই শব্দ সংস্কৃত

ব্যাকরণ অনুসারে সিদ্ধ হয় না। বাঙ্গলায় "সমবয়সী" হয় কিন্তু সংস্কৃতে কোনও বয়সীই হয় না,—হ্রস্বও না, দীর্ঘও না। এস্থলে "শব্দহানি" দোষ ঘটেছে।

তার পর দেখতে পাই যে তিলোত্তমার –

"দেহায়তনে ও মুখাবয়বে কিঞ্চিৎ বালিকাভাব ছিল।"

"মুখাবয়ব" বলায় "অবয়ব" শব্দের প্রয়োগ শিষ্ট হয়নি। অবয়ব শব্দের অর্থ হস্তপদাদি অঙ্গ। ইংরাজিতে যাকে বলে Limb. যদি কেউ বলেন যে, এস্থলে অবয়ব Features অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তার উত্তরে আলঙ্কারিকেরা বল্‌বেন যে, Features অর্থে Limb ব্যবহার করায় যে দোষ হয় "আকৃতি" অর্থে "অবয়ব" ব্যবহার করায় ঠিক সেই একই দোষ হয়। যদি "অবয়বকে" অংশ অর্থে ধরা যায় তাহলেও রক্ষে নেই—কেননা সংস্কৃত ভাষায় "অবয়ব" হচ্ছে তাই যা "সমুদয়" নয়। এস্থলে "সমুদয়" অর্থে অবয়ব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে সুতরাং "বিরুদ্ধার্থ" দোষ ঘটেছে।

তার পর তিলোত্তমার—

"ললাট···নিশীথকৌমুদীদীপ্ত নদীর ন্যায়।"

নদীর ন্যায় তরল পদার্থের সঙ্গে কপালের মত নিরেট পদার্থের তুলনা করা আলঙ্কারিক মতে সঙ্গত নয়। বিশেষতঃ যখন নদীর গায়ে জ্যোৎস্না পড়লে তার চঞ্চল হয়ে ওঠবারই কথা। চন্দ্রের করস্পর্শে সাগর ত একেবারে আন্দোলিত, উদ্বেলিত হয়ে ওঠে। আমরা অবশ্য এ নিয়ম মানিনে, কেননা ইংরাজি সাহিত্যে ও সবই চলে। তবে "কৌমুদী"র পূর্ব্বে "নিশীথ" জুড়ে দেবার কি আবশ্যক ছিল? নিশীথের কৌমুদী হয় না,– হয় চন্দ্রের।

আর নিশীথে যে "কৌমুদী" হয় অর্থাৎ দিনে জ্যোৎস্না ফোটে না তা আমরা সবাই জানি।

অলঙ্কার-শাস্ত্রের মতে "নতদ্বাহুল্যম্ একত্র"। তার কারণ "শক্যতেঽকস্যবাচকস্য বাচকবত্তাবকর্ত্তুম্, ন বহুনামিতি"। (কাব্যালঙ্কার সূত্রানি) অর্থাৎ এক কথায় যেখানে পুরো মানে পাওয়া যায় সেখানে অনেক কথা ব্যবহার করা অনুচিত। এস্থলে "বাহুল্য" দোষ ঘটেছে।

তারপরে পাই—

"অতি নিবিড়বর্ণ কুঞ্চিতালক কেশসকল ভ্রূযুগে কপোলে গণ্ডে অংসে উরসে আসিয়া পড়িয়াছে।"

নিবিড়বর্ণ বলাতে বর্ণের শুধু গাঢ়তার পরিচয় দেওয়া হয় কিন্তু বর্ণটি যে কি তা বলা হল না। এ গাঢ় বর্ণ লাল কি নীল, কালো কি সোনালি পাঠকের মনে এ সন্দেহের উদয় হওয়া আশ্চর্য্য নয়। অথচ লেখকের নিশ্চয় উদ্দেশ্য ছিল পাঠককে এই কথা জানানো, যে সে রং কালো। সুতরাং এস্থলে "সংশয়" দোষ ঘটেছে।

"কুঞ্চিতালক কেশসকল" একেবারেই অগ্রাহ্য। অলক শব্দের অর্থ কুঞ্চিত কেশ। "কুঞ্চিত কুঞ্চিত কেশ কেশ" এরূপ পদযোজনা কোন ভাষাতেই চলে না। বাঙ্গলায় অবশ্য চুল কোঁকড়া-কোঁকড়া হয় কিন্তু সংস্কৃতে কেশ কুঞ্চিত কুঞ্চিত হয় না। অলঙ্কার-শাস্ত্রে এরূপ প্রয়োগ নিষেধ। বামনাচার্য্য বলেন যে "নৈক পদং দ্বি প্রযোজ্যং প্রায়েন"—উদাহরণস্বরূপে তিনি দেখিয়েছেন যে—"পয়োদ পয়োদ" অচল। দ্বিত্ব হচ্ছে বাঙ্গলা ভাষার প্রাণ, কিন্তু সংস্কৃত ভাষার দেহভার। অশিষ্ট পদের স্পর্শে সংস্কৃত

ভাষার গা জ্বর জ্বর করে না; তার গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। এস্থলে "একার্থ" "বাহুল্য" প্রভৃতি নানা দোষ ঘটেছে।

তারপর সেই "কুঞ্চিত কুঞ্চিত কেশ কেশ সকল" এসে পড়েছে কোথায়? না "কপোলে গণ্ডে"। কপোল এবং গণ্ড অবশ্য মুখের পৃথক পৃথক "অবয়ব" নয়। যার নাম কপোল, তারই নাম গণ্ড। "একার্থ" দোষের এমন স্পষ্ট উদাহরণ বঙ্গ-সাহিত্যেও খুঁজে মেলা ভার।

তার পর ভ্রূর পরিচয় নেওয়া যাক্। তিলোত্তমার—

"ললাটতলে ভ্রূযুগ সুবঙ্কিম নিবিড়বর্ণ, চিত্রকরলিখিতবৎ হইয়াও কিঞ্চিৎ অধিক স্থূলাকার"—

এখানে আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত নিড়িবর্ণ, চুল থেকে ভুরুতে এসে পড়েছে। কিন্তু রংটি যে কি তা জানা গেল না। তার পর "কিঞ্চিৎ অধিক" এ দুটি শব্দের বাকি শব্দের সঙ্গে অন্বয় হয় না;—কার চাইতে অধিক তা বলা হয় নি। "ভুরুদুটি যেন তুলি দিয়ে আঁকা" "কিছু বেশী সরু" উপরোক্ত বাক্য হচ্চে এই বাঙ্গলা বাক্যের কথায়-কথায় সংস্কৃত অনুবাদ। "কিছু বেশী"র ভিতর Comparisonএর ভাব নাই। ইংরাজির "a little too thin" যেমন Positive—"কিছু বেশী"ও তেমনি Positive. কিন্তু সংস্কৃতে "কিঞ্চিৎ অধিক" অপর বস্তুর অপেক্ষা রাখে।

তারপর তিলোত্তমার চোখ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—"তাহাতে ...কটাক্ষ নিক্ষেপ হইত না।" কোন্ ভাষার কোন্ ব্যাকরণ অনুসারে এইরূপ হতে পারে?

সুতরাং রচনার যে রীতি বঙ্কিমচন্দ্র পরীক্ষান্তে বর্জ্জন করেছিলেন সে রীতি আমাদের গ্রাহ্য হতে পারে না।

এককথায়, বাঙ্গলা-গদ্যকে যদি সাহিত্যের নব নব রাজ্য অধিকার করতে হয়, তাহলে তাকে তার ধার-করা বুনিয়াদি চাল্ ছাড়তে হবে।

(৩)

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা রীতি-বিচার ছাড়া ঔচিত্যবিচারেরও চর্চ্চা করতেন ;—তাঁরা কি লেখা উচিত এবং কি অনুচিত সে বিষয়ের অনেক বিচার করে গেছেন।

বর্ত্তমানে এ দেশের সাহিত্যেও একদল ঔচিত্যবিচারক দেখা দিয়েছেন। এঁরা বলেন যে, বাঙ্গলায় শুধু জাতীয় সাহিত্য এবং বস্তুতান্ত্রিক কাব্য রচনা করা উচিত। এঁরা আমাদের কি বিষয় লিখতে হবে এবং সে বিষয়ে কি কি কথা বলতে হবে তাও সুনির্দ্দিষ্ট করে দিতে চান। এককথায় এঁরা ফরমায়েস দিয়ে কাব্য তৈরি করে নিতে চান।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা এরূপ অনধিকার চর্চ্চা কখনও করেন নি। তাঁরা কেবলমাত্র আর্ট হিসাবে কবির বক্তব্য কথার ঔচিত্য-বিচার করেছেন। কাব্যে অশ্লীলতা যে সর্ব্বথা বর্জ্জনীয় এ কথা আমরাও বলি, তাঁরাও বল্‌তেন, কিন্তু এক অর্থে নয়। শ্লীলতার বিচার আমরা নীতির দিক্ থেকে করি, তাঁরা করতেন রুচির দিক্ থেকে। ফলে, সেকালে কাব্যের শ্লীলতা এবং অশ্লীলতা তার ভাষার উপর নির্ভর করত। দণ্ডী তাঁর কাব্যাদর্শে অশ্লীলতার যে সকল উদাহরণ দিয়েছেন তা আমাদের কাছেও অশ্লীল এবং শ্লীলতার যা উদাহরণ দিয়েছেন তাও আমাদের কাছে সমান অশ্লীল। যে বর্ণনা

থাক্‌বার দরুন "বিদ্যাসুন্দর" বঙ্গসাহিত্যে পতিত হয়েছে, সেই সব বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও কুমারসম্ভবের উত্তরভাগ সংস্কৃত-সাহিত্যে অতি উচ্চ আসন লাভ করেছে। আমাদের রুচিজ্ঞানের বিষয় হচ্ছে কাব্যের অর্থ—তাঁদের ছিল বাক্য। আমি অবশ্য এ কালের মনকে সে কালে ফিরে যেতে বলিনে, কেননা সে ফেরা সভ্যতা হতে অসভ্যতায় ফেরা হবে। তবে সত্যের খাতিরে আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, এ বিষয়ে প্রাচীন আলঙ্কারিকদের মত সম্পূর্ণ ভুল নয়। সভ্যতা জিনিষটে অনেকটা ভাষার কথা। আমাদের সুরুচি আজও যে ভাষাগত তার প্রমাণ শিক্ষিত লোকে আজও গীতগোবিন্দ পড়ে মুগ্ধ হন; ও-কাব্য সাদা-বাঙ্গলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায় কি ?

আলঙ্কারিকদের ঔচিত্য-জ্ঞানের বিষয় যে কি তার স্পষ্ট পরিচয় মহাকবি ক্ষেমেন্দ্রের একটি কথায় পাওয়া যায়। তিনি বলেন যে, পায়ের বাঁকমল যদি গলায় পরা যায় তাহলে কণ্ঠের শোভা বৃদ্ধি হয় না বরং যদি কিছু বৃদ্ধি হয় ত সে শ্বাস-রোধের সম্ভাবনা। কোন্ কথা কোথায় বসে, কোন্ উপমা কিসে লাগে, কোথায় কোন্ রসের অবতারণা করা উচিত—এই সবই ছিল তাঁদের আলোচ্য বিষয়। তাঁরা সরস্বতীকে দেবীস্বরূপে জান্‌তেন এবং মানতেন বলে তাঁকে গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত করবার বৃথা চেষ্টা করেন নি। তাঁরা এ জ্ঞান কখনও হারান নি, যে ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং অলঙ্কারশাস্ত্রের অধিকার সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমাজ-গঠন এবং সাহিত্য-গঠনের উপায় এক হতে পারে না, কেননা এ দুয়ের উপাদানও স্বতন্ত্র, উদ্দেশ্যও স্বতন্ত্র;—এ সত্য আমরা দুবেলা ভুলে যাই।

আধা-খেঁচড়া ইংরাজি শিক্ষার ফলে, আমাদের মনে এই অদ্ভুত ধারণা জন্মেছে যে, যাঁর কোনও বিষয়ে বিশেষ অধিকার নেই তাঁর সকল বিষয়েই সমান অধিকার আছে—অন্ততঃ সমালোচনা করবার। সাহিত্যের সঙ্গে সমাজের অবশ্য আত্মীয়তা আছে, শুধু তাই নয়, মনোজগতের সঙ্গে জড়জগতেরও কুটুম্বিতা আছে;—কিন্তু যে শাস্ত্রের হাতে এ সকল সম্বন্ধ নির্ণয় করবার ভার তা হয় দর্শন, নয় বিজ্ঞান;—অলঙ্কার নয়। বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার এ তাবৎ বঙ্গসাহিত্যের অলঙ্কারস্বরূপে স্বীকৃত হয় নি। এ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলে অলঙ্কার তার সীমা অতিক্রম করতে, তার মর্য্যাদা লঙ্ঘন করতে বাধ্য হয়। একটু অসতর্ক হলেই অলঙ্কার দর্শনে গড়িয়ে পড়ে এবং ছড়িয়ে যায়। আজ আমি সে বিপদ এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করব, কেননা দর্শনের পথে যাওয়ার অর্থ প্রায়ই আলোক থেকে অন্ধকারে যাওয়া। প্রমাণস্বরূপে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আজকাল দেখতে পাই—অনেক সমালোচক একটিমাত্র সূত্র নিয়ে নব সাহিত্য-দর্শন গড়বার চেষ্টা করছেন। সে হচ্ছে এই যে, কাব্যের উদ্দেশ্য "সত্য শিব সুন্দরের" মিলন করা। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রে এ সূত্র নেই—কেননা, প্রাচীন আচার্য্যদের জ্ঞানে, এ ত্রিগুণের আধার স্বয়ং ভগবান কোনো কাব্য নয়। এ সূত্র আমরা বিলেত থেকে আমদানি করেছি। The true, the good and the beautiful-এর গায়ে আমরা সংস্কৃত ছাপ মেরে তা স্বদেশী মাল বলে চালাবার চেষ্টা করছি। বলা বাহুল্য যে, এই সূত্র ধরে কোনও কাব্যের অন্তরে প্রবেশ করা যায় না, কেননা পণ্ডিতে পণ্ডিতে যত মতভেদ, যত কলহ, যত তর্ক সবই হচ্ছে ঐ তিনটি কথার অর্থ নিয়ে।

শুধু তাই নয়—এই তিনটি কথারও পরস্পরের ভিতর ঘোর জ্ঞাতি-শত্রুতা বিদ্যমান। একজন যেই বলেন যে, এই সত্য, অমনি দশজনে চেঁচিয়ে ওঠেন যে, ও শিব নয়। বিজ্ঞানের ইতিহাসে দেখতে পাই যে, যুগে যুগে এই শিবের দোহাই দিয়ে মানুষে সত্যকে পরাভূত করতে চেষ্টা করেছে। সুন্দর বেচারির ত কথাই নেই, শিব ত তার উপর চিরদিনই খড়্গহস্ত। কমলাকান্ত বলেছেন যে, কোকিল সুন্দরের সাক্ষাৎ পেলে অমনি বলে ওঠে কু-উ। এবং তিনি এই বাচাল পক্ষীকে সম্বোধন করে বলেছেন যে—

"যখনই দেখিবে, লতা সন্ধ্যার বাতাস পাইয়া, উপর্য্যুপরি বিন্যস্ত পুষ্পস্তবক লইয়া দুলিয়া উঠিল, অমনি সুগন্ধের তরঙ্গ ছুটিল, তখনই ডাকিয়া বলিও কু-উ।"

একালের সমালোচকেরা যে কমলাকান্তের উপদেশ অনুসারে চলেন তার প্রমাণ এই যে, যেই কেউ বলেন, অমুক কাব্যে সৌন্দর্য্য আছে অমনি সাহিত্যশাসকেরা তর্জ্জন গর্জ্জন করে ওঠেন যে তাতে বস্তুতন্ত্রতা নেই অর্থাৎ সত্য নেই এবং তাতে জাতীয়তা নেই অর্থাৎ শিব নেই। এই সমালোচকদের বৃদ্ধ শিব বহুকাল ইংরাজি-সাহিত্যের উপর উপদ্রব করে—সম্প্রতি সে দেশ থেকে বহিষ্কৃত হয়ে বাঙ্গলা সাহিত্যের স্কন্ধে ভর করেছে। এঁরা ভুলে যান যে আমাদের কাব্য—জাতীয় কি বিজাতীয় তার বিচারক বিদেশীয়েরা। বস্তুর রূপ সমাজের দিক থেকে অর্থাৎ জীবনের দিক থেকে দেখলে একরকম দেখায় —আর কাব্যের দিক থেকে অর্থাৎ মনের দিক থেকে দেখলে আর-এক রকম দেখায়।

যেমন বৈজ্ঞানিকেরা এ সকল সমালোচনা উপেক্ষা করে

সত্যের আবিষ্কার করেন তেমনি শিল্পীরাও এ সকল সমালোচনা উপেক্ষা করে সুন্দরের সৃষ্টি করেন। যেমন জ্ঞানশাস্ত্রের একমাত্র জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এ তত্ত্ব সত্য কি না, তেমনি অলঙ্কারশাস্ত্রের একমাত্র জিজ্ঞাস্য হচ্ছে এ রচনা সুন্দর কি না। Truth for truth এবং Art for art প্রভৃতি বাক্য যে সহজে আমাদের মনে ধরে না তার কারণ সাংসারিক জীবনযাত্রার জন্য হিতাহিতের জ্ঞানের আমাদের যেমন দৈনিক প্রয়োজন আছে সত্যের যথার্থ জ্ঞান এবং সৌন্দর্য্যের সম্যক্ অনুভূতির তাদৃশ প্রয়োজন নেই। পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকেও জীবন সুখে স্বচ্ছন্দে যাপন করা যায় কিন্তু বাড়ির চারদিকে চোর ঘুরছে এ বিষয়ে উদাসীন থেকে এক রাতও নিশ্চিন্তে কাটাবার যো নেই। আর যা সুন্দর তা যে ঘরকন্নার কোনও কাজে লাগেনা তা সকলেই জানেন। ছবি আমরা দেয়ালেই টাঙিয়ে রাখি। Kant বলেন, সৌন্দর্য্য হচ্ছে সেই বস্তু যাতে মানুষের কোনরূপ স্বার্থ নেই। অতএব তা আত্মার অমূল্য ধন। পৃথিবীতে দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য যে জন্মগ্রহণ করছে এবং অমরতা লাভ করছে তার কারণ সংসার মানুষের সমগ্র মনটা গ্রাস করে ফেলতে পারে নি এবং পারে না। আমাদের মন যে-অংশে অসাংসারিক, সত্য এবং সুন্দর সেই-অংশেরই বিষয়। আলঙ্কারিকেরা বলেন, কাব্যের আনন্দ "বৈষয়িক আনন্দ" নয়, ও হচ্ছে "লোকোত্তরোহ্লাদ"। যার মন যত অসাংসারিক তার মন সত্য সুন্দরের সন্ধান তত পায়। বর্ত্তমান ইউরোপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক Bergson বলেন যে—

যে মন জন্মাবধি সাংসারিক বিষয়ে উদাসীন সেই মাটি-থেকে-আলগা মন থেকেই দর্শন, বিজ্ঞান, কাব্য ইত্যাদি উৎপন্ন হয়। সামাজিক লাভ লোকসানের দিক থেকে দেখতে গেলে সাহিত্যের মূল্য যে এত বেশি তার কারণ কেবলমাত্র সাংসারিক মনের সাহায্যে সমাজের হয় ত স্থিতিরক্ষা করা যেতে পারে, কিন্তু উন্নতি সাধন করা যায় না। যে দেশে সাহিত্য নেই সে দেশে সমাজ থাক্‌তে পারে কিন্তু সভ্যতা নেই। এ সত্যের সাক্ষাৎকারের জন্য অতিদূর দ্বীপান্তরে যাবার দরকার নেই, এই ছোটনাগপুরে তা নিত্য প্রত্যক্ষ। কিন্তু মানবসমাজ একমাত্র প্রাক্তন সংস্কারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে থাক্‌তে পারে না। যেমন মানুষকে সামাজিক করে তোলবার জন্যে নীতিশিক্ষার দরকার, তেমনি মানুষের মনে সত্য এবং সুন্দরের জ্ঞান উদ্রেক কর্‌বার জন্যও শাস্ত্রের আবশ্যক। অলঙ্কারশাস্ত্র কাব্যসম্বন্ধে এই শিক্ষা দেবার ভার হাতে নিয়েছে। সুতরাং সংস্কৃত এবং ফরাসী অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্যের রূপেরই বিচার হয়ে থাকে; গুণের পৃথক বিচার হয় না; কেননা কাব্যরাজ্যে রূপ আর গুণ একই বস্তু। এবং কাব্যের রূপের জ্ঞান লাভ কর্‌বার জন্য তার গঠনের পরিচয় নেওয়া দরকার—সে গঠন ভাবেরই বল, আর ভাষারই বল। প্রাণী ছাড়া যেমন আমরা প্রাণের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কোনও সন্ধান পাইনে, তেমনি সুন্দর ছাড়া আমরা সৌন্দর্য্যেরও সাক্ষাৎ পাইনে। সুতরাং সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করার অর্থ আমাদের মনোভাবকে সাকার এবং সুগঠিত করা। আর্টিষ্টের নিকট সৃজনীশক্তির অর্থ কি, সে বিষয়ে বিখ্যাত ফরাসী-লেখক Roman Rolland-এর মত নিম্নে উদ্ধৃত

করে দিচ্চি। আপনারা সকলেই জানেন যে ইনি এবার Nobel Prize লাভ করেছেন:—

The effort necessary to dominate and concentrate one's passion into a beautiful and clear form.

অলঙ্কারশাস্ত্রের এ যুগে সাহিত্য শাসন কর্‌বার সামর্থ্য নেই, কেন না এ যুগে সাহিত্যের বিচারালয় দেওয়ানি আদালত—ফৌজদারি নয়। বর্ত্তমানে অলঙ্কারের আইন—সাহিত্যের কার্য্যবিধি আইন,—দণ্ডবিধি আইন নয়। যদি আজকের দিনে অলঙ্কারের কোনও সার্থকতা থাকে ত সে এই কারণে, যে এ শাস্ত্র পাঠকদের কাব্যের beautiful and clear form চিন্‌তে এবং লেখকদের passion dominate and concentrate কর্‌তে কিঞ্চিৎ সাহায্য কর্‌তে পারে।

সুতরাং বঙ্গসাহিত্যে যে অলঙ্কারের সূত্রপাত হয়েছে এ আমি সাহিত্যের সুলক্ষণ মনে করি। এ সব আলোচনার ফলে, আমরা কাব্য রচনা কর্‌তে শিখি আর না শিখি, এই আত্মসংযমটুকু শিক্ষা কর্‌ব যে, আমরা কামারের দোকানে আর দইয়ের ফরমায়েস দেব না—যদিচ Metchnikoff-এর প্রসাদে আমরা সকলেই জানি যে দইয়ের মত স্বাস্থ্যকর পদার্থ এ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় নেই।

আমাদের এ ভয় পাবার দরকার নেই যে সৌন্দর্য্যের চর্চ্চা করাতে কাব্য সত্য এবং শিবভ্রষ্ট হয়ে পড়বে। সাহিত্যের ইতিহাস এই সত্যেরই পরিচয় দেয় যে, পৃথিবীর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর কাব্যমাত্রই মানবপ্রকৃতির সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত অতএব তা অশিব নয়। পৃথিবীতে মিথ্যাই হচ্ছে একমাত্র অমঙ্গলকর বস্তু। নানাপ্রকার

সামাজিক মতামত কালের প্রবাহে কিছুদিনের জন্য উপরে ভেসে উঠবে এবং সে দিনের আলোয় চিকমিক করবে—তার পর চিরদিনের মত বিস্মৃতির অতল গর্ভে তলিয়ে যাবে। কিন্তু কালিদাসের শকুন্তলা, দান্তের Divina Comedia, Shakespeare-এর Hamlet এবং Goethe-র Faust আবহমান কাল দাঁড়িয়ে থাক্‌বে—কেন না এ সকল কাব্য সত্যের অটলভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং সৌন্দর্য্যের অক্ষয় আলোকে মণ্ডিত।

সুতরাং বাঙ্গলার উদীয়মান আলঙ্কারিকদের নিকট আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা এই যে, তাঁরা যেন এ সত্য বিস্মৃত না হন, যে অলঙ্কার কাব্যের পিঠ-পিঠ আসে এবং উভয়ের ভিতর পিঠে পিঠে ভাইয়ের সম্বন্ধ থাকলেও অলঙ্কার কনিষ্ঠ এবং কাব্য জ্যেষ্ঠ। সাহিত্যের কোন কোন অবস্থায় অলঙ্কার জ্যেষ্ঠের পদবী গ্রহণ করতে বাধ্য হলেও জ্যেষ্ঠতাত হয়ে উঠবার অধিকারে সে একেবারেই বঞ্চিত।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

রাঁচি
১৯শে নভেম্বর ১৯১৫।

টীকাটিপ্পনি

লেখার উদ্দেশ্য

আমি যা লিখে থাকি তা অনেকের ভালো লাগে না। এই কথাটি আমাকে সাধারণত যে ভাষায় বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা হয় নানা স্বাভাবিক কারণে সে ভাষায় আমার দখল নেই। এইজন্য যথারীতি তার জবাব দেওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য।

এমন অবস্থায় হঠাৎ একখানি চিঠি পেলুম, সেই চিঠিতে অভিযোগ আছে কিন্তু অবমাননা নেই। চিঠিখানি কোনো মহিলার লেখা, তিনি আমার অপরিচিত। এই চিঠিতে তাঁর স্ত্রীজনোচিত সংযম ও সৌজন্য এবং মাতৃজনোচিত করুণা প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি দুঃখ বোধ করেছেন, কিন্তু দুঃখ দিতে চান নি।

তিনি নিজের কোনো ঠিকানা দেন নি, অথচ কয়েকটি প্রশ্ন করেছেন—এর থেকেই অনুমান করচি যে এই প্রশ্ন তিনি সাধারণের হ'য়ে পাঠিয়েছেন এবং সাধারণের ঠিকানাতেই এর জবাব চান।

অতএব তাঁর ভর্ৎসনার উত্তরে যে ক'টি কথা বলবার আছে সে আমি এই "সবুজপত্র"-যোগে তাঁর কাছে সবিনয়ে নিবেদন করি। এই উপলক্ষ্যে সাধারণত আমাদের দেশে যেভাবে সাহিত্য বিচার হয়ে থাকে প্রসঙ্গত সে সম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করব।

প্রথমত তিনি কিছু ক্ষোভের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করেছেন—"ঘরে-বাইরে" উপন্যাসখানি লেখবার উদ্দেশ্য কি?

এর সত্য উত্তরটি এই যে, উপন্যাস লেখার উদ্দেশ্যই উপন্যাস লেখা। সাদা কথায়, গল্প লিখ্‌ব আমার খুসি!

কিন্তু এ'কে উদ্দেশ্য বলা যায় না। কেননা "খুসি" বলাই উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করা। এবং যখন কোনো একটা উদ্দেশ্যই লোকে প্রত্যাশা করচে তখন সেটা নেই বল্লেই কথাটা স্পর্দ্ধার মত শুন্‌তে হয়।

কিন্তু অনেক সময় উদ্দেশ্য বাইরে থেকে দেখ্‌তে পাওয়া যায়। হরিণের গায়ে চিহ্ন আছে কেন হরিণ তা জানেনা, কিন্তু হরিণ সম্বন্ধে যাঁরা বই লেখেন তাঁরা বলেন, এর উদ্দেশ্য হচ্চে এই সমস্ত চিহ্নের দ্বারা বনের আলো ছায়ার সঙ্গে সে বেমালুম মিশিয়ে থাক্‌তে পারবে।

এই আন্দাজ সত্যও হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে কিন্তু উদ্দেশ্যটা যে হরিণের মনের নয় সে কথা সকলকেই মান্‌তে হবে।

উদ্দেশ্য হরিণের নয় কিন্তু হরিণের ভিতর দিয়ে বিশ্বকর্ম্মার একটা উদ্দেশ্য ত প্রকাশ পাচ্চে! তা হয় ত পাচ্চে। তেমনি যেকালে লেখক জন্মগ্রহণ করেচে সেই কালটি লেখকের ভিতর দিয়ে হয় ত আপন উদ্দেশ্য ফুটিয়ে তুলেচে। তাকে উদ্দেশ্য নাম দিতে পারি বা না পারি, এ কথা বলা চলে, যে, লেখকের কাল লেখকের চিত্তের মধ্যে গোচরে ও অগোচরে কাজ করচে।

আমি বলচি এ কাজও শিল্পকাজ;—শিক্ষাদানের কাজ নয়। কাল আমাদের মনের মধ্যে তার নানা রঙের সুতোয় জাল বুন্‌চে, সেই তার সৃষ্টি,—আমি তার থেকে যদি কিছু আদায় করতে চাই তবে সে উদ্দেশ্য আমারি।

আমাদের দেশের আধুনিক কাল গোপনে লেখকের মনে যে সব রেখাপাত করেচে, "ঘরে-বাইরে" গল্পের মধ্যে তার ছাপ পড়চে। কিন্তু এই ছাপার কাজ শিল্পকাজ। এর ভিতর থেকে যদি কোনো সুশিক্ষা বা কুশিক্ষা আদায় করবার থাকে সেটা লেখকের উদ্দেশ্যের অঙ্গ নয়।

পৃথিবীর খুব একজন বড় লেখকের লেখা সাম্‌নে ধরা যাক্। শেক্‌স্‌পিয়রের ওথেলো। কবিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় তাঁর উদ্দেশ্য কি, তিনি মুস্কিলে পড়্‌বেন। ভেবে চিন্তে যদি বা কোনো উত্তর দেন নিশ্চয়ই সেটা ভুল উত্তর হবে।

আমি যদি ব্রাহ্মণ-সভার সভ্য হই তবে আমি ঠিক করব কবির উদ্দেশ্য বর্ণভেদ বাঁচিয়ে চলা সম্বন্ধে জগৎকে সদুপদেশ দেওয়া। যদি স্বাধীন জেনেনার বিরুদ্ধপক্ষ হই তাহলে বল্‌ব, পরপুরুষের মুখদর্শন পরিহার করতে বলাই কবির পরামর্শ।

কিম্বা কবির বুদ্ধি বা ধর্ম্মজ্ঞানের প্রতি যদি আমার সন্দেহ থাকে তা হলে বল্‌ব, একনিষ্ঠ পাতিব্রত্যের নিদারুণ পরিণাম দেখিয়ে তিনি সতীত্বের মূলে কুঠারাঘাত করেচেন। কিম্বা ইয়াগোর চাতুরীকেই শেষ পর্য্যন্ত জয়ী করে তুলে সরলতার প্রতি নিষ্ঠুর বিদ্রূপ প্রকাশ করাই তাঁর মৎলব।

কিন্তু সোজা কথা হচ্চে তিনি নাটক লিখেচেন। সেই নাটকে কবির ভালো লাগা মন্দ লাগা, এমন কি, কবির দেশ কালও প্রকাশ পায় কিন্তু সেটা তত্ত্ব বা উপদেশরূপে নয়, শিল্পরূপেই। অর্থাৎ সমস্ত নাটকের অবিচ্ছিন্ন প্রাণ এবং লাবণ্যরূপে। যেমন একজন বাঙালীকে যখন দেখি তখন মানুষটার সঙ্গে তার জাতিকে তার

বাপদাদাকে সম্মিলিত করে দেখি; তার ব্যক্তি এবং তার জাতি দুইয়ের মাঝখানে কোনো জোড়ের চিহ্ন থাকে না; এও তেমনি। কবির কাব্যে স্বাতন্ত্র্যের সঙ্গে আর তার দেশকালের সঙ্গে একটা প্রাণগত সম্মিলন আছে।

তাই বল্‌ছিলুম, "ঘরে-বাইরে" গল্প যখন লেখা যাচ্চে তখন তার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের সাময়িক অভিজ্ঞতা জড়িত হয়ে পড়েচে এবং লেখকের ভালোমন্দ লাগাটাও বোনা হয়ে যাচ্চে কিন্তু সেই রঙীন্ সুতোগুলো শিল্পেরই উপকরণ। তাকে যদি অন্য কোনো উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায় তবে সে উদ্দেশ্য লেখকের নয়, পাঠকের। সৌখীন লোকে চমরীর পুচ্ছ থেকে চামর তৈরী করে—কিন্তু চমরী জানে তার পুচ্ছটা তার প্রাণের অন্তর্গত—ওটাকে কেটে নিয়ে চামর করা অন্তত তার উদ্দেশ্য নয়, যে করে তারই।

গল্পের মত

তার পরে কথা হচ্চে, আমার হৃদয়ভাবের সঙ্গে পাঠকের হৃদয়-ভাবের যখন বিরোধ ঘটল তখন পাঠক আমাকে দণ্ড দিতে বাধ্য।

মাটির উপর পড়ে গেলে শিশু যেমন মাটিকে মারে তেম্‌নি এমন স্থলে সাধারণ পাঠকে দণ্ড দিয়ে থাকে একথা আমার বিশেষ-রূপ জানা। তাই বলে' দণ্ড যে দিতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। ভূতকে না ভয় করতে পারি, এমন কি, ভূতের ভয় অনিষ্ট-কর মনে করতেও পারি তবু ভূতের ভয়ের গল্প পড়বার সময়ে সে কথা মনে রাখবার দরকার নেই। এখানে মতামতের কথা নয়, রসের অনুভূতির কথা। খৃষ্টান রসিক যখন কোনো হিন্দু আর্টিষ্টের

আঁকা দেবীমূর্ত্তির বিচার করেন, তখন যদি তিনি ভুলতে পারেন যে তিনি মিসনারী তা হলেই ভালো, যদি না পারেন তবে সে জন্যে হিন্দু আর্টিষ্টকে দোষ দেওয়া চলবে না। কারণ হিন্দু আর্টিষ্ট স্বভাবতই আপন মত বিশ্বাস সংস্কার অনুসারে ছবি আঁকবেই; কিন্তু যে হেতু সেটা ছবি সেই জন্যেই তার মধ্যে মত বিশ্বাস সংস্কারের অতীত একটি জিনিষ থাকবে,—সেটি হচ্চে রস; সে রস যদি অহিন্দুর অগ্রাহ্য হয় তবে, হয়, রসবোধের অভাবে সেটা অহিন্দুর দোষ, নয় রসের অভাবে সেটা হিন্দু আর্টিষ্টের দোষ। কিন্তু দোষটা মত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে না। প্রদীপ ইংরেজের এক রকম, এবং ডীট্‌জ্‌লণ্ঠন চলিত হবার পূর্ব্বে হিন্দুর অন্যরকম ছিল, তবু আলো জিনিষটা আলোই।

দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে আমার সঙ্গে পাঠকের মতভেদ থাকা সম্ভব—কিন্তু গল্পকে মত বলে দেখবার ত দরকার নেই—গল্প বলেই দেখতে হবে।

গল্পের খাতির

কিন্তু মত যখন এমন বিষয় নিয়ে যেটা দেশের একেবারে মর্ম্মের কথা তখন পাঠকের কাছ থেকেও অতটা বেশি নিরাসক্ত রসানুভূতি দাবী করা যায় না। তখন পাঠকের নিজের ব্যথা গল্পের ব্যথাকে ছাড়িয়ে ওঠে। অতএব সে জায়গায় রসের বিচারের চেয়ে রসের বিষয়বিচারটা স্বভাবতই বড় না হয়ে থাক্‌তে পারে না।

আচ্ছা বেশ, তাই মান্‌লুম। তাহলে এস্থলে লেখকের প্রতি উপদেশটা কি? নিজে যেটাকে ভালো মনে করি পাঠকের

খাতিরে চেষ্টা করব সেটাকে মন্দ মনে করতে? পাঠক যদি গল্পের খাতিরে সে কাজ করতে না পারেন তাহলে লেখকই বা পাঠকের খাতিরে এমন কাজ কি করে করবেন?

বস্তুত খাতিরটা গল্পের, লেখকেরও নয় পাঠকেরও নয়। সেই গল্পের খাতিরেই নিজের হৃদয়ভাব-সম্বন্ধে লেখককে নিজের হৃদয় অনুসরণ করতে হবেই এবং সেই গল্পের খাতিরেই পাঠককে গল্পের রস অনুসরণ করতে হবে।

যদি বলা যায় গল্পের খাতিরের চেয়ে দেশের খাতির বড়, তবে সে কথা পাঠক সম্বন্ধেও যেমন খাটে লেখক সম্বন্ধেও তেমনি। তাঁর সাময়িক একদল পাঠক তাঁকে বাহবা দেবে এ কথা লেখকের ভাববার নয়, তিনি ভাববেন তাঁর গল্পটি ঠিক মত হওয়া চাই; তাও যদি তাঁকে ভাবতে দেওয়া না যায় তবে দেশের ভালো হয় এই কথাই যেন তিনি ভাবেন, দেশ তাঁকে ভালো বলে এ কথা নয়।

আখ্যায়িকা

লেখিকার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এই উপন্যাসের আখ্যায়িকা কি আমার কল্পনাপ্রসূত, না বাস্তবে কোথাও তার আভাস পাওয়া গেছে। যদি পেয়ে থাকি তবে সে কি আধুনিক "পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী বিলাসী সম্প্রদায়ে না প্রাচীন হিন্দু পরিবারে?"

উত্তর এই—আখ্যায়িকাটি অধিকাংশ গল্পের আখ্যায়িকার মতই আমার কল্পনাপ্রসূত। কিন্তু এইটুকু মাত্র বল্‌লেই লেখিকার প্রশ্নের সম্পূর্ণ উত্তর দেওয়া হয় না। ঐ প্রশ্নের মধ্যে একটি কথা চাপা আছে, যে, এমন ঘটনা প্রাচীন হিন্দু পরিবারে অসম্ভব।

ঠিক একটা গল্পের ঘটনা সেই গল্পের অনুরূপ অবস্থার মধ্যেই ঘটতে পারে আর কোথাও ঘটতে পারে না—প্রাচীন বা নবীন, হিন্দু বা অহিন্দু কোনো পরিবারেই না। অতএব কোনো বিশেষ পরিবারে কি ঘটেচে সে কথা স্মরণ করে গুজব করাই চলে গল্প লেখা চলে না। মানবচরিত্রে যে সমস্ত সম্ভবপরতা আছে সেই গুলিকেই ঘটনাবৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে গল্পে নাটকে বিচিত্র করে তোলা হয়। মানবচরিত্রের মধ্যে চিরন্তনত্ব আছে কিন্তু ঘটনার মধ্যে নেই। ঘটনা নানা আকারে নানা জায়গায় ঘটে, একই ঘটনা দুইজায়গায় ঠিক একই রকম ঘটে না। কিন্তু তার মূলে যে মানবচরিত্র আছে সে চিরকালই নিজেকে প্রকাশ করে এসেচে। এইজন্য সেই মানবচরিত্রের প্রতিই লেখক দৃষ্টি রাখেন, কোনো ঘটনার নকল করার প্রতি নয়।

সাহিত্য-বিচার

তাহলে প্রশ্ন এই যে, প্রাচীন হিন্দু পরিবারে সর্ব্বত্রই মানবচরিত্র কি মনুসংহিতার রাশ মেনে চলে? কখনো লাগাম ছিঁড়ে খানার মধ্যে গিয়ে পড়ে না?

আমরা বৈদিক পৌরাণিক কাল থেকে এইটেই দেখে আসচি যে, বুনো ওলের সঙ্গে বাঘা তেঁতুলের লড়াইয়ের অন্ত নেই। একদিকে শাসনও কড়া, অন্যদিকে মানবের প্রকৃতিও উদ্দাম, তাই কখনো শাসন জেতে, কখনো প্রকৃতি। এই লড়াই যদি প্রাচীন হিন্দুপরিবারে সম্পূর্ণ অসম্ভব হয় তবে সেই প্রাচীন হিন্দুপরিবারের ঠিকানা এখনো পাওয়া যায়নি। তা ছাড়া একথাও মনে রাখা

আবশ্যক যেখানে মন্দ একেবারেই নেই সেখানে ভালোও নেই। প্রাচীন হিন্দুপরিবারে কারো পক্ষে মন্দ হওয়া যদি একেবারেই অসম্ভব হয় তাহলে সে পরিবারের লোক ভালোও নয়, মন্দও নয়, তারা সংহিতার কলের পুতুল। ভালোমন্দর দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে মানুষ ভালোকে বেছে নেবে বিবেকের দ্বারা, প্রথার দ্বারা নয়, এই হচ্চে মনুষ্যত্ব।

প্রাচীন সংস্কৃত উদ্ভট কবিতায় যে সকল কুৎসিত স্ত্রীনিন্দা দেখতে পাই বর্ত্তমান কোনো পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানীর লেখায় তার আভাসমাত্র পাওয়া যায় না। তার কারণ আধুনিক কবিরা স্ত্রীজাতিকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করে থাকেন। এ কথা নিশ্চিত সত্য, যে, সেই সকল প্রাচীন স্ত্রীনিন্দাগুলি স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে মিথ্যা কিন্তু যদি স্ত্রীবিশেষ সম্বন্ধেও মিথ্যা হয় তবে সেই কবিতাগুলির উদ্ভব হল কোথা হতে?

তাহলে বোধ হয় তর্কটা এই রকম দাঁড়াবে,—মানবপ্রকৃতির মধ্যে নিয়মলঙ্ঘন করবার একটা বেগ আছে কিন্তু সেটা কি সাহিত্যে বর্ণনা করবার বিষয়? এ তর্কের উত্তর আবহমান কালের সমস্ত সাহিত্যই দিচ্চে, অতএব আমি নিরুত্তর থাক্‌লেও ক্ষতি হবে না।

দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে অধিকাংশ সমালোচকের হাতে সাহিত্যবিচার স্মৃতিশাস্ত্রবিচারের অঙ্গ হয়ে উঠেচে। বঙ্কিমের কোন্ নায়িকা "হিন্দুরমণী" হিসাবে কতটা উৎকর্ষ প্রকাশ করেচে তাই নিয়ে সমালোচক-মহলে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ চলে থাকে। ভ্রমর তার স্বামীর প্রতি অভিমান করেছিল সেটাতে তার হিন্দু

সতীত্বে কতটা খাদ ধরা পড়েচে, সূর্য্যমুখী স্বামীর প্রেয়সী সতীনকে নিজেরও প্রেয়সী করতে না পারাতে তার হিন্দুরমণীত্বের কতটা লাঘব হয়েচে, শকুন্তলা কি আশ্চর্য্য হিন্দুনারী, দুষ্যন্ত কি আশ্চর্য্য হিন্দুরাজা, এই সকল বিচারপ্রহসন আমাদের দেশে সাহিত্য-বিচারের নাম ধরে নিজের গাম্ভীর্য্য বাঁচিয়ে চল্‌তে পারে— জগতে আর কোথাও এমন দেখা যায় না। শেক্‌স্‌পিয়র্‌ অনেক নায়িকার সৃষ্টি করেচেন কিন্তু তাদের মধ্যে ইংরেজ-রমণীত্ব কতটা প্রকট হয়েচে এ নিয়ে কেউ চিন্তা করে না, এমন কি, তাদের খৃষ্টানীর মাত্রা নিক্তির ওজনে পরিমাপ করে পয়লা দোসরা মার্কা দেওয়া খৃষ্টান পাদ্রিদের দ্বারাও ঘটা সম্ভব নয়।

আমি হয় ত এ কথা বলে ভালো করলুম না। কেন না, জগতে যা কোথাও নেই সেইটেই ভারতে আছে এই হচ্চে আধুনিক বাঙালীর গর্ব্ব। কিন্তু ভারত ত বাঙালীর সৃষ্টি নয়, আমরা সাহিত্য-সমালোচনা সুরু করবার পূর্ব্বেও ভারতবর্ষ ছিল। সেই ভারতের অলঙ্কারশাস্ত্রে নায়িকাবিচার মনুপরাশরের সঙ্গে মিলিয়ে করা হয় নি, মানবচরিত্রের বৈচিত্র্য অনুসারেই তাদের শ্রেণীবিভাগের চেষ্টা হয়েছিল। আমি এ রকম শ্রেণীবিভাগ ভালো বলিনে; কারণ সাহিত্য ত বিজ্ঞান নয়; সাহিত্যে শ্রেণীর ছাঁচে নায়ক নায়িকার ঢালাই হতে থাক্‌লে সেটা পুতুলের রাজ্য হয়, প্রাণের রাজ্য হয় না। তবু যদি নিতান্তই শ্রেণীবিভাগের সখ সাহিত্যেও মেটাতে হয় তাহলে ধর্ম্মশাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট হিন্দু ও অহিন্দু এই দুই শ্রেণী না ধরে যথাসম্ভব মানবস্বভাবের বৈচিত্র্য অনুসারে শ্রেণীবিভাগ করা কর্ত্তব্য।

স্বদেশ প্রেম

লেখিকার কাছে আমার শেষ নিবেদন এই যে, গল্পের ভিতর থেকে গল্পের চেয়ে বেশি কিছু যদি আদায় করতেই হয় তাহলে অন্তত গল্পের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। আর একটি কথা এই যে, আমিও দেশকে ভালোবাসি, তা যদি না হত তাহলে দেশের লোকের কাছে লোকপ্রিয় হওয়া আমার পক্ষে কঠিন হত না। সত্য প্রেমের পথ আরামের নয়, সে পথ দুর্গম। সিদ্ধিলাভ সকলের শক্তিতে নেই এবং সকলের ভাগ্যেও ফলে না কিন্তু দেশের প্রেমে যদি দুঃখ ও অপমান সহ্য করি তা হলে মনে এই সান্ত্বনা থাকবে যে কাঁটা বাঁচিয়ে চলবার ভয়ে সাধনায় মিথ্যাচরণ করি নি। দুঃখ পাই তাতে দুঃখ নেই কিন্তু আমার সকলের চেয়ে বেদনার বিষয় এই যে, যা সত্য মনে করি তাকে প্রকাশ করতে গিয়ে লেখিকার মত অনেক সরল, শ্রদ্ধাবান, স্বদেশবৎসল ও সকরুণ হৃদয়ে বেদনা দিয়েছি ; সে আমার দুর্ভাগ্য কিন্তু সে আমার অপরাধ নয়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সবুজ পত্র

শিক্ষার বাহন

প্রয়োজনের দিক হইতে দেখিলে বিদ্যায় মানুষের কত প্রয়োজন সে কথা বলা বাহুল্য। অথচ সেদিক দিয়া আলোচনা করিতে গেলে তর্ক ওঠে। চাষীকে বিদ্যা শিখাইলে তার চাষ করিবার শক্তি কমে কি না, স্ত্রীলোককে বিদ্যা শিখাইলে তার হরিভক্তি ও পতিভক্তির ব্যাঘাত হয় কি না এ সব সন্দেহের কথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। অর্থাৎ যে বেহারা বসিয়া বসিয়া পাখা টানিবে তার পক্ষে আলোর চেয়ে অন্ধকার বেশি কাজের, যে গোরু ঘানি ঠেলিবে তার পক্ষে খোলা আকাশের চেয়ে চোখের ঠুলিই বড় সহায় একথা সহজেই মনে আসে। যে দেশে একই চক্রে ঘানি. ঠেলাটা সব চেয়ে বড় কাজ সে দেশের বিজ্ঞ-লোকেরা আলোটাকে শত্রু মনে করিতে পারেন।

কিন্তু দিনের আলোককে আমরা কাজের প্রয়োজনের চেয়ে আরো বড় করিয়া দেখিতে পারি, সে হচ্চে জাগার প্রয়োজন। এবং তার চেয়ে আরো বড় কথা, এই আলোতে মানুষ মেলে, অন্ধকারে মানুষ বিচ্ছিন্ন হয়।

জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড় ঐক্য। বাংলা দেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে য়ুরোপের প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।

জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে জগৎজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে, যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়—সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক্ কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোনো কারণেই বঞ্চিত করিবার কথা মনেই করা যায় না।

সেই জ্ঞানের প্রদীপ এই ভারতবর্ষে কত বহু দূরে দূরে এবং কত মিটমিট্ করিয়া জ্বলিতেছে সে কথা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি ভারতবাসীর পক্ষে সেই পরম যোগের পথ কত সঙ্কীর্ণ, যে যোগ জ্ঞানের যোগ, যে যোগে সমস্ত পৃথিবীর লোক আজ মিলিত হইবার সাধনা করিতেছে।

যাহা হউক, বিদ্যাশিক্ষার উপায় ভারতবর্ষে কিছু কিছু হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যাবিস্তারের বাধা এখানে মস্ত বেশি। নদী দেশের একধার দিয়া চলে, বৃষ্টি আকাশ জুড়িয়া হয়। তাই ফসলের সব চেয়ে বড় বন্ধু বৃষ্টি, নদী তার অনেক নীচে; শুধু তাই নয়, এই বৃষ্টিধারার উপরেই নদীজলের গভীরতা, বেগ এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে।

আমাদের দেশে যাঁরা বজ্রহাতে ইন্দ্রপদে বসিয়া আছেন, তাঁদের সহস্রচক্ষু, কিন্তু বিদ্যার এই বর্ষণের বেলায় অন্তত তার

৯৯০টা চক্ষু নিদ্রা দেয়। গর্জ্জনের বেলায় অট্টহাস্যের বিদ্যুৎ বিকাশ করিয়া বলেন, বাবুগুলার বিদ্যা একটা অদ্ভুত জিনিষ,—তার খোসার কাছে তলতল্ করে তার আঁঠির কাছে পাক ধরে না। যেন এটা বাবুসম্প্রদায়ের প্রকৃতিগত। কিন্তু বাবুদের বিদ্যা-টাকে যে প্রণালীতে জাগ দেওয়া হয় সেই প্রাণালীতেই আমাদের উপরওয়ালাদের বিদ্যাটাকেও যদি পাকানোর চেষ্টা করা যাইত তবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে প্রমাণ হইত যে, যে-বিদ্যার উপরে ব্যাপক শিক্ষার সূর্য্যালোকের তা লাগে না তার এমনি দশাই হয়।

জবাবে কেহ কেহ বলেন, পশ্চিম যখন পশ্চিমেই ছিল পূর্ব্ব-দেশের ঘাড়ে আসিয়া পড়ে নাই তখন তোমাদের টোলে চতুষ্পাঠীতে যে তর্কশাস্ত্রের প্যাঁচ কষা এবং ব্যাকরণ সূত্রের জাল বোনা চলিত সেও ত অত্যন্ত কুণোরকমের বিদ্যা। একথা মানি, কিন্তু বিদ্যার যে অংশটা নির্জ্জলা পাণ্ডিত্য সে অংশ সকল দেশেই পংগু এবং কুণো; পশ্চিমেও পেডাণ্ট্রি মরিতে চায় না। তবে কিনা যে দেশ দুর্গতিগ্রস্ত সেখানে বিদ্যার বল কমিয়া গিয়া বিদ্যার কায়দা-টাই বড় হইয়া ওঠে। তবু একথা মানিতে হইবে তখনকার দিনের পাণ্ডিত্যটাই তর্কচুঞ্চু ও ন্যায়পঞ্চাননদের মগজের কোণে কোণে বদ্ধ ছিল বটে কিন্তু তখনকার কালের বিদ্যাটা সমাজের নাড়ীতে নাড়ীতে সজীব ও সবল হইয়া বহিত। কি গ্রামের নিরক্ষর চাষী, কি অন্তঃপুরের স্ত্রীলোক সকলেরই মন নানা উপায়ে এই বিদ্যার সেঁচ পাইত। সুতরাং এ জিনিষের মধ্যে অন্য অভাব অসম্পূর্ণতা যাই থাক্ ইহা নিজের মধ্যে সুসঙ্গত ছিল।

কিন্তু আমাদের বিলাতী বিদ্যাটা কেমন ইস্কুলের জিনিষ হইয়া

সাইন্‌বোর্ডে টাঙানো থাকে, আমাদের জীবনের ভিতরের সামগ্রী হইয়া যায় না। তাই পশ্চিমের শিক্ষায় যে ভালো জিনিষ আছে তার অনেকখানি আমাদের নোটবুকেই আছে; সে কি-চিন্তায়, কি-কাজে ফলিয়া উঠিতে চায় না।

আমাদের দেশের আধুনিক পণ্ডিত বলেন, ইহার একমাত্র কারণ জিনিষটা বিদেশী। একথা মানি না। যা সত্য তার জিয়োগ্রাফী নাই। ভারতবর্ষও একদিন যে সত্যের দীপ জ্বালিয়াছে তা পশ্চিম মহাদেশকেও উজ্জ্বল করিবে, এ যদি না হয় তবে ওটা আলোই নয়। বস্তুত যদি এমন কোনো ভালো থাকে যা একমাত্র ভারতবর্ষেরই ভালো তবে তা ভালোই নয় একথা জোর করিয়া বলিব। যদি ভারতের দেবতা ভারতেরই হন তবে তিনি আমাদের স্বর্গের পথ বন্ধ করিবেন কারণ স্বর্গ বিশ্বদেবতার।

আসল কথা, আধুনিক শিক্ষা তার বাহন পায় নাই—তার চলাফেরার পথ খোলসা হইতেছে না। এখনকার দিনে সর্ব্বজনীন শিক্ষা সকল সভ্য দেশেই মানিয়া লওয়া হইয়াছে। যে কারণেই হউক আমাদের দেশে এটা চলিল না। মহাত্মা গোখ্‌লে এই লইয়া লড়িয়া ছিলেন। শুনিয়াছি দেশের মধ্যে বাংলা দেশের কাছ হইতেই তিনি সব চেয়ে বাধা পাইয়াছেন। বাংলা দেশে শুভবুদ্ধির ক্ষেত্রে আজকাল হঠাৎ সকল দিক হইতেই একটা অদ্ভুত মহামারীর হাওয়া বহিয়াছে। ভূতের পা পিছন দিকে, বাংলা দেশে সামাজিক সকল চেষ্টারই পা পিছনে ফিরিয়াছে। আমরা ঠিক করিয়াছি সংসারে চলিবার-পথে আমরা পিছন মুখে চলিব কেবল রাষ্ট্রীয় সাধনার আকাশে উড়িবার পথে আমরা সামনের

দিকে উড়িব, আমাদের পা যেদিকে আমাদের ডানা ঠিক তার উল্টা দিকে গজাইবে।

যে সর্ব্বজনীন শিক্ষা দেশের উচ্চশিক্ষার শিকড়ে রস জোগাইবে কোথাও তার সাড়া পাওয়া গেল না, তার উপরে আবার আর-এক উপসর্গ জুটিয়াছে। একদিকে আসবাব বাড়াইয়া অন্যদিকে স্থান কমাইয়া আমাদের সঙ্কীর্ণ উচ্চশিক্ষার আয়তনকে আরো সঙ্কীর্ণ করা হইতেছে। ছাত্রের অভাব ঘটুক কিন্তু সরঞ্জামের অভাব না ঘটে সেদিকে কড়া দৃষ্টি।

কাগজে দেখিলাম সেদিন বেহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিৎ গাড়িতে গিয়া ছোটলাট বলিয়াছেন, যে, যারা বলে ইমারতের বাহুল্যে আমরা শিক্ষার সম্বল খর্ব্ব করি তারা অবুঝ, কেননা, শিক্ষা ত কেবল জ্ঞান লাভ নয়, ভালো ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করাও একটা শিক্ষা ;—ক্লাসে বড় অধ্যাপকের চেয়ে বড় দেয়ালটা বেশি বই কম দরকারী নয়।

মানুষের পক্ষে অন্নেরও দরকার থালারও দরকার এ কথা মানি কিন্তু গরীবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করাই দরকার। যখন দেখিব ভারত জুড়িয়া বিদ্যার অন্নসত্র খোলা হইয়াছে তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোনার থালা দাবী করিবার দিন আসিবে। আমাদের জীবনযাত্রা গরীবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহ্যাড়ম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকার থলি তৈরী করার মত হইবে।

আঙিনায় মাদুর বিছাইয়া আমরা আসর জমাইতে পারি, কল্‌

পাতায় আমাদের ধনীর যজ্ঞের ভোজও চলে। আমাদের দেশের নমস্য যাঁরা তাঁদের অধিকাংশই খোড়ো ঘরে মানুষ,—এদেশে লক্ষ্মীর কাছ হইতে ধার না লইলে সরস্বতীর আসনের দাম কমিবে এ কথা আমাদের কাছে চলিবে না।

পূর্ব্বদেশে জীবনসমস্যার সমাধান আমাদের নিজের প্রণালীতেই করিতে হইয়াছে। আমরা অশনে বসনে যতদূর পারি বস্তুভার কমাইয়াছি। এ বিষয়ে এখানকার জল-হাওয়া হাতে ধরিয়া আমাদের হাতে খড়ি দিয়াছে। ঘরের দেয়াল আমাদের পক্ষে তত আবশ্যক নয় যতটা আবশ্যক দেয়ালের ফাঁক; আমাদের গায়ের কাপড়ের অনেকটা অংশই তাঁতীর তাঁতের চেয়ে আকাশের সূর্য্যকিরণেই বোনা হইতেছে; আহারের যে অংশটা দেহের উত্তাপ সঞ্চারের জন্য তার অনেকটার বরাৎ পাকশালার ও পাক-যন্ত্রের পরে নয়, দেবতার পরে। দেশের প্রাকৃতিক এই সুযোগ জীবনযাত্রায় খাটাইয়া আমাদের স্বভাবটা এক রকম দাঁড়াইয়া গেছে—শিক্ষাব্যবস্থায় সেই স্বভাবকে অমান্য করিলে বিশেষ লাভ আছে এমন ত আমার মনে হয় না।

গাছতলায় মাঠের মধ্যে আমার এক বিদ্যালয় আছে। সে বিদ্যালয়টি তপোবনের শকুন্তলারই মত—অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিসলয়-মলূনং কররুহৈঃ—অবশ্য ইন্‌স্পেক্টরের কররুহ। মৈত্রেয়ী যেমন যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিয়াছিলেন তিনি উপকরণ চান না, অমৃতকে চান,—এই বিদ্যালয়ের হইয়া আমার সেই কামনা ছিল। এইখানে ছোট লাটের সঙ্গে একটা খুব গোড়ার কথায় আমাদের হয় ত অমিল আছে —এবং এইখানটায় আমরাও তাঁকে উপদেশ দিবার অধিকার

রাখি। সত্যকে গভীর করিয়া দেখিলে দেখা যায়—উপকরণের একটা সীমা আছে যেখানে অমৃতের সঙ্গে তার বিরোধ বাধে। মেদ যেখানে প্রচুর, মজ্জা সেখানে দুর্ব্বল।

দৈন্য জিনিষটাকে আমি বড় বলি না। সেটা তামসিক। কিন্তু অনাড়ম্বর, বিলাসীর ভোগসামগ্রীর চেয়ে দামে বেশি, তাহা সাত্ত্বিক। আমি সেই অনাড়ম্বরের কথা বলিতেছি যাহা পূর্ণতারই একটি ভাব, যাহা আড়ম্বরের অভাবমাত্র নহে। সেই ভাবের যেদিন আবির্ভাব হইবে সেদিন সভ্যতার আকাশ হইতে বস্তুকুয়াশার বিস্তর কলুষ দেখিতে দেখিতে কাটিয়া যাইবে। সেই ভাবের অভাব আছে বলিয়া যে-সব জিনিষ প্রত্যেক মানুষের পক্ষে একান্ত আবশ্যক তাহা দুর্ম্মূল্য ও দুর্ভর হইতেছে; গান বাজনা, আহার বিহার, আমোদ আহ্লাদ, শিক্ষা দীক্ষা, রাজ্যশাসন, আইন আদালত সভ্য দেশে সমস্তই অতি জটিল, সমস্তই মানুষের বাহিরের ও ভিতরের প্রভূত জায়গা জুড়িয়া বসে। এই বোঝার অধিকাংশই অনাবশ্যক—এই বিপুল ভার বহনে মানুষের জোর প্রকাশ পায় বটে, ক্ষমতা প্রকাশ পায় না,—এইজন্য বর্ত্তমান সভ্যতাকে যে-দেবতা বাহির হইতে দেখিতেছেন তিনি দেখিতেছেন ইহা অপটু দৈত্যের সাঁতার-দেওয়ার মত, তার হাত পা ছোঁড়ায় জল ঘুলাইয়া ফেনাইয়া উঠিতেছে;—সে জানেও না এত বেশি হাঁসফাঁস করার যথার্থ প্রয়োজন নাই। মুস্কিল এই যে দৈত্যটার দৃঢ় বিশ্বাস যে প্রচণ্ড জোরে হাত পা ছোঁড়াটারই একটা বিশেষ মূল্য আছে। যেদিন পূর্ণতার সরল সত্য সভ্যতার অন্তরের মধ্যে আবির্ভূত হইবে সেদিন পাশ্চাত্য বৈঠকখানার দেয়াল হইতে জাপানী পাখা,

দেশকে শিক্ষা দেওয়া ষ্টেটের গরজ ইহা ত অন্যত্র দেখিয়াছি। এই জন্য য়ুরোপে জাপানে আমেরিকায় শিক্ষায় কৃপণতা নাই। কেবলমাত্র আমাদের গরীব দেশেই শিক্ষাকে দুর্ম্মূল্য ও দুর্লভ করিয়া তোলাতেই দেশের বিশেষ মঙ্গল—এ কথা উচ্চাসনে বসিয়া যত উচ্চস্বরে বলা হইবে বেসুর ততই উচ্চ সপ্তকে উঠিবে। মাতার স্তন্যকে দুর্ম্মূল্য করিয়া তোলাই উচিত, এমন কথা যদি স্বয়ং লর্ড কার্জ্জন্‌ও শপথ করিয়া বলিতেন তবু আমরা বিশ্বাস করিতাম না যে শিশুর প্রতি করুণায় রাত্রে তাঁর ঘুম হয় না।

বয়স বাড়িতে বাড়িতে শিশুর ওজন বাড়িবে এই ত স্বাস্থ্যের লক্ষণ। সমান থাকিলেও ভালো নয়, কমিতে থাকিলে ভাবনার কথা। তেমনি, আমাদের দেশে যেখানে শিক্ষার অধিকাংশ জমিই পতিত আছে সেখানে বছরে বছরে ছাত্রসংখ্যা বাড়িবে হিতৈষীরা এই প্রত্যাশা করে। সমান থাকিলে সেটা দোষের, আর সংখ্যা যদি কমে ত বুঝিব, পাল্লাটা মরণের দিকে ঝুঁকিয়াছে। বাংলা দেশে ছাত্রসংখ্যা কমিল। সে জন্যে শিক্ষাবিভাগে উদ্বেগ নাই। এই উপলক্ষ্যে একটি ইংরেজি কাগজে লিখিয়াছে,—এই ত দেখি লেখাপড়ায় বাঙালীর সখ আপনিই কমিয়াছে—যদি গোখ্‌লের অবশ্যশিক্ষা এখানে চলিত তবে ত অনিচ্ছুকের পরে জুলুম করাই হইত।

এ সব কথা নির্ম্মমের কথা। নিজের জাতের সম্বন্ধে এমন কথা কেহ এমন অনায়াসে বলিতে পারে না। আজ ইংলণ্ডে যদি দেখা যাইত লোকের মনে শিক্ষার সখ আপনিই কমিয়া

আসিতেছে তবে নিশ্চয়ই এই সব লোকই উৎকণ্ঠিত হইয়া লিখিত যে কৃত্রিম উপায়েও শিক্ষার উত্তেজনা বাড়াইয়া তোলা উচিত।

নিজের জাতির পরে যে-দরদ বাঙালীর পরেও ইংরেজের সেই দরদ হইবে এমন আশা করিতেও লজ্জা বোধ করি। কিন্তু জাতিপ্রেমের সমস্ত দাবী মিটাইয়াও মনুষ্যপ্রেমের হিসাবে কিছু প্রাপ্য বাকি থাকে। ধর্ম্মবুদ্ধির বর্ত্তমান অবস্থায় স্বজাতির জন্য প্রতাপ, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি অনেক দুর্ল্লভ জিনিষ অন্যকে বঞ্চিত করিয়াও লোকে কামনা করে কিন্তু এখনো এমন কিছু আছে যা খুব কম করিয়াও সকল মানুষেরই জন্য কামনা করা যায়। আমরা কোনো দেশের সম্বন্ধেই এমন কথা বলিতে পারি না যে, সেখানকার স্বাস্থ্য যখন আপনিই কমিয়া আসিতেছে তখন সে দেশের জন্য ডাক্তার খরচটা বাদ দিয়া অন্ত্যেষ্টি সৎকারেরই আয়োজনটা পাকা করা উচিত।

তবে কি না, এ কথাও কবুল করিতে হইবে, স্বজাতি সম্বন্ধে আমাদের নিজের মনে শুভবুদ্ধি যথেষ্ট সজাগ নয় বলিয়াই বাহিরের লোক আমাদের অন্নবস্ত্র বিদ্যাবুদ্ধির মূল্য খুব কম করিয়া দেখে। দেশের অন্ন, দেশের বিদ্যা, দেশের স্বাস্থ্য আমরা তেমন করিয়া চাই নাই। পরের কাছে চাহিয়াছি, নিজের কাছে নহে। ওজর করিয়া বলি আমাদের সাধ্য কম, কিন্তু আমাদের সাধনা তার চেয়েও অনেক কম।

দেশের দাম আমাদের নিজের কাছে যত, অন্যের কাছে তার চেয়ে বেশি দাবী করিলে সে একরকম ঠকানো হয়। ইহাতে

বড় কেহ ঠকেও না। কেবল চিনাবাজারের দোকানদারের মত করিয়া পরের কাছে দর চড়াইয়া সময় নষ্ট করিয়া থাকি। তাতে যে পরিমাণে সময় যায় সে পরিমাণে লাভ হয় না। এতকাল রাষ্ট্রীয় হাটে সেই দোকানদারি করিয়া আসিয়াছি; যে জিনিষের জন্য নিজে যত দাম দিয়াছি বা দিতে রাজি তার চেয়ে অনেক বড় দাম হাঁকিয়া খুব একটা হট্টগোল করিয়া কাটাইলাম।

শিক্ষার জন্য আমরা আবদার করিয়াছি, গরজ করি নাই। শিক্ষাবিস্তারে আমাদের গা নাই। তার মানে, শিক্ষার ভোজে নিজেরা বসিয়া যাইব, পাতের প্রসাদটুকু পর্য্যন্ত আর কোনো ক্ষুধিত পায় বা না পায় সেদিকে খেয়ালই নাই। এমন কথা যারা বলে, নিম্নসাধারণের জন্য যথেষ্ট শিক্ষার দরকার নাই, তাতে তাদের ক্ষতিই করিবে, তারা কর্ত্তৃপক্ষদের কাছ হইতে এ কথা শুনিবার অধিকারী যে, বাঙালীর পক্ষে বেশি শিক্ষা অনাবশ্যক, এমন কি, অনিষ্টকর।—জনসাধারণকে লেখাপড়া শেখাইলে আমাদের চাকর জুটিবে না এ কথা যদি সত্য হয় তবে আমরা লেখাপড়া শিখিলে আমাদেরও দাস্যভাবের ব্যাঘাত হইবে এ আশঙ্কাও মিথ্যা নহে।

এ সম্বন্ধে নিজের মনের ভাবটা ঠিকমত যাচাই করিতে হইলে ছুটো একটা দৃষ্টান্ত দেখা দরকার। আমরা বেঙ্গল প্রোভিন্‌শ্যাল কন্‌ফারেন্স্‌ নামে একটা রাষ্ট্রসভার সৃষ্টি করিয়াছি। সেটা প্রাদেশিক, তার প্রধান উদ্দেশ্য বাংলার অভাব ও অভিযোগ সম্বন্ধে সকলে মিলিয়া আলোচনা করিয়া বাঙালীর চোখ ফুটাইয়া

দেওয়া। বহুকাল পর্য্যন্ত এই নিতান্ত সাদা কথাটা কিছুতেই আমাদের মনে আসে নাই যে, তা করিতে হইলে বাংলা ভাষায় আলোচনা করা চাই। তার কারণ, দেশের লোককে দেশের লোক বলিয়া সমস্ত চৈতন্য দিয়া আমরা বুঝি না। এই জন্যই দেশের পূরা দাম দেওয়া আমাদের পক্ষে অসম্ভব। যা চাহিতেছি তা পেট ভরিয়া পাই না তার কারণ এ নয় যে, দাতা প্রসন্নমনে দিতেছে না—তার কারণ এই যে আমরা সত্যমনে চাহিতেছি না।

বিদ্যাবিস্তারের কথাটাকে যখন ঠিকমত মন দিয়া দেখি তখন তার সর্ব্বপ্রধান বাধাটা এই দেখিতে পাই যে তার বাহনটা ইংরেজি। বিদেশী মাল জাহাজে করিয়া সহরের ঘাট পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিতে পারে কিন্তু সেই জাহাজটাতে করিয়াই দেশের হাটে হাটে আমদানি রফতানি করাইবার দুরাশা মিথ্যা। যদি বিলিতি জাহাজটাকেই কায়মনে আঁকড়াইয়া ধরিতে চাই তবে ব্যবসা সহরেই আট্‌কা পড়িয়া থাকিবে।

এ পর্য্যন্ত এ অসুবিধাটাতে আমাদের অসুখ বোধ হয় নাই। কেননা মুখে যাই বলি মনের মধ্যে এই সহরটাকেই দেশ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। দাক্ষিণ্য যখন খুব বেশি হয় তখন এই পর্য্যন্ত বলি, আচ্ছা বেশ, খুব গোড়ার দিকের মোটা শিক্ষাটা বাংলা ভাষায় দেওয়া চলিবে কিন্তু সে যদি উচ্চশিক্ষার দিকে হাত বাড়ায় তবে গমিষ্যত্যুপহাস্যতাম্‌।

আমাদের এই ভীরুতা কি চিরদিনই থাকিয়া যাইবে? ভরসা করিয়া এটুকু কোনোদিন বলিতে পারিব না যে, উচ্চশিক্ষাকে আমাদের দেশের ভাষায় দেশের জিনিষ করিয়া লইতে হইবে?

পশ্চিম হইতে যা কিছু শিখিবার আছে জাপান তা দেখিতে দেখিতে সমস্ত দেশে ছড়াইয়া দিল, তার প্রধান কারণ, সেই শিক্ষাকে তারা দেশী ভাষার আধারে বাঁধাই করিতে পারিয়াছে।

অথচ জাপানী ভাষার ধারণাশক্তি আমাদের ভাষার চেয়ে বেশি নয়। নূতন কথা সৃষ্টি করিবার শক্তি আমাদের ভাষায় অপরিসীম। তা ছাড়া য়ুরোপের বুদ্ধিবৃত্তির আকার প্রকার যতটা আমাদের সঙ্গে মেলে এমন জাপানীর সঙ্গে নয়। কিন্তু উদ্যোগী পুরুষসিংহ কেবলমাত্র লক্ষ্মীকে পায় না, সরস্বতীকেও পায়। জাপান জোর করিয়া বলিল, য়ুরোপের বিদ্যাকে নিজের বাণীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিব। যেমন বলা, তেম্‌নি করা, তেম্‌নি তার ফললাভ। আমরা ভরসা করিয়া এ পর্য্যন্ত বলিতেই পারিলাম না যে, বাংলাভাষাতেই আমরা উচ্চশিক্ষা দিব, এবং দেওয়া যায়, এবং দিলে তবেই বিদ্যার ফসল দেশ জুড়িয়া ফলিবে।

আমাদের ভরসা এতই কম যে স্কুল কলেজের বাহিরে আমরা যে-সব লোকশিক্ষার আয়োজন করিয়াছি সেখানেও বাংলা ভাষার প্রবেশ নিষেধ। বিজ্ঞানশিক্ষাবিস্তারের জন্য দেশের লোকের চাঁদায় বহুকাল হইতে সহরে এক বিজ্ঞান-সভা খাড়া দাঁড়াইয়া আছে। প্রাচ্যদেশের কোনো কোনো রাজার মত গৌরবনাশের ভয়ে জনসাধারণের কাছে সে বাহির হইতেই চায় না। বরং অচল হইয়া থাকিবে তবু কিছুতে সে বাংলা বলিবে না। ও যেন বাঙালীর চাঁদা দিয়া বাঁধানো পাকা ভিতের উপর বাঙালীর অক্ষমতা ও ঔদাসীন্যের স্মরণস্তম্ভের মত স্থাণু হইয়া আছে। কথাও বলে না, নড়েও না। উহাকে ভুলিতেও পারি না, উহাকে মনে রাখাও শক্ত।

ওজর এই যে, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষা অসম্ভব। ওটা অক্ষমের ভীরুর ওজর। কঠিন বৈ কি, সেইজন্যেই কঠোর সঙ্কল্প চাই। একবার ভাবিয়া দেখুন, একে ইংরেজি তা'তে সায়ান্স, তার উপরে, দেশে যে সকল বিজ্ঞানবিশারদ আছেন তাঁরা জগদ্বিখ্যাত হইতে পারেন কিন্তু দেশের কোণে এই যে একটুখানি বিজ্ঞানের নীড় দেশের লোক বাঁধিয়া দিয়াছে এখানে তাঁদের ফলাও জায়গা নাই—এমন অবস্থায় এই পদার্থটা বঙ্গসাগরের তলায় যদি ডুব মারিয়া বসে তবে ইহার সাহায্যে সেখানকার মৎস্যশাবকের বৈজ্ঞানিক উন্নতি আমাদের বাঙালীর ছেলের চেয়ে যে কিছুমাত্র কম হইতে পারে এমন অপবাদ দিতে পারিব না।

মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালীকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক্—সমস্ত বাঙালীর প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালীর এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই আমরা দ্বিজ হই?

বলা বাহুল্য, ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই—শুধু পেটের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি কেন? ফরাসী জর্ম্মাণ শিখিলে আরো ভালো। সেই সঙ্গে এ কথা বলাও বাহুল্য অধিকাংশ বাঙালী ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিম্বা অর্দ্ধাশনই ব্যবস্থা এ কথা কোন্‌মুখে বলা যায়?

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে বড় কারখানা আছে তার কলের চাকার অল্পমাত্র বদল করিতে গেলেই বিস্তর হাতুড়ি-পেটাপেটি করিতে হয়—সে খুব শক্ত হাতের কর্ম্ম। আশুমুখুজ্জেমশায় ওরি মধ্যে একজায়গায় একটুখানি বাংলা হাতল জুড়িয়া দিয়াছেন।

তিনি যেটুকু করিয়াছেন তার ভিতরকার কথা এই,—বাঙালীর ছেলে ইংরেজি বিদ্যায় যতই পাকা হোক্ বাংলা না শিখিলে তার শিক্ষা পূরা হইবে না। কিন্তু এ ত গেল যারা ইংরেজি জানে তাদেরি বিদ্যাকে চৌকষ করিবার ব্যবস্থা। আর, যারা বাংলা জানে ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এত বড় অস্বাভাবিক নির্ম্মমতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে?

আমাকে লোকে বলিবে শুধু কবিত্ব করিলে চলিবে না—একটা প্র্যাক্‌টিকেল পরামর্শ দাও, অত্যন্ত বেশি আশা করাটা কিছু নয়। অত্যন্ত বেশি আশা চুলায় যাক্, লেশমাত্র আশা না করিয়াই অধিকাংশ পরামর্শ দিতে হয়। কিছু করিবার এবং হইবার আগে ক্ষেত্রটাতে দৃষ্টি ত পড়ুক। কোনোমতে মনটা যদি একটু উস্‌খুস্ করিয়া ওঠে তাহলেই আপাতত যথেষ্ট। এমন কি, লোকে যদি গালি দেয় এবং মারিতে আসে তা হলেও বুঝি, যে, একটা বেশ উত্তম-মধ্যম ফল পাওয়া গেল।

অতএব পরামর্শে নামা যাক্।

আজকাল আমাদের বিশ্ববিত্তালয়ের একটা প্রশস্ত পরিমণ্ডল তৈরি হইয়া উঠিতেছে। একদিন মোটের উপর ইহা একজামিন পাশের কুস্তির আখড়া ছিল। এখন আখ্‌ড়ার বাহিরেও ল্যাঙোট্‌-

টার উপর ভদ্রবেশ ঢাকা দিয়া একটু হাঁফ ছাড়িবার জায়গা করা হইয়াছে। কিছুদিন হইতে দেখিতেছি বিদেশ হইতে বড় বড় অধ্যাপকেরা আসিয়া উপদেশ দিতেছেন,—এবং আমাদের দেশের মনীষীদেরও এখানে আসন পড়িতেছে। শুনিয়াছি বিশ্ববিদ্যালয়ের এইটুকু ভদ্রতাও আশু মুখুজ্জে মশায়ের কল্যাণে ঘটিয়াছে।

আমি এই বলি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন বাড়িটার ভিতরের আঙিনায় যেমন চলিতেছে চলুক,—কেবল তার এই বাহিরের প্রাঙ্গন-টাতে যেখানে আম্‌দরবারের নূতন বৈঠক বসিল সেখানে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষাটাকে যদি সমস্ত বাঙালীর জিনিষ করিয়া তোলা যায় তাতে বাধাটা কি? আহূত যারা তারা ভিতর বাড়িতেই বসুক—আর রবাহূত যারা তারা বাহিরে পাত পাড়িয়া বসিয়া যাক্ না। তাদের জন্য বিলিতি টেবিল না হয় না রইল, দিশি কলাপাত মন্দ কি? তাদের একেবারে দরোয়ান দিয়া ধাক্কা মারিয়া বিদায় করিয়া দিলে কি এ যজ্ঞে কল্যাণ হইবে? অভিশাপ লাগিবে না কি?

এম্‌নি করিয়া বাংলার বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি এবং বাংলা ভাষার ধারা যদি গঙ্গাযমুনার মত মিলিয়া যায় তবে বাঙালী শিক্ষার্থীর পক্ষে এটা একটা তীর্থস্থান হইবে। দুই স্রোতের সাদা এবং কালো রেখার বিভাগ থাকিবে বটে কিন্তু তারা এক-সঙ্গে বহিয়া চলিবে। ইহাতেই দেশের শিক্ষা যথার্থ বিস্তীর্ণ হইবে, গভীর হইবে, সত্য হইয়া উঠিবে।

সহরে যদি একটিমাত্র বড় রাস্তা থাকে তবে সে পথে বিষম ঠেলাঠেলি পড়ে। সহর-সংস্কারের প্রস্তাবের সময় রাস্তা বাড়াইয়া

ভিড়কে ভাগ্ করিয়া দিবার চেষ্টা হয়। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঝখানে আরেকটি সদর রাস্তা খুলিয়া দিলে ঠেলাঠেলি নিশ্চয় কমিবে।

বিদ্যালয়ের কাজে আমার যেটুকু অভিজ্ঞতা তাতে দেখিয়াছি একদল ছেলে স্বভাবতই ভাষাশিক্ষায় অপটু। ইংরেজি ভাষা কায়দা করিতে না পারিয়া যদিবা তারা কোনোমতে এণ্ট্রেন্সের দেউড়িটা তরিয়া যায়—উপরের সিঁড়ি ভাঙিবার বেলাতেই চিৎ হইয়া পড়ে।

এমনতর দুর্গতির অনেকগুলা কারণ আছে। এক ত যে-ছেলের মাতৃভাষা বাংলা তার পক্ষে ইংরেজি ভাষার মত বালাই আর নাই। ও যেন বিলিতি তলোয়ারের খাপের মধ্যে দিশি খাঁড়া ভরিবার ব্যায়াম। তার পরে, গোড়ার দিকে ভালো শিক্ষকের কাছে ভালো নিয়মে ইংরেজি শিখিবার সুযোগ অল্প ছেলেরই হয়,—গরীবের ছেলের ত হয়ই না। তাই অনেক স্থলেই বিশল্যকরণীর পরিচয় ঘটে না বলিয়া আস্ত গন্ধমাদন বহিতে হয়;—ভাষা আয়ত্ত হয় না বলিয়া গোটা ইংরেজি বই মুখস্থ করা ছাড়া উপায় থাকে না। অসামান্য স্মৃতিশক্তির জোরে যে ভাগ্যবানরা এমনতর কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড করিতে পারে তারা শেষ পর্য্যন্ত উদ্ধার পাইয়া যায়—কিন্তু যাদের মেধা সাধারণ মানুষের মাপে প্রমাণসই তাদের কাছে এতটা আশা করাই যায় না। তারা এই রুদ্ধ ভাষার ফাঁকের মধ্য দিয়া গলিয়া পার হইতেও পারে না, ডিঙাইয়া পার হওয়াও তাদের পক্ষে অসাধ্য।

এখন কথাটা এই, এই যে-সব বাঙালীর ছেলে স্বাভাবিক বা

আকস্মিক কারণে ইংরেজি ভাষা দখল করিতে পারিল না তারা কি এমন কিছু মারাত্মক অপরাধ করিয়াছে যেজন্য তারা বিদ্যা-মন্দির হইতে যাবজ্জীবন আণ্ডামানে চালান হইবার যোগ্য? ইংলণ্ডে একদিন ছিল যখন সামান্য কলাটা মুলাটা চুরি করিলেও মানুষের ফাঁসি হইতে পারিত—কিন্তু এ যে তার চেয়েও কড়া আইন। এ যে চুরি করিতে পারে না বলিয়াই ফাঁসি। কেননা মুখস্থ করিয়া পাস করাই ত চৌর্য্যবৃত্তি। যে ছেলে পরীক্ষাশালায় গোপনে বই লইয়া যায় তাকে খেদাইয়া দেওয়া হয়; আর যে ছেলে তার চেয়েও লুকাইয়া লয়, অর্থাৎ চাদরের মধ্যে না লইয়া মগজের মধ্যে লইয়া যায় সেই বা কম কি করিল? সভ্যতার নিয়ম অনুসারে মানুষের স্মরণশক্তির মহলটা ছাপাখানায় অধিকার করিয়াছে। অতএব যারা বই মুখস্থ করিয়া পাস করে তারা অসভ্যরকমে চুরি করে অথচ সভ্যতার যুগে পুরস্কার পাইবে তারাই?

যাই হোক্ ভাগ্যক্রমে যারা পার হইল তাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিতে চাই না। কিন্তু যারা পার হইল না তাদের পক্ষে হাবড়ার পুলটাই না হয় দু-ফাঁক হইল, কিন্তু কোনোরকমের সরকারী খেয়াও কি তাদের কপালে জুটিবে না? ষ্টীমার, না হয় ত পান্সী?

ভালোমত ইংরেজি শিখিতে পারিল না এমন ঢের-ঢের ভালো ছেলে বাংলাদেশে আছে। তাদের শিখিবার আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমকে একেবারে গোড়ার দিকেই আটক করিয়া দিয়া দেশের শক্তির কি প্রভূত অপব্যয় করা হইতেছে না?

আমার প্রশ্ন এই, প্রেপারেটরি ক্লাস পর্য্যন্ত একরকম পড়াইয়া তার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের মোড়টার কাছে যদি ইংরেজি বাংলা দুটো বড় রাস্তা খুলিয়া দেওয়া যায় তা হইলে কি নানাপ্রকারে সুবিধা হয় না? এক ত ভিড়ের চাপ কিছু কমেই, দ্বিতীয়ত শিক্ষার বিস্তার অনেক বাড়ে।

ইংরেজি রাস্তাটার দিকেই বেশি লোক ঝুঁকিবে তা জানি; এবং দুটো রাস্তার চলাচল ঠিক সহজ অবস্থায় পৌঁছিতে কিছু সময়ও লাগিবে। রাজভাষার দর বেশি সুতরাং আদরও বেশি। কেবল চাকরির বাজারে নয়, বিবাহের বাজারেও বরের মূল্যবৃদ্ধি ঐ রাস্তাটাতেই। তাই হোক্—বাংলা ভাষা অনাদর সহিতে রাজি, কিন্তু অকৃতার্থতা সহ্য করা কঠিন। ভাগ্যমন্তের ছেলে ধাত্রীস্তন্যে মোটাসোটা হইয়া উঠুক না কিন্তু গরীবের ছেলেকে তার মাতৃ-স্তন্য হইতে বঞ্চিত করা কেন?

অনেকদিন হইতে অনেক মার খাইয়াছি বলিয়া সাবধানে কথা বলিবার চেষ্টা করিয়া থাকি। তবু অভ্যাসদোষে বেফাঁস কথা আপ্‌নি বাহির হইয়া পড়ে। আমার ত মনে হয়, গোড়ায় কথাটা আমি বেশ কৌশলেই পাড়িয়াছিলাম। নিজেকে বুঝাইয়া-ছিলাম গোপাল অতি সুবোধ ছেলে, তাকে কম খাইতে দিলেও সে চেঁচামেচি করে না। তাই মৃদুস্বরে সুরু করিয়াছিলাম আজকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের বহিরঙ্গনে যে একটা বক্তৃতার বৈঠক বসিয়াছে তারি এককোণে বাংলার একটা আসন পাতিলে জায়গায় কুলাইয়া যাইবে। এ কথাটা গোপালের মতই কথা হইয়াছিল; ইহাতে অভিভাবকেরা যদি বা নারাজ হন তবু বিরক্ত হইবেন না।

কিন্তু গোপালের সুবুদ্ধির চেয়ে যখন তার ক্ষুধা বাড়িয়া ওঠে তখন তার সুর আপনি চড়িতে থাকে। আমার প্রস্তাবটা অনেকখানি বড় হইয়া উঠিয়াছে। তার ফল প্রস্তাবের পক্ষেও সাংঘাতিক হইতে পারে, প্রস্তাবকের পক্ষেও। সেটা নূতন নয়। শুনিয়াছি আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুসংখ্যা খুব বেশি। এ দেশে শতকরা একশো পঁচিশটা প্রস্তাব আঁতুড় ঘরেই মরে। আর, সাংঘাতিক মার এ বয়সে এত খাইয়াছি যে, ও জিনিষটাকে সাংঘাতিক বলিয়া একেবারেই বিশ্বাস করি না।

আমি জানি তর্ক এই উঠিবে—তুমি বাংলা ভাষার যোগে উচ্চশিক্ষা দিতে চাও কিন্তু বাংলাভাষায় উঁচুদরের শিক্ষাগ্রন্থ কই? নাই সে কথা মানি কিন্তু শিক্ষা না চলিলে শিক্ষাগ্রন্থ হয় কি উপায়ে? শিক্ষাগ্রন্থ বাগানের গাছ নয় যে, সৌখীন লোকে সখ করিয়া তার কেয়ারি করিবে,—কিম্বা সে আগাছাও নয় যে, মাঠে বাটে নিজের পুলকে নিজেই কণ্টকিত হইয়া উঠিবে! শিক্ষাকে যদি শিক্ষাগ্রন্থের জন্য বসিয়া থাকিতে হয় তবে পাতার জোগাড় আগে হওয়া চাই তার পরে গাছের পালা এবং কূলের পথ চাহিয়া নদীকে মাথায় হাত দিয়া পড়িতে হইবে।

বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চঅঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা। বঙ্গসাহিত্য-পরিষৎ কিছুকাল হইতে এই কাজের গোড়াপত্তনের চেষ্টা করিতেছেন। পরিভাষা রচনা ও সংকলনের ভার পরিষৎ লইয়াছেন, কিছু কিছু করিয়াওছেন। তাঁদের কাজ ঢিমা চালে চলিতেছে কা

অচল হইয়া আছে বলিয়া নালিশ করি। কিন্তু দুপাও যে চলিয়াছে এইটেই আশ্চর্য্য। দেশে এই পরিভাষা তৈরির তাগিদ কোথায়? ইহার ব্যবহারের প্রয়োজন বা সুযোগ কই? দেশে টাকা চলিবেনা অথচ টাকশাল চলিতেই থাকিবে এমন আবদার করি কোন্ লজ্জায়?

যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনোদিন বাংলাশিক্ষার রাস্তা খুলিয়া যায় তবে তখন এই বঙ্গসাহিত্যপরিষদের দিন আসিবে। এখন রাস্তা নাই তাই সে হুঁচট খাইতে খাইতে চলে, তখন চার-ঘোড়ার গাড়ি বাহির করিবে। আজ আক্ষেপের কথা এই যে, আমাদের উপায় আছে, উপকরণ আছে,—ক্ষেত্র নাই। বাংলার যজ্ঞে আমরা অন্নসত্র খুলিতে পারি। এই ত সব আছেন আমাদের জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, ব্রজেন্দ্রনাথ, মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী এবং আরো অনেক এই শ্রেণীর নামজাদা ও প্রচ্ছন্ননামা বাঙালী। অথচ যে সব বাঙালী কেবল বাংলা জানে তাদের উপবাস কোনোদিন ঘুচিবে না? তারা এঁদের লইয়া গৌরব করিবে কিন্তু লইয়া ব্যবহার করিতে পারিবে না? বাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসাদে বরঞ্চ সাতসমুদ্র পার হইয়া বিদেশী ছেলে এঁদের কাছে শিক্ষা লইয়া যাইতে পারে কেবল বাংলা দেশের যে ছাত্র বাংলা জানে এঁদের কাছে বসিয়া শিক্ষা লইবার অধিকার তাদেরই নাই!

জার্ম্মানীতে ফ্রান্সে আমেরিকায় জাপানে যে সকল আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় জাগিয়া উঠিয়াছে তাদের মূল উদ্দেশ্য সমস্ত দেশের চিত্তকে মানুষ করা। দেশকে তারা সৃষ্টি করিয়া চলিতেছে। বীজ হইতে অঙ্কুরকে, অঙ্কুর হইতে বৃক্ষকে তারা মুক্তিদান

করিতেছে। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে চিত্তশক্তিকে উদ্ঘাটিত করিতেছে।

দেশের এই মনকে মানুষ করা কোনোমতেই পরের ভাষায় সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না, আমরা চিন্তা করিব কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে, আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না, সমস্ত শিক্ষাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কি হইতে পারে।

তার ফল হইয়াছে, উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা যদিবা আমরা পাই, উচ্চ অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ চিন্তার স্বাভাবিক বাহন আমাদের ভাষা। বিদ্যালয়ের বাহিরে আসিয়া পোষাকী ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া ফেলি, সেই সঙ্গে তার পকেটে যা কিছু সঞ্চয় থাকে তা আলনায় ঝোলানো থাকে,—তার পরে আমাদের চিরদিনের আটপৌরে ভাষায় আমরা গল্প করি, গুজব করি, রাজা-উজীর মারি, তর্জ্জমা করি, চুরি করি, এবং খবরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি। এ সত্ত্বেও আমাদের দেশে বাংলায় সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না এমন কথা বলি না কিন্তু এ সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট দেখিতে পাই। যেমন, এমন রোগী দেখা যায়, যে খায় প্রচুর অথচ তার হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তেমনি দেখি, আমরা যতটা শিক্ষা করিতেছি তার সমস্তটা আমাদের সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গে পোষণ সঞ্চার করিতেছে না। খাদ্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগ হইতেছে না। তার প্রধান কারণ আমরা নিজের ভাষার রসনা দিয়া খাই

না, আমাদের কলে করিয়া খাওয়ানো হয়, তাতে আমাদের পেট ভর্ত্তি করে, দেহপূর্ত্তি করে না।

সকলেই জানেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাঁচে তৈরি। ঐ বিদ্যালয়টি পরীক্ষায় পাস্ করা ডিগ্রিধারীদের নামের উপর মার্কা মারিবার একটা বড়গোছের শিলমোহর। মানুষকে তৈরি করা নয়, মানুষকে চিহ্নিত করা তার কাজ। মানুষকে হাটের মাল করিয়া তার বাজারদর দাগিয়া দিয়া ব্যবসাদারীর সহায়তা সে করিয়াছে।

আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতেও আমরা সেই ডিগ্রির টাঁকশালার ছাপ লওয়াকেই বিদ্যালাভ বলিয়া গণ্য করিয়াছি। ইহা আমাদের অভ্যাস হইয়া গেছে। আমরা বিদ্যা পাই বা না পাই বিদ্যালয়ের একটা ছাঁচ পাইয়াছি। আমাদের মুস্কিল এই যে আমরা চিরদিন ছাঁচের উপাসক। ছাঁচে ঢালাই করা রীতিনীতি চালচলনকেই নানা আকারে পূজার অর্ঘ্য দিয়া এই ছাঁচ-দেবীর প্রতি অচলা ভক্তি আমাদের মজ্জাগত। সেইজন্য ছাঁচে-ঢালা বিদ্যাটাকে আমরা দেবীর বরদান বলিয়া মাথায় করিয়া লই—ইহার চেয়ে বড় কিছু আছে এ কথা মনে করাও আমাদের পক্ষে শক্ত।

তাই বলিতেছি, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যদি একটা বাংলা অঙ্গের সৃষ্টি হয় তার প্রতি বাঙালী অভিভাবকদের প্রসন্ন দৃষ্টি পড়িবে কি না সন্দেহ। তবে কি না, ইংরেজি চালুনীর ফাঁক দিয়া যারা গলিয়া পড়িতেছে এমন ছেলে এখানে পাওয়া যাইবে। কিন্তু আমার মনে হয় তার চেয়ে একটা বড় সুবিধার কথা আছে।

সে সুবিধাটি এই যে, এই অংশেই বিশ্ববিদ্যালয় স্বাধীনভাবে ও স্বাভাবিকরূপে নিজেকে সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারিবে। তার একটা কারণ, এই অংশের শিক্ষা অনেকটা পরিমাণে বাজার-দরের দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে। আমাদের অনেককেই ব্যবসার খাতিরে জীবিকার দায়ে ডিগ্রি লইতেই হয়—কিন্তু সে পথ যাদের অগত্যা বন্ধ কিম্বা যারা শিক্ষার জন্যই শিখিতে চাহিবে তারাই এই বাংলা বিভাগে আকৃষ্ট হইবে। শুধু তাই নয় যারা দায়ে পড়িয়া ডিগ্রি লইতেছে তারাও অবকাশমত বাংলা ভাষার টানে এই বিভাগে আনাগোনা করিতে ছাড়িবে না। কারণ, দুদিন না যাইতেই দেখা যাইবে এই বিভাগেই আমাদের দেশের অধ্যাপকদের প্রতিভার বিকাশ হইবে। এখন যাঁরা কেবল ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ ও নোটের ধূলা উড়াইয়া আঁধি লাগাইয়া দেন তাঁরাই সেদিন ধারা-বর্ষণে বাংলার তৃষিত চিত্ত জুড়াইয়া দিবেন।

এমনি করিয়া যাহা সজীব তাহা ক্রমে কলকে আচ্ছন্ন করিয়া নিজের স্বাভাবিক সফলতাকে প্রমাণ করিয়া তুলিবে। একদিন ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী নিজের ইংরেজী লেখার অভিমানে বাংলা ভাষাকে অবজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু কোথা হইতে নব বাংলা সাহিত্যের ছোট একটি অঙ্কুর বাংলার হৃদয়ের ভিতর হইতে গজাইয়া উঠিল;—তখন তার ক্ষুদ্রতাকে তার দুর্বলতাকে পরিহাস করা সহজ ছিল; কিন্তু সে যে সজীব, ছোট হইলেও উপেক্ষার সামগ্রী নয়; আজ সে মাথা তুলিয়া বাঙালীর ইংরেজি রচনাকে অবজ্ঞা করিবার সামর্থ লাভ করিয়াছে। অথচ বাংলা সাহিত্যের কোনো পরিচয় কোনো আদর রাজদ্বারে ছিল না—আমাদের মত অধীন

জাতির পক্ষে সেই প্রলোভনের অভাব কম অভাব নয়—বাহিরের সেই সমস্ত অনাদরকে গণ্য না করিয়া বিলাতী বাজারের যাচনদারের দৃষ্টির বাহিরে কেবলমাত্র নিজের প্রাণের আনন্দেই সে আজ পৃথিবীতে চিরপ্রতিষ্ঠা লাভের যোগ্য হইতেছে। এতদিন ধরিয়া আমাদের সাহিত্যিকেরা যদি ইংরেজি কপিবুক নকল করিয়া আসিতেন তাহা হইলে জগতে যে প্রভূত আবর্জ্জনার সৃষ্টি হইত তাহা কল্পনা করিলেও গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে।

এতদিন ধরিয়া ইংরেজি বিদ্যার যে কলটা চলিতেছে সেটাকে মিস্ত্রিখানার যোগে বদল করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে। তার দুটো কারণ আছে, এক, কলটা একটা বিশেষ ছাঁচে গড়া, একেবারে গোড়া হইতে সে ছাঁচ বদল করা সোজা কথা নয়। দ্বিতীয়ত, এই ছাঁচের প্রতি ছাঁচ-উপাসকদের ভক্তি এত সুদৃঢ় যে, আমরা ন্যাশনাল কলেজই করি আর হিন্দু য়ুনিভার্সিটিই করি আমাদের মন কিছুতেই ঐ ছাঁচের মুঠা হইতে মুক্তি পায় না। ইহার সংস্কারের একটিমাত্র উপায় আছে এই ছাঁচের পাশে একটা সজীব জিনিষকে অল্প একটু স্থান দেওয়া। তাহা হইলে সে তর্ক না করিয়া বিরোধ না করিয়া কলকে আচ্ছন্ন করিয়া একদিন মাথা তুলিয়া উঠিবে এবং কল যখন আকাশে ধোঁয়া উড়াইয়া ঘর্ঘর শব্দে হাটের জন্য মালের বস্তা উদ্গার করিতে থাকিবে তখন এই বনস্পতি নিঃশব্দে দেশকে ফল দিবে, ছায়া দিবে এবং দেশের সমস্ত কলভাষী বিহঙ্গদলকে নিজের শাখায় শাখায় আশ্রয়দান করিবে।

কিন্তু ঐ কলটার সঙ্গে রফা করিবার কথাই বা কেন বলা?

ওটা দেশের আপিস আদালত, পুলিসের থানা, জেলখানা, পাগলাগারদ, জাহাজের জেটি, পাটের কল প্রভৃতি আধুনিক সভ্যতার আস্‌বাবের সামিল হইয়া থাক্ না। আমাদের দেশ যেখানে ফল চাহিতেছে ছায়া চাহিতেছে সেখানে কোঠাবাড়িগুলা ছাড়িয়া একবার মাটির দিকেই নামিয়া আসিনা কেন? গুরুর চারিদিকে শিষ্য আসিয়া যেমন স্বভাবের নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টি করিয়া তোলে, বৈদিককালে যেমন ছিল তপোবন, বৌদ্ধকালে যেমন ছিল নালন্দা, তক্ষশিলা,—ভারতের দুর্গতির দিনেও যেমন করিয়া টোল চতুষ্পাঠী দেশের প্রাণ হইতে প্রাণ লইয়া দেশকে প্রাণ দিয়া রাখিয়াছিল তেমনি করিয়াই বিশ্ববিদ্যালয়কে জীবনের দ্বারা জীবলোকে সৃষ্টি করিয়া তুলিবার কথাই সাহস করিয়া বলা যাক না কেন?

সৃষ্টির প্রথম মন্ত্র—"আমরা চাই!" এই মন্ত্র কি দেশের চিত্ত-কুহর হইতে একেবারেই শুনা যাইতেছে না? দেশে যাঁরা আচার্য্য, যাঁরা সন্ধান করিতেছেন, সাধনা করিতেছেন, ধ্যান করিতেছেন, তাঁরা কি এই মন্ত্রে শিষ্যদের কাছে আসিয়া মিলিবেন না? বাষ্প যেমন মেঘে মেলে, মেঘ যেমন ধারাবর্ষণে ধরণীকে অভিষিক্ত করে তেমনি করিয়া কবে তাঁরা একত্র মিলিবেন, কবে তাঁদের সাধনা মাতৃ-ভাষায় গলিয়া পড়িয়া মাতৃভূমিকে তৃষ্ণার জলে ও ক্ষুধার অন্নে পূর্ণ করিয়া তুলিবে?

আমার এই শেষ কথাটি কেজো কথা নহে, ইহা কল্পনা। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কেজো কথায় কেবল জোড়াতাড়া চলিয়াছে, সৃষ্টি হইয়াছে কল্পনায়।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নব্য দর্শন

মানুষ পরিবারভুক্ত, সমাজ বা জাতিভুক্ত, দেশভুক্ত, সর্ব্বশেষে এই সমগ্র বিশ্বচরাচরভুক্ত। অনেকে বলেন,—পরিবার, সমাজ, জাতি, দেশ ইত্যাদি মানুষের আবরণ মাত্র। আসল মানুষকে পাইতে হইলে এই সমস্ত খুলিয়া ফেলিতে হইবে। খুলিয়া ফেলিয়া যাহা বাকি থাকিবে তাহাই মানবের সারবস্তু। আবার অনেকে বলেন, তাহা নয় ;—মানুষ একটি আবরণের পর আর একটি আবরণ-পর্য্যায়ের সমষ্টি মাত্র। তোমার বিশ্বাস এই সমস্ত আবরণ বাদ দিলে খাঁটি মানুষটি পাইবে ;—সেটা ভুল। মানুষকে পাইতে হইলে এই আবরণের মধ্যেই খুঁজিতে হইবে। জগৎ ছাড়া জীব নাই, যেমন খোলস ছাড়া সাপ নাই। কিন্তু আমাদের মনের প্রবৃত্তি এই যে, আমরা একবার জীবকে জগৎ হইতে পৃথক্ করি, আবার এই দুইকে একীভূত করি। বাস্তবিক পক্ষে এই দুইকে একেবারে পৃথকও করিতে পারি না, আবার একবার পৃথক্ করিলে একও করিতে পারি না। অনেক দার্শনিক চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইয়াছেন কিনা সন্দেহ। আমার বিশ্বাস যে, জীব জগৎ সৃষ্টি করিতেছে, আর জগৎ জীব সৃষ্টি করিতেছে,—এই উভয়ের মধ্যে আদান প্রদানই বিশ্বের মর্ম্মকথা। সাংখ্যকার প্রকৃতিতে সৃষ্টিগুণ আরোপ করিয়া পুরুষকে দ্রষ্টামাত্র করিয়াছেন, আর ভারতচন্দ্র অন্নদাতাকে বিশ্বের জননীপদে অভিষিক্ত করিয়া শিবকে গাঁজা ও ধুতুরার নেশায় বিভোর করিয়াছেন। আমাদেরও মন চায় যে, জগৎকে জীবিত করিয়া জীবকে নির্জ্জীব করি, আর না হয় ত

জগৎকে নির্জীব করিয়া জীবকে জীবিত করি। ফলকথা, উভয়েই সজীব, উভয়েই প্রাণে ভরা। উভয়েই নিজের প্রাণ দিয়া পরস্পরকে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অনুপ্রাণিত করিতেছে।

জগতের সৃষ্টি করিবার শক্তি অসীম কি সসীম, তাহা জানি না। কিন্তু অনেকের বিশ্বাস জীবের সৃষ্টিশক্তি সীমাবদ্ধ। মানুষ মানুষের সহিত মিলিয়া ধর্ম্ম, সমাজ, জাতি, রাষ্ট্র ইত্যাদি কত কি বস্তু সৃষ্টি করে। কিন্তু কালক্রমে তাহার সৃষ্টিশক্তি কমিয়া আসে—সে আর নূতন সৃষ্টি করিতে চায় না। যাহা আছে তাহাই নাড়াচাড়া করিয়া কালাতিপাত করে। জীব ও জগৎ উভয়েই যে শক্তির আধার, মানুষ তাহা ভুলিয়া যায়। সে ভাবে জগৎই একমাত্র জনয়িত্রী, সে তাহার সন্তান মাত্র। তখন সে জগতের উপর গা ঢালিয়া দিয়া ভাসিয়া যাইতে চায়, যে পথে সে এতদিন চলিয়া আসিয়াছে সেই পথ ধরিয়া চলিতে চায়। বন জঙ্গল কাটিয়া, পাহাড় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া নূতন পথ বসাইতে আর তাহার ইচ্ছা হয় না। সে ভাবে যে পথে সে চলিতেছে, তাহা অনাদি ও অনন্ত। বাহ্যিক হিসাবে এ অবস্থায় তাহার হয় ত সবই থাকে। ধন, দৌলত, মান, প্রতিপত্তি, জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, দর্শন, বিজ্ঞান—হয় ত তাহার কিছুরই অভাব হয় না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সে সব হারাইতে বসিয়াছে। তাহার নূতন সৃষ্টি করিবার বাসনাই ক্রমশঃ লোপ পাইবার উপক্রম। তাই সে আর বৈদিক ঋষিদের ন্যায় নূতন দেবতা সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পায় না—পুরাতন দেবতার পূজা অর্চ্চনায় মুক্তিলাভ করে। নূতন মনুষ্যত্ব দেখিলে সে ভয় পায়—পুরাতন মনুষ্যত্ব বা

"চরিত্র" মাত্র দেখিলেই সে সন্তুষ্ট হয়। আর, ধর্ম্মাধিকরণে সে নূতন প্রথায় বিচার প্রার্থনা করে না—precedent মতে বিচার পাইলেই কৃতার্থ হয়।

মানুষের চিন্তার ও জীবনের যে চিত্রটি উপরে দিলাম, উহারই অন্যতম নাম বস্তুতন্ত্রতা বা Realism. বস্তুতন্ত্রতা একটি দার্শনিক মতমাত্র নয়,—ইহা আমাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত চিন্তা ও জীবনের একটি প্রবৃত্তি বা বিকার। উপর উপর দেখিতে গেলে বস্তুতন্ত্রতা কোন দোষের কথা বলে না। মাত্র এই বলে—জীব ছাড়া একটি স্বতন্ত্র বহির্জগৎ আছে। অনেক দার্শনিক আছেন যাঁহারা এ মত অস্বীকার করেন। কিন্তু আমাদের দশজনের পক্ষে বহির্জগতের অস্তিত্ব একটি মৌলিক সত্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু বস্তুতন্ত্রবাদীগণ কেবল মাত্র বহির্জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গ্রাহ্য (posit) করিয়াই সন্তুষ্ট থাকেন না—তাঁহারা বলেন, এই বহির্জগতের সহিত জীবের চিন্তা ও কার্য্যের সামঞ্জস্যই নিত্য। একথাও হয় ত একেবারে অমূলক নয়। জীব ছাড়া যদি বহির্জগৎ থাকে, তাহা হইলে অবশ্য জীবকে সেই জগৎ মানিয়া চলিতে হইবে, নতুবা তাহার পদে পদে বিড়ম্বনা। কিন্তু বহির্জগৎ কথাটি বড় আলগা। বহির্জগৎ বলিলে সচরাচর আমরা বুঝিয়া থাকি "জড়জগৎ"। অথচ একটু তলাইয়া দেখিলে বেশ বুঝা যায় যে, বহির্জগতে ইট্ পাথর তো আছেই—কিন্তু তাহা ছাড়া অপর অনেক বস্তু আছে—যথা জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র, ইত্যাদি। বস্তুতন্ত্রবাদী জড়-জগৎ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ জাতি, রাষ্ট্র, সমাজ ইত্যাদি সমগ্র বস্তুই নিজের মতের গণ্ডির মধ্যে আনিবার চেষ্টা করেন।

এই চেষ্টার ফলে প্রকৃত প্রস্তাবে যে সমুদয় বস্তু অল্পাধিক পরিমাণে জীবের নিজের চিন্তা ও চেষ্টার সৃষ্টি, তাহাদেরও কারণ কালক্রমে বহির্জগতে আরোপিত হয়, এবং শেষে আমাদের নিজেদের একটি বিশ্বাস জন্মে যে, বহির্জগৎই সর্ব্ববস্তুর মূল কারণ—জীব একটি কারণ-ফলমাত্র।

যতক্ষণ বস্তুতন্ত্রবাদী জড়জগৎ লইয়া নাড়াচাড়া করেন, ততক্ষণ অন্ততঃ ব্যবহারিক সূত্রে উত্তর পক্ষের বিশেষ কিছু বলিবার নাই। যদি জড়জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করি, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই জগতের সহিত মিল করাই জড়জগৎ সম্বন্ধীয় চিন্তা বা জ্ঞানের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু জড়জগতের জ্ঞান ছাড়া মানুষের অন্য দশবিষয়ের জ্ঞান আছে। সে সমুদয় জ্ঞানের উদ্দেশ্য কি? এখানেও বস্তুতন্ত্রবাদী জড়জগতের ন্যায় এক একটি জগৎ posit করিয়া সেই সেই জগতের পরিচয় লওয়াই আমাদের জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য—ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে প্রয়াস পান। তাঁহাদের মতে জীব জড়জগৎ হইতে যেমন স্বতন্ত্র ও তৎসম্বন্ধে নিষ্ক্রিয়, ভাবজগৎ হইতেও তেমনই স্বতন্ত্র ও তৎসম্বন্ধে নিষ্ক্রিয়,—উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের জ্ঞান বহির্জগতের ছায়ামাত্র; উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের চিন্তা, যাহা আছে তাহারই প্রকাশক মাত্র। কি জড়জগৎ কি ভাবজগৎ—কোনটিই আমাদের সৃষ্টি নয়।

বস্তুতন্ত্রতা যে কেবল জড়জগতে নিজের আধিপত্য স্থাপন করিয়া সন্তুষ্ট নয়, কিন্তু সেই আধিপত্য অন্যত্র বিস্তার করিতে সচেষ্ট,—তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই উপলব্ধি হয়। প্রথমে ধরুন সমাজ। সামাজিক রীতিনীতি আচারব্যবহার মানুষ

নিজের সুখ, সুবিধা বা আত্মস্ফূর্ত্তি ও আত্মোন্নতির জন্য উদ্ভাবন করে। অবশ্য বহির্জগৎ একেবারে চুপ থাকে না। সে অল্পাধিক পরিমাণে মানুষকে সাহায্য করে, কিম্বা বাধা দেয়। পূর্ব্ববিতন সমাজতত্ত্ববাদীদের বিশ্বাস যে, সামাজিক রীতিনীতি ইত্যাদি সর্ব্বতো-ভাবে বহির্জগৎ বা আবর্ত্তনের স্থষ্টি। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ যতই সমাজতত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন, ততই দেখিতে পাইতেছেন যে, মানুষের নিজের চিন্তা ও চেষ্টা সমাজ স্থাপন, পরিবর্ত্তন ও বিকাশের অন্যতম মূলকারণ। দুঃখের বিষয় বস্তুতন্ত্রবাদী এ কথাটি সব সময় মনে রাখেন না—তিনি নিজের মতের একাধিপত্য বিস্তারের অভিপ্রায়ে এই পরিদৃশ্যমান মানব-সমাজ ছাড়া একটি সনাতন সমাজের অস্তিত্ব posit করেন, এবং সেই সনাতন সমাজের সহিত সামঞ্জস্য বা মিলন সাধন করা আমাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের যে একমাত্র উদ্দেশ্য, ইহাই প্রমাণ করিতে চেষ্টা করেন। এই সনাতন সমাজের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কার্য্যে ও জীবনে বস্তুতন্ত্রতা প্রবেশ করে। সনাতন সমাজই আমাদের একমাত্র আদর্শ হইয়া দাঁড়ায়—নূতন আদর্শ স্থষ্টি করিতে আর আমাদের ইচ্ছা হয় না,—বরঞ্চ ভয় হয়। এক-কথায়, মানবাত্মার স্ফূর্ত্তি ও বিকাশ ক্রমশঃ লোপ পায়। মানুষ আর নিজের প্রাণে বর্হিজগৎকে অনুপ্রাণিত করে না—সনাতন জগতের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করাই তাহার মুখ্য চেষ্টা হইয়া দাঁড়ায়।

নীতিক্ষেত্রে বস্তুতন্ত্রতার প্রভাব কতদূর, তাহা দুইচারিটি নীতি-বেত্তার পুস্তকাদি পাঠ করিলেই বেশ বুঝা যায়। নীতিবেত্তা মাত্রেই মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন চালাইবার জন্য এক একটি

moral catechism প্রস্তুত করিয়াছেন। Moses এর Ten Commandments হইতে আরম্ভ করিয়া Herbert Spencer-এর Absolute & Relative Ethcis পর্য্যন্ত—যে কোনো নীতিশাস্ত্র দেখুন না কেন, দেখিবেন, সকলেরই মুখ্য চেষ্টা এক—দুইটি বা দশটি সনাতন বা চিরন্তন নৈতিক নিয়ম প্রতিপন্ন করা। কেহ বলিবেন, এই সমুদয় নিয়ম ঈশ্বরাগত; কেহ বা বলিবেন, সেগুলি মানুষের স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম; আবার কেহ বলিবেন, সেগুলি বিশ্বের ন্যায় অনাদি ও অনন্ত। অনেকে হয় ত বলিবেন, দুই চারিটি সনাতন নৈতিক নিয়ম আনিবার সহিত বস্তুতন্ত্রতার কি সম্বন্ধ? সম্বন্ধ যথেষ্ট আছে। আমার বিশ্বাস, যাহা কিছু মানুষকে বাঁধিবার চেষ্টা করে, তাহাই বস্তুতন্ত্রতা—এবং নীতিবেত্তা মাত্রেরই চেষ্টা কতকগুলি সনাতন বা চিরন্তন নিয়মের শৃঙ্খলে মানুষের চিন্তা ও কার্য্য চিরকালের জন্য বাঁধিয়া রাখা। উপরন্তু জড়বাদীর যেমন বিশ্বাস যে একটি স্বতন্ত্র জড়জগৎ আছে, এবং সেই জগতের পরিচয় নেওয়াই আমাদের জ্ঞানের উদ্দেশ্য, তেমনি অধিকাংশ নীতিবেত্তারও বিশ্বাস যে মানুষ ছাড়া একটি স্বতন্ত্র নৈতিক জগৎ আছে, এবং সেই জগতের নিয়ম অনুসরণ করাই আমাদের স্বভাব ও চরিত্রের ধর্ম্ম। তাঁহাদের মতে মানুষ কর্ম্মী বটে, কিন্তু তাহার কর্ম্মের একটি অলঙ্ঘনীয় সীমা আছে—একটি চিরন্তন মাপকাঠি আছে। ইহারই নাম "নৈতিক বস্তুতন্ত্রতা" বা moral realism। এই মত সম্বন্ধে আরও দুই চারিটি কথা বলিবার ইচ্ছা রহিল। ভবিষ্যতে অবসর মতে বলিব।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার চক্রবর্ত্তী।

পুস্তক-প্রশংসা

রঙ্গ ও ব্যঙ্গ

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটক এম,এ প্রণীত।
সেন রায় এণ্ড কোং—কর্ণওয়ালিস্ বিল্ডিংস, কলিকাতা।

বীরবল বলেন যে “কাব্য-সমালোচনার তিনটি জাতি আছে—উত্তম, মধ্যম এবং অধম। যে সমালোচনায় কোনও গ্রন্থের দোষগুণ বিচার করা হয়, তাই উত্তম; যাতে কেবল প্রশংসা করা হয় তা মধ্যম এবং যাতে শুধু নিন্দা করা হয় তা অধম। এ ছাড়া উত্তম-মধ্যম, অধমাধম প্রভৃতি অনেক মিশ্রজাতির সমালোচনা আছে।”

বীরবল নিজে উত্তম-মধ্যমের পক্ষপাতী—আমি মধ্যমের, কেননা আমার উত্তম সমালোচনা করবার শক্তি নেই এবং অধম সমালোচনা করবার প্রবৃত্তি নেই।

অনেকে হয়ত মনে করবেন যে, সে পথ নিরাপদ বলেই আমি মধ্যপথ অবলম্বন করতে চাই, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘটনা তা নয়। আজকাল দেখতে পাই—এদেশে নিন্দা করার চাইতে প্রশংসা করার ভিতরই বিপদ বেশি। কারও নিন্দা করলে শুধু একজনের মনে কষ্ট দেওয়া হয়, কিন্তু একজনের প্রশংসা করলে অনেকের মনে কষ্ট দেওয়া হয়—অর্থাৎ সেই অগণ্য লোকের যাঁদের প্রশংসা করা হয়নি। ঝিকে মারার অর্থ যে বৌকে শেখানো—এ কথা ত আমরা সকলেই মানি, কিন্তু বৌকে আদর করার অর্থ যে ঝিকে মারা, এ জ্ঞান সম্প্রতি একখানি বেনামি পত্রের প্রসাদে আমি লাভ করেছি।

পূর্ব্বে যদি আমি একের প্রশংসা করে অপরের মনে ব্যথা দিয়ে থাকি তাহলে আমার সেই অজ্ঞানকৃত পাপের জন্য সাহিত্য-সমাজের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করচি।

এ শিক্ষালাভ করা সত্ত্বেও আমি "রঙ্গ ও ব্যঙ্গের" প্রশংসা করতে বাধ্য, কেননা, গ্রন্থকার বাঙ্গালীচরিত বর্ণনাসূত্রে বলেছেন যে,—

'আমরা বাঙ্গালী খাঁটি
মোরা কুৎসা কলহ করি অহরহ
কিছুতে বলিনা না'টি,

* * *

ভালগুলি রেখে মন্দ সকল
মিমেযেতে মোরা টুকি অবিকল'

এ কথা শুনে আমার এ বইয়ের ভালগুলি রেখে মন্দ সকল টোকবার সাহস নেই।

আর এক কথা বলে রাখি। নিক্তির ওজনে নিন্দা প্রশংসা করা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং নিন্দা যদি একরত্তি কম হয় আর প্রশংসা যদি একরতি বেশিও হয় তার জন্য সমালোচককে পক্ষপাতিত্ব দোষে দোষী করা উচিত নয়। ফাও যদি দিতেই হয় ত মিষ্ট কথারই দেওয়া উচিত;—ও দানে দাতা গ্রহীতা দুজনেরই মান সমান বজায় থাকে।

প্রথমতঃ আমি এই বইয়ের নামের তারিফ করি। "রঙ্গ ও ব্যঙ্গ" এই নামকরণে গ্রন্থকার অসামান্য সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। আজ-কাল বাঙ্গলা সাহিত্যের যত কাগজ আমাদের হাতে আসে সে সবই

হয় রঙ্-ছুট্, নয় গেরুয়া—তাও আবার ছোপানো নয়, ছাপানো; অর্থাৎ সে রং আমাদের সাহিত্যের সদরে চেপে বসেছে, ভিতরে ধরেনি। আমরা জীবনে যে শুধু গৃহস্থ তাই নয় নেহায়েৎ গেরস্ত; কিন্তু সাহিত্যে আমরা সবাই ব্রহ্মচারী—জীবনে আমরা কেউ নই। কিন্তু সাহিত্যে আমরা প্রত্যেকেই সোঽহং। সাহিত্যে জীবনের রঙের চেহারা দেখ্‌তে আমরা ভয় পাই কেন না জীবনের রঙ ত রক্তের রঙ, জলের নয়। এ অবস্থায় যিনি সাহিত্যে রঙ্গের প্রশ্রয় দিতে চান তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তার পর, যে ক্ষেত্রে নিত্য আত্মশ্লাঘা করা হয়ে থাকে—সে ক্ষেত্রে যিনি ব্যঙ্গ করতে উদ্যত, তাঁর আর যা সদ্‌গুণের অভাব থাক, সৎসাহসের অভাব নেই। এই নামের জন্য আমি তাঁর বইকে একশর ভিতর দশ মার্ক দিতে প্রস্তুত আছি।

পৃথিবীর যেমন একভাগ স্থল আর তিনভাগ জল, এ গ্রন্থেরও তেমনি একভাগ পদ্য এবং তিনভাগ গদ্য। এই পদ্যাংশের প্রায় সকল অংশই হচ্ছে লালিকা, ইংরাজিতে যাকে বলে parody. প্যারডির উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি ভাল কবিতার বাইরেটা ঠিক রেখে ভিতরটা উল্‌টে দেওয়া;—তার দেহটি ঠিক রেখে তার আত্মাটি বদলে দেওয়া। এ হচ্ছে হাত-সাফাইয়ের কাজ। এ ব্যাপারে যিনি মূল কবিতার দেহের গঠন, অঙ্গসৌষ্ঠব, ভঙ্গী ও ছন্দ যতটা বজায় রাখতে পারবেন এবং তার আত্মাটিকে যত খেলো করে দিতে পারবেন, তাঁর কৃতিত্ব তত বেশি। কোনো কবিতার পূর্ব্ব-পরিচিত রূপের সঙ্গে তার নব-কল্পিত ভাবের অসঙ্গতি যত স্পষ্ট হয়ে উঠবে, প্যারডির চেহারা তত ফুটে উঠবে,—কেননা প্যারডি হচ্ছে কবিতার বিকল্প। "রঙ্গ ও ব্যঙ্গের" রচয়িতা এ বিষয়ে যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা

আমার কাছে অপূর্ব্ব—কেননা পূর্ব্বে আমি বঙ্গসাহিত্যে এ মেকদারের প্যারডির সাক্ষাৎ পাই নি। তাঁর প্যারডির আর একটি মহৎ গুণ এই যে, তাতে রঙ্গ আছে কিন্তু ব্যঙ্গ নেই। ঘটক মহাশয় এ সত্য ভুলে যাননি, যে-কবিতা ঠাট্টার সামগ্রী তা প্যারডির বিষয় নয় আর যা ঠাট্টার সামগ্রী নয় তা নিয়ে তামাসা করা চলে কিন্তু ঠাট্টা করা চলে না।

পৃথিবীর যেমন বেশির ভাগ জলো—রঙ্গ ও ব্যঙ্গেরও বেশির ভাগ অর্থাৎ গদ্যের ভাগ, পদ্যের ভাগের তুলনায় জলো। ঘটক মহাশয়ের গলায় হাসির সুর আছে এবং সে সুর ঘোরে; কিন্তু তার অতিবিস্তার কর্‌তে গিয়েই তার রস ফিকে হয়ে গেছে। আলঙ্কারিকদের মতে রসের অর্থ স্থায়ীভাব। অন্যান্য রস সম্বন্ধে এ কথা সত্য হলেও হাস্যরস সম্বন্ধে সম্ভবতঃ সত্য নয়। হাসি জিনিষটে প্রায়ই ক্ষণস্থায়ী—কেন না ও ক্ষণপ্রভার জাত।

ইংরাজি সাহিত্যে আমরা হাসির যুগল-মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাই, একটি স্থায়ী আর একটি অস্থায়ী—তার প্রথমটির নাম humour এবং দ্বিতীয়টির নাম wit. এ দুটির প্রভেদ যে কোথায় এবং কতখানি তা নিয়ে সে-দেশে অনেক গবেষণা করা হয়েছে কিন্তু অদ্যাবধি সে ভেদতত্ত্ব নির্ণীত হয় নি। তবে মোটামুটিভাবে এদের ভেদ নির্ণয় করা যেতে পারে। আমার বিশ্বাস wit হচ্ছে সম্পূর্ণ মনের সৃষ্টি; অপর-পক্ষে অন্তর ও বাহির এ দুয়ের যোগাযোগেই humour জন্ম লাভ করে।

ভাবের সঙ্গে ভাবের, কথার সঙ্গে কথার চকমকি ঠুকেই যে হাসির সৃষ্টি করতে হয় তারি নাম wit—এ হাসির আলো যেমন

উজ্জ্বল, তেমনি তীক্ষ্ণ—এ আলো অন্ধকারের গায়ে ছুরির মতন বেঁধে। এ জাতির হাসিতে যেমন আলো আছে, তেমনি আগুনও আছে। মনের এই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ চামড়ার উপরে পড়্‌লে সেখানে ফোস্কা ওঠে, সোনার উপরে পড়্‌লে তা ভস্ম হয়ে যায়। এর স্ফূর্ত্তি যেমন ক্ষণস্থায়ী, এর জ্বালা তেমনি চিরস্থায়ী। এ রঙ্গের হাসি নয়, ব্যঙ্গের হাসি।

হাসির রঙ্গমশালের নাম humour ;—এর আলোতে চারিদিক রঙ্গিন করে তোলে অথচ এর স্পর্শে কিছুই পোড়ে না। রঙ্গমশাল দেখবার বস্তু নয়—তার আলোতে নানা বস্তু অপরূপ চেহারায় দেখা দেয়। সুতরাং humour-এর উপাদান হচ্ছে বাহ্যবস্তু। ঘটক মহাশয় হচ্ছেন humourist—কিন্তু তিনি অতি স্বল্প উপাদানের উপর অনেকখানি হাসির প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করে ও-বস্তুকে তেমন ভাল করে দাঁড় করাতে পারেন নি। গদ্যে "নোলক" "আরসি" "ঢেঁকি" "কুলো" প্রভৃতি বস্তু হচ্ছে তাঁর হাসির অবলম্বন এবং উপকরণ। নোলকের গায়ে অনেকখানি হাসি ধরে না, আরসির গা থেকে তা ঠিক্‌রে পড়ে, আর ঢেঁকিতে হাজার পাড় দাও আর কুলোকে হাজার পেটাও তার থেকে হাস্যরসের তরঙ্গ বার করা অসাধ্যের সাধন করা। এরূপ ক্ষীণ ভিত্তির উপর হাসিকে স্থায়ী করা কষ্টসাধ্য এবং সাহিত্যে দুষ্ট-হাসিরও স্থান আছে কিন্তু কষ্ট-হাসির নেই। মানুষের হাসির বিষয় হচ্ছে প্রধানতঃ মানুষ। ঢেঁকি কুলোর চাইতে মানুষ ঢের বেশি হাস্যকর পদার্থ। সুতরাং ঘটক মহাশয় যেখানে স্বজাতিকে নিয়ে রঙ্গ ও ব্যঙ্গ করবার চেষ্টা করেছেন সেখানেই অল্পবিস্তর কৃতকার্য্য

হয়েছেন। তাঁর ব্যঙ্গের প্রধান গুণ এই যে, তাঁর বিদ্রূপবাণ তীক্ষ্ণ না হলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট নয়। আমাদের মনোভাবে এবং ব্যবহারে যা বাস্তবিকই স্ফীত এবং বিকৃত তাই হচ্ছে তাঁর উপহাসের বিষয়।

ঘটক মহাশয়ের উপহাসের ভিতর তেমন ঝাঁঝ নেই। কিন্তু এ ত্রুটি যে নিতান্ত আপ্‌শোষের বিষয় তা বলতে পারিনে, কেননা বাঙ্গলা ভাষার অনেক ঝাঁঝালো লেখাতে শুধু গেঁজে-যাওয়া রসের পরিচয় পাওয়া যায়। দুবেলা দেখতে পাই রঙ্গব্যঙ্গ পঙ্কোৎসবে পরিণত হচ্ছে, রসিকতা ইতরতাকে বরণ করছে। শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘটকের রচনার ভাবে ভাষায় আকারে ইঙ্গিতে ইতরতার নামগন্ধও নেই। তাঁর লেখার ভিতর আগাগোড়া এমন একটি ভদ্র সুর আছে যা তাঁর মনের আভিজাত্যের পরিচয় দেয়। এই শ্রেণীর নবীন লেখকেরা রসিকতাকে জাতে তোল্‌বার চেষ্টা করছেন, সুতরাং কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে এঁদের এ চেষ্টা সফল হোক্— এঁদের হাতে রঙ্গের রং পেকে উঠুক।

গোবর গণেশের গবেষণা

শ্রীযুক্ত হরিদাস হালদার প্রণীত।

ঘটক মহাশয়ের ব্যঙ্গের ভিতর যা নেই—হালদার মহাশয়ের ব্যঙ্গের ভিতর তা যথেষ্ট আছে—অর্থাৎ নুন ও ঝাল; এমন কি স্থানে স্থানে এই নুনঝালের মাত্রা অতিরিক্ত হওয়ার দরুন হাস্যরস কটু হয়ে উঠেছে। তাতে আমি আপত্তি করিনে, কেননা, হালদার

মহাশয় যা বলেছেন, তা সাজানো-গোছানো কথা নয়—সে তাঁর মনের কথা, এবং সে মন আমাদের জীবনের হীনতা এবং দীনতার পরিচয়ে তিতো হয়ে গেছে। হালদার মহাশয় কলম ধারণ করেছেন বাঙ্গালীকে আমোদ দেবার জন্য নয়, তাকে খোঁচা দেবার জন্য। তিনি আমাদের মনে বিঁধিয়ে কথা বল্‌তে চান, সুতরাং তাঁর যতদূর সাধ্য সে কথাকে তিনি ছুঁচলো করতে চেয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্য রঙ্গ করা নয়; ব্যঙ্গ করা; সুতরাং তিনি যেখানে রঙ্গ করেছেন সেখানে তাঁর ভাব ও ভাষা তেমন জমাট হয়নি, কিন্তু যেখানে তিনি ব্যঙ্গ করেছেন সেখানে তাঁর ভাব ও ভাষা দানা বেঁধে উঠেছে। তিনি দেখে এবং ঠেকে শিখেছেন যে আমাদের মুখে ধর্ম্মের কথা, বৈরাগ্যের কথা, স্বদেশের কথা, শিক্ষার কথা—এসব হচ্ছে বুলি, এবং এই সব বুলি আমাদের মন থেকেও বেরোয় নি, আমাদের জীবনে গিয়েও পৌঁছয়নি। আমাদের মানুষ হবার সকল চেষ্টা যে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে তার মূল কারণ হচ্ছে আমাদের দেহের মনের ও চরিত্রের জড়তা। আমরা যতদিন না সে জড়তার হাত থেকে মুক্তি পাব ততদিন আমাদের তামসিকতাকে আমরা বড় বড় কথার ছদ্মবেশ পরিয়ে সাত্ত্বিকতা বলে চালাতে চেষ্টা করব। এতে আমরা নিজের ছাড়া অপর কারও চোখে ধূলো দিতে পারব না।

হালদার মহাশয় আমাদের চোখে-আঙুল-দিয়ে সমাজের অবস্থা দেখিয়ে দিয়েছেন, কেননা তাঁর ব্যঙ্গ সচিত্র—ইংরাজিতে যাকে বলে Illustrated; তিনি পাতায় পাতায় আমাদের জীবনের ও মনের ছবি এঁকে গিয়েছেন। আমরা জীবনের পথে এমনি ঝিমন্তভাবে চলি যে চারপাশের চেহারা অপরে না দেখিয়ে দিলে আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। সুতরাং হালদার মহাশয় যে আমাদের চোখের সুমুখে

সমাজের ছবি ধরে দিয়েছেন তার জন্য পাঠক-সমাজের তাঁর নিকট কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। এ সেহাই-কলমের কাজ করতে পারেন এমন গুণী বাঙ্গলায় খুব কম আছে। অনেকে হয় ত বলবেন যে হালদার মহাশয়ের হাত থেকে যা বেরিয়েছে তা ফোটোগ্রাফ নয়, caricature. এ কথার ভিতর ষোলো-আনা না হোক আট-আনা সত্য আছে। মহাকালী পাঠশালার পুরস্কার-বিতরণ, হাইকোর্ট বঙ্গযুবকের বেশভূষা ইত্যাদির বর্ণনায় এ সব বস্তু এবং ব্যাপারের ফোটোগ্রাফ তোলা হয়েছে। অপর পক্ষে স্বদেশী সভা, গেরুয়া প্রভৃতির যে ছবি তিনি এঁকেছেন তা অবশ্য caricature—কিন্তু তাই বলে তা মিথ্যা নয়। মনগড়া ছবির নাম caricature নয়, তার নাম আদর্শ। আমরা গল্পে কবিতায় বাঙ্গালী সমাজের যে-সব আদর্শ-চিত্র অঙ্কন করি তার বেশির ভাগই মন-গড়া—তার সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক অতি কম। Caricature হচ্ছে idealisation-এর উল্টো রীতি। কোনও ব্যক্তির আকৃতির যে অংশ সুন্দর সেই অংশ আলোয় ফুটিয়ে তোলা এবং বাকি অংশ ছায়ায় ঢেকে দেবার নাম idealisation, সুতরাং idealise করতে কতক অংশ সত্য ঢাকা-চাপা দিতে হয়। অপর পক্ষে আকৃতির যে অংশ বিকৃত সেই অংশটিকে সুমুখে টেনে আনাই হচ্ছে caricature-এর উদ্দেশ্য—এতেও কতক অংশ সত্যকে পিছনে ফেলতে হয়। আর্ট হিসেবে এ উভয়েরি সার্থকতা আছে। তবে সত্যের খাতিরে স্বীকার করতে হবে, যে আমাদের সমাজকে idealise করতে হলে যে পরিমাণ সত্য গোপন করতে হয় caricature-এ তার চাইতে ঢের কম। সেই caricature যথার্থ আর্ট যাতে টান-

টোনে মুখের চেহারা একটু আধটু বাঁকিয়ে চরিয়ে মনের প্রকৃত চেহারা বার করে আনা হয়। আমার বিশ্বাস, হালদার মহাশয় অনেক স্থলেই এ বিষয়ে কৃতকার্য্য হয়েছেন। এই কারণে আমি বাঙ্গালীমাত্রকেই এ বই পড়তে অনুরোধ করি। এ গ্রন্থপাঠে আমাদের অন্ততঃ এই উপকারটুকু হবে যে আমাদের হুঁস হবে যে everything is for the best in this the best possible of all societies—এ ধারণা ভুল।

এ জ্ঞান লাভ করা বড় কম লাভের কথা নয়—কেননা এ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে কর্ত্তব্য-জ্ঞানও আসে। আমাদের এ চৈতন্য হয় যে, যা আছে তাকে better করতে চেষ্টা করা আমাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য। আমার বিশ্বাস যে হালদার মহাশয় স্বদেশকে ভালবাসেন বলেই স্বসমাজকে realise করতে চেষ্টা করেছেন, কেননা idealise করবার দোষ এই যে ideal-কে এক পূজা করা ছাড়া তার প্রতি আমাদের কোনও কর্ত্তব্য নেই এবং পূজা করতে হলে মানুষকে হাত পা জড় করে বসতে হয়। খাইদাই কাঁসি বাজাই দেশফেশের ধার ধারিনে,—এরূপ প্রকৃতির পাঠকেরাও এ গ্রন্থ থেকে কোনো শিক্ষালাভ না করুন, নিশ্চয় কতকটা আমোদ লাভ করবেন; কেননা গ্রন্থকার যা বলেছেন তা ফুর্ত্তি করেই বলেছেন। এ লেখা আর যাই হোক ভোঁতা নয়।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

ঘরে-বাইরে

বিমলার আত্মকথা

একজন্মে যে এতটা ঘটতে পারে সে মনেও করা যায় না। আমার যেন সাতজন্ম হয়ে গেল। এই কয় মাসে হাজার বছর পার হয়ে গেছে। সময় এত জোরে চলছিল যে চল্‌চে বলে বুঝতেই পারিনি। সেদিন হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে বুঝতে পেরেচি।

বাজার থেকে বিদেশী মাল বিদায় করবার কথা যখন স্বামীর কাছে বল্‌তে গেলুম তখন জানতুম এই নিয়ে খানিকটা কথা-কাটাকাটি চল্‌বে। কিন্তু আমার একটা বিশ্বাস ছিল যে, তর্কের দ্বারা তর্ককে নিরস্ত করা আমার পক্ষে অনাবশ্যক। আমার চারদিকের বায়ুমণ্ডলে একটা জাদু আছে। সন্দীপের মত অত বড় একটা পুরুষ সমুদ্রের ঢেউয়ের মত যে আমার পায়ের কাছে এসে ভেঙে পড়ল। আমি ত ডাক দিইনি—সে আমার এই হাওয়ার ডাক। আর সেদিন দেখ্‌লুম সেই অমূল্যকে—আহা সে ছেলেমানুষ—কচি মুরলী বাঁশটির মত সরল এবং সরস—সে আমার কাছে যখন এল তখন ভোরবেলাকার নদীর মত দেখতে দেখতে তার জীবনের ধারার ভিতর থেকে একটি রং ফুটে উঠল। দেবী তাঁর ভক্তের মুখের দিকে চেয়ে যে কি-রকম মুগ্ধ হতে পারেন সেদিন অমূল্যর দিকে চেয়ে আমি তা বুঝতে পারলুম। আমার শক্তির সোনার কাঠি যে কেমনতর কাজ করে এমনি করে ত তা দেখতে পেয়েচি।

তাই সেদিন নিজের পরে দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে বজ্রবাহিনী বিদ্যুৎ-শিখার মত আমার স্বামীর কাছে গিয়েছিলুম। কিন্তু হল কি? আজ ন বছরে একদিনও স্বামীর চোখে এমন উদাস দৃষ্টি দেখিনি। সে যেন মরুভূমির আকাশের মত, তার নিজের মধ্যেও একটুখানি রসের বাষ্প নেই, আর যার দিকে তাকিয়ে আছে তার মধ্যেও যেন কোথাও কিছুমাত্র রং দেখা যাচ্চে না। একটু যদি রাগও করতেন তাহলেও বাঁচতুম। কোথাও তাঁকে ছুঁতেও পারলুম না। মনে হল আমি মিথ্যে। যেন আমি স্বপ্ন,—স্বপ্নটা যেই ভেঙে গেল, অমনি কেবল অন্ধকার রাত্রি।

এতকাল রূপের জন্যে আমার রূপসী জা'দের ঈর্ষা করে এসেচি। মনে জানতুম বিধাতা আমাকে শক্তি দেন নি—আমার স্বামীর ভালোবাসাই আমার একমাত্র শক্তি। আজ যে শক্তির মদ পেয়ালা ভরে খেয়েচি, নেশা জমে উঠেচে। এমন হঠাৎ পেয়ালাটা ভেঙে মাটির উপর পড়ে গেল। এখন বাঁচি কি করে!

তাড়াতাড়ি খোঁপা বাঁধ্‌তে বসেছিলুম! লজ্জা! লজ্জা! লজ্জা! মেজরাণীর ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় তিনি বলে উঠলেন, কিলো ছোটরাণী, খোঁপাটা যে মাথা ডিঙিয়ে লাফ মারতে চায়, মাথাটা ঠিক আছে ত?

সেদিন বাগানে স্বামী আমাকে অনায়াসে বল্লেন, তোমাকে ছুটি দিলুম। ছুটি কি এতই সহজে দেওয়া যায় কিম্বা নেওয়া যায়? ছুটি কি একটা জিনিষ? ছুটি যে ফাঁকা। মাছের মত আমি যে চিরদিন আদরের জলে সাঁতার দিয়েচি—হঠাৎ আকাশে তুলে

ধরে যখন বল্লে, এই তোমার ছুটি—তখন দেখি এখানে আমি চল্‌তেও পারিনে বাঁচতেও পারিনে।

আজ শোবার ঘরে যখন ঢুকি তখন শুধু দেখি আস্‌বাব, শুধু আলনা শুধু আয়না শুধু খাট—এর উপরে সেই সর্ব্বব্যাপী হৃদয়টি নেই। রয়েছে ছুটি, কেবল ছুটি, একটা ফাঁক। ঝরণা একেবারে শুকিয়ে গেল, পাথর আর নুড়িগুলো বেরিয়ে পড়েচে। আদর নেই, আসবাব।

এ জগতে সত্য আমার পক্ষে কোথায় কতটুকু টিকে আছে সে সম্বন্ধে হঠাৎ যখন এত বড় একটা ধাঁধাঁ লাগ্‌ল তখন আবার দেখা হল সন্দীপের সঙ্গে। প্রাণের সঙ্গে প্রাণের ধাক্কা লেগে সেই আগুন ত আবার তেমনি করেই জ্বল্‌ল। কোথায় মিথ্যে! এ যে ভরপুর সত্য—দুই কূল ছাপিয়ে পড়া সত্য। এই যে মানুষগুলো সব ঘুরে বেড়াচ্চে, কথা কচ্চে, হাস্‌চে,—ঐ যে বড় রাণী মালা জপ্‌চেন, মেজরাণী থাকো দাসীকে নিয়ে হাস্‌চেন, পাঁচালীর গান গাচ্চেন, আমার ভিতরকার এই আবির্ভাব যে এই-সমস্তর চেয়ে হাজারগুণে সত্য!

সন্দীপ বল্লেন, পঞ্চাশ হাজার চাই!—আমার মাতাল মন বলে উঠ্‌ল পঞ্চাশ হাজার কিছুই নয়! এনে দেব! কোথায় পাব, কি করে পাব, সেও কি একটা কথা! এই ত আমি নিজে এক মুহূর্ত্তে কিছু-না থেকে একেবারে সব-কিছুকে যেন ছাড়িয়ে উঠেছি—এম্‌নি করেই এক-ইসারায় সব-ঘটনা ঘটবে। পারব, পারব, পারব—একটুও সন্দেহ নেই।

চলে ত এলুম। তার পর চারদিকে চেয়ে দেখি, টাকা

কই? কল্পতরু কোথায়? বাহিরটা মনকে এমন করে লজ্জা দেয় কেন? কিন্তু তবু টাকা এনে দেবই। যেমন করেই হোক্ তাতে গ্লানি নেই। যেখানে দীনতা সেখানেই অপরাধ, শক্তিকে কোনো অপরাধ স্পর্শই করে না। চোরই চুরি করে, বিজয়ী রাজা লুঠ করে নেয়। কোথায় মালখানা, সেখানে কা'র হাতে টাকা জমা হয়, পাহারা দেয় কা'রা—এই সব সন্ধান করচি। অর্দ্ধেক রাত্রে বাহির-বাড়িতে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দফ্‌তর-খানার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে কাটিয়েচি। ঐ লোহার গরাদের মুঠো থেকে পঞ্চাশ হাজার ছিনিয়ে নেব কি করে? মনে দয়া ছিল না—যারা পাহারা দিচ্চে তারা যদি মন্ত্রে ঐখানে মরে পড়ে তাহলে এখনি আমি উন্মত্ত হয়ে ঐ ঘরের মধ্যে ছুটে যেতে পারি। এই বাড়ির রাণীর মনের মধ্যে ডাকাতের দল খাঁড়া হাতে নৃত্য করতে করতে দেবীর কাছে বর মাগ্‌তে লাগ্‌ল—কিন্তু বাইরের আকাশ নিঃশব্দ হয়ে রইল, প্রহরে প্রহরে পাহারা বদল হতে লাগ্‌ল, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঢং ঢং করে ঘণ্টা বাজ্‌ল, বৃহৎ রাজবাড়ি নির্ভয়ে শান্তিতে ঘুমিয়ে রইল।

শেষকালে একদিন অমূল্যকে ডাক্‌লুম। বল্লুম, দেশের জন্যে টাকার দরকার—খাজাঞ্চির কাছ থেকে এ টাকা বের করে আন্‌তে পারবে না?

সে বুক ফুলিয়ে বল্লে, কেন পারব না?

হায়রে, আমিও সন্দীপের কাছে এমনি করে বলেছিলুম, কেন পারব না? অমূল্যর বুক ফোলানো দেখে, একটুও আশ্বাস পেলুম না।

জিজ্ঞাসা করলুম, কি করবে বল দেখি?

অমূল্য এমনি-সব আজগুবি প্ল্যান বল্‌তে লাগল যে, সে মাসিক-কাগজের ছোট গল্পে ছাড়া আর কোথাও প্রকাশ করবারই যোগ্য নয়।

আমি বল্লুম, না, অমূল্য, ও-সব ছেলেমানুষি রাখ।

সে বল্লে, আচ্ছা, টাকা দিয়ে ঐ পাহারার লোকদের বশ করব।

টাকা পাবে কোথায়?

সে অম্লানমুখে বল্লে, বাজার লুট করে।

আমি বল্লুম, ও-সব দরকার নেই, আমার গয়না আছে তাই দিয়ে হবে।

অমূল্য বল্লে, কিন্তু খাজাঞ্চির উপর ঘুষ চল্‌বে না। খুব একটা সহজ ফিকির আছে।

কি রকম?

সে আপনার শুনে কাজ নেই। সে খুব সহজ।

তবু শুনি।

অমূল্য কোর্ত্তার পকেট থেকে প্রথমে একটা পকেট-এডিশন গীতা বের করে টেবিলের উপর রাখ্‌লে, তার পরে একটি ছোট পিস্তল বের করে আমাকে দেখালে—আর কিছু বল্লে না।

কি সর্ব্বনাশ! আমাদের বুড়ো খাজাঞ্চিকে মারার কথা মনে করতে ওর এক মুহূর্ত্তও দেরী হল না। ওর মুখখানি এমনতর যে, মনে হয় একটা কাক মারাও ওর পক্ষে শক্ত, অথচ মুখের কথা একেবারে অন্য জাতের। আসল কথা, এই সংসারে

বুড়ো খাজাঞ্চি যে কতখানি সত্য তা ও একেবারে দেখতে পাচ্চে না, সেখানে যেন ফাঁকা আকাশ। সেই আকাশে প্রাণ নেই, ব্যথা নেই, কেবল শ্লোক আছে, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।

আমি বল্লুম, বল কি অমূল্য! আমাদের রায়মশায়ের যে স্ত্রী আছে, ছেলেমেয়ে আছে—তার যে—

স্ত্রী নেই, ছেলেমেয়ে নেই এমন মানুষ এদেশে পাব কোথায়? দেখুন আমরা যাকে দয়া বলি সে কেবল নিজের পরেই দয়া,—পাছে নিজের দুর্ব্বল মনে ব্যথা লাগে সেই জন্যেই অন্যকে আঘাত করতে পারিনে—এই ত হল কাপুরুষতার চূড়ান্ত!

সন্দীপের মুখের বুলি বালকের মুখে শুনে বুক কেঁপে উঠ্‌ল। ও যে নিতান্ত কাঁচা, ভালোকে ভালো বলে বিশ্বাস করবারই যে ওর সময়। আহা ওর যে বাঁচবার বয়েস, বাড়বার বয়েস। আমার ভিতরে মা জেগে উঠল যে। নিজের দিক থেকে আমার ভালোও ছিল না মন্দও ছিল না, ছিল কেবল মরণ, মধুর রূপ ধরে'; কিন্তু যখন এই আঠারো বছরের ছেলে এমন অনায়াসে মনে করতে পারলে একজন বুড়ো মানুষকে বিনা দোষে মেরে ফেলাই ধর্ম্ম তখন আমার গা শিউরে উঠ্‌ল। যখন দেখতে পেলুম ওর মনে পাপ নেই তখন ওর এই কথার পাপ বড় ভয়ঙ্কর হয়ে আমার কাছে দেখা দিলে। যেন বাপ মায়ের অপরাধকে কচি ছেলের মধ্যে দেখ্‌তে পেলুম।

বিশ্বাসে উৎসাহে ভরা বড় বড় ঐ দুটি সরল চোখের দিকে চেয়ে আমার প্রাণের ভিতর কেমন করতে লাগ্‌ল। অজগর সাপের মুখের মধ্যে ঢুক্‌তে চলেচে, এ'কে কে বাঁচাবে? আমার

দেশ কেন সত্যিকার মা হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে এই ছেলেটিকে বুকে চেপে ধরচে না? কেন এ'কে বল্‌চে না, ওরে বাছা, আমাকে তুই বাঁচিয়ে কি করবি, তোকে যদি বাঁচাতে না পারলুম?

জানি, জানি, পৃথিবীর বড় বড় প্রতাপ সয়তানের সঙ্গে রফা করে বেড়ে উঠেচে, কিন্তু মা যে আছে একলা দাঁড়িয়ে এই সয়তানের সমৃদ্ধিকে তুচ্ছ করবার জন্যে। মা ত কার্য্যসিদ্ধি চায় না, সে-সিদ্ধি যত বড় সিদ্ধিই হোক্, মা যে বাঁচাতে চায়! আজ আমার সমস্ত প্রাণ চাচ্চে এই ছেলেটিকে দুই হাতে টেনে ধরে বাঁচাবার জন্যে।

কিছু আগেই ওকে ডাকাতি করতে বলেছিলুম, এখন যত-বড় উল্টো কথাই বলি সেটাকে ও মেয়েমানুষের দুর্ব্বলতা বলে হাস্‌বে। মেয়েমানুষের দুর্ব্বলতাকে ওরা তখনি মাথা পেতে নেয় যখন সে পৃথিবী মজাতে বসে।

অমূল্যকে বল্লুম, যাও তোমাকে কিছু করতে হবে না—টাকা সংগ্রহ করবার ভার আমারই উপর।

যখন সে দরজা পর্য্যন্ত গেছে তাকে ডাক দিয়ে ফেরালুম বল্লুম,—অমূল্য, আমি তোমার দিদি। আজ ভাইফোঁটার পাঁজির তিথি নয়, কিন্তু ভাইফোঁটার আসল তিথি বছরে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করচি ভগবান তোমাকে রক্ষা করুন।

হঠাৎ আমার মুখ থেকে এই কথা শুনে অমূল্য একটু থম্‌কে রইল। তার পরেই প্রণাম করে আমার পায়ের ধুলো নিলে। উঠে যখন দাঁড়াল তার চোখ ছলছল করচে। ভাই

আমার, আমি ত মরতেই বসেচি—তোমার সব বালাই নিয়ে যেন মরি—আমা হতে তোমার কোনো অপরাধ যেন না হয়।

অমূল্যকে বল্লুম, তোমার পিস্তলটি আমাকে প্রণামী দিতে হবে।

কি করবে দিদি?

মরণ প্র্যাক্‌টিস্‌ করব।

এই ত চাই দিদি, মেয়েদেরও মরতে হবে, মারতে হবে;—এই বলে অমূল্য পিস্তলটি আমার হাতে দিলে।

অমূল্য তার তরুণ মুখের দীপ্তি-রেখা আমার জীবনের মধ্যে নূতন ঊষার প্রথম অরুণ-লেখাটির মত এঁকে দিয়ে গেল। পিস্তলটাকে বুকের কাপড়ের ভিতর নিয়ে বল্লুম, এই রইল আমার উদ্ধারের শেষ সম্বল, আমার ভাইফোঁটার প্রণামী।

নারীর হৃদয়ে যেখানে মায়ের আসন আমার সেইখানকার জানলাটি হঠাৎ এই একবার খুলে গিয়েছিল। তখন মনে হল এখন থেকে বুঝি তবে খোলাই রইল।

কিন্তু শ্রেয়ের পথ আবার বন্ধ হয়ে গেল, প্রেয়সী নারী এসে মাতার স্বস্ত্যয়নের ঘরে তালা লাগিয়ে দিলে।

পরের দিনে সন্দীপের সঙ্গে আবার দেখা। একটা উলঙ্গ পাগ্‌লামি আবার হৃৎপিণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে নৃত্য সুরু করে দিলে। কিন্তু এ কি এ! এই কি আমার স্বভাব! কখনোই না।

এই নির্লজ্জকে এই নিদারুণকে এর আগে কোনো দিন দেখি নি। সাপুড়ে হঠাৎ এসে এই সাপকে আমার আঁচলের ভিতর থেকে বের করে দেখিয়ে দিলে—কিন্তু কখনই এ আমার আঁচলের

মধ্যে ছিল না, এ ঐ সাপুড়েরই চাদরের ভিতরকার জিনিষ। অপদেবতা কেমন করে আমার উপর ভর করেচে—আজ আমি যা কিছু করচি সে আমার নয়, সে তারই লীলা।

সেই অপদেবতা একদিন রাঙা মশাল হাতে করে এসে আমাকে বল্লে, আমিই তোমার দেশ, আমিই তোমার সন্দীপ, আমার চেয়ে বড় তোমার আর-কিছুই নেই—বন্দেমাতরং। আমি হাত জোড় করে বল্লুম, তুমিই আমার ধর্ম্ম, তুমিই আমার স্বর্গ, আমার যা-কিছু-আছে সব তোমার প্রেমে ভাসিয়ে দেব—বন্দেমাতরং।

পাঁচহাজার চাই? আচ্ছা পাঁচহাজারই নিয়ে যাব। কালই চাই? আচ্ছা কালই পাবে। কলঙ্কে দুঃসাহসে ঐ পাঁচহাজার টাকার দান মদের মত ফেনিয়ে উঠবে—তার পরে মাতালের উৎসব,—অচলা পৃথিবী পায়ের তলায় টলমল করতে থাক্‌বে, চোখের উপর আগুন ছুটবে, কানের ভিতর ঝড়ের গর্জ্জন জাগ্‌বে, সামনে কি আছে কি নেই তা বুঝতেই পারব না,—তার পরে টল্‌তে টল্‌তে পড়ব গিয়ে মরণের মধ্যে—সমস্ত আগুন এক নিমিষে নিবে যাবে, সমস্ত ছাই হাওয়ায় উড়বে,—কিছুই আর বাকি থাক্‌বেনা।

টাকা কোথায় পাওয়া যেতে পারে সে কথা এর আগে কোনো মতেই ভেবে পাচ্ছিলুম না। সেদিন তীব্র উত্তেজনার আলোতে এই টাকাটা হঠাৎ চোখের সামনে প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পেলুম।

ফি-বছর আমার স্বামী পূজোর সময় তাঁর বড় ভাজ আর মেজ ভাজকে তিনহাজার টাকা ক'রে প্রণামী দিয়ে থাকেন। সেই টাকা বছরে বছরে তাঁদের নামে ব্যাঙ্কে জমা হয়ে সুদে

বাড়চে। এবারেও নিয়মমত প্রণামী দেওয়া হয়েচে, কিন্তু জানি টাকাটা এখনো ব্যাঙ্কে পাঠানো হয় নি। কোথায় আছে তাও আমার জানা। আমাদের শোবার ঘরের সংলগ্ন কাপড়-ছাড়বার ছোট কুঠরির কোণে লোহার সিন্ধুক আছে তারই মধ্যে টাকাটা তোলা হয়েচে।

ফি-বছরে এই টাকা নিয়ে আমার স্বামী কলকাতার ব্যাঙ্কে জমা দিতে যান এবারে তাঁর আর যাওয়া হল না! এই জন্যই ত দৈবকে মানি। ঐ টাকা দেশ নেবেন বলেই আটক আছে—এ টাকা ব্যাঙ্কে নিয়ে যায় সাধ্য কার? আর এই টাকা আমি না নিই এমন সাধ্যই বা আমার কই? প্রলয়ঙ্করী খর্পর বাড়িয়ে দিয়েচেন—বল্‌চেন, আমি ক্ষুধিত, আমাকে দে,—আমি আমার বুকের রক্ত দিলুম, ঐ পাঁচ হাজার টাকায়! মাগো, এই টাকা যার গেল তার সামান্যই ক্ষতি হবে—কিন্তু আমাকে এবার তুমি একেবারে ফতুর করে নিলে!

এর আগে কতদিন বড়রাণী মেজরাণীকে আমি মনে মনে চোর বলেচি—আমার বিশ্বাসপরায়ণ স্বামীকে ভুলিয়ে তারা ফাঁকি দিয়ে কেবল টাকা নিচ্চে, এই ছিল আমার নালিশ। তাঁদের স্বামীদের মৃত্যুর পরে অনেক সরকারী জিনিষপত্র তাঁরা লুকিয়ে সরিয়েছেন, এ কথা অনেকবার আমার স্বামীকে বলেচি। তিনি তার কোনো জবাব না করে চুপ করে থাক্‌তেন। তখন আমার রাগ হত, আমি বল্‌তুম, দান করতে হয়, হাতে তুলে দান কর, কিন্তু চুরি করতে দেবে কেন?—বিধাতা সেদিন আমার এই নালিশ শুনে মুচকে হেসেছিলেন—আজ আমি আমার স্বামীর

সিন্ধুক থেকে ঐ বড়রাণীর মেজরাণীর টাকা চুরি করতে চলেচি।

রাত্রে আমার স্বামী সেই ঘরেই তাঁর কাপড় ছাড়েন, সেই কাপড়ের পকেটেই তাঁর চাবি থাকে। সেই চাবি বের করে নিয়ে লোহার সিন্ধুক খুল্‌লুম। অল্প যে-একটু শব্দ হল, মনে হল সমস্ত পৃথিবী যেন জেগে উঠল। হঠাৎ একটা শীতে আমার হাত পা হিম হয়ে বুকের মধ্যে ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে থাক্‌ল।

লোহার সিন্ধুকের মধ্যে একটা টানা দেরাজ আছে। সেইটে খুলে দেখ্‌লুম নোট নেই, কাগজের মোড়কে ভাগ করা গিনি সাজানো। প্রতি মোড়কে কত গিনি আছে, আমার কত দরকার, সে তখন হিসেব করবার সময় নয়। কুড়িটি মোড়ক ছিল, সব কটা নিয়েই আমার আঁচলে বাঁধলুম।

কম ভারী নয়। চুরির ভারে আমার মন যেন মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। হয় ত নোটের তাড়া হলে সেটাকে এত বেশি চুরি বলে মনে হত না। এ যে সব সোনা।

সেই রাত্রে নিজের ঘরে যখন চোর হয়ে ঢুক্‌তে হল তখন থেকে এ ঘর আমার আর আপন রইল না। এ ঘরে আমার কত বড় অধিকার—চুরি করে সব খোয়ালুম।

মনে মনে জপ্‌তে লাগলুম, বন্দেমাতরং; বন্দেমাতরং। দেশ, আমার দেশ, আমার সোনার দেশ। সব সোনা সেই দেশের সোনা, এ আর কারো নয়।

কিন্তু রাত্রের অন্ধকারে মন যে দুর্ব্বল হয়ে থাকে। স্বামী পাশের ঘরে ঘুমচ্ছিলেন, চোখ বুজে তাঁর ঘরের ভিতর থেকে

বেরিয়ে গেলুম,—অন্তঃপুরের খোলা ছাদের উপর গিয়ে সেই আঁচলে-বাঁধা চুরির উপর বুক দিয়ে মাটিতে পড়ে রইলুম—সেই মোড়কগুলো বুকে বাজতে লাগল। নিস্তব্ধ রাত্রি আমার শিয়রের কাছে তর্জ্জনী তুলে রইল। ঘরকে ত আমি দেশ থেকে স্বতন্ত্র করে দেখতে পারলুম না। আজ ঘরকে লুটেচি, দেশকেই লুটেচি —এই পাপে একই সঙ্গে ঘর আমার ঘর রইল না, দেশও হয়ে গেল পর। আমি যদি ভিক্ষে করে দেশের সেবা করতুম, এবং সেই সেবা সম্পূর্ণ না করেও মরে যেতুম, তবে সেই অসমাপ্ত সেবাই হত পূজো, দেবতা তা গ্রহণ করতেন। কিন্তু চুরি ত পূজা নয়—এ জিনিষ কেমন করে দেশের হাতে তুলে দেব? চোরাই মালে দেশের ভরা ডোবাতে বস্‌লুম গো! নিজে মরতে বসেচি কিন্তু দেশকে আঁকড়ে ধরে তাকে সুদ্ধ কেন অশুচি করি?

এ টাকা লোহার সিন্ধুকে ফেরবার পথ বন্ধ। আবার এই রাত্রে সেই ঘরে ফিরে গিয়ে সেই চাবি নিয়ে সেই সিন্ধুক খোলবার শক্তি আমার নেই। আমি তাহলে স্বামীর ঘরের চৌকাঠের কাছে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। এখন সামনে রাস্তা ছাড়া রাস্তাই নেই।

কত টাকা নিলুম তাই যে বসে বসে গুনব সে আমি লজ্জায় পারলুম না। ও যেমন ঢাকা আছে তেমনি ঢাকা থাক, চুরির হিসেব করব না।

শীতের অন্ধকার রাত্রে আকাশে একটুও বাষ্প ছিল না; সমস্ত তারাগুলি ঝকঝক্ করচে। আমি ছাদের উপর শুয়ে শুয়ে

ভাবছিলুম—দেশের নাম করে ঐ তারাগুলি যদি একটি-একটি মোহরের মত আমাকে চুরি করতে হত—অন্ধকারের বুকের মধ্যে সঞ্চিত ঐ তারাগুলি—তার পরদিন থেকে চিরকালের জন্য রাত্রি একেবারে বিধবা,—নিশীথের আকাশ একেবারে অন্ধ,—তাহলে সে চুরি যে সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি হত। আজ আমি এই যে চুরি করে আনলুম, এও ত টাকা চুরি নয়, এ যে আকাশের চিরকালের আলো চুরিরই মত—এ চুরি সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি,—বিশ্বাস চুরি, ধর্ম্ম চুরি!

ছাদের উপর পড়ে রাত্রি কেটে গেল। সকালে যখন বুঝলুম আমার স্বামী এতক্ষণে উঠে চলে গেছেন তখন সর্ব্বাঙ্গে শাল মুড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে ঘরের দিকে চল্লুম। তখন মেজরাণী ঘটিতে করে' তাঁর বারান্দার টবের গাছ ক'টিতে জল দিচ্ছিলেন। আমাকে দেখেই বলে উঠলেন—ওলো, ছোটরাণী, শুনেছিস্ খবর?

আমি চুপ করে দাঁড়ালুম, আমার বুকের মধ্যে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল—মনে হতে লাগ্‌ল, আঁচলে বাঁধা গিনিগুলো শালের ভিতর থেকে বড় বেশি উঁচু হয়ে আছে, মনে হল, এখনি আমার কাপড় ছিঁড়ে গিনিগুলো বারান্দাময় ঝন্‌ঝন্‌ করে ছড়িয়ে পড়বে, নিজের ঐশ্বর্য্য চুরি করে ফতুর হয়ে গেছে এমন চোর আজ এই বাড়ির দাসী চাকরদের কাছেও ধরা পড়ে যাবে।

মেজরাণী বল্লেন, তোদের দেবীচৌধুরাণীর দল ঠাকুরপোর তহবিল লুঠ করবে শাসিয়ে বেনামী চিঠি লিখেচে।

আমি চোরের মতই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম।

আজ ঠাকুরপোকে বলছিলুম তোমার শরণাপন্ন হতে। দেবী প্রসন্ন হও গো, তোমার দলবল ঠেকাও! আমরা তোমার বন্দেমাতরমের সিন্নি মানুচি। দেখতে দেখতে অনেক কাণ্ডই ত হল, এখন, দোহাই তোমার, ঘরে সিঁদটা ঘটুতে দিয়ো না।

আমি কিছু না বলে' তাড়াতাড়ি আমার শোবার ঘরে চলে গেলুম। চোরা বালীতে পা দিয়ে ফেলেচি—আর ওঠবার জো নেই—এখন যত ছটুফটু করব ততই ডুবতে থাকব।

এ টাকাটা এক্ষণি আমার আঁচল থেকে খসিয়ে সন্দীপের হাতে দিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচি, এ বোঝা আমি আর বইতে পারিনে —আমার পাঁজর যেন ভেঙে যাচ্চে।

সকালবেলাতেই খবর পেলুন সন্দীপ আমার জন্যে অপেক্ষা করচে। আজ আর আমার সাজসজ্জা ছিল না—শাল মুড়ি দিয়ে তাড়াতাড়ি বাইরে চলে গেলুম।

ঘরের মধ্যে ঢুকেই দেখি সন্দীপের সঙ্গে অমূল্য বসে আছে। মনে হল আমার মান সম্ভ্রম যা কিছু বাকি ছিল সমস্ত যেন ঝিম ঝিম করে আমার গা বেয়ে নেবে গিয়ে পায়ের তলা দিয়ে একেবারে মাটির মধ্যে চলে গেল। নারীর চরম অমর্য্যাদা ঐ বালকের সামনে আজ আমাকে উদ্ঘাটিত করে দিতে হবে! আমার এই চুরির কথা এরা আজ দলের মধ্যে বসে আলোচনা করচে? এর উপরে অল্প একটুখানিও আব্রু রাখতে দেয় নি!

পুরুষমানুষকে আমরা বুঝব না। ওরা যখন ওদের উদ্দেশ্যের রথ টানবার পথ তৈরি করতে বসে তখন বিশ্বের হৃদয়কে টুকরো টুকরো করে ভেঙে পথের খোয়া বিছিয়ে দিতে ওদের

একটুও বাধে না। ওরা নিজের হাতে সৃষ্টি করবার নেশায় যখন মেতে ওঠে তখন সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টিকে চুরমার করতেই ওদের আনন্দ। আমার এই মর্ম্মান্তিক লজ্জা ওদের চোখের কোণেও পড়বে না—প্রাণের পরে দরদ নেই ওদের—ওদের যত ব্যগ্রতা সব উদ্দেশ্যের দিকে! হায়রে, এদের কাছে আমি কেইবা! বন্যার মুখের কাছে একটা মেঠো ফুলের মত!

কিন্তু আমাকে এমন করে নিবিয়ে ফেলে সন্দীপের লাভ হল কি? এই পাঁচ হাজার টাকা? কিন্তু আমার মধ্যে পাঁচ হাজার টাকার চেয়ে বেশি কিছু ছিল না কি? ছিল বই কি। সেই খবরই ত সন্দীপের কাছেই শুনেছিলুম—আর সেই শুনেই ত আমি সংসারের সমস্তকে তুচ্ছ করতে পেরেছিলুম। আমি আলো দেব, আমি জীবন দেব, আমি শক্তি দেব, আমি অমৃত দেব, সেই বিশ্বাসে সেই আনন্দে দুই কূল ছাপিয়ে আমি বাহির হয়ে পড়েছিলুম। আমার সেই আনন্দকে যদি কেউ পূর্ণ করে তুল্‌ত তাহলে আমি মরে গিয়েও বাঁচতুম, আমার সমস্ত সংসার ভাসিয়ে দিয়েও আমার লোকসান হত না।

আজ কি এরা বল্‌তে চায় এ সমস্তই মিথ্যে কথা? আমার মধ্যে যে-দেবী আছে ভক্তকে বরাভয় দেবার শক্তি তার নেই? আমি যে স্তবগান শুনেছিলুম, যে-গান শুনে স্বর্গ হতে ধূলোয় নেমে এসেছিলুম, সে কি এই ধূলোকে স্বর্গ করবার জন্যে নয়, সে কি স্বর্গকেই মাটি করবার জন্যে?

সন্দীপ আমার মুখের দিকে তার তীব্র দৃষ্টি রেখে বল্লে, টাকা চাই, রাণী!

অমূল্য আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল,—সেই বালক,—সে আমার মায়ের গর্ভে জন্মায় নি বটে কিন্তু সে ত তার মায়ের গর্ভে জন্মেছিল—সেই মা, সে যে একই মা! আহা ঐ কচি মুখ, ঐ স্নিগ্ধ চোখ, ঐ তরুণ বয়েস! আমি মেয়েমানুষ, আমি ওর মায়ের জাত,—ও আমাকে বল্লে কিনা, আমার হাতে বিষ তুলে দাও —আর আমি ওর হাতে বিষই তুলে দেব!

টাকা চাই, রাণী!—রাগে লজ্জায় আমার ইচ্ছে হল সেই সোনার বোঝা সন্দীপের মাথার উপর ছুঁড়ে ফেলে দিই। আমি কিছুতেই আঁচলের গিরে যেন খুলতে পারছিলুম না, থরথর করে আমার আঙুল-গুলো কাঁপতে লাগল। তারপর টেবিলের উপর সেই কাগজের মোড়কগুলো যখন পড়ল তখন সন্দীপের মুখ কালো হয়ে উঠল। সে নিশ্চয় ভাবলে ঐ মোড়কগুলোর মধ্যে আধুলি আছে। কি ঘৃণা! অক্ষমতার উপরে কি নিষ্ঠুর অবজ্ঞা! মনে হল ও যেন আমাকে মারতে পারে। সন্দীপ ভাবলে, আমি বুঝি ওর সঙ্গে দর করতে বসেচি—ওর পাঁচ হাজার টাকার দাবী দু তিনশো টাকা দিয়ে রফা করতে চাই। একবার মনে হল, এই মোড়কগুলো নিয়ে ও জানলার বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। ও কি ভিক্ষুক? ও যে রাজা।

অমূল্য জিজ্ঞাসা করলে, আর নেই, রাণীদিদি?

করুণায় ভরা তার গলা। আমার মনে হল আমি বুঝি চীৎকার করে কেঁদে উঠব। প্রাণপণে হৃদয়কে যেন চেপে ধরে' একটু কেবল ঘাড় নাড়লুম। সন্দীপ চুপ করে রইল—মোড়কগুলো ছুঁলেও না, একটা কথাও বল্লে না।

চলে যাব ভাবচি কিন্তু কিছুতে আমার পা চল্‌চে না—পৃথিবী

ফু-ফাঁক হয়ে আমাকে যদি টেনে নিত তাহলেই এই মাটির পিণ্ড মাটির মধ্যে আশ্রয় পেয়ে বাঁচত।

আমার অপমান ঐ বালকের বুকে গিয়ে বাজল। সে হঠাৎ খুব একটা আনন্দের ভান করে বলে উঠল—এই কম কি! এতেই ঢের হবে! তুমি আমাদের বাঁচিয়েচ রাণীদিদি!

বলেই সে একটা মোড়ক খুলে ফেল্লে—গিনিগুলো ঝক্‌ঝক্ করে উঠল।

এক মুহূর্ত্তে সন্দীপের মুখের যেন একটা কালো মোড়ক খুলে গেল। তারও মুখ চোখ আনন্দে ঝক্‌ঝক্ করতে লাগল। মনের ভিতরকার এই হঠাৎ উল্‌টো হাওয়ার দমকা সাম্‌লাতে না পেরে সে চৌকি থেকে লাফিয়ে উঠে আমার কাছে ছুটে এল। কি তার মৎলব ছিল জানিনে। আমি বিদ্যুতের মত অমূল্যের মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলুম—হঠাৎ একটা চাবুক খেয়ে তার মুখ যেন বিবর্ণ হয়ে গেছে। আমি আমার সমস্ত শক্তি নিয়ে সন্দীপকে ঠেলা দিলুম। পাথরের টেবিলের উপর মাথাটা তার ঠক্ করে ঠেকল, তার পরে সেখান থেকে সে মাটিতে পড়ে গেল,—কিছুক্ষণ তার আর সাড়া রইল না। এই প্রবল চেষ্টার পরে আমার শরীরে আর একটুও বল ছিল না—আমি চৌকির উপরে বসে পড়লুম। অমূল্যের মুখ আনন্দে দীপ্ত হয়ে উঠল—সে সন্দীপের দিকে ফিরেও তাকালে না—আমার পায়ের ধূলো নিয়ে আমার পায়ের কাছে বস্‌ল। ওরে ভাই, ওরে বাছা, তোর এই শ্রদ্ধাটুকু আজ আমার শূন্য বিশ্বপাত্রের শেষ সুধাবিন্দু। আর আমি পারলুম না—আমার কান্না ভেঙে পড়ল। আমি দুই

হাতে আঁচল দিয়ে মুখ চেপে ধরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলুম। মাঝে মাঝে আমার পায়ের উপর অমূল্যর করুণ হাতের স্পর্শ যতই পাই আমার কান্না ততই ফেটে পড়তে চায়।

খানিকক্ষণ পরে সাম্‌লে উঠে চোখ খুলে দেখি যেন একেবারে কিছুই হয়নি এমনি ভাবে সন্দীপ টেবিলের কাছে বসে গিনিগুলো রুমালে বাঁধচে। অমূল্য আমার পায়ের কাছ থেকে উঠে দাঁড়াল —ছল্‌ছল্‌ করচে তার চোখ।

সন্দীপ অসঙ্কোচে আমাদের মুখের দিকে চোখ তুলে বল্লে, ছ হাজার টাকা।

অমূল্য বল্লে, এত টাকা ত আমাদের দরকার নেই সন্দীপ বাবু। হিসেব করে দেখেচি সাড়ে তিন হাজার টাকা হলেই আমাদের এখনকার কাজ উদ্ধার হবে।

সন্দীপ বল্লে, আমাদের কাজ ত কেবলমাত্র এখনকার কাজই নয়। আমাদের যা দরকার তার কি সংখ্যা আছে?

অমূল্য বল্লে, তা হোক্‌, ভবিষ্যতে যা দরকার হবে তার জন্যে আমি দায়ী—আপনি ঐ আড়াই হাজার টাকা রাণীদিদিকে ফিরিয়ে দিন।

সন্দীপ আমার মুখের দিকে চাইলে। আমি বলে উঠলুম, না, না, ও-টাকা আমি আর ছুঁতেও চাইনে। ও নিয়ে তোমাদের যা-খুসী তাই কর।

সন্দীপ অমূল্যর দিকে চেয়ে বল্লে, মেয়েরা যেমন করে দিতে পারে এমন কি পুরুষ পারে?

অমূল্য উচ্ছ্বসিত হয়ে বল্লে, মেয়েরা যে দেবী।

সন্দীপ বল্লে, আমরা পুরুষরা বড় জোর আমাদের শক্তিকে দিতে পারি, মেয়েরা যে আপনাকে দেয়। ওরা আপনার প্রাণের ভিতর থেকে সন্তানকে জন্ম দেয় পালন করে, বাহির থেকে নয়। এই দানই ত সত্য দান।

এই বলে সন্দীপ আমার দিকে চেয়ে বল্লে, রাণী, আজ তুমি যা দিলে এ যদি কেবলমাত্র টাকা হত তাহলে আমি এ ছুঁতুম না, তুমি আপনার প্রাণের চেয়ে বড় জিনিষ দিয়েচ।

মানুষের বোধ হয় দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারে সন্দীপ আমাকে ভোলাচ্চে, কিন্তু আমার আরেকটা বুদ্ধি ভোলে। সন্দীপের চরিত্র নেই, সন্দীপের শক্তি আছে। সেই জন্যে ও যে-মুহূর্ত্তে প্রাণকে জাগিয়ে তোলে সেই মুহূর্ত্তেই মৃত্যুবাণও মারে। দেবতার অক্ষয় তূণ ওর হাতে আছে কিন্তু তূণের মধ্যে দানবের অস্ত্র।

সন্দীপের রুমালে সব গিনি ধরছিল না, সে বল্লে, রাণী তোমার একখানি রুমাল আমাকে দিতে পার?

আমি রুমাল বের করে দিতেই সেই রুমালটি নিয়ে সে মাথায় ঠেকালে, তার পরেই হঠাৎ আমার পায়ের কাছে বসে পড়ে' আমাকে প্রণাম করে বল্লে, দেবী তোমাকে এই প্রণামটি দেবার জন্যেই ছুটে এসেছিলুম, তুমি আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে। তোমার ঐ ধাক্কাই আমার বর। ঐ ধাক্কা আমি মাথায় করে নিয়েছি।—বলে' মাথায় যেখানে লেগেছিল সেইখানটা আমাকে দেখিয়ে দিলে।

আমি কি সত্যি ভুল বুঝেছিলুম? সন্দীপ কি দুই হাত বাড়িয়ে

দিয়ে তখন আমাকে প্রণাম করতেই এসেছিল, তার মুখে চোখে হঠাৎ যে মত্ততা ফেনিয়ে উঠল, সে ত, মনে হল, অমূল্যও দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু স্তবগানে সন্দীপ এমন আশ্চর্য্য সুর লাগাতে জানে যে, তর্ক করতে পারিনে, সত্য দেখবার চোখ যেন কোন্ আফিমের নেশায় বুজে আসে। সন্দীপকে আমি যে-আঘাত করেছি সে-আঘাত সে আমাকে দ্বিগুণ করে ফিরিয়ে দিলে, তার মাথার ক্ষত আমার বুকের ভিতরে রক্তপাত করতে লাগল।—সন্দীপের প্রণাম যখন পেলুম আমার চুরি তখন মহিমান্বিত হয়ে উঠল। টেবিলের উপরকার গিনিগুলি সমস্ত লোকনিন্দাকে ধর্ম্মবুদ্ধির সমস্ত বেদনাকে উপেক্ষা করে ঝক্‌ঝক করে হাস্‌তে লাগল।

আমারি মত অমূল্যেরও মন ভুলে গেল। ক্ষণকালের জন্যে সন্দীপের প্রতি তার যে শ্রদ্ধা প্রতিরুদ্ধ হয়েছিল সে আবার বাধা-মুক্ত হয়ে উছলে উঠল, আমার পূজায় এবং সন্দীপের পূজায় তার হৃদয়ের পুষ্পপাত্রটি পূর্ণ হয়ে গেল—সরল বিশ্বাসের কি স্নিগ্ধসুধা ভোরবেলাকার শুকতারার আলোটির মত তার চোখ থেকে বিকীর্ণ হতে লাগল! আমি পূজা দিলেম, আমি পূজা পেলেম, আমার পাপ জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠল। অমূল্য আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে বল্লে, বন্দেমাতরং।

কিন্তু স্তবের বাণী ত সব সময়ে শুন্‌তে পাইনে। নিজের মনের ভিতর থেকে নিজের পরে নিজের শ্রদ্ধাকে বাঁচিয়ে রাখবার সম্বল আমার যে কিছুই নেই। আমার শোবার ঘরে ঢুকতে পারিনে। সেই লোহার সিন্দুক আমার দিকে ভ্রূকুটি করে থাকে, আমাদের পালঙ্ক আমার দিকে যেন একটা নিষেধের হাত বাড়ায়।

আপনার ভিতরে আপনার এই অপমান থেকে ছুটে পালাতে ইচ্ছে করে—কেবলি মনে হয় সন্দীপের কাছে গিয়ে আপনার স্তব শুনিগে। আমার অতলস্পর্শ গ্লানির গহ্বর থেকে জগতে সেই একটুমাত্র পূজার বেদী জেগে আছে—সেখান থেকে যেখানেই পা বাড়াই সেখানেই শূন্য। তাই দিনরাত্রি ঐ বেদী আঁকড়ে পড়ে থাকতে চাই। স্তব চাই, স্তব চাই, দিনরাত্রি স্তব চাই,—ঐ মদের পেয়ালা একটুমাত্র খালি হতে থাক্‌লেই আমি আর বাঁচিনে। তাই সমস্ত দিনই সন্দীপের কাছে গিয়ে তার কথা শোন্‌বার জন্যে আমার প্রাণ কাঁদচে—আমার অস্তিত্বের মূল্যটুকু পাবার জন্যে আজ পৃথিবীর মধ্যে সন্দীপকে আমার এত দরকার!

আমার স্বামী দুপুরবেলা যখন খেতে আসেন আমি তাঁর সামনে বস্‌তে পারিনে—অথচ না-বসাটা এতই বেশি লজ্জা যে, সেও আমি পারিনে—আমি তাঁর একটু পিছনের দিকে এমন করে বসি যে, তাঁর সঙ্গে আমার মুখোমুখি ঘটে না। সেদিন তেম্‌নি করে বসে আছি তিনি খাচ্চেন এমন সময় মেজরাণী এসে বস্‌লেন, বল্লেন, ঠাকুরপো, তুমি ঐ সব ডাকাতির শাসানি-চিঠি হেসে উড়িয়ে দাও কিন্তু আমার ভয় হয়। আমাদের এবারকার প্রণামীর টাকাটা তুমি এখনো ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দাওনি?

আমার স্বামী বল্লেন, না, সময় পাইনি।

মেজরাণী বল্লেন, দেখ ভাই, তুমি বড় অসাবধান, ও টাকাটা—

স্বামী হেসে বল্লেন, সে যে আমার শোবার ঘরের পাশের ঘরে লোহার সিন্দুকে আছে!

যদি সেখান থেকে নেয় বলা যায় কি?

আমার ও ঘরেও যদি চোর ঢোকে তাহলে কোন্‌দিন তোমাকেও চুরি হতে পারে!

ওগো আমাকে কেউ নেবে না, ভয় নেই তোমার। নেবার মত জিনিষ তোমার আপনার ঘরেই আছে। না ভাই, ঠাট্টা না, তুমি ঘরে টাকা রেখো না।

সদর খাজনা চালান যেতে আর দিন-পাঁচেক আছে সেই সঙ্গেই ও টাকাটা আমি কলকাতার ব্যাঙ্কে পাঠিয়ে দেব।

দেখো ভাই ভুলে বোসো না, তোমার যে-রকম ভোলামন কিছুই বলা যায় না।

এ ঘর থেকে যদি টাকা চুরি যায় তাহলে আমারি টাকা চুরি যাবে তোমার কেন যাবে বউরাণী?

ঠাকুরপো, তোমার ঐ সব কথা শুন্‌লে আমার গায়ে জ্বর আসে। আমি কি আমার-তোমার ভেদ করে কথা কচ্চি? তোমারি যদি চুরি যায় সে কি আমাকে বাজ্‌বে না? পোড়া বিধাতা সব কেড়ে নিয়ে আমার যে লক্ষ্মণ দেওরটি রেখেচেন তার মূল্য বুঝি আমি বুঝিনে? আমি ভাই তোমাদের বড়রাণীর মত দিনরাত্রি দেবতা নিয়ে ভুলে থাকতে পারিনে, দেবতা আমাকে যা দিয়েচেন সেই আমার দেবতার চেয়েও বেশি। কি লো ছোটরাণী, তুই যে একেবারে কাঠের পুতুলের মত চুপ করে রইলি? জান ভাই ঠাকুরপো, ছোটরাণী মনে ভাবে আমি তোমাকে খোষামোদ করি। তা তেমন দায়ে পড়লে খোষামোদই করতে হত। কিন্তু তুমি কি আমাদের তেমনি দেওর যে খোষামোদের অপেক্ষা রাখ? যদি হতে ঐ মাধব চক্রবর্ত্তীর মত, তাহলে আমাদের বড়রাণীরও দেবসেবা আজ ঘুচে

যেত, আধপয়সাটির জন্যে তোমার হাতে পায়ে ধরাধরি করেই দিন কাটত। তাও বলি, তাহলে ওর উপকার হত, বানিয়ে বানিয়ে তোমার নিন্দে করবার এত সময় পেত না।

এমনি করে মেজরাণী অনর্গল বকে যেতে লাগ্‌লেন, তারি মাঝে মাঝে ছেঁচকিটা, ঘণ্টটা, চিংড়িমাছের মুড়োটার প্রতিও ঠাকুরপোর মনোযোগ আকর্ষণ করা চল্‌তে থাক্‌ল। আমার তখন মাথা ঘুরচে। আর ত সময় নেই, এখনি একটা উপায় করতে হবে,—কি হতে পারে, কি করা যেতে পারে এই কথা যখন বারবার মনকে জিজ্ঞাসা করচি তখন মেজরাণীর বকুনি আমার কাছে অত্যন্ত অসহ্য বোধ হতে লাগল। বিশেষত আমি জানি মেজরাণীর চোখে কিছুই এড়ায় না—তিনি ক্ষণে ক্ষণে আমার মুখের দিকে চাচ্ছিলেন, কি দেখছিলেন জানিনে, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল আমার মুখে সমস্ত কথাই যেন স্পষ্ট ধরা পড়ছিল।

দুঃসাহসের অন্ত নেই—আমি যেন নিতান্ত সহজ কৌতুকে হেসে উঠলুম—বলে উঠলুম—আসল কথা, আমার পরেই মেজরাণীর যত অবিশ্বাস, চোর ডাকাত সমস্ত বাজে কথা!

মেজরাণী মুচ্‌কে হেসে বল্লেন—তা ঠিক বলেছিস্‌ লো, মেয়েমানুষের চুরি বড় সর্ব্বনেশে। তা আমার কাছে ধরা পড়তেই হবে, আমি ত আর পুরুষমানুষ নই! আমাকে ভোলাবি কি দিয়ে?

আমি বল্‌লুম, তোমার মনে এতই যদি ভয় থাকে তবে আমার যা-কিছু আছে তোমার কাছে না-হয় জামিন রাখি, যদি কিছু লোকসান করি ত কেটে নিয়ো।

মেজরাণী হেসে বল্লেন, শোনো একবার ছোটরাণীর কথা শোনো।

এমন লোকসান আছে যা ইহকাল পরকালে জামিন দিয়ে উদ্ধার হয় না।

আমাদের এই কথাবার্ত্তার মধ্যে আমার স্বামী একটি কথাও বল্লেন না। তাঁর খাওয়া হয়ে যেতেই তিনি বাইরে চলে গেলেন, আজকাল তিনি আর বিশ্রাম করতে ঘরের মধ্যে বসেন না।

আমার অধিকাংশ দামী গয়না ছিল খাতাঞ্চির জিম্মায়। তবু আমার নিজের কাছে যা ছিল তার দাম ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার কম হবে না। আমি সেই গয়নার বাক্স নিয়ে মেজরাণীর কাছে খুলে দিলুম, বল্লুম, মেজরাণী, আমার এই গয়না রইল তোমার কাছে। এখন থেকে তুমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পার।

মেজরাণী গালে হাত দিয়ে বল্লেন, ওমা, তুই যে অবাক্ করলি! তুই কি সত্যি ভাবিস তুই আমার টাকা চুরি করবি এই ভয়ে রাত্রে আমার ঘুম হচ্চে না?

আমি বল্লুম, ভয় করতেই বা দোষ কি? সংসারে কে কাকে চেনে বল, মেজরাণী!

মেজরাণী বল্লেন, তাই আমাকে বিশ্বাস করে শিক্ষা দিতে এসেচ বুঝি? আমার নিজের গয়না কোথায় রাখি ঠিক নেই, তোমার গয়না পাহারা দিয়ে আমি মরি আর কি? চারদিকে দাসীচাকর ঘুরচে, তোমার ও গয়না তুমি নিয়ে যাও ভাই।

মেজরাণীর কাছ থেকে চলে এসেই বাইরে বৈঠকখানাঘরে অমূল্যকে ডেকে পাঠালুম। অমূল্যর সঙ্গে সঙ্গে দেখি সন্দীপ এসে উপস্থিত। আমার তখন দেরী করবার সময় ছিল না, আমি

সন্দীপকে বল্লুম, অমূল্যর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ কথা আছে আপনাকে একবার—

সন্দীপ কাষ্ঠ হাসি হেসে বল্লে, অমূল্যকে আমার থেকে আলাদা করে দেখ না কি? তুমি যদি আমার কাছ থেকে ওকে ভাঙিয়ে নিতে চাও তাহলে আমি ওকে ঠেকিয়ে রাখতে পারব না।

আমি এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। সন্দীপ বল্লে, আচ্ছা বেশ, অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ কথা শেষ করে নিয়ে তার পরে আমার সঙ্গেও একটু বিশেষ কথা কবার অবসর দিতে হবে কিন্তু, নইলে আমার হার হবে; আমি সব মানতে পারি হার মান্‌তে পারিনে। আমার ভাগ সকলের ভাগের বেশি। এই নিয়ে চিরজীবন বিধাতার সঙ্গে লড়চি। বিধাতাকে হারাব, আমি হারব না।

তীব্রকটাক্ষে অমূল্যকে আঘাত করে সন্দীপ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অমূল্যকে বল্লুম, লক্ষ্মী ভাই আমার, তোমাকে আমার একটি কাজ করে দিতে হবে।

সে বল্লে, তুমি যা বল্‌বে আমি প্রাণ দিয়ে করব দিদি।

শালের ভিতর থেকে গয়নার বাক্স বের করে তার সাম্‌নে রেখে বল্লুম, আমার এই গয়না বন্ধক দিয়ে হোক্‌ বিক্রী করে হোক্‌ আমাকে ছ হাজার টাকা যত শীঘ্র পার এনে দিতে হবে।

অমূল্য ব্যথিত হয়ে বলে উঠল, না দিদি না, গয়না বিক্রী বন্ধক না, আমি তোমাকে ছ হাজার টাকা এনে দেব।

আমি বিরক্ত হয়ে বল্লুম, ওসব কথা রাখ,—আমার আর একটুও সময় নেই। এই নিয়ে যাও গয়নার বাক্স,—আজ রাত্রের

ট্রেনেই কলকাতায় যাও, পশু'র মধ্যে ছ হাজার টাকা আমাকে এনে দিতে হবে।

অমূল্য বাক্সের ভিতর থেকে হীরের চিকটা আলোতে তুলে ধরে আবার বিষণ্ণ মুখে রেখে দিলে। আমি বল্লুম, এই সব হীরের গয়না ঠিক দামে সহজে বিক্রী হবে না, সেই জন্যে আমি তোমাকে যে গয়না দিচ্চি এর দাম ত্রিশ হাজারেরও বেশি হবে। এ সবই যদি যায় সেও ভালো—কিন্তু ছ হাজার টাকা আমার নিশ্চয়ই চাই।

অমূল্য বল্লে, দেখ দিদি, তোমার কাছ থেকে এই যে ছ হাজার টাকা নিয়েচেন সন্দীপবাবু, এর জন্যে আমি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করেচি। বল্‌তে পারিনে এ কি লজ্জা! সন্দীপবাবু বলেন দেশের জন্যে লজ্জা বিসর্জ্জন করতে হবে। তা হয় ত হবে। কিন্তু এ যেন একটু আলাদা কথা,—দেশের জন্যে মরতে ভয় করিনে, মারতে দয়া করিনে এই শক্তি পেয়েচি, কিন্তু তোমার হাত থেকে এই টাকা নেওয়ার গ্লানি কিছুতে মন থেকে তাড়াতে পারচিনে। এইখানে সন্দীপবাবু আমার চেয়ে অনেক শক্ত—ওঁর একতিলও ক্ষোভ নেই। উনি বলেন টাকা যার বাক্সে ছিল টাকা যে সত্যি তারই এই মোহটা কাটানো চাই—নইলে বন্দেমাতরং মন্ত্র কিসের!

বল্‌তে বল্‌তে অমূল্য উৎসাহিত হয়ে উঠতে লাগল। আমাকে শ্রোতা পেলে ওর এই সব কথা বলবার উৎসাহ আরো বেড়ে যায়। ও বল্‌তে লাগল, গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেচেন, আত্মাকে ত কেউ মারতে পারে না। কাউকে বধ করা ও একটা কথা মাত্র। টাকা হরণ করাও সেই রকম একটা কথা। টাকা কার?

ওকে কেউ সৃষ্টি করে না, ওকে কেউ সঙ্গে নিয়ে যায় না, ও ত কারো আত্মার অঙ্গ নয়। ও আজ আমার, কাল আমার ছেলের, আর-একদিন আমার মহাজনের। সেই চঞ্চল টাকা যখন তত্বত কারোই নয় তখন তোমার অকর্ম্মণ্য ছেলের হাতে না পড়ে' দেশসেবকদের সেবায় যদি লাগে তাহলে তাকে নিন্দা করলেই সে কি নিন্দিত হবে?

সন্দীপের মুখের কথা যখন এই বালকের মুখে শুনি তখন ভয়ে আমার বুক কাঁপতে থাকে। যারা সাপুড়ে তারা বাঁশি বাজিয়ে সাপ নিয়ে খেলুক্, মরতে যদি হয় তারা জেনেশুনে মরুক। কিন্তু আহা এরা যে কাঁচা, সমস্ত বিশ্বের আশীর্ব্বাদ এদের যে নিয়ত রক্ষা করতে চায়, এরা সাপকে সাপ না জেনে হাস্‌তে হাস্‌তে তার সঙ্গে খেলা করতে যখন হাত বাড়ায় তখনই স্পষ্ট বুঝতে পারি এই সাপটা কি ভয়ঙ্কর অভিশাপ! সন্দীপ ঠিকই বুঝেছে— আমি নিজে তার হাতে মরতে পারি কিন্তু এই ছেলেটিকে তার হাত থেকে ভাঙিয়ে নিয়ে আমি বাঁচাব।

আমি একটু হেসে অমূল্যকে বল্লুম, তোমাদের দেশসেবকদের সেবার জন্যেও টাকার দরকার আছে বুঝি?

অমূল্য সগর্ব্বে মাথা তুলে বল্লে—আছে বই কি। তারাই যে আমাদের রাজা, দারিদ্র্যে তাদের শক্তি ক্ষয় হয়। আপনি জানেন, সন্দীপ বাবুকে ফার্ষ্টক্লাস ছাড়া অন্য গাড়িতে কখনো চড়তে দিই নে। রাজভোগে তিনি কখনো লেশমাত্র সঙ্কুচিত হন না—তাঁর এই মর্য্যাদা তাঁকে রাখতে হয় তাঁর নিজের জন্যে নয়, আমাদের সকলের জন্যে। সন্দীপবাবু বলেন সংসারে যারা ঈশ্বর, ঐশ্বর্য্যের সম্মোহনই

হচ্চে তাদের সব চেয়ে বড় অস্ত্র। দারিদ্র্যব্রত গ্রহণ করা তাদের পক্ষে দুঃখগ্রহণ করা নয় সে হচ্চে আত্মঘাত।

এমন সময় নিঃশব্দে সন্দীপ হঠাৎ ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আমি তাড়াতাড়ি আমার গয়নার বাক্সর উপর শাল চাপা দিলুম। সন্দীপ বাঁকাসুরে জিজ্ঞাসা করলে, অমূল্যর সঙ্গে তোমার বিশেষ কথার পালা এখনো ফুরোয় নি বুঝি?

অমূল্য একটু লজ্জিত হয়ে বল্লে, না, আমাদের কথা হয়ে গেছে। বিশেষ কিছু না।

আমি বল্লুম, না অমূল্য, এখনো হয় নি।

সন্দীপ বল্লে, তাহলে দ্বিতীয়বার সন্দীপের প্রস্থান?

আমি বল্লুম, হাঁ।

তাহলে সন্দীপকুমারের পুনঃপ্রবেশ—

সে আজ নয়—আমার সময় হবে না।

সন্দীপের চোখ দুটো জ্বলে উঠল,—বল্লে, কেবল বিশেষ কাজেরই সময় আছে, আর সময় নষ্ট করবার সময় নেই?

ঈর্ষা! প্রবল যেখানে দুর্ব্বল সেখানে অবলা আপনার জয়ডঙ্কা না বাজিয়ে থাকৃতে পারে কি? আমি তাই খুব দৃঢ়স্বরেই বল্লুম, না, আমার সময় নেই।

সন্দীপ মুখ কালী করে চলে গেল। অমূল্য কিছু উদ্বিগ্ন হয়ে বল্লে, রাণীদিদি, সন্দীপবাবু বিরক্ত হয়েচেন।

আমি তেজের সঙ্গে বল্লুম, বিরক্ত হবার ওঁর কারণও নেই, অধিকারও নেই। একটি কথা তোমাকে বলে রাখি অমূল্য, আমার এই গয়না বিক্রীর কথা তুমি প্রাণান্তেও সন্দীপবাবুকে বলতে পারবে না।

অমূল্য বল্লে, না, বল্‌ব না।

তাহলে আর দেরি কোরো না, আজ রাত্রের গাড়িতেই তুমি চলে যাও।

এই বলে অমূল্যর সঙ্গে সঙ্গেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম। বাইরে এসে দেখি, বারান্দায় সন্দীপ দাঁড়িয়ে আছে। বুঝলুম এখনি সে অমূল্যকে ধরবে। সেইটে বাঁচাবার জন্যে তাঁকে ডাকতে হল—সন্দীপবাবু, কি বল্‌তে চাচ্ছিলেন?

আমার কথা ত বিশেষ কথা নয়, কেবল বাজে কথা, সময় যখন নেই তখন—

আমি বল্‌লুম, আছে সময়।

অমূল্য চলে গেল। ঘরে ঢুকেই সন্দীপ বল্লেন, অমূল্যর হাতে একটা কি বাক্স দিলেন ওটা কিসের বাক্স?

বাক্সটা সন্দীপের চোখ এড়াতে পারেনি। আমি একটু শক্ত করেই বল্‌লুম, আপনাকে যদি বলবার হত তাহলে আপনার সামনেই দিতুম।

তুমি কি ভাবচ অমূল্য আমাকে বল্‌বে না?

না বল্‌বে না।

সন্দীপের রাগ আর চাপা রইল না, একেবারে আগুন হয়ে উঠে বল্লে, তুমি মনে করচ তুমি আমার উপর প্রভুত্ব করবে, পারবে না। ঐ অমূল্য, ওকে যদি আমার পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিই তাহলে সেই ওর সুখের মরণ হয়, ওকে তুমি তোমার পদানত করবে, আমি থাক্‌তে সে হবে না।

দুর্ব্বল, দুর্ব্বল! এতদিন পরে সন্দীপ বুঝতে পেরেচে ও

আমার কাছে দুর্ব্বল। তাই হঠাৎ এই অসংযত রাগ। ও বুঝতে পেরেচে আমার যে শক্তি আছে তার সঙ্গে জোর-জবরদস্তি খাটবে না;—আমার কটাক্ষের ঘায়ে ওর দুর্গের প্রাচীর আমি ভেঙে দিতে পারি। সেই জন্যই আজ এই আস্ফালন। আমি একটি কথা না বলে একটুখানি কেবল হাস্‌লুম। এতদিন পরে আমি ওর উপরের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েচি—আমার এ জায়গাটুকু যেন না হারায়, যেন না নাবি। আমার দুর্গতির মধ্যেও যেন আমার মান একটু থাকে!

সন্দীপ বল্লে, আমি জানি তোমার ও-বাক্স গয়নার বাক্স।

আমি বল্লুম, আপনি যেমন-খুসি আন্দাজ করুন আমি বলব না।

তুমি অমূল্যকে আমার চেয়ে বেশী বিশ্বাস কর? জান, ঐ বালক আমার ছায়ার ছায়া, আমার প্রতিধ্বনির প্রতিধ্বনি, আমার পাশের থেকে সরে গেলে ও কিছুই নয়!

যেখানে ও তোমার প্রতিধ্বনি নয় সেইখানে ও অমূল্য, সেইখানে আমি ওকে তোমার প্রতিধ্বনির চেয়ে বিশ্বাস করি।

মায়ের পূজা-প্রতিষ্ঠার জন্য তোমার সমস্ত গয়না আমাকে দিতে প্রতিশ্রুত আছ সে কথা ভুল্‌লে চল্‌বে না। সে তোমার দেওয়াই হয়ে গেছে।

দেবতা যদি আমার কোনো গয়না বাকি রাখেন তাহলে সেই গয়না দেবতাকে দেব। আমার যে গয়না চুরি যায় সে গয়না দেব কেমন করে’?

দেখ, তুমি আমার কাছ থেকে অমন-করে ফস্‌কে যাবার

চেষ্টা কোরো না। এখন আমার কাজ আছে, সেই কাজ আগে হয়ে যাক্ তার পরে তোমাদের ঐ মেয়েলি ছলাকলা বিস্তারের সময় হবে। তখন সেই লীলায় আমিও যোগ দেব।

যে-মুহূর্ত্তে আমি আমার স্বামীর টাকা চুরি করে সন্দীপের হাতে দিয়েচি সেই মুহূর্ত্ত থেকেই আমাদের সম্বন্ধের ভিতরকার সুরটুকু চলে গেছে। কেবল যে আমারি সমস্ত মূল্য ঘুচিয়ে দিয়ে আমি কানাকড়ার মত সস্তা হয়ে গেছি তা নয়—আমার পরে সন্দীপেরও শক্তি ভালো করে খেলবার আর জায়গা পাচ্চে না,—মুঠোর মধ্যে যা এসে পড়ে তার উপর আর তীর মারা চলে না। সেই জন্যে সন্দীপের আজ আর সেই বীরের মুর্ত্তি নেই। ওর কথার মধ্যে কলহের কর্কশ ইতর আওয়াজ লাগচে।

সন্দীপ আমার মুখের উপর তার উজ্জ্বল চোখ দুটো তুলে বসে রইল, দেখতে দেখতে তার চোখ যেন মধ্যাহ্ন আকাশের তৃষ্ণার মত জ্বলে উঠতে লাগল। তার পা দুই-একবার চঞ্চল হয়ে উঠল—বুঝতে পারলুম সে উঠি-উঠি করচে—এখনি সে উঠে এসে আমাকে চেপে ধরবে। আমার বুকের ভিতরে দুল্‌তে লাগল—সমস্ত শরীরের শির দব্‌দব্ করচে, কানের মধ্যে রক্ত ঝাঁ ঝাঁ করচে, বুঝলুম আর-একটু বসে থাকলে আমি আর উঠতে পারবো না। প্রাণপণ শক্তিতে আপনাকে চৌকি থেকে ছিঁড়ে নিয়ে উঠেই দরজার দিকে ছুটলুম। সন্দীপের রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠের মধ্যে থেকে গুমরে উঠলো—কোথায় পালাও রাণী?

পরক্ষণেই সে লাফ দিয়ে উঠে আমাকে ধরতে এল। এমন সময় বাইরে জুতোর শব্দ শোনা যেতেই সন্দীপ তাড়াতাড়ি চৌকিতে

ফিরে এসে বস্‌ল। আমি বইয়ের শেল্‌ফের দিকে মুখ করে বইগুলোর নামের দিকে তাকিয়ে রইলুম।

আমার স্বামী ঘরে ঢোকবামাত্রই সন্দীপ বলে উঠ্‌ল, ওহে নিখিল, তোমার শেল্‌ফে ব্রাউনিং নেই? আমি মক্ষিরাণীকে আমাদের সেই কলেজ-ক্লাবের কথা বলছিলুম—মনে আছে ত ব্রাউনিঙের সেই কবিতাটা তর্জ্জমা নিয়ে আমাদের চার জনের মধ্যে লড়াই? বল কি, মনে নেই! সেই যে—

> She should never have looked at me,
> If she meant I should not love her !
> There are plenty···men you call such,
> I suppose...she may discover
> All her soul to, if she pleases,
> And yet leave much as she found them :
> But I'm not so, and she knew it
> When she fixed me, glancing round them.

আমি হিঁচ্‌ড়ে-মিচ্‌ড়ে তার একটা বাংলা করেছিলুম কিন্তু সেটা এমন হল না "গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" এক সময়ে ঠাউরেছিলুম, কবি হলেম বুঝি, আর দেরি নেই,—বিধাতা দয়া করে আমার সে ফাঁড়া কাটিয়ে দিলেন —কিন্তু আমাদের দক্ষিণাচরণ, সে যদি আজ নিমক-মহালের ইনস্পেক্টর না হত তাহলে নিশ্চয় কবি হতে পারত; সে খাসা তর্জ্জমাটি করেছিল—পড়ে মনে হয় ঠিক যেন বাংলা ভাষা পড়ছি, যে দেশ জিয়োগ্রাফিতে নেই এমন কোনো দেশের ভাষা নয়—

আমায় ভালো বাস্‌বেনা সে এই যদি তার ছিল জানা
তবে কি তার উচিত ছিল আমার পানে দৃষ্টি হানা ?
তেমন-তেমন অনেক মানুষ আছে ত এই ধরাধামে
(যদি চ ভাই আমি তাদের গণিনেক মানুষ নামে)—
যাদের কাছে সে যদি তার খুলে দিত প্রাণের ঢাকা,
তবু তারা রইত খাড়া যেমন ছিল তেমনি ফাঁকা।
আমি ত নই তাদের মতন সে কথা সে জানত মনে
যখন মোরে বাঁধলো ধরে বিদ্ধ করে নয়ন কোণে।

না মক্ষিরাণী তুমি মিথ্যে খুঁজচ—নিখিল বিবাহের পর থেকে কবিতা পড়া একেবারে ছেড়ে দিয়েচে, বোধ হয় ওর আর দরকার হয় না। আমি ছেড়ে দিয়েছিলুম কাজের তাড়ায়, কিন্তু বোধ হচ্চে যেন কাব্যজ্বরো মনুষ্যানাং আমাকে ধরবে-ধরবে করচে!

আমার স্বামী বল্লেন, আমি তোমাকে সতর্ক করে দিতে এসেচি সন্দীপ।

সন্দীপ বল্লে, কাব্যজ্বর সম্বন্ধে ?

স্বামী ঠাট্টায় যোগ না দিয়ে বল্লেন, কিছুদিন ধরে ঢাকা থেকে মৌলবী আনাগোনা করতে আরম্ভ করচে—এ অঞ্চলের মুসলমানদের ভিতরে-ভিতরে ক্ষেপিয়ে তোল্‌বার উদ্যোগ চলেচে। তোমার উপর ওরা বিরক্ত হয়ে আছে, হঠাৎ একটা-কিছু উৎপাত করতে পারে।

পালাতে পরামর্শ দাও নাকি ?

আমি খবর দিতে এসেচি পরামর্শ দিতে চাইনে।

আমি যদি এখানকার জমিদার হতুম তাহলে ভাবনার কথা হত

মুসলমানদেরই, আমার নয়। তুমি আমাকেই উদ্বিগ্ন করে না তুলে ওদের দিকে যদি একটু উদ্বেগের চাপ দাও তাহলে সেটা তোমার এবং আমার উভয়েরই যোগ্য হয়। জান, তোমার দুর্ব্বলতায় পাশের জমিদারদের পর্য্যন্ত তুমি দুর্ব্বল করে তুলেচ?

সন্দীপ, আমি তোমাকে পরামর্শ দিই নি, তুমিও আমাকে পরামর্শ না দিলে চলত। ওটা বৃথা হচ্চে। আর একটি কথা আমার বলবার আছে। তোমরা কিছুদিন থেকে দলবল নিয়ে আমার প্রজাদের পরে ভিতরে ভিতরে উৎপাত করেচ। আর চলবে না, এখন তোমাকে আমার এলেকা ছেড়ে চলে যেতে হচ্চে।

মুসলমানের ভয়ে, না, আরো কোনো ভয় আছে?

এমন ভয় আছে যে ভয় না থাকাই কাপুরুষতা—আমি সেই ভয় থেকেই বলচি তোমাকে যেতে হবে সন্দীপ। আর দিন পাঁচেক পরে আমি কলকাতায় যাচ্চি সেই সময় তোমারও আমার সঙ্গে যাওয়া চাই। আমাদের কলকাতার বাড়িতে থাকতে পার তাতে কোনো বাধা নেই।

আচ্ছা, পাঁচদিন ভাববার সময় পাওয়া গেল। ইতিমধ্যে মক্ষিরাণী, তোমার মৌচাক থেকে বিদায় হবার গুঞ্জন গান করে নেওয়া যাক্! হে আধুনিক বাংলার কবি, খোলো তোমার দ্বার, তোমার বাণী লুঠ করে নিই,—চুরি তোমারই—তুমি আমারই গানকে তোমার গান করেচ—না-হয় নাম তোমার হল কিন্তু গান আমার।

এই বলে তার বেসুর-ঘেঁষা মোটা ভাঙা গলায় ভৈরবীতে গান ধরলে,—

মধুঋতু নিত্য হয়ে রইল তোমার মধুর দেশে।
যাওয়া-আসার কান্নাহাসি হাওয়ায় সেথা বেড়ায় ভেসে।

যায় যে জনা সেই সুধু যায়, ফুল ফোটা ত ফুরোয় না হায়,
ঝরবে যে ফুল সেই কেবলি ঝরে পড়ে বেলাশেষে।
যখন আমি ছিলেম কাছে তখন কত দিয়েছি গান ;
এখন আমার দূরে যাওয়া এরো কিগো নাই কোনো দান ?
পুষ্পবনের ছায়ায় ঢেকে এই আশা তাই গেলেম রেখে
আগুন-ভরা ফাগুনকে তোর কাঁদায় যেন আষাঢ় এসে ॥

সাহসের অন্ত নেই—সে সাহসের কোনো আবরণও নেই—একেবারে আগুনের মত নগ্ন। তাকে বাধা দেওয়ার সময় পাওয়া যায় না,—তাকে নিষেধ করা যেন বজ্রকে নিষেধ করা, বিদ্যুৎ সে নিষেধ হেসে উড়িয়ে দেয়।

আমি বাইরে বেরিয়ে এলুম। বাড়ির ভিতরের দিকে যখন চলে যাচ্চি হঠাৎ দেখি অমূল্য কোথা থেকে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। বল্লে, রাণীদিদি, তুমি কিচ্ছু ভেবো না। আমি চল্‌লুম, কিছুতেই নিষ্ফল হয়ে ফিরব না।

আমি তার নিষ্ঠাপূর্ণ তরুণ মুখের দিকে চেয়ে বল্‌লুম, অমূল্য, নিজের জন্য ভাব্‌ব না, যেন তোমাদের জন্যে ভাবতে পারি।

অমূল্য চলে যাচ্ছিল, আমি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলুম, অমূল্য তোমার মা আছেন ?

আছেন।

বোন ?

নেই, আমি মায়ের একমাত্র ছেলে। বাবা আমার অল্প বয়সে মারা গেছেন্।

যাও তুমি, তোমার মায়ের কাছে ফিরে যাও, অমূল্য।

দিদি, আমি যে এখানে আমার মাকেও দেখছি আমার বোনকেও দেখছি।

আমি বল্লুম, অমূল্য, আজ রাত্রে যাবার আগে তুমি এখান থেকে খেয়ে যেয়ো।

সে বল্লে, সময় হবে না, দিদিরাণী, তোমার প্রসাদ আমার সঙ্গে দিয়ো আমি নিয়ে যাব।

তুমি কী খেতে ভালবাস অমূল্য?

মায়ের কাছে থাকলে পৌষে পেট ভরে পিঠে খেতুম। ফিরে এসে তোমার হাতের তৈরী পিঠে খাব দিদিরাণী!

ক্রমশঃ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেক্‌স্‌পিয়র

(কবির মৃত্যুর তিনশো বছর পরের স্মৃতিবার্ষিক উপলক্ষ্যে)

যেদিন উদিলে তুমি, বিশ্বকবি, দূর সিন্ধুপারে,
ইংলণ্ডের দিক্‌প্রান্ত পেয়েছিল সেদিন তোমারে
আপন বক্ষের কাছে, ভেবেছিল বুঝি তারি তুমি
কেবল আপন ধন; উজ্জ্বল ললাট তব চুমি'
রেখেছিল কিছুকাল অরণ্যশাখার বাহুজালে,
ঢেকেছিল কিছুকাল কুয়াশা-অঞ্চল অন্তরালে
বনপুষ্প-বিকশিত তৃণঘন শিশির-উজ্জ্বল
পরীদের খেলার প্রাঙ্গণে। দ্বীপের নিকুঞ্জতল
তখনো ওঠেনি জেগে কবিসূর্য্য-বন্দনা-সঙ্গীতে।
তার পরে ধীরে ধীরে অনন্তের নিঃশব্দ ইঙ্গিতে
দিগন্তের কোল ছাড়ি' শতাব্দীর প্রহরে প্রহরে
উঠিয়াছে দীপ্তজ্যোতি মধ্যাহ্নের গগনের পরে;
নিয়েছ আসন তব সকল দিকের কেন্দ্রদেশে
বিশ্বচিত্ত উদ্ভাসিয়া; তাই হের যুগান্তর-শেষে
ভারতসমুদ্রতীরে কম্পমান শাখাপুঞ্জে আজি
নারিকেলকুঞ্জবনে জয়ধ্বনি উঠিতেছে বাজি।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিক্ষা বিস্তার

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রবাবুর প্রস্তাবটিকে কাজে খাটাইবার জন্য দুইটি উপায় স্থির করা যাইতে পারে। প্রথম উপায়—মাতৃভাষায় সাহিত্যের পুষ্টি সাধনের জন্য বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, কলাবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ রচনা, যাহাতে মাতৃভাষার ভিতর দিয়াই এই সকল বিষয়ের চর্চ্চা হইতে পারে। দ্বিতীয় উপায়—মাতৃভাষায় এই সকল বিষয়ে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার ব্যবস্থা, যাহাতে ছাত্র ও অধ্যাপক দুজনেরই যথার্থ মানসিক বিকাশ হইতে পারে এবং উদ্ভাবনী ও সৃজনী শক্তি স্ফূর্ত্তিলাভ করিতে পারে। বস্তুত এই দুইটি উপায়ের মধ্যেই একটি অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে। কারণ, সাহিত্য ছাড়া শিক্ষা হয় না এবং শিক্ষা ছাড়াও সাহিত্য হয় না।

ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, কোন দেশের প্রচলিত ভাষায় এই সকল বিষয়ের চর্চ্চা দুইটি উপায়ের দ্বারা সাধিত হইয়াছে। প্রথমত, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, ইস্কুল প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা। দ্বিতীয়ত, একাডেমি বা সোসাইটি বা পরিষদের দ্বারা। ইতালী দেশে Della Cruxa Academy, ফরাসীদেশে বহুসংখ্যক Academy, এবং জর্ম্মাণি ও রাশিয়াতে State University-র সাহায্যে সেই-সেই দেশের মাতৃভাষায় বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তর গ্রন্থ রচিত হইয়া একটা বড় রকমের সাহিত্য দাঁড়াইয়া গেছে। চীনদেশে ও জাপানে শেষোক্ত প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে এই কাজ অগ্রসর হইতেছে। আমাদের এই ভারতবর্ষে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরিয়েণ্টাল বিভাগে এবং বেনারস কলেজে

সংস্কৃত বিভাগের জন্য উচ্চ অঙ্গের দর্শন বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি দেশীয় ভাষায় প্রকাশ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় Locke-এর Human Understanding গ্রন্থের অনুবাদ আছে এবং পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে লজিক, ইতিহাস, অর্থনীতিশাস্ত্রের গ্রন্থাদিও দেশীয় ভাষায় তর্জ্জমা করা হইয়াছে। কিন্তু এই দুই বিভাগেই শিক্ষার ক্ষেত্র অত্যন্ত সংকীর্ণ থাকায়, ইংরাজী শিক্ষার সঙ্গে প্রতি-দ্বন্দ্বিতায় ইহাদিগকে হটিতে হইয়াছে। হিন্দী প্রচারিণী সভা হইতেও একটা পরিভাষা সংকলিত হইয়া ইউরোপীয় ভাষা হইতে নানা গ্রন্থ অনুবাদ করিয়া সাহিত্য-পুষ্টির চেষ্টা হইয়াছে। গুজরাটী মারাঠী ভাষাতেও এইরূপ হইয়াছে। অর্থনীতি সম্বন্ধে নানাগ্রন্থ সে সকল ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বাংলা ভাষায় এ কাজের প্রস্তাব অনেকবার উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সে প্রস্তাব কাজে পরিণত হয় নাই। কেবল ক্যাম্পবেল স্কুল, সার্ভে স্কুল ও ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদের জন্য শারীর বিজ্ঞান, অস্থিতত্ত্ব, পাটীগণিত, বীজগণিত, জরীপ বিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে বাংলা ভাষায় কতক কতক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু সে সকল শিক্ষা এখন আর মাতৃভাষায় হয় না, কিম্বা সে সকল শিক্ষার স্রোত রুদ্ধপ্রায়। তাহার একটা কারণ এই মনে হয় যে, এ সকল শিক্ষার সহিত উচ্চ বিজ্ঞানের শিক্ষা জুড়িয়া দেওয়া হয় নাই; সেইজন্য ইহারা প্রাণ পাইতেছে না।

বাংলাদেশে শিক্ষার ভিতর মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠার শেষ চেষ্টা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন, ইণ্টারমিডিয়েট ও বি এ পরীক্ষায় বংলাভাষায় পরীক্ষার ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় কয়েকজন

সাহিত্যিক উৎসাহিত হন এবং ছাত্রেরা অল্প স্বল্প বাংলা পড়িতে ও লিখিতে অভ্যস্ত হয়—আমার মত একেবারে আনাড়ী থাকিয়া যায় না, এইটুকুই যা লাভ। কিন্তু তাহা কিছুই নয়, অতি সামান্য। এ ব্যবস্থায় বাংলা সাহিত্য বা ভাষা বিশেষভাবে অধ্যয়ন অধ্যাপনার বিষয় হয় নাই; পরীক্ষা অনেকটা সখের জিনিষ দাঁড়াইয়া গেছে। আর ইহাতে বাংলার ভিতর দিয়া দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি শিখিবার কোন কথাই নাই; সুতরাং যথার্থ মানসিকবিকাশের কোন সুযোগ নাই। বরং বম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন হইতে এম্ এ পরীক্ষা পর্য্যন্ত সমস্ত পরীক্ষায় মারাঠী ও গুজরাটী ভাষায় পাঠ্য বিষয়ের নির্দ্দিষ্ট তালিকা অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে ঐ দুই ভাষা অধ্যয়ন সম্বন্ধে বেশ কাজ হইয়াছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের readership আছে এবং বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতাও হয়—কিন্তু ইংরাজীতে।

আর একটি ব্যবস্থা এ সকলের চেয়েও মাতৃভাষায় শিক্ষালাভের পথকে বেশ একটুখানি প্রশস্ত করিয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার্থী ইচ্ছা করিলে ইতিহাস বিষয়ে বাংলায় পরীক্ষা দিতে পারে; সে বিষয়ে বাংলা পাঠ্যপুস্তকও নির্দ্দিষ্ট হয়। শিক্ষক মহাশয়ও ইচ্ছা করিলেই অধ্যাপনার সময়ে বাংলাভাষা অবলম্বন করিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে অত্যন্ত অল্পসংখ্যক স্কুলে ছাত্র কিম্বা অধ্যাপক এই সুযোগটি গ্রহণ করিয়া থাকেন। প্রথমে Simla Committeeতে এ-সম্বন্ধে আমার প্রস্তাব যখন গৃহীত হয়, তখন আশা করিয়াছিলাম যে এই নজিরে ক্রমে অঙ্ক ও ভূগোল এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষার লজিক ও ইতিহাস এবং

ক্রমশঃ আরো দু একটি বিষয় বাংলার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার রীতি প্রবর্ত্তিত করা যাইতে পারিবে। কিন্তু আমাদের নিজেদের তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার জন্য এ সম্ভাবনাকে আমরা হারাইতে বসিয়াছি।

কাশীতে যে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে, তাহাতে হিন্দী ভাষায় অনেক বিষয়ে শিক্ষা দিবার চেষ্টা হইবে। কিন্তু তাহা কতদূর কাজে দাঁড়াইবে, তাহা এখন বলা কঠিন। তবে সেই বিশ্ববিত্থালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগের এ বিষয়ে দৃষ্টি আছে, ইহাই সুখের বিষয়।

এখন আমাদের কর্ত্তব্য :—

(১) বিশ্ববিত্থালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলির বাহিরে কি কাজ হইতে পারে :—

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাহিরে নানা সমিতি বা পরিষদের ভিতর দিয়া নানাবিধ শিক্ষাপ্রদ বিষয়ে ধারাবাহিক ভাবে বক্তৃতা দিবার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। যেমন, সায়ান্স এসোসিয়েশনে বিজ্ঞান সম্বন্ধে এইরূপ অনেকগুলি বক্তৃতার ব্যবস্থা করা যায়—সাহিত্যপরিষদে ও সাহিত্যসভাগুলিতেও ইতিহাস, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতার ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু এ সকল বক্তৃতার দ্বারা কোন নিয়মিত শিক্ষার কাজ হয় না। সবচেয়ে সুবিধা হয় যদি বিশ্ববিত্থালয়ের extension lectures-এর প্রোগ্রামের মধ্যে নিয়মিতরূপে বাংলা-ভাষায় বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করা যায়। সেই সঙ্গে পরীক্ষার ব্যবস্থাও থাকিবে; পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদিগকে ডিপ্লোমা, মেডাল প্রভৃতি দেওয়া

হইবে। বিশ্ববিদ্যালয় সেই সকল বক্তৃতা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবেন ও তাহাদিগকে প্রশংসিত পুস্তকের তালিকাভুক্ত করিবেন। এইরূপে ক্রমে বাংলায় একটা university publication শ্রেণী বা Home University শ্রেণীর মত এক শ্রেণীর গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে পারিবে। একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। এই সকল বক্তৃতায় শ্রোতার অভাব হইবে না—বিশেষতঃ কলিকাতায়, ঢাকায়, কিম্বা অন্য কোন প্রধান সহরে বা শিক্ষার কেন্দ্রে। কেবল যে কলেজ বা স্কুলের ছাত্ররাই আসিবে তাহা নয়, অনেক শিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত লোক, যাঁহারা স্কুল বা কলেজ ছাড়িয়া কাজকর্ম্ম বা ব্যবসায়ে লাগিয়াছেন, তাঁহারাও এই সকল বাংলা বক্তৃতাদি শুনিতে আসিবেন। এগুলি সান্ধ্য বক্তৃতার মত কাজ করিবে। এইরূপে বাংলায় শিক্ষা ও বাংলা সাহিত্য উভয়েরই ক্ষেত্র বিস্তৃত হইতে থাকিবে।

(২) বিশ্ববিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলির ভিতরে বাংলায় শিক্ষা দেওয়ার কি ব্যবস্থা হইতে পারে:—

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহার গোড়াপত্তন হইয়াছে, এখন ইমারত গাঁথা চাই। ম্যাট্রিকুলেশনের ইতিহাস, ইণ্টারমিডিয়েটের লজিক-এ বাংলা পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচিত হয় এবং ইতিহাসে বাংলায় পরীক্ষা গ্রহণও করা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অল্প বিদ্যালয়েই বাংলায় এই সকল বিষয় শেখানো হইয়া থাকে এবং অতি অল্পসংখ্যক পরীক্ষার্থী বাংলায় ইতিহাসের প্রশ্নের উত্তর দেয়। যদি ছাত্রদের বা স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের বা ছাত্রদের অভিভাবকদের এ বিষয়ে আগ্রহ থাকিত, তাহা হইলে ক্রমশঃ ভূগোল, অঙ্ক, মেকানিক্স,

লজিক ও ইতিহাস, এই সকল বিষয়েও বাংলায় শিক্ষাদান ও বাংলায় পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ে তোলা যাইত ও আলোচনা করা যাইত। এখনও সুযোগ আছে, এ বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা ও উদ্যম আবশ্যক। আর বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ প্রস্তাব না আনিয়াও এ বিষয়ে কিছু পরিমাণে কার্য্যসিদ্ধি অসম্ভব নয়। আমি কোন কোন বিজ্ঞ ও বহুদর্শী অধ্যাপকের কথা জানি যাঁহারা ইণ্টারমিডিয়েট এমন কি বি,এ, শ্রেণীতেও বাংলায় শিক্ষা দিয়াছেন এবং ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত যে তাঁহাদের অধ্যাপনায় ছাত্রেরা অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে অধ্যাপকেরা ও ছাত্রেরা স্বাধীন —বিশ্ববিদ্যালয় এরূপ শিক্ষায় কোন আপত্তি করেন নাই, কোন আপত্তি করিতে পারেন না। যদি অধ্যাপক মাঝে মাঝে সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় অধ্যাপনার সময়ে বাংলায় বক্তৃতা দেন, তাহা হইলে সকল পক্ষেরই মঙ্গল। তাহা হইলে ছাত্রদেরও যেমন যথার্থ মানসিক উন্নতি ঘটিতে পারে, অধ্যাপকদেরও তেমনিই প্রভূত মানসিক উন্নতি ঘটিতে পারে। "শিক্ষার বাহন" আসিবার জন্য ইহাই সদর রাস্তা—একমাত্র বড় রাস্তা। আজকাল প্রত্যেক কলেজে, অনেক কলেজ-বোর্ডিংয়ে বা মেসে সাহিত্য, দর্শন বা বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনার জন্য ক্লাব আছে। ছাত্র ও অধ্যাপকে মিলিয়া সেই সকল সভাসমিতিতে বাংলা ভাষায় মাঝে মাঝে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা চলিতে পারে। কলেজের কাগজে বা মাসিক পত্রাদিতে সেই সকল প্রবন্ধ ছাপা হইতে পারে। এ সকল উপায় অবলম্বন করা কিছুমাত্র দুঃসাধ্য নয়।

(৩) সাহিত্যপরিষদ ও সাহিত্যসভাসকল পরিভাষা সঙ্কলন ও গ্রন্থ প্রকাশ বা প্রবন্ধাদির দ্বারা মাতৃভাষায় দর্শন বিজ্ঞান প্রভৃতির শিক্ষাবিস্তারে বিশেষ সহায়তা করিতে পারেন। সাহিত্য পরিষদ একাজে ইতিমধ্যেই ব্রতী হইয়াছেন—বিজ্ঞানের পরিভাষা এবং আজকাল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদিও মাতৃভাষায় প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু শিক্ষার কেন্দ্রগুলি তৈরি না হইলে এ পরিভাষা কখনও চলিবে না। সুতরাং সেই সকল কেন্দ্র প্রস্তুত করিয়া মাতৃভাষায় উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান ও দর্শন শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে, তবেই সাহিত্য পরিষদের এতকালের চেষ্টা সফল হইবে।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শীল।

মনীষী-মঙ্গল

(প্রাচ্য ও প্রতীচ্যে প্রাপ্ত-পূজা, বিজ্ঞানাচার্য্য, বহুমানাস্পদ ডাক্তার
শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের সংবর্দ্ধনা উপলক্ষ্যে)

জ্ঞানের মণি-প্রদীপ নিয়ে ফিরিছ কে গো দুর্গমে !
হেরিছ এক প্রাণের লীলা জন্তু-জড়-জঙ্গমে !
অন্ধকারে নিত্য নব পন্থা ক'র আবিষ্কার !
সত্য-পথ-যাত্রী ওগো ! তোমায় করি নমস্কার ।

দাস্যকালি যাহার ভালে জন্ম তব সেই দেশে,
বিশ্বেরও নমস্য আজি প্রতিভা-বিভা-উন্মেষে ;
গরুড় তুমি গগনারূঢ় বিনতা নীড় সম্ভূত,
দেবতাসম ললাটে তব স্ফুরে কী আঁখি অদ্ভুত !

দরদী তুমি দরদ দিয়ে বুঝেছ তৃণলতার প্রাণ ;
খনির লোহা প্রাণীর লোহ পরশে তব স্পন্দমান ।
কুহকী তুমি, মায়াবী তুমি, এ কি গো তব ইন্দ্রজাল !
হুকুমে তব নৃত্য করে বনের তরু বনচাঁড়াল !

মরমী তুমি চরম খোঁজা মরম শুধু খুঁজেছ গো,
লজ্জাবতী লতার কি যে সরম তাহা বুঝেছ গো,
অজানা রাজপুত্র সম জড়ের দেশে একলাটি
পশিয়া নৃপ-বালার ভালে ছোঁয়ালে এ কি হেম-কাঠি !

হিম যা ছিল তপ্ত হল মেলিল আঁখি মূর্চ্ছিত,—
নূতন পরিচয়ের নব চন্দনেতে চর্চ্চিত !
বনের পরী তুলিল হাই, জাগিল হাওয়া নিশ্বাসে
জড়েরা বলে মনের কথা তোমার প্রতি বিশ্বাসে !

দ্বন্দ্ব যত জনম-শোধ চুকিয়া গেল অকস্মাৎ,
চক্ষে হেরে নিখিল লোক জীবনে জড়ে নাই তফাৎ !
ভুবন ভরি বিরাজ করে অনন্ত অখণ্ড প্রাণ
প্রাণেরি অচিন্ত্য লীলা জন্তু জড়ে স্পন্দমান !

জ্ঞানের মহাসিন্ধু তুমি মিলালে যত নদনদী,
বজ্রমণি ছিদ্র করে প্রতিভা তব, তীক্ষ্ণধী !
আনন্দেরি স্বর্গে তুমি জ্ঞানের সিঁড়ি নিত্য হে,
সত্য-মহা-সমুদ্রেতে সঙ্গমেরি তীর্থ হে !

অনুর চেয়ে ক্ষুদ্র যিনি জনক মহাসমুদ্রের
করিলে জ্ঞানগম্য তাঁরে কি বিপ্রের কি শূদ্রের ;
দ্বন্দ্বহারা আনন্দের করিলে পথ পরিস্কার
বিশ্বজন-বন্দ্য তুমি তোমায় করি নমস্কার।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

১৬ই ডিসেম্বর ১৯১৫

সবুজ পত্র

ঘরে-বাইরে

নিখিলেশের আত্মকথা

রাত্রি তিনটের সময় জেগে উঠেই আমার হঠাৎ মনে হয়, যে-জগতে আমি একদিন বাস করতুম সে যেন মরে' ভূত হয়ে আমার এই বিছানা, এই ঘর, এই সব জিনিষপত্র দখল করে বসে আছে। আমি বেশ বুঝতে পারলুম মানুষ কেন পরিচিত লোকের ভূতকেও ভয় করে। চিরকালের জানা যখন একমুহূর্ত্তে অজানা হয়ে ওঠে তখন সে এক বিভীষিকা। জীবনের সমস্ত ব্যবহার যে সহজ স্রোতে চলছিল আজ তাকে যখন এমন খাদে চালাতে হবে যে-খাদ এখনো কাটা হয়নি তখন বিষম ধাদা লেগে যায়; তখন নিজের স্বভাবকে বাঁচিয়ে চলা শক্ত হয়; তখন নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হয় আমিও বুঝি আরেকজন কেউ।

কিছুদিন থেকে বুঝতে পারচি সন্দীপের দলবল আমাদের অঞ্চলে উৎপাত সুরু করেচে। যদি আমার স্বভাবে স্থির থাকতুম তাহলে সন্দীপকে জোরের সঙ্গে বলতুম, এখান থেকে চলে যাও। কিন্তু গোলেমালে অস্বাভাবিক হয়ে উঠেচি। আমার পথ আর

সরল নেই। সন্দীপকে চলে যেতে বলার মধ্যে আমার একটা লজ্জা আসে। ওর সঙ্গে আর-একটা কথা এসে পড়ে; তাতে নিজের কাছে ছোট হয়ে যাই।

দাম্পত্য আমার ভিতরের জিনিষ ছিল—সে ত কেবল আমার গৃহস্থ-আশ্রম বা সংসারযাত্রা নয়। সে আমার জীবনের বিকাশ। সেই জন্যে বাইরের দিক থেকে ওর উপরে একটুও জোর দিতে পারলুম না—দিতে গেলেই মনে হয় আমার দেবতাকে অপমান করচি। এ কথা কাউকে বোঝাতে পারব না। আমি হয় ত অদ্ভুত। সেই জন্যেই হয় ত ঠক্‌লুম। কিন্তু আমার বাইরেকে ঠকা থেকে বাঁচাতে গিয়ে ভিতরকে ঠকাই কি করে?

যে-সত্য অন্তর থেকে বাইরেকে সৃষ্টি করে তোলে আমি সেই-সত্যের দীক্ষা নিয়েচি। তাই আজ আমাকে বাইরের জাল এমন করে ছিন্ন করতে হল। আমার দেবতা আমাকে বাইরের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবেন। হৃদয়ের রক্তপাত করে সেই-মুক্তি আমি পাব। কিন্তু যখন পাব তখন অন্তরের রাজত্ব আমার হবে।

সেই-মুক্তির স্বাদ এখনি পাচ্চি। থেকে থেকে অন্ধকারের ভিতর থেকে আমার অন্তরের ভোরের পাখী গান গেয়ে উঠচে। যে-বিমলা মায়ায় তৈরি সেই স্বপ্ন ছুটে গেলেও ক্ষতি হবে না, আমার ভিতরের পুরুষটি এই আশ্বাসবাণী থেকে থেকে বলে উঠচে।

মাষ্টার মশায়ের কাছে খবর পেলুম সন্দীপ হরিশকুণ্ডুর সঙ্গে যোগ দিয়ে খুব ধুম করে মহিষমর্দ্দিনী পূজোর আয়োজন করচে। এই পূজোর খরচা হরিশকুণ্ডু তার প্রজাদের কাছ থেকে আদায়

করতে লেগে গেছে। আমাদের কবিরত্ন আর বিদ্যাবাগীশ মশায়কে দিয়ে একটি স্তব রচনা করা হচ্চে যার মধ্যে দুই অর্থ হয়। মাষ্টার মশায়ের সঙ্গে এই নিয়ে সন্দীপের একটু তর্কও হয়ে গেছে। সন্দীপ বলে, দেবতার একটা এভোল্যুশন আছে; পিতামহরা যে-দেবতা সৃষ্টি করেছিলেন, পৌত্রেরা যদি সেই-দেবতাকে আপনার মত না করে তোলে তাহলে যে নাস্তিক হয়ে উঠবে। পুরাতন দেবতাকে আধুনিক করে তোলাই আমার মিশন্, দেবতাকে অতীতের বন্ধন্ থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই আমার জন্ম। আমি দেবতার উদ্ধারকর্ত্তা। ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসচি সন্দীপ হচ্চে আইডিয়ার যাদুকর,—সত্যকে আবিষ্কার করায় ওর কোনো প্রয়োজন নেই, সত্যের ভেল্‌কি বানিয়ে তোলাতেই ওর আনন্দ। মধ্য আফ্রিকায় যদি ওর জন্ম হত, তাহলে, নরবলি দিয়ে নরমাংস ভোজন করাই যে মানুষকে মানুষের অন্তরঙ্গ করার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাধনা এই কথা নূতন যুক্তিতে প্রমাণ করে ও পুলকিত হয়ে উঠত। ভোলানোই যার কাজ নিজেকেও না ভুলিয়ে সে থাকতে পারে না। আমার বিশ্বাস, সন্দীপ কথার মন্ত্রে যতবার নূতন-নূতন কুহক সৃষ্টি করে প্রত্যেকবার নিজেই মনে করে সত্যকে পেয়েচি,—তার এক-সৃষ্টির সঙ্গে আরেক-সৃষ্টির যতই বিরোধ থাক্।

যাই হোক্ দেশের মধ্যে মায়ার এই তাড়ি-খানা বানিয়ে তোলায় আমি কিছুমাত্র সাহায্য করতে পারব না। যে তরুণ যুবকেরা দেশের কাজে লাগতে চাচ্চে গোড়া থেকেই তাদের নেশা অভ্যাস করানোর চেষ্টায় আমার যেন কোনো হাত না থাকে। মন্ত্রে ভুলিয়ে যারা কাজ আদায় করতে চায় তারা কাজটারই দাম বড়

করে দেখে, যে-মানুষের মনকে ভোলায় সেই মনের দাম তাদের কাছে কিছুই নেই। প্রমত্ততা থেকে দেশকে যদি বাঁচাতে না পারি তবে দেশের পূজা হবে দেশের বিষনৈবেদ্য, দেশের কাজ বিমুখ ব্রহ্মাস্ত্রের মত দেশের বুকে এসে বাজবে।

বিমলার সাম্‌নেই সন্দীপকে বলেচি, তোমাকে আমার বাড়ি থেকে চলে যেতে হবে। এতে হয় ত বিমলা এবং সন্দীপ দুজনেই আমার মৎলবকে ভুল বুঝবে। কিন্তু এই ভুল বোঝার ভয় থেকে মুক্তি চাই। বিমলাও আমাকে ভুল বুঝুক্।

ঢাকা থেকে মৌলবী প্রচারকের আনাগোনা চল্‌চে। আমাদের এলাকার মুসলমানেরা গোহত্যাকে প্রায় হিন্দুর মতই ঘৃণা করত। কিন্তু দুই-এক জায়গায় গোরু জবাই দেখা দিল। আমি আমার মুসলমান প্রজারই কাছে তার প্রথম খবর পাই এবং তার প্রতিবাদও শুনি। এবারে বুঝলুম, ঠেকানো শক্ত হবে। ব্যাপার-টার মূলে একটা কৃত্রিম জেদ আছে। বাধা দিতে গেলে ক্রমে তাকে অকৃত্রিম করে তোলা হবে। সেইটেই ত আমাদের বিরুদ্ধ পক্ষের চাল।

আমার প্রধান-প্রধান হিন্দুপ্রজাকে ডাকিয়ে অনেক করে' বোঝাবার চেষ্টা করলুম। বল্লুম, নিজের ধর্ম্ম আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্ম্মের উপর আমাদের হাত নেই। আমি বোষ্টম বলে' শাক্ত ত রক্তপাত করতে ছাড়ে না। উপায় কি? মুসলমানকেও নিজের ধর্ম্মমতে চল্‌তে দিতে হবে। তোমরা গোলমাল কোরো না।

তারা বল্লে, মহারাজ এতদিন ত এ সব উপসর্গ ছিল না।

আমি বল্লুম, ছিল না, সে ওদের ইচ্ছা। আবার ইচ্ছা করেই যাতে নিবৃত্ত হয় সেই পথই দেখ। সে ত ঝগড়ার পথ নয়।

তারা বল্লে, না মহারাজ, সেদিন নেই, শাসন না করলে কিছুতেই থামবে না।

আমি বল্লুম, শাসনে গোহিংসা ত থাম্‌বেই না, তার উপরে মানুষের প্রতি হিংসা বেড়ে উঠতে থাকবে।

এদের মধ্যে একজন ছিল, ইংরেজি-পড়া; সে এখনকার বুলি আওড়াতে শিখেচে। সে বল্লে, দেখুন, এটা ত কেবল একটা সংস্কারের কথা নয়, আমাদের দেশ কৃষিপ্রধান—এদেশে গোরু যে—

আমি বল্লুম,—এদেশে মহিষেও দুধ দেয় মহিষেও চাষ করে, কিন্তু তার কাটামুণ্ড মাথায় নিয়ে সর্ব্বাঙ্গে রক্ত মেখে যখন উঠোনময় নৃত্য করে বেড়াই তখন ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম্ম মনে মনে হাসেন কেবল ঝগড়াটাই প্রবল হয়ে উঠে। কেবল গোরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয় তবে ওটা ধর্ম্ম নয়, ওটা অন্ধ সংস্কার।

ইংরেজি পড়া বল্লে, এর পিছনে কে আছে সেটা কি দেখতে পাচ্চেন না? মুসলমানরা জান্‌তে পেরেছে তাদের শাস্তি হবে না —পাঁচুড়েতে কি কাণ্ড তারা করেচে শুনেছেন ত?

আমি বল্লুম, এই যে মুসলমানদের অস্ত্র করে আজ আমাদের উপরে হানা সম্ভব হচ্চে—এই অস্ত্রই যে আমরা নিজের হাতে বানিয়েচি—ধর্ম্ম যে এমনি করেই বিচার করেন। আমরা যা এতকাল ধরে জমিয়েচি আমাদের উপরেই তা খরচ হবে।

ইংরেজি-পড়া বল্লে, আচ্ছা ভালো, তাই খরচ হয়ে যাক্। কিন্তু

এর মধ্যে আমাদেরও একটা সুখ আছে—আমাদেরই এবার জিৎ—যে আইন ওদের সকলের চেয়ে বড় শক্তি সেই আইনকে আজ আমরা ধূলিসাৎ করেচি, এতদিন ওরা রাজা ছিল আজ ওদেরও আমরা ডাকাতি ধরাব। একথা ইতিহাসে কেউ লিখবে না কিন্তু এ কথা চিরদিন আমাদের মনে থাক্‌বে।

এদিকে কাগজে কাগজে অখ্যাতিতে আমি বিখ্যাত হয়ে পড়লুম। শুন্‌চি চক্রবর্ত্তীদের এলাকায় নদীর ধারে শ্মশানঘাটে দেশসেবকের দল আমার কুশপুত্তলী বানিয়ে খুব ধুম করে সেটাকে দাহ করেচে—তার সঙ্গে আরো অনেক অপমানের আয়োজন ছিল। এরা কাপড়ের কল খুলে যৌথ কারবার করবে বলে আমাকে খুব বড় শেয়ার কেনাতে এসেছিল। আমি বলেছিলুম, যদি কেবল আমার এই ক'টি টাকা লোকসান যেত খেদ ছিল না, কিন্তু তোমরা যদি কারখানা খোল তবে অনেক গরীবের টাকা মারা যাবে এই জন্যেই আমি শেয়ার কিন্‌ব না।

কেন মশায়? দেশের হিত কি আপনি পছন্দ করেন না?

কারবার করলে দেশের হিত হতেও পারে, কিন্তু দেশের হিত করব বল্লেই ত কারবার হয় না। যখন ঠাণ্ডা ছিলুম তখন আমাদের ব্যবসা চলেনি,—আর ক্ষেপে উঠেচি বলেই কি আমাদের ব্যবসা হুহু করে চল্‌বে?

এক কথায় বলুন না আপনি শেয়ার কিনবেন না।

কিন্‌ব যখন তোমাদের ব্যবসাকে ব্যবসা বলে বুঝব। তোমাদের আগুন জ্বলচে বলেই যে তোমাদের হাঁড়িও চড়বে সেটার ত কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখচিনে।

এরা মনে করে আমি খুব হিসাবী আমি কৃপণ। আমার স্বদেশী কারবারের হিসাবের খাতাটা এদের খুলে দেখাতে ইচ্ছা করে। আর সেই যে একদিন মাতৃভূমিতে ফসলের উন্নতি করতে বসেছিলুম তার ইতিহাস এরা বুঝি জানে না! ক'বছর ধরে জাভা মরিশস্ থেকে আখ আনিয়ে চাষ করালুম; সরকারী কৃষি বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের পরামর্শে যত রকমের কর্ষণ বর্ষণ হতে পারে তার কিছুই রাকি রাখিনি; অবশেষে তার থেকে ফসলটা কি হল? সে আমার এলাকার চাষীদের চাপা অট্টহাস্য। আজো সেটা চাপা রয়ে গেছে। তার পরে সরকারী কৃষিপত্রিকা তর্জ্জমা করে যখন ওদের কাছে জাপানী সিম কিম্বা বিদেশী কাপাশের চাষের কথা বল্‌তে গেছি তখন দেখতে পেয়েছি সেই পুরোনো চাপা হাসি আর চাপা থাকে না। দেশে তখন দেশসেবকদের কোনো সাড়াশব্দ ছিল না, বন্দেমাতরং মন্ত্র তখন নীরব। আর সেই যে আমার কলের জাহাজ—দূর হোক্, সে সব কথা তুলে লাভ কি? দেশহিতের যে আগুন এরা জ্বাল্‌লে তাতে আমারি কুশপুত্তলী দগ্ধ হয়ে যদি থামে তবে ত রক্ষা!

* * * *

এ কি খবর! আমাদের চকুয়ার কাছারিতে ডাকাতি হয়ে গেছে! কাল রাত্রে সদরখাজনার সাড়ে সাত হাজার টাকার এক কিস্তি সেখানে জমা হয়েছিল আজ ভোরে নৌকা করে আমাদের সদরে রওনা হবার কথা। পাঠাবার সুবিধা হবে বলে নায়েব ট্রেজরি থেকে টাকা ভাঙিয়ে দশ কুড়ি টাকার নোট করে তাড়াবন্দী করে রেখেছিল। অর্দ্ধেক রাত্রে ডাকাতের দল বন্দুক

পিস্তল নিয়ে মালখানা লুটেছে। কাসেম সর্দ্দার পিস্তলের গুলি খেয়ে জখম হয়েছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ডাকাতরা কেবল ছ হাজার টাকা নিয়ে বাকি দেড় হাজার টাকার নোট ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে ফেলে চলে এসেচে। অনায়াসে সব টাকাই নিয়ে আস্‌তে পারত। যাই হোক্, ডাকাতের পালা শেষ হল এইবার পুলিশের পালা আরম্ভ হবে। টাকা ত গেছেই এখন শান্তিও থাক্‌বে না।

বাড়ি ভিতরে গিয়ে দেখি সেখানে খবর রটে গেছে। মেজ রাণী এসে বল্লেন, ঠাকুরপো, এ কি সর্ব্বনাশ!

আমি উড়িয়ে দেবার জন্য বল্লুম, সর্ব্বনাশের এখনো অনেক বাকী আছে। এখনো কিছুকাল খেয়ে-পরে কাটাতে পারব।

না ভাই, টাট্টা নয়, তোমারই উপর এদের এত রাগ কেন? ঠাকুরপো, তুমি না-হয় ওদের একটু মন রেখেই চল না! দেশ-সুদ্ধ লোককে কি—

দেশসুদ্ধ লোকের খাতিরে দেশকে সুদ্ধ মজাতে পারব না ত।

এই সেদিন শুন্‌লুম নদীর ধারে তোমাকে নিয়ে ওরা এক কাণ্ড করে বসেচে। ছি ছি! আমি ত ভয়ে মরি! ছোটরাণী মেমের কাছে পড়েচে ওর ত ভয় ডর নেই—আমি কেনারাম পুরুতকে ডাকিয়ে শান্তি স্বস্ত্যয়নের বন্দোবস্ত করে দিয়ে তবে বাঁচি। আমার মাথা খাও ঠাকুরপো, তুমি কলকাতায় যাও—এখানে থাক্‌লে ওরা কোন্ দিন কি করে বসে!

মেজরাণীদিদির ভয় ভাবনা আজ আমার প্রাণে সুধাবর্ষণ করলে! অন্নপূর্ণা, তোমাদের হৃদয়ের দ্বারে আমাদের ভিক্ষা কোনোদিন ঘুচবে না।

ঠাকুরপো, তোমার শোবার ঘরের পাশে ঐ যে টাকাটা রেখেচ ওটা ভালো করচ না। কোন্‌দিক থেকে ওরা খবর পাবে আর শেষকালে—আমি টাকার জন্যে ভাবিনে ভাই—কি জানি—

আমি মেজরাণীকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে বল্লুম, আচ্ছা, ও-টাকাটা বের করে এখনি আমাদের খাতাঞ্চিখানায় পাঠিয়ে দিচ্চি। পর্শু দিনই কলকাতার ব্যাঙ্কে জমা করে দিয়ে আসব।

এই বলে শোবার ঘরে ঢুকে দেখি পাশের ঘর বন্ধ। দরজাটা ধাক্কা দিতেই ভিতর থেকে বিমলা বল্লে—আমি কাপড় ছাড়চি।

মেজরাণী বল্লেন—এই সকালবেলাতেই ছোটরাণীর সাজ হচ্চে! অবাক করলে! আজ বুঝি ওদের বন্দেমাতরমের বৈঠক বস্‌বে! ওলো, ও দেবীচৌধুরাণী, লুটের মাল বোঝাই হচ্চে নাকি?

আর-একটু পরে এসে সব ঠিক করা যাবে—এই বলে বাইরে এসে দেখি সেখানে পুলিস্ ইন্‌স্পেক্টর উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করলুম, কিছু সন্ধান পেলেন?

সন্দেহ ত করচি।

কাকে?

ঐ কাসেম সর্দ্দারকে।

সে কি কথা? ঐ ত জখম হয়েচে!

জখম কিছু নয়—পায়ের চামড়া ঘেঁষে একটুখানি রক্ত পড়েচে—সে ওর নিজেরই কীর্ত্তি।

কাসেমকে আমি কোনোমতেই সন্দেহ করতে পারিনে—ও বিশ্বাসী।

বিশ্বাসী, সে কথা মান্‌তে রাজি আছি কিন্তু তাই বলেই যে

চুরি করতে পারে না তা বলা যায় না। এও দেখেচি পঁচিশ বৎসর যে-লোক বিশ্বাস রক্ষা করে এসেচে সেও একদিন হঠাৎ—

তা যদি হয় আমি ওকে জেলে দিতে পারব না।

আপনি দেবেন কেন? যার হাতে দেবার ভার সেই দেবে।

কাসেম ছ হাজার টাকা নিয়ে বাকি টাকাটা ফেলে রাখলে কেন?

ঐ ধোঁকাটা মনে জন্মে দেবার জন্যেই। আপনি যাই বলুন, লোকটা পাকা। ও আপনাদের কাছারীতে পাহারা দেয় এদিকে কাছাকাছি এ অঞ্চলে যত চুরি ডাকাতি হয়েচে নিশ্চয় তার মূলে ও আছে।

লাটিয়ালরা পঁচিশ ত্রিশ মাইল দূরে ডাকাতি সেরে এক রাত্রেই কেমন করে ফিরে এসে মনিবের কাছারিতে হাজরি লেখাতে পারে ইন্‌স্পেক্টর তার অনেক দৃষ্টান্ত দেখালেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কাসেমকে এনেচেন?

তিনি বল্লেন, না, সে থানায় আছে—এখনি ডেপুটিবাবু তদন্ত করতে আস্‌বেন।

আমি বল্লুম, আমি তাকে দেখতে চাই।

কাসেমের সঙ্গে দেখা হবামাত্র সে আমার পা জড়িয়ে ধরে কেঁদে বল্লে, খোদার কসম, মহারাজ, আমি এ কাজ করিনি।

আমি বল্লুম, কাসেম, আমি তোমাকে সন্দেহ করিনে। ভয় নেই তোমার—বিনা দোষে তোমার শাস্তি ঘট্‌তে দেব না।

কাসেম ডাকাতদের ভালো বর্ণনা করতে পারলে না—কেবল খুবই অত্যুক্তি করতে লাগল—চারশো পাঁচশো লোক, এত-বড়-বড়

বন্দুক তলোয়ার ইত্যাদি। বুঝলুম এ সমস্ত বাজে কথা; হয়, ভয়ের দৃষ্টিতে সব বেড়ে উঠেচে, নয় পরাভবের লজ্জা চাপা দেবার জন্যে বাড়িয়ে তুলেচে। ওর ধারণা, হরিশকুণ্ডুর সঙ্গে আমার শত্রুতা, এ তারই কাজ—এমন কি, তাদের এক্রাম্ সর্দ্দারের গলার আওয়াজ স্পষ্ট শুন্‌তে পেয়েচে বলে তার বিশ্বাস।

আমি বল্লুম, দেখ্ কাসেম, আন্দাজের উপর ভর করে খবরদার পরের নাম জড়াস্‌নে। হরিশকুণ্ডু এর মধ্যে আছে কি না সে কথা বানিয়ে তোলবার ভার তোর উপর নেই।

বাড়ি ফিরে এসে মাষ্টার মশায়কে ডেকে পাঠালুম। তিনি মাথা নেড়ে বল্লেন—আর কল্যাণ নেই। ধর্ম্মকে সরিয়ে দিয়ে দেশকে তার জায়গায় বসিয়েছি—এখন দেশের সমস্ত পাপ উদ্ধত হয়ে ফুটে বেরবে, তার আর কোনো লজ্জা থাক্‌বে না।

আপনি কি মনে করেন, একাজ—

আমি জানিনে কিন্তু পাপের হাওয়া উঠেচে। দাও, দাও, তোমার এলেকা থেকে ওদের এখনি বিদায় করে দাও।

আর একদিন সময় দিয়েচি—পশু এরা সব যাবে।

দেখ, আমি একটি কথা বলি, বিমলাকে তুমি কলকাতায় নিয়ে যাও। এখান থেকে তিনি বাইরেটাকে সঙ্কীর্ণ করে দেখচেন, সব মানুষের, সব জিনিষের, ঠিক পরিমাণ বুঝতে পারচেন না। ওঁকে তুমি একবার পৃথিবীটা দেখিয়ে দাও—মানুষকে, মানুষের কর্ম্মক্ষেত্রকে, উনি একবার বড় জায়গা থেকে দেখে নিন্।

আমিও ঐ কথাই ভাবছিলুম।

কিন্তু আর দেরি কোরো না। দেখ নিখিল, মানুষের ইতিহাস

পৃথিবীর সমস্ত দেশকে সমস্ত জাতকে নিয়ে তৈরি হয়ে উঠচে, এই জন্যে পালিটিক্সেও ধর্ম্মকে বিকিয়ে দেশকে বাড়িয়ে তোলা চল্‌বে না। আমি জানি য়ুরোপ একথা মনের সঙ্গে মানে না কিন্তু তাই বলেই যে য়ুরোপই আমাদের গুরু এ আমি মান্‌ব না। সত্যের জন্যে মানুষ মরে অমর হয়, কোনো জাতিও যদি মরে, তাহলে মানুষের ইতিহাসে সেও অমর হবে। সেই সত্যের অনুভূতি জগতের মধ্যে এই ভারতবর্ষেই খাঁটি হয়ে উঠুক্ সয়তানের অভ্রভেদী অট্টহাসির মাঝখানে! কিন্তু বিদেশ থেকে এ কি পাপের মহামারী এসে আমাদের দেশে প্রবেশ করলে?

সমস্ত দিন এই সব নানা হাঙ্গামে কেটে গেল। শ্রান্ত হয়ে রাত্রে শুতে গেলুম। সেই টাকাটা আজ বের না করে কাল সকালে বের করে নেব স্থির করেচি।

রাত্রে কখন্ এক সময়ে ঘুম ভেঙে গেল। ঘর অন্ধকার। একটা কিসের শব্দ যেন শুন্‌তে পাচ্চি। বুঝি কেউ কাঁদচে।

থেকে থেকে বাদ্‌লা রাতের দম্‌কা হাওয়ার মত চোখের জলে ভরা এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস শুন্‌তে পাচ্চি। আমার মনে হল, আমার এই ঘরটার বুকের ভিতরকার কান্না!

আমার ঘরে আর-কেউ নেই। বিমলা কিছুদিন থেকে কোনো একটা পাশের ঘরে শোয়। আমি বিছানা থেকে উঠে পড়লুম। বাইরের বারান্দায় গিয়ে দেখি বিমলা মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে রয়েচে।

এসব কথা লিখতে পারা যায় না। এ যে কী, তা কেবল

তিনিই জানেন যিনি বিশ্বের মর্ম্মের মধ্যে বসে জগতের সমস্ত বেদনাকে গ্রহণ করচেন। আকাশ মূক, তারাগুলি নীরব, রাত্রি নিস্তব্ধ—তারি মাঝখানে ঐ একটি নিদ্রাহীন কান্না!

আমরা এই সব সুখদুঃখকে সংসারের সঙ্গে শাস্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে ভালোমন্দ একটা কিছু নাম দিয়ে চুকিয়ে ফেলে দিই! কিন্তু অন্ধকারের বক্ষ ভাসিয়ে দিয়ে এই যে ব্যথার উৎস উঠচে এর কি কোনো নাম আছে! সেই নিশীথরাত্রে সেই লক্ষকোটি তারার নিঃশব্দতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি যখন ওর দিকে চেয়ে দেখলুম তখন আমার মন সভয়ে বলে উঠল, আমি এ'কে বিচার করবার কে। হে প্রাণ, হে মৃত্যু, হে অসীম বিশ্ব, হে অসীম বিশ্বের ঈশ্বর, তোমাদের মধ্যে যে রহস্য রয়েছে আমি জোড়হাতে তাকে প্রণাম করি।

একবার ভাবলুম, ফিরে যাই। কিন্তু পারলুম না। নিঃশব্দে বিমলার শিয়রের কাছে বসে তার মাথার উপর হাত রাখলুম। প্রথমটা তার সমস্ত শরীর কাঠের মত শক্ত হয়ে উঠল—তার পরেই সেই কঠিনতা যেন ফেটে ভেঙে কান্না সহস্রধারায় বেয়ে যেতে লাগল। মানুষের হৃদয়ের মধ্যে এত কান্না যে কোথায় ধরতে পারে সে ত ভেবে পাওয়া যায় না।

আমি আস্তে আস্তে বিমলার মাথায় হাত বুলোতে লাগলুম। তার পরে কখন্ একসময়ে হাৎড়ে হাৎড়ে সে আমার পা দুটো টেনে নিলে—বুকের উপরে এমনি করে চেপে ধরলে যে, আমার মনে হল সেই আঘাতে তার বুক ফেটে যাবে।

বিমলার আত্মকথা

আজ সকালে অমূল্যর কলকাতা থেকে ফেরবার কথা। বেহারাকে বলে রেখেচি সে এলেই যেন খবর দেয়। কিন্তু স্থির থাকতে পারচি নে। বাইরে বৈঠকখানায় গিয়ে বসে রইলুম।

অমূল্যকে যখন আমার গয়না বেচবার জন্যে কলকাতায় পাঠালুম তখন নিজের কথা ছাড়া আর কোনো কথা বুঝি মনেই ছিল না। এ-কথা একবারো আমার বুদ্ধিতে এলই না যে, সে ছেলেমানুষ, অত টাকার গয়না কোথাও বেচতে গেলে সবাই তাকে সন্দেহ করবে। মেয়েমানুষ, আমরা এত অসহায় যে, আমাদের নিজের বিপদ অন্যের ঘাড়ে না চাপিয়ে আমাদের যেন উপায় নেই। আমরা মরবার সময় পাঁচজনকে ডুবিয়ে মারি।

বড় অহঙ্কার করে বলেছিলুম, অমূল্যকে বাঁচাব। যে নিজে তলিয়ে যাচ্চে সে না কি অন্যকে বাঁচাতে পারে! হায়, হায়, আমিই বুঝি ওকে মারলুম! ভাই আমার, আমি তোর এম্নি দিদি, যেদিন মনে মনে তোর কপালে ভাইফোঁটা দিলুম সেইদিনই বুঝি যম মনে মনে হাস্‌লে। আমি যে অকল্যাণের বোঝাই নিয়ে ফিরচি আজ!

আমার আজ মনে হচ্চে মানুষকে এক-এক সময়ে যেন অমঙ্গলের প্লেগে ধরে, হঠাৎ কোথা হতে তার বীজ এসে পড়ে, আর, একরাত্রেই মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। সেই সময়ে সকল সংসার থেকে খুব দূরে কোথাও তাকে সরিয়ে রাখা যায় না কি? স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি তার ছোঁয়াচ যে বড় ভয়ানক! সে যে বিপদের মশালের মত, নিজে পুড়তে থাকে সংসারে আগুন লাগাবার জন্যেই।

নটা বাজ্‌ল। আমার কেমন বোধ হচ্চে, অমূল্য বিপদে পড়েছে, ওকে পুলিসে ধরেছে। আমার গয়নার বাক্স নিয়ে থানায় গোলমাল পড়ে গেছে—কার বাক্স, ও কোথা থেকে পেলে, তার জবাব ত শেষকালে আমাকেই দিতে হবে, সমস্ত পৃথিবীর লোকের সাম্‌নে! কি জবাবটা দেব? মেজরাণী, এতকাল তোমাকে বড় অবজ্ঞাই করেচি! আজ তোমার দিন এল! তুমি আজ সমস্ত পৃথিবীর রূপ ধরে শোধ তুল্‌বে। হে ভগবান, এইবার আমাকে বাঁচাও—আমার সমস্ত অহঙ্কার ভাসিয়ে দিয়ে মেজরাণীর পায়ের তলায় পড়ে থাক্‌ব!

আর থাক্‌তে পারলুম না—তখনি বাড়ি ভিতরে মেজরাণীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। তিনি তখন বারান্দায় রোদ্দুরে বসে পান সাজচেন, পাশে থাকো বসে। থাকোকে দেখে মুহূর্ত্তের জন্যে মনটা সঙ্কুচিত হল—তখনি সেটা কাটিয়ে নিয়ে মেজরাণীর পায়ের কাছে পড়ে তাঁর পায়ের ধূলো নিলুম। তিনি বলে উঠ্‌লেন,—ও কি লো ছোটরাণী, তোর হল কি? হঠাৎ এত ভক্তি কেন?

আমি বল্লুম, দিদি, আজ আমার জন্মতিথি। অনেক অপরাধ করেচি, কর দিদি, আশীর্ব্বাদ কর, আর যেন কোনোদিন তোমাদের কোনো দুঃখ না দিই! আমার ভারি ছোট মন!

বলেই তাঁকে আবার প্রণাম করে তাড়াতাড়ি উঠে এলুম। তিনি পিছন থেকে বল্‌তে লাগলেন, বলি, ও ছুটু, তোর জন্মতিথি, একথা আগে বলিস্‌নি কেন? আমার এখানে দুপুরবেলা তোর নিমন্ত্রণ রইল। লক্ষ্মী বোন, ভুলিস্‌নে!

ভগবান, এমন কিছু কর যাতে আজ আমার জন্মতিথি হয়।

একেবারে নতুন হতে পারিনে কি? সব ধুয়ে-মুছে আর-একবার গোড়া থেকে পরীক্ষা কর, প্রভু!

বাইরে বৈঠকখানা ঘরে যখন ঢুক্‌তে যাচ্চি এমন সময় সেখানে সন্দীপ এসে উপস্থিত হল। বিতৃষ্ণায় সমস্ত মনটা যেন বিষিয়ে উঠল। আজ সকালের আলোয় তার যে-মুখ দেখ্‌লুম তাতে প্রতিভার জাদু একটুও ছিল না। আমি বলে উঠলুম,—আপনি যান এখান থেকে!

সন্দীপ হেসে বল্লে, অমূল্য ত নেই, এবারে বিশেষ কথার পালা যে আমার।

পোড়া কপাল! যে-অধিকার আমিই দিয়েচি সে-অধিকার আজ ঠেকাই কি করে? বল্লুম, আমার একলা থাকবার দরকার আছে।

রাণী, আর-একজন লোক ঘরে থাক্‌লেও একলা থাকার ব্যাঘাত হয় না। আমাকে তুমি মনে কোরো না, ভিড়ের লোক,—আমি সন্দীপ, লক্ষ লোকের মাঝেও আমি একলা।

আপনি আর-এক সময়ে আস্‌বেন, আজ সকালে আমি—

অমূল্যর জন্যে অপেক্ষা করচেন?

আমি বিরক্ত হয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবার উদ্যোগ করচি এমন সময় সন্দীপ তার শালের ভিতর থেকে আমার গয়নার বাক্স বের করে ঠক্ করে পাথরের টেবিলের উপর রাখলে।

আমি চম্‌কে উঠলুম, বল্লুম, তাহলে অমূল্য যায় নি?

কোথায় যায় নি?

কলকাতায়?

সন্দীপ একটু হেসে বল্লে, না।

বাঁচলুম! আমার ভাইফোঁটা বাঁচল! আমি চোর, বিধাতার দণ্ড ঐ পর্য্যন্তই পৌঁছক্—অমূল্য রক্ষা পাক্!

সন্দীপ আমার মুখের ভাব দেখে বিদ্রূপ করে বল্লে, এত খুসী, রাণী? গয়নার বাক্সর এত দাম? তবে কোন্ প্রাণে এই গয়না দেবীর পূজায় দিতে চেয়েছিলে? দিয়ে ত ফেলেচ, দেবতার হাত থেকে আবার কি ফিরিয়ে নিতে চাও?

অহঙ্কার মরতে মরতেও. ছাড়ে না—ইচ্ছে হল দেখিয়ে দিই এ-গয়নার পরে আমার শিকি পয়সার মমতা নেই। আমি বল্লুম, এ-গয়নায় আপনার যদি লোভ থাকে নিয়ে যান না।

সন্দীপ বল্লে, আজ বাংলা দেশে যেখানে যত ধন আছে সমস্তর পরেই আমার লোভ। লোভের মত এত বড় মহৎ বৃত্তি কি আর-কিছু আছে? পৃথিবীর যারা ইন্দ্র লোভ তাদের ঐরাবত। তাহলে এ সমস্ত গয়না আমার?

এই বলে, সন্দীপ বাক্সটি তুলে নিয়ে শালের মধ্যে ঢাকা দিতেই অমূল্য ঘরের মধ্যে ঢুক্‌ল। তার চোখের গোড়ায় কালী পড়েচে, মুখ শুক্‌নো, উস্কখুস্ক চুল—একদিনেই তার তরুণ বয়সের লাবণ্য যেন ঝরে গিয়েচে। তাকে দেখবামাত্রই আমার বুকের ভিতরটায় কাম্‌ড়ে উঠল।

অমূল্য আমার দিকে না তাকিয়েই একেবারে সন্দীপকে গিয়ে বল্লে, আপনি গয়নার বাক্স আমার তোরঙ্গ থেকে বের করে এনেচেন?

গয়নার বাক্স তোমারি না কি?

না, কিন্তু তোরঙ্গ আমার।

সন্দীপ হা হা করে হেসে উঠল। বল্লে, তোরঙ্গ সম্বন্ধে আমি-তুমির ভেদ-বিচার ত তোমার বড় সূক্ষ্ম হে, অমূল্য! তুমিও মরবার আগে ধর্ম্মপ্রচারক হয়ে মরবে দেখচি।

অমূল্য চৌকির উপর বসে পড়ে দুই হাতে মুখ ঢেকে টেবিলের উপর মাথা রাখলে। আমি তার কাছে এসে তার মাথায় হাত রেখে বল্লুম, অমূল্য, কি হয়েচে?

তখনি সে দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে, দিদি, এ গয়নার বাক্স আমিই নিজের হাতে তোমাকে এনে দেব এই আমার সাধ ছিল—সন্দীপ বাবু তা জান্‌তেন—তাই উনি তাড়াতাড়ি—

আমি বল্লুম, কি হবে আমার ঐ গয়নার বাক্স নিয়ে—ও যাক্ না, তাতে ক্ষতি কি?

অমূল্য বিস্মিত হয়ে বল্লে, যাবে কোথায়?

সন্দীপ বল্লে, এ গয়না আমার—এ আমার রাণীর দেওয়া অর্ঘ্য।

অমূল্য পাগলের মত বলে উঠল, না, না, না,—কখনই না! দিদি, এ আমি তোমাকে ফিরিয়ে এনে দিয়েচি, এ তুমি আর কাউকে দিতে পারবে না!

আমি বল্লুম, ভাই তোমার দান চিরদিন আমার মনে রইল, কিন্তু গয়নায় যার লোভ সে নিয়ে যাক্ না!

অমূল্য তখন হিংস্র জন্তুর মত সন্দীপের দিকে তাকিয়ে গুম্‌রে গুম্‌রে বল্লে, দেখুন, সন্দীপবাবু, আপনি জানেন, আমি ফাঁসিকে ভয় করিনে। এ গয়নার বাক্স যদি আপনি নেন—

সন্দীপ বিদ্রূপের হাসি হাসবার চেষ্টা করে বল্লে, অমূল্য, তোমারও এতদিনে জানা উচিত তোমার শাসনকে আমি ভয়

করিনে। মক্ষিরাণী, এ গয়না আজ আমি নেব বলে আসি নি —তোমাকে দেব বলেই এসেছিলুম। কিন্তু আমার জিনিষ তুমি যে অমূল্যর হাত থেকে নেবে সেই অন্যায় নিবারণ করবার জন্যেই প্রথমে এ বাক্সে আমার দাবি স্পষ্ট করে তোমাকে দিয়ে বলিয়ে নিলুম। এখন আমার এই জিনিষ তোমাকে আমি দান করচি,—এই রইল! এবারে ঐ বালকের সঙ্গে তুমি বোঝাপড়া কর, আমি চল্লুম। কিছুদিন থেকে তোমাদের দুজনের মধ্যে বিশেষ কথা চল্‌চে, আমি তার মধ্যে নেই, যদি কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটে ওঠে আমাকে দোষ দিতে পারবে না। অমূল্য তোমার তোরঙ্গ, বই প্রভৃতি যা-কিছু আমার ঘরে ছিল সমস্তই বাজারে তোমার বাসা ঘরে পাঠিয়ে দিয়েচি। আমার ঘরে তোমার কোনো জিনিষ রাখা চল্‌বে না।

এই বলে সন্দীপ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে চলে গেল।

আমি বল্লুম, অমূল্য, তোমাকে আমার গয়না বিক্রি করতে দিয়ে অবধি মনে আমার শান্তি ছিল না।

কেন দিদি?

আমার ভয় হচ্ছিল এ গয়নার বাক্স নিয়ে পাছে তুমি বিপদে পড়—পাছে তোমাকে কেউ চোর বলে সন্দেহ করে' ধরে। আমার সে ছ হাজার টাকায় কাজ নেই। এখন আমার একটি কথা তোমাকে শুন্‌তে হবে—এখনি তুমি বাড়ি যাও - যাও তোমার মায়ের কাছে।

অমূল্য চাদরের ভিতর থেকে একটা পুঁটুলি বের করে বল্লে, দিদি, ছ হাজার টাকা এনেচি

জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় পেলে?

তার কোনো উত্তর না দিয়ে বল্লে, গিনির জন্যে অনেক চেষ্টা করলুম সে হল না, তাই নোট এনেচি।

অমূল্য, মাথা খাও সত্যি করে বল, এ-টাকা কোথায় পেলে?

সে আপনাকে বলব না।

আমি চোখে যেন অন্ধকার দেখতে লাগলুম। বল্লুম—কি কাণ্ড করেচ অমূল্য? এ টাকা কি—

অমূল্য বলে উঠল, আমি জানি তুমি বল্‌বে এ টাকা আমি অন্যায় করে এনেচি—আচ্ছা তাই স্বীকার। কিন্তু যত বড় অন্যায় তত বড়ই দাম, সে দাম আমি দিয়েচি। এখন এ-টাকা আমার।

এ টাকার সমস্ত বিবরণ আমার আর শুন্‌তে ইচ্ছে হল না। শিরগুলো সঙ্কুচিত হয়ে আমার সমস্ত শরীরকে যেন গুটিয়ে আন্‌তে লাগ্‌ল। আমি বল্লুম, নিয়ে যাও অমূল্য, এ-টাকা যেখান থেকে নিয়ে এসেচ এখনি সেখানে দিয়ে এস।

সে যে বড় শক্ত কথা।

না, শক্ত নয় ভাই। কি কুক্ষণে তুমি আমার কাছে এসেছিলে! সন্দীপও তোমার যত বড় অনিষ্ট করতে পারেনি আমি তাই করলুম!

সন্দীপের নামটা যেন তাকে খোঁচা মারলে। সে বল্লে, সন্দীপ! তোমার কাছে এলুম বলেই ত ওকে চিন্‌তে পেরেচি। জান, দিদি, তোমার কাছ থেকে সেদিন ও যে-ছহাজার টাকার গিনি নিয়ে গেছে তার থেকে এক পয়সাও খরচ করেনি। এখান থেকে গিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে রুমাল থেকে

সমস্ত গিনি মেজের উপর ঢেলে রাশ করে তুলে মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল। বল্লে, এ টাকা নয়, এ ঐশ্বর্য্য-পারিজাতের পাপ্‌ড়ি,—এ অলকাপুরীর বাঁশি থেকে সুরের মত ঝরে পড়তে পড়তে শক্ত হয়ে উঠেছে, এ'কে ত ব্যাঙ্কনোটে ভাঙানো চলে না, এ যে সুন্দরীর কণ্ঠহার হয়ে থাকবার কামনা করচে—ওরে অমূল্য, তোরা এ'কে স্থূলদৃষ্টিতে দেখিস্‌নে, এ হচ্চে লক্ষ্মীর হাসি, ইন্দ্রাণীর লাবণ্য—না, না, ঐ অরসিক নায়েবটার হাতে পড়বার জন্যে এর সৃষ্টি হয়নি। দেখ অমূল্য, নায়েবটা নিছক মিথ্যা কথা বলেচে, পুলিশ সেই নৌকোচুরির কোনো খবর পায়নি—ও এই সুযোগে কিছু করে নিতে চায়। দেখ অমূল্য, নায়েবের কাছ থেকে সেই চিঠি-তিনটে আদায় করতে হবে।—আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কেমন করে?—সন্দীপ বল্লে, জোর করে, ভয় দেখিয়ে!—আমি বল্লুম, রাজি আছি, কিন্তু এই গিনিগুলি ফিরিয়ে দিতে হবে।—সন্দীপ বল্লে, আচ্ছা সে হবে।—কেমন করে ভয় দেখিয়ে নায়েবের কাছ থেকে সেই চিঠিগুলি আদায় করে পুড়িয়ে ফেলেচি সে অনেক কথা।—সেই রাত্রেই আমি সন্দীপের কাছে এসে বলেচি, আর ভয় নেই, গিনিগুলি আমাকে দিন, কাল সকালেই আমি দিদিকে ফিরিয়ে দেব।—সন্দীপ বল্লে, এ কোন্ মোহ তোমাকে পেয়ে বস্‌ল! এবার দিদির আঁচলে দেশ ঢাকা পড়ল বুঝি! বল বন্দেমাতরং—ঘোর্ কেটে যাক্!—তুমি ত জান, দিদি, সন্দীপ কি মন্ত্র জানে! গিনি তারই কাছে রইল। আমি অন্ধকার রাত্রে পুকুরের ঘাটের চাতালের উপরে বসে বন্দে মাতরং জপতে লাগলুম। কাল যখন তুমি গয়না বেচতে দিলে

তখন সন্ধ্যার সময় আবার ওর কাছে গেলুম। বেশ বুঝলুম, তখন ও আমার উপরে রাগে জ্বলচে। সে রাগ প্রকাশ করলে না; বল্লে, দেখ, যদি আমার কোনো বাক্সয় সে গিনি থাকে ত নিয়ে যাও। বলে' আমার গায়ের উপর চাবির গোছাটা ফেলে দিলে। কোথা^ নেই। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কোথায় রেখেচেন বলুন। —সন্দীপ বল্লে, আগে তোমার মোহ ভাঙবে তারপরে আমি বল্‌ব। এখন নয়।—আমি দেখলুম কিছুতেই তাকে নড়াতে পারব না, তখন আমাকে অন্য উপায় নিতে হয়েছিল। এর পরেও ওকে এই ছ হাজার টাকা নোট দেখিয়ে সেই গিনি-ক'টা নেবার অনেক চেষ্টা করেচি। গিনি এনে দিচ্চি বলে আমাকে ভুলিয়ে রেখে ওর শোবার ঘর থেকে আমার তোরঙ্গ ভেঙে গয়নার বাক্স নিয়ে তোমার কাছে এসেচে—এ বাক্স তোমার কাছে আমাকে নিয়ে আস্‌তে দিলে না! আবার বলে কিনা এ গয়না ওরি দান! আমাকে যে কতখানি বঞ্চিত করেচে সে আমি কাকে বল্‌ব? এ আমি কখনো মাপ করতে পারবনা।—দিদি ওর মন্ত্র একেবারে ছুটে গেছে। তুমিই ছুটিয়ে দিয়েচ।

আমি বল্লুম, ভাই আমার, আমার জীবন সার্থক হয়েচে। কিন্তু, অমূল্য, এখনো বাকি আছে। শুধু মায়া কাটালে হবে না, যে কালী মেখেছি সে ধুয়ে ফেল্‌তে হবে। দেরি কোরো না, অমূল্য, এখনি যাও, এ টাকা যেখান থেকে এনেচ সেইখানেই রেখে এস। পারবে না, লক্ষ্মী ভাই?

তোমার আশীর্ব্বাদে পারব দিদি।

এ শুধু তোমার একলার পারা নয়। এর মধ্যে যে আমারও

পারা আছে। আমি মেয়েমানুষ বাইরের রাস্তা আমার বন্ধ, নইলে তোমাকে আমি যেতে দিতুম না, আমিই যেতুম। আমার পক্ষে এইটেই সব চেয়ে কঠিন শাস্তি, যে, আমার পাপ তোমাকে সাম্‌লাতে হচ্চে।

ও-কথা বোলোনা দিদি! যে-রাস্তায় চলেছিলুম সে তোমার রাস্তা নয়। সে-রাস্তা দুর্গম বলেই আমার মনকে টেনেছিল। দিদি, এবার তোমার রাস্তায় ডেকেচ—এ রাস্তা আমার আরও হাজার গুণে দুর্গম হোক্, কিন্তু তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে জিতে আস্‌বো—কোনো ভয় নেই! তাহলে এ টাকা যেখান থেকে এনেচি সেইখানেই ফিরিয়ে দিতে হবে এই তোমার হুকুম?

আমার হুকুম নয় ভাই, উপরের হুকুম।

সে আমি জানিনে। সেই উপরের হুকুম তোমার মুখ দিয়ে এসেচে এই আমার যথেষ্ট। কিন্তু দিদি তোমার কাছে আমার নিমন্তন্ন আছে। সেইটে আজ আদায় করে তবে যাব। প্রসাদ দিতে হবে। তার পরে সন্ধ্যের মধ্যেই যদি পারি কাজ সেরে আসব।

হাস্‌তে গিয়ে চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে পড়ল—বল্লুম, আচ্ছা!

অমূল্য চলে যেতেই আমার বুক দমে গেল। কোন্ মায়ের বাছাকে বিপদে ভাসালুম! ভগবান, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত এমন সর্ব্বনেশে ঘটা করে' কেন? এত লোককে নিমন্ত্রণ? আমার একলায় কুলল না? এত মানুষকে দিয়ে তার ভার বহন করাবে? আহা ঐ ছেলেমানুষকে কেন মারবে?

তাকে ফিরে ডাকলুম, অমূল্য!—আমার গলা এমন ক্ষীণ হয়ে

বাজল, সে শুনতে পেলে না। দরজার কাছে গিয়ে আবার ডাকলুম, অমূল্য! তখন সে চলে গেছে।

বেহারা, বেহারা!

কি রাণী মা!

অমূল্যবাবুকে ডেকে দে!

কি জানি, বেহারা অমূল্যর নাম বোধ হয় জানে না, তাই সে একটু পরেই সন্দীপকে ডেকে নিয়ে এল। ঘরে ঢুকেই সন্দীপ বল্লে, যখন তাড়িয়ে দিলে তখনি জানতুম ফিরে ডাকবে। যে-চাঁদের টানে ভাঁটা সেই-চাঁদের টানেই জোয়ার। এমনি নিশ্চয় জানতুম তুমি ডাকবে যে, আমি দরজার কাছে অপেক্ষা করে বসেছিলুম। যেমনি তোমার বেহারাকে দেখেচি অমনি সে কিছু বলবার পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি যাচ্চি, এখনি যাচ্চি!—ভোজপুরীটা আশ্চর্য্য হয়ে হাঁ করে রইল। ভাবলে লোকটা মন্ত্রসিদ্ধ। মক্ষিরাণী, সংসারে সব চেয়ে বড় লড়াই এই মন্ত্রের লড়াই। সম্মোহনে সম্মোহনে কাটাকাটি। এর বাণ শব্দ-ভেদী বাণ—আবার নিঃশব্দভেদী বাণও আছে! এতদিন পরে এ লড়াইয়েই সন্দীপের সমকক্ষ মিলেচে। তোমার তূণে অনেক বাণ আছে, রণরঙ্গিণী! পৃথিবীর মধ্যে দেখলুম, কেবল তুমিই সন্দীপকে আপন ইচ্ছামতে ফেরাতে পারলে, আবার আপন ইচ্ছামতে টেনে আনলে। শিকার ত এসে পড়ল। এখন এ'কে নিয়ে কি করবে বল? একেবারে নিঃশেষে মারবে, না, তোমার খাঁচায় পূরে রাখবে? কিন্তু আগে থাকতে বলে রাখচি, রাণী, এই জীবটিকে বধ করাও যেমন শক্ত, বন্ধ করাও তেমনি!

অতএব দিব্য অস্ত্র তোমার হাতে যা আছে তার পরীক্ষা করতে বিলম্ব কোরোনা।

সন্দীপের মনের ভিতরে একটা পরাভবের সংশয় এসেচে বলেই সে আজ এমন অনর্গল বকে গেল। আমার বিশ্বাস, ও জানত আমি অমূল্যকেই ডেকেচি—বেহারা খুব সম্ভব তারই নাম বলেছিল ও তাকে ফাঁকি দিয়ে নিজে এসে উপস্থিত হয়েচে। আমাকে বল্‌তে দেবার সময় দিলে না যে, ওকে ডাকিনি, অমূল্যকে ডেকেচি। কিন্তু আস্ফালন মিথ্যে—এবার দুর্ব্বলকে দেখতে পেয়েচি। এখন আমার জয়লব্ধ জায়গাটির সূচ্যগ্রভূমিও ছাড়তে পারব না।

আমি বল্লুম, সন্দীপবাবু, আপনি গল্‌গল্‌ করে এত কথা বলেন কেমন করে? আগে থাক্‌তে বুঝি তৈরি হয়ে আসেন?

একমুহূর্ত্তে সন্দীপের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। আমি বল্লুম, শুনেচি কথকদের খাতায় নানারকমের লম্বালম্বা বর্ণনা লেখা থাকে, যখন যেটা যেখানে দরকার খাটিয়ে দেয়। আপনার সে-রকম খাতা আছে নাকি?

সন্দীপ চিবিয়ে চিবিয়ে বল্‌তে লাগল, বিধাতার প্রসাদে তোমাদের ত হাবভাব ছলাকলার অন্ত নেই, তার উপরেও দরজির দোকান স্যাকরার দোকান তোমাদের সহায়, আর বিধাতা কি আমাদেরই এমনি নিরস্ত্র করে রেখেচেন যে—

আমি বল্লুম, সন্দীপবাবু, খাতা দেখে আসুন—এ-কথাগুলো ঠিক হচ্চে না। দেখচি এক-একবার আপনি উল্টোপাল্টা বলে বসেন—খাতা-মুখস্থর ঐ একটা মস্ত দোষ!

সন্দীপ আর থাক্‌তে পারলে না—একেবারে গর্জ্জে উঠল,

তুমি! তুমি আমাকে অপমান করবে! তোমার কী না আমার কাছে ধরা পড়েচে, বল ত? তোমার যে—

ওর মুখ দিয়ে আর কথা বেরল না। সন্দীপ যে মন্ত্রব্যবসায়ী, মন্ত্র যে-মুহূর্ত্তে খাটে না সে-মুহূর্ত্তেই ওর আর জোর নেই—রাজা থেকে একেবারে রাখাল হয়ে যায়! দুর্ব্বল! দুর্ব্বল! ও যতই রূঢ় হয়ে উঠে কর্কশ কথা বলতে লাগল ততই আনন্দে আমার বুক ভরে উঠল। আমাকে বাঁধবার নাগপাশ ওর ফুরিয়ে গেছে—আমি মুক্তি পেয়েচি। বাঁচা গেছে, বাঁচা গেছে। অপমান কর, আমাকে অপমান কর, এইটেই তোমার সত্য, আমাকে স্তব কোরো না, সেইটেই মিথ্যা।

এমন সময় আমার স্বামী ঘরের মধ্যে এলেন। অন্য দিন সন্দীপ মুহূর্ত্তেই আপনাকে যেরকম সাম্‌লে নেয় আজ তার সে-শক্তি ছিল না। আমার স্বামী তার মুখের দিকে চেয়ে একটু আশ্চর্য্য হলেন। আগে হলে আমি এ'তে লজ্জা পেতুম। কিন্তু স্বামী যাই মনে করুন না আমি আজ খুসি হলুম। আমি ঐ দুর্ব্বলকে দেখে নিতে চাই।

আমরা দুজনেই স্তব্ধ হয়ে রইলুম দেখে আমার স্বামী একটু ইতস্তত করে চৌকিতে বস্‌লেন। বল্লেন, সন্দীপ, আমি তোমাকেই খুঁজছিলুম, শুনলুম এই ঘরেই আছ।

সন্দীপ কথাটার উপর একটু বিশেষ ঝোঁক দিয়ে বল্লে, হাঁ, মক্ষিরাণী সকালেই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। আমি যে মৌচাকের দাসমক্ষিকা, কাজেই হুকুম শুনেই সব কাজ ফেলে চলে আস্‌তে হল!

স্বামী বল্লেন, কাল কলকাতায় যাচ্চি, তোমাকে যেতে হবে।

সন্দীপ বল্লে, কেন বল দেখি? আমি কি তোমার অনুচর না কি?

আচ্ছা, তুমিই কলকাতায় চল, আমিই তোমার অনুচর হব।

কলকাতায় আমার কাজ নেই।

সেই জন্যেই ত কলকাতায় যাওয়া তোমার দরকার। এখানে তোমার বড্ড বেশি কাজ।

আমি ত নড়চি নে।

তাহলে তোমাকে নাড়াতে হবে।

জোর?

হাঁ জোর।

আচ্ছা বেশ—নড়ব। কিন্তু জগৎটা ত কলকাতা আর তোমার এলাকা এই দুই ভাগে বিভক্ত নয়। ম্যাপে আরও জায়গা আছে।

তোমার গতিক দেখে মনে হয়েছিল জগতে আমার এলেকা ছাড়া আর-কোনো জায়গাই নেই।

সন্দীপ তখন দাঁড়িয়ে উঠে বল্লে,—মানুষের এমন অবস্থা আসে যখন সমস্ত জগৎ এতটুকু জায়গায় এসে ঠেকে। তোমার এই বৈঠকখানাটির মধ্যে আমার বিশ্বকে আমি প্রত্যক্ষ করে দেখেচি—সেই জন্যেই এখান থেকে নড়িনে। মক্ষিরাণী, আমার কথা এরা কেউ বুঝতে পারবে না—হয়ত তুমিও বুঝবে না। আমি তোমাকে বন্দনা করি। আমি তোমারই বন্দনা করতে চল্লুম। তোমাকে দেখার পর থেকে আমার মন্ত্র বদল হয়ে গেছে। বন্দে মাতরং নয়—বন্দে প্রিয়াং, বন্দে মোহিনীং। মা আমাদের

রক্ষা করেন—প্রিয়া আমাদের বিনাশ করেন—বড় সুন্দর সেই বিনাশ। সেই মরণ-নৃত্যের নূপুর-ঝঙ্কার বাজিয়ে তুলেচ আমার হৃৎপিণ্ড! এই কোমলা সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা বাংলা দেশের রূপ তুমি তোমার এই ভক্তের চক্ষে এক মুহূর্ত্তে বদলে দিয়েচ—দয়ামায়া তোমার নেই গো—এসেচ মোহিনী, তুমি তোমার বিষ পাত্র নিয়ে—সেই বিষ পান করে সেই বিষে জর্জ্জর হয়ে, হয় মরব, নয় মৃত্যুঞ্জয় হব! মাতার দিন আজ নেই—প্রিয়া, প্রিয়া, প্রিয়া, দেবতা স্বর্গ ধর্ম্ম সত্য সব তুমি তুচ্ছ করে দিয়েচ, পৃথিবীর আর-সমস্ত সম্বন্ধ আজ ছায়া, নিয়ম-সংযমের সমস্ত বন্ধন আজ ছিন্ন! প্রিয়া, প্রিয়া, প্রিয়া, তুমি যে-দেশে দুটি পা দিয়ে দাঁড়িয়েছ তার বাইরের সমস্ত পৃথিবীতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে তারই ছাইয়ের উপর আনন্দে তাণ্ডব নৃত্য করতে পারি! এরা ভালোমানুষ, এরা অত্যন্ত ভালো—এরা সবার ভালো করতে চায়—যেন সবই সত্য। কখনই না, এমন সত্য বিশ্বে আর কোথাও নেই, এই আমার একমাত্র সত্য। বন্দনা করি তোমাকে—তোমার প্রতি নিষ্ঠা আমাকে নিষ্ঠুর করেচে, তোমার পরে ভক্তি আমার মধ্যে প্রলয়ের আগুন জ্বালিয়েচে,—আমি ভালো নই, আমি ধার্ম্মিক নই, আমি পৃথিবীতে কিছুই মানিনে, আমি যাকে সকলের চেয়ে প্রত্যক্ষ করতে পেরেচি কেবলমাত্র তাকেই মানি!

আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! এই কিছু-আগেই আমি এ’কে সমস্ত মন দিয়ে ঘৃণা করেছিলুম! যাকে ছাই বলে দেখেছিলুম তার মধ্যে থেকে আগুন জ্বলে উঠেচে। এ একেবারে খাঁটি আগুন

তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বিধাতা এমন করে মিশিয়ে কেন মানুষকে তৈরি করেন ? সে কি কেবল তাঁর অলৌকিক ইন্দ্রজাল দেখাবার জন্যে ? আধ ঘণ্টা আগেই আমি মনে মনে ভাবছিলুম এই মানুষটাকে একদিন রাজা বলে ভ্রম হয়েছিল বটে কিন্তু এ যাত্রার দলের রাজা,—তা নয় তা নয়—যাত্রার দলের পোষাকের মধ্যেও এক-এক সময় রাজা লুকিয়ে থেকে যায়। এর মধ্যে অনেক লোভ, অনেক স্থূল, অনেক ফাঁকি আছে, স্তরে স্তরে মাংসের মধ্যে এ ঢাকা, কিন্তু তবুও—আমরা জানিনে, আমরা শেষ কথাটাকে জানিনে, এইটেই স্বীকার করা ভালো, আপনাকেও জানিনে। মানুষ বড় আশ্চর্য্য—তাকে নিয়ে কি প্রচণ্ড রহস্যই তৈরি হচ্চে তা সেই রুদ্র দেবতাই জানেন—মাঝের থেকে দগ্ধ হয়ে গেলুম ! প্রলয় ! প্রলয়ের দেবতাই শিব, তিনিই আনন্দময়, তিনি বন্ধন মোচন কর্ব্বেন।

কিছুদিন থেকে বারেবারে মনে হচ্চে আমার দুটো বুদ্ধি আছে। আমার একটা বুদ্ধি বুঝতে পারচে সন্দীপের এই প্রলয়-রূপ ভয়ঙ্কর—আর-এক বুদ্ধি বল্‌চে এই ত মধুর। জাহাজ যখন ডোবে তখন চারদিকে যারা সাঁতার দেয় তাদের টেনে নেয়—সন্দীপ যেন সেই মরণের মুর্ত্তি—ভয় ধরবার আগেই ওর প্রচণ্ড টান এসে ধরে—সমস্ত আলো সমস্ত কল্যাণ থেকে, আকাশের মুক্তি থেকে, নিশ্বাসের বাতাস থেকে, চিরদিনের সঞ্চয় থেকে, প্রতিদিনের ভাবনা থেকে চোখের পলকে একটা নিবিড় সর্ব্বনাশের মধ্যে একেবারে লোপ করে দিতে চায়। কোন্ মহামারীর দূত হয়ে ও এসেচে—অশিব মন্ত্র পড়তে-পড়তে রাস্তা দিয়ে চলেছে,

আর ছুটে আসচে দেশের সব বালকরা সব যুবকরা। বাংলাদেশের হৃদয়পদ্মে যিনি মা বসে আছেন তিনি কেঁদে উঠেচেন—তাঁর অমৃতভাণ্ডারের দরজা ভেঙে ফেলে এরা সেখানে মদের ভাণ্ড নিয়ে পানসভা বসিয়েছে—ধূলার উপর ঢেলে ফেলতে চায় সব সুধা, চুরমার করতে চায় চিরদিনের সুধাপাত্র! সবই বুঝলুম কিন্তু মোহকে ত ঠেকিয়ে রাখতে পারিনে! সত্যের কঠোর তপস্যার পরীক্ষা করবার জন্যে সত্যদেবেরই এই কাজ—মাৎলামি স্বর্গের সাজ পরে এসে তাপসদের সাম্‌নে নৃত্য করতে থাকে—বলে, তোমরা মূঢ়, তপস্যায় সিদ্ধি হয় না, তার পথ দীর্ঘ, তার কাল মন্থর—তাই বজ্রধারী আমাকে পাঠিয়েচেন—আমি তোমাদের বরণ করব,—আমি সুন্দরী, আমি মত্ততা, আমার আলিঙ্গনেই নিমেষের মধ্যে সমস্ত সিদ্ধি।

একটুখানি চুপ করে থেকে সন্দীপ আবার আমাকে বল্লে, এবার দূরে যাবার সময় এসেচে দেবী! ভালোই হয়েচে। তোমার কাছে আসার কাজ আমার হয়ে গেছে। তার পরেও যদি থাকি তাহলে একে-একে আবার সব নষ্ট হয়ে যাবে। পৃথিবীতে যা সকলের চেয়ে বড় তাকে লোভে পড়ে সস্তা করতে গেলেই সর্ব্বনাশ ঘটে—মুহূর্ত্তের অন্তরে যা অনন্ত তাকে কালের মধ্যে ব্যাপ্ত করতে গেলেই সীমাবদ্ধ করা হয়। আমরা সেই অনন্তকে নষ্ট করতে বসেছিলুম—ঠিক এমন সময়ে তোমারই বজ্র উদ্যত হল, তোমার পূজাকে তুমি রক্ষা করলে, আর তোমার এই পূজারিকেও। আজ আমার এই বিদায়ের মধ্যেই তোমার বন্দনা সকলের চেয়ে বড় হয়ে উঠ্‌ল। দেবী, আমিও আজ তোমাকে মুক্তি দিলুম—আমার মাটির

মন্দিরে তোমাকে ধরছিল না,—এ মন্দির প্রত্যেক পলকে ভাঙবে-ভাঙবে করছিল—আজ তোমার বড় মূর্ত্তিকে বড় মন্দিরে পূজা করতে চল্লুম—তোমার কাছ থেকে দূরেই তোমাকে সত্য করে পাব—এখানে তোমার কাছ থেকে প্রশ্রয় পেয়েছিলুম, সেখানে তোমার কাছ থেকে বর পাব!

টেবিলের উপর আমার গয়নার বাক্স ছিল। আমি সেটা তুলে ধরে বল্লুম, আমার এই গয়না আমি তোমার হাত দিয়ে যাঁকে দিলুম তাঁর চরণে তুমি পৌঁছে দিয়ো।

আমার স্বামী চুপ করে রইলেন। সন্দীপ বেরিয়ে চলে গেল।

ক্রমশঃ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বৈরাগ্য সাধন

চুপ, চুপ, চুপ কর্ তোরা।

কেন, কি হয়েচে ?

মহারাজের মন খারাপ হয়েচে।

সর্ব্বনাশ !

কেরে ? কে বাজায় বাঁশি ?

কেন ভাই, কি হয়েচে ?

মহারাজের মন খারাপ হয়েচে।

সর্ব্বনাশ !

ছেলেগুলো দাপাদাপি করচে কার ?

আমাদের মণ্ডলদের।

মণ্ডলকে সাবধান করে দে ! ছেলেগুলোকে ঠেকাক্ !

মন্ত্রী কোথায় গেলেন ?

এই যে এখানেই আছি।

খবর পেয়েছেন কি ?

কি বল দেখি !

মহারাজের মন খারাপ হয়েচে।

কিন্তু প্রত্যন্তবিভাগ থেকে যুদ্ধের সংবাদ এসেচে যে !

যুদ্ধ চলুক কিন্তু তার সংবাদটা এখন চল্‌বে না।

চীন সম্রাটের দূত অপেক্ষা করচেন।

অপেক্ষা করতে দোষ নেই কিন্তু সাক্ষাৎ পাবেন না।

ঐযে মহারাজ দর্পণ হাতে করে আস্‌চেন।

জয় হোক্ মহারাজের।

মহারাজ, সভায় যাবার সময় হল।

যাবার সময় হল বৈ কি, কিন্তু সভায় যাবার নয়!

সে কি কথা, মহারাজ?

সভা ভাঙবার ঘণ্টা বেজেচে শুনতে পেয়েচি।

কই, আমরা ত কেউ—

তোমরা শুন্‌বে কি করে? ঘণ্টা একেবারে আমারই কানের কাছে বাজিয়েচে।

এত বড় স্পর্দ্ধা কার হতে পারে?

মন্ত্রী, এখনো বাজাচ্চে।

মহারাজ, দাসের স্থূলবুদ্ধি মাপ করবেন, বুঝতে পারলুম না।

এই চেয়ে দেখ—

মহারাজের চুল—

ওখানে একজন ঘণ্টা-বাজিয়েকে দেখতে পাচ্চ না?

দাসের সঙ্গে পরিহাস?

পরিহাস আমার নয়, মন্ত্রী, যিনি পৃথিবীসুদ্ধ জীবের কানে ধরে পরিহাস করেন এ তাঁরই। গত রজনীতে আমার গলায় মল্লিকার মালা পরাবার সময় মহিষী চম্‌কে উঠে বল্লেন, এ কি মহারাজ, আপনার কানের কাছে দুটো পাকাচুল দেখ্‌চি যে!

মহারাজ এজন্য খেদ করবেন না—রাজবৈদ্য আছেন তিনি—

এ বংশের প্রথম রাজা ইক্ষাকুরও রাজবৈদ্য ছিলেন, তিনি কি

করতে পেরেছিলেন ?—মন্ত্রী, যমরাজ আমার কানের কাছে তাঁর নিমন্ত্রণপত্র ঝুলিয়ে রেখে দিয়েচেন। মহিষী এ দুটো চুল তুলে ফেল্‌তে চেয়েছিলেন, আমি বল্লুম, কি হবে রাণী ? যমের পত্রই যেন সরালুম কিন্তু যমের পত্রলিখককে ত সরানো যায় না। অতএব এ পত্র শিরোধার্য্য করাই গেল !—এখন তাহলে—

যে আজ্ঞা, এখন তাহলে রাজকার্য্যের আয়োজন—

কিসের রাজকার্য্য ! রাজকার্য্যের সময় নেই—শ্রুতিভূষণকে ডেকে আন।

সেনাপতি বিজয়বর্ম্মা—

না, বিজয়বর্ম্মা না, শ্রুতিভূষণ।

মহারাজ, এদিকে চীনসম্রাটের দূত—

তাঁর চেয়ে বড় সম্রাটের দূত অপেক্ষা করচেন। ডাক শ্রুতিভূষণকে।

মহারাজ প্রত্যন্তসীমার সংবাদ—

মন্ত্রী প্রত্যন্ততম সীমার সংবাদ এসেচে, ডাক শ্রুতিভূষণকে।

মহারাজের শ্বশুর—

আমি যাঁর কথা বল্‌চি তিনি আমার শ্বশুর নন্। ডাক শ্রুতিভূষণকে !

আমাদের কবিশেখর তাঁর কল্পমঞ্জরী কাব্য নিয়ে—

নিয়ে তিনি তাঁর কল্পদ্রুমের শাখায় প্রশাখায় আনন্দে সঞ্চরণ করুন, ডাক শ্রুতিভূষণকে।

যে আদেশ, তাঁকে ডাক্‌তে পাঠাচ্চি।

বোলো, সঙ্গে যেন তাঁর বৈরাগ্যবারিধি পুঁথিটা আনেন।

প্রতিহারী; বাইরে ঐ কারা গোল করচে, বারণ কর, আমি একটু শান্তি চাই।

নাগপত্তনে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে, প্রজারা সাক্ষাৎ প্রার্থনা করে।

আমার ত সময় নেই মন্ত্রী! আমি শান্তি চাই।

তারা বল্‌চে তাদের সময় আরো অনেক অল্প—তারা মৃত্যুর দ্বার প্রায় লঙ্ঘন করেচে—তারা ক্ষুধাশান্তি চায়।

মন্ত্রী, সময়ের মাপ কি বৎসর মাস দিয়ে হয়? আমার যা আয়োজন তাতে হাজার বছরও কিছু নয়, অথচ আজ যদি আমি কেবল আরো পঞ্চাশ বছর মাত্র বাঁচি সেটা কি ওদের ঐ পাঁচ দিনের চেয়ে বেশি?

তাহলে মহারাজ, ঐ হতভাগ্যদের—

ঐ হতভাগ্যদের প্রতি এই হতভাগ্যের উপদেশ এই যে, কাল-ধীবরের জাল ছিন্ন করবার জন্যে ছটফট করা বৃথা, আজই হোক্ কালই হোক্ সে টেনে তুল্‌বেই।

অতএব—

অতএব শ্রুতিভূষণকে প্রয়োজন এবং তাঁর বৈরাগ্যবারিধি পুঁথি।

প্রজারা তাহলে দুর্ভিক্ষ—

দেখ মন্ত্রী, ভিক্ষা ত অন্নের নয়, ভিক্ষা আয়ুর। সেই ভিক্ষায় জগৎ জুড়ে দুর্ভিক্ষ—কি রাজার কি প্রজার—কে কাকে রক্ষা করবে?

অতএব—

অতএব শ্মশানেশ্বর শিব যেখানে ডমরুধ্বনি করচেন সেই-খানেই সকলের সব প্রার্থনা ছাইচাপা পড়বে—তবে কেন মিছে গলা ভাঙা! এই যে শ্রুতিভূষণ, প্রণাম!

শুভমস্তু!

শ্রুতিভূষণ মশায়, মহারাজকে একটু বুঝিয়ে বল্‌বেন যে অবসাদ-গ্রস্ত নিরুৎসাহকে লক্ষ্মী পরিহার করেন।

শ্রুতিভূষণ, মন্ত্রী আপনাকে কি বল্‌চেন?

উনি বল্‌চেন লক্ষ্মীর স্বভাব সম্বন্ধে মহারাজকে কিছু উপদেশ দিতে।

আপনার উপদেশ কি?

বৈরাগ্যবারিধিতে একটি চৌপদী আছে—

যে পদ্মে লক্ষ্মীর বাস, দিন অবসানে
সেই পদ্ম মুদে দল সকলেই জানে।
গৃহ যার ফুটে আর মুদে পুনঃ পুনঃ
সে লক্ষ্মীরে ত্যাগ কর, শুন মূঢ় শুন!

অহো, আপনার উপদেশের এক ফুৎকারেই আশা-প্রদীপের জ্বলন্ত শিখা নির্ব্বাপিত হয়ে যায়। আমাদের আচার্য্য বলেচেন না—

দন্তং গলিতং পলিতং মুণ্ডং
তদপি ন মুঞ্চতি আশাভাণ্ডং!

মহারাজ, আশার কথা যদি তুল্লেন তবে বারিধি থেকে আর একটি চৌপদী শোনাই—

শৃঙ্খল বাঁধিয়া রাখে এই জানি সবে,
আশার শৃঙ্খল কিন্তু অদ্ভুত এ ভবে।
সে যাহারে বাঁধে সেই ঘুরে মরে পাকে,
সে বন্ধন ছাড়ে যারে স্থির হয়ে থাকে।

হায় হায় অমূল্য আপনার বাণী! শ্রুতিভূষণকে এক সহস্র স্বর্ণমুদ্রা এখনি—ও কি মন্ত্রী, আবার কারা গোল করচে?

সেই দুর্ভিক্ষগ্রস্ত প্রজারা।

ওদের এখনি শান্ত হতে বল।

তাহলে, মহারাজ, শ্রুতিভূষণকে ওদের কাছে পাঠিয়ে দিন না—আমরা ততক্ষণ যুদ্ধের পরামর্শটা—

না, না, যুদ্ধ পরে হবে, শ্রুতিভূষণকে ছাড়তে পারচিনে।

মহারাজ, স্বর্ণমুদ্রা দেবার কথা বলছিলেন কিন্তু সে দান যে ক্ষয় হয়ে যাবে। বৈরাগ্যবারিধি লিখচেন,—

স্বর্ণদান করে যেই করে দুঃখ দান
যত স্বর্ণ ক্ষয় হয় ব্যথা পায় প্রাণ।
শত দাও, লক্ষ দাও, হয়ে যায় শেষ,
শূন্য ভাণ্ড ভরি শুধু থাকে মনঃক্লেশ।

আহা, শরীর রোমাঞ্চিত হল। প্রভু কি তাহলে—

না, আমি সহস্রমুদ্রা চাইনে!

দিন্ দিন্ একটু পদধূলি দিন্! সহস্র মুদ্রা চান্‌না। এত বড় কথা!

মহারাজ, এই সহস্র মুদ্রা অক্ষয় হয়ে যাতে মহারাজের পুণ্যফলকে অসীম করে আমি এমন কিছু চাই! গোধন-সমেত আপনার ঐ কাঞ্চনপুর জনপদটি যদি ব্রহ্মত্রদান করেন কেবলমাত্র ঐটুকুতেই আমি সন্তুষ্ট থাকব কারণ বৈরাগ্যবারিধি বল্‌চেন—

বুঝেছি শ্রুতিভূষণ, এর জন্যে আর বৈরাগ্যবারিধির প্রমাণ দরকার নেই। মন্ত্রী, কাঞ্চনপুর জনপদটি যাতে শ্রুতিভূষণের বংশে চিরন্তন—আবার কি, বারবার কেন চীৎকার করচে?

চীৎকারটা বারবার করচে বটে কিন্তু কারণটা একই রয়ে গেছে। ওরা সেই মহারাজের দুর্ভিক্ষকাতর প্রজা।

মহারাজ, ব্রাহ্মণী মহারাজকে বল্‌তে বলেচেন তিনি তাঁর সর্ব্বাঙ্গে মহারাজের যশোঝঙ্কার ধ্বনিত করতে চান কিন্তু আভরণের অভাব-বশত শব্দ বড়ই ক্ষীণ হয়ে বাজ্‌চে।

মন্ত্রী!

মহারাজ!

ব্রাহ্মণীর আভরণের অভাবমোচন করতে যেন বিলম্ব না হয়!

আর মন্ত্রীমশায়কে বলে দিন, আমরা সর্ব্বদাই পরমার্থচিন্তায় রত, বৎসরে বৎসরে গৃহসংস্কারের চিন্তায় মন দিতে হলে চিত্তবিক্ষেপ হয় অতএব রাজ-শিল্পী যদি আমার গৃহটি সুদৃঢ় করে নির্ম্মাণ করে দেয় তাহলে তার তলদেশে শান্তমনে বৈরাগ্য সাধন করতে পারি।

মন্ত্রী, রাজশিল্পীকে যথাবিধি আদেশ করে দাও।

মহারাজ, এবৎসর রাজকোষে ধনাভাব।

সে ত প্রতিবৎসরেই শুনে আসচি। মন্ত্রী তোমাদের উপর ভার ধন বৃদ্ধি করবার, আর আমার উপর ভার অভাব বৃদ্ধি করবার! এই দুইয়ে মিলে সন্ধি করে হয় ধনাভাব।

মহারাজ, মন্ত্রীকে দোষ দিতে পারিনে। উনি দেখচেন আপনার অর্থ, আর আমরা দেখচি আপনার পরমার্থ সুতরাং উনি যেখানে দেখতে পাচ্চেন অভাব আমরা সেইখানে দেখতে পাচ্চি ধন। বৈরাগ্যবারিধিতে লিখচেন—

রাজকোষ পূর্ণ হয়ে তবু শূন্যমাত্র,
যোগ্য হাতে যাহা পড়ে লভে সৎপাত্র।
পাত্র নাই ধন আছে, থেকেও না থাকা,
পাত্র হাতে ধন, সেই রাজকোষ পাকা।

আহা হাঁ! আপনাদের সঙ্গ অমূল্য!

কিন্তু মহারাজের সঙ্গ কত মূল্যবান, শ্রুতিভূষণমশায় তা বেশ জানেন। তাহলে আসুন শ্রুতিভূষণ, বৈরাগ্যসাধনের ফর্দ্দ যা দিলেন সেটা সংগ্রহ করা যাক্! এই ক্ষয়শীল সংসারে উপকরণ প্রতিমুহূর্ত্তে হ্রাস হয়ে আসে এইজন্যই এখানে আরাম করে বৈরাগ্য করা এতই কঠিন!

চলুন তবে চলুন, বিলম্বে কাজ নেই। মন্ত্রী এই সামান্য বিষয় নিয়ে যখন এত অধীর হয়েচেন তখন ওঁকে শান্ত করে এখনি আবার ফিরে আস্‌চি!

আমার সর্ব্বদা ভয় হয় পাছে আপনি রাজাশ্রয় ছেড়ে অরণ্যে চলে যান!

মহারাজ, মনটা মুক্ত থাকলে কিছুই ত্যাগ করতে হয় না—এই রাজগৃহে যতক্ষণ আমার সন্তোষ আছে ততক্ষণ এই যে আমার অরণ্য! এক্ষণে তবে আসি! মন্ত্রী, চল, চল।

ঐ যে কবিশেখর আস্‌চে—আমার তপস্যা ভাঙলে বুঝি! ওকে ভয় করি! ওরে পাকাচুল, কান ঢেকে থাক্‌রে, কবির বাণী যেন প্রবেশপথ না পায়!

মহারাজ, আপনার এই কবিকে না কি বিদায় করতে চান?

কবিত্ব যে বিদায়-সংবাদ পাঠালে এখন কবিকে রেখে হবে কি!

সংবাদটা কোথায় পৌঁছল?

ঠিক আমার কানের উপর! চেয়ে দেখ!

পাকাচুল? ওটাকে আপনি ভাবচেন কি?

যৌবনের শ্যামকে মুছে ফেলে শাদা করার চেষ্টা!

কারিকরের মৎলব বোঝেন নি। ঐ শাদা ভূমিকার উপরে আবার নূতন রং লাগবে।

কই রঙের আভাস ত দেখিনে!

সেটা গোপনে আছে। শাদার প্রাণের মধ্যে সব রঙেরই বাসা।

চুপ, চুপ, চুপ কর, কবি, চুপ কর!

মহারাজ, এ যৌবন ম্লান যদি হল ত হোক না! আরেক যৌবনলক্ষ্মী আসচেন, মহারাজের কেশে তিনি তাঁর শুভ্র মল্লিকার মালা পাঠিয়ে দিয়েচেন—নেপথ্যে সেই মিলনের আয়োজন চল্‌চে।

আরে, আরে, তুমি দেখচি বিপদ বাধাবে কবি! যাও যাও তুমি যাও—ওরে শ্রুতিভূষণকে দৌড়ে ডেকে নিয়ে আয়!

তাঁকে কেন, মহারাজ?

বৈরাগ্যসাধন করব।

সেই খবর শুনেই ত ছুটে এসেচি, এ সাধনায় আমিই ত আপনার সহচর!

তুমি?

হাঁ মহারাজ, আমরাই ত পৃথিবীতে আছি মানুষের আসক্তি মোচন করবার জন্য।

বুঝতে পারলুম না।

এতদিন কাব্য শুনিয়ে এলুম তবু বুঝতে পারলে না? আমাদের কথার মধ্যে বৈরাগ্য, সুরের মধ্যে বৈরাগ্য, ছন্দের মধ্যে বৈরাগ্য! সেইজন্যেই ত লক্ষ্মী আমাদের ছাড়েন আমরাও লক্ষ্মীকে ছাড়বার জন্যে যৌবনের কানে মন্ত্র দিয়ে বেড়াই!

তোমাদের মন্ত্রটা কি?

আমাদের মন্ত্র এই যে, ওরে ভাই, ঘরের কোণে তোদের থলি থালি আঁকড়ে বসে থাকিস্‌নে—বেরিয়ে পড়্‌ প্রাণের সদর রাস্তায়, ওরে যৌবনের বৈরাগীর দল!

সংসারের পথটাই বুঝি তোমার বৈরাগ্যের পথ হল?

তা নয় ত কি মহারাজ? সংসারে যে কেবলি সরা, কেবলি চলা; তারই সঙ্গে সঙ্গে যে-লোক একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে কেবলি সরে, কেবলি চলে সেই ত বৈরাগী, সেই ত পথিক, সেই ত কবি-বাউলের চেলা!

তাহলে শান্তি পাব কি করে?

শান্তির উপরে ত আমাদের একটুও আসক্তি নেই, আমরা যে বৈরাগী।

কিন্তু ধ্রুব সম্পদটি ত পাওয়া চাই!

ধ্রুব সম্পদে আমাদের একটুও লোভ নেই, আমরা যে বৈরাগী।

সে কি কথা?—বিপদ বাধাবে দেখচি! ওরে শ্রুতিভূষণকে ডাক্‌!

আমরা অধ্রুব মন্ত্রের বৈরাগী। আমরা কেবলি ছাড়তে ছাড়তে পাই তাই ধ্রুবটাকে মানিনে।

এ তোমার কি রকম কথা?

পাহাড়ের গুহা ছেড়ে যে নদী বেরিয়ে পড়েচে তার বৈরাগ্য কি দেখেন নি মহারাজ? সে অনায়াসে আপনাকে ঢেলে দিতে-দিতেই আপনাকে পায়, নদীর পক্ষে ধ্রুব হচ্চে বালির মরুভূমি—তার মধ্যে সেঁধলেই বেচারা গেল! তার দেওয়া যেম্‌নি ঘোচে অম্‌নি তার পাওয়াও ঘোচে!

ঐ শোন কবিশেখর, কান্না শোন। ঐ ত তোমার সংসার!

ওরা মহারাজের দুর্ভিক্ষকাতর প্রজা।

আমার প্রজা? বল কি কবি? সংসারের প্রজা ওরা! এ দুঃখ কি আমি সৃষ্টি করেচি? তোমার কবিত্ব-মন্ত্রের বৈরাগীরা এ দুঃখের কি প্রতিকার করতে পারে বল ত?

মহারাজ, এ দুঃখকে ত আমরাই বহন করতে পারি! আমরা যে নিজেকে ঢেলে দিয়ে বয়ে চলেচি। নদী কেমন করে ভার বহন করে দেখেচেন ত? মাটির পাকা রাস্তাই হল যাকে বলেন ধ্রুব, তাই ত সে ভারকে কেবলি ভারী করে তোলে; বোঝা তার উপর দিয়ে আর্ত্তনাদ করতে করতে চলে, আর তারও বুক চিরে ক্ষত বিক্ষত হয়ে যায়। নদী আনন্দে বয়ে চলে তাই ত সে আপনার ভার লাঘব করেচে বলেই বিশ্বের ভার লাঘব করে। আমরা ডাক দিয়েচি সকলের সব সুখ দুঃখকে চলার লীলায় বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে। আমাদের বৈরাগীর ডাক। আমাদের বৈরাগীর সর্দ্দার যিনি, তিনি এই সংসারের পথ দিয়ে নেচে চলেচেন তাই ত বসে থাক্‌তে পারিনে,—

পথ দিয়ে কে যায় গো চলে'
ডাক দিয়ে সে যায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

পথের হাওয়ায় কি সুর বাজে,
বাজে আমার বুকের মাঝে,
বাজে বেদনায়।
আমার ঘরে থাকাই দায়।

পূর্ণিমাতে সাগর হতে
ছুটে এল বান,
আমার লাগ্‌ল প্রাণে টান।

আপন মনে মেলে' আঁখি
আর কেন বা পড়ে থাকি
কিসের ভাবনায় ?
আমার ঘরে থাকাই দায়॥

যাক্‌গে শ্রুতিভূষণ! ওহে কবিশেখর, আমার কি মুস্কিল হয়েচে জান? তোমার কথা আমি এক বিন্দু বিসর্গও বুঝতে পারিনে অথচ তোমার সুরটা আমার বুকে গিয়ে বাজে। আর শ্রুতিভূষণের ঠিক তার উল্টো;—তার কথাগুলো খুবই স্পষ্ট বোঝা যায় হে,—ব্যাকরণের সঙ্গেও মেলে—কিন্তু সুরটা—সে আর কি বলব!

মহারাজ, আমাদের কথা ত বোঝবার জন্যে হয়নি, বাজবার জন্যে হয়েচে!

এখন তোমার কাজটা কি বল ত কবি?

মহারাজ, ঐ যে তোমার দরজার বাইরে কান্না উঠেচে ঐ কান্নার মাঝখান দিয়ে এখন ছুটতে হবে।

ওহে কবি, বল কি তুমি! এ সমস্ত কেজোলোকের কাজ, দুর্ভিক্ষের মধ্যে তোমরা কি করবে?

কেজোলোকেরা কাজ বেসুরো করে ফেলে, তাই, সুর বাঁধবার জন্যে আমাদের ছুটে আস্‌তে হয়!

ওহে কবি, আর একটু স্পষ্ট ভাষায় কথা কও!

মহারাজ, ওরা কর্ত্তব্যকে ভালোবাসে বলে কাজ করে আমরা প্রাণকে ভালবাসি বলে কাজ করি—এইজন্যে ওরা আমাদের গাল দেয়, বলে নিষ্কর্ম্মা, আমরা ওদের গাল দিই, বলি নির্জ্জীব!

কিন্তু জিৎটা হল কার?

আমাদের, মহারাজ, আমাদের!

তার প্রমাণ?

পৃথিবীতে যা কিছু সকলের বড় তার প্রমাণ নেই। পৃথিবীতে যত কবি যত কবিত্ব সমস্ত যদি ধুয়েমুছে ফেলতে পার তাহলেই প্রমাণ হবে এতদিন কেজো লোকেরা তাদের কাজের জোরটা কোথা থেকে পাচ্ছিল, তাদের ফসলক্ষেতের মূলের রস জুগিয়ে এসেচে কারা! মহারাজ, আপনার দরজার বাইরে ঐ যে কান্না উঠেচে সে কান্না থামায় কারা? যারা বৈরাগ্যবারিধির তলায় ডুব মেরেচে তারা নয়, যারা বিষয়কে আঁকড়ে ধরে রয়েচে তারা নয়, যারা কাজের কৌশলে হাত পাকিয়েচে তারাও নয়, যারা কর্ত্তব্যের শুষ্করুদ্রাক্ষের মালা জপ্‌চে তারাও নয়, যারা অপর্য্যাপ্ত প্রাণকে বুকের মধ্যে পেয়েচে বলেই জগতের কিছুতে যাদের উপেক্ষা নেই, যাদের সাধনা কেবলই কর্ম্মের সাধনা নয় প্রাণের সাধনা, জয় করে তারা, ত্যাগ করেও তারাই, বাঁচতে জানে তারা, মরতেও জানে তারা, তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ পায় তারা জোরের সঙ্গে দুঃখ দূর করে,—সৃষ্টি করে তারাই, কেননা তাদের মন্ত্র আনন্দের মন্ত্র, সবচেয়ে বড় বৈরাগ্যের মন্ত্র!

ওহে কবি, তাহলে তুমি আমাকে কি করতে বল?

উঠ্‌তে বলি, মহারাজ, চল্‌তে বলি! ঐ যে কান্না, ওযে প্রাণের

কাছে প্রাণের আহ্বান! কিছু করতে পারব কিনা সে পরের কথা—কিন্তু ডাক শুনে যদি ভিতরে সাড়া না দেয়, প্রাণ যদি না দুলে ওঠে তবে অকর্ত্তব্য হল বলে ভাবনা নয়, তবে ভাবনা মরেচি বলে!

কিন্তু মরবই যে, কবিশেখর, আজ হোক্ আর কাল হোক্!

কে বল্লে মহারাজ! মিথ্যা কথা! যখন দেখচি বেঁচে আছি তখন জানচি যে বাঁচবই;—যে আপনার সেই বাঁচাটাকে সব দিক থেকে যাচাই করে দেখলে না সেই বলে মরব—সেই বলে "নলিনীদলগত জলমতি তরলং তদ্বৎজীবনমতিশয় চপলং।"

কি বল হে, কবি, জীবন চপল নয়?

চপল বই কি, কিন্তু অনিত্য নয়। চপল জীবনটা চিরদিন চপলতা করতে-করতেই চল্‌বে। মহারাজ, আজ তুমি তার চপলতা বন্ধ করে মরবার পালা অভিনয় করতে বসেচ?

ঠিক বল্‌চ কবি? আমরা বাঁচবই?

বাঁচবই!

যদি বাঁচবই তবে ত বাঁচার মত করেই বাঁচতে হবে—কি বল!

হাঁ মহারাজ!

প্রতিহারী!

কি মহারাজ!

ডাক, ডাক, মন্ত্রীকে এখনি ডাক।

কি মহারাজ।

মন্ত্রী, আমাকে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেচ কেন?

ব্যস্ত ছিলুম।

কিসে?

বিজয়বর্ম্মাকে বিদায় করে দিতে।

কি মুস্কিল! বিদায় করবে কেন? যুদ্ধের পরামর্শ আছে যে! চীনের সম্রাটের দূতের জন্যে বাহনের ব্যবস্থা—

কেন, বাহন কিসের জন্যে?

মহারাজের ত দর্শন হবেনা তাই তাঁকে ফিরিয়ে দেবার—

মন্ত্রী আশ্চর্য্য করলে দেখচি—রাজকার্য্য কি এমনি করেই চল্‌বে? হঠাৎ তোমার হল কি?

তার পরে আমাদের কবিশেখরের বাসা ভাঙবার জন্যে লোকের সন্ধান কর্‌ছিলুম—আর ত কেউ রাজি হয় না, কেবল দিঙ্‌নাগের বংশে যাঁরা অলঙ্কারের আর ব্যাকরণ শাস্ত্রের টোল খুলেচেন তাঁরা দলে দলে সাবল হাতে ছুটে আস্‌চেন।

সর্ব্বনাশ! মন্ত্রী পাগল হলে না কি? কবিশেখরের বাসা ভেঙে দেবে? আর আজ ফাল্গুনে বসন্তের নিকুঞ্জবনের পাখীগুলোকে নিয়ে পলায়ন প্রস্তুত করতে চাও না কি?

ভয় নেই মহারাজ, বাসাটা একেবারে ভাঙতে হবে না। শ্রুতিভূষণ খবর পেয়েই স্থির করেচেন কবিশেখরের ঐ বাসাটা আজ থেকে তিনি দখল করবেন।

কি বিপদ! সরস্বতী যে তা হলে তাঁর বীণাখানা আমার মাথার উপর আছড়ে ভেঙে ফেলবেন! না, না, সে হবে না!'

আর একটা কাজ ছিল—শ্রুতিভূষণকে কাঞ্চনপুরের সেই বৃহৎ জনপদটা—

ও হো, সেই জনপদটার দানপত্র তৈরি হয়েচে বুঝি? সেটা কিন্তু আমাদের এই কবিশেখরকে—

সে কি কথা মহারাজ! আমার পুরস্কার ত জনপদ নয়—আমরা জন-পদের সেবা ত কখনো করিনি—তাই ঐ পদপ্রাপ্তিটা আশাও করিনে।

আচ্ছা, তবে ওটা শ্রুতিভূষণের জন্যেই থাক্!

আর, মহারাজ, দুর্ভিক্ষপীড়িত প্রজাদের বিদায় করবার জন্যে সৈন্যদলকে আহ্বান করেচি।

মন্ত্রী আজ দেখচি পদে পদে তোমার বুদ্ধির বিভ্রাট ঘট্‌চে। দুর্ভিক্ষকাতর প্রজাদের বিদায় করবার ভালো উপায় অন্ন দিয়ে, সৈন্য দিয়ে নয়।

মহারাজ!

কি প্রতিহারী!

বৈরাগ্যবারিধি নিয়ে শ্রুতিভূষণ এসেচেন!

সর্ব্বনাশ করলে! ফেরাও তাকে ফেরাও! মন্ত্রী দেখো হঠাৎ যেন শ্রুতিভূষণ. না এসে পড়ে! আমার দুর্ব্বল মন, হয়ত সাম্‌লাতে পারব না, হয়ত অন্যমনস্ক হয়ে বৈরাগ্যবারিধির ডুব-জলে গিয়ে পড়ব। ওহে কবিশেখর, আমাকে কিছুমাত্র সময় দিয়ো না—প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখ—একটা যা-হয়-কিছু কর—যেমন এই ফাল্গুনের হাওয়াটা যা-খুসি-তাই করচে তেমনিতর! হাতে কিছু তৈরি আছে হে? একটা নাটক, কিম্বা প্রকরণ, কিম্বা রূপক, কিম্বা ভাণ, কিম্বা—

তৈরি আছে—কিন্তু সেটা নাটক, কি প্রকরণ, কি রূপক, কি ভাণ তা ঠিক বলতে পারব না!

যা রচনা করেচ তার অর্থ কি কিছু গ্রহণ করতে পারব?

না মহারাজ! রচনা ত অর্থ গ্রহণ করবার জন্যে নয়।

তবে?

সেই রচনাকেই গ্রহণ করবার জন্যে। আমি ত বলেচি আমার এ সব জিনিস বাঁশির মত, বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।

বল কি হে কবি, এর মধ্যে তত্ত্বকথা কিছুই নেই?

কিচ্ছু না!

তবে তোমার ও রচনাটা বল্‌চে কি?

ও বল্‌চে, আমি আছি! শিশু জন্মাবামাত্র চেঁচিয়ে ওঠে, সেই কান্নার মানে জানেন মহারাজ? শিশু হঠাৎ শুন্‌তে পায় জলস্থল আকাশ তাকে চারদিক থেকে বলে উঠেচে—"আমি আছি"—তারই উত্তরে ঐ প্রাণটুকু সাড়া দিয়ে ওঠে—"আমি আছি!" আমার রচনা সেই সদ্যোজাত শিশুর কান্না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ডাকের উত্তরে প্রাণের সাড়া!

তার বেশি আর কিচ্ছু না?

কিচ্ছু না! আমার রচনার মধ্যে প্রাণ বলে' উঠেচে, সুখে দুঃখে, কাজে বিশ্রামে, জন্মে মৃত্যুতে, জয়ে পরাজয়ে, লোকে লোকান্তরে জয় এই আমি-আছির জয়, জয় এই আনন্দময় আমি-আছির জয়!

ওহে কবি, তত্ত্ব না থাক্‌লে আজকের দিনে তোমার এ জিনিস্ চল্‌বে না।

সে কথা সত্য মহারাজ! আজকের দিনের আধুনিকেরা উপার্জ্জন করতে চায় উপলব্ধি করতে চায় না! ওরা বুদ্ধিমান!

তা হলে শ্রোতা কাদের ডাকা যায়, টোলের নবীন ছাত্রদের ডাকব কি?

না মহারাজ, তারা কাব্য শুনেও তর্ক করে! নতুন শিং-ওঠা হরিণশিশুর মত ফুলের গাছকেও গুঁতো মেরে মেরে বেড়ায়!

তবে?

ডাক দেবেন যাদের চুলে পাক ধরেচে।

সে কি কথা কবি?

হাঁ মহারাজ, সেই প্রৌঢ়দেরই যৌবনটি নিরাসক্ত যৌবন। তারা ভোগবতী পার হয়ে আনন্দলোকের ডাঙা দেখতে পেয়েচে। তারা আর ফল চায় না, ফল্‌তে চায়!

ওহে কবি, তবে ত এতদিন পরে ঠিক আমার কাব্য শোনবার বয়েস হয়েচে। তাহলে বিজয়বর্ম্মাকেও ডাকা যাক্!

ডাকুন্!

চীনসম্রাটের দূতকে?

ডাকুন!

আমার শ্বশুর এসেছেন শুন্‌চি—

তাঁকে ডাক্‌তে পারেন—কিন্তু শ্বশুরের ছেলেটির সম্বন্ধে সন্দেহ আছে।

তাই বলে' শ্বশুরের মেয়ের কথাটা ভুলোনা কবি।

আমি ভুল্‌লেও তাঁর সম্বন্ধে ভুল হবার আশঙ্কা নেই।

আর শ্রুতিভূষণকে?

না মহারাজ, তাঁর প্রতি ত আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ নেই, তাঁকে কেন দুঃখ দিতে যাব?

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আর্য্যধর্ম্মের সহিত বাহ্যধর্ম্মের যোগাযোগ

সম্প্রতি আমাদের মাসিকপত্রে বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্মের উৎপত্তি নিয়ে একটি তর্ক উপস্থিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, ও দুটি ধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম হতে উৎপন্ন হয়েছে; শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় বলেন, তা নয়। এ সমস্যার মীমাংসা করা আমার সাধ্যাতীত। তবে এ আলোচনায় যোগদান করবার অধিকারে ইংরাজিশিক্ষিত লোকেরাও বঞ্চিত নন্, কেননা যাকে আমরা হিন্দুসভ্যতা বলি তা কোন্ অংশে আর্য্য, আর কোন্ অংশে অনার্য্য এ কথা জানবার কৌতূহল বিশেষ করে আমাদেরই আছে।

বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয় যাকে আর্য্যধর্ম্ম বলেন তাকে বৈদিক ধর্ম্ম বলাই শ্রেয়। কেননা, আর্য্য বল্‌তে ঠিক কি বোঝায় সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ থাক্‌তে পারে এবং আছে। শাস্ত্রীমহাশয় "বৈদিক-ধর্ম্ম"-অর্থেই "আর্য্যধর্ম্ম" শব্দ ব্যবহার করেছেন; তিনি আর্য্যমতকে বরাবর বেদপন্থীদের মত বলেই উল্লেখ করে গেছেন। "বেদপন্থী" শব্দটিও আমি বর্জ্জন করা আবশ্যক মনে করি,—কেননা বেদের শতপথ থাক্‌তে পারে, সুতরাং সকল বেদ-পন্থীরা চাই-কি একমতও না হতে পারেন; অপর পক্ষে বেদ শব্দের অর্থ যে কি সে-বিষয়ে মীমাংসক এবং বৈদান্তিক উভয়েই একমত। মনুর ভাষ্যকার মেধাতিথি বলেন—

"ব্রাহ্মণ সহিত ঋক সাম যজুঃকে বেদ কহা যায়। এস্থলে "অগ্নিমীলেহগ্নির্বৈ দেবানামবম" ইত্যাদি এবং "সংসমিদ্যুবসেহথ মহাব্রতম্" ইত্যন্ত বাক্যসমূহ এবং তাহার অবয়বভূত সকল বাক্যের প্রতিই বেদ শব্দ প্রয়োগ করা হয়।"

বেদ যে কেবল শব্দসমূহ এ বিষয়ে মেধাতিথির সঙ্গে শঙ্কর একমত। তিনি বলেছেন—

"উপনিষদ্ বেদ্যাক্ষরবিষয়ং হি বিজ্ঞানমিহ পরাবিদ্যেতি প্রাধান্যেন বিবক্ষিতং নোপনিষচ্ছব্দরাশিঃ। বেদশব্দেন তু সর্ব্বত্র শব্দরাশির্ব্বিবক্ষিতঃ।—অর্থাৎ উপনিষদ-বেদ্য যে অক্ষর ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান, তাহাই এখানে—"পরাবিদ্যা" বলিয়া বিবক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু উপনিষদের শব্দসমূহ নহে। পক্ষান্তরে, বেদশব্দে কিন্তু সর্ব্বত্রই শব্দসমূহ মাত্র বিবক্ষিত হইয়াছে।"

সুতরাং জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম বেদমূলক কি না—তাই হচ্ছে এস্থলে যথার্থ আলোচনার বিষয়। এ বিষয়ে পুরাকালে বহু তর্ক করা হয়েছে, সে তর্কের ফল সেকালে কি দাঁড়িয়েছিল মেধাতিথির মনুভাষ্যে তার পরিচয় পাওয়া যায়ঃ—

"বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ" ॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা সূত্রে মেধাতিথি বলেন—

"শাক্যভোজক ক্ষপণকাদির ধর্ম্ম বেদমূলক নহে,কেননা ইহারা বেদ যে অপ্রামাণ্য ইহা প্রমাণ করিবার জন্য প্রত্যক্ষ-বেদবিরুদ্ধ উপদেশ দিয়া থাকেন। তাঁহাদের স্মৃতিতে বেদপাঠ নিষিদ্ধ। তৎসত্ত্বেও বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মের বেদমূলত্ব সম্ভব কিনা তাহা বিচার করা যাউক্। যেস্থলে এক বস্তুর সহিত অপর কোন বস্তুর সম্বন্ধ দুরাপেত সে স্থলে একের মূল যে অপর এরূপ আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। তদ্ব্যতীত এ সকল ধর্ম্মের স্মৃতিপরম্পরায় মূলান্তরও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভিক্ষু প্রভৃতির সুগতি এবং দুর্গতিও ত আমি দিব্যচক্ষে নিত্যই দেখিতে পাই। ভোজক পাঞ্চরাত্রিক নিগ্রন্থ অর্থবাদ পাশুপত প্রভৃতি বাহ্য ধর্ম্মাবলম্বীরা স্বসিদ্ধান্ত-প্রণেতৃ মহাপুরুষদিগকে কিম্বা দেবতাবিশেষকে সেই সেই সিদ্ধান্তের অর্থের প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া মনে করে। এবং বেদমূলক ধর্ম্মকে মান্য করে না।

কেবল তাহাই নয়, তাহারা প্রত্যক্ষ-বেদে যে সকল বিরোধ দৃষ্ট হয় বিশেষ করিয়া তাহাই উপদেশ দেয়।"

শুধু বৌদ্ধ জৈন নয়, বৈষ্ণব শৈব প্রভৃতি বেদবাহ্য ধর্ম্মসকল যে বেদমূলক নয় এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় এবং মেধাতিথি একমত। এবং আমার বিশ্বাস এই মতই ভারতবর্ষের সনাতন মত।

এর উত্তরে হয় ত অনেকে বল্‌বেন, যে এ-মত ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণের সাম্প্রদায়িক মত, সুতরাং তাঁদের কথা ঐতিহাসিক সত্যস্বরূপে গ্রাহ্য নয়। এ আপত্তি কিন্তু জাতির বাহ্য ইতিহাস সম্বন্ধেই খাটে, মানসিক ইতিহাস সম্বন্ধে নয়। কোন বাহ্য ঘটনার সত্যাসত্য অবশ্য কোনও ব্যক্তিবিশেষ কিম্বা সম্প্রদায়বিশেষের মতামতের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না এবং তা প্রমাণান্তরের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু ধর্ম্মমতসম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক মতই মুখ্যতঃ গ্রাহ্য। এরূপস্থলে স্মৃতি-পরম্পরাকে উপেক্ষা করায় ঐতিহাসিক বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হয় না।

(২)

যেক্ষেত্রে একই শব্দ একজন এক অর্থে ব্যবহার করেন এবং আর-একজন আর-এক অর্থে ব্যবহার করেন সে ক্ষেত্রে তর্কবিতর্কের কোনও শেষ নেই। হিন্দুধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের সকল আলোচনা যে প্রায়ই কথার-কথা হয়ে ওঠে তার কারণ,—আমরা ধর্ম্ম শব্দ তিন্‌টি সম্পূর্ণ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি। Religion, Morality এবং Law—এ তিনের প্রতিই আমরা নির্ব্বিচারে ধর্ম্ম শব্দ প্রয়োগ করি। এ তিনের মধ্যে অবশ্য যোগাযোগ আছে। ধর্ম্ম

অবশ্য এই ত্রিমূর্ত্তি ধারণ করেই দেখা দেয়। এ ক্ষেত্রে একে-তিন, তিনে-এক হলেও এ তিনটির পার্থক্য বিস্মৃত হলে ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকল বিচার পণ্ড হয়। সুতরাং বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্ম বেদমূলক কি না তা নির্ণয় করতে হলে ধর্ম্মশাস্ত্রে "ধর্ম্ম" শব্দ কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে তা জানা আবশ্যক।

আমরা যাকে religion বলি সে অর্থে ধর্ম্ম, ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বিষয় নয়। এ শাস্ত্র মুখ্যতঃ law এবং গৌণতঃ moralitiy-র শাস্ত্র।

"বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ সদ্ভির্নিত্যমদ্বেষরাগিভিঃ।
হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতো যোধর্ম্মস্তন্নিবোধত ॥"

মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের এই প্রথম শ্লোকের মেধাতিথি এইরূপ ব্যাখ্যা করেছেন :—

"এস্থলে সাক্ষাদ্ধর্ম্মের উপদেশ দেওয়া হইতেছে। ধর্ম্মশব্দ অষ্টকাদি* অনুষ্ঠান বচন। বাহ্যদর্শীরা কিন্তু ভস্মকপাল ধারণ করাকেও ধর্ম্ম বলিয়া মনে করে। তাহাই নিবর্ত্তন করিবার জন্য "বিদ্বদ্ভিঃ সেবিতঃ" ইত্যাদি বিশেষণ পদ ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। সাধু ব্যক্তিরা হিতের প্রাপ্তি এবং অহিতের পরিহারের জন্য যত্নবান হইয়া থাকেন। হিতাহিত ত দৃষ্ট এবং প্রসিদ্ধ। অদৃষ্ট হিতাহিতই বিধিপ্রতিষেধের দ্বারা লক্ষিত হয়। যাহারা সেই (বৈদিক) অনুষ্ঠানের বাহ্য তাহাদিগকেই অসাধু কহা যায়। "ধর্ম্ম" শব্দের প্রতি যে "নিত্য" বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার কারণ ইতর ধর্ম্মের ন্যায় অষ্টকাদি ধর্ম্ম কোনও ব্যক্তি-বিশেষের দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয় নাই। যতদিন সংসার থাকিবে ততদিন এই ধর্ম্মই থাকিবে। অপর পক্ষে বাহ্যধর্ম্মসকল মূর্খ এবং দুঃশীল পুরুষদিগের কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

* বৈদিক শ্রাদ্ধবিশেষ।

হইয়া কিছু দিনের জন্য অবসর লাভ করে, তাহার পর অন্তর্হিত হয়। ইহার কারণ, ব্যামোহ যুগসহস্রানুবর্ত্তী হইতে পারে না। সম্যক্‌জ্ঞান অবিদ্যার দ্বারা আচ্ছন্ন হইলেও তৎক্ষয়ে পুনর্ব্বার নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়। সম্যক্‌জ্ঞানের নির্ম্মলতার কোন রূপ ছেদ সম্ভাবনা নাই।—"অদ্বেষরাগিভিঃ" ইত্যাদি শব্দের দ্বারা বাহ্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান সকলের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় কারণ দর্শান হইয়াছে। "রাগদ্বেষ" ইত্যাদি শব্দের দ্বারা লোভাদি প্রবৃত্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। লোভ হইতেই মন্ত্রতন্ত্রাদির প্রবর্ত্তন হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি ভোগোপযোগী আত্মচেষ্টার দ্বারা জীবধারণ করিতে অসমর্থ তাহারাই লিঙ্গধারণাদির দ্বারা জীবনধারণ করে। এই কারণেই বলা হইয়াছে ভস্মকপালধারণ, নগ্নতা, কাষার বাস ধারণ এ সকল বুদ্ধি পৌরুষহীন ব্যক্তিদের জীবিকামাত্র।"

এর থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, বৈদিকধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য মানবের ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক অভ্যুদয় সাধন করা। মেধাতিথি সংক্ষেপে ধর্ম্মের এই লক্ষণ নির্দ্দেশ করেছেন—"যাবতা ধর্ম্মোঽত্র বক্তব্যতয়া প্রতিজ্ঞাতঃ স চ বিধি প্রতিষেধ লক্ষণঃ।" অর্থাৎ Do এবং Dont নিয়েই এ ধর্ম্মের কারবার, এক-কথায় এ ধর্ম্মের অর্থ Law এবং Morality.

অতএব একথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, Religion হিসেবে বাহ্যধর্ম্মসকল বেদমূলক নয়। বৈদিক অনুষ্ঠানের অদৃষ্ট-ফলে বিশ্বাসই সে ধর্ম্মের Sacred অংশ এবং সে অংশ, সকল বাহ্যধর্ম্ম সমান পরিহার করেছিল। শুধু তাই নয়, বাহ্যধর্ম্মাবলম্বী-দের স্বর্গলাভ করবার প্রবৃত্তিও ছিল না। বৈদিকধর্ম্ম সামাজিক মনোভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। সে ধর্ম্ম মুখ্যতঃ Social ;—Spiritual নয়। এখানে বলে রাখা আবশ্যক যে, উপনিষদ বেদ নয়, শ্রুতি। এমন কি, স্মার্ত্তমতে উপনিষদ যে বেদবাহ্য একথা স্বয়ং শঙ্করও

স্বীকার করেছেন। সুতরাং বাহ্যধর্ম্মের মূল বেদান্ত কিনা সে হচ্ছে স্বতন্ত্র প্রশ্ন। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নি, সুতরাং এস্থলে তার উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক। শাস্ত্রীমহাশয় কেবল ধর্ম্মশাস্ত্রের অর্থাৎ স্মৃতির প্রমাণ দেখিয়েছেন; সুতরাং জৈন এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সে শাস্ত্রের কাছে Law এবং Morality বিষয়ে কতটা ঋণী সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক।

(৩)

ধর্ম্মশাস্ত্রসম্বন্ধে মেধাতিথি বলেছেন "ইহতু সাক্ষাদ্ধর্ম্ম উপদিশ্যতে"। সাক্ষাদ্ধর্ম্মের অর্থ,—যে-সকল বিধি-নিষেধের দ্বারা মানবসমাজ শাসিত এবং চালিত হয়। শাস্ত্র (Law) এবং আচার (Custom) হচ্ছে ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ দেহ। ইংরাজের আইন এবং স্বসমাজের আচার—এ যুগে আমাদের প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম। আত্মার সৃষ্টি স্থিতি এবং লয় সম্বন্ধে মতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই, কোন কালে কোন দেশে সমাজ-রক্ষার সকল ব্যবস্থা বিলকুল উল্টে যায় না।

ইউরোপ খৃষ্টের ধর্ম্ম গ্রহণ করেছে কিন্তু রোমের আইন ত্যাগ করেনি। অদ্যাবধি রোমের সমাজ-শাসন (Civil Law) এবং নিজ নিজ দেশের আচারের (Common Law) উপরেই ইউরোপের প্রতি দেশের সাক্ষাদ্ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতির সংসারধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনও নূতন শাস্ত্র গড়বার প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া প্রাচীন ভারতবর্ষের বাহ্যধর্ম্মসকল প্রবৃত্তিমূলক নয়, নিবৃত্তিমূলক। সংসার-ত্যাগই সে সকল ধর্ম্মের পরম পুরুষার্থ। অর্থকাম নয়, মোক্ষলাভ করাই ছিল সে সকল ধর্ম্মের লক্ষ্য।

এরূপ ধর্ম্মমত থেকে কর্ম্মজীবনের কোনও নূতন ব্যবস্থা জন্মলাভ করতে পারে না। মেধাতিথি বলেন যে, যদি নিষ্কামধর্ম্মই সত্য হয় তাহলে "ইদং আপতিতং ন কিঞ্চিৎ কেনচিৎকর্ত্তব্যং সর্ব্বৈবস্তু ষ্ণীং-ভূতৈঃ স্থাতব্যম্"। সুতরাং বৌদ্ধ জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মের কোনও স্বতন্ত্র ব্যবহারশাস্ত্র থাক্‌বার কথা নয় এবং সম্ভবতঃ নেই।

(৪)

একশ্রেণীর ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মতে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রে Moralityর কোনও কথা নেই; সে শাস্ত্রে যা আছে তা শুধু Law। অপর পক্ষে এইমতে বৌদ্ধশাস্ত্রে যা আছে তা শুধু Morality। এরূপ মত প্রচার করায় অবশ্য নিতান্ত একদেশদর্শী-তার পরিচয় দেওয়া হয়। Moralityর সঙ্গে সম্পর্কহীন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠালাভ করা যেমন অসম্ভব, কেবলমাত্র Moralityর উপর ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠা করাও তেমনি অসম্ভব। যদি কেবলমাত্র হিতবাদের উপর ধর্ম্মস্থাপন করা সম্ভবপর হত তাহলে Mill এবং Comteও পৃথিবীতে নূতন নূতন ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন কর্‌তে পারতেন, এবং বিশ্ব-মানবের সেবাধর্ম্ম এবং অনুশীলনের ধর্ম্ম প্রভৃতি আঁতুড়ে মারা যেত না। অপর পক্ষে ধর্ম্মশাস্ত্রে Morality নেই একথা বলায় Lawএর সঙ্গে Moralityর সম্বন্ধ যে কত ঘনিষ্ঠ সে বিষয়ে অজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হয়। মেধাতিথি বলেন যে "স্মার্ত্ত-বৈদিকয়োর্নিত্যং ব্যতিষঙ্গাৎ পরস্পরম্।" স্মৃতির সঙ্গে বেদের যে সম্বন্ধ, Lawএর সঙ্গে Moralityরও সেই সম্বন্ধ।

অর্থাৎ এ দুই পরস্পর একান্ত জড়িত। ধর্ম্মশাস্ত্রে যে এ দুটি বস্তু পৃথক করা হয়নি তার কারণ এ শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য কর্ত্তব্য

কর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া নয়, আদেশ দেওয়া। তৎসত্ত্বেও বৌদ্ধ ও জৈনশাস্ত্রে যে সকল শীলের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সে সকলের উপদেশ ধর্ম্মশাস্ত্রেও আছে। এর থেকে শ্রীযুক্ত বিধু-শেখর শাস্ত্রীমহাশয় প্রমাণ করতে চান যে, বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্ম বৈদিক ধর্ম্ম হতে উৎপন্ন। বাহ্যধর্ম্ম এবং বৈদিকধর্ম্মের এই শীলগত ঐক্য থেকে তার একটি যে অপর-আর-একটি থেকে উৎপন্ন এরূপ অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত নয়। নচেৎ এ অনুমানও সঙ্গত যে মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র বাইবেল হতে উৎপন্ন; কেননা চুরি করা, হিংসা করা, পর-দার সেবন করা, মিথ্যা কথা বলা এবং পরদ্রব্যে লোভ করা মনুর মতেও অধর্ম্ম, Moses এর মতেও অধর্ম্ম। এ প্রকার যুক্তি অনুসরণ করলে বরং এই সত্যে উপস্থিত হতে হয় যে বৈদিকধর্ম্ম বৌদ্ধ এবং জৈনধর্ম্ম হতে উৎপন্ন, কেননা কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদের মতে সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রসকল বুদ্ধের জন্মের পরবর্ত্তী কালে লিখিত হয়ে-ছিল। আমার বিশ্বাস যে, এ বিষয়ে ভারতবর্ষের কোনও ধর্ম্ম অপর-কোনও ধর্ম্মের নিকট ঋণী নয়। এই ধর্ম্মজ্ঞান ভারতবর্ষের উত্তরাপথের প্রাচীন সভ্যতার অন্বয়াগত সম্পত্তি। এবং এই কারণেই ধর্ম্মশাস্ত্রে Moral Laws কে সামান্য-ধর্ম্ম বলে উল্লেখ করা হয়েছে। "চুরি করো না"—এ নিষেধ বর্ণাশ্রমনির্বিচারে সকলের পক্ষে সমান প্রযোজ্য। অপর পক্ষে বেদাধ্যয়ন করো এবং বেদাধ্যয়ন করো না—এ দুটি হচ্ছে ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রের সম্বন্ধে বিশেষ বিধি এবং বিশেষ নিষেধ। অতএব বৈদিক বৌদ্ধ এবং জৈন প্রভৃতি ধর্ম্মের শীল যে একই আর্য্য মনোভাব হতে উৎপন্ন হয়েছে এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়।

৮

(৫)

বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয় আরও বলেন যে—

"বেদপন্থীদের জ্ঞানদর্শন আচারব্যবহার শিক্ষাদীক্ষা রীতিনীতি মূল করিয়া বৌদ্ধ এবং জৈন উভয় ধর্ম্মেরই সন্ন্যাসিগণের বিধিনিষেধ প্রণীত হইয়াছে"—

এর উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, পূর্ব্বে যে সভ্যতার উল্লেখ করা হয়েছে তাতে গার্হস্থ্য এবং আরণ্যক উভয় ধর্ম্মেরই প্রচলন ছিল। বাহ্যধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন সন্যাসধর্ম্ম, এবং বেদধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন গার্হস্থ্যধর্ম্ম। শুন্‌তে পাই কোন কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্রকার গার্হস্থ্য ব্যতীত অপর কোনও আশ্রম অঙ্গীকার করেন না। এর উত্তরে মেধাতিথি বলেন যে, অপর তিনটি আশ্রমকে গার্হস্থ্যর বিকল্পস্বরূপেই গ্রাহ্য করা হয়। সে যাই হোক মনু-সংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায় যদি লুপ্ত হয়ে যেত তাহলেও সে শাস্ত্রের যে কোনরূপ অঙ্গহানি হত না—সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। উভয়ের প্রস্থানভূমি এক হলেও, কর্ম্মমার্গে এবং ত্যাগমার্গে প্রভেদ বিস্তর, সুতরাং বেদধর্ম্ম এবং বাহ্যধর্ম্ম যে পরস্পর পরস্পরের শত্রু হয়ে উঠেছিল এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। সুতরাং এর একটি হতে অপরটির উদ্ভবের কল্পনা করা যুক্তিসিদ্ধ হবে না।

এই সকল বিভিন্ন ধর্ম্ম-শাস্ত্রের মূল আর যেখানেই নিহিত থাক্, বেদে নেই। সুতরাং শাস্ত্রকারেরা বেদকে কি অর্থে স্মৃতির মূলস্বরূপে স্বীকার করেন তাও একটু খুঁটিয়ে দেখা দরকার।

(৬)

"মূল" শব্দ দ্ব্যর্থবাচক। ধর্ম্মের মূল কোথায় এ প্রশ্ন ঐতিহাসিকও জিজ্ঞাসা করেন, দার্শনিকও জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু

এ উভয়ের জিজ্ঞাস্য-বিষয় সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ঐতিহাসিক, ধর্ম্মের মূল অনুসন্ধান করেন দেশে ও কালে; দার্শনিক সে মূল অনুসন্ধান করেন দেশকালের অতিরিক্ত কোনও পদার্থে। কোনও একটি বিশেষ ধর্ম্ম কোন্ যুগে কোন্ দেশে কোন্ জাতির অন্তরে আবির্ভূত হয়েছিল,—কোন্ পূর্ব্বমত হতে তা উদ্ভূত—এই হচ্ছে ঐতিহাসিকের জিজ্ঞাস্য বিষয়, অপর পক্ষে ধর্ম্মের মূল মানবের হৃদয়ে কি সমাজে, আগমে. কি আপ্তবাকে নিহিত—এই হচ্ছে দার্শনিকের জিজ্ঞাস্য বিষয়।

শাস্ত্রীমহাশয়েরা আজ যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছেন—সে হচ্ছে ঐতিহাসিক প্রশ্ন এবং শাস্ত্রকারেরা যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন সে হচ্ছে দার্শনিক প্রশ্ন।

খৃষ্ট-ধর্ম্মের মূল যে বাইবেল, এ ত ঐতিহাসিক সত্য। এ সত্য যার খুসি তিনিই যখন খুসি তখনই প্রত্যক্ষ করতে পারেন। কিন্তু স্মৃতি যে, বেদমূলক, তা উক্ত জাতীয় সত্য নয়। কেননা প্রত্যক্ষ-বেদে যে সে মূল দৃষ্ট হয় না এ কথা মীমাংসকেরাও স্বীকার করেন। এ কথা স্বীকার করতে তাঁদের বিন্দুমাত্রও আপত্তি ছিল না, কেননা তাঁদের মতে ধর্ম্মের মূল কস্মিনকালেও প্রত্যক্ষ হতে পারে না। মেধাতিথি বলেন,—

"পূর্ব্বপক্ষের মতে অননুভূত বস্তুর স্মরণ উপপত্তি হয় না। কোনরূপ প্রমাণের দ্বারা অনুভব না করিয়াও মনুপ্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, কবিগণ যেরূপ কেবলমাত্র কল্পনার সাহায্যে কথাবস্তু উৎপাদন করিয়া কহিয়া থাকেন। ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে, এরূপ হইবার সম্ভাবনা থাকিত যদি না স্মৃতিতে কর্ত্তব্যতার উপদেশ দেওয়া হইত। অনুষ্ঠানার্থই কর্ত্তব্যতার উপদেশ দেওয়া হয়। এমন কোনও ব্যক্তি নাই, যিনি নিজের ইচ্ছা এবং নিজের

বুদ্ধির সাহায্যে ব্যবহারিক অনুষ্ঠান সকল নির্ম্মাণ করিতে পারেন। আর যদি ইহাই হয় যে ভ্রান্ত অনুষ্ঠানসকল সিদ্ধিলাভ করিতে পারে তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যাবৎ সংসার তাবৎ একের ভ্রান্তি জগৎকে ভ্রান্ত করিয়া রাখিবে। এ কল্পনা অলৌকিকী। অতএব মনুপ্রভৃতির শাস্ত্র যে বেদমূলক, সে বিষয়ে ভ্রান্তির কোন অবসর নাই। মন্বাদি, ধর্ম্মের যে সাক্ষাদ্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত। ইন্দ্রিয়ের সহিত পদার্থের সন্নিকর্ষজ যে জ্ঞান তাহাই প্রত্যক্ষ জ্ঞান। ধর্ম্ম কখনও ইন্দ্রিয় গোচর হইতে পারে না, কেননা তাহা কর্ত্তব্যতা-স্বভাব। সেই কারণে বেদকে কর্ত্তব্যতা-স্মরণের অনুরূপ কারণস্বরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। সে বেদ অনুমানের দ্বারাই মনুপ্রভৃতির উপলব্ধ হইয়াছিল। বেদের যে শাখা স্মার্ত্ত ধর্ম্মের আশ্রয় সে শাখা ইদানীং উৎসন্ন হইয়াছে।”

সুতরাং দেখা গেল যে, মীমাংসকদের মতে বেদ যে স্মৃতির মূল এও কল্পনামাত্র। তা ছাড়া বেদকে সামান্য-ধর্ম্মের (morality) মূলস্বরূপেই কল্পনা করা হয়েছে, বিশেষ ধর্ম্মের নয়। মেধাতিথি বলেন,—“বিশেষনির্দ্ধারণে তু ন কিঞ্চিৎ প্রমাণাং ন চ প্রয়োজনম্”।

সুতরাং বেদে ভারতবর্ষের সকল ধর্ম্মের মূল অনুসন্ধান করতে গেলে শুধু বাহ্যধর্ম্মের নয়, বৈদিক ধর্ম্মেরও বিশেষত্ব উপেক্ষা করা হয়। বস্তুর বিশেষ জ্ঞানের নামই বিজ্ঞান। সুতরাং এ সকল ধর্ম্মের ভিতর যা সর্ব্বসামান্য কেবলমাত্র তার প্রতি মনোযোগ দেওয়াতে আমাদের অতীতের জ্ঞান এক পদও অগ্রসর হয় না।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা উক্ত পদ্ধতি অনুসারে বেদ এবং বাহ্যধর্ম্মের সমন্বয় করা অতি গর্হিত কার্য্য বলে মনে করতেন। ধর্ম্মের সঙ্গে বেদান্তের, ব্রাহ্মণের সঙ্গে বৈষ্ণবের, শৈবের সঙ্গে বৌদ্ধের এবং চার্ব্বাকের সঙ্গে মীমাংসকের সমন্বয় করা এ যুগের

ধর্ম্ম ;—সেকালের ধর্ম্ম, বিরোধের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল। যাগ-যজ্ঞাদির প্রতি বাহ্যধর্ম্মের যেরূপ অশ্রদ্ধা ছিল চৈত্যবন্দনাদির প্রতি বেদধর্ম্মের তদপেক্ষা বেশি অশ্রদ্ধা ছিল। অনেকের বিশ্বাস যে ভগবদ্গীতায় সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় করা হয়েছিল কিন্তু এ ধারণা ভুল। কেননা "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ো পরোধর্ম্ম ভয়াবহ" —এ হচ্ছে গীতারই বচন। গীতাকারের মতে সমাজের পক্ষে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তির চাইতে আর বেশি বিপত্তি নেই। অসবর্ণ বিবাহ কি সমাজে কি মনোরাজ্যে ব্রাহ্মণদের মতে সমান জঘন্য ও হেয় ছিল। সুতরাং পুরাকালে কোনও সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়কারী জন্মগ্রহণ করলে ব্রাহ্মণেরা বেণ রাজার প্রতি যে ব্যবহার করেছিলেন তাঁর প্রতিও ঠিক সেই ব্যবহার করতেন। তবে যে প্রাচীন ভারতের সকল ধর্ম্ম মিলেমিশে খিঁচুড়ি পাকিয়ে নবীন হিন্দুধর্ম্মে পরিণত হয়েছে—তার কারণ পূর্ব্বাচার্য্যেরা সহস্র চেষ্টাতেও যেমন আর্য্য-অনার্য্যজাতির রক্তের মিশ্রণ বন্ধ করতে পারেন নি, তেমনি বেদ ও বাহ্য ধর্ম্মের মিশ্রণও বন্ধ করতে পারেন নি।

সুতরাং দেখা গেল যে বেদপন্থীরা যে কারণে স্বধর্ম্মের বেদ-মূলত্ব স্বীকার করেন—সে হচ্ছে theoretical,—historical নয়। তাঁরা স্পষ্ট বলেছেন যে, এ মূল "ন স্থিতি হেতুতয়া বৃক্ষস্যেব।"

আমরা যা খুঁজি তা হচ্ছে ধর্ম্মবৃক্ষের শিকড়। সে শিকড় সেকালে যখন বেদধর্ম্মে খুঁজে পাওয়া যাইনি তখন একালে যে পাওয়া যাবে সে সম্ভাবনা অতি অল্প।

মেধাতিথি বলেছেন—"বাহ্যধর্ম্মসকলের স্মৃতিপরম্পরায় মূলান্তরও প্রাপ্ত হওয়া যায়"—কিন্তু সেই অপর মূল সকল যে কি, তা

তিনি স্পষ্ট করে বলেন নি, তবে তাঁর কথার ভাবে বোঝা যায় যে তিনি বাহ্যধর্ম্মের প্রবর্ত্তক-পুরুষদেরই নিজ নিজ ধর্ম্মমতের মূলস্বরূপে গ্রাহ্য করেছিলেন।

আমরা তাঁদের পিছনেও যেতে চাই, এবং বুদ্ধপ্রভৃতির মত আর্য্যমত কি না বিশেষ করে তাই জান্‌তে চাই।

আর্য্য শব্দ যদি Aryan শব্দের প্রতিবাক্য হয় তাহলে বৌদ্ধ জৈন এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মকেও আর্য্যধর্ম্ম বলে স্বীকার কর্‌বার পক্ষে আমি কোনরূপ বাধা দেখ্‌তে পাইনে। Aryan শব্দ জাতিবাচক এবং অতি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে অর্থে সমগ্র ইউরোপ আর্য্য, সে অর্থে বুদ্ধ মহাবীর বাসুদেবও আর্য্য। বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন শাক্যকুলে, মহাবীর জ্ঞাতৃক কুলে, এবং বাসুদেব যদুকুলে। এ সকল কুলই (clan) আর্য্যকুল। এ সত্য বেদ-পন্থীরাও স্বীকার করেছেন, কেননা তাঁরা এঁদের ক্ষত্রিয় অর্থাৎ দ্বিজ বলেই উল্লেখ করেন। তবে যে তাঁরা এঁদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম বাহ্যধর্ম্ম নামে অভিহিত করেন তার কারণ এই যে, যে আর্য্য-কুল হতে বৈদিক ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়, সে একটি স্বতন্ত্র কুল।

সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী এই দুই দেব নদীর অভ্যন্তরে যে দেশ অবস্থিত তার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। এবং তৎপার্শ্বস্থিত কুরুক্ষেত্র মৎস্য পাঞ্চাল এবং শূরসেন এই চারটি ব্রহ্মর্ষিদেশ। ভারতবর্ষের এই ভূভাগে যে আর্য্যকুল বাস কর্‌তেন সেই কুলেরই পারম্পর্য্য-ক্রমাগত যে আচার শাস্ত্রকারদের মতে তাই সদাচার। এই আর্য্যদের কুলাচারই শাস্ত্রমতে আর্য্যধর্ম্ম। এ অর্থে অবশ্য বৌদ্ধ জৈন এবং বৈষ্ণবধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম নয়, কেননা বৃষ্ণিকুল, জ্ঞাতৃককুল

এবং শাক্যকুলের বাসস্থান ব্রহ্মাবর্ত্ত এবং ব্রহ্মর্ষিদেশের বহির্ভূত দেশ। কিন্তু সে সকল দেশ ত শাস্ত্রমতে আর্য্যদেশ। মনু বলেন, যে দেশের পূর্ব্বে এবং পশ্চিমে সমুদ্র, উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে বিন্ধ্যপর্ব্বত সেই সমগ্র দেশের নাম আর্য্যাবর্ত্ত। মেধাতিথি বলেন যে "আর্য্যা বর্ত্তন্তে তত্র" "এবং ম্লেচ্ছেরা পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়াও সে দেশে চিরস্থায়ী হইতে পারে না"—এই কারণেই এ দেশের নাম আর্য্যাবর্ত্ত। তাঁর মতে দেশের নাম থেকে জাতির নাম হয় না; জাতির নাম থেকেই দেশের নাম-করণ হয়।

ভারতবর্ষের উত্তরাপথে, যে সকল আর্য্যকুল বাস করতেন— তাঁদের মধ্যে পরস্পরের ভাষার যেমন ঐক্য ছিল, মনোভাবেরও তেমনি ঐক্য ছিল। এঁরাই ভারতবর্ষে আর্য্যসভ্যতা স্থাপন করেন, এবং সেই আর্য্যসভ্যতাই এ-দেশের সকল প্রাচীন ধর্ম্মমতের মূল। এই সকল বিভিন্নকুলের আধ্যাত্মিক মনোভাবের যে পার্থক্য ছিল সম্ভবতঃ সেই পার্থক্য হতেই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মের আবির্ভাব হয়েছে। বুদ্ধ মহাবীরপ্রভৃতিকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসকলের মূল যে তাঁদের নিজ নিজ কুলধর্ম্মে নিহিত ছিল এরূপ অনুমান করবার বৈধ কারণ আছে। এই উভয় ধর্ম্মমতে শাক্যসিংহের পূর্ব্বে অপর বুদ্ধ এবং মহাবীরের পূর্ব্বে অপর তীর্থঙ্কর ছিল। এতেই প্রমাণ হয় যে এ-সকল ধর্ম্মমত অতি প্রাচীন ধর্ম্মমত, বুদ্ধাদির হাতে তা শুধু সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল। যে আর্য্যকুল আদিতে ব্রহ্মাবর্ত্তেই উপনিবেশ স্থাপন করেন তাঁরা স্বীয় কুলধর্ম্মকেই আর্য্যধর্ম্ম বলে প্রচার করেছিলেন। আর্য্য শব্দের এই সঙ্কীর্ণ অর্থে শাক্য ক্ষপণকাদির ধর্ম্ম অবশ্য বাহ্যধর্ম্ম কিন্তু সে সকল ধর্ম্মমত Non-Aryan নয়।

(৭)

একদলের আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, শাক্যসাত্বতাদি কুল আর্য্যবংশীয় নয়। কিন্তু এ মত যে সত্য তার কোনও অকাট্য প্রমাণ নেই। এস্থলে Ethnology নামক উপ-বিজ্ঞানের আলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হবে। তবে এইটুকু বলে রাখা দরকার যে Ethnologist-দের হাত এখন আমাদের মাথা থেকে নেমে নাকের উপর এসে পড়েছে, সম্ভবতঃ পরে দাঁতে গিয়ে ঠেক্‌বে। যাঁরা মস্তকের পরিমাণ থেকে মানবের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব এবং হীনত্ব নির্ণয় কর্‌তেন তাঁদের মস্তিষ্কের পরিমাণ যে স্বল্প ছিল—এ সত্য Ethnologist-রাই প্রমাণ করেছেন। এখন এঁদের বিজ্ঞানের প্রাণ নাসিকাগত হয়েচে। কিন্তু সে প্রাণ যতদিন না ওষ্ঠাগত হয় ততদিন এঁরা শাক্যসিংহের জাতি নির্ণয় কর্‌তে পারবেন না। কেননা বুদ্ধদেবের দন্ত রক্ষিত হয়েছে, নাসিকা হয় নি। ইতিমধ্যে আমরা আমাদের শাস্ত্রের উপর নির্ভর করে মহাবীর, বাসুদেব, বুদ্ধদেব প্রভৃতিকে আর্য্য বলে গ্রাহ্য কর্‌তে বাধ্য। এঁদের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমতসকল আর যেখান থেকেই হোক শূদ্রবুদ্ধি অর্থাৎ ক্ষুদ্রবুদ্ধি থেকে উৎপন্ন হয়নি। অতএব এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে যে, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মত এ-হিসেবে সত্য যে, বাহ্যধর্ম্মসকল বৈদিকধর্ম্ম হতে উৎপন্ন হয়নি; অপর পক্ষে শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রীমহাশয়ের মতও এই হিসেবে সত্য যে, এ সকল ধর্ম্মমত Non-Aryan নয়। এর চাইতে বেশি কিছু জোর করে বলা চলে না। ইতি—

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

শিক্ষার নব আদর্শ

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরমহাশয় যে এ দেশের চল্‌তি শিক্ষার দর যাচাই কর্‌তে উদ্যত হয়েছেন এ অতি সুখের কথা। কেননা বাঙ্গালী যদি কোনও বস্তু লাভ কর্‌বার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ত সে হচ্ছে শিক্ষা—সুতরাং আমরা দেশসুদ্ধ ভদ্রসন্তান প্রাণপাত করে যা পাই, জহুরির কাছে তার মূল্য যে কি তা জানায় ক্ষতি নেই।

আমরা যে কত শিক্ষালোভী তার প্রমাণ আমাদের পাঁচ বৎসর বয়েসে হাতে-খড়ি হয়। আর কম্‌সে-কম্‌ একুশ বৎসর বয়েসে হাতে-কালি, মুখে-কালি আমরা সেনেট-হাউস থেকে লিখে আসি। কিন্তু এতেও আমাদের শিক্ষার সাধ মেটে না। এর পরে আমরা সারাজীবন যখন যা-কিছু পড়ি—তা কবিতাই হোক আর গল্পই হোক—আমাদের মনে স্বতঃই এই প্রশ্নের উদয় হয় যে আমরা এ পড়ে কি শিক্ষা লাভ করলুম? এ প্রশ্নের উত্তর মুখে-মুখে দেওয়া অসম্ভব, কেননা সাহিত্যের যা শিক্ষা তা হাতে-হাতে পাওয়া যায় না। সাহিত্য যা দেয় তা আনন্দ; কিন্তু ও-বস্তু আমরা জানিনে বলে মানিনে। আমাদের শিক্ষার ভিতর আনন্দ নেই বলে, আনন্দের ভিতর যে শিক্ষা থাক্‌তে পারে তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

ফলে পাঠকমাত্রই যখন শিক্ষার্থী তখন লেখকমাত্রকেই দায়ে-পড়ে শিক্ষক হতে হয়। পাঠক-সমাজ যখন আমাদের কাছে শিক্ষা নিতে প্রস্তুত তখন অবশ্য শিক্ষা দিতে আমাদের নারাজ হওয়া উচিত নয়;—কেননা লেকচার জিনিষটে দেওয়া সহজ, শোনাই কঠিন। তবে যে আমরা পাঠকদের সকল-সময় শিক্ষা

না দিয়ে সময়-সময় আনন্দ দেবার বৃথাচেষ্টা করে তাঁদের বিরাগভাজন হই তার একটি বিশেষ কারণ আছে।

বাঙ্গলা-সাহিত্যের যে শুধু পাঠক আছেন তা নয়, পাঠিকাও আছেন। দলে বোধ হয় উভয়েই সমান পুরু হবেন—অথচ এ উভয়ের ভিতর বিদ্যার প্রভেদ বিস্তর। পাঠকেরা-সব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ, পাঠিকারা বালিকা-বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণাও নন্। সুতরাং পাঠকদের জন্য লেখকদের post graduate লেক্‌চার দেওয়া কর্ত্তব্য এবং পাঠিকাদের জন্য নিম্ন প্রাইমারির। অথচ শ্রোতাদের শিক্ষা দিতে হলে আমাদের পক্ষে সেইরূপ বক্তৃতা করা আবশ্যক—যা সকলের পক্ষে সমান উপযোগী হয়। অসাধ্য সাধন কর্‌বার দুঃসাহস সকলের নেই, সম্ভবতঃ সেই কারণে বাঙ্গলার কাব্য-সাহিত্য শিক্ষাদানের ভার হাতে নেয়নি।

কিন্তু এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের পক্ষে সমান শিক্ষাপ্রদ সাহিত্য যে রচনা করা যায় না—এ ধারণা অমূলক। উপর উপর দেখলেই এ দেশের শিক্ষিত লোক এবং অশিক্ষিত স্ত্রীলোকের বিদ্যাবুদ্ধির প্রভেদ মস্ত দেখায়—কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই দেখা যায় যে, আমরা মনে সকলেই এক। মনোরাজ্যে যে আমাদের লিঙ্গভেদ নেই, বর্ণভেদ নেই, বয়োভেদ নেই তার প্রমাণ হাতে-কলমে দেখানো যেতে পারে। "ঘরে-বাইরে" লেখ্‌বার কৈফিয়ৎ তলব করে একটি ভদ্রমহিলা রবীন্দ্রনাথকে যে পত্র লিখেছিলেন্ তা যে-কোনও এম্-এ-পাস-করা প্রোফেসর লিখতে পারতেন—এবং উক্ত গল্প পাঠ করে একটি এম্-এ-পাস-করা প্রোফেসরের মনে যে সমস্যার উদয় হয়েছে তা যে কোনও ভদ্রমহিলার মনে

উদয় হ'তে পারত—অতএব যে-কোনও শিকারী সাহিত্যিক একটি বাক্যবাণে এ দুটি পাখীকেই বিদ্ধ করতে পারেন। বস্তুগত্যা আমাদের মন হচ্ছে হরীতকী জাতীয়; শিক্ষার গুণে সে মন পাকে না,—শুধু শুকিয়ে যায়। সুতরাং বাঙ্গলার অশিক্ষিত স্ত্রীলোক ও শিক্ষিত পুরুষ,—এ দুয়ের মনের ভিতর প্রভেদ এই যে, এর একটি কাঁচা আর অপরটি শুক্নো। দেশসুদ্ধ লোক সেই শিক্ষা চান যে-শিক্ষার গুণে স্ত্রীপুরুষ সকলের মন সমান শুকিয়ে ওঠে। কেননা হরীতকী যত বেশি শুকোয়, যত বেশি তিতো হয় তত বেশি তা উপকারী হয়। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ সেই শিক্ষার সন্ধানে ফিরছেন যে শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মন-হরীতকী পেকে উঠবে এবং যার আস্বাদ গ্রহণ করে স্বজাতি অমরত্ব লাভ করবে। এ ক্ষেত্রে দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মতের মিল হবার কোনও সম্ভাবনা নেই—কেননা উভয়ের আদর্শ সম্পূর্ণ বিভিন্ন।

আমাদের পক্ষে কি শিক্ষা ভাল তা নির্ণয় করবার পূর্ব্বে আমরা কি হতে চাই সে বিষয়ে মনস্থির করা আবশ্যক;—কেননা একটা স্পষ্ট জাতীয় আদর্শ না থাকলে, জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে না। ধরুন যদি অশ্বত্ব-লাভ-করা গর্দ্দভদের জাতীয় আদর্শ করে তোলা যায়, তাহলে অবশ্য সে জাতির শিক্ষকেরা তাদের জন্য পেটলের ব্যবস্থা করবেন—অপর পক্ষে গর্দ্দভত্ব লাভ করা যদি অশ্বদের জাতীয় আদর্শ করে তোলা যায় তাহলে সে জাতির শিক্ষকেরাও তাদের জন্য ঐ পেটলেরই ব্যবস্থা করবেন। হয় গাধা-পিটে-ঘোড়া, নয় ঘোড়া-পিটে-গাধা করাই যে শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য সাধারণতঃ এইটেই হচ্ছে লোকের ধারণা। এবং

আমরা এই উভয়ের মধ্যে যে কোন্ জাতীয় সে বিষয়ে দেশে-বিদেশে বিষম মতভেদ থাকলেও—পেটল দেওয়াটাই যে শিক্ষা দেবার একমাত্র পদ্ধতি সে-বিষয়ে বিশেষ কোন মতভেদ নেই। কাজেই আমাদের শিক্ষকেরা একহাতে সংস্কৃত, আর-একহাতে ইংরেজি ধরে আমাদের উপর দুহাতে চাবুক চালাচ্ছেন। এর ফলে কত গাধা ঘোড়া এবং কত ঘোড়া গাধা হচ্ছে—তা বলা কঠিন; কেননা এ বিষয়ের কোনও Statistics অদ্যাবধি সংগ্রহ করা হয়নি।

সে যাই হোক, যে-জাতীয় আদর্শের উপর জাতীয়শিক্ষা নির্ভর করে, তা যুগপৎ মনের এবং জীবনের আদর্শ হওয়া দরকার। যে দেশে জাতীয়শিক্ষা আছে সে দেশের প্রতি ঈষৎ দৃষ্টিপাত করলেই এ সত্য সকলের কাছেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে। ইউরোপে আমরা দেখতে পাই যে, জর্ম্মাণি চেয়েছিল—"যা নই তাই হব" ইংলণ্ড—"যা আছি তাই থাকব" আর ফ্রান্স—"যা আছি তাও থাকব না, যা নই তাও হব না" এবং এই তিন দেশের গত পঞ্চাশ বৎসবের কাজ ও কথার ভিতর নিজ নিজ জাতীয় আদর্শের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে।

কিন্তু আমাদের বিশেষত্ব এই যে, আমরা জীবনে এক পথে চল্‌তে চাই—মনে আর-এক পথে।

আমাদের ব্যক্তিগত মনের আদর্শ হচ্চে—"যা ছিলুম তাই হওয়া" আর আমাদের জাতিগত জীবনের আদর্শ হচ্ছে—"যা ছিলুমনা তাই হওয়া"। ফলে আমাদের সামাজিক বুদ্ধির মুখ প্রাচীন ভারতবর্ষের দিকে আর আমাদের রাষ্ট্রীয় বুদ্ধির মুখ নবীন ইউরোপের

দিকে। এই আদর্শের উভয়-সঙ্কটে পড়ে, আমরা শিক্ষার একটা সুপথ ধরতে পাচ্ছিনে,—স্কুলেও নয়, সাহিত্যেও নয়।

একজন ইংরেজ দার্শনিক বলেছেন যে সমস্যাটা যে কোথায় ও তা কি সেইটে ধরাই কঠিন, তার মীমাংসা করা সহজ। এ কথা সত্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ তাই "ঘরে-বাইরে" আমাদের জাতীয় সমস্যার ছবি এঁকেছেন, কেননা—ও-উপন্যাসখানি একটি রূপক-কাব্য ছাড়া আর কিছুই নয়। নিখিলেশ হচ্ছেন প্রাচীন ভারতবর্ষ, সন্দীপ নবীন ইউরোপ আর বিমলা—বর্ত্তমান ভারত। এই দোটানার ভিতর পড়েই বিমলা বেচারা নাস্তানাবুদ হচ্ছে, মুক্তির পথ যে কোন্‌দিকে তা সে খুঁজে পাচ্ছে না। এরূপ অবস্থায় এক সৎশিক্ষা ব্যতীত তার উদ্ধারের উপায়ান্তর নেই। অতএব এ ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে শিক্ষার একটি আদর্শ খুঁজে-পেতে বার করা দরকার।

আমি বহু গবেষণার ফলেও সে আদর্শ আজও আবিষ্কার করতে পারিনি, সুতরাং সে আদর্শ নিজেই আমি গড়তে বাধ্য হয়েছি। আমি স্বজাতিকে অনুরোধ করি যে, আমার এই গড়া আদর্শ যেন বিনা পরীক্ষায় পরিহার না করেন।

শ্রীমতী লীলা মিত্র নামক জনৈক ভদ্রমহিলা "সবুজ পত্রে" এই মত প্রকাশ করেন যে, এদেশে স্ত্রীশিক্ষার আদর্শ ভুল। সুতরাং তার পদ্ধতিও নিরর্থক। তাঁর মতে আমরা স্ত্রীজাতিকে সেই শিক্ষা দিতে চাই, যাতে তারা পুরুষজাতির কাজে লাগে সুতরাং সে শিক্ষা নিষ্ফল। এ কথা সম্ভবতঃ সত্য। তিনি চান যে স্ত্রীজাতি নিজের শিক্ষার ভার নিজ-হস্তে গ্রহণ করেন—এ হলে তো আমরা বাঁচি।

আমাদের মেয়েরা যদি নিজের বিবাহের ভার নিজের হাতে নেন তাহ'লে দেশসুদ্ধ লোক যেমন কন্যাদায় হতে অগ্নি নিষ্কৃতি লাভ করে তেমনি মা-লক্ষ্মীরা যদি নিজগুণে মা-সরস্বতী হয়ে ওঠেন তাহলে স্ত্রীশিক্ষার সমস্যা আমাদের আর মীমাংসা করতে হয় না।

সে যাই হোক, আমি বলি পুরুষজাতিকে সেই শিক্ষা দেওয়া হোক যাতে তারা স্ত্রীজাতির কাজে লাগে। শিক্ষার এ আদর্শ কোনকালে কোনদেশে ছিল না বলেই আমাদের পক্ষে তা গ্রাহ্য করা উচিত। পুরুষজাতি যদি এই আদর্শে শিক্ষিত হয় তাহলে আর-কিছু না হোক, পৃথিবীর মারামারি কাটাকাটি সব থেমে যাবে। নিখিলেশ ও সন্দীপ যদি বিমলাকে নিজের নিজের কাজে লাগাতে চেষ্টা না কোরে—নিজেদের বিমলার কাজে লাগাতে চেষ্টা করতেন তাহলে গোল ত সব মিটেই যেত। অতএব আমরা যাতে বিমলার কাজে লাগি সেই রকম আমাদের শিক্ষা হওয়া কর্ত্তব্য।

বীরবল।

সবুজ পত্র

রূপ

বিশ্বের বিপুল বস্তুরাশি
উঠে অট্টহাসি'
ধূলা বালি
দিয়ে করতালি
নিত্য নিত্য
করে নৃত্য
দিকে দিকে দলে দলে ;
আকাশে শিশুর মত অবিরত কোলাহলে।

মানুষের লক্ষ লক্ষ অলক্ষ্য ভাবনা,
অসংখ্য কামনা,
রূপে মত্ত বস্তুর আহ্বানে উঠে মাতি'
তাদের খেলায় হতে সাথী।
স্বপ্ন যত অব্যক্ত আকুল
খুঁজে মরে কূল ;

অস্পষ্টের অতল প্রবাহে পড়ি
চায় এরা প্রাণপণে ধরণীরে ধরিতে আঁকড়ি'
কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-সুদৃঢ় মুষ্টিতে,
ক্ষণকাল মাটিতে তিষ্ঠিতে।
চিত্তের কঠিন চেষ্টা বস্তুরূপে
স্তূপে স্তূপে
উঠিতেছে ভরি',—
সেই ত নগরী।
সে ত শুধু নহে পথ ঘর,
নহে শুধু ইষ্টক প্রস্তর।

অতীতের গৃহছাড়া কত যে অশ্রুত বাণী
শূন্যে শূন্যে করে কানাকানি;
খোঁজে তারা আমার বাণীরে
লোকালয় তীরে তীরে।
আলোক-তীর্থের পথে আলোহীন সেই যাত্রিদল
চলিয়াছে অশ্রান্ত চঞ্চল।
তাদের নীরব কোলাহলে
অস্ফুট ভাবনা যত দলে দলে ছুটে চলে
মোর চিত্তগুহা ছাড়ি,
দেয় পাড়ি
অদৃশ্যের অন্ধ মরু, ব্যগ্র ঊর্দ্ধশ্বাসে,
আকারের অসহ্য পিয়াসে।

কি জানি কে তারা কবে
কোথা পার হবে
যুগান্তরে,
দূর সৃষ্টি পরে
পাবে আপনার রূপ অপূর্ব্ব আলোতে।
আজ তারা কোথা হতে
মেলেছিল ডানা
সেদিন তা রহিবে অজানা।
অকস্মাৎ পাবে তারে কোন্ কবি,
বাঁধিবে তাহারে কোন্ ছবি,
গাঁথিবে তাহারে কোন্ হর্ম্ম্যচূড়ে,
সেই রাজপুরে
আজি যার কোনো দেশে কোনো চিহ্ন নাই।
তার তরে কোথা রচে ঠাঁই
অরচিত দূর যজ্ঞভূমে ?
কামানের ধূমে
কোন্ ভাবী ভীষণ সংগ্রাম
রণশৃঙ্গে আহ্বান করিছে তার নাম !

২৭ পৌষ ১৩২১
সুরুল

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঘরে-বাইরে

বিমলার আত্মকথা

অমূল্যর জন্যে নিজের হাতে খাবার তৈরী করতে বসেছিলুম এমন সময় মেজরাণী এসে বল্লেন, কিলো ছুটু, নিজের জন্মতিথিতে নিজেকেই খাওয়াবার উজ্জুগ হচ্চে বুঝি ?

আমি বল্লুম, নিজেকে ছাড়া আর কাউকে খাওয়াবার নেই না কি ?

মেজরাণী বল্লেন, আজ ত তোর খাওয়াবার কথা নয় আমরা খাওয়াব। সেই জোগাড়ও ত করছিলুম, এমন সময় খবর শুনে পিলে চমকে গেছে—আমাদের কোন্ কাছারিতে না কি পাঁচ-ছশো ডাকাত পড়ে ছ হাজার টাকা লুটে নিয়েচে। লোকে বল্‌চে এইবার তারা আমাদের বাড়ি লুট করতে আস্‌বে।

এই খবর শুনে আমার মনটা হাল্কা হল। এ তবে আমাদেরি টাকা! এখনি অমূল্যকে ডাকিয়ে বলি, এই ছ হাজার টাকা এইখানেই আমার সাম্‌নে আমার স্বামীর হাতে সে ফিরিয়ে দিক্ তার পরে আমার যা বল্‌বার সে আমি তাঁকে বল্‌ব!

মেজরাণী আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করে বল্লেন, অবাক্ করলে! তোর মনে একটুও ভয় ডর নেই ?

আমি বল্লুম, আমাদের বাড়ি লুট করতে আস্‌বে এ আমি বিশ্বাস করতে পারি নে!

বিশ্বাস করতে পার না! কাছারি লুঠ করবে এইটেই বা বিশ্বাস করতে কে পারত।

কোনো জবাব না দিয়ে মাথা নীচু করে পুলিপিঠের মধ্যে নারকেলের পূর দিতে লাগলুম। আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে তিনি বল্লেন, যাই, ঠাকুরপোকে ডেকে পাঠাই, আমাদের সেই ছ হাজার টাকাটা এখনি বের করে নিয়ে কলকাতায় পাঠাতে হবে, আর দেরি করা নয়।

এই বলে তিনি চলে যেতেই আমি পিঠের বারকোস্ সেইখানে আল্‌গা ফেলে রেখে তাড়াতাড়ি সেই লোহার সিন্ধুকের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলুম। আমার স্বামীর এমনি ভোলামন যে দেখি তাঁর যে-কাপড়ের পকেটে চাবি থাকে সে-কাপড়টা তখনো আল্‌নায় ঝুল্‌চে। চাবির রিং থেকে লোহার সিন্ধুকের চাবিটা খুলে আমার জ্যাকেটের মধ্যে লুকিয়ে ফেল্লুম।

এমন সময় বাইরে থেকে দরজায় ধাক্কা পড়ল। বল্লুম, কাপড় ছাড়চি।—শুন্‌তে পেলুম, মেজরাণী বল্লেন, এই কিছু আগে দেখি পিঠে তৈরি করচে, আবার এখনি সাজ করবার ধুম পড়ে গেল! কত লীলাই যে দেখ্‌ব! আজ বুঝি ওদের বন্দেমাতরমের বৈঠক বস্‌বে। ওলো, ও দেবীচৌধুরাণী, লুঠের মাল বোঝাই হচ্চে না কি?

কি মনে করে' একবার আস্তে আস্তে লোহার সিন্ধুকটা খুল্‌লুম। বোধ হয় মনে ভাবছিলুম, যদি সমস্তটা স্বপ্ন হয়;—যদি হঠাৎ সেই ছোট দেরাজটা টেনে খুল্‌তেই দেখি সেই কাগজের মোড়কগুলি ঠিক তেমনিই সাজানো রয়েচে! হায় রে, বিশ্বাসঘাতকের নষ্ট বিশ্বাসের মতই সব শূন্য!

মিছামিছি কাপড় ছাড়তেই হল। কোনো দরকার নেই তবু

নতুন করে চুল বাঁধলুম। মেজরাণীর সঙ্গে দেখা হতেই তিনি যখন জিজ্ঞাসা করলেন, বলি এত সাজ কিসের?—আমি বল্লুম, জন্মতিথির!

মেজরাণী হেসে বল্লেন, একটা কিছু ছুতো পেলেই অম্‌নি সাজ! ঢের দেখেছি, তোর মত এমন ভাবুনে দেখি নি!

অমূল্যকে ডাকবার জন্যে বেহারার খোঁজ করচি এমন সময় সে এসে পেন্সিলে লেখা একটি ছোট চিঠি আমার হাতে দিলে। তাতে অমূল্য লিখচে, দিদি, খেতে ডেকেছিলে কিন্তু সবুর করতে পারলুম না। আগে তোমার আদেশ পালন করে আসি তার পরে তোমার প্রসাদ গ্রহণ করব। হয় ত ফিরে আস্‌তে সন্ধ্যা হবে।

অমূল্য কার হাতে টাকা ফেরাতে চল্‌ল, আবার কোন্ জালের মধ্যে নিজেকে জড়াতে গেল! আমি তাকে তীরের মত কেবল ছুঁড়তেই পারি কিন্তু লক্ষ্য ভুল হলে তাকে আর কোনোমতে ফেরাতে পারি নে।

এই অপরাধের মূলে যে আমি আছি এই কথাটা এখনি স্বীকার করা আমার উচিত ছিল। কিন্তু মেয়েরা সংসারের বিশ্বাসের উপরেই বাস করে, সেই যে তাদের জগৎ। সেই বিশ্বাসকে লুকিয়ে ফাঁকি দিয়েছি এই কথাটা জানিয়ে তার পরে সংসারে টিঁকে থাকা আমাদের পক্ষে বড় কঠিন। যা আমরা ভাঙব ঠিক তার উপরেই যে আমাদের দাঁড়াতে হবে—সেই ভাঙা জিনিসের খোঁচা নড়তে-চড়তে আমাদের প্রতিমুহূর্ত্তেই বাজতে থাক্‌বে। অপরাধ করা শক্ত নয় কিন্তু সেই অপরাধের সংশোধন করা মেয়েদের পক্ষে যত কঠিন এমন আর কারো নয়।

কিছুদিন থেকে আমার স্বামীর সঙ্গে বেশ সহজে কথাবার্ত্তা কওয়ার প্রণালীটা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই হঠাৎ এত বড় একটা কথা কেমন করে এবং কখন্ যে তাঁকে বল্‌ব তা কিছুতেই ভেবে পেলুম না। আজ তিনি অনেক দেরিতে খেতে এসেচেন—তখন বেলা দুটো। অন্যমনস্ক হয়ে কিছুই প্রায় খেতে পারলেন না। আমি যে তাঁকে একটু অনুরোধ করে খেতে বল্‌ব সে অধিকারটুকু খুইয়েচি। মুখ ফিরিয়ে আঁচলে চোখের জল মুছলুম।

একবার ভাবলুম সঙ্কোচ কাটিয়ে বলি, ঘরের মধ্যে একটু বিশ্রাম কর' সে, তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্চে!—একটু কেশে কথাটা যেই তুল্‌তে যাচ্চি এমন সময় বেহারা এসে খবর দিলে দারোগাবাবু কাসেম সর্দ্দারকে নিয়ে এসেচে। আমার স্বামী উদ্বিগ্ন মুখে তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলেন।

তিনি বাইরে যাওয়ার একটু পরেই মেজরাণী এসে বল্লেন, ঠাকুরপো কখন খেতে এলেন আমাকে খবর দিলিনে কেন? আজ তাঁর খাবার দেরি দেখে নাইতে গেলুম,—এরি মধ্যে কখন্—

কেন, কি চাই!

শুন্‌চি তোরা কাল কলকাতায় যাচ্চিস্। তাহলে আমি এখানে থাক্‌তে পারব না। বড়রাণী তাঁর রাধাবল্লভ ঠাকুরকে ছেড়ে কোথাও নড়বেন না। কিন্তু আমি এই ডাকাতির দিনে যে তোমাদের এই শূন্য ঘর আগলে বসে কথায়-কথায় চম্‌কে-চম্‌কে মরব, সে আমি পারব না। কাল যাওয়াই ত ঠিক?

আমি বল্লুম, হাঁ ঠিক।—মনে মনে ভাবলুম, সেই যাওয়ার

আগে এইটুকু সময়ের মধ্যে কত ইতিহাসই যে তৈরি হয়ে উঠবে তার ঠিকানা নেই। তার পরে কলকাতাতেই যাই, কি এখানেই থাকি সব সমান। তার পর থেকে সংসারটা যে কেমন, জীবনটা যে কি, কে জানে! সব ধোঁয়া, স্বপ্ন!

এই যে আমার অদৃষ্ট দৃষ্ট হয়ে উঠল-বলে,' আর কয়েক ঘণ্টা মাত্র আছে—এই সময়টাকে কেউ একদিন থেকে আরেক দিন পর্য্যন্ত সরিয়ে সরিয়ে টেনে টেনে খুব দীর্ঘ করে দিতে পারে না? তাহলে এরি মধ্যে আমি ধীরে ধীরে একবার সমস্তটা যথাসাধ্য সেরে-সুরে নিই—অন্তত এই আঘাতটার জন্য নিজেকে এবং সংসারকে প্রস্তুত করে তুলি। প্রলয়ের বীজ যতক্ষণ মাটির নীচে থাকে ততক্ষণ অনেক সময় নেয়—সে এত সময় যে, মনে হয় ভয়ের বুঝি কোনো কারণ নেই—কিন্তু মাটির উপর একবার যেই এতটুকু অঙ্কুর দেখা দেয় অমনি দেখতে দেখতে বেড়ে ওঠে, তখন তাকে কোনো-মতে আঁচল দিয়ে বুক দিয়ে প্রাণ দিয়ে চাপা দেবার আর সময় পাওয়া যায় না।

মনে করচি কিছুই ভাব্‌ব না, অসাড় হয়ে চুপ করে পড়ে থাকব, তার পরে মাথার উপরে যা এসে পড়ে পড়ুক্‌গে! পশু দিনের মধ্যেই ত যা হবার তা হয়ে যাবে—জানাশোনা, হাসাহাসি, কাঁদাকাটি, প্রশ্ন, প্রশ্নের জবাব, সবই!

কিন্তু অমূল্যর সেই আত্মোৎসর্গের-দীপ্তিতে-সুন্দর বালকের মুখখানি যে কিছুতে ভুল্‌তে পারচি নে। সে ত চুপ করে বসে ভাগ্যের প্রতীক্ষা করে নি—সে যে ছুটে গেল বিপদের মাঝখানে। আমি নারীর অধম তাকে প্রণাম করি,—সে আমার বালক দেবতা,—

সে আমার কলঙ্কের বোঝা একেবারে খেলাচ্ছলে কেড়ে নিতে এসেচে ;—সে আমার মার নিজের মাথায় নিয়ে আমাকে বাঁচাবে, ভগবানের এমন ভয়ানক দয়া আমি সইব কেমন করে ? বাছা আমার, তোমাকে প্রণাম, ভাই আমার, তোমাকে প্রণাম,—নির্ম্মল তুমি, সুন্দর তুমি, বীর তুমি, নির্ভীক তুমি, তোমাকে প্রণাম—জন্মান্তরে তুমি আমার ছেলে হয়ে আমার কোলে এস এই বর আমি কামনা করি।

এর মধ্যে চারদিকে নানা গুজব জেগে উঠচে, পুলিস আনাগোনা করচে, বাড়ির দাসী চাকররা সবাই উদ্বিগ্ন। ক্ষেমা দাসী আমাকে এসে বল্লে, ছোটরাণীমা, আমার এই সোনার পৈঁচে আর বাজুবন্ধ তোমার লোহার সিন্ধুকে তুলে রেখে দাও।—ঘরের ছোটরাণীই দেশ জুড়ে এই দুর্ভাবনার জাল তৈরি করে নিজে তার মধ্যে আট্‌কা পড়ে গেছে একথা বলি কার কাছে ? ক্ষেমার গয়না থাকোর জমানো টাকা আমাকে ভালোমানুষের মত নিতে হল। আমাদের গয়লানী একটা টিনের বাক্সোয় করে একটি বেনারসী কাপড় এবং তার আর-আর দামী সম্পত্তি আমার কাছে রেখে গেল—বল্লে, রাণীমা, এই বেনারসী কাপড় তোমারই বিয়েতে আমি পেয়েছিলুম।

কাল যখন আমারই ঘরের লোহার সিন্ধুক খোলা হবে তখন এই ক্ষেমা, থাকো, গয়লানী—থাক্, সে কথা কল্পনা করে হবে কি ! বরঞ্চ ভাবি, কালকের দিনের পর আর-এক বৎসর কেটে গেছে, আবার আর-একটা তেস্‌রা মাঘের দিন এসেচে। সেদিনও কি আমার সংসারের সব কাটা ঘা এম্‌নি কাটাই থেকে যাবে ?

অমূল্য লিখেচে, সে আজ সন্ধ্যার মধ্যে ফিরবে। ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে একা বসে চুপ করে থাক্‌তে পারি নে। আবার পিঠে তৈরি করতে গেলুম। যা তৈরি হয়েচে তা যথেষ্ট, কিন্তু আরো করতে হবে। এত কে খাবে? বাড়ির সমস্ত দাসী চাকরদের খাইয়ে দেব। আজ রাত্রেই খাওয়াতে হবে। আজ রাত পর্য্যন্ত আমার দিনের সীমা। কালকের দিন আর আমার হাতে নেই।

পিঠের পর পিঠে ভাজ্‌চি, বিশ্রাম নেই। এক-একবার মনে হচ্চে যেন উপরে আমার মহলের দিকে কি-একটা গোলমাল চল্‌চে। হয় ত আমার স্বামী লোহার সিন্ধুক খুল্‌তে এসে চাবি খুঁজে পাচ্চেন না। তাই নিয়ে মেজরাণী দাসী চাকরকে ডেকে একটা তোলপাড় কাণ্ড বাধিয়েচেন। না, আমি শুন্‌ব না, কিচ্ছু শুনব না, দরজা বন্ধ করে থাক্‌ব। দরজা বন্ধ করতে যাচ্চি এমন সময় দেখি থাকো তাড়াতাড়ি আস্‌চে—সে হাঁপিয়ে বল্লে, ছোটরাণীমা! আমি বলে উঠ্‌লুম, যা, যা, বিরক্ত করিস্‌ নে, আমার এখন সময় নেই।—থাকো বল্লে, মেজরাণীমার বোনপো নন্দবাবু কলকাতা থেকে এক কল এনেচেন সে মানুষের মত গান করে, তাই মেজরাণীমা তোমাকে ডাক্‌তে পাঠিয়েচেন।

হাস্‌ব, কি কাঁদব তাই ভাবি! এর মাঝখানেও গ্রামোফোন্‌! তাতে যতবার দম দিচ্চে সেই থিয়েটারের নাকীসুর বেরচ্চে—ওর কোনো ভাবনা নেই। যন্ত্র যখন জীবনের নকল করে তখন তা এম্‌নি বিষম বিদ্রূপ হয়েই ওঠে!

সন্ধ্যা হয়ে গেল। জানি, অমূল্য এলেই আমাকে খবর পাঠাতে

দেরি করবে না—তবু থাক্‌তে পারলুম না—বেহারাকে ডেকে বল্লুম, অমূল্যবাবুকে খবর দাও।—বেহারা খানিকটা ঘুরে এসে বল্লে, অমূল্যবাবু নেই।

কথাটা কিছুই নয়, কিন্তু হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে যেন তোলপাড় করে উঠ্‌ল। অমূল্যবাবু নেই—সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে এ কথাটা যেন কান্নার মত বাজ্‌ল। নেই, সে নেই! সে সূর্য্যাস্তের সোনার রেখাটির মত দেখা দিলে—তার পরে আর সে নেই! সম্ভব অসম্ভব কত দুর্ঘটনার কল্পনাই আমার মাথার মধ্যে জমে উঠতে লাগল। আমিই তাকে মৃত্যুর মধ্যে পাঠিয়েছি, সে যে কোনো ভয় করে নি সে তারই মহত্ত্ব কিন্তু এর পরে আমি বেঁচে থাক্‌ব কেমন করে?

অমূল্যর কোন চিহ্নই আমার কাছে ছিল না—কেবল ছিল তার সেই ভাইফোঁটার প্রণামী—সেই পিস্তলটি। মনে হল এর মধ্যে দৈবের ইঙ্গিত রয়েচে। আমার জীবনের মূলে যে কলঙ্ক লেগেচে, বালক-বেশে আমার নারায়ণ সেটি ঘুচিয়ে দেবার উপায় আমার হাতে রেখে দিয়েই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেচেন। কি ভালোবাসার দান! কি পাবন মন্ত্র তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন!

বাক্স খুলে পিস্তলটি বের করে দুই হাতে তুলে আমার মাথায় ঠেকালুম। ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই আমাদের ঠাকুরবাড়ি থেকে আরতির কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠল। আমি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলুম।

রাত্রে লোকজনদের পিঠে খাওয়ানো গেল। মেজরাণী এসে বল্লেন, নিজে নিজেই খুব ধুম করে জন্মতিথি করে নিলি যাহোক্‌। আমাদের বুঝি কিছু করতে দিবি নে?—এই বলে তিনি তাঁর

সেই গ্রামোফোন্‌টাতে যত রাজ্যের নটীদের মিহি চড়া সুরের দ্রুত তানের কসরৎ শোনাতে লাগলেন; মনে হতে লাগল যেন গন্ধর্ব্বলোকের সুরওয়ালা ঘোড়ার আস্তাবল থেকে চীঁহি চীঁহি শব্দে হ্রেষাধ্বনি উঠচে।

খাওয়ানো শেষ করতে অনেক রাত হয়ে গেল। ইচ্ছা ছিল আজ রাতে আমার স্বামীর পায়ের ধূলো নেব। শোবার ঘরে গিয়ে দেখি তিনি অকাতরে ঘুমচ্চেন। আজ সমস্ত দিন তাঁর অনেক ঘুরাঘুরি অনেক ভাবনা গিয়েচে। খুব সাবধানে মশারি একটুখানি খুলে তাঁর পায়ের কাছে আস্তে আস্তে মাথা রাখলুম। চুলের স্পর্শ লাগ্‌তেই ঘুমের ঘোরে তিনি তাঁর পা দিয়ে আমার মাথাটা একটু ঠেলে দিলেন।

পশ্চিমের বারান্দায় গিয়ে বস্‌লুম। দূরে একটা শিমুল গাছ অন্ধকারে কঙ্কালের মত দাঁড়িয়ে আছে—তার সমস্ত পাতা ঝরে গিয়েছে—তারই পিছনে সপ্তমীর চাঁদ ধীরে ধীরে অস্ত গেল।

আমার হঠাৎ মনে হল আকাশের সমস্ত তারা যেন আমাকে ভয় করচে—রাত্রিবেলাকার এই প্রকাণ্ড জগৎ আমার দিকে যেন আড়চোখে চাইচে। কেননা আমি যে একলা। একলা মানুষের মত এমন সৃষ্টিছাড়া আর কিছুই নেই। যার সমস্ত আত্মীয় স্বজন একে একে মরে গিয়েচে সেও একলা নয়, মৃত্যুর আড়াল থেকেও সে সঙ্গ পায়। কিন্তু যার সমস্ত আপন মানুষ পাশেই রয়েচে তবু কাছে নেই, যে-মানুষ পরিপূর্ণ সংসারের সকল সঙ্গ থেকেই একেবারে খসে' পড়ে' গিয়েছে মনে হয় যেন অন্ধকারে তার মুখের দিকে চাইলে সমস্ত নক্ষত্রলোকের গায়ে

কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমি যেখানে রয়েছি সেইখানেই নেই—যারা আমাকে ঘিরে রয়েছে আমি তাদের কাছে থেকেই দূরে। আমি চল্‌চি ফির্‌চি বেঁচে আছি একটা বিশ্বব্যাপী বিচ্ছেদের উপরে—যেন পদ্মপাতার উপরকার শিশিরবিন্দুর মত।

কিন্তু মানুষ যখন বদ্‌লে যায় তখন তার আগাগোড়া সমস্ত বদল হয় না কেন? হৃদয়ের দিকে তাকালে দেখ্‌তে পাই যা ছিল তা সবই আছে কেবল নড়ে-চড়ে গিয়েচে। যা সাজানো ছিল আজ তা এলোমেলো,—যা কণ্ঠের হারে গাঁথা ছিল আজ তা ধুলোয়। সেই জন্যই ত বুক ফেটে যাচ্চে। ইচ্ছা করে মরি, কিন্তু সবই যে হৃদয়ের মধ্যে বেঁচে আছে—মরার ভিতরে ত শেষ দেখ্‌তে পাচ্চি নে। আমার মনে হচ্চে যেন মরার মধ্যে আরো ভয়ানক কান্না। যা-কিছু চুকিয়ে দেবার তা বাঁচার ভিতর দিয়েই চুকোতে পারি—অন্য উপায় নেই।

এবারকার মত একবার আমাকে মাপ কর, হে আমার প্রভু! যা-কিছুকে তুমি আমার জীবনের ধন বলে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে সে-সমস্তকেই আমি আমার জীবনের বোঝা করে তুলেছি। আজ তা আর বহনও করতে পারচিনে ত্যাগ করতেও পারচিনে। আর-একদিন তুমি আমার ভোর-বেলাকার রাঙা আকাশের ধারে দাঁড়িয়ে যে বাঁশী বাজিয়েছিলে সেই বাঁশীটি বাজাও, সব সমস্যা সহজ হয়ে যাক্‌—তোমার সেই বাঁশীর সুরটি ছাড়া ভাঙাকে কেউ জুড়তে পারে না, অপবিত্রকে কেউ শুভ্র করতে পারে না। সেই বাঁশীর সুরে আমার সংসারকে তুমি নতুন করে সৃষ্টি কর। নইলে আমি আর কোনো উপায় দেখি নে।

মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগ্‌লুম—একটা কোনো-দয়া কোথাও থেকে চাই, একটা কোনো-আশ্রয়, একটু-ক্ষমার আভাস, একটা এমন আশ্বাস যে, সব চুকে যেতেও পারে। মনে মনে বল্লুম, আমি দিন রাত ধর্ন্না দিয়ে পড়ে থাকব প্রভু—আমি খাব না, আমি জল স্পর্শ করব না, যতক্ষণ না তোমার আশীর্ব্বাদ এসে পৌঁছয়।

এমন সময় পায়ের শব্দ শুন্‌লুম। আমার বুকের ভিতরটা দুলে উঠ্‌ল। কে বলে দেবতা দেখা দেন না! আমি মুখ তুলে চাইলুম না পাছে আমার দৃষ্টি তিনি সইতে না পারেন। এস, এস, এস,—তোমার পা আমার মাথায় এসে ঠেকুক্‌, আমার এই বুকের কাঁপনের উপরে এসে দাঁড়াও, প্রভু, আমি এই মুহূর্ত্তেই মরি!

আমার শিয়রের কাছে এসে বস্‌লেন। কে? আমার স্বামী! আমার স্বামীর হৃদয়ের মধ্যে আমার সেই দেবতারই সিংহাসন নড়ে উঠেছে যিনি আমার কান্না আর সইতে পারলেন না। মনে হল মূর্চ্ছা যাব। তার পরে আমার শিরার বাঁধন যেন ছিঁড়ে ফেলে আমার বুকের বেদনা কান্নার জোয়ারে ভেসে বেরিয়ে পড়ল। বুকের মধ্যে তাঁর পা চেপে ধরলুম—ঐ পায়ের চিহ্ন চিরজীবনের মত ঐখানে আঁকা হয়ে যায় না কি?

এইবার ত সব কথা খুলে বল্লেই হত! কিন্তু এর পরে কি আর কথা আছে? থাক্‌গে আমার কথা!

তিনি আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। আশীর্ব্বাদ পেয়েছি। কাল যে-অপমান আমার জন্যে আসচে সেই অপমানের ডালি সকলের সাম্‌নে মাথায় তুলে নিয়ে আমার দেবতার পায়ে সরল হয়ে প্রণাম করতে পারব।

কিন্তু এই মনে করে আমার বুক ভেঙে যাচ্চে, আজ ন বছর আগে যে-নহবৎ বেজেছিল সে আর ইহজন্মে কোনোদিন বাজ্‌বেনা। এ ঘরে আমাকে বরণ করে এনেছিল যে! ওগো, এই জগতে কোন্ দেবতার পায়ে মাথা কুটে মরলে সেই বউ চন্দন চেলি পরে সেই বরণের পিঁড়িতে এসে দাঁড়াতে পারে? কত দিন লাগ্‌বে আর—কত যুগ, কত যুগান্তর—সেই ন বছর আগেকার দিনটিতে আর একটিবার ফিরে যেতে? দেবতা নতুন স্থষ্টি করতে পারেন কিন্তু ভাঙা স্থষ্টিকে ফিরে গড়তে পারেন এমন সাধ্য কি তাঁর আছে?

নিখিলেশের আত্মকথা

আজ আমরা কলকাতায় যাব। সুখ দুঃখ কেবলি জমিয়ে তুল্‌তে থাক্‌লে বোঝা ভারি হয়ে ওঠে। কেননা বসে থাকাটা মিথ্যে, সঞ্চয় করাটা মিথ্যে। আমি যে এই ঘরের কর্ত্তা এটা বানানো জিনিস্—সত্য এই যে আমি জীবনপথের পথিক। ঘরের কর্ত্তাকে তাই বারেবারে ঘা লাগ্‌বে—তারপরে শেষ আঘাত আছে মৃত্যু। তোমার সঙ্গে আমার যে মিলন সে মিলন চলার মুখে,—যতদূর পর্য্যন্ত একপথে চলা গেল ততদূর পর্য্যন্তই ভালো—তার চেয়ে বেশি টানাটানি করতে গেলেই মিলন হবে বাঁধন। সে-বাঁধন আজ রইল পড়ে—এবার বেরিয়ে পড়লুম—চল্‌তে চল্‌তে যেটুকু চোখে-চোখে মেলে, হাতে-হাতে ঠেকে সেইটুকুই ভালো। তার পরে? তারপরে আছে অনন্ত জগতের পথ, অসীম জীবনের বেগ,—তুমি আমাকে কতটুকু বঞ্চনা করতে পার, প্রিয়ে? সাম্‌নে যে বাঁশী বাজ্‌চে কান দিয়ে যদি শুনি ত শুন্‌তে পাই, বিচ্ছেদের

সমস্ত ফাটলগুলোর ভিতর দিয়েঁ তার মাধুর্য্যের ঝরণা ঝরে পড়চে। লক্ষ্মীর অমৃত ভাণ্ডার ফুরোবে না বলেই মাঝে মাঝে তিনি আমাদের পাত্র ভেঙে দিয়ে কাঁদিয়ে হাসেন। আমি ভাঙা পাত্র কুড়োতে যাব না, আমি আমার অতৃপ্তি বুকে নিয়েই সাম্‌নে চলে যাব।

মেজরাণীদিদি এসে বল্লেন, ঠাকুরপো, তোমার বইগুলো সব বাক্স ভরে গোরুর গাড়ি বোঝাই করে যে চল্ল তার মানে কি বল ত।

আমি বল্লুম, তার মানে ঐ বইগুলোর উপর থেকে এখনো মায়া কাটাতে পারিনি।

মায়া কিছু কিছু থাকলেই যে বাঁচি। কিন্তু এখানে আর ফিরবে না নাকি?

আনাগোনা চল্‌বে কিন্তু পড়ে থাকা আর চল্‌বে না।

সত্যি না কি? তাহলে একবার এস, একবার দেখ্‌সে কত জিনিসের উপরে আমার মায়া।—এই বলে আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন।

তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি ছোটবড় নানা রকমের বাক্স আর পুঁটলি। একটা বাক্স খুলে দেখালেন, এই দেখ ঠাকুরপো, আমার পান-সাজার সরঞ্জাম। কেয়াখয়ের গুঁড়িয়ে বোতলের মধ্যে পুরেছি—এই সব দেখচ এক-এক টিন মসলা। এই দেখ তাস, দশপঁচিশও ভুলিনি, তোমাদের না পাই আমি খেলবার লোক জুটিয়ে নেবই। এই চিরুণী তোমারই স্বদেশী চিরুণী, আর এই—

কিন্তু ব্যাপারটা কি মেজরাণী? এ সব বাক্সয় তুলেচ কেন?

আমি যে তোমাদের সঙ্গে কলকাতায় যাচ্চি

সে কি কথা ?

ভয় নেই, ভাই, ভয় নেই, তোমার সঙ্গেও ভাব করতে যাব না, ছোটরাণীর সঙ্গেও ঝগড়া করব না। মরতেই ত হবে তাই সময় থাকতে গঙ্গাতীরের দেশে আশ্রয় নেওয়া ভালো—মলে তোমাদের সেই নেড়া-বটতলায় পোড়াবে সে কথা মনে হলে আমার মরতে ঘেন্না ধরে,—সেই জন্যেই ত এতদিন ধরে তোমাদের জ্বালাচ্চি।

এতক্ষণ পরে আমার এই বাড়ি যেন কথা কয়ে উঠল। আমার বয়স যখন ছয় তখন ন-বছর বয়সে মেজরাণী আমাদের এই বাড়িতে এসেচেন। এই বাড়ির ছাদে দুপুর-বেলায় উঁচু পাঁচিলের কোণের ছায়ায় বসে ওঁর সঙ্গে খেলা করেচি। বাগানে আমড়াগাছে চড়ে উপর থেকে কাঁচা আমড়া ফেলেচি তিনি নীচে বসে সেগুলি কুচি-কুচি করে তার সঙ্গে নুন লঙ্কা ধনেশাক মিশিয়ে অপথ্য তৈরি করেচেন। পুতুলের বিবাহের ভোজ উপলক্ষ্যে যে-সব উপকরণ ভাঁড়ার ঘর থেকে গোপনে সংগ্রহ করার প্রয়োজন ছিল তার ভার ছিল আমারই উপরে, কেননা ঠাকুরমার বিচারে আমার কোনো অপরাধের দণ্ড ছিল না। তার পরে যে-সব সৌখীন জিনিসের জন্যে দাদার পরে তাঁর আবদার ছিল সে-আবদারের বাহক ছিলুম আমি,—আমি দাদাকে বিরক্ত করে করে যেমন করে হোক্ কাজ উদ্ধার করে আন্‌তুম। তারপরে মনে পড়ে, তখনকার দিনে জ্বর হলে কবিরাজের কঠোর শাসনে তিন দিন কেবল গরম জল আর এলাচদানা আমার পথ্য ছিল—মেজরাণী আমার দুঃখ সইতে পারতেন না, কতদিন লুকিয়ে লুকিয়ে আমাকে খাবার এনে

দিয়েচেন ; এক-একদিন ধরা পড়ে তাঁকে ভর্ৎসনাও সইতে হয়েচে। তার পরে বড়-হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুখদুঃখের রং নিবিড় হয়ে উঠেচে—কত ঝগড়াও হয়েচে, বিষয়ব্যাপার নিয়ে মাঝে মাঝে অনেক ঈর্ষা, সন্দেহ এবং বিরোধও এসে পড়েচে, আবার তার মাঝখানে বিমল এসে পড়ে কখনো কখনো এমন হয়েচে, যে, মনে হয়েচে বিচ্ছেদ বুঝি আর জুড়বে না—কিন্তু তার পরে প্রমাণ হয়েচে অন্তরের মিল সেই বাইরের ক্ষতের চেয়ে অনেক প্রবল। এমনি করে শিশুকাল থেকে আজ পর্য্যন্ত একটি সত্য সম্বন্ধ দিনে দিনে অবিচ্ছিন্ন হয়ে জেগে উঠেচে ; সেই সম্বন্ধের শাখা প্রশাখা এই বৃহৎ বাড়ির সমস্ত ঘরে আঙিনায় বারান্দায় ছাদে বাগানে তার ছায়া ছড়িয়ে দিয়ে সমস্তকে অধিকার করে দাঁড়িয়েচে।—যখন দেখ্‌লুম মেজরাণী তাঁর সমস্ত ছোট-খাট জিনিসপত্র গুছিয়ে বাক্স বোঝাই করে আমাদের বাড়ির থেকে যাবার মুখ করে দাঁড়িয়েচেন তখন এই চিরসম্বন্ধটির সমস্ত শিকড়গুলি পর্য্যন্ত আমার হৃদয়ের মধ্যে যেন শিউরে উঠ্‌ল। আমি বেশ বুঝতে পারলুম কেন মেজরাণী, যিনি ন বছর বয়স থেকে আর এপর্য্যন্ত কখনও একদিনের জন্যও এ-বাড়ি ছেড়ে বাইরে কাটান নি, তিনি তাঁর সমস্ত অভ্যাসের বাঁধন কেটে ফেলে অপরিচিতের মধ্যে ভেসে চল্লেন। অথচ সেই আসল কারণটির কথা মুখ ফুটে বল্‌তেই চান না—অন্য কত রকমের তুচ্ছ ছুতো তোলেন। এই ভাগ্যকর্ত্তৃক বঞ্চিত পতিপুত্রহীনা নারী সংসারের মধ্যে কেবল এই একটিমাত্র সম্বন্ধকে নিজের হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত অমৃত দিয়ে পালন করেচেন, তার বেদনা যে কত গভীর সে আজ তাঁর এই ঘরময় ছড়াছড়ি বাক্স পুঁটুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে যত স্পষ্ট করে

বুঝলুম এমন আর কোনো দিন বুঝি নি। আমি বুঝেছি টাকা-কড়ি ঘরদুয়ারের ভাগ নিয়ে ছোটখাট সামান্য সাংসারিক খুঁটিনাটি নিয়ে বিমলের সঙ্গে আমার সঙ্গে তাঁর যে বারবার ঝগড়া হয়ে গেছে তার কারণ বৈষয়িকতা নয়, তার কারণ তাঁর জীবনের এই একটিমাত্র সম্বন্ধে তাঁর দাবী তিনি প্রবল করতে পারেন নি—বিমল কোথা থেকে হঠাৎ মাঝখানে এসে এ'কে ম্লান করে দিয়েচে,—এইখানে তিনি নড়তে-চড়তে ঘা পেয়েচেন অথচ তাঁর নালিশ করবার জোর ছিল না। বিমলও একরকম করে বুঝেছিল আমার উপর মেজরাণীর দাবী কেবলমাত্র সামাজিকতার দাবী নয়, তার চেয়ে অনেক বেশি গভীর,—সেইজন্যে আমাদের এই আশৈশবের সম্পর্কটির পরে তার এতটা ঈর্ষা। আজ বুকের দরজাটার কাছে আমার হৃদয় ধক্ ধক্ করে ঘা দিতে লাগ্‌ল। একটা তোরঙ্গের উপর বসে পড়লুম—বল্লুম, মেজরাণীদিদি, আমরা দুজনেই এই বাড়িতে যেদিন নতুন দেখা দিয়েচি সেই দিনের মধ্যে আর-একবার ফিরে যেতে বড় ইচ্ছে করে।

মেজরাণী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বল্লেন, না ভাই, মেয়ে-জন্ম নিয়ে আর নয়,—যা সয়েচি তা একটা-জন্মের উপর দিয়েই যাক্, ফের আর কি সয়?

আমি বলে উঠলুম, দুঃখের ভিতর দিয়ে যে মুক্তি আসে সেই মুক্তি দুঃখের চেয়ে বড়।

তিনি বল্লেন, তা হতে পারে, ঠাকুরপো, তোমরা পুরুষমানুষ, মুক্তি তোমাদের জন্যে। আমরা মেয়েরা বাঁধতে চাই, বাঁধা পড়তে চাই,—আমাদের কাছ থেকে তোমরা সহজে ছাড়া পাবে না গো। ডানা

যদি মেলতে চাও আমাদের সুদ্ধ নিতে হবে—ফেলতে পারবে না। সেই জন্যেই ত এই সব বোঝা সাজিয়ে রেখেচি—তোমাদের একেবারে হাল্কা হতে দিলে কি আর রক্ষা আছে!

আমি হেসে বল্লুম, তাই ত দেখচি—বোঝা বলে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্চে। কিন্তু এই বোঝা বইবার মজুরি তোমরা পুষিয়ে দাও বলেই আমরা নালিশ করিনে।

মেজরাণী বল্লেন, আমাদের বোঝা হচ্চে ছোট জিনিসের বোঝা। যাকেই বাদ দিতে যাবে সেই বলবে আমি সামান্য, আমার ভার কতটুকুইবা,—এমনি করে হাল্কা জিনিস দিয়েই আমরা তোমাদের মোট ভারী করি। কখন্ বেরতে হবে ঠাকুরপো?

রাত্তির সাড়ে এগারোটায়—সে এখনো ঢের সময় আছে।

দেখ ঠাকুরপো, লক্ষ্মীটি, আমার একটি কথা রাখতে হবে—আজ সকাল-সকাল খেয়ে নিয়ে দুপুরবেলা একটু ঘুমিয়ে নিয়ো—গাড়িতে রাত্তিরে ত ভালো ঘুম হবে না। তোমার শরীর এমন হয়েচে দেখ্‌লেই মনে হয় আর-একটু হলেই ভেঙে পড়বে। চল, এখনি তোমাকে নাইতে যেতে হবে।

এমন সময় ক্ষেমা মস্ত একটা ঘোমটা টেনে মৃদুস্বরে বল্লে, দারোগা-বাবু কাকে সঙ্গে করে এনেচে, মহারাজের সঙ্গে দেখা করতে চায়।

মেজরাণী রাগ করে উঠে বল্লেন, মহারাজ চোর না ডাকাত যে দারোগা তার সঙ্গে লেগেই রয়েচে! বলে আয় গে, মহারাজ এখন নাইতে গেছেন।

আমি বল্লুম, একবার দেখে আসিগে—হয় ত কোনো জরুরি কাজ আছে।

মেজরাণী বল্লেন, না সে হবে না। ছোটরাণী কাল বিস্তর পিঠে তৈরি করেচে, দারোগাকে সেই পিঠে খেতে পাঠিয়ে তার মেজাজ ঠাণ্ডা করে রাখ্‌চি।—বলে তিনি আমাকে হাতে ধরে টেনে স্নানের ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

আমি ভিতর থেকে বল্লুম, আমার সাফ কাপড় যে এখনো—

তিনি বল্লেন, সে আমি ঠিক করে রাখব, ততক্ষণ তুমি স্নান করে নাও।

এই উৎপাতের শাসনকে অমান্য করি এমন সাধ্য আমার নেই—সংসারে এ যে বড় দুর্লভ। থাক্‌গে, দারোগাবাবু বসে বসে পিঠে খাক্‌গে! না-হয় হল আমার কাজের অবহেলা!

ইতিমধ্যে সেই ডাকাতি নিয়ে দারোগা দুপাঁচ জনকে ধরা-পাকড়া করচেই। রোজই একটা না-একটা নিরীহ লোককে ধরে-বেঁধে এনে আসর গরম করে রেখেচে। আজও বোধ হয় তেমনি কোন্ এক অভাগাকে পাকড়া করে এনেছে। কিন্তু পিঠে কি একলা দারোগাই খাবে? সে ত ঠিক নয়। দরজায় দমাদম ঘা লাগালুম। মেজরাণী বাইরে থেকে বল্লেন, জল ঢালো, জল ঢালো, মাথা গরম হয়ে উঠেছে বুঝি?

আমি বল্লুম, পিঠে দুজনের মত সাজিয়ে পাঠিয়ো—দারোগা যাকে চোর বলে ধরেচে, পিঠে তারই প্রাপ্য—বেহারাকে বলে দিয়ো তার ভাগে যেন বেশি পড়ে।

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি স্নান সেরেই দরজা খুলে বেরিয়ে এলুম। দেখি দরজার বাইরে মাটির উপরে বিমল বসে। এ কি আমার

সেই বিমল, সেই তেজে অভিমানে ভরা গরবিণী? কোন্ ভিক্ষা মনের মধ্যে নিয়ে এ আমার দরজাতেও বসে থাকে? আমি একটু থম্‌কে দাঁড়াতেই সে উঠে মুখ একটু নীচু করে আমাকে বল্লে, তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা আছে।

আমি বল্লুম, তাহলে এস আমাদের ঘরে।

কোনো বিশেষ কাজে কি তুমি বাইরে যাচ্চ?

হাঁ, কিন্তু থাক্ সে কাজ—আগে তোমার সঙ্গে—

না, তুমি কাজ সেরে এস—তারপরে তোমার খাওয়া হলে কথা হবে।

বাইরে গিয়ে দেখি দারোগার পাত্র শূন্য—সে যাকে ধরে এনেচে সে তখনো বসে বসে পিঠে খাচ্চে।

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বল্লুম, এ কি, অমূল্য যে!

সে এক-মুখ পিঠে নিয়ে বল্লে, আজ্ঞে হাঁ,—পেট-ভরে খেয়ে নিয়েচি, এখন কিছু যদি না মনে করেন তাহলে যে ক'টা বাকি আছে রুমালে বেঁধে নিই।—বলে পিঠেগুলো সব রুমালে বেঁধে নিলে।

আমি দারোগার দিকে চেয়ে বল্লুম, ব্যাপারখানা কি?

দারোগা হেসে বল্লে, মহারাজ, চোরের হেঁয়ালি ত হেঁয়ালিই রয়ে গেছে, তার উপরে চোরাই মালের হেঁয়ালি নিয়ে মাথা ঘোরাচ্চি।

এই বলে একটা ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুঁটুলি খুলে এক তাড়া নোট সে আমার সাম্‌নে ধরলে। বল্লে, এই মহারাজের ছ হাজার টাকা।

কোথা থেকে বেরল ?

আপাতত অমূল্যবাবুর হাত থেকে। উনি কালরাত্রে আপনার চকুয়া কাছারির নায়েবের কাছে গিয়ে বল্লেন, চোরাই নোট পাওয়া গেছে।—চুরি যেতে নায়েব এত ভয় পায় নি যেমন এই চোরাই মাল ফিরে পেয়ে। তার ভয় হল সবাই সন্দেহ করবে এ নোট সেই লুকিয়ে রেখেছিল এখন বিপদের সম্ভাবনা দেখে একটা অসম্ভব গল্প বানিয়ে তুলেচে। সে অমূল্যবাবুকে খাওয়াবার ছল করে বসিয়ে রেখেই থানায় খবর দিয়েচে। আমি ঘোড়ায় চড়ে গিয়েই ভোর থেকে ওঁকে নিয়ে পড়েচি। উনি বল্লেন, কোথা থেকে পেয়েচি সে আপনাকে বল্‌ব না। আমি বল্লুম, না বল্লে আপনি ত ছাড়া পাবেন না। উনি বলেন, মিথ্যে বল্‌ব। আমি বলি, আচ্ছা তাই বলুন। উনি বলেন, ঝোপের মধ্যে থেকে কুড়িয়ে পেয়েচি। আমি বল্লুম, মিথ্যে কথা অত সহজ নয়। কোথায় ঝোপ, সেই ঝোপের মধ্যে আপনি কি দরকারে গিয়েছিলেন সমস্ত বলা চাই। উনি বল্লেন, সে সমস্ত বানিয়ে তোলবার আমি যথেষ্ট সময় পাব—সে জন্যে কিছু চিন্তা করবেন না।

আমি বল্লুম, হরিচরণবাবু, ভদ্রলোকের ছেলেকে নিয়ে মিছিমিছি টানাটানি করে কি হবে!

দারোগা বল্লেন, শুধু ভদ্রলোকের ছেলে নয়, উনি নিবারণ ঘোষালের ছেলে—তিনি আমার ক্লাস্‌-ফ্রেণ্ড ছিলেন। মহারাজ, আমি আপনাকে বলে দিচ্চি—ব্যাপারখানা কি ? অমূল্য জানুতে পেরেচেন কে চুরি করেচে—এই বন্দেমাতরমের হুজুক উপলক্ষ্যে তাকে উনি চেনেন। নিজের ঘাড়ে দায় নিয়ে তাকে উনি বাঁচাতে

চান। এই সব হচ্চে ওঁর বীরত্ব। বাবা, আমাদেরও বয়েস একদিন তোমাদেরই মত ঐ আঠারো-উনিশ ছিল—পড়তুম রিপন কলেজে—একদিন ষ্ট্র্যাণ্ডে একটা গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানকে পাহারাওয়ালার জুলুম থেকে বাঁচাবার জন্যে প্রায় জেলখানার সদর দরজার দিকে ঝুঁকেছিলুম—দৈবাৎ ফস্‌কে গেছে।—মহারাজ এখন চোর ধরা-পড়া শক্ত হল কিন্তু আমি বলে রাখচি কে এর মূলে আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কে?

আপনার নায়েব তিনকড়ি দত্ত আর ঐ কাসেম সর্দ্দার।

দারোগা তাঁর এই অনুমানের পক্ষে নানা যুক্তি দেখিয়ে যখন চলে গেলেন আমি অমূল্যকে বল্লুম, এই টাকাটা কে নিয়েছিল আমাকে যদি বল কারো কোনো ক্ষতি হবে না।

সে বল্লে, আমি।

কেমন করে? ওরা যে বলে ডাকাতের দল—

আমি একলা।

অমূল্য যা বল্লে সে অদ্ভুত। নায়েব রাত্রে আহার সেরে বাইরে বসে আঁচাচ্ছিল, সে জায়গাটা ছিল অন্ধকার। অমূল্যর দুই পকেটে দুই পিস্তল, একটাতে ফাঁকা টোটা আর একটাতে গুলি ভরা। ওর মুখের আধখানাতে ছিল কালো মুখোষ। হঠাৎ একটা বুল্‌স্-আই লণ্ঠনের আলো নায়েবের মুখে ফেলে পিস্তলের ফাঁকা আওয়াজ করতেই সে হাঁউমাউ শব্দ করে মূর্চ্ছা গেল—দু চারজন বর্কন্দাজ ছুটে আস্‌তেই তাদের মাথার উপর পিস্তলের আওয়াজ করে দিলে, তারা যে-যেখানে পারলে ঘরের মধ্যে ঢুকে

দরজা বন্ধ করে দিলে। কাসেম সর্দ্দার লাঠি হাতে ছুটে এল, তার পা লক্ষ্য করে গুলি মারতেই সে বসে পড়ল। তারপরে ঐ নায়েবকে দিয়ে লোহার সিন্ধুক খুলিয়ে ছ-হাজার টাকার নোট গুলো নিয়ে আমাদের কাছারির এক ঘোড়া মাইল পাঁচ ছয় ছুটিয়ে সেই ঘোড়াটাকে এক জায়গায় ছেড়ে দিয়ে পর-দিন সকালে আমার এখানে এসে পৌঁচেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, অমূল্য, এ কাজ কেন করতে গেলে?

সে বল্লে, আমার বিশেষ দরকার ছিল।

তবে আবার ফিরিয়ে দিলে কেন?

যাঁর হুকুমে ফিরিয়ে দিলুম তাঁকে ডাকুন, তাঁর সাম্‌নে আমি বল্‌ব।

তিনি কে?

ছোট-রাণীদিদি।

বিমলকে ডেকে পাঠালুম। তিনি একখানি সাদা শাল মাথার উপর দিয়ে ফিরিয়ে গা ঢেকে আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে ঢুক্‌লেন —পায়ে জুতোও ছিল না। দেখে আমার মনে হল বিমলকে এমন যেন আর কখনো দেখি নি—সকালবেলাকার চাঁদের মত-ও যেন আপনাকে প্রভাতের আলো দিয়ে ঢেকে এনেচে।

অমূল্য বিমলের পায়ের কাছে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিলে। উঠে দাঁড়িয়ে বল্লে, তোমার আদেশ পালন করে এসেচি দিদি। টাকা ফিরিয়ে দিয়েচি।

বিমল বল্লে, বাঁচিয়েচ, ভাই।

অমূল্য বল্লে, তোমাকে স্মরণ করেই একটি মিথ্যা কথাও বলি

নি। আমার বন্দেমাতরম্ মন্ত্র রইল তোমার পায়ের তলায়। ফিরে এসে এই বাড়িতে ঢুকেই তোমার প্রসাদও পেয়েচি।

বিমলা এ কথাটা ঠিক বুঝতে পারলে না। অমূল্য পকেট থেকে রুমাল বের করে তার গ্রন্থি খুলে সঞ্চিত পিঠেগুলি দেখালে। বল্লে, সব খাই নি, কিছু রেখেচি—তুমি নিজের হাতে আমার পাতে তুলে দিয়ে খাওয়াবে বলে এইগুলি জমানো আছে।

আমি বুঝলুম এখানে আমার আর দরকার নেই; ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। মনে ভাবলুম আমি ত কেবল বকে বকেই মরি, আর ওরা আমার কুশপুত্তলির গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা পরিয়ে নদীর ধারে দাহ করে। কাউকে ত মরার পথ থেকে ফেরাতে পারিনে—যে পারে সে ইঙ্গিতেই পারে। আমাদের বাণীতে সেই অমোঘ ইঙ্গিত নেই। আমরা শিখা নই, আমরা অঙ্গার, আমরা নিবোনো, আমরা দীপ জ্বালাতে পারব না। আমার জীবনের ইতিহাসে সেই কথাটাই প্রমাণ হল, আমার সাজানো বাতি জ্বল্‌ল না।

আবার আস্তে আস্তে অন্তঃপুরে গেলুম। বোধ হয় আর-একবার মেজরাণীর ঘরের দিকে আমার মনটা ছুট্‌ল। আমার জীবনও এ-সংসারে কোনো-একটা জীবনের বীণায় সত্য এবং স্পষ্ট আঘাত দিয়েছে এটা অনুভব করা আজ আমার যে বড় দরকার;—নিজের অস্তিত্বের পরিচয় ত নিজের মধ্যে পাওয়া যায় না—বাইরে আর-কোথাও যে তার খোঁজ করতে হয়।

মেজরাণীর ঘরের সাম্‌নে আস্‌তেই তিনি বেরিয়ে এসে বল্লেন, এই যে, ঠাকুরপো, আমি বলি-বুঝি তোমার আজও দেরী হয়। আর দেরী নেই, তোমার খাবার তৈরী রয়েচে এখনি আসচে।

আমি বল্লুম, ততক্ষণ সেই টাকাটা বের করে ঠিক করে রাখি।

আমার শোবার ঘরের দিকে যেতে যেতে মেজরাণী জিজ্ঞাসা করলেন, দারোগা যে এল, সেই চুরির কোন আস্কারা হল না কি?

সেই ছ-হাজার টাকা ফিরে পাবার ব্যাপারটা মেজরাণীর কাছে আমার বল্‌তে ইচ্ছে হল না। আমি বল্লুম, সেই নিয়েই ত চল্‌চে।

লোহার সিন্ধুকের ঘরে গিয়ে পকেট থেকে চাবির গোছা বের করে দেখি সিন্ধুকের চাবিটাই নেই। অদ্ভুত আমার অন্য-মনস্কতা! এই চাবির রিং নিয়ে আজ সকাল থেকে কতবার কত বাক্স খুলেচি আলমারি খুলেচি কিন্তু একবারও লক্ষ্যই করি নি যে সে চাবিটা নেই।

মেজরাণী বল্লেন, চাবি কই?

আমি তার জবাব না করে বৃথা এ-পকেট ও-পকেট নাড়া দিলুম—দশবার করে সমস্ত জিনিসপত্র হাঁট্‌কে খোঁজাখুঁজি করলুম। আমাদের বোঝবার বাকি রইল না যে, চাবি হারায় নি, কেউ একজন রিং থেকে খুলে নিয়েচে। কে নিতে পারে? এ ঘরে ত—

মেজরাণী বল্লেন, ব্যস্ত হোয়ো না, আগে তুমি খেয়ে নাও। আমার বিশ্বাস, তুমি অসাবধান বলেই ছোটরাণী ঐ চাবিটা বিশেষ করে তার বাক্সে তুলে রেখেচে।

আমার ভারি গোলমাল ঠেক্‌তে লাগল। আমাকে না-জানিয়ে বিমল রিং থেকে চাবি বের করে নেবে এ তার স্বভাব নয়।

কি রকমের যোগ সে কথা জান্‌তেও ইচ্ছা করল না—কোনোদিন সে প্রশ্নও করব না।

বিধাতা আমাদের জীবন-ছবির দাগ একটু ঝাপসা করেই টেনে দেন—আমরা নিজের হাতে সেটাকে কিছু-কিছু বদ্‌লে মুছে পূরিয়ে দিয়ে নিজের মনের মত একটা স্পষ্ট চেহারা ফুটিয়ে তুল্‌ব এই তাঁর অভিপ্রায়। সৃষ্টিকর্ত্তার ইসারা নিয়ে নিজের জীবনটাকে নিজে সৃষ্টি করে তুলব, একটা বড় আইডিয়াকে আমার সমস্তর মধ্য দিয়ে ব্যক্ত করে দেখাব এই বেদনা বরাবর আমার মনে আছে।

এই সাধনাতে এতদিন কাটিয়েচি! প্রবৃত্তিকে কত বঞ্চিত করেচি নিজেকে কত দমন করেছি সেই অন্তরের ইতিহাস অন্তর্যামীই জানেন। শক্ত কথা এই যে, কারো জীবন একলার জিনিস নয় —সৃষ্টি যে করবে সে নিজের চারদিককে নিয়ে যদি সৃষ্টি না করে তবে ব্যর্থ হবে। মনের মধ্যে তাই একান্ত একটা প্রয়াস ছিল যে বিমলকেও এই রচনার মধ্যে টান্‌ব। সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাকে ভালো যখন বাসি তখন কেন পারব না এই ছিল আমার জোর।

এমন সময় স্পষ্ট দেখতে পেলুম নিজের সঙ্গে সঙ্গে নিজের চারিদিককে যারা সহজেই সৃষ্টি করতে পারে তারা এক-জাতের মানুষ, আমি সে জাতের না। আমি মন্ত্র নিয়েচি, কাউকে মন্ত্র দিতে পারি নি। যাদের কাছে আপনাকে সম্পূর্ণ ঢেলে দিয়েচি তারা আমার আর-সবই নিয়েচে কেবল আমার এই অন্তরতম জিনিসটি ছাড়া। আমার পরীক্ষা কঠিন হল। সব-চেয়ে যেখানে

সহায় চাই সব-চেয়ে সেখানেই একলা হলুম। এই পরীক্ষাতেও জিতব এই আমার পণ রইল। জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমার দুর্গম পথ আমার একলারই পথ।

আজ সন্দেহ হচ্চে আমার মধ্যে একটা অত্যাচার ছিল। বিমলের সঙ্গে আমার সম্বন্ধটিকে একটা সুকঠিন ভালোর ছাঁচে নিখুঁৎ-করে ঢালাই করব আমার ইচ্ছার ভিতরে এই একটা জবরদস্তি আছে। কিন্তু মানুষের জীবনটা ত ছাঁচে ঢালবার নয়। আর, ভালোকে জড়বস্তু মনে করে গড়ে তুল্‌তে গেলেই মরে-গিয়ে সে তার ভয়ানক শোধ নেয়।

এই জুলুমের জন্যেই আমরা পরস্পরের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তফাৎ হয়ে গেচি তা জান্‌তেই পারিনি। বিমল নিজে যা হতে পারত তা আমার চাপে উপরে ফুটে উঠতে পারেনি বলেই নীচের তল থেকে রুদ্ধ জীবনের ঘর্ষণে বাঁধ ক্ষইয়ে ফেলেচে। এই ছ-হাজার টাকা আজ ওকে চুরি করে নিতে হয়েচে,—আমার সঙ্গে ও স্পষ্ট ব্যবহার করতে পারে নি, কেননা ও বুঝেচে এক জায়গায় আমি ওর থেকে প্রবলরূপে পৃথক। আমাদের মত এক-রোখা আইডিয়ার মানুষের সঙ্গে যারা মেলে তারা মেলে, যারা মেলেনা তারা আমাদের ঠকায়। সরল মানুষকেও আমরা কপট করে তুলি। আমরা সহধর্ম্মিণীকে গড়তে গিয়ে স্ত্রীকে বিকৃত করি।

আবার কি সেই গোড়ায় ফেরা যায় না? তা হলে একবার সহজের রাস্তায় চলি। আমার পথের সঙ্গিনীকে এবার কোনো আইডিয়ার শিকল দিয়ে বাঁধতে চাইব না—কেবল আমার ভালো-বাসার বাঁশি বাজিয়ে বল্‌ব, তুমি আমাকে ভালোবাস, সেই ভালো-

বাসার আলোতে তুমি যা তারই পূর্ণ বিকাশ হোক্, আমার ফরমাস একেবারে চাপা পড়ুক—তোমার মধ্যে বিধাতার যে ইচ্ছ আছে তারই জয় হোক্, আমার ইচ্ছা লজ্জিত হয়ে ফিরে যাক।

কিন্তু আমাদের মধ্যেকার যে বিচ্ছেদটা ভিতরে ভিতরে জমছিল সেটা আজ এমনতর একটা ক্ষতর মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়েচে যে, আর কি তার উপর স্বভাবের শুশ্রূষা কাজ করতে পারবে? যে আব্রুর আড়ালে প্রকৃতি আপনার সংশোধনের কাজ নিঃশব্দে করে সেই আব্রু যে একেবারে ছিন্ন হয়ে গেল! ক্ষতকে ঢাকা দিতে হয়, এই ক্ষতকে আমার ভালোবাসা দিয়ে ঢাকব---বেদনাকে আমার হৃদয় দিয়ে পাকে পাকে জড়িয়ে বাইরের স্পর্শ থেকে আড়াল করে রাখব—একদিন এমন হবে যে, এই ক্ষতর চিহ্ন পর্য্যন্ত থাকবে না। কিন্তু আর কি সময় আছে? এতদিন গেল ভুল বুঝতে, আজকের দিন এল ভুল ভাঙতে, কতদিন লাগবে ভুল শোধরাতে! তার পরে? তারপরে ক্ষত শুকোতেও পারে কিন্তু ক্ষতিপূরণ কি আর কোনো কালে হবে?

একটা কি খট্ করে উঠল—ফিরে তাকিয়ে দেখি বিমল দরজার কাছ থেকে ফিরে যাচ্চে। বোধ হয় দরজার পাশে এসে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল—ঘরে ঢুকবে কি না-ঢুকবে ভেবে পাচ্ছিল না—শেষে ফিরে যাচ্ছিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ডাকলুম, বিমল! সে থমকে দাঁড়াল, তার পিঠ ছিল আমার দিকে। আমি তাকে হাতে ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে এলুম।

ঘরে এসেই মেঝের উপর পড়ে মুখের উপর একটা বালিস

আঁকড়ে ধরে তার কান্না! আমি একটি কথা না বলে তার হাত ধরে মাথার কাছে বসে রইলুম।

কান্নার বেগ থেমে গিয়ে উঠে বসতেই আমি তাকে আমার বুকের কাছে টেনে নেবার চেষ্টা করলুম। সে একটু জোর করে আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে হাঁটু গেড়ে আমার পায়ের উপর বার বার মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে লাগল। আমি পা সরিয়ে নিতেই সে দুই হাত দিয়ে আমার পা জড়িয়ে ধরে গদগদ স্বরে বল্লে, না, না, না, তোমার পা সরিয়ে নিয়ো না—আমাকে পূজো করতে দিও।

আমি তখন চুপ করে রইলুম। এ পূজায় বাধা দেবার আমি কে! যে-পূজা সত্য সে-পূজার দেবতাও সত্য,—সে-দেবতা কি আমি, যে, আমি সঙ্কোচ করব?

বিমলার আত্মকথা

চল, চল, এইবার বেরিয়ে পড়,—সকল ভালোবাসা যেখানে পূজার সমুদ্রে মিশেচে সেই সাগর-সঙ্গমে। সেই নির্ম্মল নীলের অতলের মধ্যে সমস্ত পঙ্কের ভার মিলিয়ে যাবে। আর আমি ভয় করিনে,—আপনাকেও না, আর-কাউকেও না। আমি আগুনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে এসেচি—যা পোড়বার তা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে—যা বাকি আছে তার আর মরণ নেই। সেই-আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলুম তাঁর পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তাঁর গভীর বেদনার মধ্যে গ্রহণ করেচেন।

আজ রাত্রে কলকাতায় যেতে হবে। এতক্ষণ অন্তর বাহিরের

নানা গোলমালে জিনিসপত্র গোছাবার কাজে মন দিতে পারি নি। এইবার বাক্সগুলো টেনে নিয়ে গোছাতে বস্‌লুম। খানিক বাদে দেখি আমার স্বামীও আমার পাশে এসে জুট্‌লেন। আমি বল্লুম, না, ও হবে না,—তুমি যে একটু ঘুমিয়ে নেবে আমাকে কথা দিয়েচ।

আমার স্বামী বল্লেন, আমিই যেন কথা দিয়েচি কিন্তু আমার ঘুম ত কথা দেয় নি—তার যে দেখা নেই।

আমি বল্লুম, না সে হবে না—তুমি শুতে যাও!

তিনি বল্লেন, তুমি একলা পারবে কেন?

খুব পারব!

আমি না হলেও তোমার চলে এ জাঁক তুমি করতে চাও কর কিন্তু তুমি না হলে আমার চলে না। তাই একলা-ঘরে কিছুতেই আমার ঘুম এল না।

এই বলে তিনি কাজে লেগে গেলেন। এমন সময় বেহারা এসে জানালে, সন্দীপবাবু এসেচেন, তিনি খবর দিতে বল্লেন।

খবর কাকে দিতে বল্লেন সে কথা জিজ্ঞাসা করবার জোর ছিল না। আমার কাছে একমুহূর্ত্তে আকাশের আলোটা যেন লজ্জাবতী লতার মত সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

আমার স্বামী বল্লেন, চল বিমল শুনে আসি সন্দীপ কি বলে। ও ত বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল আবার যখন ফিরে এসেচে তখন বোধ হয় বিশেষ কোনো কথা আছে।

যাওয়ার চেয়ে না যাওয়াটাই বেশি লজ্জা বলে স্বামীর সঙ্গে বাইরে গেলুম। বৈঠকখানার ঘরে সন্দীপ দাঁড়িয়ে দেয়ালে টাঙানো

ছবি দেখছিল। আমরা যেতেই বলে উঠ্‌ল—তোমরা ভাবচ লোকটা ফেরে কেন? সৎকার সম্পূর্ণ শেষ না হলে প্রেত বিদায় হয় না।

এই বলে চাদরের ভিতর থেকে সে একটা রুমালের পুঁটুলি বের করে টেবিলের উপরে খুলে ধরলে। সেই গিনিগুলো। বল্লে, নিখিল, ভুল কোরোনো, ভেবনা হঠাৎ তোমাদের সংসর্গে পড়ে সাধু হয়ে উঠেছি। অনুতাপের অশ্রুজল ফেলতে ফেলতে এই ছ-হাজার টাকার গিনি ফিরিয়ে দেবার মত ছিঁচকাঁদুনে সন্দীপ নয়। কিন্তু—

এই বলে সন্দীপ কথাটা আর শেষ করলে না। একটু চুপ করে থেকে আমার দিকে চেয়ে বল্লে, মক্ষিরাণী, এতদিন পরে সন্দীপের নির্ম্মল জীবনে একটা কিন্তু এসে ঢুকেচে—রাত্রি তিনটের পর জেগে উঠেই রোজ তার সঙ্গে একবার ঝুটোপুটি লড়াই করে দেখেচি সে নিতান্ত ফাঁকি নয়—তার দেনা চুকিয়ে না দিয়ে সন্দীপেরও নিষ্কৃতি নেই। সেই আমার সর্ব্বনাশিনী কিন্তুর হাতে দিয়ে গেলুম আমার পূজা। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখলুম পৃথিবীতে কেবলমাত্র তারই ধন আমি নিতে পারব না—তোমার কাছে আমি নিঃস্ব হয়ে তবে বিদায় পাব, দেবী! এই নাও!—

বলে সেই গয়নার বাক্সটিও বের করে টেবিলের উপর রেখে সন্দীপ দ্রুত চলে যাবার উপক্রম করলে। আমার স্বামী তাকে ডেকে বল্লেন, শুনে যাও, সন্দীপ!

সন্দীপ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বল্লে, আমার সময় নেই নিখিল। খবর পেয়েছি মুসলমানের দল আমাকে মহামূল্য রত্নের মত লুঠ করে নিয়ে তাদের গোরস্থানে পুঁতে রাখবার মৎলব করেচে।

কিন্তু আমার বেঁচে থাকার দরকার। উত্তরের গাড়ি ছাড়তে আর পঁচিশ মিনিট মাত্র আছে। অতএব এখনকার মত চল্লুম—তার পরে আবার একটু অবকাশ পেলে তোমাদের সঙ্গে বাকি সমস্ত কথা চুকিয়ে দেব। যদি আমার পরামর্শ নাও, তুমিও বেশি দেরি কোরো না। মক্ষিরাণী, বন্দে প্রলয়রূপিনীং হৃৎপিণ্ডমালিনীং!

এই বলে সন্দীপ প্রায় ছুটে চলে গেল। আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম। গিনি আর গয়নাগুলো যে কত তুচ্ছ সে আর-কোনো-দিন এমন করে দেখ্‌তে পাইনি। কত জিনিস সঙ্গে নেব, কোথায় কি ধরাব, এই কিছু আগে তাই ভাবছিলুম এখন মনে হল কোনো জিনিসই নেবার দরকার নেই—কেবল বেরিয়ে চলে যাওয়াটাই দরকার।

আমার স্বামী চৌকি থেকে উঠে এসে আমার হাত ধরে আস্তে আস্তে বল্লেন, আর ত বেশি সময় নেই এখন কাজগুলো সেরে নেওয়া যাক্!

এমন সময় চন্দ্রনাথবাবু ঘরে ঢুকেই আমাকে দেখে ক্ষণকালের জন্যে সঙ্কুচিত হলেন—বল্লেন, মাপ কোরো মা, খবর দিয়ে আস্‌তে পারি নি। নিখিল, মুসলমানের দল ক্ষেপে উঠেচে। হরিশকুণ্ডুর কাছারি লুট হয়ে গেছে। সে-জন্যে ভয় ছিল না কিন্তু মেয়েদের উপর তারা যে অত্যাচার আরম্ভ করেচে সে ত প্রাণ থাক্‌তে সহ্য করা যায় না!

আমার স্বামী বল্লেন, আমি তবে চল্লুম।

আমি তাঁর হাত ধরে বল্লুম, তুমি গিয়ে কি করতে পারবে? মাষ্টারমশায়, আপনি ওঁকে বারণ করুন।

চন্দ্রনাথবাবু বল্লেন, মা, বারণ করবার ত সময় নেই।

আমার স্বামী বল্লেন, কিচ্ছু ভেবোনা বিমল।

জানলার কাছে গিয়ে দেখ্‌লুম, তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। হাতে তাঁর কোনো অস্ত্রও ছিল না।

একটু পরেই মেজরাণী ছুটে ঘরের মধ্যে ঢুকেই বল্লেন, করলি কি, ছুটু, কি সর্ব্বনাশ করলি? ঠাকুরপোকে যেতে দিলি কেন? —বেহারাকে বল্লেন, ডাক্ ডাক্ শীগ্‌গির দেওয়ানবাবুকে ডেকে আন্।

দেওয়ানবাবুর সাম্‌নে মেজরাণী কোনোদিন বেরন নি। সেদিন তাঁর লজ্জা ছিল্ না। বল্লেন, মহারাজকে ফিরিয়ে আনতে শিগ্‌গির সওয়ার পাঠাও।

দেওয়ানবাবু বল্লেন, আমরা অনেক মানা করেচি, তিনি ফিরবেন না।

মেজরাণী বল্লেন, তাঁকে বলে পাঠাও, মেজরাণীর ওলাউঠো হয়েচে—তার মরণকাল আসন্ন।

দেওয়ান চলে গেলে মেজরাণী আমাকে গাল দিতে লাগ্‌লেন, রাক্কুসী, সর্ব্বনাশী! নিজে মরলিনে, ঠাকুরপোকে মরতে পাঠালি।

দিনের আলো শেষ হয়ে এল। জানলার সামনে পশ্চিম-দিগন্তে গোয়ালপাড়ার ফুটন্ত সজ্‌নে গাছটার পিছনে সূর্য্য অস্ত গেল। সেই সূর্য্যাস্তের প্রত্যেক রেখাটি আজও আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্চি। অস্তমান সূর্য্যকে কেন্দ্র করে একটা মেঘের ঘটা উত্তরে দক্ষিণে দুইভাগে ছড়িয়ে পড়েছিল, একটা প্রকাণ্ড পাখীর ডানা মেলার মত,—তার আগুনের রঙের পালকগুলো থাকে-থাকে সাজানো। মনে হতে লাগল আজকের দিনটা যেন হুহু করে উড়ে চলেচে রাত্রের সমুদ্র পার হবার জন্যে।

অন্ধকার হয়ে এল। দূর গ্রামে আগুন লাগলে থেকে থেকে যেমন তার শিখা আকাশে লাফিয়ে উঠ্‌তে থাকে—তেমনি বহুদূর থেকে এক-একবার এক-একটা কলরবের ঢেউ অন্ধকারের ভিতর থেকে যেন ফেঁপে উঠতে লাগ্‌ল।

ঠাকুরঘর থেকে সন্ধ্যারতির শঙ্খঘণ্টা বেজে উঠল। আমি জানি মেজরাণী সেইঘরে গিয়ে জোড়হাত করে বসে আছেন। আমি এই রাস্তার ধারের জানলা ছেড়ে এক পা কোথাও নড়তে পারলুম না। সাম্‌নেকার রাস্তা গ্রাম, আরো দূরেকার শস্যশূন্য মাঠ এবং তারও শেষ-প্রান্তে গাছের রেখা ঝাপ্‌সা হয়ে এল। রাজবাড়ির বড় দিঘিটা অন্ধের চোখের মত আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। বাঁ দিকের ফটকের উপরকার নবৎখানাটা উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে কি-যেন-একটা দেখতে পাচ্চে।

রাত্রিবেলাকার শব্দ যে কতরকমের ছদ্মবেশ ধরে তার ঠিকানা নেই। কাছে কোথায় একটা ডাল নড়ে মনে হয় দূরে যেন কে ছুটে পলাচ্চে। হঠাৎ বাতাসে একটা দরজা পড়ল মনে হল সেটা যেন সমস্ত আকাশের বুক ধড়াস্‌ করে ওঠার শব্দ।

মাঝে মাঝে রাস্তার ধারের কালো গাছের সারের নীচে দিয়ে আলো দেখ্‌তে পাই তার পরে আর দেখ্‌তে পাইনে। ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনি, তরাপরে দেখি ঘোড়সোয়ার রাজবাড়ির গেট থেকেই বেরিয়ে ছুটে চল্‌চে।

কেবলি মনে হতে লাগ্‌ল আমি মরলেই সব বিপদ কেটে যাবে। আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি সংসারকে আমার পাপ নানা-দিক থেকে মারতে থাকবে। মনে পড়ল সেই পিস্তলটা বাক্সের

মধ্যে আছে। কিন্তু এই পথের ধারের জানলা ছেড়ে পিস্তল নিতে যেতে পা সরল না, আমি যে আমার ভাগ্যের প্রতীক্ষা করচি।

রাজবাড়ির দেউড়ির ঘণ্টায় ঢং ঢং করে দশটা বাজল।

তার খানিক পরে দেখি রাস্তায় অনেকগুলি আলো অনেক ভিড়। অন্ধকারে সমস্ত জনতা এক হয়ে জুড়ে গিয়ে মনে হল একটা প্রকাণ্ড কালো অজগর এঁকেবেঁকে রাজবাড়ির গেটের মধ্যে ঢুকতে আস্‌চে।

দেওয়ানজি দূরে লোকের শব্দ শুনে গেটের কাছে ছুটে গেলেন। সেই সময় একজন সওয়ার এসে পৌঁছতেই দেওয়ানজি ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, জটাধর, খবর কি?

সে বল্লে, খবর ভালো নয়।

প্রত্যেক কথা উপর থেকে স্পষ্ট শুন্‌তে পেলুম।

তার পরে কি চুপি চুপি বল্লে, শোনা গেল না।

তার পরে একটা পাল্কী আর তারই পিছনে একটা ডুলি ফটকের মধ্যে ঢুক্‌ল। পাল্কীর পাশে পাশে মথুর ডাক্তার আস্‌ছিলেন। দেওয়ানজি জিজ্ঞাসা করলেন, ডাক্তারবাবু কি মনে করেন?

ডাক্তার বল্লেন, কিছু বলা যায় না। মাথায় বিষম চোট লেগেছে।

আর অমূল্যবাবু?

তাঁর বুকে গুলি লেগেছিল—তাঁর হয়ে গেছে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমাপ্ত

চেয়ে দেখা

এইক্ষণে
মোর হৃদয়ের প্রান্তে আমার নয়নবাতায়নে
যে-তুমি রয়েছ চেয়ে প্রভাত আলোতে
সে তোমার দৃষ্টি যেন নানা দিন নানা রাত্রি হতে
রহিয়া রহিয়া
চিত্তে মোর আনিছে বহিয়া
নীলিমার অপার সঙ্গীত,
নিঃশব্দের উদার ইঙ্গিত।

আজি মনে হয় বারেবারে
যেন মোর স্মরণের দূর পরপারে
দেখিয়াছ কত দেখা
কত যুগে, কত লোকে, কত চোখে, কত জনতায়, কত একা!
সেই সব দেখা আজি শিহরিছে দিকে দিকে
ঘাসে ঘাসে নিমিখে নিমিখে,
বেণুবনে ঝিলিমিলি পাতার ঝলক-ঝিকিমিকে।

কত নব নব অবগুণ্ঠনের তলে
দেখিয়াছ কত ছলে
চুপে চুপে
এক প্রেয়সীর মুখ কত রূপে রূপে
জন্মে জন্মে, নামহারা নক্ষত্রের গোধূলি-লগনে।
তাই আজি নিখিল গগনে
অনাদি মিলন তব অনন্ত বিরহ
এক পূর্ণ বেদনায় ঝঙ্কারি উঠিছে অহরহ।

তাই যা দেখিছ তারে ঘিরেছে নিবিড়
যাহা দেখিছ না তারি ভীড়।
তাই আজি দক্ষিণ পবনে
ফাল্গুনের ফুলগন্ধে ভরিয়া উঠিছে বনে বনে
ব্যাপ্ত ব্যাকুলতা,
বহুশত জনমের চোখে-চোখে কানে-কানে কথা।

শিলাইদা
৭ই ফাল্গুন ১৩২২।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আর্য্যসভ্যতার সহিত বঙ্গ-সভ্যতার যোগাযোগ

ভারতবর্ষের উত্তরাপথের প্রাচীনসভ্যতা মূলতঃ এবং মুখ্যতঃ যে আর্য্যসভ্যতা আমি আমার পূর্ব্ব-প্রবন্ধে তাই প্রমাণ করবার চেষ্ট করেছি। এবং এ কথাও সর্ব্বলোকবিদিত যে, আমরা নিজেদের সেই সভ্যতার উত্তরাধিকারী-স্বরূপে গণ্য মান্য এবং ধন্য মনে করি। আমাদের বল-বুদ্ধি-ভরসা সব ঐ আর্য্য-শব্দের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আমরা কি-অর্থে এবং কি-পরিমাণে আর্য্যধর্ম্মী, সে বিষয়ে আমাদের মনে একটি যথাসম্ভব স্পষ্ট ধারণা থাকা, আমি বাঙ্গালীর পক্ষে শ্রেয়স্কর মনে করি। আর্য্য এবং বাহ্যধর্ম্মসকলের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমার অনধিকার-চর্চ্চা করবার উদ্দেশ্যই হচ্ছে আমাদের স্বধর্ম্মের উৎপত্তির নির্ণয় করা।

বাঙ্গালীজাতি আর্য্যজাতি কি না, তাই নিয়ে দেখ্‌তে পাই পণ্ডিতে পণ্ডিতে মহা মতভেদ আছে। আমরা আর্য্যবংশীয় কিনা সে বিষয়ে অনেকের মনে সন্দেহ আছে এবং সে সন্দেহের বৈধ কারণও আছে। কি প্রাচীন শাস্ত্রমতে কি অর্ব্বাচীন বৈজ্ঞানিক মতে বাঙ্গালী যে আর্য্যজাতি বলে গণ্য নয়—এ-কথা সকলেই জানেন। শাস্ত্রমতে এক দ্বিজব্যতীত অপর-কেউ বংশমর্য্যাদা হিসেবে আর্য্যত্বের দাবী করতে পারেন না—এবং বাঙ্গালীজাতির মধ্যে দ্বিজের সংখ্যা যে কত অল্প তা বিশ্বসুদ্ধ লোক জানে। অপর পক্ষে ethnologists-দের মতে হাজারে ন-শ-নিরনব্বই জন বাঙ্গালী দ্রবিড়-মোগল-বংশীয়। কিন্তু এর থেকে বাঙ্গালীর

আর্য্যত্ব অপ্রমাণ হয় না। কেননা নৃতত্ত্ববিদেরা অদ্যাবধি এমন কোনও মাপকাঠি নির্ম্মাণ করতে পারেন নি যার সাহায্যে কোনও জাতির বংশনির্ণয় করা যেতে পারে। অপরপক্ষে ভাষার প্রমাণ যদি গ্রাহ্য হয় তাহলে আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, বাঙ্গালীজাতি মূলতঃ আর্য্যজাতি। বাঙ্গলাভাষা যে আর্য্যভাষা এ বিষয়ে দ্বিমত নেই। বর্ত্তমান বাঙ্গালীজাতির যে অনার্য্যদের সঙ্গে রক্তের সম্পর্ক আছে এ সত্য অস্বীকার করা যায় না—এবং তা অস্বীকার করবার কোনও আবশ্যকতা নেই। কেননা ভারতবর্ষে এমন কোনও জাতি নেই—যাদের শিরায় অনার্য্য রক্তের লেশমাত্রও নেই। একালের দ্বিজমাত্রেই যে খাঁটি আর্য্য এবং অ-দ্বিজ মাত্রেই যে খাঁটি আনার্য্য এরূপ বিশ্বাসের মূলে কোনও বৈধ কারণ নেই। পুরাকালে বহু আর্য্য যে দ্বিজত্ব-ভ্রষ্ট হয়েছিলেন এবং বহু অনার্য্য যে দ্বিজত্ব-লাভ করেছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সত্য কথা এই যে, আমরা ভারতবর্ষীয় হিন্দুরা সামাজিক হিসেবে যে-যাই হই, শারীরিক হিসেবে সবাই বর্ণসঙ্কর।

এ সত্ত্বেও আমরা যে আর্য্যসভ্যতার যথার্থ উত্তরাধিকারী এবং আমাদের স্বধর্ম্ম যে আর্য্যধর্ম্ম এ কথা নির্ভয়ে বলা যেতে পারে। সভ্যতা হচ্ছে মনের বস্তু। সুতরাং এ কথা যদি সত্যও হয় যে, প্রাচীন আর্য্যদের সঙ্গে বাঙ্গালীর রক্তের সম্পর্ক এক পাই, তাহলেও আর্য্যসভ্যতার সঙ্গে বাঙ্গালী-হিন্দুর মনের সম্পর্ক পোনোরো-আনা-তিন-পাই। অতএব আমাদের পক্ষে আর্য্যত্বের দাবী করা অসঙ্গত নয়। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে জাতীয় মানবই হ'ন তাঁরা আর্য্যভাষা আর্য্যধর্ম্ম আর্য্যআচার এবং আর্য্যজ্ঞানের অধীনতা

স্বীকার করেছিলেন। সুতরাং আমরা দেহে না হলেও মনে আর্য্য-জাতির বংশধর। এ সত্যের উপর কোনও ethnologist হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।

আমরা আর্য্যসভ্যতার উত্তরাধিকারী একথা সত্য হলেও উক্ত সত্ত্বে আমরা যা লাভ করেছি তার মূল্য কত তাও একটু যাচিয়ে দেখা দরকার। আর্য্যসভ্যতা ভারতবর্ষে 'ফেল্' করেছিল। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা সমগ্র ভারতবর্ষে একটি ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করতে পরেন নি—Legal হিসাবেও নয়, spiritual হিসেবেও নয়। এক মোটামুটি শীলগত ঐক্যছাড়া তাঁরা অপর কোনও বিষয়ে ভারতবাসীদের ঐক্যসাধন করতে পারেন নি। বৈদিক orthodoxyর সঙ্গে বাহ্য heresyর সংঘর্ষের ফলে, এদেশে কোনও একটি গোটা আর্য্যধর্ম্ম গড়ে ওঠে নি;—নানা খণ্ড বিখণ্ডে তা বিভক্ত হয়ে পড়েছে, এবং সেই সকল খণ্ডধর্ম্ম অনার্য্য আচার, অনার্য্য মনোভাবকে নিজের অন্তর্ভূত করে নিতে বাধ্য হয়েছে। এককথায় ভারতবর্ষের প্রাচীন আর্য্যসভ্যতার evolution নয় dissolutionএর দায় আমাদের উপরে এসে বর্ত্তেছে। আমরা যা পেয়েছি তা পূর্ণ সভ্যতা নয়—চূর্ণ সভ্যতা। ভারতবাসী এখন অগণ্য সম্প্রদায়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছে এবং আচারে বিচারে এইসকল খণ্ডসমাজ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কহীন। ফলে কে যে হিন্দু তা আমরা জানি, অথচ হিন্দুত্বের সামান্য লক্ষণ এবং ধর্ম্ম যে কি তা কেউ বলতে পারেন না। অর্থাৎ ইংরাজি লজিকের ভাষায় বলতে হলে, হিন্দু শব্দের denotation আছে connotation নেই। এই অনৈক্যের মধ্যে কোথায়ও একটা ঐক্য আবিষ্কার করবার আকাঙ্ক্ষাও আমা-

দের পক্ষে স্বাভাবিক। এই প্রবৃত্তিবশতঃ, যে-ঐক্য বর্ত্তমানে নেই সেই-ঐক্য আমরা ভারতবর্ষের অতীতে অনুসন্ধান করি। কিন্তু এ অনুসন্ধান নিষ্ফল; কেননা সেকালেও ভারতবাসীরা আর্য্যে অনার্য্যে জড়িয়ে একটি বিরাটপুরুষ হয়ে উঠতে পারেন নি।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই যে এদেশে অতীতে শান্তি ছিল না; যা ছিল তা হচ্ছে লড়াই। দেশে দেশে রাজায় রাজায় জাতিতে জাতিতে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যুগে যুগে যে শুধু লড়াই চলেছিল, প্রাচীন মুদ্রা, তাম্রশাসন, প্রশস্তি প্রভৃতি একবাক্যে এই-কথারই সাক্ষ্য দেয়। সেকালে বাহুবল বলো বুদ্ধিবল বলো সকলই পরস্পরের হিংসার কার্য্যে অপব্যয় করা হয়েছে। "অহিংসা পরম ধর্ম্ম"—এ-কথা হচ্ছে ভারতবর্ষের পীড়িত ব্যথিত হৃদয়ের কাতরোক্তি। কিন্তু এ কথার উপর একটি জাতীয় সভ্যতা গড়ে তোলা যায় না—কেননা এ শুধু নিষেধ-বাক্য। বিশ্বের অন্তরে একটি অনাদি অনন্ত "হাঁ"র চেহারা না দেখলে মানুষ বাড়া দূরে থাক বাঁচতেও পারে না। সুতরাং বৈদিকধর্ম্মের সঙ্কীর্ণতার প্রতিবাদস্বরূপে বৌদ্ধ জৈন চার্ব্বাক প্রভৃতি মতের সার্থকতা আছে—কিন্তু জাতীয় জীবন গঠনের শক্তিতে তা বঞ্চিত; কেননা ও-সকল ধর্ম্ম বিশ্বের অন্তরে শুধু একটি অনাদি অনন্ত "না"র মূর্ত্তি দেখতে পায়। নাস্তিকতা শূন্যবাদ স্যাৎবাদ প্রভৃতি, heresy হিসেবেই, মানব-সমাজের দেহ ও মনের পক্ষে বলকারক এবং অগ্নিবর্দ্ধক। কিন্তু ভারতবর্ষের কপালের দোষে তার এমন দিনও গিয়েছে যখন এই ঔষধই তার পথ্য হয়ে উঠেছিল।

সে যাই হোক্, জাতীয়সভ্যতা গঠন করবার শক্তি একমাত্র বৈদিকধর্ম্মেই ছিল, কেননা—সেধর্ম্ম পূর্ণাবয়ব এবং রাজসিক। Religion, Morality এবং Law বৈদিকধর্ম্মে এ-তিনের কোনটিই উপেক্ষিত হয় নি। এ ধর্ম্ম-মতে ব্যক্তি এবং সমাজ, ইহলোক এবং পরলোক পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে অনুস্যূত। সুতরাং সমগ্র ভারতবর্ষে এক-ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করবার ক্ষমতা একমাত্র এই ধর্ম্মেরই ছিল। তবে যে, বৈদিক-আর্য্যেরা আর্য্যসভ্যতার ঐক্যস্থাপন করতে অক্ষম হয়েছিলেন, তার একটি কারণ, তাঁদের আভিজাত্যের অহঙ্কার; আর-একটি—তাঁদের জাতি-বিরোধ। ভারতবর্ষের মানসিক-রাজ্যেও কুরুক্ষেত্র হয়ে গেছে। কি দৈহিক কি মানসিক উভয় বলেই আর্য্যেরা অনার্য্যদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ ছিলেন, সুতরাং অনার্য্যদের উপর নিজেদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রভুত্বস্থাপন করা এঁদের পক্ষে অতি সহজ ছিল। এর ফলে সাংসারিক এবং মানসিক—এ উভয়ক্ষেত্রেই একাধিপত্য করবার প্রবৃত্তি উত্তরোত্তর এঁদের মনে এত প্রাধান্য লাভ করেছিল যে, কোনরূপ বাহ্যআচার কিম্বা বাহ্যমতের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসা করা এঁদের ধাতে ছিল না। বৈদিক-ধর্ম্ম দ্বিজ-সর্ব্বস্ব এবং ব্রাহ্মণ-প্রধান। ব্রাহ্মণ-শাস্ত্রের ত কথাই নেই, বেদান্তের জ্ঞানেও শূদ্রের অধিকার নেই। এ ধর্ম্মের সঙ্গে বাহ্য-ধর্ম্মসকলের সর্ব্বপ্রধান প্রভেদ এই যে, সে-সকল ধর্ম্মে ব্রাহ্মণের স্থান নেই এবং তাতে শূদ্র যবন সকলেরি অধিকার ছিল। সুতরাং বেদধর্ম্ম এবং বাহ্যধর্ম্ম পরস্পর পরস্পরের ঘোর শত্রু হয়ে উঠেছিল। সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয়ক্ষেত্রে এই দুই শত্রুপক্ষের যুগ-

যুগান্তরের লড়ালড়িই ভারতবর্ষে আর্য্যসভ্যতার অধঃপতনের প্রথম কারণ।

তার পর, এই বৈদিক-ধর্ম্মের অন্তরেও এমন বিরোধ ছিল যে, তার সমন্বয় ক'রে তাকে এক-ধর্ম্মে পরিণত করাও সেকালে সম্ভবপর হয়নি। এই বিরোধের কারণ এই যে, এ ধর্ম্ম অপৌরুষেয়; অর্থাৎ নানান মুনির নানান মতের নামই শ্রুতি। কোনও বিশেষ পুরুষকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে মতের ঐক্য থাকে, কেননা তা এক ব্যক্তিরই মত। প্রথমেই নজরে পড়ে যে, এ-ধর্ম্মে কর্ম্ম এবং জ্ঞান পরস্পর পৃথক হয়ে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত মার্গ অবলম্বন করলে। আত্মা গমন করলেন অরণ্যে—আর দেহ পড়ে থাক্‌ল গৃহে। এর ফলে জীবন আত্মা-হীন এবং আত্মা নির্জ্জীব হয়ে পড়ল। দেহ ও আত্মা একবার পৃথক হয়ে গেলে তাদের পুনর্ব্বার সমন্বয় করা মানুষের সাধ্যের অতীত। বেদপন্থীরা এই অসাধ্য-সাধনের চেষ্টা কখনও করেন নি। বরং তাঁরা নিজের নিজের কোট্ বজায় রাখবার জন্য নিজ নিজ সাম্প্রদায়িক মতের মীমাংসা কর্‌তেই ব্যস্ত ছিলেন। এ মীমাংসার উদ্দেশ্য স্বপক্ষের বিরোধের সমন্বয় করা। কর্ম্ম এবং জ্ঞান এ উভয় কাণ্ডেই নেতি নেতি করে মীমাংসা করে হয়েছিল। ফলে ইতি দাঁড়াল এই যে—ব্রহ্মবাদ শূন্যবাদের কোঠায় এবং মন্ত্রাত্মক দেবতাবাদ নাস্তিকতার কোঠায় গিয়ে পড়ল; অর্থাৎ একদিকে থাক্‌ল—ভক্তিহীন ক্রিয়াহীন জ্ঞান, আর-একদিকে থাকল—জ্ঞানহীন ভক্তিহীন ক্রিয়া। এ জ্ঞান এবং এ ক্রিয়া দুইই চলৎ-শক্তি-রহিত; কেননা এর ভিতর ভক্তি নেই অর্থাৎ মানব হৃদয় নেই, অতএব রক্তের চলাচল নেই। এই

হচ্ছে ভারতবর্ষের আর্য্যসভ্যতার গতি স্থগিত হয়ে যাবার অপর কারণ।

সুতরাং আমরা উত্তরাধিকারী-সত্বে যা লাভ করেছি তা হচ্ছে আর্য্যসভ্যতার ভাঙ্গা ঘর। সেই ঘরে কায়-ক্লেশে মনের সুখে বাস করাতে আর্য্য-মনোভাবের পরিচয় দেওয়া হয় না। আমরা যদি বৈদিক আর্য্যদের আত্মার উত্তরাধিকারী হতুম তাহলে সভ্যতার যে-ঘর মাথা-ভারি হওয়ার দরুন, অর্দ্ধেক না উঠতেই ভেঙ্গে পড়েছে সেই-ঘর আবার গড়ে তুলতে চেষ্টা করতুম, এবং তার জন্য দরকার, জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের জীবনে সমন্বয় করা,—দর্শনে না। মীমাংসা-দর্শনের পথ সব চোরাগলি, তার ভিতর একবার প্রবেশ করলে, মীমাংসকেরা যেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তার থেকে এক-পাও বেশি অগ্রসর হবার যো নেই,—জীবনে ফিরে আসবারও কোনও উপায় নেই। বৈদিক এবং বাহ্যধর্ম্ম-সকলের সমন্বয় খালি এক ক্ষেত্রে হতে পারে এবং সে-ক্ষেত্রের ইংরাজি নাম Metaphysical nihilism.

আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মসকলের নবীন-সমন্বয়কারীরা আশা করি এই কথাটি মনে রাখবেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

কন্‌গ্রেসের আইডিয়াল্

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই বন্দরে কন্‌গ্রেসের জন্ম হয়। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা সহরে তা সাবালক হয়। তার পর-বৎসর সুরাট নগরীতে তার মৃত্যু হয়। এ বৎসর আবার তার জন্মস্থানে তার পুনর্জ্জন্ম হয়েছে।

এবার কিন্তু কন্‌গ্রেসের ধড়ে প্রাণ আসে নি, তার প্রাণে ধড় এসেছে। সকলেই জানেন, সুরাটে কন্‌গ্রেসের মৃত্যু হয়নি, তার অপমৃত্যু ঘটেছিল, আর সে যেমন-তেমন অপমৃত্যু নয়—একসঙ্গে খুন এবং আত্মহত্যা। এদেশে কারও অপমৃত্যু ঘটলে তার আত্মার ততদিন সদ্গতি হয় না যতদিন-না তা আবার একটি নূতন দেহে প্রবেশ লাভ করতে পারে। কন্‌গ্রেসের সূক্ষ্ম শরীর তাই এ-কয়-বৎসর একটি স্থূল শরীরের তল্লাসে এদেশে ওদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অতঃপর বোম্বাই-ধামে তা লাভ করেছে। গত কন্‌গ্রেসে বিশ-হাজার লোক জমায়েৎ হয়েছিল।

কন্‌গ্রেসওয়ালাদের মতে কিন্তু কন্‌গ্রেসের কস্মিনকালেও মৃত্যু হয়নি। সুরাটে শুধু স্বরাট পাগল হয়ে কন্‌গ্রেসকে জখম করে, নিজে করেছিলেন আত্মহত্যা। তার পর, যেহেতু সে স্বরাট কন্‌গ্রেসেই জন্মলাভ করেছিল, সেই জন্য তার ভূত তার জন্মদাতার স্কন্ধে ভর-করবার চেষ্টায় ফিরছিল। সেই ভূতের ভয়ে কন্‌গ্রেস

এতদিন ঘরের দুয়োর বন্ধ করে বসেছিল। এই বন্ধ ঘরের দূষিত বায়ুতেই তার শরীর কাহিল হয়ে গিয়েছিল। অথচ কন্‌গ্রেস এই ভূতের উপদ্রব থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনও উপায় বার করতে পারে নি। এবার নব মন্ত্রের বলে স্বরাটের ভূত—ভবিষ্যৎ হয়ে গেছে। তাই কন্‌গ্রেসের দেহটি আবার নাদুস্‌নুদুস্‌ হয়ে উঠেছে। এককথায় কন্‌গ্রেস এবার বেঁচে ওঠে নি—বেঁচে গিয়েছে।

সে যাই হো'ক। কন্‌গ্রেসের এবার ভোল ফিরেছে এবং সেই সঙ্গে তার বোল ফিরেছে। এতদিন কন্‌গ্রেস ছিল বড়দিনের দুর্গোৎসব। তিনদিন ধরে "ধনং দেহি মানং দেহি" বলে দুসন্ধ্যা ইংরাজিতে মন্ত্র আওড়ান এবং সেই উপলক্ষ্যে খানাপিনা নাচ-তামাসা আমোদ-আহ্লাদ এবং তার পরে বিসর্জ্জন এবং তার পরে কন্‌গ্রেসওয়ালাদের পরস্পর কোলাকুলি করে, গৃহাভিমুখে যাত্রা—এই ছিল কন্‌গ্রেসের হাল ও চাল।

ভবিষ্যতে শুন্‌ছি কন্‌গ্রেসের সপ্তমী অষ্টমী নবমী থাক্‌বে কিন্তু দশমীতেই সব শেষ হবে না। তার পর বারোমাস ধরে কন্‌গ্রেস তার স্বধর্ম্ম প্রচার করবে। অর্থাৎ কন্‌গ্রেস এবার জাতীয়-রাজনৈতিক-শিক্ষা-পরিষদে পরিণত হল। কন্‌গ্রেসের এ সংকল্প অতি সাধু-সংকল্প সন্দেহ নেই—কিন্তু যে বিষয়ে সন্দেহ আছে তা হচ্ছে এই যে, এ সংকল্প কার্য্যে পরিণত হবে কি না।

প্রথমতঃ রাজনীতি বল্‌তে যা বোঝায় তা দেশসুদ্ধ লোককে

বোঝানো কঠিন। ও-পদার্থ আমরা ইউরোপ থেকে আমদানি করেছি। সে দেশে একালে ও-বস্তু হচ্ছে তাই, যার ভিতর একদিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে রাজাও নেই নীতিও নেই; আবার আর-একদিক দিয়ে দেখ্‌তে গেলে ও-দুইই আছে। এই দুটো দিক যাতে একসঙ্গে চোখে পড়ে এমন-করে দেশের চোখ-ফোটানোর জন্য যে জ্ঞানাঞ্জন শলাকার আবশ্যক, তা দেশী-ভাষা নয়। ব্রহ্ম যে একাধারে সগুণ এবং নির্গুণ এ সত্য বোঝাতে হলে যেমন সংস্কৃত ভাষার সাহায্য চাই, তেমনি রাজনীতি যে একসঙ্গে রাজমন্ত্র এবং প্রজাতন্ত্র হতে পারে এ সত্য বোঝাতে হলে ইংরাজির সাহায্য চাই।

কন্‌গ্রেস অবশ্য এতে পিছপাও হবে না। কেননা কন্‌গ্রেসের পাণ্ডারা ঐ এক ইংরাজি ভাষাই জানেন এবং ঐ এক ইংরাজি ভাষাই মানেন। তবে তাঁদের কথা বোঝে এমন লোক দেশে ক'টি? অতএব তাঁরা যদি দেশকে রাজনৈতিক-শিক্ষা দিতে বসেন ত ফলে দাঁড়াবে এই যে, কন্‌গ্রেসওয়ালারাই পালা করে পরস্পর পরস্পরের গুরু শিষ্য হবেন। সুতরাং যতদিন না ভারতবর্ষের ত্রিশকোটি লোক ইংরাজি-শিক্ষিত হয়ে ওঠে, ততদিন এই রাজনৈতিক-শিক্ষার কার্য্যটা মুলতবি রাখাই কর্ত্তব্য। সে শিক্ষা যে শুধু নিষ্ফল হবে তাই নয়, তার কুফলও হতে পারে। শিক্ষা দিতে গিয়ে হয় ত কন্‌গ্রেসকে দুদিন পরে দেশের লোককে বল্‌তে হবে—"উল্টা বুঝিলি রাম!" এ বিপদ যে আছে তার প্রমাণও আছে। আর এরূপ উল্টা বোঝাটা রামের পক্ষে আরামের

নয়। এবং সে অবস্থায় কন্‌গ্রেসের পক্ষে তাকে ভ্যাবাগঙ্গারাম বলাটাও সঙ্গত নয়।

দ্বিতীয়তঃ, জাতীয় রাজনৈতিক-শিক্ষার জন্য একটা জাতীয় রাজনৈতিক-আদর্শ থাকা আবশ্যক। একটা আইডিয়াল্‌ যে থাকা চাইই চাই এ কথা কন্‌গ্রেসও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। এস্থলে যদি কেউ প্রশ্ন করেন যে, কন্‌গ্রেস কি আজও তেমন কোন রাজনৈতিক-আদর্শের সন্ধান পেয়েছেন? তাহলে কন্‌গ্রেস-ওয়ালারা উচ্চকণ্ঠে উত্তর দেবেন—অবশ্য পেয়েছি। এবং সে আদর্শের নাম হচ্ছে—"সাম্রাজ্যের ভিতর স্বরাজ্য।"

নিত্য দেখ্‌তে পাই যে, একদলের মতে ভারতবর্ষে স্বরাজকতার অর্থ হচ্ছে অরাজকতা, আর-একদলের মতে অরাজকতার অর্থই হচ্ছে স্বরাজকতা। এই দুটি হচ্ছে আমাদের রাজনৈতিক গগনের শুক্ল আর কৃষ্ণ পক্ষ। কন্‌গ্রেস অবশ্য এই দুই মতই সমান অগ্রাহ্য করেন; কেননা এই দুয়ের মধ্যস্থ দল হচ্ছে কন্‌গ্রেস। এ মতে শুদ্ধ-স্বরাজ্য সম্বন্ধে এইরূপ মতভেদ হতে পারে কিন্তু "সাম্রাজ্যের ভিতর স্বরাজ্য" সম্বন্ধে হতে পারে না। কেননা সাম্রাজ্যের ভিতর স্বরাজ্য যে খাপ খাওয়ানো যেতে পারে তার উদাহরণ ক্যানাডা অষ্ট্রেলিয়া সাউথ-আফ্রিকা প্রভৃতি। সুতরাং যার এত নজির আছে সেই আদর্শের পক্ষে ওকালতি করায় বাধা নেই; অতএব এ আদর্শ বিদ্যাসঙ্গতও বটে বুদ্ধিসঙ্গতও বটে; কেননা যদি বর্ত্তমানের উপাদান নিয়ে ভবিষ্যতের মূর্ত্তি গড়তে হয়

তাহলে এ-ছাড়া অন্য কোনো আদর্শ হতে পারে না। তবে এই আদর্শকে বিপক্ষ-পক্ষ হেসে এই প্রশ্ন করেন যে—

"তুমি কোন গগনের ফুল ?
তুমি কোন বাগনের চাঁদ ?"

এর উত্তরে স্বয়ং প্রশ্নকর্ত্তাই বলেন যে, এ আদর্শ ইংরাজি-শিক্ষিত ভারতবর্ষের চিদ্-আকাশের ফুল এবং ইংরাজি-শিক্ষিত ভারত-বর্ষের অমাবস্যার চাঁদ।

—

এ কথা শুনে কন্‌গ্রেস বলেন, এ ভবিষ্যতের আদর্শ এবং সে ভবিষ্যৎও এত দূর-ভবিষ্যৎ যে, বর্ত্তমানের ধূলো যাঁদের চোখে ঢুকেছে সেই সকল অন্ধলোকেই এর সাক্ষাৎ পান না বলে, এর অস্তিত্বেও বিশ্বাস করেন না। এ আদর্শ ভারতবর্ষের কল্পনার ধন। এ ত হাতে নাগাল পাবার জিনিষ নয়—মনশ্চক্ষে দূরবীন্ কশে এ আদর্শ দেখ্‌তে হয়। কন্‌গ্রেসের সকল বাণীই যে ভবিষ্যদ্বাণী, এ জ্ঞান থাক্‌লে বিপক্ষ-পক্ষ কন্‌গ্রেসের কথা শুনে আর হাস্‌ত না।

ভবিষ্যতে কি হতে পারে আর না হতে পারে সে বিষয়ে ত্রিকালজ্ঞ স্বয়ং ভগবান ছাড়া আর কেউ কিছু বল্‌তে পারেন না। সুতরাং দূর-ভবিষ্যতে যে ঐ আদর্শ চাঁদ ভারতবাসীর হাতে আসবে না এবং তাদের মাথায় ঐ আকাশকুসুমের পুষ্পবৃষ্টি হবে না একথা জোর করে কে বল্‌তে পারে! তবে এখন ঐ চাঁদকে ডেকে "আয় আয় আমাদের মাথায় টী দিয়ে যা"—আর ঐ

আকাশকুসুমকে ডেকে—"যেখানে আছ সেখানেই থাকো, দেখো যেন ঝরে আমাদের গায়ে পড়ো না"—একথা বলা ছাড়া আমাদের উপায়ান্তর নেই। কেননা বেশি আলোয় আমাদের চোখ ঝলসে যায় আর আমরা ফুলের ঘায়ে মূর্চ্ছা যাই।

তবে কথা হচ্ছে এই যে, বর্ত্তমানকে আমরা একেবারেই উপেক্ষা করতে পারি নে, কেননা এ পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের যা সম্বন্ধ তা বর্ত্তমানেরই সম্বন্ধ। "চোখ বুঁজলেই অন্ধকার"—এ প্রবাদ ত সকলেই জানেন। সুতরাং আমাদের খোলাচোখের জন্যও একটা আদর্শ থাকা দরকার। আমরা চাই সেই ফুল যার দ্বারা মার নিত্যপূজা চল্‌বে আর সেই চাঁদ যার আলোতে আমরা রাত্তিরে পথ দেখ্‌তে পাব। বলা বাহুল্য যে, এদেশে এখন রাত্তির, আর আমরা জাতকে-জাত রাত-কানা।

অতএব কন্‌গ্রেসের পক্ষে জাতীয়-রাজনৈতিক-শিক্ষা-পরিষৎ হবার পূর্ব্বে জাতীয়-রাজনৈতিক-আদর্শ-অনুসন্ধান-সমিতি হওয়া কর্ত্তব্য।

ইতিমধ্যে আমি একটি আটপৌরে আদর্শ দেশের হাতে ধরে দিতে চাই। আমার কথা এই—এস আমরা ঘরে বসে নিজের নিজের চরকায় বিলেতি তেল দেই, তাহলেই সকলে মিলে ভারতমাতার চর্‌কায় স্বদেশী তেল দেওয়া হবে, এবং তাতে মা আমাদের যে কাট্‌না কাটবেন তার সূতো মাকড়সার সূতোর চাইতেও সূক্ষ্ম হবে—এবং সেই সূতোর জাল বুনে সেই ফাঁদে আমরা আকাশের চাঁদ ধরব।

বীরবল।

মধ্যাহ্নে

তোমাতে আমাতে দেখা শুভ শুভ্রক্ষণে,—
নিভৃত মধ্যাহ্নসুপ্ত নিঝুম ভুবনে।
অলস হৃদয়ে জাগে রূপের স্বপন,—
আঁখি খুলে দেখি তব মধুর আনন—
ধ্যান-অবসানে যথা ভক্তের নয়নে
আবির্ভূত দেব-মূর্ত্তি উন্মদ কিরণে!
কথা কও—আঁখি সনে জুড়াক্ শ্রবণ,—
—মধুবাণী তিক্তবাণী যাহা চাহে মন।
রূপসীর তিরস্কার প্রাণে মিষ্ট বাজে,
মধু-মুখ রাঙা ঠোঁটে ঠোঁট-নাড়া সাজে!
হাসিতেছ! কর-পদ্ম দাও মম করে,
বসন্ত জাগ্রত—ছায়া সুপ্ত পথ পরে।
স্নিগ্ধ বায়ু, চল যথা ছায়া তরুতলে
আস্তীর্ণ শ্যামল শয্যা কাননের কোলে।

শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

সবুজ পত্র

ছাত্রশাসন তন্ত্র

প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রদের সহিত কোনো কোনো য়ুরোপীয় অধ্যাপকের যে বিরোধ ঘটিয়াছে তাহা লইয়া কোনো কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করি। তার একটা কারণ, ব্যাপারটা দেখিতেও ভাল হয় নাই, শুনিতেও ভাল নয়, আর একটা কারণ, ইংরেজ ও ভারতবাসীর সম্পর্কটার মধ্যে যেখানে কিছু ব্যথা আছে সেখানে নাড়া দিতে ইচ্ছা করে না।

কিন্তু কথাটাকে চাপা দিলে চলিবে না। চাপা থাকেও নাই— বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মনে-মনে বা কানে-কানে বা মুখে-মুখে সকলেই এর বিচার করিতেছে।

বিকৃতি ভিতরে জমিতে থাকিলে একদিন সে আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। লাল হইয়া শেষকালে ফাটিয়া পড়ে। তখনকার মত সেটা সুদৃশ্য নয়।

বাহিরে ফুটিয়া পড়াটাকেই দোষ দেওয়া বিশ্ববিধানকে দোষ দেওয়া—এমনতর অপবাদে বিশ্ববিধাতা কান দেন না। ভিতরে ভিতরে জমিতে দেওয়া লইয়াই আমাদের নালিশ চলে।

যাক্, বাহির যখন হইয়াছেই তখন বিচার করিয়া কোনো একটা জায়গায় শাস্তি না দিলে নয়। এইটেই সঙ্কটের সময়। জিনিসটা ভদ্ররকমের নহে এটা ঠিক। ইহার আক্রোশটা প্রকাশ করিব কার উপরে? প্রায় দেখা যায় সহজে যার উপরে জোর খাটে শাসনের ধাক্কাটা তারই উপরে পড়ে। ঘরের গৃহিণী যেখানে বৌকে মারিতে ভয় পায় সেখানে ঝিকে মারিয়া কর্ত্তব্য পালন করে।

বিচারসভা বসিয়াছে। ইতিমধ্যেই ছাত্রদের সম্বন্ধে শাসন কড়া করিবার জন্য কোনো মিশনারি কলেজের কর্ত্তা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট আবদার প্রকাশ করিয়াছেন। কথাটা শুনিতেও হঠাৎ সঙ্গত বোধ হয়। কারণ, ছাত্রেরা অধ্যাপকদের অসম্মান করিলে সেটা যে কেবল অপরাধ হয় তাহা নহে সেটা অস্বাভাবিক হইয়া উঠে। যেখান হইতে আমরা জ্ঞান পাই সেখানে আমাদের শ্রদ্ধা যাইবে এটা মানবপ্রকৃতির ধর্ম্ম। তাহার উল্টা দেখিলে বাহিরের শাসনে এই বিকৃতির প্রতিকার করিতে হইবে সে কথা সকলেই স্বীকার করিবেন।

কিন্তু প্রতিকারের প্রণালী স্থির করিবার পূর্ব্বে ভাবিয়া দেখা চাই স্বভাব ওলটায় কিসে।

কাগজে দেখিতে পাই অনেকে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতেছেন যে, যে-ভারতবর্ষে গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ ধর্ম্মসম্বন্ধ সেখানে এমনতর ঘটনা বিশেষভাবে গর্হিত। শুধু গর্হিত এ কথা বলিয়া পার পাইব না, চিরকালীন এই সংস্কার অস্থিমজ্জার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও

ব্যবহারে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতেছে কেন এর একটা সত্য উত্তর বাহির করিতে হইবে।

বাংলাদেশের ছাত্রদের মনস্তত্ত্ব যে বিধাতার একটি খাপছাড়া খেয়াল একথা মানি না। ছেলেরা যে-বয়সে কলেজে পড়ে সেটা একটা বয়ঃসন্ধির কাল। তখন শাসনের সীমানা হইতে স্বাধীনতার এলাকায় সে প্রথম পা বাড়াইয়াছে। এই স্বাধীনতা কেবল বাহিরের ব্যবহারগত নহে; মনোরাজ্যেও সে ভাষার খাঁচা ছাড়িয়া ভাবের আকাশে ডানা মেলিতে সুরু করিয়াছে। তার মন প্রশ্ন করিবার তর্ক করিবার বিচার করিবার অধিকার প্রথম লাভ করিয়াছে। শরীর মনের এই বয়ঃসন্ধিকালটিই বেদনাকাতরতায় ভরা। এই সময়েই অল্পমাত্র অপমান মর্ম্মে গিয়া বিঁধিয়া থাকে এবং আভাসমাত্র প্রীতি জীবনকে সুধাময় করিয়া তোলে। এই সময়েই মানব-সংস্রবের জোর তার পরে যতটা খাটে এমন আর কোনো সময়েই নয়।

এই বয়সটাই মানুষের জীবন মানুষের সঙ্গপ্রভাবেই গড়িয়া উঠিবার পক্ষে সকলের চেয়ে অনুকূল, স্বভাবের এই সত্যটিকে সকল দেশের লোকেই মানিয়া লইয়াছে। এই জন্যই আমাদের দেশে বলে "প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ"—তার মানে, এই বয়সেই ছেলে যেন বাপকে পূরাপূরি মানুষ বলিয়া বুঝিতে পারে শাসনের কল বলিয়া নহে—কেননা, মানুষ হইবার পক্ষে মানুষের সংস্রব এই বয়সেই দরকার। এই জন্যই সকল দেশেই য়ুনিভর্সিটিতে ছাত্ররা এমন একটুখানি সম্মানের পদ পাইয়া থাকে যাহাতে অধ্যাপকদের বিশেষ কাছে তারা আসিতে পারে এবং সেই সুযোগে তাদের জীবনের পরে মানব-সংস্রবের হাত

পড়িতে পায়। এই বয়সে ছাত্রগণ শিক্ষার উদ্যোগপর্ব্ব শেষ করিয়া মনুষ্যত্বের সার জিনিসগুলিকে আত্মসাৎ করিবার পালা আরম্ভ করে—এই কাজটি স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান ছাড়া হইবার জো নাই। সেই জন্যই এই বয়সে আত্মসম্মানের সম্বন্ধে দরদ বড় বেশি হয়। চিবাইয়া খাইবার বয়স আসিলে বেশ একটু জানান্ দিয়া দাঁত ওঠে তেমনি মনুষ্যত্বলাভের যখন বয়স আসে তখন আত্মসম্মানবোধটা একটু ঘটা করিয়াই দেখা দেয়।

এই বয়ঃসন্ধির কালে ছাত্রেরা মাঝে মাঝে এক-একটা হাঙ্গাম বাধাইয়া বসে। যেখানে ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপকের সম্বন্ধ স্বাভাবিক সেখানে এই সকল উৎপাতকে জোয়ারের জলের জঞ্জালের মত ভাসিয়া যাইতে দেওয়া হয়—কেননা তাকে টানিয়া তুলিতে গেলেই সেটা বিশ্রী হইয়া উঠে।

বিধাতার নিয়ম অনুসারে বাঙালী ছাত্রদেরও এই বয়ঃসন্ধির কাল আসে, তখন তাহাদের মনোবৃত্তি যেমন একদিকে আত্মশক্তির অভিমুখে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে চায় তেমনি আর একদিকে যেখানে তারা কোনো মহত্ত্ব দেখে, যেখান হইতে তারা শ্রদ্ধা পায়, জ্ঞান পায়, দরদ পায়, প্রাণের প্রেরণা পায় সেখানে নিজেকে উৎসর্গ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। মিশনরি কলেজের বিধাতাপুরুষের বিধানে ঠিক এই বয়সেই তাহাদিগকে শাসনে পেষণে দলনে দমনে নির্জ্জীব জড়পিণ্ড করিয়া তুলিবার জাঁতাকল বানাইয়া তোলা জগদ্বিধাতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—ইহাই প্রকৃত নাস্তিকতা।

জেলখানার কয়েদী নিয়মের নড়চড় করিলে তাকে কড়া শাসন করিতে কারো বাধে না কেননা তাকে অপরাধী বলিয়াই

দেখা হয়, মানুষ বলিয়া নয়। অপমানের কঠোরতায় মানুষের মনে কড়া পড়িয়া তাকে কেবলি অমানুষ করিতে থাকে সে হিসাবটা কেহ করিতে চায় না—কেননা, মানুষের দিক দিয়া তাকে হিসাব করাই হয় না। এইজন্য জেলখানার সর্দ্দারি যে করে সে, মানুষকে নয়, অপরাধীকেই সকলের চেয়ে বড় করিয়া দেখে।

সৈন্যদলকে তৈরি করিয়া তুলিবার ভার যে লইয়াছে সে মানুষকে একটি মাত্র সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনের দিক হইতেই দেখিতে বাধ্য। লড়াইয়ের নিখুঁত কল বানাইবার ফরমাস তার উপরে। সুতরাং সেই কলের হিসাবে যে কিছু ত্রুটি সেইটে সে একান্ত করিয়া দেখে এবং নির্ম্মমভাবে সংশোধন করে।

কিন্তু ছাত্রকে জেলের কয়েদী বা ফৌজের সিপাই বলিয়া আমরা ত মনে ভাবিতে পারি না। আমরা জানি তাহাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। মানুষের প্রকৃতি সূক্ষ্ম এবং সজীব তন্তুজালে বড় বিচিত্র করিয়া গড়া। এই জন্যই মানুষের মাথা ধরিলে মাথায় মুগুর মারিয়া সেটা সারানো যায় না—অনেক দিক বাঁচাইয়া প্রকৃতির সাধ্যসাধনা করিয়া তার চিকিৎসা করিতে হয়। এমন লোকও আছে এ সম্বন্ধে যারা বিজ্ঞানকে খুবই সহজ করিয়া আনিয়াছে—তারা সকল ব্যাধিরই একটিমাত্র কারণ ঠিক করিয়া রাখিয়াছে, সে হচ্চে ভূতে পাওয়া। এবং তারা মিশনারি কলেজের ওঝাটির মত ব্যাধির ভূতকে মারিয়া ঝাড়িয়া গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়া চীৎকার করিয়া ভাড়াইতে চায়। তাহাতে ব্যাধি যায় এবং প্রাণপদার্থের প্রায় পনেরো আনা তার অনুসরণ করে।

এ হইল আনাড়ির চিকিৎসা। যারা বিচক্ষণ তারা ব্যাধিটাকেই

স্বতন্ত্র করিয়া দেখে না; চিকিৎসার সময় তারা মানুষের সমস্ত ধাতটাকে অখণ্ড করিয়া দেখে; মানব প্রকৃতির জটিলতা ও সূক্ষ্মতাকে তারা মানিয়া লয় এবং বিশেষ কোনো ব্যাধিকে শাসন করিতে গিয়া সমস্ত মানুষকে নিকাশ করিয়া বসে না।

অতএব যাদের উচিত ছিল, জেলের দারোগা বা ড্রিল সার্জ্জেণ্ট বা ভূতের ওঝা হওয়া তাদের কোনমতেই উচিত হয় না ছাত্রদিগকে মানুষ করিবার ভার লওয়া। ছাত্রদের ভার তাঁরাই লইবার অধিকারী যাঁরা নিজের চেয়ে বয়সে অল্প, জ্ঞানে অপ্রবীণ ও ক্ষমতায় দুর্ব্বলকেও সহজেই শ্রদ্ধা করিতে পারেন, যাঁরা জানেন শক্তস্য ভূষণং ক্ষমা, যাঁরা ছাত্রকেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না।

যিশুখৃষ্ট বলিয়াছেন, শিশুদিগকে আমার কাছে আসিতে দাও। তিনি শিশুদিগকে বিশেষ করিয়া শ্রদ্ধা করিয়াছেন। কেননা শিশুদের মধ্যেই পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা আছে। যে মানুষ বয়সে পাকা হইয়া অভ্যাসে সংস্কারে ও অহমিকায় কঠিন হইয়া গেছে সে মানুষ সেই পূর্ণতার ব্যঞ্জনা হারাইয়াছে—বিশ্বগুরুর কাছে আসা তার পক্ষেই বড় কঠিন।

ছাত্রেরা গড়িয়া উঠিতেছে,—ভাবের আলোকে রসের বর্ষণে তাদের প্রাণ-কোরকের গোপন মর্ম্মস্থলে বিকাশবেদনা কাজ করিতেছে। প্রকাশ তাদের মধ্যে থামিয়া যায় নাই—তাদের মধ্যে পরিপূর্ণতার ব্যঞ্জনা। সেইজন্যই সৎগুরু ইহাদিগকে শ্রদ্ধা করেন, প্রেমের সহিত কাছে আহ্বান করেন, ক্ষমার সহিত ইহাঁদের অপরাধ মার্জ্জনা করেন এবং ধৈর্য্যের সহিত ইহাদের চিত্তবৃত্তিকে ঊর্দ্ধের দিকে উদ্ঘাটন করিতে থাকেন। ইহাদের মধ্যে পূর্ণ মনুষ্যত্বের মহিমা

প্রভাতের অরুণরেখার মত অসীম সম্ভাব্যতার গৌরবে উজ্জ্বল; সেই গৌরবের দীপ্তি যাদের চোখে পড়ে না—যারা নিজের বিদ্যা, পদ বা জাতির অভিমানে ইহাদিগকে পদে পদে অবজ্ঞা করিতে উদ্যত তারা গুরুপদের অযোগ্য। ছাত্রদিগকে যারা স্বভাবতই শ্রদ্ধা করিতে না পারে ছাত্রদের নিকট হইতে ভক্তি তারা সহজে পাইতে পারিবে না। কাজেই ভক্তি জোর করিয়া আদায় করিবার জন্য তারাই রাজদরবারে কড়া আইন ও চাপ্‌রাসওয়ালা পেয়াদার দরবার করিয়া থাকে।

ছাত্রদিগকে কড়া শাসনের জালে যাঁরা মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বাঁধিয়া ফেলিতে চান তাঁরা অধ্যাপকদের যে কত বড় ক্ষতি করিতেছেন সেটা যেন ভাবিয়া দেখেন। পৃথিবীতে অল্প লোকই আছে নিজের অন্তরের মহৎ আদর্শ যাহাদিগকে সত্য পথে আহ্বান করিয়া লইয়া যায়। বাহিরের সঙ্গে ঘাত প্রতিঘাতের ঠেলাতেই তারা কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া থাকে। বাহিরের সঙ্গে বোঝাপড়া আছে বলিয়াই তারা আত্মবিস্মৃত হইতে পারে না।

এই জন্যই চারিদিকে যেখানে দাসত্ব মনিবের সেখানে দুর্গতি, শূদ্র যেখানে শূদ্র ব্রাহ্মণের সেখানে অধঃপতন। কঠোর শাসনের চাপে ছাত্রেরা যদি মানব-স্বভাব হইতে ভ্রষ্ট হয়, সকল প্রকার অপমান, দুর্ব্যবহার ও অযোগ্যতা যদি তারা নির্জ্জীবভাবে নিঃশব্দে সহিয়া যায় তবে অধিকাংশ অধ্যাপকদিগকেই তাহা অধোগতির দিকে টানিয়া লইবে। ছাত্রদের মধ্যে অবজ্ঞার কারণ তাঁরা নিজে ঘটাইয়া তুলিয়া তাহাদের অবমাননার দ্বারা নিজেকে

অহরহ অবমানিত করিতে থাকিবেন। অবজ্ঞার ক্ষেত্রে নিজের কর্ত্তব্য কখনই কেহ সাধন করিতে পারে না।

অপর পক্ষ বলিবেন, তবে কি ছেলেরা যা-খুসি-তাই করিবে, আর সমস্তই সহিয়া লইতে হইবে? আমার কথা এই, ছেলেরা যা-খুসি-তাই কখনই করিবে না। তারা ঠিক পথেই চলিবে যদি তাহাদের সঙ্গে ঠিকমত ব্যবহার করা হয়। যদি তাহাদিগকে অপমান কর, তাহাদের জাতি বা ধর্ম্ম বা আচারকে গালি দাও, যদি দেখে তাহাদের পক্ষে সুবিচার পাইবার আশা নাই, যদি অনুভব করে যোগ্যতাসত্ত্বেও তাহাদের স্বদেশীয় অধ্যাপকেরা অযোগ্যের কাছে মাথা হেঁট করিতে বাধ্য তবে ক্ষণে ক্ষণে তারা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেই—যদি না করে তবে আমরা সেটাকে লজ্জা এবং দুঃখের বিষয় বলিয়া মনে করিব।

অপর পক্ষে একটি সঙ্গত কথা বলিবার আছে। য়ুরোপীয়ের পক্ষে ভারতবর্ষ বিদেশ, এখানকার আবহাওয়া ক্লান্তিকর, তাঁহাদের পানাহার উত্তেজক, আমরা তাঁহাদের অধীনস্থ জাতি, আমাদের বর্ণ ধর্ম্ম, ভাষা, আচার সমস্তই স্বতন্ত্র; তার উপরে, এদেশে প্রত্যেক ইংরেজই রাজশক্তি বহন করেন, সুতরাং রাজাসন তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে থাকে;—এই জন্য ছাত্রকে কেবলমাত্র ছাত্র বলিয়া দেখা তাঁর পক্ষে শক্ত, তাকে প্রজা বলিয়াও দেখেন। অতএব অতি সামান্য কারণেই অসহিষ্ণু হওয়া তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। বাঙালি ছাত্রদের মানুষ করিবার ভার কেবল তাঁর নয়, ইংরেজ রাজের প্রতিষ্ঠা রক্ষার ভারও তাঁর। অতএব একে তিনি ইংরেজ, তার উপর তিনি ইম্পীরিএল সার্ভিসের অধ্যাপক, তার উপরে তিনি রাজার অংশ,

তার উপরে তাঁর বিশ্বাস তিনি পতিত উদ্ধার করিবার জন্য আমাদের প্রতি কৃপা করিয়াই এদেশে আসিয়াছেন এমন অবস্থায় সকল সময়ে তাঁর মেজাজ ঠিক না থাকিতেও পারে। অতএব তিনি কিরূপ ব্যবহার করিবেন সে বিচার না করিয়া ছাত্রদেরই ব্যবহারকে আষ্টে পৃষ্ঠে কঠিন করিয়া বাঁধিয়া দিতে হইবে। সমুদ্রকে বলিলে চলিবে না যে, তুমি এই পর্য্যন্ত আসিবে তার উর্দ্ধে নয়, তীরে যারা আছে তাহাদিগকেই বলিতে হইবে তোমরা হঠ, হঠ, আরো হঠ।

তাই বলিতেছি একথা সত্য বলিয়া মানিতেই হইবে, যে, নানা অনিবার্য্য কারণে ইংরেজ অধ্যাপক বাঙালি ছাত্রের সহিত বিশুদ্ধ অধ্যাপকের মত ব্যবহার করিয়া উঠিতে পারেন না। কেম্ব্রিজে অক্সফোর্ডে ছাত্রদের সহিত অধ্যাপকদের সম্বন্ধ কিরূপ, তর্কস্থলে আমরা সে নজির উত্থাপন করিয়া থাকি, কিন্তু তাহাতে লাভ কি? সেখানে যে সম্বন্ধ স্বাভাবিক এখানে যে তাহা নহে সে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। অতএব স্বাভাবিকতায় যেখানে গর্ত্ত আছে সেখানে শাসনের ইঁটপাটকেল দিয়া ভরাট করিবার কথাটাই সর্ব্বাগ্রে মনে আসে।

সমস্যাটা আমাদের পক্ষে শক্ত হইয়াছে এই কারণেই। এই জন্যই আমাদের স্বদেশীয় বিজ্ঞেরাও ছাত্রদিগকে পরামর্শ দিয়া থাকেন যে, বাপু, তোমরা কোনোমতে এগ্‌জামিন্ পাস করিয়াই সন্তুষ্ট থাক, মানুষ হইবার দুরাশা মনে রাখিয়ো না।

এ বেশ ভাল কথা। কিন্তু সুবুদ্ধির কথা চিরদিন খাটে না —মানব-প্রকৃতি সুবুদ্ধির পাকা ভিতের উপরে পাথরে গাঁথিয়া তৈরি হয় নাই। তাকে বাড়িতে হইবে, এই জন্যই সে কাঁচা।

এই জন্যই কৃত্রিম ঘেরটাকে সে খানিকটা দূর পর্য্যন্ত সহ্য করে, তার পরে প্রাণের বাড় আর আপনাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, একদিন হঠাৎ বেড়া কাটিয়া ভাঙিয়া পড়ে। যে প্রাণ কচি তারি জয় হয়, যে বাঁধন পাকা সে টেঁকে না।

অতএব স্বভাবকে যদি কেবল একপক্ষেই মানি এবং অপর পক্ষে একেবারেই অগ্রাহ্য করি তবে কিছুদিন মনে হয় সেই একতরফা নিষ্পত্তিতে বেশ কাজ চলিতেছে। তার পরে একদিন হঠাৎ দেখিতে পাই কাজ একেবারেই চলিতেছে না। তখন দ্বিগুণ রাগ হয়—যা এতদিন ঠাণ্ডা ছিল তার অকস্মাৎ চঞ্চলতা গুরুতর অপরাধ বলিয়াই গণ্য হইতে থাকে এবং সেই কারণেই শাস্তির মাত্রা দণ্ডবিধির সহজ বিধানকে ছাড়াইয়া যায়। তার পর হইতে সমস্ত ব্যাপারটা এমনি জটিল হইয়া উঠে যে কমিশনের পঞ্চায়েৎ তার মধ্যে পথ খুঁজিয়া পায় না; তখন বলিতে বাধ্য হয় যে, কুড়াল দিয়া কাটিয়া, আগুন দিয়া পোড়াইয়া, ষ্টীম-রোলার দিয়া পিষিয়া রাস্তা তৈরি কর।

কথাটা বেশ! কর্ণধার কানে ধরিয়া ঝিঁকা মারিতে মারিতে স্কুলের খেয়া পার করিয়া দিল, তারপরে লৌহ শাসনের কলের গাড়িতে প্রাণ-রসকে অন্তররুদ্ধ তপ্তবাষ্পে পরিণত করিয়া য়ুনিভার্সিটির শেষ ইষ্টেশনে গিয়া নামিলাম, সেখানে চাকরির বালুমরুতে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন জীবিকা-মরীচিকার পিছনে ধুঁকিতে ধুঁকিতে চলিলাম, তারপরে সূর্য্য যখন অস্ত যায় তখন যমরাজের সদর গেটের কাছে গিয়া মাথার বোঝা নামাইয়া দিয়া মনে করিলাম জীবন সার্থক হইল—জীবনযাত্রার এমন নিরাপদ এবং শান্তিময় আদর্শ অন্য কোথাও নাই। এই

আদর্শ আমাদের দেশে যদি চিরদিন টেঁকা সম্ভবপর হইত তাহা হইলে কোনো কথা বলিতাম না।

কিন্তু টিকিল না। তার কারণ, আমরা ত কেবলমাত্র খৃষ্টান-কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ এবং পতিত-উদ্ধারের দুঃসাধ্য ব্রত-ধারীদের কাছ হইতেই শিক্ষা পাই নাই। আমরা যে ইংলণ্ডের কাছ হইতে শিখিতেছি। সেও আজ একশো বছরের উপর হইয়া গেল। সে শিক্ষা ত বন্ধ্যা নহে। নূতন প্রাণকে সে জন্ম দিবেই। তারপরে সেই প্রাণের ক্ষুধা-তৃষ্ণা যে-অন্নপানীয়ের দাবী করিবে তাকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করিতে কেহ পারিবে না।

মনে আছে. ছেলেবেলা যখন ইংরেজি মাষ্টারের কাছে ইংরেজি শব্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ মুখস্থ করিতে হইত তখন "I" শব্দের একটা প্রতিশব্দ বহুকষ্টে কণ্ঠস্থ করিয়াছিলাম, সে হচ্ছে "Myself,—I, by myself I।" ইংরেজি এই "I" শব্দের প্রতিশব্দটি আয়ত্ত করিতে কিছুদিন সময় লাগিয়াছে। ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প করিয়া ওটা একরকম সড়গড় হইয়া আসিল। এখন মাষ্টারমশায় I হইতে ঐ myself টাকে কালির দাগে লাঞ্ছিত করিয়া রবারের ঘর্ষণে একেবারে মুছিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতেছেন। আমাদের খৃষ্টান হেডমাষ্টার বলিতেছেন, "আমাদের দেশে I শব্দের যে অর্থ তোমাদের দেশে সে অর্থ হইতেই পারেনা।" কিন্তু ওটাকে কণ্ঠস্থ করিতে যদি আমাদের দুইশো বছর লাগিয়া থাকে ওটাকে সম্পূর্ণ বহিষ্কৃত করিতে তার ডবল্ সময়েও কুলায় কিনা সন্দেহ করি। কেননা ঐ I শব্দের ইংরেজি মন্ত্রটা ভয়ঙ্কর কড়া—গুরু যদি গোড়া হইতেই ওটা সম্পূর্ণ চাপিয়া যাইতে পারিতেন ত কোনো ঝলাই থাকিত না—

এখন ওটা কান হইতে প্রাণের মধ্যে পৌঁছিয়াছে—এখন প্রাণটাকে মারিয়া ওটাকে উপড়ানো যায়। কিন্তু প্রাণ বড় শক্ত জিনিস্।

ইংলণ্ড যতক্ষণ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সঙ্গে আপন সম্পর্ক রাখিয়াছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাকে আপনি লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। যাহা তার সর্ব্বোচ্চ সম্পদ তাহা ইচ্ছা করিয়াই হউক ইচ্ছার বিরুদ্ধেই হউক আমাদিগকে দিতেই হইবে। ইহাই বিধাতার অভিপ্রায়, তার সঙ্গে প্রিন্সিপাল সাহেবের অভিপ্রায় মিলুক আর নাই মিলুক। তাই আজ আমাদের ছাত্রেরা কেবলমাত্র ইংরেজি কেতাবের ইংরেজি নোট কুড়ানোর উঞ্ছবৃত্তিতেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিবে না—আজ তারা আত্মসম্মানকে বজায় রাখিতে চাহিবেই, আজ তারা নিজেকে কলের পুতুল বলিয়া ভুল করিতে পারিবে না, আজ তারা জেলের দারোগাকে নিজের গুরু বলিয়া মানিয়া শাসনের চোটে তাকে গুরুভক্তি দেখাইতে রাজি হইবে না। আজ যাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাকে গালি দিলেও তাহা মিথ্যা হইবে না এবং তার গালে চড় মারিলেও সে যে সত্য ইহাই আরো বেশী করিয়া প্রমাণ হইতে থাকিবে।

যে কথা লইয়া আজ আলোচনা চলিতেছে এ যদি একটা সামান্য ও সাময়িক আন্দোলনমাত্র হইত তাহা হইলে আমি কোনো কথাই বলিতাম না। কিন্তু ইহার মূলে খুব একটা বড় কথা আছে সেইজন্যই এই প্রসঙ্গে চুপ করিয়া থাকা অন্যায় মনে করি।

মানুষের ইতিহাস ভিন্ন দেশে ভিন্ন মূর্ত্তি ধরে। ভারতবর্ষের ইতিহাসেরও বিশেষত্ব আছে। সেই ইতিহাসের গোড়া হইতেই আমরা দেখিয়া আসিতেছি এ দেশ কোনো বিশেষ একটি জাতির

বা বিশেষ একটি সভ্যতার দেশ নয়। এদেশে আর্য্যসভ্যতাও যেমন সত্য, দ্রাবিড় সভ্যতাও তেমনি সত্য; এদেশে হিন্দুও যত বড় মুসলমানও তার চেয়ে নিতান্ত কম নয়। এইজন্যই এখানকার ইতিহাস নানা বিরোধের বাষ্প-সংঘাতে প্রকাণ্ড নীহারিকার মত ঝাপসা হইয়া আছে। এই ইতিহাসে আমরা নানাশক্তির আলোড়ন দেখিয়া আসিতেছি কিন্তু একটা অখণ্ড ঐতিহাসিক মূর্ত্তির উদ্ভাবন এখনো দেখি নাই। এই পরিব্যাপ্ত বিপুলতার মধ্য হইতে একটি নিরবচ্ছিন্ন "আমি"র সুস্পষ্ট ক্রন্দন জাগিল না।

স্ফটিক যখন দ্রব অবস্থায় থাকে তখন তাহা মূর্ত্তিহীন—আমরা সেই অবস্থায় অনেক দিন কাটাইলাম। এমন সময় সমুদ্রপার হইতে একটি আঘাত এই তরল পদার্থের উপর হইতে নীচে একপ্রান্ত হইতে আর একপ্রান্তে সঞ্চারিত হইয়াছে—তাই অনুভব করিতেছি দানা বাঁধিবার মত একটা সর্ব্বব্যাপী আবেগ ইহার কণায় কণায় যেন নড়িয়া উঠিল। মূর্ত্তি ধরিয়া উঠিবার একটা বেদনা ইহার সর্ব্বত্র যেন চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে।

তাই দেখিতেছি ভারতবর্ষের ইতিহাসে যেমন আর্য্য আছে দ্রাবিড় আছে যেমন মুসলমান আছে, তেমনি ইংরেজও আসিয়া পড়িয়াছে। তাই ভারতবর্ষের প্রকৃত ইতিহাস কেবল আমাদের ইতিহাস নহে তাহা ইংরেজেরও ইতিহাস। এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে ইতিহাসের এই সমস্ত অংশগুলি ঠিকমত করিয়া মেলে, সমস্তটাই এক সজীব শরীরের অঙ্গ হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে কোনো একটা অংশকে বাদ দিব সে আমাদের সাধ্য নাই। মুসলমানকে বাদ দিতে পারি নাই, ইংরেজকেও বাদ দিতে পারিব না। এ কেবল বাহুবলের অভাববশত নহে, আমাদের ইতিহাসটার

প্রকৃতিই এই—তাহা কোনো একজাতির ইতিহাস নয়, তাহা একটা মানব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ইতিহাস।

এই যে নানা যুগ, নানা জাতি ও নানা সভ্যতা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে গড়িয়া তুলিতেছে আজ সেই ঐতিহাসিক অভিপ্রায়ের অনুগত করিয়া আমাদের অভিপ্রায়কে সজাগ করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে আমাদের দেশ ইংলণ্ড নয়, ইটালি নয়, আমেরিকা নয়—সেখানকার মাপে কোনোমতেই আমাদের ইতিহাসকে ছাঁটা চলিবে না। এখানে একেবারে মূলে তফাৎ। ও সকল দেশ মোটের উপরে একটা ঐক্যকে লইয়াই নিজের ইতিহাস ফাঁদিয়াছে, আমরা অনৈক্য লইয়াই প্রথম হইতে সুরু করিয়াছি এবং আজ পর্য্যন্ত কেবল তাহা বাড়িয়াই চলিয়াছে।

আমাদিগকে ভাবিতে হইবে এই লইয়াই আমরা কি করিতে পারি। বাহিরকে কেমন করিয়া বাহির করিয়া দিব স্বভাবতই অন্য ইতিহাসের এই ভাবনা, বাহিরকে কেমন করিয়া আপন করিয়া লইব স্বভাবতই আমাদের ইতিহাসের এই ভাবনা।

ইংরেজকে আমাদের দেশের পক্ষে আপন করিয়া না লইতে পারিলে আমাদের স্বাস্থ্য নাই কল্যাণ নাই। ইংরেজের শাসন যতক্ষণ আমাদের পক্ষে কলের শাসন থাকিবে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের সম্বন্ধ মানব-সম্বন্ধ না হইবে ততক্ষণ Pax Britanica আমাদিগকে শান্তি দিবে, জীবন দিবেনা। আমাদের অন্নের হাঁড়িতে জল চড়াইবে মাত্র চুলাতে আগুন ধরাইবে না। অর্থাৎ ততক্ষণ ইংরেজ ভারতবর্ষের সৃজন কার্য্যে বিশ্বকর্ম্মার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হইবে না, বাহির হইতে মজুরি করিয়া কেবল ইঁট কাঠ ফেলিয়া দিয়া চলিয়া

যাইবে। ইহাকেই একজন ইংরেজ কবি বলিয়াছেন the white man's burden। কিন্তু burden কেন হইতে যাইবে? এ কেন সৃজনকার্য্যের আনন্দ না হইবে? সৃষ্টিকর্তার ডাকে ইংরেজ এখানে আসিয়াছে, তাকে সৃষ্টিকার্য্যে যোগ দিতেই হইবে। যদি আনন্দের সঙ্গে যোগ দিতে পারে তবেই সব দিকে ভাল, যদি না পারে তবে এই Land of regretsএর তপ্ত বালুকাপথ তাহাদের কঙ্কালে খচিত হইয়া যাইবে, তবু ভার বহিতেই হইবে। ভারত ইতিহাসের গঠনকাজে যদি তাহাদের প্রাণের যোগ না ঘটে কেবলমাত্র কাজের যোগ ঘটে তাহা হইলে ভারতবর্ষের বিধাতা বেদনা পাইবেন, ইংরেজও সুখ পাইবে না।

তাই ভারত ইতিহাসের প্রধান সমস্যা এই, ইংরেজকে পরিহার করা নয়, ইংরেজের সঙ্গে ভারতবর্ষের সম্বন্ধকে সজীব ও স্বাভাবিক করিয়া তোলা। এতদিন পর্য্যন্ত হিন্দু মুসলমান ও ভারতবর্ষের নানা বিচিত্র জাতিতে মিলিয়া এ দেশের ইতিহাস আপনা-আপনি যেমন-তেমন করিয়া গড়িয়া উঠিতেছিল। আজ ইংরেজ আসার পর এই কাজে আমাদের চেতনা জাগিয়াছে। ইতিহাস রচনায় আজ আমাদের ইচ্ছা কাজ করিতে উদ্যত হইয়াছে।

এই জন্যই ইচ্ছায় ইচ্ছায় মাঝে মাঝে দ্বন্দ্ব বাধিবার আশঙ্কা আছে। কিন্তু যাঁরা এ দেশের সঞ্জীবন মন্ত্রের তপস্বী, রাগদ্বেষে ক্ষুব্ধ হইলে তাঁদের চলিবে না। তাঁহাদিগকে এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইচ্ছায় ইচ্ছায় মিল করাই চাই। কারণ ইংরেজ ভারতের ইতিহাসধারাকে বাধা দিতে আসে নাই তাহাতে যোগ দিতেই আসিয়াছে। ইংরেজকে নহিলে ভারতইতিহাস পূর্ণ

হইতেই পারে না। সেই জন্যই আমরা কেবলমাত্র ইংরেজের আপিস চাই না, ইংরেজের হৃদয় চাই।

ইংরেজ যদি আমাদিগকে অবাধে অনায়াসে অবজ্ঞা করিতে পায় তাহা হইলেই আমরা তার হৃদয় হারাইব। শ্রদ্ধা আমাদিগকে দাবী করিতেই হইবে, আমরা খৃষ্টান প্রিন্সিপালের নিকট হইতেও একগালে চড় খাইয়া অন্য গাল ফিরাইয়া দিতে পারিব না।

ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর জীবনের সম্বন্ধ কোথায় সহজে ঘটিতে পারে? বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নয়, রাজকীয় ক্ষেত্রেও নয়। তার সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান বিদ্যাদানের ক্ষেত্র। জ্ঞানের আদান-প্রদানের ব্যাপারটি সাত্ত্বিক। তাহা প্রাণকে উদ্বোধিত করে। সেইজন্য এইখানেই প্রাণের নাগাল পাওয়া সহজ। এইখানেই গুরুর সঙ্গে শিষ্যের সম্বন্ধ যদি সত্য হয় তবে ইহজীবনে তার বিচ্ছেদ নাই। তাহা পিতার সঙ্গে পুত্রের সম্বন্ধের চেয়েও গভীরতর।

আমাদের য়ুনিভার্সিটিতে এই সুযোগ ঘটিয়াছিল। এইখানে ইংরেজ এমন একটি স্থান পাইতে পারিত যাহা সে রাজসিংহাসনে বসিয়াও পায় না। এই সুযোগ যখন ব্যর্থ হইতে দেখা যায় তখন আক্ষেপের সীমা থাকে না।

ব্যর্থতার কারণ আমাদের ছাত্ররাই এ কথা আমি কিছুতেই মানিতে পারি না। আমাদের দেশের ছাত্রদের আমি ভাল করিয়াই জানি। ইংরেজ ছেলের সঙ্গে একটা বিষয়ে ইহাদের প্রভেদ আছে। ইহারা ভক্তি করিতে পাইলে আর কিছু চায় না। অধ্যাপকের কাছ হইতে একটুমাত্রও যদি ইহারা খাঁটি স্নেহ পায় তবে তাঁর কাছে হৃদয় উৎসর্গ করিয়া দিয়া যেন হাঁফ

ছাড়িয়া বাঁচে। আমাদের ছেলেদের হৃদয় নিতান্তই শস্তা দামে পাওয়া যায়।

এইজন্যই আমার যে একটি বিদ্যালয় আছে সেখানে ইংরেজ অধ্যাপক আনিবার জন্য অনেক দিন হইতে উদ্যোগ করিয়াছি। বহুকাল পূর্ব্বে একজনকে আনিয়াছিলাম তিনি সুদীর্ঘ কাল ভারতবর্ষের আবহাওয়ায় পাকিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁর অন্তঃকরণে পিত্তাধিক্য ঘটিয়াছিল। তিনি তাঁর ক্লাসে ছেলেদের জাতি তুলিয়া গালি দিতেন; তারা বাঙালীর ঘরে জন্মিয়াছে এই অপরাধ তিনি সহিতে পারিতেন না। সেই ছেলেরা যদিচ প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র নয়, তাদের বয়স নয় দশ বৎসর হইবে, তবু তারা তাঁর ক্লাসে যাওয়া ছাড়িল। হেডমাষ্টারের তাড়নাতেও কোনো ফল হইল না। দেখিলাম হিতে বিপরীত ঘটিল। এই মাষ্টারটিকে white man's burden হইতে সে যাত্রায় নিষ্কৃতি দিলাম।

কিন্তু আশা ছাড়ি নাই এবং আমার কামনাও সফল হইয়াছে। আজ ইংরেজগুরুর সঙ্গে বাঙালীছাত্রের জীবনের গভীর মিলন ঘটিয়া আশ্রম পবিত্র হইয়াছে। এই পুণ্য মিলনটি সমস্ত ভারতক্ষেত্রে দেখিবার জন্য বিধাতা অপেক্ষা করিতেছেন। যে দুটি ইংরেজ তাপস সেখানে আছেন তাঁরা নিজের ধর্ম্ম প্রচার করিতে যান নাই, তাঁরা পতিতউদ্ধারের দুঃসহ কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করেন নাই, তাঁরা গ্রীকদের মত বর্ব্বর জাতিকে সভ্যতায় দীক্ষিত করিবার জন্য ধরাধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এমন অভিমান মনে রাখেন না—তাঁরা তাঁদের পরম গুরুর মত করিয়াই দুই হাত বাড়াইয়া বলিয়াছেন, ছেলেদের আসিতে দাও আমার কাছে—হোক্‌না তারা বাঙালীর ছেলে।—ছেলেরা তাঁদের

অত্যন্ত কাছে আসিতে লেশমাত্র বিলম্ব করে নাই—হোন্ না তাঁরা ইংরেজ। আজ এই কথা বলিতে পারি, এই দুটি ইংরেজের সঙ্গে আমার ছেলেদের যে সম্বন্ধ ঘটিয়াছে তাহা তাহাদের জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ থাকিবে। এই ছেলেরা ইংরেজ-বিদ্বেষের বিষে জীবন পূর্ণ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে না।

প্রথমে যে শিক্ষকটি আসিয়াছিলেন তিনি শিক্ষকতায় পাকা ছিলেন। তাঁর কাছে পড়িতে পাইলে ছেলেদের ইংরেজি উচ্চারণ ও ব্যাকরণ দুরস্ত হইয়া যাইত। সেই লোভে আমি কঠোর শাসনে ছাত্রগুলিকে তাঁর ক্লাসে পাঠাইতে পারিতাম। মনে করিতে পারিতাম শিক্ষক যেমনি দুর্ব্যবহার করুন ছাত্রদের কর্ত্তব্য সমস্ত সহিয়া তাঁকে মানিয়া চলা। কিছুদিন তাদের মনে বাজিত, হয় ত কিছুদিন পরে তাদের মনে বাজিতও না—কিন্তু তাদের এক্‌সেণ্ট বিশুদ্ধ হইত। তা হউক, কিন্তু এই মানবের ছেলেদের কি ভগবান নাই? আমরাই কি চুল পাকিয়াছে বলিয়া তাদের বিধাতাপুরুষ? ইংরেজি ভাষায় বিশুদ্ধ এক্‌সেণ্টের জোরে সেই ভগবানের বিচারে আমি কি খালাস পাইতাম?

ইংরেজ অধ্যাপকের সহিত বাঙালী ছাত্রদের সম্বন্ধ সরল ও স্বাভাবিক হওয়া বর্ত্তমানে বিশেষ কঠিন হইয়াছে। তার কারণ কি, একদিন ইংলণ্ডে থাকিতে, তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। রেলগাড়িতে একজন ইংরেজ আমার পাশে বসিয়াছিলেন—প্রথমটা আমাকে দেখিয়া তাঁর ভালোই লাগিল। এমন কি, তাঁর মনে হইল ইংলণ্ডে আমি ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছি। য়ুরোপের লোককে সাধু উপদেশ দিবার

অধিকার আমাদেরও আছে এ মত তিনি বিশেষ উৎসাহের সহিত প্রকাশ করিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁর কৌতূহল হইল আমি ভারতবর্ষের কোন্ প্রদেশ হইতে আসিয়াছি তাহা জানিবার জন্য। আমি বলিলাম আমি বাংলা দেশের লোক। শুনিয়া তিনি লাফাইয়া উঠিলেন। কোনো দুষ্কর্ম্মই যে বাংলা দেশের লোকের অসাধ্য নহে তাহা তিনি তীব্র উত্তেজনার সঙ্গে বলিতে লাগিলেন।

কোনো. জাতির উপর যখন রাগ করি তখন সে জাতির প্রত্যেক মানুষ আমাদের কাছে একটা এব্‌ষ্ট্র্যাক্ট সত্তা হইয়া উঠে। তখন সে আর বিশেষ্য থাকে না, বিশেষণ হয়। আমার সহযাত্রী যতক্ষণ না জানিয়াছিলেন আমি বাঙালী, ততক্ষণ তিনি আমার সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের মত ব্যবহার করিতেছিলেন, সুতরাং আদব-কায়দার ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু যেই তিনি শুনিলেন আমি বাঙালী অমনি আমার ব্যক্তিবিশেষত্ব বাষ্প হইয়া গিয়া একটা বিকট বিশেষণে আসিয়া দাঁড়াইল, সেই বিশেষণটি অভিধানে যাকে বলে, "নিদারুণ"। বিশেষণ-পদার্থের সঙ্গে সাধারণ ভদ্রতা রক্ষার কথা মনেই হয় না। কেননা, ওটা অপদার্থ বলিলেই হয়।

রাশিয়ানের উপর ইংরেজের যখন রাগ ছিল তখন রাশিয়ান-মাত্রেই তার কাছে একটা বিশেষণ হইয়া উঠিয়াছিল। আজ ইংরেজি কাগজে প্রায়ই দেখিতে পাই রাশিয়ানের ধর্ম্মপরতা সহৃদয়তার সীমা নাই। মানুষকে বিশেষণ হইতে বিশেষ্যের কোঠায় ফেলিবামাত্র তার মানবধর্ম্ম প্রকাশ হইয়া পড়ে—তখন তার সঙ্গে সহজ ব্যবহার করিতে আর বাধে না।

বাঙালী আজ ইংরেজের কাছে বিশেষণ হইয়া উঠিয়াছে। এইজন্য

বাঙালীর বাস্তব সত্তা ইংরেজের চোখে পড়া আজ বড়ই কঠিন। এইজন্যই ইচ্ছা করিয়াছিলাম বর্ত্তমান য়ুরোপীয় যুদ্ধে বাঙালী যুবকদিগকে ভলণ্টিয়াররূপে লড়িতে দেওয়া হয়। ইংরেজের সঙ্গে একযুদ্ধে মরিতে পারিলে বাঙালীও ইংরেজের চোখে বাস্তব হইয়া উঠিত, ঝাপসা থাকিত না, সুতরাং তার পর হইতে তাকে বিচার করা সহজ হইত।

সে সুযোগ ত চলিয়া গেল, এখনো আমরা অস্পষ্টতার আড়ালেই রহিয়া গেলাম। অস্পষ্টতাকে মানুষ সন্দেহ করে। আজ বাংলাদেশে একজন মানুষও আছে কি, যে এই সন্দেহ হইতে মুক্ত?

যাই হউক আমাদের মধ্যে এই অস্পষ্টতার গোধূলি ঘনাইয়া আসিয়াছে;—এইটেই ছায়াকে বস্তু ও বস্তুকে ছায়া ভ্রম করিবার সময়। এখন পরে পরে কেবলি ভুল বোঝাবুঝির সময় বাড়িয়া চলিল।

কিন্তু এই অন্ধকারটাকে কি কড়া শাসনের ধূলা উড়াইয়াই পরিষ্কার করা যায়? এখনি কি আলোকের প্রয়োজন সব চেয়ে অধিক নয়? সে আলোক প্রীতির আলোক, সে আলোক সমবেদনার প্রদীপে পরস্পর মুখ-চেনাচেনি করিবার আলোক! এই দুর্য্যোগের সময়েই কি খৃষ্টান কলেজের কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাদের গুরুর চরিত ও উপদেশ স্মরণ করিবেন না? এখনি কি charityর প্রয়োজন সব চেয়ে অধিক নয়? এই যে দেশব্যাপী সংশয় ঘনাইয়া উঠিয়া সত্যকে আচ্ছন্ন ও বিকৃত করিয়া তুলিতেছে ইহাকে সম্পূর্ণ কাটাইয়া তুলিবার শক্তি তাঁদেরই হাতে যাঁরা উপরে আছেন। পৃথিবীর কুয়াশা কাটাইয়া দিবার ভার আকাশের সূর্য্যের। যখন বারিবর্ষণের প্রয়োজন একান্ত তখন যাঁরা বজ্রবর্ষণের পরামর্শ দিতেছেন

তাঁরা যে কেবলমাত্র সহৃদয়তা ও ঔদার্য্যের অভাব দেখাইতেছেন তাহা নহে তাঁরা ভারুতার পরিচয় দিতেছেন। পৃথিবীর অধিকাংশ অন্যায় উপদ্রব ভয় হইতে; সাহস হইতে নয়।

উপসংহারে আমি এই কথা কর্তৃপক্ষকে বিশেষভাবে স্মরণ করিতে অনুনয় করি। যে-বিদ্যালয়ে ইংরেজ অধ্যাপকের কাছে বাঙালী ছাত্রেরা শিক্ষালাভ করিতেছে সেই বিদ্যালয় হইতে নব-যুগের বাঙালী যুবক ইংরেজ-জাতির পরে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি বহন করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবে ইহাই আশা করিতে পারিতাম। যে-বয়সে যে-ক্ষেত্রে নূতন নূতন জ্ঞানের আলোকে ও ভাবের বর্ষণে ছাত্রদের মধ্যে নবজীবনের প্রথম বিকাশ ঘটিতেছে সেই বয়সে ও সেই ক্ষেত্রেই ইংরেজগুরু যদি তাহাদের হৃদয়কে প্রীতির দ্বারা আকর্ষণ করিতে পারেন তবেই এই যুবকেরা ইংরেজের সঙ্গে ভারতবাসীর সম্বন্ধকে সজীব ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে পারিবে। এই শুভক্ষণে এবং এই পুণ্যক্ষেত্রে ইংরেজ অধ্যাপকের সঙ্গে বাঙালী ছাত্রের সম্বন্ধ যদি সন্দেহের, বিদ্বেষের ও কঠিন শাসনের সম্বন্ধ হয়, তবে আমাদের পরস্পরের ভিতরকার এই বিরোধের বিষ ক্রমশই দেশের নাড়ির মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিবে, ইংরেজের প্রতি অবিশ্বাস পুরুষানুক্রমে আমাদের মজ্জাগত হইয়া অন্ধ-সংস্কারে পরিণত হইতে থাকিবে। সে অবস্থায় বাংলা দেশের রাষ্ট্রশাসন-ব্যাপারে জঞ্জাল কেবলি বাড়িতে থাকিবে বলিয়া যে আশঙ্কা তাহাকেও আমি তেমন গুরুতর বলিয়া মনে করি না—আমার ভয় এই, যে, ইংরেজের কাছ হইতে আমরা যে-দান দিনে দিনে আনন্দে গ্রহণ করিতে পারিতাম সে-দান প্রত্যহ

আমাদের হৃদয়ের দ্বার হইতে ফিরিয়া যাইতে থাকিবে। শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করিলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করা সম্ভব হয়। যেখানে সেই শ্রদ্ধার সম্পর্ক নাই সেখানে আদানপ্রদানের সম্বন্ধ কলুষিত হইয়া উঠে। জেলখানার কয়েদীরা হাতে বেড়ি পড়িয়া যে-অন্ন খাইতে বসে তাকে যজ্ঞের ভোজ বলা বিদ্রূপ করা। জ্ঞানের ভোজ আনন্দের ভোজ। সেখানেও যে সকল কর্ত্তারা ভোক্তার জন্য আজ লোহার হাতকড়ি ফরমাস দিতেছেন তাঁরা কাল নিতান্ত ভালোমানুষটির মত আশ্চর্য্য হইয়া বলিবেন এত করিয়াও বাঙালীর ছেলের মন পাওয়া গেল না—কৃতজ্ঞতাবৃত্তি ইহাদের একেবারেই নাই, এবং তাঁরা রাত্রে শুইতে যাইবার সময় এবং প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া প্রার্থনা করিবেন Father, do not forgive them!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চার-ইয়ারি কথা

আমরা সেদিন ক্লাবে তাস-খেলায় এতই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলুম যে রাত্তিব যে কত হয়েছে সে-দিকে আমাদের কারও খেয়াল ছিল না। হঠাৎ ঘড়িতে দশটা বাজল শুনে আমরা চমকে উঠলুম। এ-রকম গলাভাঙ্গা ঘড়ি কলিকাতা সহরে আর দ্বিতীয় নেই। ভাঙ্গা কাঁশির চাইতেও তার আওয়াজ বেশি বাজখাঁই এবং সে আওয়াজের রেশ কানে থেকেই যায়; আর যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ অসোয়াস্তি করে। এ ঘড়ির কণ্ঠ আমাদের পূর্ব্বপরিচিত কিন্তু সেদিন কেন জানিনে তার খ্যানখ্যানানিটে যেন নূতন করে, বিশেষ করে, আমাদের কানে বাজল।

হাতের তাস হাতেই রেখে কি কর্‌ব ভাবছি—এমন সময়ে সীতেশ শশব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুয়োরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বল্‌লেন—"Boy, গাড়ী যোতনে বোলো।" পাশের ঘর থেকে উত্তর এল—"যো হুকুম!"

সেন বল্‌লেন—"এত তাড়া কেন? এ-হাতটা খেলেই যাও না।"

সীতেশ—বেশ! দেখছনা কত রাত হয়েছে! আমি আর এক-মিনিটও থাক্‌ব না। এম্‌নি ত বাড়ী গিয়ে বকুনি খেতে হবে।

সোমনাথ জিজ্ঞেস কর্‌লেন—"কার কাছে?"

সীতেশ।—স্ত্রীর—

সোমনাথ উত্তর করলেন—"ঘরে স্ত্রী কি দুনিয়াতে একা তোমারই আছে, আর কারও নেই?"

সীতেশ।—তোমাদের স্ত্রীরা এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে।' বাড়ীতে তোমরা কখন্ আসো যাও, তাতে তাদের কিছু আসে যায় না।

সেন বল্লেন—"সে কথা ঠিক। তবে একদিন একটু দেরী হয়েছে তার জন্য......"

সীতেশ।— একটু দেরী? আমার মেয়াদ আট্‌টা পর্য্যন্ত আর এখন দশটা। আর এ-ত একদিন নয়, প্রায় রোজই ত বাড়ী ফিরতে তোপ পড়ে যায়।

"আর রোজই বকুনি খাও।"

"খাইনে?"

"তাহলে সে বকুনি ত আর গায়ে লাগবার কথা নয়। এত দিনেও মনে ঘাঁটা পড়ে যায়নি?"

সীতেশ।—এখন ইয়ারকি রাখ, আমি চল্লুম—Good night!

এই কথা বলে তিনি ঘর থেকে বেরুতে যাচ্ছেন এমন সময় Boy এসে খবর দিলে যে, "কোচমানলোগ আবি গাড়ী যোৎনে নেই মাঙ্গতা। ও লোগ সমজ্‌তা দো·দশ মিনিট্‌মে জোর পানি আয়েগা, সায়েৎ হাওয়া ভি জোর করে গা। ঘোড়ালোগ আস্তা বলমে খাড়া খাড়া এইসাঁই ডরতা হ্যায়। রাস্তামে নিকালনেসে জরুর ভড়কেগা, সায়েৎ উখড় যায়েগা। কোই আধা ঘণ্টা দেখকে তব সোয়ারি দেনা ঠিক হ্যায়।"

এ কথা শুনে আমরা একটু উতলা হয়ে উঠ্‌লুম, কেননা একা সীতেশ নয়, আমাদের সকলেরই বাড়ী যাবার তাড়া ছিল। ঝড়বৃষ্টি আসবার আশু সম্ভাবনা আছে কিনা তাই দেখবার জন্য আমরা চারজনেই বারান্দায় গেলুম। গিয়ে আকাশের যে চেহারা দেখলুম

তাতে আমার বুক চেপে ধরলে, গায়ে কাঁটা দিলে। এ-দেশের মেঘলা দিনের এবং মেঘলা রাত্তিরের চেহারা আমরা সবাই চিনি ; কিন্তু এ যেন আর-এক পৃথিবীর আর-এক আকাশ ;—দিনের কি রাত্তিরের বলা শক্ত। মাথার উপরে কিম্বা চোখের সুমুখে কোথায়ও ঘন-ঘটা করে নেই, আশে-পাশে কোথায়ও মেঘের চাপ নেই ; মনে হল যেন কে সমস্ত আকাশটিকে একখানি একরঙা মেঘের ঘেরাটোপ পরিয়ে দিয়েছে এবং সে রঙ কালোও নয়, ঘনও নয় ; কেননা তার ভিতর থেকে আলো দেখা যাচ্ছে। ছাই-রঙের কাঁচের ঢাকনির ভিতর থেকে যে-রকম আলো দেখা যায় সেই-রকম আলো। আকাশ-জোড়া এমন মলিন, এমন মরা আলো আমি জীবনে কখনও দেখিনি। পৃথিবীর উপরে সে রাত্তিরে যেন শনির দৃষ্টি পড়েছিল। এ আলোর স্পর্শে পৃথিবী যেন অভিভূত স্তম্ভিত মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিল। চারপাশে তাকিয়ে দেখি, গাছ-পালা, বাড়ী-ঘর-দোর সব যেন কোনও আসন্ন প্রলয়ের আশঙ্কায় মরার মত দাঁড়িয়ে আছে ; অথচ এই আলোয় সব যেন একটু হাস্‌ছে। মড়ার মুখে হাসি দেখলে মানুষের মনে যে-রকম কৌতূহলমিশ্রিত আতঙ্ক উপস্থিত হয়, সে রাত্তিরের দৃশ্য দেখে আমার মনে ঠিক সেই-রকম কৌতূহল ও আতঙ্ক দুই একসঙ্গে সমান উদয় হয়েছিল। আমার মন চাচ্ছিল যে, হয় ঝড় উঠুক বৃষ্টি নামুক বিদ্যুৎ চমকাক্ বজ্র পড়ুক, নয় আরও ঘোর করে আসুক—সব অন্ধকারে ডুবে যাক্। কেননা প্রকৃতির এই আড়ষ্ট দম-আটকানো ভাব আমার কাছে মুহূর্ত্তের পর মুহূর্ত্তে অসহ্য থেকে অসহ্যতর হয়ে উঠছিল, অথচ আমি বাইরে থেকে চোখ তুলে নিতে পাচ্ছিলুম না ;—

অবাক হয়ে একদৃষ্টে আকাশের দিকে চেয়েছিলুম, কেননা এই মেঘ-চোয়ানো আলোর ভিতর একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য ছিল।

আমি মুখ ফিরিয়ে দেখি আমার তিনটি বন্ধুই যিনি যেমন দাঁড়িয়েছিলেন তিনি তেমনিই দাঁড়িয়ে আছেন; সকলের মুখই গম্ভীর, সকলেই নিস্তব্ধ। আমি এই দুঃস্বপ্ন ভাঙিয়ে দেবার জন্য চীৎকার করে বল্লুম—"Boy, চারঠো আধা peg লাও।" এই কথা শুনে সকলেই যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন। সোমনাথ বল্লেন—"আমার জন্য peg নয়, Vermouth।" তার পর আমরা যে যার চেয়ার টেনে নিয়ে বসে অন্যমনস্ক ভাবে সিগ্‌রেট ধরালুম। আবার সব চুপ। যখন boy peg নিয়ে এসে হাজির হল তখন সীতেশ বলে উঠলেন্ "মেরা ওয়াস্তে আধা নেই—পূরা।"

আমি হেসে বল্লুম—"I beg your pardon, স্থূল পদার্থের সঙ্গে তরল পদার্থের এ ক্ষেত্রে সম্বন্ধ কত ঘনিষ্ঠ সে কথাটা ভুলে গিয়েছলুম।"

সীতেশ একটু বিরক্তির স্বরে উত্তর কল্লেন—"তোমাদের মত আমি বামন-অবতারের বংশধর নই।"

—"না অগস্ত্যমুনির; একচুমুকে তুমি সুরা-সমুদ্র পান করতে পার।"

এ কথা শুনে তিনি মহা বিরক্ত হয়ে বললেন—"দেখো রায়, ওসব বাজে রসিকতা এখন ভাল লাগছে না।" আমি কোনও উত্তর করলুম না, কেননা বুঝলুম যে, কথাটা ঠিক: বাইরের ঐ আলো আমাদের মনের ভিতরও প্রবেশ করেছিল, এবং সেই সঙ্গে আমাদের মনের রঙও ফিরে গিয়েছিল। মুহূর্ত্তমধ্যে আমরা নতুন

ভাবের মানুষ হয়ে উঠেছিলুম। যে-সকল মনোভাব নিয়ে আমাদের দৈনিক জীবনের কারবার, সে-সকল মন থেকে ঝরে গিয়ে তার বদলে দিনের আলোয় যা-কিছু গুপ্ত ও সুপ্ত হয়ে থাকে তাই জেগে ও ফুটে উঠেছিল।

সেন বল্লেন—"যে রকম আকাশের গতিক দেখছি তাতে বোধ হয় এখানেই রাত কাটাতে হবে।"

সোমনাথ বল্লেন,—"ঘণ্টাখানেক না দেখে ত আর যাওয়া যায় না।"

তারপর সকলে নীরবে ধূমপান করতে লাগলুম।

খানিকক্ষণ পরে সেন আকাশের দিকে চেয়ে যেন নিজের মনে নিজের সঙ্গে কথা কইতে আরম্ভ করলেন, আমরা একমনে তাই শুনতে লাগলুম।

সেনের কথা

দেখতে পাচ্ছ বাইরে যা-কিছু আছে, চোখের পলকে সব কি-রকম নিস্পন্দ, নিশ্চেষ্ট, নিস্তব্ধ হয়ে গেছে; যা জীবন্ত তাও মৃতের মত দেখাচ্ছে; বিশ্বের হৃৎপিণ্ড যেন জড়পিণ্ড হয়ে গেছে, তার বাক্‌রোধ নিশ্বাসরোধ হয়ে গেছে, রক্ত চলাচল বন্ধ হয়েছে; মনে হচ্ছে যেন সব শেষ হয়ে গেছে,—এর পর আর কিছু নেই। তুমি আমি সকলেই জানি যে এ কথা সত্য নয়। এই দুষ্ট বিকৃত কলুষিত আলোর মায়াতে আমাদের অভিভূত করে রেখেছে বলেই আমাদের চোখে এখন যা সত্য তাও মিছে ঠেকছে। আমাদের মন, ইন্দ্রিয়ের এত অধীন যে, একটু রঙের বদলে আমাদের

কাছে বিশ্বের মানে বদ্‌লে যায়। এর প্রমাণ আমি পূর্ব্বেও পেয়েছি। আমি আর-একদিন এই আকাশে আর-এক আলো দেখেছিলুম যার মায়াতে পৃথিবী প্রাণে ভরপুর হয়ে উঠেছিল;— যা মৃত তা জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, যা মিছে তা সত্য হয়ে উঠেছিল।

সে বহুদিনের কথা। তখন আমি সবে M. A. পাশ করে বাড়ীতে বসে আছি; কিছু করিনে, কিছু কর্‌বার কথা মনেও করিনে। সংসার চালাবার জন্য আমার টাকা রোজগার কর্‌বার আবশ্যক ছিল না, অভিপ্রায়ও ছিল না। আমার অন্নবস্ত্রের সংস্থান ছিল এবং তখনও আমি বিবাহ করিনি; এবং কখনও যে করব এ কথাও আমার মনে স্বপ্নে স্থান পায়নি। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমার আত্মীয়স্বজনেরা আমাকে চাকরি কিম্বা বিবাহ করবার জন্য কোনরূপ উৎপাত কর্‌তেন না। সুতরাং কিছু না-করবার স্বাধীনতা আমার সম্পূর্ণ ছিল। এক-কথায় জীবনে তখন আমি ছুটি পেয়েছিলুম, এবং সে ছুটি আমি যত-খুসি তত দীর্ঘ কর্‌তে পারতুম। তোমরা হয়ত মনে করছ যে এরকম আরাম, এরকম সুখের অবস্থা তোমাদের কপালে ঘটলে, তোমরা আর তার বদল কর্‌তে চাইতে না। কিন্তু আমার পক্ষে এ অবস্থা সুখের ত নয়ই, আরামেরও ছিল না। প্রথমতঃ আমার শরীর তেমন ভাল ছিল না। কোনও বিশেষ অসুখ ছিল না অথচ একটা প্রচ্ছন্ন জড়তা ক্রমে ক্রমে আমার সমগ্র দেহটি আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। শরীরের ইচ্ছাশক্তি যেন দিন দিন লোপ পেয়ে আসছিল, প্রতি অঙ্গে আমি একটি অকারণ একটি অসাধারণ শ্রান্তি বোধ করতুম। এখন বুঝি সে হচ্ছে কিছু না কর্‌বার শ্রান্তি। সে যাই হোক,

ডাক্তাররা আমার বুক পিঠ ঠুকে আবিষ্কার করলেন যে, আমার যা রোগ তা শরীরের নয়, মনের। কথাটি ঠিক, তবে মনের অসুখটা যে কি তা কোন ডাক্তার-কবিরাজের পক্ষে ধরা অসম্ভব ছিল—কেননা যার মন সেই তা ঠিক ধরতে পারত না। লোকে যাকে বলে দুশ্চিন্তা অর্থাৎ সংসারের ভাবনা তা আমার ছিল না, এবং কোনও স্ত্রীলোক আমার হৃদয় চুরি করে পালায়নি। হয়ত শুনলে বিশ্বাস করবে না, অথচ এ কথা সম্পূর্ণ সত্য যে, যদিচ তখন আমার পূর্ণ যৌবন তবুও কোন বঙ্গযুবতী আমার চোখে পড়ে নি। আমার মনের প্রকৃতি এতটা অস্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল যে, সে মনে কোনও অবলা সরলা ননিবালার প্রবেশাধিকার ছিলনা।

আমার মনে যে সুখ ছিলনা, সোয়াস্তি ছিলনা তার কারণই ত এই, যে, আমার মন সংসার থেকে আলগা হয়ে পড়েছিল। এর অর্থ এ নয় যে আমার মনে বৈরাগ্য এসেছিল; অবস্থা ঠিক তার উল্টো। জীবনের প্রতি বিরাগ নয়, আত্যন্তিক অনুরাগবশতঃই আমার মন চারপাশের সঙ্গে খাপছাড়া হয়ে পড়েছিল। আমার দেহ ছিল এদেশে, আর মন ইউরোপে। সে মনের উপর ইউরোপের আলো পড়েছিল এবং সে আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেতুম যে এদেশে প্রাণ নেই; আমাদের কাজ, আমাদের কথা, আমাদের চিন্তা, আমাদের ইচ্ছা—সবই তেজোহীন, শক্তিহীন, ক্ষীণ, রুগ্ন, ম্রিয়মাণ এবং মৃতকল্প। আমার চোখে আমাদের সামাজিক জীবন একটি বিরাট পুতুল-নাচের মত দেখাত। নিজে পুতুল সেজে আর-একটি সালঙ্কারা পুতুলের হাত ধরে এই পুতুল-সমাজে নৃত্য করবার কথা মনে করতেও আমার ভয় হ'ত। জানতুম তার-চাইতে

মরণও শ্রেয়ঃ; কিন্তু আমি মর্‌তে চাইনি, আমি চেয়েছিলুম বাঁচতে, —শুধু দেহে নয়, মনেও বেঁচে উঠতে, ফুটে উঠতে, জ্বলে উঠতে। এই ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায় আমার শরীর-মনকে জীর্ণ করে ফেলছিল, কেননা এই আকাঙ্ক্ষার কোনও স্পষ্ট বিষয় ছিল না, কোনও নির্দ্দিষ্ট অবলম্বন ছিল না। তখন আমার মনের ভিতরে যা ছিল তা একটি ব্যাকুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়; এবং সেই ব্যাকুলতা একটি কাল্পনিক একটি আদর্শ নায়িকার সৃষ্টি করেছিল। ভাবতুম যে, জীবনে সেই নায়িকার সাক্ষাৎ পেলেই আমি সজীব হয়ে উঠব। কিন্তু জানতুম এই মরার দেশে সে জীবন্ত রমণীর সাক্ষাৎ কখনো পাব না।

এ-রকম মনের অবস্থায় আমার অবশ্য চারপাশের কাজ-কর্ম্ম আমোদ-আহ্লাদ কিছুই ভাল লাগত না, তাই আমি লোকজন ছেড়ে ইউরোপীয় নাটক-নভেলের রাজ্যে বাস করতুম;—এই রাজ্যের নায়ক-নায়িকারাই আমার রাতদিনের সঙ্গী হয়ে উঠেছিল, এই কাল্পনিক স্ত্রীপুরুষেরাই আমার কাছে শরীরী হয়ে উঠেছিল; আর রক্তমাংসের দেহধারী স্ত্রী-পুরুষেরা আমার চারপাশে সব ছায়ার মত ঘুরে বেড়াত। কিন্তু আমার মনের অবস্থা যতই অস্বাভাবিক হোক, আমি কাণ্ডজ্ঞান হারাই-নি। আমার এ জ্ঞান ছিল যে, মনের এ বিকার থেকে উদ্ধার না পেলে, আমি দেহ-মনে অমানুষ হয়ে পড়্‌ব। সুতরং যাতে আমার স্বাস্থ্য নষ্ট না হয় সে-বিষয়ে আমার পূরো নজর ছিল। আমি জানতুম যে শরীর সুস্থ রাখ্‌তে পার্‌লে মন সময়ে আপনিই প্রকৃতিস্থ হয়ে আস্‌বে। তাই আমি রোজ চার-পাঁচ মাইল পায়ে হেঁটে বেড়াতুম। আমার বেড়াবার সময় ছিল সন্ধ্যার পর; কোনদিন খাবার আগে, কোন-

দিন খাবার পরে। যেদিন খেয়ে-দেয়ে বেড়াতে বেরুতুম সেদিন বাড়ী ফির্‌তে প্রায় রাত এগারটা বারোটা বেজে যেত। এক রাত্তিরের একটি ঘটনা আমি আজও বিস্মৃত হই নি, বোধ হয় কখনও হতে পার্‌ব না, কেননা আজ পর্য্যন্ত আমার মনে তা সমান টাট্‌কা রয়েছে।

সেদিন পূর্ণিমা। আমি একলা বেড়াতে বেড়াতে যখন গঙ্গার ধারে গিয়ে পৌঁছিলুম তখন রাত প্রায় এগারটা। রাস্তায় জন-মানব ছিল না তবু আমার বাড়ী ফির্‌তে মন সরছিল না, কেননা সেদিন যে-রকম জ্যোৎস্না ফুটেছিল সে-রকম জ্যোৎস্না কলিকাতায় বোধ হয় দু-দশবৎসরে এক-আধ দিন দেখা যায়। চাঁদের আলোর ভিতর প্রায়ই দেখা যায় একটা ঘুমন্ত ভাব আছে; সে আলো মাটিতে জলেতে ছাদের উপর গাছের উপর যেখানে পড়ে সেখানেই মনে হয় ঘুমিয়ে যায়। কিন্তু সে রাত্তিরে আকাশে অলোর বান ডেকেছিল। চন্দ্রলোক হতে অসংখ্য অবিরত অবিরল ও অবিচ্ছিন্ন একটির-পর-একটি তারপর আর-একটি জ্যোৎস্নার ঢেউ পৃথিবীর উপর এসে ভেঙ্গে পড়ছিল। এই ঢেউ-খেলানো জ্যোৎস্নায় দিগদিগন্ত ফেনিল হয়ে উঠেছিল—সে ফেনা শ্যাম্পেনের ফেনার মত আপন-হৃদয়ের আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে, তারপরে হাসির আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। আমার মনে এ আলোর নেশা ধরেছিল, আমি তাই নিরুদ্দেশ-ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, মনের ভিতর একটি অস্পষ্ট আনন্দ ছাড়া আর কোনও ভাব, কোনও চিন্তা ছিল না।

হঠাৎ নদীর দিকে আমার চোখ পড়্‌ল। দেখি, সারি-সারি জাহাজ

এই আলোয় ভাস্‌ছে। জাহাজের গড়ন যে এমন সুন্দর তা আমি পূর্ব্বে কখনও লক্ষ্য করি নি। তাদের ঐ লম্বা ছিপছিপে দেহের প্রতি-রেখায় একটি একটানা গতির চেহারা সাকার হয়ে উঠেছিল ; যে গতির মুখ অসীমের দিকে, আর যার শক্তি অদম্য এবং অপ্রতি-হত। মনে হল, যেন কোনও সাগর-পারের রূপকথার রাজ্যের বিহঙ্গম-বিহঙ্গমীরা উড়ে এসে এখন পাখা-গুটিয়ে জলের উপর শুয়ে আছে—এই জ্যোৎস্নার সঙ্গে-সঙ্গে তারা আবার পাখা-মেলিয়ে নিজের দেশে ফিরে যাবে। সে দেশ ইউরোপ—যে ইউরোপ তুমি-আমি চোখে দেখে এসেছি সে ইউরোপ নয়, কিন্তু সেই কবি-কল্পিত রাজ্য যার পরিচয় আমি ইউরোপীয় সাহিত্যে লাভ করেছিলুম। এই জাহাজের ইঙ্গিতে সেই রূপকথার রাজ্য, সেই রূপের রাজ্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে এল। আমি উপরের দিকে চেয়ে দেখি আকাশ জুড়ে হাজার-হাজার জ্যাস্‌মিন্‌ হথরণ্‌ প্রভৃতি স্তবকে স্তবকে ফুটে উঠছে, ঝরে পড়্‌ছে,—চারিদিকে সাদা ফুলের বৃষ্টি হচ্ছে। সে ফুল, গাছপালা সব ঢেকে ফেলেছে, পাতার ফাঁক দিয়ে ঘাসের উপরে পড়েছে, রাস্তা-ঘাট সব ছেয়ে ফেলেছে। তার পর আমার মনে হল যে, আমি আজ রাত্তিরে কোন মিরাণ্ডা কি ডেসডিমনা, বিয়াট্রিস কি টেসার দেখা পাব এবং তার স্পর্শে আমি বেঁচে উঠব, জেগে উঠব, অমর হব। আমি কল্পনার চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পেলুম যে, আমার সেই চির-কাঙ্ক্ষিত eternal feminine সশরীরে দূরে দাঁড়িয়ে আমার জন্য প্রতীক্ষা করছে।

ঘুমের ঘোরে মানুষ যেমন সোজা-একদিকে চলে যায় আমি

তেমনি ভাবে চল্‌তে চল্‌তে যখন লাল রাস্তার পাশে এসে পড়লুম তখন দেখি দূরে যেন একটি ছায়া পায়চারি করছে। আমি সেই-দিকে এগুতে লাগলুম। ক্রমে সেই ছায়া শরীরী হয়ে উঠতে লাগল; সে যে মানুষ সে-বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ রইল না। আমি তার দিকে এগুতে লাগলুম। যখন অনেকটা কাছে এসে পড়েছি তখন সে পথের ধারে একটি বেঞ্চিতে বস্‌ল। আরও কাছে এসে দেখি, বেঞ্চিতে যে বসে আছে সে একটি ইংরাজ-রমণী—পূর্ণযৌবনা অপূর্ব্বসুন্দরী! এমন রূপ মানুষের হয় না;—সে যেন মূর্ত্তিমতী পূর্ণিমা! আমি তার সমুখে থমকে দাঁড়িয়ে নির্ণেমেষে তার দিকে চেয়ে রইলুম। দেখি সেও একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছে। যখন তার চোখের উপর আমার চোখ পড়্‌ল তখন দেখি তার চোখদুটি আলোয় জ্বলজ্বল করছে; মানুষের চোখে এমন জ্যোতি আমি জীবনে আর-কখনও দেখি নি! সে আলো তারার নয়, চন্দ্রের নয়, সূর্য্যের নয়,—বিদ্যুতের। সে আলো জ্যোৎস্নাকে আরও উজ্জ্বল করে তুললে, চন্দ্রালোকের বুকের ভিতর যেন তাড়িত সঞ্চারিত হল। বিশ্বের সূক্ষ্মশরীর সেদিন একমুহূর্ত্তের জন্য আমার কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছিল। এ জড়জগৎ সেই-মুহূর্ত্তে প্রাণময় মনোময় হয়ে উঠেছিল। আমি সেদিন ইথারের স্পন্দন চর্ম্মচক্ষে দেখেছি; আর দিব্য-চক্ষে দেখতে পেয়েছি যে আমার আত্মা ইথারের সঙ্গে এক-সুরে একতানে স্পন্দিত হচ্ছে। এ সবই সেই রাত্তিরের সেই আলোর মায়া। এই মায়ার প্রভাবে শুধু বহির্জগতে নয়, আমার অন্তর-জগতেরও সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটেছিল। আমার দেহমন মিলে-

মিশে এক-হয়ে একটি মূর্ত্তিমতী বাসনার আকার ধারণ করেছিল এবং সে হচ্ছে ভালবাসবার এবং ভালবাসা-পাবার বাসনা। আমার মন্ত্রমুগ্ধ মনে জ্ঞান বুদ্ধি এমন কি চৈতন্য পর্য্যন্ত লোপ পেয়েছিল।

কতক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটি আমার দিকে চেয়ে, আমি অচেতন পদার্থের মত দাঁড়িয়ে আছি দেখে, একটু হাসলে। সেই হাসি দেখে আমার মনে সাহস এল, আমি সেই বেঞ্চিতে তার পাশে বসলুম—গা ঘেঁসে নয়, একটু দূরে। আমরা দুজনেই চুপ করে ছিলুম। বলা বাহুল্য, তখন আমি চোখ-চেয়ে স্বপ্ন দেখছিলুম; সে স্বপ্ন যে-রাজ্যের সে-রাজ্যে শব্দ নেই; যা আছে তা শুধু নীরব অনুভূতি। আমি যে স্বপ্ন দেখছিলুম তার প্রধান প্রমাণ এই যে, সে-সময় আমার কাছে সকল অসম্ভব সম্ভব হয়ে উঠেছিল। এই কলিকাতা-সহরে কোন বাঙ্গালী রোমিয়োর ভাগ্যে কোনও বিলাতি জুলিয়েট যে জুটতে পারেনা—এ জ্ঞান তখন সম্পূর্ণ হারিয়ে বসেছিলুম।

আমার মনে হচ্ছিল যে, ও-স্ত্রীলোকেরও হয়ত আমারই মত মনের সুখ ছিলনা এবং সে একই কারণে। এর মনও হয়ত এর চারপাশের বণিক-সমাজ হতে আল্‌গা হয়ে পড়েছিল এবং এও সেই অপরিচিতের আশায়, প্রতীক্ষায়, দিনের পর দিন বিষাদে অবসাদে কাটাচ্ছিল, যার কাছে আত্মসমর্পণ করে এর জীবনমন সরাগ সতেজ হয়ে উঠবে। আর আজকের এই কুহকী পূর্ণিমার অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের ডাকে আমরা দুজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি। আমাদের এ মিলনের মধ্যে বিধাতার হাত আছে। অনাদিকালে এ মিলনের সূচনা হয়েছিল এবং অনন্তকালেও তার সমাধা হবে না। এই সত্য আবিষ্কার করবামাত্র আমি আমার সঙ্গিনীর দিকে

মুখ ফেরালুম। দেখি, কিছুক্ষণ আগে যে চোখ হীরার মত জ্বলছিল এখন তা নীলার মত সুকোমল হয়ে গেছে ;—একটি গভীর বিষাদের রঙে তা স্তরে স্তরে রঞ্জিত হয়ে উঠেছে ;—এমন কাতর, এমন করুণ দৃষ্টি আমি মানুষের চোখে আর-কখনও দেখিনি। সে চাহনিতে আমার হৃদয়মন একবারে গ'লে উথলে উঠল ; আমি আস্তে তার একখানি জ্যোৎস্নামাখা হাত আমার হাতের কোলে টেনে নিলুম ; সে হাতের স্পর্শে আমার সকল শরীর শিহরিত হয়ে উঠল, সকল মনের মধ্য দিয়ে একটি আনন্দের জোয়ার বইতে লাগল। আমি চোখ-বুজে আমার অন্তরে এই নব-উচ্ছ্বসিত প্রাণের বেদনা অনুভব করতে লাগলুম।

হঠাৎ সে তার হাত আমার হাত থেকে সজোরে ছিনিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল! চেয়ে দেখি সে দাঁড়িয়ে কাঁপছে, তার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। একটু এদিক্-ওদিক চেয়ে সে দক্ষিণদিকে দ্রুতবেগে চল্‌তে আরম্ভ করলে। আমি পিছনদিকে তাকিয়ে দেখি ছ-ফুট-এক-ইঞ্চি লম্বা একটি ইংরেজ চার-পাঁচজন চাকর সঙ্গে করে মেয়েটির দিকে জোরে হেঁটে চল্‌ছে। মেয়েটি দু-পা এগুচ্ছে আবার মুখ ফিরিয়ে দেখছে, আবার এগুচ্ছে আবার দাঁড়াচ্ছে। এমনি করতে করতে ইংরাজটি যখন তার কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হল অমনি সে দৌড়ুতে আরম্ভ করলে। পিছনে পিছনে এরা-সকলেও দৌড়ুতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে একটি চীৎকার শুনতে পেলুম। সে চীৎকার ধ্বনি যেমন অস্বাভাবিক, তেমনি বিকট! সে চীৎকার শুনে আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে গেল ;—আমি যেন ভয়ে কাঠ হয়ে গেলুম, আমার নড়বার-চড়বার শক্তি রইল না।

তারপর দেখি চার-পাঁচ-জনে চেপে ধরে তাকে আমার দিকে টেনে আন্‌ছে ; ইংরাজটি সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছে। মনে হল, এ অত্যাচারের হাত থেকে একে উদ্ধার কর্‌তেই হবে—এই পশুদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতেই হবে! এই মনে করে আমি যেমন সেই-দিকে এগুতে যাচ্ছি অমনি মেয়েটি হো হো করে হাস্‌তে আরম্ভ কর্‌লে। সে অট্টহাস্য চারিদিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল; সে হাসি তার কান্নার চাইতে দশগুণ বেশি বিকট, দশগুণ বেশি মর্ম্মভেদী। আমি বুঝলুম যে মেয়েটি পাগল,—একেবারে উন্মাদ পাগল, পাগলা-গারদ থেকে কোনও সুযোগে পালিয়ে এসেছিল, রক্ষকেরা তাকে ফের ধরে নিয়ে যাচ্চে।

এই আমার প্রথম-ভালবাসা আর এই আমার শেষ-ভালবাসা। এর পরে ইউরোপে কত ফুলের-মত কোমল, কত তারার-মত উজ্জ্বল স্ত্রীলোক দেখেছি; ক্ষণিকের জন্য আকৃষ্টও হয়েছি কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে আমার মন নরম হবার উপক্রম হয়েছে সেইমুহূর্ত্তে ঐ অট্টহাসি আমার কানে বেজেছে, অমনি আমার মন পাথর হয়ে গেছে। আমি সেই-দিন থেকে চিরদিনের জন্য eternal feminineকে হারিয়েছি, কিন্তু তার বদলে নিজেকে ফিরে পেয়েছি।

এই বলে সেন তাঁর কথা শেষ কর্‌লেন। আমরা সকলে চুপ করে রইলুম। এতক্ষণ সীতেশ চোখবুজে একখানি আরাম-চৌকির উপর তাঁর ছ-ফুট দেহটি বিস্তার করে লম্বা হয়ে শুয়ে-ছিলেন; তাঁর হস্তচ্যুত আধহাত লম্বা ম্যানিলা চুরুটটি মেজের উপর পড়ে সধূম দুর্গন্ধ প্রচার করে তাঁর অন্তরের প্রচ্ছন্ন আগুনের

অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছিল। আমি মনে করেছিলুম সীতেশ ঘুমিয়ে পড়েছেন। হঠাৎ জলের ভিতর থেকে একটা বড় মাছ যেমন ঘাই-মেরে ওঠে তেমনি সীতেশ এই নিস্তব্ধতার ভিতর থেকে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে খাড়া হয়ে বসলেন। সেদিনকের সেই রাত্তিরের ছায়ায় তাঁর প্রকাণ্ড দেহ অষ্টধাতুতে গড়া একটি বিরাট বৌদ্ধমূর্ত্তির মত দেখাচ্ছিল। তারপর সেই মূর্ত্তি অতি মিহি মেয়েলি গলায় কথা কইতে আরম্ভ করলেন। ভগবান বুদ্ধদেব তাঁর প্রিয় শিষ্য আনন্দকে স্ত্রীজাতিসম্বন্ধে কিংকর্ত্তব্যের যে উপদেশ দিয়েছিলেন, সীতেশের ঠিক কথা তার পুনরাবৃত্তি নয়।

সীতেশের কথা

তোমরা সকলেই জান, আমার প্রকৃতি সেনের ঠিক উল্টো। স্ত্রীলোক দেখলে আমার মন আপনিই নরম হয়ে আসে। কত সবল শরীরের ভিতর কত দুর্ব্বল মন থাকতে পারে, তোমাদের মতে, আমি তার একটি জল-জ্যান্ত উদাহরণ। বিলেতে আমি মাসে একবার-করে নূতন করে ভালবাসায় পড়্‌তুম; তার জন্য তোমরা আমাকে কত-না ঠাট্টা করেছ এবং তার জন্য আমি তোমাদের সঙ্গে কত-না তর্ক করেছি। কিন্তু এখন আমি আমার নিজের মন বুঝে দেখেছি যে, তোমরা যা বল্‌তে তা ঠিক। আমি যে সেকালে, দিনে একবার-করে ভালবাসায় পড়ি নি, এতেই আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই। স্ত্রীজাতির দেহ এবং মনের ভিতর এমন-একটি শক্তি আছে যা আমার দেহমনকে নিত্য টানে। সে আকর্ষণী শক্তি

কারও বা চোখের চাহনিতে থাকে, কারও বা মুখের হাসিতে কারও বা গলার স্বরে কারও বা দেহের গঠনে। এমন-কি স্ত্রী-অঙ্গের কাপড়ের রঙে গহনার ঝঙ্কারেও আমার বিশ্বাস যাদু আছে। মনে আছে একদিন একজনকে দেখে আমি কাতর হয়ে পড়ি, সেদিন সে ফলসাই-রঙের কাপড় পরেছিল—তারপরে তাকে আর-একদিন আশমানি-রঙের কাপড়-পরা দেখে আমি প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলুম। এ রোগ আমার আজও সম্পূর্ণ সারে নি। আজও আমি মলের শব্দ শুন্‌লে কান খাড়া করি, রাস্তায় কোন বন্ধ-গাড়িতে খড়খড়ি তোলা রয়েছে দেখলে আমার চোখ আপনিই সেদিকে যায়; গ্রীক Statueর মত গড়নের কোনও হিন্দুস্থানী রমণীকে পথে-ঘাটে পিছন-থেকে দেখলে আমি ঘাড়-বাঁকিয়ে একবার তার মুখটি দেখে নেবার চেষ্টা করি। তা ছাড়া সেকালে আমার মনে এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, আমি হচ্ছি সেই-জাতের পুরুষমানুষ, যাদের প্রতি স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃই অনুরক্ত হয়। এ-সত্বেও আমি যে নিজের কিম্বা পরের সর্ব্বনাশ করি নি তার কারণ Don Juan হবার মত সাহস ও শক্তি আমার শরীরে আজও নেই, কখন ছিলও না। দুনিয়ার যত সুন্দরী আজও রীতিনীতির কাচের আলমারির ভিতর পোরা রয়েছে, অর্থাৎ তাদের দেখা যায়, ছোঁয়া যায় না। আমি যে ইহজীবনে এই আলমারির একখানা আয়নাও ভাঙিনি তার কারণ ও-বস্তু ভাঙলে প্রথমতঃ বড় আওয়াজ হয়—তার ঝনঝনানি পাড়া মাথায় কোরে তোলে; দ্বিতীয়তঃ তাতে হাত-পা কাটবার ভয়ও আছে। আসল কথা, সেন eternal feminine একের ভিতর পেতে চেয়েছিলেন—আমি অনেকের

ভিতর। ফল সমানই হয়েছে। তিনিও তা পাননি, আমিও পাই নি। তবে দুজনের ভিতর তফাৎ এই যে, সেনের মত কঠিন মন কোনও স্ত্রীলোকের হাতে পড়্‌লে, সে তাতে বাটালি দিয়ে নিজের নাম খুদে রেখে যায়, কিন্তু আমার মত তরল মনে, স্ত্রীলোকমাত্রেই তার আঙ্গুল ডুবিয়ে যা-খুসি হিজিবিজি করে দাঁড়ি টান্‌তে পারে, সেই-সঙ্গে সে-মনকে ক্ষণিকের তরে ঈষৎ চঞ্চল করে তুল্‌তে পারে—কিন্তু কোনও দাগ রেখে যেতে পারে না; সে অঙ্গুলিও সরে যায়—তার রেখাও মিলিয়ে যায়; তাই আজ দেখ্‌তে পাই আমার স্মৃতিপটে একটি-ছাড়া অপর কোন স্ত্রীলোকের স্পষ্ট ছবি নেই। একটি দিনের একটি ঘটনা আজও ভুল্‌তে পারিনি, কেননা এক-জীবনে এমন ঘটনা দুবার ঘটে না।

আমি তখন লণ্ডনে। মাসটি ঠিক মনে নেই; বোধ হয় অক্টোবরের শেষ, কিম্বা নভেম্বরের প্রথম। কেন-না এইটুকু মনে আছে যে তখন চিম্‌নিতে আগুন দেখা দিয়েছে। আমি একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি যে, সন্ধ্যে হয়েছে; —যেন সূর্য্যের আলো নিভে গেছে অথচ গ্যাসের বাতি জ্বালা হয় নি। ব্যাপারখানা কি বোঝবার জন্য জানলার কাছে গিয়ে দেখি রাস্তায় যত লোক চলেছে সকলের মুখই ছাতায় ঢাকা। তাদের ভিতর পুরুষ স্ত্রীলোক চেনা যাচ্ছে শুধু কাপড় ও চালের তফাতে। যারা ছাতার ভিতর মাথা গুঁজে কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করে হনহন্ করে চলেছেন, বুঝলুম তাঁরা পুরুষ; আর যাঁরা ডানহাতে ছাতা ধরে বাঁহাতে গাউন হাঁটুপর্য্যন্ত তুলে ধরে কাঁদা-খোঁচার মত লাফিয়ে-লাফিয়ে চলেছেন, বুঝলুম তাঁরা স্ত্রীলোক।

এই থেকে আন্দাজ করলুম বৃষ্টি সুরু হয়েছে; কেন না এ-বৃষ্টির ধারা এত সূক্ষ্ম যে তা চোখে দেখা যায় না, আর এত ক্ষীণ যে তা কানে শোনা যায় না।

ভাল কথা, এ জিনিষ কখন নজর করে দেখেছ কি যে বর্ষার দিনে বিলেতে কখনও মেঘ করে না, আকাশটা শুধু আগাগোড়া ঘুলিয়ে যায়, এবং তার ছোঁয়াচ লেগে গাছপালা সব নেতিয়ে পড়ে, রাস্তাঘাট কাদায় প্যাচপ্যাচ করে? মনে হয় যে এ বর্ষার আধখানা উপর থেকে নামে আর আধখানা নীচে থেকেও ওঠে, আর দুইয়ে মিলে আকাশময় একটা বিশ্রী অস্পৃশ্য নোংরা ব্যাপারের সৃষ্টি করে। সকালে উঠেই দিনের এই চেহারা দেখে যে একদম মন-মরা হয়ে গেলুম সে কথা বলা বাহুল্য। এ রকম দিনে ইংরাজরা বলেন, তাঁদের খুন করবার ইচ্ছে যায়; সুতরাং এ অবস্থায় আমাদের যে আত্মহত্যা করবার ইচ্ছে হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

আমার একজনের সঙ্গে Richmond যাবার কথা ছিল, কিন্তু এমন-দিনে ঘর থেকে বেরোবার প্রবৃত্তি হল না। কাজেই ব্রেকফাষ্ট খেয়ে Times নিয়ে পড়তে বসলুম। আমি সেদিন ও কাগজের প্রথম অক্ষর থেকে শেষ অক্ষর পর্য্যন্ত পড়লুম; এক কথাও বাদ দেই নি। সেদিন আমি প্রথম আবিষ্কার করি যে, Times-এর শাঁসের চাইতে তার খোসা, তার প্রবন্ধের চাইতে তার বিজ্ঞাপন ঢের বেশি মুখরোচক। তার আর্টিকেল পড়লে মনে যা হয় তার নাম রাগ; আর তার আডভার্টিস্‌মেণ্ট পড়লে মনে মনে যা হয় তার নাম লোভ। সে যাই হোক, কাগজ-পড়া

শেষ হতে-না-হতেই দাসী লাঞ্চ এনে হাজির করলে; যেখানে বসেছিলুম সেইখানে বসেই তা শেষ কল্লুম। তখন দুটো বেজেছে। অথচ বাইরের চেহারার কোনও বদল হয় নি, কেননা এই বিলেতি বৃষ্টি ভাল করে পড়তেও জানে না, ছাড়তেও জানে না। তফাতের মধ্যে দেখি যে, আলো ক্রমে এত কমে এসেছে যে বাতি না জ্বেলে ছাপার অক্ষর আর পড়বার যো নেই।

আমি কি করব ঠিক করতে না পেরে ঘরের ভিতর পায়চারি করতে সুরু করলুম, ক্ষাণিকক্ষণ পরে তাতেও বিরক্তি ধরে এল। ঘরের গ্যাস জ্বেলে আবার পড়তে বসলুম। প্রথমে নিলুম আইনের বই —Anson-এর contract। এক-কথা দশবার করে পড়লুম অথচ offer এবং acceptance-এর এক বর্ণও মাথায় ঢুকল না। আমি জিজ্ঞেস কল্লুম "তুমি এতে রাজি?" তুমি উত্তর করলে "আমি ওতে রাজি।"—এই সোজা জিনিষটেকে মানুষ কি জটিল করে তুলেছে এই দেখে মানুষের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়্লুম। মানুষে যদি কথা দিয়ে কথা রাখত তাহলে এই সব পাপের বোঝা আমাদের আর বইতে হত না। তার খুরে দণ্ডবৎ করে Anson-কে সেল্ফের সর্ব্বোচ্চ থাকে তুলে রাখলুম। নজরে পড়ল সুমুখে একখানা পুরোনো Punch পড়ে রয়েছে। তাই নিয়ে ফের বসে গেলুম। সত্যি কথা বলতে কি, সেদিন Punch পড়ে হাসি পাওয়া দূরে থাক্, রাগ হতে লাগল। এমন কলে-তৈরী রসিকতাও যে মানুষে পয়সা দিয়ে কিনে পড়ে এই ভেবে অবাক হলুম। দিব্যচক্ষে দেখতে পেলুম যে, পৃথিবীর এমন দিনও আসবে, যখন Made in Germany এই ছাপমারা রসিকতাও বাজারে দেদার কাটবে। সে

যাই হোক, আমার চৈতন্য হল যে এদেশের আকাশের মত এদেশের মনেও বিদ্যুৎ কালে-ভদ্রে এক-আধবার দেখা দেয়—তাও আবার যেমন ফ্যাকাসে, তেমনি এলো। যেই এই কথা মনে হওয়া অমনি Punchখানি চিম্‌নির ভিতর গুঁজে দিলুম, তার আগুন আনন্দে হেসে উঠল। একটি জড়পদার্থ Punchএর মান রাখলে দেখে খুসী হলুম।

তার পর চিম্‌নির দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে মিনিট-দশেক আগুন পোহালুম। তার পর আবার একখানি বই নিয়ে পড়তে বসলুম। এবার নভেল। খুলেই দেখি ডিনারের বর্ণনা। টেবিলের উপর সারি সারি রূপোর বাতিদান, গাদা গাদা রূপোর বাসন, ডজন ডজন হীরের মতন পল-কাটা চকচকে ঝকঝকে কাঁচের গেলাস। আর, সেই-সব গেলাসের ভিতর স্পেনের ফ্রান্সের জর্ম্মানির মদ,—তার কোনটির রঙ চুনির, কোনটির পান্নার, কোনটি পোখরাজের। এ নভেলের নায়কের নাম Algernon, নায়িকার Millicent। একজন Dukeএর ছেলে, আর একজন millionaireএর মেয়ে, রূপে Algernon বিদ্যাধর, Millicent বিদ্যাধরী। কিছুদিন হল পরস্পর পরস্পরের প্রণয়াসক্ত হয়েছেন এবং সে-প্রণয় অতি পবিত্র, অতি মধুর, অতি গভীর। এই ডিনারে Algernon বিবাহের offer করবেন, Millicent তা accept করবেন—contract পাকা হয়ে যাবে।

সে-কালের কোনও বর্ষার দিনে কালিদাসের আত্মা যেমন মেঘ-চড়ে অলকায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, এই দুর্দ্দিনে আমার আত্মাও তেমনি কুয়াসায় ভর করে এই নভেল-বর্ণিত এই রূপোর-

রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হল। কল্পনার চক্ষে দেখলুম সেখানে একটি যুবতী, বিরহিণী যক্ষ-পত্নীর মত, আমার পথ-চেয়ে বসে আছে। আর তার রূপ! তা বর্ণনা করবার ক্ষমতা আমার নেই। সে যেন হীরামাণিক-দিয়ে সাজানো সোনার প্রতিমা। বলা বাহুল্য যে চারচক্ষুর মিলন হবা-মাত্রই আমার মনে ভালবাসা উথলে উঠল। আমি বিনা বাক্যব্যয়ে আমার মনপ্রাণ তার হাতে সমর্পন কল্লুম। সে সস্নেহে সাদরে তা গ্রহণ করলে। ফলে যা পেলুম তা শুধু যক্ষকন্যা নয়, সেই সঙ্গে যক্ষের ধন। এমন সময় ঘড়িতে টং টং করে চারটে বাজল, অমনি আমার দিবাস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। চোখ চেয়ে দেখি যেখানে আছি সে রূপকথার রাজ্য নয়, কিন্তু একটা স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার জল-কাদার দেশ। আর একা ঘরে বসে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠল; আমি টুপি ছাতা ওভারকোট নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লুম।

জানইত, জলই হোক, ঝড়ই হোক্, লণ্ডনের রাস্তায় লোক চলাচল কখনই বন্ধ হয় না; সেদিনও হয় নি। যতদূর চোখ যায় দেখি, শুধু মানুষের স্রোত চলেছে—সকলেরই পরণে কালো কাপড়, মাথায় কালো টুপি, পায়ে কালো জুতো, হাতে কালো ছাতা। হঠাৎ দেখতে মনে হয় যেন অসংখ্য অগণ্য Daguerro type এর ছবি বইয়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় দিশেহারা হয়ে ছুটোছুটি করছে। এই লোকারণ্যের ভিতর, ঘরের চাইতে আমার বেশি একলা মনে হতে লাগল, কেননা এই হাজার হাজার স্ত্রীপুরুষের মধ্যে এমন একজনও ছিল না যাকে আমি চিনি, যার সঙ্গে দুটো কথা কইতে পারি; অথচ সেই-মুহূর্ত্তে মানুষের সঙ্গে কথা কইবার

জন্য আমার মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। মানুষ যে মানুষের পক্ষে কত আবশ্যক তা এই-রকম দিনে এই-রকম অবস্থায় পূরো বোঝা যায়।

নিরুদ্দেশ-ভাবে ঘুরতে ঘুরতে আমি Holborn Circusএর কাছাকাছি গিয়ে উপস্থিত হলুম। সুমুখে দেখি একটি ছোট্ট পুরোনো বইয়ের দোকান, আর তার ভিতরে একটি জীর্ণ-শীর্ণ, বৃদ্ধ গ্যাসের বাতির নীচে বসে আছে: তার গায়ের ফ্রক-কোটের বয়েস বোধ হয় তার চাইতেও বেশি। যা বয়েস-কালে কালো ছিল এখন তা হল্‌দে হয়ে উঠেছে। আমি অন্যমনস্ক-ভাবে সেই দোকানে ঢুকে পড়লুম। বৃদ্ধটি শশব্যস্তে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল। তার রকম দেখে মনে হল যে আমার মত সৌখিন পোষাক-পরা খদ্দের ইতিপূর্ব্বে তার দোকানের ছায়া কখনই মাড়ায় নি। এ-বই ও-বই সে-বইয়ের ধূলো ঝেড়ে সে আমার সুমুখে নিয়ে এসে ধর্‌তে লাগল। আমি তাকে স্থির থাক্‌তে বলে নিজেই এখান-থেকে সেখান-থেকে বই টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে সুরু করলুম। কোন বইয়ের বা পাঁচমিনিট ধরে ছবি দেখ্‌লুম, কোন বইয়ের বা দু-চার লাইন পড়েও ফেললুম। পুরোনো বই-ঘাঁটার ভিতর যে একটু আমোদ আছে তা তোমরা সবাই জানো। আমি এক-মনে সেই আনন্দ উপভোগ কচ্ছি এমন সময়ে হঠাৎ এই ঘরের ভিতর কি জানি কোথা-থেকে একটি মিষ্টি গন্ধ বর্ষার দিনে বসন্তের হাওয়ার মত ভেসে এল। সে গন্ধ যেমন ক্ষীণ তেমনি তীক্ষ্ণ,—এ সেই জাতের গন্ধ যা অলক্ষিতে তোমার বুকের ভিতর প্রবেশ করে, আর সমস্ত অন্তরাত্মাকে উতলা

করে তোলে। এ গন্ধ ফুলের নয়; কেন-না ফুলের গন্ধ বাতাসে ছড়িয়ে যায়, আকাশে চারিয়ে যায়; তার কোনও মুখ নেই। কিন্তু এ সেই-জাতীয় গন্ধ যা একটি সূক্ষ্মরেখা ধরে ছুটে আসে, একটি অদৃশ্য তীরের মত বুকের ভিতর গিয়ে বেঁধে। বুঝলুম এ গন্ধ হয় মৃগনাভি কস্তুরির, নয় পাচুলির অর্থাৎ রক্তমাংসের দেহ থেকে এ গন্ধের উৎপত্তি। আমি একটু ত্রস্ত-ভাবে মুখ ফিরিয়ে দেখি যে, পিছনে গলা-থেকে-পা-পর্য্যন্ত আগাগোড়া কালো কাপড়পরা একটি স্ত্রীলোক লেজে ভর দিয়ে সাপের মত ফণা ধরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তার দিকে হাঁ-করে চেয়ে রয়েছি দেখে সে চোখ ফেরালে না। পূর্ব্বপরিচিত লোকের সঙ্গে দেখা হলে লোকে যে-রকম করে হাসে সেই-রকম মুখ-টিপে-টিপে হাস্‌তে লাগল, অথচ আমি হলপ করে বল্‌তে পারি যে, এ-স্ত্রীলোকের সঙ্গে ইহজন্মে আমার কস্মিনকালেও দেখা হয় নি। আমি এই হাসির রহস্য বুঝতে না পেরে ঈষৎ অপ্রতিভভাবে তার দিকে পিছন ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে একখানি বই খুলে দেখতে লাগলুম। কিন্তু তার একছত্রও আমার চোখে পড়ল না। আমার মনে হতে লাগল যে, তার চোখ-দুটি যেন ছুরির মত আমার পিঠে বিঁধছে। এতে আমার এত অসোয়াস্তি করতে লাগল যে আমি আবার তার দিকে ফিরে দাঁড়ালুম। দেখি সেই মুখটেপা হাসি তার মুখে লেগেই রয়েছে। ভাল করে নিরীক্ষণ করে দেখলুম যে এ-হাসি তার মুখের নয়, চোখের: ইস্পাতের মত নীল, ইস্পাতের মত কঠিন দুটি চোখের কোণ থেকে সে-হাসি ছুরির ধারের মত চিক্‌মিক্ করছে। আমি সে-দৃষ্টি এড়াবার

যতবার চেষ্টা করলুম আমার চোখ ততবার ফিরে সেই-দিকেই গেল। শুনতে পাই, কোন কোন সাপের চোখে এমন আকর্ষণী শক্তি আছে, যার টানে গাছের পাখী মাটিতে নেমে আসে; তাক্লার পাখা-ঝাপটা দিয়েও তা উড়ে যেতে পারে না। আমার মনের অবস্থাও ঐ পাখীর মতই হয়েছিল।

বলাবাহুল্য, ইতিমধ্যে আমার মনে নেশা ধরেছিল,—ঐ পাচুলির গন্ধ আর ঐ চোখের আলো এই দুইয়ে মিশে আমার শরীর-মন দুই উত্তেজিত করে তুলেছিল। আমার মাথার ঠিক ছিল না সুতরাং তখন যে কি কচ্ছিলুম তা আমি জানিনে। শুধু এইটুকু মনে আছে যে হঠাৎ তার গায়ে আমার গায়ের ধাক্কা লাগল। আমি মাপ চাইলুম; সে হাসিমুখে উত্তর করলে—"আমার দোষ। তোমার নয়।" তার গলার স্বরে আমার বুকের ভিতর কি-যেন ঈষৎ কেঁপে উঠল, কেননা সে আওয়াজ বাঁশির নয়, তারের যন্ত্রের। তাতে জোয়ারি ছিল। এই কথার পর আমরা এমনভাবে পরস্পর কথাবার্ত্তা আরম্ভ করলুম যেন আমরা দুজনে কতকালের বন্ধু। আমি তাকে এ-বইয়ের ছবি দেখাই, সে আর-একখানি বই টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করে আমি তা পড়েছি কিনা। এই করতে করতে কতক্ষণ কেটে গেল তা জানিনে। তার কথাবার্ত্তায় বুঝলুম যে তার পড়াশুনো আমার-চাইতে ঢের বেশি। জর্ম্মাণ ফ্রেঞ্চ ইটালিয়ান তিন ভাষার সঙ্গেই দেখলুম তার সমান পরিচয় আছে। আমি ফ্রেঞ্চ জানতুম তাই নিজের বিদ্যে-দেখাবার জন্যে একখানি ফরাসি কেতাব তুলে নিয়ে ঠিক তার মাঝখানে খুলে পড়তে লাগলুম; সে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে আমার কাঁধের উপর দিয়ে

মুখ বাড়িয়ে দিয়ে দেখ্‌তে লাগল, আমি কি পড়ছি। আমার কাঁধে তার চিবুক, আমার গালে তার চুল স্পর্শ করছিল; সে স্পর্শে ফুলের কোমলতা, ফুলের গন্ধ ছিল; কিন্তু এই স্পর্শে আমার শরীর-মনে আগুন ধরিয়ে দিলে।

ফরাসী বইখানির যা পড়ছিলুম তা হচ্ছে একটি কবিতা—

Puisque vous n'avez rien a' me dire

Pourquoi venir aupres de moi

Pourquoi me faire ce sourire

Qui tournerait le tete ou roi."

এর মোটামুটি অর্থ এই—"যদি আমাকে তোমার বিশেষ কিছু বলবার না থাকে ত আমার কাছে এলেই বা কেন আর অমন করে হাসলেই বা কেন যাতে রাজারাজড়ারও মাথা ঘুরে যায়।"

আমি কি পড়ছি দেখে সুন্দরী ফিক্‌-করে হেসে উঠল। সে হাসির ঝাপ্‌টা আমার মুখে লাগল, আমি চোখে ঝাপসা দেখ্‌তে লাগলুম। আমার পড়া আর এগুলো না। ছোটছেলেতে যেমন কোন অন্যায় কাজ করতে ধরা পড়্‌লে শুধু হেলে-দোলে ব্যাঁকে-চোরে, অপ্রতিভভাবে একিদ ওদিক চায়, আর-কোনও কথা বল্‌তে পারে না, আমার অবস্থাও তদ্রূপ হয়েছিল।

আমি বইখানি বন্ধ করে বৃদ্ধকে ডেকে তার দাম জিজ্ঞেস করলুম। সে বল্লে, এক শিলিং। আমি বুকের পকেট থেকে একটি মরোক্কোর পকেট-কেস বার করে দাম দিতে গিয়ে দেখি যে তার ভিতর আছে শুধু পাঁচটি গিনি;—একটিও সিলিং নেই। আমি এ-পকেট ও-পকেট খুঁজে কোথায়ও একটি সিলিং পেলুম না।

এই সময়ে আমার নব-পরিচিতা নিজের পকেট থেকে একটি সিলিং বার করে বৃদ্ধের হাতে দিয়ে আমাকে বল্‌লে—"তোমার আর গিনি ভাঙ্গাতে হবে না, ও-বইখানি আমি নেব।" আমি বল্লুম—"তা হবে না।" তাতে সে হেসে বল্‌লে—"আজ থাক্, আবার যেদিন দেখা হবে সেইদিনই তুমি টাকাটা আমাকে ফিরে দিয়ো।"

এরপরে আমরা দুজনেই বাইরে চলে এলুম। রাস্তায় এসেই আমার সঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করলে—"এখন তোমার বিশেষ-করে কোথায়ও যাবার আছে?" আমি বল্লুম—"না।"

—"তবে চলো Oxford circus পর্য্যন্ত আমাকে এগিয়ে দাও। লণ্ডনের রাস্তায় একা চল্‌তে হলে সুন্দরী স্ত্রীলোককে অনেক উপদ্রব সহ্য কর্‌তে হয়।"

এ প্রস্তাব শুনে আমার মনে হল, রমণীটি আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। আমি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে জিজ্ঞেস কল্লুম—"কেন?"

—"তার কারণ পুরুষমানুষ হচ্ছে বাঁদরের জাত। রাস্তায় যদি কোনও মেয়ে একা চলে, আর তার যদি রূপ যৌবন থাকে, তাহলে হাজার পুরুষের মধ্যে পাঁচশজন তার দিকে ফিরে ফিরে তাকাবে, পঞ্চাশজন তার দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হাসি হাসবে, পাঁচজন গায়ে পড়ে আলাপ কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে আর অন্ততঃ একজন এসে বল্‌বে, আমি তোমাকে ভালবাসি।"

—"এই যদি আমাদের স্বভাব হয় ত কি ভরসায় আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছ?"

সে একটু থমকে দাঁড়িয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে —"তোমাকে আমি ভয় করিনে।"

—"কেন ?"

—"বাঁদর ছাড়া আর-এক জাতের পুরুষ আছে। তারা আমাদের রক্ষক।"

—"সে জাতটি কি ?"

—"যদি রাগ না করো ত বলি। কেননা কথাটা সত্য হলেও প্রিয় নয়।"

—"তুমি নিশ্চিন্তে বল্‌তে পারো—কেননা তোমার উপর রাগ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।"

—"সে হচ্ছে পোষা-কুকুরের জাত। এ জাতের পুরুষরা আমাদের পায়ে লুটিয়ে পড়ে, মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে চেয়ে থাকে, গায়ে হাত দিলে আনন্দে লেজ নাড়ায়, আর অপর-কোনও পুরুষ আমাদের কাছে আস্‌তে দেয় না। বাইরের-লোক দেখলেই প্রথমে গোঁ গোঁ করে; তারপর দাঁত বার করে, তাতেও যদি সে পিঠটান না দেয় তাহলে তাকে কামড়ায়।"

আমি কি উত্তর করব না ভেবে পেয়ে বল্লুম—"তোমার দেখছি আমার জাতের উপর ভক্তি খুব বেশি।"

সে আমার মুখের উপর তার চোখ রেখে উত্তর করলে—"ভক্তি না থাক, ভালবাসা আছে।" আমার মনে হল তার চোখ তার কথায় সায় দিচ্ছে।

এতক্ষণ আমরা Oxford cricus-এর দিকে চলেছিলুম, কিন্তু বেশি-দূর অগ্রসর হতে পারি নি, কেননা দুজনেই খুব আস্তে হাঁটছিলুম।

তার শেষ-কথাগুলি শুনে আমি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলুম।

তারপর যা জিজ্ঞেস করলুম তার থেকে বুঝতে পারবে যে তখন আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কতটা লোপ পেয়েছিল।

আমি।—"তোমার সঙ্গে আমার আবার কবে দেখা হবে ?"

উত্তর এল—"কখনই না।"

—"এই যে একটু আগে বললে যে আবার যেদিন দেখা হবে..."

—"সে তুমি সিলিংটে নিতে ইতস্তত করছিলে বলে।"

এই বলে সে আমার দিকে চাইলে। দেখি তার মুখে সেই-হাসি—যে-হাসির অর্থ আমি আজ পর্য্যন্ত বুঝতে পারি নি।

আমি তখন নিশীথে-পাওয়া লোকের মত জ্ঞানহারা হয়ে চল্‌ছিলুম। তার সকল-কথা আমার কানে ঢুকলেও, মনে ঢুকছিল না। তাই আমি তার হাসির উত্তরে বললুম—"তুমি না চাইতে পার কিন্তু আমি তোমার সঙ্গে আবার দেখা করতে চাই।"

—"কেন ? আমার সঙ্গে তোমার কোনও কাজ আছে ?"

—"শুধু দেখা-করা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই!—আসল কথা এই যে, তোমাকে না-দেখে আমি আর থাকতে পারব না।"

—"এ-কথা যে-বইয়ে পড়েছ সেটি নাটক না নভেলে ?"

—"পরের বই থেকে বলছি নে, নিজের মন থেকে। যা বলছি তা সম্পূর্ণ সত্য।"

—"তোমার-বয়েসের লোক নিজের মন জানে না; মনের সত্য-মিথ্যে চিনতেও সময় লাগে। ছোট ছেলের যেমন মিষ্টি দেখলেই খাবার লোভ হয়, বিশ-একুশ বৎসর বয়েসের বড় ছেলেদেরও তেমনি মেয়ে দেখলেই ভালবাসা হয়। ও সব হচ্ছে যৌবনের দুষ্টু ক্ষিধে।"

—"তুমি যা বলছ তা হয়ত সত্য। কিন্তু আমি জানি যে তুমি আমার কাছে আজ বসন্তের হাওয়ার মত এসেছ, আমার মনের মধ্যে আজ ফুল ফুটে উঠেছে।"

—"ও হচ্ছে যৌবনের season flower, দুদণ্ডেই ঝরে যায়—ও-ফুলে কোনও ফল ধরে না।"

—"যদি তাই হয় ত যে ফুল তুমি ফুটিয়েছ তার দিকে মুখ-ফেরাচ্ছ কেন? ওর প্রাণ দুদণ্ডের কি চিরদিনের তার পরিচয় শুধু ভবিষ্যতই দিতে পারে।"

এই কথা শুনে সে একটু গম্ভীর হয়ে গেল। পাঁচমিনিট চুপ করে থেকে বল্‌লে—"তুমি কি ভাবছ যে তুমি পৃথিবীর পথে আমার পিছু পিছু চিরকাল চল্‌তে পার্‌বে?"

—"আমার বিশ্বাস পার্‌ব।"

—"আমি তোমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছি তা না জেনে?"

—"তোমার আলোই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।"

—"আমি যদি আলেয়া হই! তাহলে তুমি একদিন অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে শুধু কেঁদে বেড়াবে।"

আমার মনে এ কথার কোনও উত্তর জোগাল না। আমি নীরব হয়ে গেলুম দেখে সে বল্‌লে—"তোমার মুখে এমন-একটি সরলতার চেহারা আছে যে আমি বুঝতে পাচ্ছি যে তুমি এই-মুহূর্ত্তে তোমার মনের কথাই বল্‌ছ। সেই জন্যই আমি তোমার জীবন আমার সঙ্গে জড়াতে চাই নে। তাতে শুধু কষ্ট পাবে। যে কষ্ট আমি বহু লোককে দিয়েছি সে-কষ্ট আমি তোমাকে দিতে চাই নে;—প্রথমতঃ তুমি বিদেশী, তার 'পর তুমি নিতান্ত অর্ব্বাচীন।"

এতক্ষণে আমরা Oxford circus-এ এসে পৌঁছিলুম। আমি একটু উত্তেজিত ভাবে বল্‌লুম—"আমি নিজের মন দিয়ে জান্‌ছি যে তোমাকে হারানোর চাইতে আমার পক্ষে আর কিছু বেশি কষ্ট হতে পারে না। সুতরাং তুমি যদি আমাকে কষ্ট না দিতে চাও তাহলে বলো আবার কবে আমার সঙ্গে দেখা করবে।"

সম্ভবতঃ আমার কথার ভিতর এমন একটা কাতরতা ছিল যা তা তার মন্‌কে স্পর্শ করলে। তার চোখের দিকে চেয়ে বুঝলুম যে তার মনে আমার প্রতি একটু মায়া জন্মেছে। সে বল্লে—"আচ্ছা তোমার কার্ড দাও, আমি তোমাকে চিঠি লিখব।"

আমি অমনি আমার পকেট-কেস থেকে একখানি কার্ড বার করে তার হাতে দিলুম। তারপর আমি তার কার্ড চাইলে সে উত্তর দিলে—"সঙ্গে নেই।" আমি তার নাম জানবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করলুম, সে কিছুতেই তা বল্‌তে রাজি হল না। শেষটা অনেক কাকুতি-মিনতি কর্‌বার পর বল্‌লে—"তোমার একখানি কার্ড দাও তার গায়ে লিখে দিচ্ছি; কিন্তু তোমায় কথা দিতে হবে সাড়ে-ছটার আগে তুমি তা দেখ্‌বে না।"

তখন ছটা বেজে বিশ মিনিট। আমি দশ মিনিট ধৈর্য্য ধরে থাক্‌তে প্রতিশ্রুত হলুম। সে তখন আমার পকেট-কেসটি আমার হাত থেকে নিয়ে আমার দিকে পিঠ-ফিরিয়ে একখানি কার্ড বার করে তার উপর পেন্সিল দিয়ে কি লিখে আবার সেখানি পকেট-কেসের ভিতর রেখে কেসটি আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়েই পাশে যে ক্যাবখানি দাঁড়িয়ে ছিল তার উপর লাফিয়ে উঠে সোজা মার্বেল আর্চের দিকে হাঁকাতে বল্‌লে। দেখতে-না-

দেখ্‌তে ক্যাবখানি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি Regent street-এ ঢুকে প্রথম যে restaurant চোখে পড়ল তার ভিতর প্রবেশ করে এক পাইণ্ট স্যাম্পেন নিয়ে বসে গেলুম। মিনিটে মিনিটে ঘড়ি দেখ্‌তে লাগলুম। দশমিনিট দশঘণ্টা মনে হল। যেই সাড়ে-ছটা বাজা অমনি আমি পকেট-কেস খুলে যা দেখলুম তাতে আমার ভালবাসা আর শ্যাম্পেনের নেশা একসঙ্গে ছুটে গেল। দেখি কার্ডখানি রয়েছে, গিনি ক'টি নেই। কার্ডের উপর অতি সুন্দর স্ত্রীহস্তে এই-কটি কথা লেখা ছিল—

"পুরুষমানুষের ভালবাসার চাইতে তাদের টাকা আমার ঢের বেশি আবশ্যক। যদি তুমি আমার কখনও খোঁজ না করো তাহলেই যথার্থ বন্ধুত্বের পরিচয় দেবে।"

আমি অবশ্য তার খোঁজ নিজেও করিনি, পুলিশ-দিয়েও করাই নি! শুনে আশ্চর্য্য হবে সেদিন আমার মনে রাগ হয় নি, দুঃখ হয়েছিল, তাও আবার নিজের জন্য নয়, তার জন্য।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

*

* *

যে কথা বলিতে চাই,

বলা হয় নাই,—

সে কেবল এই—

চিরদিবসের বিশ্ব আঁখি সম্মুখেই

দেখিনু সহস্রবার

দুয়ারে আমার।

অপরিচিতের এই চিরপরিচয়

এতই সহজে নিত্য ভরিয়াছে গভীর হৃদয়

সে কথা বলিতে পারি এমন সরল বাণী

আমি নাহি জানি।

শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়াবটে;

নদীর এপারে ঢালু তটে

চাষী করিতেছে চাষ;

উড়ে চলিয়াছে হাঁস

ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরতলে।

চলে কি না চলে

ক্লান্তস্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত

আধ-জাগা নয়নের মত।

পথখানি বাঁকা
বহুশত বরষের পদচিহ্ন আঁকা
চলেছে মাঠের ধারে—ফসল ক্ষেতের যেন মিতা—
নদী সাথে কুটীরের বহে কুটুম্বিতা।

ফাল্গুনের এ আলোয় এই গ্রাম ওই শূন্য মাঠ
ওই খেয়াঘাট
ওই নীল নদীরেখা, ওই দূর বালুকার কোলে
নিভৃত জলের ধারে চখাচখি কাকলী-কল্লোলে
যেখানে বসায় মেলা—এই সব ছবি
কতদিন দেখিয়াছে কবি।
শুধু এই চেয়ে দেখা, এই পথ বেয়ে চলে যাওয়া,
এই আলো, এই হাওয়া,
এইমত অস্ফুটধ্বনির গুঞ্জরণ,
ভেসে-যাওয়া মেঘ হতে
অকস্মাৎ নদীস্রোতে
ছায়ার নিঃশব্দ সঞ্চরণ,
যে আনন্দ বেদনায় এ জীবন বারেবারে করেছে উদাস
হৃদয় খুঁজিছে আজি তাহারি প্রকাশ।

পদ্মা
৮ই ফাল্গুন, ১৩২২

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ছাত্রের পত্র

বিগত পৌষ-মাসের "সবুজ পত্রে" পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়দ্বয়ের যে দুইটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠে বঙ্গবাসীর বিশেষতঃ ছাত্র-সমাজের যুগপৎ আশা ও আনন্দ বাড়িয়া গিয়াছে; এ কথা বলা বাহুল্য। এত দিন ধরিয়া আমরা শিক্ষার ত্রুটির কথা শুনিয়া আসিতেছি; কত লোকে আমাদের শিক্ষা-প্রণালীর উপর তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণ বর্ষণ করিয়াছেন; কিন্তু কেহই নূতন পন্থা-নির্দ্দেশ করেন নাই। আজ যে বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিক একত্র হইয়া শিক্ষার সুপথের দিকে দেশের লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহাতে আমরা ধন্য হইয়াছি।

মাতৃভাষা, শিক্ষার রাজপথ না হইলেও প্রশস্ত পথ—এ কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না; কিন্তু পূজনীয় শীলমহাশয় এমন দু'একটি কথা বলিয়াছেন যাহার উত্তরে দু-একটি কথা আমাদের পক্ষ হইতে বলা আবশ্যক। অধ্যাপক শীল মহাশয় লিখিয়াছেন—'অতি অল্প সংখ্যক পরীক্ষার্থী ইতিহাসের প্রশ্নের বাঙ্গলায় উত্তর দেয়।' এ কথা সত্য। কিন্তু ইহার কারণ কি? অভিভাবক ও স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের মাতৃভাষার প্রতি অনাস্থাই ইহার কারণ,—ছাত্রদের অভক্তি নহে। কর্ত্তৃপক্ষেরা এ বিষয়ে আমাদের উৎসাহ দেওয়া দূরে থাক, প্রতিবন্ধকতা করিতেও পশ্চাৎপদ হন না। তাঁহারা আবার বাংলায় চিঠিপত্র লেখাও পছন্দ করেন না। ইংরাজিতে

চিঠি না লেখায় আমি একবার পত্রের উত্তর পাই নাই; এবং তজ্জন্য বিশেষ ভৎর্সিতও হইয়াছিলাম। দোষ দিব কার? বিধি বাংলার প্রতি বাম। আধুনিক ছাত্র-সমাজের আর যাহাই দোষ থাকুক, দেশকে ও মাতৃভাষাকে তাহারা পূর্ব্বের মত বিদেশীর চক্ষে দেখে না। কিন্তু যেখানে গুরুজন প্রতিবন্ধক সেখানে উপায় কি? এ বিষয়ে শিক্ষার দরকার আমাদের যতখানি আমাদের কর্তৃপক্ষদেরও ততখানি বলিয়া মনে হয়; যাঁহারা আমাদের পরিচালনের ভার লইয়াছেন তাঁহারা যদি পথ না জানেন তবে আমাদের খাদে পড়িতে হইবে এবং পড়িয়াও আছি।

আমাদের আদর্শ—"লেখাপড়া করে যেই, গাড়ী ঘোড়া চড়ে সেই।" এবং আমাদের সেই লেখাপড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর উপর নির্ভর করে—শিক্ষার উপরে নহে। এ অবস্থায় কিসে ডিগ্রী সুলভ হয় সেই বিষয়ে সকলেরি লক্ষ্য।

আমার নিবেদন এই যে, আমরা যে বাংলায় প্রশ্নের উত্তর লিখিব সে বাংলার standard কি? 4th class হইতে আজ পর্য্যন্ত এই কয়েক বৎসরের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ধন Chaste Bengali (চোস্ত বাংলা?) রূপ পদার্থটির কোন সন্ধান পাইলাম না।

১৯১৪ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা প্রশ্নপত্রে রবীন্দ্রনাথের পুস্তক হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছিল তাহা এই—"যেদিন লেখবার ঝোঁক চাপে সেদিন হঠাৎ এত ভাব মনের মধ্যে এ'সে প'ড়ে যে দিশাহারা হ'য়ে যেতে হয়। এক সাথে কোকিল, পাপিয়া, হাঁস সকলগুলি ডাকতে আরম্ভ করে, আর বসন্ত, নিদাঘ, বর্ষা, শরৎ ছুটে এসে পড়ে। কতক যদি বা বলা হয়

ত অনেক প'ড়ে থাকে। একটা একটুখানি মানুষের মন পেরে উঠবে কেন?" এই বাক্য কয়টি chaste and elegant Bengali-তে লিখিতে হইবে প্রশ্নপত্রে এরূপ লেখা ছিল। যদি রবীন্দ্রনাথের ভাষা standard না হয় তবে বাংলা যে কোন্ ধরণের হইবে তা আমাদের মত ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য।

আর একটি কথা। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক প্রশ্নপত্রের উপরে লেখা থাকে—Candidates are required to give their answers in their own words as far as practicable.

বাঙ্গলার সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমাদের হাতে সংশোধিত হইয়া কেমন করিয়া Chaste and elegant Bengali হইবে এ রহস্য আমি বুঝিতে পারি না। 'প'ড়ে', 'এ'সে' এগুলিকে 'পড়িয়া' বা 'আসিয়া' লিখিলে যে elegant হইবে এ ধারণা যে আমার নাই তাহা আমি স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করি না।

বিশ্ববিদ্যালয় যদি আমাদের নিকট সংস্কৃত ভাষা চাহেন আমরা তাহাও লিখিতে পারি কিন্তু পূজ্যপাদ সাহিত্যরথীর ভাষাকে চোস্ত (?) করিতে আমরা অসমর্থ। লজ্জার বিষয় এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে রবীন্দ্রনাথের রচনার উপর স্কুলের ছাত্রদের হস্তক্ষেপ করিতে আদেশ করা হয়। ইংরাজি সাহিত্যের সহিত পরিচিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন Bentley ও Addison Milton-এর উপর কি মূর্খতার অত্যাচার করিয়াছিলেন! বাঙ্গলার বিশ্ববিদ্যালয় যে ছাত্র-সমাজের উপর সেই কবি-পীড়নের ভার দিতেছেন ইহা দেখিয়া শরীর শিহরিয়া উঠে।

সকলেই জানেন আমরা কলেজে পড়ি পাশ করিবার জন্য; শিক্ষালাভ আমাদের গৌণ উদ্দেশ্য। কাজেকাজেই পরীক্ষকবর্গের মনস্তুষ্টির জন্য রবীন্দ্রনাথের ভাষাকে আমরা কাটিয়া ছাঁটিয়া মাজিয়া ঘষিয়া সভ্যভব্য করিয়া তুলিতে বাধ্য হই। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লেখক লাঞ্ছিত হন, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা যে মাতৃভাষায় কতদূর ব্যুৎপন্ন হইয়া ওঠে তা বলা বাহুল্য। সত্য কথা এই যে, আমাদের স্কুল কলেজে বাঙ্গলা শিক্ষা দিবার Form বজায় আছে—কিন্তু কাজে কিছুই হয় না।

শ্রীসুবোধ চট্টোপাধ্যায়।

নামশূন্যা কন্যা

ছ' মাসের কচি কন্যা! নাই তোর নামের বড়াই!
এক-রত্তি শিশিরের কণা হেরি কামিনী-কোরকে;
এক-রত্তি জোনাকীর আলো হেরি যামিনী-অলকে!
রাঙা আনারের দানা, লিচু ও খেজুর-পানে চাই,
লুব্ধ নেত্রে, তাহাদের তনুতে তুলনা যদি পাই!
এক-রত্তি মুক্তা হেরি, অতি ক্ষুদ্র পরীর নোলকে,—
এইরূপে সারা-বিশ্বে ভ্রমে ভ্রমি অশ্রান্ত পুলকে,
ক্লান্ত আঁখি বলে শেষে 'কন্যার তুলনা বুঝি নাই'!
কোলে ল'য়ে দিদিরা কতই হাসে, আঁখি অনিমিক্,
বলে তারা "মোদের পুতুল সম তুই মনোরম।"
মৌলিক রসিক শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র খোকা,—কবি অনুপম,
বলে হেসে তাড়াতাড়ি "খুকি লাল লোজেঞ্জেস্ ঠিক্!"
গৃহিণীরা হাসি বলে "কন্যা তুই পেয়ারার জেলি।"
বিস্মিতা উপমা কিন্তু ঘাড় নাড়ে, মুগ্ধ আঁখি মেলি!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।